



THE HON'BLE MOHARAJAH MANINDRA CHANDRA NANDI BAH

মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহ



প্রথম খণ্ড ।

ভারতবর্ষ ।

(প্রাচীন ভারতবর্ষ ।)

শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী প্রণীত ।

প্রকাশক,—

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী ।

“পৃথিবীর ইতিহাস” কার্যালয়, হাওড়া ।

কর্দয়োগ প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
৪নং তেলকলঘাট রোড, হাওড়া,
হুইতে
ঐযুক্তকিশোর সিংহ কর্তৃক মুদ্রিত।

ত্ৰিত্ৰিহরিঃ—শৰণং ।

উৎসৰ্গ ।

অশেষ বৰ্ণসম্পন্ন মাননীয়

মহাৰাজ শ্ৰীল শ্ৰীবৃদ্ধ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুৰ

সমীপে ।

মহাৰাজ !

বৰ্ত্তমান বঙ্গে আপনি বঙ্গভাষাৰ ও বঙ্গীয় সাহিত্যসেবিগণেৰ প্ৰধান আশ্ৰয়স্থল । আপনাৰ অক্ষুণ্ণায় বঙ্গভাষা দিন দিন বহুতৰ অমূল্য বৰ্দ্ধভূষণে অলঙ্কৃত হইতেছে ; আবার, বঙ্গীয় সাহিত্যসেবিগণও সাহিত্যসেবা-ত্ৰতে আপনাৰ নিকট নানাক্ৰমে উৎসাহ পাইতেছেন । আমাৰ এই “পৃথিবীৰ ইতিহাস” প্ৰণয়ন উপলক্ষেও আপনি স্বতঃপ্ৰযুক্ত হইয়া আমাৰ পৃষ্ঠপোষণে— এক খণ্ডেৰ মুদ্ৰণ-ব্যয় প্ৰদানে—সম্মত হইয়াছেন । আপনাৰ এ অল্পগ্ৰহ কখনই বিস্মৃত হইবার নহে । কৃতজ্ঞতাৰ নিদৰ্শন-স্বৰূপ আমাৰ “পৃথিবীৰ ইতিহাস” গ্ৰন্থেৰ এই খণ্ড আপনাৰ চিৰস্মরণীয় নামে উৎসৰ্গীকৃত হইল ।

হাওড়া,

৩০ এ চৈত্ৰ, ১৩১৬ সাল ।

বিনীত

শ্ৰীহৰ্গদাস লাহিড়ী ।

প্রাচীন ভারতবর্ষের সমাজ, ধর্ম, আচার, ব্যবহার, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে আমাদের জ্ঞান-বিশ্বাস-মতে আমরা যাহা বুঝিয়াছি, তাহাই এই গ্রন্থ-পত্রে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। সকলের দৃষ্টিতে উহা যে সর্বথা অত্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে, বিষয়ের সে স্পর্শা; কখনই করি না; প্রাচীন ভারতের ইতিহাস আলোচনায় অনন্ততঃ সে স্পর্শা করিবার কাহারও শক্তি আছে বলিয়াও আমাদের মনে হয় না। ভারতের—অনন্তকালের অনন্ত ইতিহাস; আর সে ইতিহাসে অনন্ত তত্ত্ব নিহিত আছে। যিনি যে দৃষ্টিতে যে অংশের প্রতি লক্ষ্য করিবেন, তিনি তদনুরূপ দৃষ্টাই দেখিতে পাইবেন। অধিকারী অনুসারে, জ্ঞান-বুদ্ধির তারতম্য-ক্রমে, তাহাতে এক এক জনের প্রাণে এক এক নূতন ভাবের ক্ষুধা হইতে পারে; এমনকি, সময়ে সময়ে তাহাতে অনুসন্ধিৎসু জনের মনে নানা বিপরীত ভাবের সঞ্চার হওয়াও অসম্ভব নহে। সে দৃষ্টান্ত—এই গ্রন্থের অনেক স্থলেই দেখিতে পাইবেন। সে দৃষ্টান্ত,—ভারতের পুরাতত্ত্বে কেহ জাতি-ভেদ-প্রথা—ব্রাহ্মণাদির অস্তিত্ব—দেখিতে পান; কেহ বা তাহার বিপরীত দৃষ্ট দর্শন করেন। সে দৃষ্টান্ত,—কেহ অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করেন; কেহ বা নানা দেবদেবীর মাহাত্ম্য-তত্ত্ব বুঝিতে পারেন। এই গ্রন্থে প্রধানতঃ সেই তথ্যই আমরা প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি।

উপসংহারে বল্লেখ্য, এই গ্রন্থের প্রকাশ-সম্বন্ধে যাহারা আমাদের সহায়তা-কল্পে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। তাঁহারা দীর্ঘ-জীবী হউন; তাঁহাদের যশঃ-সৌরভে দিগ্দিগন্ত আমোদিত হউক।
উপসংহার। তাঁহাদের ভরসা ও উৎসাহ না পাইলে, আমাদের স্থায় নিঃশব্দ ব্যক্তির এই গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার সাধ্য কি ছিল? সুতরাং গ্রন্থ-সূচনায় তাঁহাদের শুভ-কামনা করিতেছি। “পৃথিবীর ইতিহাসে” তাঁহাদের পরিচয় চিরস্মরণীয় করিবার জন্য চেষ্টার ক্রটি করিব না। “পৃথিবীর ইতিহাস” প্রণয়নে যে যে গ্রন্থের সাহায্য গৃহীত হইতেছে, প্রসঙ্গতঃ প্রায় সকল গ্রন্থের নামই উল্লেখ করা হইয়াছে। অধিকন্ত, এক এক দেশের ইতিহাস সম্পন্ন হইলে, সেই সেই দেশ-সংক্রান্ত গ্রন্থাবলীর সাহায্য প্রাপ্তির বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচিত হইবে। পরিশেষে বল্লেখ্য, এই গ্রন্থের সহিত শ্রীমান্ প্রমথনাথ সান্যালের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। এই গ্রন্থ-প্রণয়নে তিনি আগার দক্ষিণ-হস্ত-স্থানীয়। গ্রন্থের অনেক অংশ তাঁহার লিখিত বলিলেও অত্যাশ্চর্য্য হয় না। ইহার প্রকাশ-পক্ষে তাঁহার যত ও অধ্যবসায় অভুলনীয় বলিতে কি, তাঁহার উৎসাহ না পাইলে, এ গ্রন্থ লিখিত ও প্রকাশিত হইবারই সম্ভাবনা ছল না! সুতরাং এই গ্রন্থ-প্রণয়নে শ্রীমান্ প্রমথনাথের নাম চির-সম্বন্ধযুক্ত রহিল। ইতি।

হাওড়া।

৩০-এ কাশ্বন, ১৩১৬।

নিবেদক,

শ্রীহরগদাস লাহিড়ী।

সূচনা ।



১২

এ পর্যন্ত ভারতের কোনও ভাষায় “পৃথিবীর ইতিহাস” প্রকাশিত হয় নাই। আমাদের সঙ্কল্প—আমরা বাঙ্গালা ভাষায় সেই “পৃথিবীর ইতিহাস” প্রকাশ করিব। বহু দিন হইতেই এ কল্পনা আমাদের মনোমধ্যে উদয় হইয়াছিল ; বহু দিন সঙ্কল্প । হইতেই এতৎ-সম্পর্কে আমরা উত্তোগ-আয়োজনে ত্রুটি হইয়াছিলাম। ভগবৎ-রূপায় এক্ষণে আমাদের সেই অভীষ্ট-সিদ্ধির সুযোগ উপস্থিত। এই “পৃথিবীর ইতিহাস”—এক বিরাট কল্পনা ; অন্যান্য ত্রিশ খণ্ডে সম্পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা। সে হিসাবে, এই গ্রন্থ-খণ্ড—ভূমিকা মাত্র। পৃথিবীর সকল দেশের সর্ববিধ জাতব্য-তত্ত্ব বাঙ্গালা ভাষায় এই “পৃথিবীর ইতিহাসে” সন্নিবিষ্ট করিব,—ইহাই আমাদের অভিলাষ। এ পর্যন্ত ইংরাজী প্রভৃতি ভাষায় যে সকল ‘পৃথিবীর ইতিহাস’ প্রকাশিত হইয়াছে ; আমাদের আকাঙ্ক্ষা—আমরা এই ইতিহাসে তদপেক্ষা অধিক বিষয়ের আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব।

ভারতবর্ষকেই আমরা সর্ববিষয়ের আদিভূত বলিয়া মনে করি। সুতরাং “পৃথিবীর ইতিহাসে” ভারতবর্ষের প্রসঙ্গই প্রথমে উত্থাপন করিলাম। পূর্বেই বলিয়াছি,—এই গ্রন্থ ভূমিকা মাত্র। প্রকারান্তরে ভারতবর্ষের ইতিহাসেরও ইহা ভূমিকা মাত্র। ভারতবর্ষের ইতিহাস বুঝিতে হইলে, প্রথমে শাস্ত্র-তত্ত্ব বুঝিবার আবশ্যক হয়। শাস্ত্র-গ্রন্থের সহিত ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস ওতঃ-প্রোত বিজড়িত। সুতরাং আমরা এই গ্রন্থে প্রথমে সংক্ষেপে বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্র-গ্রন্থের পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছি। তার পর, তাহা হইতে ক্রমে ক্রমে পুরাতত্ত্ব উদ্ধারের প্রয়াস পাইয়াছি। অতীত দেশের ইতিহাসের তুলনায় ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটু বিশেষত্ব আছে। সে বিশেষত্ব—অতীত দেশের ইতিহাসে প্রকাশ, তত্ত্বদেশ অবনত অবস্থা হইতে দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে ; কিন্তু ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্ব আলোচনায় আমরা বুঝিতে পারি, ভারতবর্ষ উন্নত ছিল, যুগ বিবর্তনে এখন অবনতি পথে প্রধাবিত হইয়াছে। সে হিসাবে, অতীত দেশে প্রথমে জাতির অভ্যুদয়, পরে সভ্যতার সমৃদ্ধি তাহাদের ইতিহাসের সৃষ্টি ; কিন্তু ভারতবর্ষে প্রথমেই সভ্যতা, প্রথমেই সভ্যতার আদিভূত শাস্ত্র-গ্রন্থের অভ্যুদয়। সেজন্যও আমরা প্রথমে শাস্ত্রাদির পরিচয় প্রদান করিয়া পরিশেষে অতীত বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি।

ভান্তনম ।

সংক্ষিপ্ত সূচীপত্র ।

পরিচ্ছেদ ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
১ম ।	ইতিহাসে প্রতিষ্ঠা	১
	সভ্যতায়, প্রাচীনযে, প্রাকৃতিক দৃষ্টে, জলবায়ু প্রভৃতিতে শ্রেষ্ঠত্ব ৩ ; পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত ৪ ; প্রাচীনযে ভারতের শীর্ষস্থান,—মিশর, গ্রীস, প্রভৃতির সহিত তুলনা ৭ ; প্রাচীনত্ব-বিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ৯ ।	
২য় ।	আর্য্য-জাতি	১২
	ভারতেই আর্য্য-জাতির প্রতিষ্ঠা ১২ ; আর্য্য-জাতির আদি-বাস সম্বন্ধে বিভিন্ন মত ও তাহার কারণ-পরম্পরা ১৩ ; সেই মতামতের অযৌক্তিকতা ১৪ ; আর্য্য-হিন্দুগণের পৃথিবীর সর্বত্র গতিবিধি ১৬ ; অভিজ্ঞতাই আদি- বাসের পরিচায়ক নহে ১৮ ; আর্য্যাবর্ত ২২ ; আর্য্য ও অনার্য্য ২৪ ।	
৩য় ।	বেদ-চতুষ্ঠয়	২৬
	বেদ-পরিচয় ২৬ ; বেদ-রচয়িতা ২৭ ; বেদ কত কালের ২৯ ; ঋগ্বেদ ৩০ ; যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব ৩২ ; বেদোক্ত দেবতা ও ঋষি ৩৩ ; বেদোক্ত ধর্ম্ম ৩৪ ; বেদোক্ত আচার-ব্যবহার ৩৭ ; বেদে জাতিভেদ ৪০ ; বেদই সর্বশাস্ত্রের মূল ৪৬ ; বৈদিক ধর্ম্মই সকল ধর্ম্মের আদিভূত ৪৮ ।	
৪র্থ ।	বৈদিক প্রসঙ্গ	৫১
	বেদে পুরাবৃত্ত—ইতিহাস-তত্ত্ব ৫১ ; বৈদিক কালের রাজস্ববর্গ ৫৩ ; বৈদিক-কালের যুদ্ধ-বিগ্রহ ৫৬ ; বেদ-বিষয়ক বিবিধ প্রসঙ্গ ৫৭ ; বেদ-ব্যাখ্যায় অধিকারী-অনধিকারী ৬০ ।	
৫ম ।	ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষৎ	৬২
	ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক ৬২ ; সৃষ্টি-তত্ত্ব, জল-প্রাবন, মনু ও নোয়া ৬২ ; হরিশ্চন্দ্র, শুনঃশেফ ও নরবলি ৬৩ ; উপনিষৎ, লংখ্যা-পর্য্যায়, উপনিষদের প্রতিপাদ্য ৬৫ ; উপনিষদে ব্রহ্ম-তত্ত্ব ৭০ ; উপনিষৎ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মত ৭১ ; উপনিষদোক্ত রাজস্ববর্গের কৃতিত্ব-পরিচয় ৭৩ ।	
৬ষ্ঠ ।	ষড়্বেদোক্ত	৭৪
	সূত্র-গ্রন্থের পরিচয় ৭৪ ; সূত্র-সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মত ৭৬ ; ষড়্বেদোক্ত ৭৭ ; পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত ৮১ ।	
৭ম ।	ষড়্দর্শন	৮৩
	ষড়্দর্শনের সার-সঙ্কল ৮৩ ; পাশ্চাত্য ও হিন্দু-দর্শনে পার্থক্য ৮৫	

পরিচ্ছেদ ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
৮ম ।	সাম্ব্য-দর্শন	৮৭
	কপিল ও সাম্ব্য-দর্শন ৮৭ ; সাম্ব্যের প্রতিপাদ্য ৮৯ ; সাম্ব্য-মতে সৃষ্টি- তত্ত্ব ৯১ ; সাম্ব্য-মতে ঈশ্বর ৯৩ ; কপিলের নিরীশ্বর-বাদ ৯৪ ।	
৯ম ।	বৈশেষিক-দর্শন	৯৬
	কণাদ ও বৈশেষিক দর্শন ৯৬ ; বৈশেষিকের প্রতিপাদ্য ৯৭ ; বৈশে- ষিক দর্শনের বিবিধ-তত্ত্ব ৯৯ ।	
১০ম ।	তায়-দর্শন	১০১
	গৌতম ও তায়-দর্শন ১০১ ; তাস্তকারগণ ১০২ ; তায়-দর্শনের প্রতি- পাদ্য ১০৩ ; তায়-দর্শনের বিবিধ তত্ত্ব ১০৬ ।	
১১শ ।	পাতঞ্জল-দর্শন বা যোগশাস্ত্র	১১০
	পতঞ্জলি ও যোগ-শাস্ত্র ১১০ ; পাতঞ্জল-দর্শনের প্রতিপাদ্য ১১০ ; যোগ- মাহাত্ম্য ১১২ ; হরিদাস সাধু প্রভৃতির প্রসঙ্গ ১১২—১১৩ ।	
১২শ ।	মীমাংসা-দর্শন	১১৪
	জৈমিনি ও মীমাংসা-দর্শন ১১৪ ; মীমাংসা-দর্শনের প্রতিপাদ্য ১১৫ ।	
১৩শ ।	বেদান্ত-দর্শন	১১৭
	বাদরায়ণ ও বেদান্ত-দর্শন ১১৭ ; ঈতদৈত মত ১১৯ ; অধিকার-তত্ত্ব ১২০ ; ঐতদৈত মতের পরিচয় ১২২ ; ঐতদৈত-বাদের বিবিধ কথা ১২৪ ; ঈতদৈত মতের পরিচয় ১২৫ ; বেদান্ত-দর্শনের বিবিধ তত্ত্ব ১২৮ ; বেদান্ত-সূত্রে বাস্তবের অভিপ্রায় ১৪০ ।	
১৪শ ।	চার্বাক ও বৌদ্ধ-দর্শন	১৩২
	বৃহস্পতি ও চার্বাক-দর্শন ১৩২ ; চার্বাক-দর্শনের সার-সঙ্কলন ১৩৩ ; বৌদ্ধ-দর্শন ১৩৪ ; বৌদ্ধ-দর্শনের প্রতিপাদ্য ১৩৬ ।	
১৫শ ।	ষড়দর্শন সমন্বয়	১৩৮
	হিন্দু-দর্শন-সমূহের সাদৃশ্য ১৩৮ ; প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন ১৪১ ।	
১৬শ ।	স্মৃতি	১৪৪
	বিশ্বস্তি স্মৃতি-সংহিতা ১৪৪ ; মহাসংহিতা ১৪৬ ; অত্রি-সংহিতা ১৫০ ; বিষ্ণু-সংহিতা ১৫১ ; হারীত ও যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা ১৫২ ; উশনঃ-সংহিতা ১৫৩ ; অঙ্গির, যম ও আপস্তম্ব সংহিতা ১৫৪ ; সংবর্ত, কাত্যায়ন ও বৃহস্পতি সংহিতা ১৫৫ ; পরাশর-সংহিতা ১৫৬ ; ব্যাস-সংহিতা ১৫৭ ; শঙ্খ, লিখিত ও দক্ষ সংহিতা ১৫৮ ; গৌতম, শাতাতিপ ও বশিষ্ঠ সংহিতা ১৫৯ ; সংহিতা- সমূহে সামাজিক চিত্র ১৬০ ; স্মৃতি-সংহিতার কাল-নির্ণয় ১৬৩ ; স্মার্ত রঘুনন্দন ১৬৫ ; একাদশী-তত্ত্ব ১৬৬ ; শূলপাণি ও স্মৃতিশাস্ত্র ১৬৮ ।	

পরিচ্ছেদ ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
১৭শ ।	পুরাণ	১৭০

পুরাণ-প্রসঙ্গ ১৭০ ; মহা-পুরাণ ও উপপুরাণ ১৭১ ; ব্রহ্মপুরাণ ১৭৩ ; পদ্ম-পুরাণ ১৭৪ ; বিষ্ণুপুরাণ ১৭৫ ; শিবপুরাণ ১৭৬ ; লিঙ্গপুরাণ ও গরুড়-পুরাণ ১৭৭ ; নারদ-পুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত ১৭৮ ; অগ্নিপুরাণ ১৮০ ; স্বন্দ-পুরাণ ১৮১ ; ভবিষ্য-পুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ ১৮২ ; মার্কণ্ডেয়-পুরাণ ১৮৩ ; বামন-পুরাণ ও বরাহ-পুরাণ ১৮৫ ; মৎস্য-পুরাণ ও কুর্শ-পুরাণ ১৮৬ ; ত্রিকাণ্ড-পুরাণ ১৮৭ ; উপপুরাণ-প্রসঙ্গ ১৮৮ ; পুরাণোপপুরাণের সার মর্থ ও সম্বন্ধ-বিধান ১৯০ ; পুরাণে ইতিহাস ১৯৩ ; বেদব্যাস ও পুরাণ-রচনা ১৯৪ ; পুরাণ রচনার সময়ালোচনা ১৯৫ ; পুরাণে বিবিধ চিত্র ২০১ ; পাশ্চাত্য মত ২০৪ ।

১৮শ ।	তন্ত্র	২০৭
-------	---------------	-----

তন্ত্র-শাস্ত্র ২০৭ ; পঞ্চ-মকার তন্ত্র ২০৯ ; তান্ত্রিক আচার ২১১ ; তন্ত্র সম্বন্ধে বিবিধ বক্তব্য ২১২ ; তান্ত্রিক পূজা-পদ্ধতি ২১৪ ।

১৯শ ।	রামায়ণ	২১৫
-------	----------------	-----

রামায়ণের সার মর্থ ২১৫ ; অযোধ্যার বিবিধ চিত্র ২১৯ ; যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ ২২৩ ; বিবিধ রামায়ণ গ্রন্থ ২২৬ ; পদ্মপুরাণে রামচরিত ২২৬ ; পুরাণান্তরে রামচরিত ২২৮ ; বাঙ্গালী ও কৃত্তিবাস ২৩০ ; উভয়ের অসাম-ঞ্জস্য ২৩১ ; রামায়ণে শিক্ষা ২৩৪ ; অযোধ্যা ও লঙ্কা ২৩৫ ; রামায়ণের প্রাচীনত্ব ২৩৬ ; রামায়ণ বা মহাভারত ২৩৯ ; পাশ্চাত্যের তুলনা ২৪০ ।

২০শ ।	মহাভারত	২৪১
-------	----------------	-----

মহাভারত-পরিচয় ২৪১ ; কুরু-পাণ্ডবের বিবরণ ২৪২ ; কুরুক্ষেত্রের মহাসমর ২৪৫ ; ধৃতরাষ্ট্রের ভবিষ্য-দর্শন ২৪৭ ; ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে মহাভারত-প্রসঙ্গ ২৫৬ ; প্রক্লিপ্ত-প্রসঙ্গ ২৫৮ ; মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র ২৬১ ; শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২৬৬ ; মহাভারতের ঐতিহাসিকতা ২৬৯ ; সমসাময়িক চিত্র ২৭৩ ; মহাভারতের প্রাচীনত্ব ২৭৬ ; মহাভারতের কাল-নির্ণয় ২৭৯ ; কাল-নির্ণয়ে শ্রীকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ ২৮২ ; আপস্তম্বের কথা ২৮৪ ; হরিবংশ ২৮৯ ; উপসংহার ২৯০ ।

২১শ ।	দুর্ধ্যবংশ	২৯১
-------	-------------------	-----

দুর্ধ্যবংশের বংশলতা ;—রামায়ণে ২৯২ ; ব্রহ্মপুরাণে ২৯৩ ; বিষ্ণুপুরাণে ২৯৪ ; হরিবংশে ২৯৭ ; অগ্নিপুরাণে ২৯৮ ; শিবপুরাণে ২৯৯ ; শ্রীমদ্ভাগবতে ৩০০ ; মহাভারতে ৩০২ ; দেবীভাগবতে ও বৃহদ্রত্নপুরাণে ৩০৩ ।

২২শ ।	চন্দ্রবংশ	৩০৪
-------	------------------	-----

চন্দ্রবংশের বংশলতা ;—মহাভারতে ৩০৫ ; হরিবংশে ৩০৭ ; বিষ্ণুপুরাণে ৩০৯ ; শ্রীমদ্ভাগবতে ৩১৮ ; অগ্নিপুরাণে ৩২৩ ; ব্রহ্মপুরাণে ৩২৬ ।

পরিচ্ছেদ ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
২৩শ ।	মনু ও মনুপুত্রগণ ... স্বায়ম্ভুব মনু ৩৩০ ; প্রিয়ব্রত ও তৎপুত্রগণ ৩৩১ ; প্রিয়ব্রত-বংশ ৩৩৩ ; ঋষত ও ভরত ৩৩৪ ; উত্তানপাদেব বংশ ৩৩৫ ; স্বায়ম্ভুব মনুর বংশলতা,— শ্রীমদ্ভাগবতে ৩৩৭, বিষ্ণুপুরাণে ৩৩৮ ; অপরাপর মনু ও মনুপুত্রগণ ৩৩৯ ।	৩৩০
২৪শ ।	সূর্য্যবংশীয় নৃপতিগণ ... সূর্য্যবংশের আদিরাজগণ ৩৪১ ; হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান ৩৪২ ; অযোধ্যার নৃপতিগণ ৩৪৪ ; মিথিলার রাজবংশ ৩৪৭ ; বৈবস্বত মনুর বংশধরগণ ৩৪৮ ।	৩৪১
২৫শ ।	চন্দ্রবংশীয় নৃপতিগণ ... আয়ু ও অমাবস্যুর প্রসঙ্গ ৩৫০ ; নৃহ-পুত্র যতি ও যযাতি ৩৫২ ; যদুবংশ ৩৫৩ ; পুরুবংশ ৩৫৭ ; দ্রুহ্য, তুর্কসু ও অণুর বংশ ৩৬৩ ।	৩৫০
২৬শ ।	দৈত্য ও দানবগণ ... কল্প ও তাঁহার বংশ ৩৬৫ ; দৈত্য ও দানবগণ ৩৬৬ ; হিরণ্যকশিপু ও প্রজ্ঞাদ প্রভৃতির বংশলতা ৩৬৬ ; বিবিধ দৈত্যের বিবরণ ৩৬৭ ; বিভিন্ন মহন্তের বিভিন্ন দৈত্যগণ ৩৬৯ ; ব্রজাসুর ও অন্যান্য দৈত্যগণ ৩৭০ ; রূপকে ব্রজাসুর প্রভৃতি ৩৭১ ; দৈত্যাদির তাৎপর্য্য ৩৭৩ ।	৩৬৫
২৭শ ।	বংশ-পর্য্যায় আলোচনা ... বংশ-পর্য্যায় আলোচনায় অসামঞ্জস্য ৩৭৪ ; মিশর, চীন প্রভৃতির তুলনা-তত্ত্ব ৩৭৫ ; সূর্য্যবংশের বংশ-লতায় অসামঞ্জস্য ৩৭৯ ; অজ্ঞাত মনুপুত্রের বংশে অসামঞ্জস্য ৩৮২ ; মৈথিল-বংশ ৩৮৩ ; ইলার অলৌকিকত্ব ৩৮৪ ; চন্দ্রবংশে ঘোর অনৈক্য ৩৮৫ ; অন্যান্য অসামঞ্জস্য-তত্ত্ব, ৩৮৭ ; বিদ্যামিমে প্রসঙ্গ ৩৮৯ ; বিবিধ বক্তব্য ৩৯১ ।	৩৭৫
২৮শ ।	অজ্ঞাত নৃপতিগণ ... নল-দময়ন্তী ৩৯৩ ; সাবিত্রী-সত্যবান ৩৯৬ ; অযোধ্যার আদি ও শেষ ৩৯৮ ; ক্ষুপ—আদিরাজা ৩৯৮ ; অন্যান্য রাজগণ ৩৯৯ ; মরুতের যজ্ঞ ও রাবণের দ্বিধিক্রয় ৪০০ ; নৃগ ও ব্রহ্মদত্ত ৪০১ ; শ্রীবৎস-চিন্তা ৪০২ ; ইন্দ্রদ্রুম ও জগন্নাথ-ক্ষেত্র ৪০৪ ; কাশী-নরেশগণ ৪০৬ ; অলক-প্রসঙ্গ, ৪০৮ ; পদ্মপুরা- ণোক্ত রাজন্যবর্গ ৪১১ ; মহাতারতোক্ত অপরাপর রাজত্ববর্গ ৪১৪ ; যুধিষ্ঠিরের অবশেষ যজ্ঞে আগত নৃপতিগণ ৪১৭ ; প্রসঙ্গোক্ত নৃপতিগণ ৪২০ ; ঋগ্বেদোক্ত নৃপতিগণ ৪২২ ; সুদাস, অমু, দ্রুহ্য, আয়ু প্রভৃতি ৪২৪ ; ঋগ্বেদোক্ত রাজর্ষি- গণ ৪২৮ ; ঋগ্বেদোক্ত অজ্ঞাত রাজগণ ৪৩১ ; বিবিধ রাজত্ব-পরিচয় ৪৩৩ ।	৩৯৩
২৯শ ।	রাজা ও প্রজা ... বেদে রাজত্ব ৪৩৬ ; প্রজার কর্তব্য ৪৩৭ ; রাজার কর্তব্য ৪৩৯ ।	৪৩৬
৩০শ ।	দেবতা ও ব্রাহ্মণ ... সম্বন্ধ-তত্ত্ব ৪৪১ ; দেবতা ৪৪১ ; অবতার-তত্ত্ব ৪৪৪ ; ব্রাহ্মণ-প্রসঙ্গ ৪৪৮ ; ঋষি-প্রসঙ্গ ৪৫০ ।	৪৪১
৩১শ ।	পূর্বানুস্মৃতি ... আতাস-মাত্র, অণু ও অনন্তের তুলনা ৪৫২ ; ভারতে সমাজ ৪৫৩ ; ভাল মন্দ দুই দিক ৪৫৩ ; বৈদিক যুগ-প্রসঙ্গ ৪৫৫ ; দ্বায়ত্রী ও বিশ্বামিত্র ৪৫৫ ; জাতিভেদ-তত্ত্ব ৪৫৬ ; সামাজিক আচার ব্যবহার ৪৫৮ ; জ্ঞান-বিজ্ঞানোন্নতি ৪৬০ ; বিবিধ বিষয়ে অভিজ্ঞতা ৪৬২ ; ভিন্ন ভিন্ন দেশে গতিবিধি ৪৬৪ ; বিবিধ ৪৬৮ ; উপসংহার ৪৭০ ।	৪৫২

২৩৩৩
ভারতবর্ষ ।

(প্রথম খণ্ড ।)

হিন্দু-রাজত্ব ।

শ্রী হর্গাদাস লাহিড়ী ।

নিবেদন ।

ভারতবর্ষের এই ইতিবৃত্ত প্রণয়ন সম্বন্ধে প্রধানতঃ আমি তিনটা বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছি,—

প্রথম।—ভারতবর্ষ-সম্বন্ধে প্রচলিত সাধারণ মত-পরম্পরার পরিচয় দিবার প্রয়াস পাইয়াছি; অর্থাৎ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মণীষিগণ কোন্ বিষয় কি ভাবে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন,—তাহার আভাস এই গ্রন্থে পাঠকগণ যাহাতে পাইতে পারেন, আমি তৎপক্ষে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি।

দ্বিতীয়।—একই বিষয়ে নানা জনে নানামত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের অনেকেই মতামত আমি আলোচনার চেষ্টা পাইয়াছি। সেই প্রচলিত মত-সমূহের আলোচনা করিয়া, কোন্ কোন্ বিষয়ে আমার মনে কিরূপ ধারণা হইয়াছে,—তাহাও এই গ্রন্থে বিবৃত করিয়াছি। বলা বাহুল্য, সেই ধারণায় উপনীত হওয়ার কারণ-পরম্পরা নির্দেশ করিতেও আমি ক্রটি করি নাই। তবে প্রাচীন বিষয়ের আলোচনায়, আমার জ্ঞান-বুদ্ধি-শিক্ষানুসারে, প্রধানতঃ আমি শাস্ত্রমতের অনুসরণ করিতেই চেষ্টা পাইয়াছি।

তৃতীয়।—প্রত্যেকেই জ্ঞান-বুদ্ধি-অনুসারে মতামত প্রকাশে বা বিচার-বিতর্কে অধিকারী। সুতরাং আমি যদি কোনও নূতন সিদ্ধান্তে উপনীত হই, পাঠক-মাত্রকেই যে তাহা মানিয়া লইতে হইবে, সেরূপ স্পর্ধা—সেরূপ উদ্দেশ্য আমার আদৌ নাই। যে বিষয় লইয়া কত বড় বড় পণ্ডিতের মস্তিষ্ক বিবৃণিত হইয়া গিয়াছে, ক্ষুদ্র আমি, আমার সিদ্ধান্তই যে প্রমাদ-পরিশূন্য হইবে—তাহাই বা কিরূপে বলিতে পারি? তবে, যুক্তিযুক্ত প্রমাণ-পরম্পরা দেখিয়া যদি কেহ আমার কোনও সিদ্ধান্তের পোষকতা করেন, তাহাই আমার পরিশ্রমের সাক্ষ্য বলিয়া মনে করিব।

আমার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পাঠকগণ এই গ্রন্থ পাঠ করেন, আমার ক্রটি-বিচ্যুতি উপেক্ষা করেন,—এই গ্রন্থ-প্রচারে ইহাই আমার প্রার্থনা।

বিনীত,
প্রণয়ক।



ভারতবর্ষ।



প্রথম পরিচ্ছেদ।

ইতিহাসে প্রতিষ্ঠা।

[ইতিহাসে ভারতের শীর্ষস্থান,—সভ্যতায়, প্রাচীনত্বে, প্রাকৃতিক দৃষ্টে, জলবায়ু প্রভৃতিতে শ্রেষ্ঠ—
ম্যাক্সমুলার, হীরেণ, মারে, টড, জোর্ণস্-জার্বা প্রভৃতির মতে ভারতবর্ষের অলৌকিকত্ব,—মিশর, গ্রীস,
রোম প্রভৃতির সহিত তুলনা,—বিপ্লবের শত ঝঞ্ঝাবাতেও ভারতীয় প্রতিষ্ঠার ক্রম-পর্যায়-রক্ষা,—ব্রাহ্মণ্য-
গৌরবের দৃষ্টান্ত,—প্রাচীনত্বে প্রাধিক্য,—মিশরের মেনেস প্রভৃতির তুলনা,—স্বর্গের অনন্তত্ব,—পঞ্চনাকে
কোটা কোটা বৎসরের প্রতিষ্ঠা,—প্রাচীনত্ব বিষয়ে জোর্ণস্-জার্বা, ষ্টাইলস্, হ্যালবেড, বেলি, হীরেণ,
আবুল কডেল প্রভৃতির মত,—মেগাস্থেনীস এবং দেবীস্থান-গ্রন্থের বর্ণনা।]

পৃথিবীর ইতিহাসে ভারতবর্ষ শীর্ষ-স্থান অধিকার করিয়া আছে। ভারতবর্ষ—
সভ্যতার, জ্ঞানের, মনুষ্যত্বের, বীরত্বের—সকলেরই আদিভূত। সভ্যতার প্রস্রবণ প্রথমে

ভারতবর্ষই—
আদিভূত।
কোথায় প্রবাহিত হইয়াছিল?—সে এই ভারতবর্ষে! জ্ঞানালোক
প্রথমে কোথায় প্রস্ফুট হইয়াছিল?—সে এই ভারতবর্ষে! দর্শন,

বিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতিষ—সভ্য-জগৎ বাহার গৌরবে অধুনা পরীক্ষান—
ভারতবর্ষই তাহার উৎপত্তি-স্থান নহে কি? সভ্য, সরলতা, দয়া-দাক্ষিণ্য প্রভৃতি
গুণগ্রামের উচ্চ আদর্শ ই বা পৃথিবীর কোন্ দেশে প্রথম পরিদৃষ্ট হইয়াছিল? শৌর্য-
বীৰ্য, আত্মত্যাগ, স্বদেশাহুসার—মানব-চরিত্রের যে কিছু উচ্চ সম্পদ—ভারতবর্ষ
সকলেরই আদিভূত নহে কি? ভারতীয় সভ্যতার কণিকামাত্র লাভ করিয়াই পৃথিবীর
অস্তিত্ব দেশ মুসভ্য ও গৌরবান্বিত হইয়াছে। ভারতবর্ষ হইতেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের কিরণ-
ছটা দিল্লিগন্তে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষই সকল গৌরবের আধার-স্থান।
প্রকৃতি ভারতবর্ষকে অল্পপরিমাণে পৌলুষ্য-সুবহার বিভূষিত করিয়া রাখিয়াছেন। এখানে
সকল সময়েই কড়কড়ের অপূর্ণ সামগ্র্য! এখানে, ক্রম-ক্রমে কুহন-কানন অহরহ

শুষ্করিত ; এখানে, বসন্তের যুগ্মবন্দ মলয়ানিলে মনঃপ্রাণ নিক-পরিপ্লুত ; এখানে, মলুবনে কোকিল-পাপিয়া-শ্যামার স্নমপুর সুস্বর-লহরীতে ভারত-কানন প্রতিধ্বনিত। আবার এখানে, গ্রীষ্মের প্রথম মার্ভণ্ড-কিরণ, প্রাবটের প্রবল বারিবর্ষণ, শীতের প্রচণ্ড হিমালী-সম্পাত !—একাধারে এ বৈচিত্র্য পৃথিবীর আর কোথায় আছে ? এখানে, হিমালয়ের উচ্চ-শৃঙ্গে আরোহণ কর, শীতে হিমালীতে শরীর সঙ্কুচিত হইবে ; এখানে, গ্রীষ্মের প্রথম মার্ভণ্ড-তাপ যদি অম্লভব করিতে চাও, দাক্ষিণাত্যে বিষুব-সান্নিধ্যে সে আকাজ্ঞা পূর্ণ হইবে ; আর যদি এখানে, সুজলা সুফলা শস্তশ্যামলা বৃষ্টি দেখিতে চাও, তোমার সম্মুখেই—এই বঙ্গদেশেই—সে নয়নাভিরাম মূর্তি বিরাজমান। কোমলে-কঠোরে, মোহনে-ভীষণে, সৌন্দর্য্যো-গাভীর্য্যো এমন একত্র সমাবেশ—ভারতবর্ষ ভিন্ন বুঝি অত্র কোথায়ও আর নাই ! ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ অবিসম্বাদিত। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পর্ব্বত হিমালয়—সে এই ভারতবর্ষে ! পৃথিবীর পবিত্র নদী—গুণাপূত ভাগীরথী—সে এই ভারতবর্ষে ! পৃথিবীর বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ—সে এই ভারতবর্ষে ! পৃথিবীর আদি-বাণী বেদ—সে এই ভারতবর্ষে ! পৃথিবীর আদি-ধর্ম্মের উৎপত্তি-স্থান—সে এই ভারতবর্ষে ! এখনও—ভারতবর্ষের এতাদৃশ অধঃপতনের দিনেও—পৃথিবীর অধিকাংশ লোক যে ধর্ম্মের অনুসরণকারী—সে ধর্ম্মও এই ভারতবর্ষেরই ! প্রকৃতি যেন আপন অল্পপম শ্রেষ্ঠ সম্পদে ভারতবর্ষকে সাজাইয়া রাখিয়াছেন। ভারতবর্ষের দৃশ্যাবলী মনঃপ্রাণবিমুক্তকারী ; ভারতবর্ষের গ্রায় ভূমির উর্ব্বরা-শক্তিই বা কোথায় আছে ? ভারতবর্ষের গ্রায় বিবিধ শস্ত-সম্পদ ও বিচিত্র জীবজন্তুর একত্র-সমাবেশই বা কোথায় দেখিতে পাই ? ফলতঃ, সমগ্র পৃথিবীর সার-সামগ্রী লইয়াই বিধাতা যেন ভারতবর্ষের সৃষ্টি করিয়াছেন !

আপনার দেশ—আপনার জন্মভূমি বলিয়া, অথবা গৌরব-গরিমা প্রকাশ করিতেছি না। ভারতবর্ষের বিপুল-বৈভবের প্রতি বাঁহারই দৃষ্টি পড়িয়াছে, তিনিই বিশ্বয়-বিহ্বল হইয়া-ছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে ম্যাক্সমুলারের স্থান কত উচ্চ, পাশ্চাত্য-পণ্ডিতের মতামত। কে না অবগত আছেন ? ভারতবর্ষের প্রসঙ্গ বধনই তিনি উত্থাপন করিয়াছেন, তখনই তিনি বলিয়াছেন,—“সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে যদি এমন

দেশ আয়ায় কখনও সন্ধান করিতে হয়—প্রকৃতি যে দেশ ধনৈর্ধর্য্যে শক্তি-সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন—এমন কি যে দেশ মর্ত্ত্যে অমরপুরী বলিলেও অত্যাঙ্ক হয় না—আমি যুক্তকণ্ঠে বলিব,—সে দেশ ভারতবর্ষ ! যদি কেহ আয়ায় জিজ্ঞাসা করেন,—কোন্ আকাশের কোন্ প্রদেশে জ্ঞান-সুর্ভিতে মানসিক বৃত্তিনিচয় পূর্ণ-পরিপ্লুত হইয়াছিল,—আর কোন্ দেশ জীবন-সমস্তার কঠোর প্রতিজ্ঞার প্রথম সমাধানে সমর্থ হইয়াছিল, এবং সেই সমাধানে প্লেটো ও কার্ট প্রমুখ পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের গবেষণাও প্রতিহত হইয়া আছে,—তাহা হইলে, আমি দেখাইয়া দিব—সে দেশ এই ভারতবর্ষ ! যদি কেহ আয়ায় জিজ্ঞাসা করেন,—আমাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবন সুগঠিত করিবার জন্য পৃথিবীর কোন্ দেহের কোন্ ভাষা হইতে প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করিতে পারি ;—প্রধানতঃ আমর্য্য গ্রীক, রোমান এবং সেমিটিক-জাতীয় ইহুদীদিগের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হইলেও,

মিঃস্কোচে দেখাইয়া দিব—তাহাও এই ভারতবর্ষেরই। কি ভাষা, কি ধর্ম, কি পুরাতত্ত্ব, কি দর্শনশাস্ত্র, কি বিধি-বিধান, কি আচার-ব্যবহার, কি আদিম শিল্প ও আদিম বিজ্ঞান—মহুয়া যে বিষয়ই অধ্যয়ন করিতে অভিলাষী হউন না কেন, মানব-জাতির ইতিহাসের সারভূত, শিক্ষাপ্রদ এবং মূল্যবান যাবতীয় সামগ্রীই এই ভারতবর্ষে—একমাত্র এই ভারতবর্ষের অনন্ত-ভাণ্ডারেই সঞ্চিত রহিয়াছে।” * অধ্যাপক হীরেণ বলেন,—“কেবল এমিয়া মহাদেশ বলিয়া নহে, সমগ্র পাশ্চাত্য-ভূখণ্ডের জ্ঞান এবং ধর্মের আধার-স্থান—এই ভারতবর্ষ।” † মিঃ মারে বলেন,—“ভারতবর্ষের মনোহর প্রাকৃতিক দৃশ্যের এবং অপূর্ণাঙ্গ বিবিধ উৎপন্ন দ্রব্যের তুলনা পৃথিবীর কোনও দেশের কোথাও নাই।” ‡ কর্ণেল টড্ রাজস্থানের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন,—“গ্রীক দার্শনিকগণ যীহাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন ; প্লেটো, থেলস্, পীথাগোরাস প্রভৃতি যীহাদের শিষ্যস্থানীয় ছিলেন ;—সেই আদর্শ-মনীষিগণের আদি-স্থান কোথায়,—বলিতে হইবে কি ? যীহাদের জ্যোতির্বিজ্ঞানের অলৌকিক প্রভাবে আজিও ইউরোপ-খণ্ড বিচকিত ও বিমূগ্ধ,—সেই জ্যোতির্বিদগণের আবাস-ভূমিই বা কোথায় ছিল ? যীহাদের স্থাপত্য—কারুকার্য্যে আজিও আশ্চর্য্যাদিত হইতে হয়, তাঁহারাই বা কোথায় ছিলেন ? সেই সঙ্গীত-শাস্ত্র-বিশারদগণ—যীহাদের সঙ্গীতের সুধাধারায় কখনও বা আনন্দে অবসাদ আনয়ন করিত, আবার কখনও বা অশ্রুধারায় হাস্তদুর্ভি-সঞ্চারে সমর্থ হইত, তাঁহারাই বা কোন্ দেশে অবস্থিতি করিতেন ?” § সকলেরই আদিভূত এই ভারতবর্ষ নহে কি ? কাউন্ট জোন্স জারুণা বলেন,—“ভারতের প্রত্যেক সামগ্রীই অভিনব বৈভব-সম্পন্ন এবং কৌতুহলোদ্দীপক। .. প্রকৃতি কি যাদুযুক্তি পরিগ্রহ করিয়াই এখানে বিরাজমান রহিয়াছেন ! এক দিকে, মুকুলযুগ্ম-পরিশোভিত কি সুন্দর শ্রামল প্রান্তর ; অত্র দিকে, তুর্গদ-প্রবাহ-বিচালিত কি ভীষণ প্রায়টের ঘনঘটা ! এক দিকে, তুষার-ধবলিত রজত-শুভ্র হিমাচলের কি মহীয়সী মূর্তি ; অত্র দিকে, অগ্নিস্রাবী মরু-প্রান্তরের কি শুষ্ক কঠোর ভীষণতা ! এক দিকে, হিন্দুস্থানের প্রশান্ত-বিস্তৃত সমতল ক্ষেত্রের কি কমনীয় কান্তি ; অত্র দিকে, উন্নত-শীর্ষ গিরিমালার কি অপূর্ণ গম্ভীর প্রকৃতি ! এক দিকে, অতীত ইতিহাসের অনন্ত জীবন ; অত্র দিকে, কবিত্বের পুষ্পপরাগে অতীতের অমল-স্মৃতি !” ॥ এইরূপ কত জনের কত কথা উল্লেখ করিব ? যীহারাই নিরপেক্ষভাবে ভারতের তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন, ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব-সম্বন্ধে তাঁহারা সকলেই একবাক্যে এই কথাই প্রতিধ্বনি

* “If I were to look over the whole world to find out the country most richly endowed with all the wealth, power, and beauty that nature can bestow—in some parts a very *paradise* on earth—I should point to India. &c., &c.”—Maxmüller's *India ; What can it teach us*.

† “India is the source from which not only the rest of Asia but the whole Western World derived their knowledge and their religion.”—Prof. Heeren,—*Historical Researches*. Vol II.

‡ Murray's *History of India*.

§ Colonel Tod's *Rajasthan*.

Count Bjornstjerna—*Theogony of the Hindus*.

করিয়া গিয়াছেন। সার উইলিয়ম জোন্স, অধ্যাপক এইচ্ এইচ্ উইলসন, মিঃ কোলব্রুক, মিঃ পোকক্, সার উইলিয়ম হ্যামিল্টন, মিসেস ম্যানিং প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের সকলেরই প্রায় এ সম্বন্ধে এক মত।

ভারতবর্ষের সভ্যতা কত কাল অব্যাহত, তাহার ইয়ত্তা হয় না। ভারতীয় সভ্যতার দীর্ঘ-জীবনের বিষয় চিন্তা করিলেও বিস্মিত হইতে হয়। উন্নতির উচ্চ-চূড়ায় আরোহণ

করিয়া, ভারতবর্ষ কত জাতির কতরূপ উত্থান-পতন দর্শন করিল ;—

ভারতীয় সভ্যতার
অবিচ্ছিন্নতা।

তাহার চক্কের সম্মুখে কত নূতন জাতির নূতন সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় ও

অবসান হইল ;—জলবুদ্বুদের ন্যায় কত জাতি কত সাম্রাজ্য উদ্ভূত হইয়াই

আবার কালসাগরে বিলীন হইল ; কিন্তু ভারতবর্ষের আৰ্য্য-হিন্দুজাতির কখনই ক্রমভঙ্গ হয় নাই ;—তাঁহাদের ধর্ম, সমাজ ও সভ্যতার মৌলিকত্ব চিরদিন অটুট রহিয়াছে। সেই প্রণব-ধ্বনি—আজিও আৰ্য্য-হিন্দুর প্রাণে প্রাণে প্রতিধ্বনিত ! সেই ব্রাহ্মণ-গর্ভ—আজিও এক প্রাস্ত হইতে অপর প্রাস্ত পর্য্যন্ত সর্বত্র পরিদৃষ্ট ! সেই সমাজ, সেই ধর্ম, সেই আচার-ব্যবহার, সেই রীতি-নীতি-পদ্ধতি—আজিও অবিচ্ছিন্নভাবে বিরাজমান ! সেই শাস্ত্র, সেই বেদবেদাঙ্গ, সেই মন্ত্রত্রিযাজ্ঞবল্ক্য, সেই পিছু-পরিচয়—সেই সবই রহিয়াছে ! এমন ক্রমপর্য্যায় বুঝি পৃথিবীর আর কোথাও নাই—কোন জাতিরই নাই ! দৃষ্টান্ত কি আর দিব ? প্রাচীন মিশর, মানিলাম, খৃষ্ট-জন্মের কয়েক সহস্র বৎসর পূর্বে সভ্য-সমুন্নত বলিয়া প্রতিষ্ঠা-লাভ করিয়াছিল ! কিন্তু অনন্ত কাল-সাগরে সে কয় দিন মাত্র ! এখন, কোথায় সেই জাতি ? —কোথায় তাহাদের সেই প্রাচীন ধর্ম ? —কোথায় তাহাদের সেই প্রাচীন ভাষা-সাহিত্য ? কয়েকটী মাত্র ‘পীরামিড’ প্রস্তরলিপি প্রভৃতি দেখিয়া এখন তাহাদের অস্তিত্ব নির্ণয় করিতে হইতেছে ! প্রাচীন রোম, খৃষ্টজন্মের সাড়ে সাত শত বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহারই বা এখন কি ক্রমপর্য্যায় বিঘ্নমান আছে ? খৃষ্টজন্মের পাঁচ শত বৎসর পূর্বে পুরাতত্ত্বে গ্রীস-দেশ উচ্চ-আসন লাভ করে। কিন্তু সেই গ্রীসেরই বা এখন সে পরিচয়-সম্বন্ধ কি আছে ? ফিনিসীয়, কার্ণেজীয়, বাইজেন্টাইন এবং মুর প্রভৃতি প্রাচীন জাতি ভূমধ্য-সাগরের উপকূল-ভাগে কয় দিন পূর্বে কি প্রভাবই বিস্তার করিয়া ছিল ! কিন্তু তাহাদেরই বা কি পরিচয়-চিহ্ন এখন খুঁজিয়া পাই ? এইরূপ পৃথিবীর যে জাতির ইতিবৃত্তই অনুসন্ধান করি না কেন, দেখিতে পাই, সকল জাতিরই ক্রম-পর্য্যায় ভঙ্গ হইয়াছে ;—কেবল ভারতীয় আৰ্য্য-হিন্দুগণ আজি পর্য্যন্ত আপনাদের পিতৃপুরুষের পরিচয়-চিহ্ন অব্যাহত রাখিয়া আসিয়াছেন। বিপ্লবের কত প্রবল প্রবাহ ভারতবর্ষের বক্ষের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে ; কত বৈদেশিক জাতির কত ভীষণ আক্রমণে ভারতবর্ষ কত সময় বিপর্য্যস্ত হইয়াছে,—তাহার পবিত্র দেবমন্দির কলুষিত, দেবদেবী চূর্ণীকৃত, শাস্ত্রগ্রন্থ ভস্মীভূত,—কত অত্যাচারই তাহার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে ; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, তথাপি হিন্দুজাতির ক্রমভঙ্গ হয় নাই। সৃষ্টির আদি-কালে যে ব্রাহ্মণ যে প্রণব-ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া আশ্ব-পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন, আজিও সেই ব্রাহ্মণ সেই প্রণব-মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াই আশ্ব-পরিচয় প্রদান করিতে সমর্থ রহিয়াছেন।

তুমি যখনই জিজ্ঞাসা করিবে,—“ব্রাহ্মণ ! তুমি কত দিনের ?” তাঁহার সেই একই উত্তর অনন্ত কাল হইতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে,—“যাবচ্চন্দ্রস্বর্য্য মহীতলে ।” এমন পরিচয়, পৃথিবীর কোনও জাতির নাই, থাকিতে পারে না, থাকাও সম্ভবপর নহে । সৃষ্টির আদিকাল হইতে যে ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব তেজোগর্বে বিরাজমান ছিলেন, আজিও সেই ব্রাহ্মণ সেইভাবেই আপন প্রতিষ্ঠা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন । পৃথিবীর অগাধ দেশের তুলনায়, ভারতবর্ষের ইহাই অলৌকিকত্ব ।

আর অলৌকিকত্ব—তাঁহার প্রাচীনত্ব । অজ জাতির কল্পনায়ও যাহা আসে না, ভারতবর্ষের প্রাচীনত্ব তত কালের । পৃথিবী-সৃষ্টির ইতিহাসে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের কল্পনা কয়েক সহস্র বৎসর মধ্যেই নিবদ্ধ আছে । বাইবেলোক্ত সৃষ্টি-প্রাচীনত্ব ভারতের শীর্ষস্থান ।

জিহ্বা প্রভৃতির মধ্যে মতানৈক্য দৃষ্ট হয়, কিন্তু তথাপি কেহই খৃষ্টজন্মের ছয় সাত সহস্র বৎসরের অধিক পূর্বে পৃথিবী-সৃষ্টির কল্পনা মনোমধ্যে স্থান দিতে পারেন নাই । হিব্রু-মতের অনুবর্তী হইয়া, আয়লণ্ডের পাদরী উষার খৃষ্ট-জন্মের ৪০০৪ বৎসর পূর্বে এই পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন । ইউরোপের অনেকেই এখনও পর্য্যন্ত উষারের সেই মতই প্রকৃষ্ট বলিয়া মান্য করেন । কোনও কোনও পাশ্চাত্য-পণ্ডিতের মতে—উষারের গণনা অবশ্য প্রমাদ-শূন্য নহে । তাঁহার বলেন,—“মিশর-দেশই পৃথিবীর সভ্যতার আদিকেন্দ্র । মিশর-দেশে প্রথম যে রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন, তিনি খৃষ্ট-জন্মের ৫৮৬৭ বৎসর পূর্বে বিद्यমান ছিলেন । সে রাজার নাম মেনেস । তিনি মেনেথো বা ‘টিনাইট খেবাইন’ নামক আদিবংশের প্রতিষ্ঠিতা । গিঞ্জে পীরামীডের প্রতিষ্ঠাতা মিশরের অগ্ৰতম প্রাচীন রাজা স্নফির রাজত্বকালের দুই সহস্র বৎসর পূর্বে মেনেস আবির্ভূত হইয়াছিলেন ।” মেনেসের রাজত্বকাল সম্বন্ধে আরও অবশ্য নানা মত প্রচলিত আছে ; বুথের মতে ৫৭০২ পূর্ব-খৃষ্টাব্দে, বুনসেনের মতে ৩৬৪৩ পূর্ব-খৃষ্টাব্দে, লেপসিয়সের মতে ৩৮৯২ পূর্ব-খৃষ্টাব্দে, হেনরীর মতে ৫৩০৫ পূর্ব-খৃষ্টাব্দে, সার্পের মতে ২০০০ পূর্ব-খৃষ্টাব্দে, নোলানের মতে ২৬৭৩ পূর্ব-খৃষ্টাব্দে, এবং পুলের মতে ২৭১৭ পূর্ব খৃষ্টাব্দে ; ইত্যাদি । * ফলতঃ, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতামত ভিত্তি-স্বরূপ গ্রহণ করিলে, খৃষ্ট-জন্মের ছয় সাত সহস্র বৎসরের অধিক কাল পূর্বে পৃথিবী-সৃষ্টির কল্পনা কখনই মনোমধ্যে স্থান দেওয়া যাইতে পারে না ;—পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ উহার অধিক পূর্বের কোনও কথাই উল্লেখ করিতে সমর্থ হন নাই । মিশরের পৌরাণিক তত্ত্ব আলোচনা করিলে, মেনেসের পূর্বে মিশর-দেশের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায় । সেই পুরাতত্ত্বে প্রকাশ,—“মেনেস, মিশরের আদি-রাজা বটে ; কিন্তু তাঁহার পূর্বে চারি হাজার বৎসর কাল ‘সেমি-গড্’ বা উপদেবতাগণ এবং তৎপূর্বে বিশ্বকর্মা, স্বর্য্য, শনি, বায়ু, রাহু, কেতু প্রভৃতি দেবতাগণ তথায় রাজত্ব করিতেন । দেবতাদেবতার ১৩ হাজার ৯০০ শত বৎসর রাজত্বের

* জেম্‌স্‌ উষারের (James Usher) “Annals of the Old and New Testament”, “Chamber's Encyclopaedia”, এবং “Theogony of the Hindus” প্রভৃতি গ্রন্থে ব্রূত ।

শর, উপদেবতাগণ রাজ্যলাভ করেন।” * এই পৌরাণিক সিদ্ধান্ত মান্য করিয়া লইলেও, কোনক্রমেই খৃষ্ট-জন্মের চতুর্বিংশতি সহস্র বৎসর পূর্বের কল্পনা মনোমধ্যে জাগিতে পারে না। কিন্তু ভারতবর্ষের সভ্যতা, ভারতবর্ষের গৌরব-গরিমা, ভারতবর্ষের অতীত-স্মৃতি—কত অনন্তকালের সহিত বিজড়িত রহিয়াছে, তাহা স্মরণ করিলেও চমকিত হইতে হয়। যেদিন হইতে ভারতবর্ষের অধঃপতনের সূত্রপাত হয়,—কুরুক্ষেত্রের রণক্ষেত্রে পাণ্ডব-কৌরবের ঘোর-সমরে ভারতের গৌরব-রবি যেদিন অন্তমিত হন,—সেও আজ কত কালের কথা! বর্তমান বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগের অন্তর্গত যে কলিযুগ, সেই কলিযুগেরই এখন ৫০১০ বৎসর অতীত-প্রায়। * কুরুক্ষেত্র সময় যদি উক্ত চতুর্যুগান্তর্গত ত্রেতা ও কলির সন্ধিহলে সংঘটিত হইয়া থাকে, তাহা হইলেও, হিন্দুগৌরবের অবসানের দিন আসিয়াছে,—সেও প্রায় পাঁচ সহস্রাব্দিক বৎসর অতীত হইতে চলিল। সূতরাং হিন্দু-জাতির সভ্যতা যে তাহারও কত পূর্বের,—সহজেই প্রতীত হয় না কি? কাল—অনন্ত; সংসার—অনন্তকাল। গণনাঙ্কের গণী-বন্ধনে, কে বল, অনন্তকে আয়ত্ত করিতে পারে? পৃথিবীর অত্র জাতি সেই অনন্ত কাল-প্রবাহকে সীমাবদ্ধ করিতে প্রয়াসী হইলেও, আর্য্য-হিন্দুগণের প্রস্তুত মস্তিষ্ক কিন্তু তাহার স্বরূপ-ভঙ্গই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কাল অনাদি, সৃষ্টি অনাদি, ব্রহ্মাণ্ড অনাদি, প্রাণিপথ্য্যর অনাদি, সৃষ্টিকর্তা অনাদি,—আর্য্য-হিন্দু ব্যতীত কে তাহা নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন? অনাদি ঈশ্বর, অনাদি কাল, ওতঃপ্রোতঃ বিরাজমান আছেন,—ইহসংসার তাঁহারই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা অভিব্যক্তি মাত্র,—এ নিগূঢ় তত্ত্ব যাঁহারা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা কখনই, যুগমদামুসন্ধিস্থ বিজ্ঞান যুগের ঞ্চয়, পৃথিবীর জন্মদিন অমুসন্ধানের জন্ত ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ান নাই। তাঁহারা বুঝিতেন,—পৃথিবী অনন্তকাল বিরাজমান আছে, পৃথিবী অনন্তকাল বিরাজমান থাকিবে; মহাশাগরে জলবুবুদের ঞ্চয় সৃষ্ট-সামগ্রী—প্রাণিপথ্য্য—তাহাতেই উৎপন্ন হইয়া তাহাতেই বিলীন হইবে। বলা বাহুল্য, সেই অনন্তত্ব ধারণার দৃঢ়-ভিত্তির উপরই পরবর্ত্তিকালে শাস্ত্রে ও পুরাণেতিহাসে যুগযুগান্তরাদির একটা সীমা-পরিমাপ নির্দিষ্ট হইয়া আছে। কিন্তু সে সীমা-পরিমাপও অধুনাতন মনুষ্যের ধারণা-শক্তির অতীত

* পাক্ষাত্য জাতিদিগের ভাষায় বিশ্ব দেশের সেই দেবগণের নাম এইরূপ লিখিত হইয়াছে,—Vulcan or Ptah, Helios the Sun or Ra, Saturn or Seb ইত্যাদি।

* প্রত্যেক শুভ অনুষ্ঠানে এবং তীর্থকৃত্যের সময় হিন্দুমাত্রকেই একটা সঙ্কল্প-মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়। সে সঙ্কল্প-মন্ত্র এই,—“ও তৎসৎ জীৱন্মণো দ্বিতীয়প্রহরার্ধে বৈবস্বতে মন্বন্তরে অষ্টাবিংশতিতমেন কলিযুগে কলিপ্রথমচরণে আর্য্যাবর্ত্তান্তরৈকদেশে অমুক-নগরে অমুক-সংবৎসরায়ণর্গ্ধ্বাসপঞ্চদিননক্ষত্রমূর্ত্তেহজ্জেনং কার্য্যং কৃতং ক্রিয়তে বা।” বলা বাহুল্য, কালভেদে, দেশভেদে, মাসভেদে, ঋতুভেদে এই মন্ত্রের বিশেষ বিশেষ শব্দের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। বাহা হউক, এই মন্ত্রানুসারে বুঝিতে পারা যায়,—এখন বৈবস্বত মন্বন্তরের অন্তর্গত অষ্টাবিংশতি কলিযুগ চলিতেছে। অর্থাৎ, পূর্ববর্ত্তী ছয় মন্বন্তরের (১১×৬) ৬৬ চতুর্যুগ এবং বর্ত্তমান মন্বন্তরের সপ্তবিংশ চতুর্যুগ অতীত হইয়া অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগেরও সত্য-ত্রেতা-ধারণান্তে কলিযুগের ৫০১০ বৎসর চলিয়া গিয়াছে।

বলিলেও অস্বীকার হয় না। যেহেতু, তদ্বারাও প্রতিপন্ন হয়—ভারতবর্ষের সভ্যতা অন্যান্য এক শত সাতানব্বই কোটি বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। *

সত্য-জ্ঞেতা-দ্বাপর—অতি-দূর অতীতের কথা—বিশ্বতির অঙ্কতম গর্ভে নিমজ্জিত রাখিয়াও যদি কেহ নিরপেক্ষভাবে ভারতবর্ষের প্রাচীনত্ব-বিষয়ে পর্য্যালোচনা করেন, কি পাশ্চাত্য, কি প্রাচ্য,—যিনিই হউন না কেন, তিনিই বা কি সিদ্ধান্তে উপনীত হন? এতৎপ্রসঙ্গেও কয়েক জন পাশ্চাত্য-পণ্ডিতের গবেষণার ফল প্রদর্শন করিতেছি। জর্জবীর প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ পরিব্রাজক কাউন্ট জোর্জস্-জারগা—পাশ্চাত্য-জগতে বাহ্যর পাণ্ডিত্য-খ্যাতির অবধি নাই—তিনি পুনঃপুনঃ বৃত্তকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন,—“ভারতবর্ষের ধর্ম ও সভ্যতার প্রাচীনত্ব

* এই বিষয় একটু বিশদভাবে বুঝিবার আবশ্যক হইলে, জানিতে হয়—শাস্ত্রে পৃথিবীর ‘কারণ’ ও ‘লয়’ দুই অবস্থার বিষয় কথিত আছে। সেই দুই অবস্থারই নামান্তর ‘ব্রহ্মদিন’ ও ‘ব্রহ্মরাত্রি’। সহস্র চতুষ্পুংগে (দিব্যযুগে) একটি ব্রহ্মদিন হয়; এবং সেই ব্রহ্মদিনের পরিমাণ—৪০২ কোটি বৎসর। যথা,—

“শতং তেহ ব্রুতং হায়নাস্তে যুগে জিগি চত্বারি কৃমাঃ।”—অথর্ববৈদ।

ব্রহ্মদিন আবার চতুর্দশ মন্বন্তরে এবং এক এক একটি মন্বন্তর আবার একসপ্ততি চতুষ্পুংগে বিভক্ত। যথা,—

“যুগানাং সপ্ততি সৈকা মন্বন্তরমিহোচ্যতে।”—স্বর্ঘ্যসিদ্ধান্ত।

“ষৎপ্রাগ্ দ্বাদশ সহস্রমুদিতং দৈবকং যুগং।

তদেক সপ্ততি গুণং মন্বন্তরমিহোচ্যতে ॥”—মহু।

এক্ষণে বৈবস্বত মন্বন্তর অর্থাৎ সপ্তম মন্বন্তর চলিতেছে। পূর্বে বলা হইয়াছে—১১ চতুষ্পুংগে একটি মন্বন্তর হয়। এক একটি চতুষ্পুংগে ১২ সহস্র দিব্যবর্ষ বা ৪০ লক্ষ ২০ সহস্র সাধারণ বর্ষ। দিব্যবর্ষের পরিমাণ-সম্বন্ধে ‘স্বর্ঘ্যসিদ্ধান্তের’ পগনা এই,—

“তদ্বাদশ সহস্রাণি চতুষ্পুংগমুদাহৃত।

স্বর্ঘ্যাসংখ্যায়া দ্বিপ্রিসাগরৈরনুতাহতৈঃ ॥

সক্ষ্যা লক্ষ্যাংশসহিতং বিজ্ঞেয়ং তচ্চতুষ্পুংগং।

যুগঞ্চ দশমো ভাগশ্চতুর্বিধ্যেক সংগুণঃ।

ক্রমাৎ কৃতযুগাদিনাং ষষ্ঠাংশঃ সক্ষ্যায়োঃ স্বকঃ ॥”

ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, সত্যযুগে ৪৮০০, ত্রেতাযুগে ৩৬০০, দ্বাপরযুগে ২৪০০ এবং কলিযুগে ১২০০ দিব্যবর্ষ আছে। মনু বলেন,—৩৬০ সাধারণ বৎসরে এক দিব্যবর্ষ হয়। সে হিসাবে সত্যযুগে ৪৮০০ দিব্যবর্ষ বা ১৭ লক্ষ ২৮ হাজার সাধারণ বর্ষ, ত্রেতাযুগে ৩৬০০ দিব্যবর্ষ বা ১২ লক্ষ ৯৬ হাজার সাধারণ বর্ষ, দ্বাপরযুগে ২৪০০ দিব্যবর্ষ বা ৮ লক্ষ ৬৪ হাজার সাধারণ বর্ষ এবং কলিযুগে ১২০০ দিব্যবর্ষ বা ৪ লক্ষ ৩২ হাজার সাধারণ বর্ষ আছে। তাহা হইলেই বুঝা যায়, এক একটি মন্বন্তরে ৪০,২০,০০০ × ৭১ = ৩০,৬৭,২০,০০০ বৎসর। পূর্বে বলা হইয়াছে, এক্ষণে সপ্তম মন্বন্তর চলিতেছে। সে হিসাবে, ছয় মন্বন্তরের ১,৮৪,০৩,২০,০০০ বৎসর এবং বর্তমান মন্বন্তরের সপ্তবিংশতি চতুষ্পুংগ (৪০,২০,০০০ × ২৭ = ১১,৬৬,৪০,০০০ বৎসর) ও অষ্টবিংশতি চতুষ্পুংগের অতীত-কাল (৩৮,৯০,০১০ বৎসর) অতীত হইয়া গিয়াছে; অর্থাৎ, সর্বসাকুল্যে ১১৬ কোটি ৮ লক্ষ ৫৩ হাজার বৎসর কাল অতীত হইয়াও এখনও একটি ব্রহ্মদিন পূর্ণ হয় নাই। তবেই বুঝুন, পৃথিবী-স্থষ্টির ইতিহাস কোন অনন্ত কাল-সাগরে ভাসমান রহিয়াছে! ইহাতেই প্রতিপন্ন হয় না কি,—পাশ্চাত্য-কল্পনায় পৃথিবী-স্থষ্টির কত পূর্বে ভারতবর্ষের সভ্যতালোকে কি দিব্যজ্যোতি প্রকাশ পাইয়াছিল!

ধৃষিবীর কোনও জাতিই সমকক্ষতা-লাভে সমর্থ নহে।” * আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ‘ইয়েল কলেজের’ প্রেসিডেন্ট ষ্টাইলস্, হিন্দুদিগের রচনাবলীর প্রাচীনত্বের বিষয় আলোচনা করিয়া, বিশ্ব-বিহ্বল হইয়া, সার উইলিয়ম জোন্সকে অমুরোধ করিয়াছিলেন,—“আদমের ইতিহাস-মূলক আদি-পুস্তকও বোধ হয়, হিন্দুদিগের নিকট অমুসন্ধান করিলে পাওয়া যাইতে পারে।”† খৃষ্টীয় দশ-প্রহের মতে ঈশ্বর মনুজ-সৃষ্টির প্রারম্ভেই আদম ও ইভকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কিন্তু ডাক্তার ষ্টাইলস্, সেই আদম ও ইভের বৃত্তান্ত-কথা হিন্দু-জাতির নিকট সন্ধান লইবার জন্ত অমুরোধ করিতেছেন। তবেই বুঝুন, ভারতীয় হিন্দু-জাতির প্রাচীনত্ব-বিষয়ে তাঁহার মনে কি ধারণাই না উদ্ভিত হইয়াছিল! হিন্দুজাতির যুগ-চতুষ্টির বিষয় আলোচনা করিতে করিতে, সসম্মানে মস্তক অবনত করিয়া, মিঃ হাল্‌বেড বলিয়াছেন,—“সে তুলনায় বাইবেলের সৃষ্টি-তত্ত্বকে কলাকার ঘটনা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।”‡ প্রসিদ্ধ ফরাসী-জ্যোতির্বিদ মুসে-বেলির মতে—“খৃষ্ট-জন্মের তিন সহস্র বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষ জ্যামিতি ও জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা-লাভ করিয়াছিল।” § একটা জাতি কতদূর উন্নত হইলে, এতাদৃশ বিজ্ঞান পারদর্শী হইতে পারে,—তাহা স্মরণ করিয়াও, হিন্দু জাতির প্রাচীনত্ব-বিষয়ে অধুনা বহু পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মস্তক বিবুর্ণিত হইতেছে। ‘রাজতরঙ্গিনী’র অনুবাদক আবুল ফজল ইতিহাসোল্লিখিত কাশ্মীরের রাজগণের রাজত্ব-কালের পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া দেখিয়াছেন, তদ্রূপ রাজবংশাবলী ৪১০২ বৎসর ১১ মাস ২ দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিবার পদ্ধতি, অনেকাংশে আধুনিক বলিলেও বলা যাইতে পারে। সুতরাং ধারাবাহিক এই ইতিহাস লিখিবার কত পূর্বে এ দেশে সভ্যতা-প্রতিষ্ঠা স্থাপিত হইয়াছিল—সহজেই অনুমান করা যায়। || অধ্যাপক হীরেন বলেন,—“গ্রীকরাজদূত মেগাস্থিনীস যখন চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় আগমন করেন, তখন তিনি প্রমাণ পাইয়াছিলেন, চন্দ্রগুপ্তের পূর্ববর্তী রাজগণ ৬০৪২ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।” মেগাস্থিনীস ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন—খৃষ্ট-জন্মের ৩১৭ বৎসর পূর্বে। সুতরাং খৃষ্ট-জন্মের প্রায় সাড়ে ছয় হাজার বৎসর পূর্ববর্তী রাজগণের পরিচয়,

* “No nation on earth can vie with the Hindus in respect of the antiquity of their civilization and the antiquity of their religion.”— *Theogony of the Hindus*.

† Ward's Mythology mentioned in the *Hindu Superiority*.

‡ “To such antiquity the Mosaic creation is but as yesterday.”

§ M. Bailly's History of Astronomy—*Histoire de l'Astronomie Ancienne*. ফরাসীরা ৫তম শতাব্দীর রাজত্বকালে, ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে, আশ্বিনে জ্যৈষ্ঠ-প্রেরণে এবং ভারতবর্ষের কণাট প্রদেশের জ্যোতির্বিদ ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে গণনাক্ষের যে পদ্ধতি সংগ্রহ করা হইয়াছিল, তাহা আলোচনা করিয়া বেলি বুঝিতে পারেন, ব্রাহ্মণ জ্যোতির্বিদগণ ৪৬৮০ বৎসরের যে গণনা নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত। বলা বাহুল্য, সেই ব্যাপার দর্শনেই ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব-সম্বন্ধে বেলির মনে দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছিল।

|| বর্তমান কালে যে প্রণালীতে ইতিহাস লিখিত হয়, প্রাচীন ভারতের ইতিবৃত্তে সে প্রণালী অবলম্বিত হয় নাই—ইহা নিঃসন্দেহ। তবে উচ্চ সভ্যতার পরিচয়-চিহ্ন যে ইতিহাস, ভারতীয় সাহিত্যে সে ইতিহাস বহুকাল হইতেই লিপিবদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। যথাস্থানে সে প্রসঙ্গ উত্থাপনে প্রয়াস পাইব

ঐহার বর্ণনাতেই পাওয়া যায়। তিনি বিদেশী; অল্লদিন মাত্র এদেশে অবস্থান করিয়াছিলেন; সুতরাং এদেশের পুথানুপুথ পূর্বরুত্তান্ত সংগ্রহ করা তাঁহার পক্ষে কদাচ সম্ভবপর নহে। চন্দ্রগুপ্তের রাজ-দরবার হইতে মোটামুটি তৎকালের যে পরিচয় পাইয়াছিলেন, তাহাই তিনি সংগ্রহ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। অধ্যাপক ম্যাক্স ডঙ্কার বলেন,—“স্পেতাশ্বস বা ডাইও-নিসাস ৬৭১৭ পূর্ব-খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।” * এক্ষণে দেখা যাউক, এই ‘স্পেতাশ্বস’ বা ‘ডাইওনিসাস’ কে ছিলেন! ইহারা দুই ব্যক্তি, কি একই ব্যক্তি দুই নামে পরিচিত হইয়াছেন? অধ্যাপক হীরেন বলেন,—“ডাইওনিসাস হইতে সাল্লোকোটাস (চন্দ্রগুপ্ত) রাজ্যের রাজত্ব-কালের ব্যবধান—৬০৪২ বৎসর।” আবার মেগাস্থেনীস বলেন,—“স্পেতাশ্বস হইতে সাল্লোকোটাস রাজ্যের রাজত্বকালের ব্যবধান—৬০৪২ বৎসর।” অধ্যাপক ম্যাক্স ডঙ্কার এবং কাউন্ট জোর্জস্-জারুণা প্রভৃতির মতেও ঐ দুই রাজ্যের মধ্যে ঐরূপ কাল-ব্যবধান দেয়া যায়। ‘স্পেতাশ্বস’ বা ‘ডাইওনিসাস’ যে একই ব্যক্তি ছিলেন,—ইহাতে তাহাই প্রতিপন্ন হয়। যদি তাহাই হয়, ঐ ‘স্পেতাশ্বস’ বা ‘ডাইওনিসাস’ কে ছিলেন? সংস্কৃত ‘পীতাম্বর’ এবং ‘দীনেশ’ বা ‘দানবেশ’—ঐ দুই শব্দের রূপান্তরে পাশ্চাত্য-ভাষায় ঐ ‘স্পেতাশ্বস’ এবং ‘ডাইওনিসাস’ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। ‘চন্দ্রগুপ্ত’ নাম যখন ‘সাল্লোকোটাস’ হইতে পারেন, তখন পীতাম্বর এবং দীনেশ (দানবেশ) যথাক্রমে স্পেতাশ্বস বা ডাইওনিসাস হওয়া অসম্ভব নহে। বিশেষতঃ, ইংরেজি গ্রন্থেই আমরা দেখিতে পাই,—পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ বসরামকে ‘বেলুস’ এবং শ্রীকৃষ্ণকে ‘ডাইওনিসাস’ বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। * ইহাই অনেকে যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করেন। বিশেষতঃ, কলিযুগের কাল-পরিমাণ হিসাব করিলেও দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণ ঐ সময়েই বিচরমান ছিলেন। ফলতঃ, ‘স্পেতাশ্বস’ এবং ‘ডাইওনিসাস’ যে শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝাইত, তাঁহার পীতাম্বর ও দানবেশ নাম পাশ্চাত্য-জাতির উচ্চারণে বিকৃত হইয়াই যে ঐ আকার ধারণ করিয়া আছে, তাহাতে কোনই সংশয় থাকিতে পারে না। অধ্যাপক ম্যাক্স ডঙ্কার যুধিষ্ঠিরের কাল-নির্ণয় প্রসঙ্গে বলেন,—“বিক্রমাদিত্যের রাজত্বের ৩০৪৪ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ প্রায় ৩১০০ পূর্ব-খৃষ্টাব্দে যুধিষ্ঠির বিরাজমান ছিলেন।” যদিও এ সকল সিদ্ধান্ত প্রমাদ-শূন্য নহে, তথাপি কেহই যে ভারতের প্রাচীনত্ব-বিষয়ে দ্বিধা করিতে পারেন নাই,—তাহা দেখাইবার জন্যই এতৎপ্রসঙ্গের অবতারণা করিলাম। ‘দেবীস্থান’-গ্রন্থে প্রমাণ পাওয়া যায়,—“প্রায় আট সহস্র বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষে সভ্যতার উজ্জ্বল আলোক বিকীরণ হইয়াছিল।” কত দেখাইব? ভারতের প্রাচীনত্ব—সে যে স্বতঃসিদ্ধ!—সে কি আর প্রমাণ করিবার প্রয়োজন হয়? আর তাই বলিতেছিলাম,—পৃথিবীর ইতিহাসে ভারতবর্ষ কি গৌরবান্বিত অধিকার করিয়াই আছে!

* Max Dunker's *History of Antiquity*. Vol. IV.

† Historical Researches. Vol. II.

‡ মিঃ গ্রোস্ (Mr. Growse) মথুরা-জেলার বিবরণী-গ্রন্থে এই কথাই লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধান্তে প্রতিপন্ন হয়,—বসরাম ‘বেলুস’ (Belus) এবং শ্রীকৃষ্ণ ‘ডাইওনিসাস’ (Dionysius) নাম গ্রহণ করিয়া আছেন।—Mr. Growse's *Memoirs of Mathura District*.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

আর্য্য-জাতি ।

[আর্য্য-জাতিই পৃথিবীর আদি সভ্য-জাতি,—সকল সভ্য-জাতিই তাঁহাদের বংশসমুদ্ভূত বলিয়া পরিচয় দেওয়া তাঁহাদের আদিমত্ব ;—আর্য্যগণের আদি-বাস-সম্বন্ধে ভ্রম-ধারণা,—তিনটী প্রধান মত ও তাহার কারণ-পরস্পরা,—মধ্য-এসিয়া, উত্তর-মেরু ও জর্জী প্রভৃতিতে আদি-বাসের প্রমাণ ;—মত-পরস্পরার অযৌক্তিকতা,—ভাষা, বংশ প্রভৃতির নিদর্শনে ভারতেই তাঁহাদের আদি-বাস নির্দিষ্ট,—আধুনিক পাশ্চাত্য-জাতিগণের দৃষ্টান্ত ;—আর্য্য-হিন্দুগণের পৃথিবীর সর্বত্র গতিবিধি,—প্রিয়ব্রত কর্তৃক পৃথিবী সপ্তদ্বা বিভক্ত,—কালভেদে দেশাদির নাম-পরিবর্তন,—আমেরিকা, আফ্রিকা, ইউরোপ প্রভৃতিতে আধিপত্য ;—আর্য্য-গণের উত্তর-মেরু প্রভৃতির অভিজ্ঞতাই তত্তৎপ্রদেশে আদিবাসের পরিচায়ক নহে ;—আর্য্যগণের স্থান-নির্দেশ,—শাস্ত্রের ও ঐতিহাসিকগণের মতালোচনা ;—আর্য্য ও অনার্য্য ।]

ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠা যেকোন অনন্ত কালের, ভারতে আর্য্য-জাতির প্রতিষ্ঠাও সেইরূপ অনন্তকালব্যাপী। ভারতবর্ষই আর্য্য-জাতির উদ্ভব-ক্ষেত্র, ভারতবর্ষই তাহার ভারতেই উন্নতি-পরিপুষ্ট, আর ভারতবর্ষ হইতেই তাহার প্রভাব-প্রতিপত্তি আর্য্য-জাতির জগৎ-পরিব্যাপ্ত। ভারতীয় আর্য্য-হিন্দুগণ সকল বিষয়েই শ্রেষ্ঠ লাভ করিয়াছিলেন। বর্তমান বিংশ শতাব্দী—মানব-জাতির উন্নতির সুবর্ণ-যুগ বলিয়া অভিহিত হয় ; কিন্তু আর্য্য-হিন্দুগণের উন্নতির তুলনায়, সে উন্নতি এখনও অপূর্ণ অপরিপুষ্ট বলিলেও অতুক্তি হয় না। অধুনা পৃথিবীতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের তাদৃশ সৃষ্টি কিছুই হয় নাই,—যাহা আর্য্য-হিন্দুগণের জ্ঞান-বুদ্ধির অপোচর ছিল। জড়-জগতে প্রতিষ্ঠা-লাভই অধুনা মানব-জাতির লক্ষ্যস্থান ; কিন্তু আর্য্য-হিন্দুগণ বাস্তব সং-সামগ্রীর অধিকারী ছিলেন ;—তাই তাঁহারা কি বহির্জগৎ কি অন্তর্জগৎ সর্বত্র আপনাদের আধিপত্য-বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিলেন। জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, দর্শনে, সাহিত্যে, গণিতে, কাব্যে, অলঙ্কারে, শৌর্য্যে, বীর্য্যে—সর্ব বিষয়েই তাঁহাদের এতাদৃশ খ্যাতি-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা ছিল যে, আজি পর্য্যন্ত পৃথিবীর সভ্যজাতি মাঝেই সেই আর্য্যগণের বংশ-সমুদ্ভূত বা তাঁহাদের সহিত কোনও-না-কোনও প্রকারে সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া পরিচয় দিতে গৌরব বোধ করিয়া থাকেন। সভ্যজাতিমাত্রের এতাদৃশ আশ্রয়-পরিচয় দান,—আর্য্য-জাতির মৌলিকত্বেরই নিদর্শন নহে কি ?

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, আর্য্যদিগের আদি-তত্ত্বে এখনও অনেকের ভ্রম-ধারণা দূরীভূত নহে। অধিক বলিব কি, এ পর্য্যন্ত আর্য্য-জাতি-সম্বন্ধে বিনিই আলোচনা করিয়াছেন,

তিনিই আর্য্য-জাতিকে কোনও এক অভিনব দেশের অভিনব আগন্তুক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। এতদ্বিষয়ে প্রধানতঃ তিনটী মত দৃষ্ট

আদি-তত্ত্বে
বিভিন্ন মত ।

হয়। অধিকাংশ প্রত্নতত্ত্বাসক্তিসম্পন্ন ঐতিহাসিকের সিদ্ধান্ত,—আর্য্যগণ প্রাথমিক মধ্য-এসিয়ার এক অজ্ঞাত-প্রদেশে বসবাস করিতেন, এবং সেই অজ্ঞাত-প্রদেশ

হইতে ক্রমশঃ পশ্চিমে, উত্তরে, পূর্বে—নানা দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মতে,—কাস্পীয়ান-সাগরের উপকূলস্থিত এক ভূ-খণ্ড হইতে আর্য্য-জাতি ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশে হিমালয়ের পাদপ্রান্তে আসিয়া প্রথমে উপনিবেশ স্থাপন করেন, এবং সেখান হইতেই ক্রমশঃ উত্তর-ভারতের অন্ত্যান্ত প্রদেশে তাঁহাদের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়া পড়ে।* মধ্য-এসিয়া হইতে আর্য্যদিগের ভারত-আগমন সম্বন্ধে প্রত্নতত্ত্ববিদগণ কয়েকটা হেতুবাদ প্রদর্শন করেন। প্রথমতঃ, তাঁহারা বলেন,—‘আর্য্য-গণের আদিগ্রন্থ ঋগ্বেদ-সংহিতায় যে সকল নদ-নদী ও নগর-গ্রামের উল্লেখ আছে, তাহাদের কয়েকটির অবস্থান-স্থান মধ্য-এসিয়ার নির্দিষ্ট হইতে পারে।’† দ্বিতীয়তঃ, তাঁহারা বলেন,—‘আর্য্যগণ সুন্দর শ্বেতবর্ণের পুরুষ বলিয়া শাস্ত্রাদিতে বর্ণিত আছেন, এবং তাঁহাদের প্রতিযোগিগণ রুক্ষবর্ণ দৈত্য বা অসুর বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। মধ্য-এসিয়া শ্বেতবর্ণ মনুষ্যের উৎপত্তি-স্থান এবং ভারতবর্ষের অধিবাসীরা প্রায়শঃই রুক্ষবর্ণ;—সুতরাং এতদ্বারাও আর্য্য-হিন্দুগণের মধ্য-এসিয়ার বাস প্রতিপন্ন হয়।’ তৃতীয়তঃ, তাঁহারা বলেন,—‘আর্য্যগণের উপাশ্র দেবদেবীর নামের সহিত এবং ভাষার অনেক শব্দের সহিত প্রাচীন মহাদেশের অনেক প্রাচীন জাতির ভাষার ও উপাশ্র দেবতার নামের অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। মধ্য-এসিয়ার একই কেন্দ্রস্থল হইতে ভিন্ন ভিন্ন দেশে গমন করিয়া তত্তৎপ্রদেশে বসবাস করার—ইহাও এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ বলিতে হয়।’‡ অপর এক শ্রেণীর প্রত্নতত্ত্ববিদগণ

* অধুনা-প্রচলিত প্রায় সকল ইতিহাসেই এই মত দৃষ্ট হয়। যে কোনও বিদ্যালয়-পাঠ্য ইংরেজি বা কান্টালা ইতিহাস বা অভিধান দৃষ্টি করিলেই এই মত দেখিতে পাওয়া যাইবে।

† ঋগ্বেদ-সংহিতায় এসকলক্রমে ‘য়কু’, ‘অজ’, ‘আজীক’, ‘গজার’, ‘রুশম’, ‘শারদী’, ‘শিগ্র’, ‘কীকট’ প্রভৃতি কয়েকটা দেশের, এবং ‘আজীকীয়া’, ‘সীতা’ বা ‘সীরা’, ‘সুবাস্ত’, ‘কুভা’, ‘যবাবতী’, ‘শ্বেতাবতী’ প্রভৃতি কয়েকটা নদীর নাম দৃষ্ট হয়। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ উহার মধ্যে ‘য়কু’ দেশকে ‘ওক্সুস’ (Oxus) বা ‘অক্সাস’-নদীর তীরবর্তী দেশ বলিয়া নির্দেশ করেন। ‘সীতা’ বা ‘সীরা’ নদীর বর্তমান নাম; তাঁহাদের মতে, ‘জাকার্তেস’ (Jaxartes) বা ‘জাগজার্তেস’। ‘সুবাস্ত’কে তাঁহারা ‘দোয়াভ’ বা ‘স্বাভ’-প্রদেশ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। ‘গজার’—বর্তমান কান্দাহার-দেশ; ‘কুভা’—‘কোকেশ’-নামক নদী,—কান্দাহারের উত্তর-পশ্চিমে সু-অস্তিন দেশে প্রবাহিত ছিল বলিয়া নির্দিষ্ট হয়। অন্ত্যান্ত নদনদী এবং নগরেরও এইরূপ নানা পরিচয় তাঁহারা নির্দেশ করিয়া থাকেন।

‡ বেদোক্ত ‘বায়ু’, ‘সোম’, ‘যম’, ‘মিত্র’, ‘অসুর’ প্রভৃতি শব্দ পারসীকগণের ‘জেনক-আভেস্তা’-গ্রন্থে যথাক্রমে ‘বয়ু’, ‘হোম’, ‘যিম’, ‘মিথ্র’, ‘অহুর’ প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়াছে। এইরূপ, বেদোক্ত ‘অন্ধিবান’, ‘অরুবা’, ‘গজার’, ‘অহনা’ প্রভৃতি শব্দ গ্রীকদের গ্রন্থে যথাক্রমে ‘ইলিওন’, ‘ইরুস’, ‘কেটোরস’, ‘ডাকনি’ প্রভৃতি নামে উল্লিখিত হইয়াছে। বেদোক্ত ঐ সকল শব্দের সহিত পারসীক ও গ্রীক শব্দ-সমূহের অর্থগত সাদৃশ্যও যথেষ্ট আছে। ভাষার ঐক্য-সম্বন্ধেও দেখা যায়,—সংস্কৃতের ‘শিভু’—পারসীকের ‘গেভার’; লাতিনের ‘পেটার’, সংস্কৃতের ‘দ্বি’—পারসীকের ‘দো’, লাতিনের ‘দ্রয়ো’, সংস্কৃতের ‘যুগ’—পারসীকের ‘যুখ’, লাতিনের ‘যুগাম’,—ইত্যাদিতে উচ্চারণগত ও অর্থগত সাদৃশ্য কতই বিদ্যমান আছে। এইরূপ আরও দেখা যায়,—সংস্কৃত ‘অগ্নি’, লিথুনিয়ান ভাষার ‘এগ্নি’, জেনক-ভাষার ‘অগ্নি’, প্রাচীন গ্রীকভাষিক ভাষার ‘জেনি’, লাতিন ভাষার ‘সাব’ প্রভৃতিতেও কতই সাদৃশ্য! সংস্কৃতের ‘অতি’, লিথুনিয়ানের ‘এতি’, জেনক-ভাষিক ‘অতি’, প্রাচীন গ্রীকভাষিকের ‘যেস্তে’, লাতিনের ‘য়েস্ত’—সাদৃশ্য আরও কতই দেখিতে পাওয়া যায়।

সন্ধিৎসুগণের অভিমত,—আর্য্যগণ উত্তর মেরু হইতে ক্রমশঃ দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইয়া, পরিশেষে ভারতে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহাদের এতাদৃশ সিদ্ধান্তের তেজু-বাদ,—‘বেদে দীর্ঘকালব্যাপী রাত্রি ও তদনুরূপ দিবাতাগের উক্তি আছে ; শৈত্যাধিক্যের বর্ণনা আছে ; অপিচ, জ্যোতির্গণনা-ক্রমেও উত্তর-মেরু বাসযোগ্য ছিল বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে।* তথায় একাদিক্রমে ছয় মাস রাত্রি ও ছয় মাস দিন, তথায় সূর্য্য দক্ষিণ দিকে উদয় হন, তথায় নক্ষত্রগণের উদয়ান্ত নাই,—বেদের কোনও কোনও মন্ত্রের সহিত এই অবস্থার সাদৃশ্য আছে। অপিচ, শাস্ত্রাদিতে যে ব্রহ্মরাত্রি ও ব্রহ্মদিনের পরিমাণ সাধারণ বর্ষের এক বর্ষ বলিয়া দেখা যায়, উত্তর-মেরু-প্রদেশের ছয় মাস রাত্রি এবং ছয় মাস দিনই সেই ব্রহ্মরাত্রি ও ব্রহ্মদিন হওয়া সম্ভবপর।’ আর্য্যগণের উত্তর-মেরু পরিত্যাগের একটা কারণও তাঁহারা নির্দেশ করেন। ‘জৈমদ্র আভেস্তা’ গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে,—“আর্য্যদিগের স্বর্ণ বা ‘এরিয়ানা ভেইজো’ উত্তর-মেরু-প্রদেশেই অবস্থিত ছিল ; সেখানে বৎসরে একবার মাত্র সূর্য্যোদয় হইত। পরিশেষে বরফ ও হিমশিলায় সেই প্রদেশ উৎসন্নপ্রাপ্ত হওয়ায়, অসহ্য শৈত্যাধিক্য-নিবন্ধন, আর্য্যগণ সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে গমন করেন।” বলা বাহুল্য, আর্য্যগণের উত্তর-মেরু-বাস-সিদ্ধান্তের পরিপোষকগণ, আর্য্যগণের উত্তর-মেরু পরিত্যাগ-সম্বন্ধে ‘জৈমদ্র আভেস্তার’ এই উক্তিরই প্রতিধ্বনি করিয়া থাকেন। তৃতীয় আর এক পক্ষ বলেন,—‘জর্মনীর অন্তর্গত পোলণ্ড-প্রদেশে (কাহারও মতে স্বাভেনেভিয়ায়) আর্য্যদিগের আদি-বাসস্থান ছিল। ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় সংস্কৃতাদির সহিত জর্মন-ভাষার সাদৃশ্যঃসুভব করিয়াই তাঁহারা এই মত পোষণ করিয়া থাকেন। ফলতঃ, আর্য্যগণ যে কোনও এক অভিনব দেশ হইতে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা প্রমাণের জন্তই এ পর্য্যন্ত বহু পণ্ডিতের মস্তিষ্ক আলোড়িত হইয়াছে, এবং তদ্বিষয়ে কেহই জ্ঞান-গবেষণার পরিচয় দিতে সক্ষম করেন নাই।

কিন্তু প্রকৃত তত্ত্ব কি ? সত্য সত্যই আর্য্যগণ মধ্য-এসিয়া, উত্তর-মেরু বা জর্মনী-স্বাভেনেভিয়া প্রভৃতি স্থান হইতেই পৃথিবীর চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন,—

মতামতের
অব্যোক্তিকতা। কি এই ভারতবর্ষেই তাঁহাদের আদি-বাসস্থান ছিল ? আমরা পূর্বেই বলিয়াছি,—সত্যতায়, জ্ঞানের, সকলেরই আদিকেন্দ্র—ভারতবর্ষ। যে

বৈদিক মন্ত্র পৃথিবীর আদি-বাণী বলিয়া সকলেই স্বীকার করেন, এবং যে বৈদিক গ্রন্থের পূর্বে পৃথিবীতে অল্প গ্রন্থ প্রচারিত হয় নাই বলিয়া সকলেই মান্য করিয়া আসিতেছেন ;—সেই বৈদিক মন্ত্রের—বৈদিক গ্রন্থের উৎপত্তিস্থান কোথায় ? কৈ, এ পর্য্যন্ত কেহই তো ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য দেশে বেদের উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ

* এতদঙ্গীয় প্রস্তুতস্বাস্থ্যসন্ধিৎসুগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলক এই মতের প্রধান পরিপোষক। পাশ্চাত্য কয়েক জন পণ্ডিতের সহিত এক-মত হইয়া তিনি এই কথাই আপন গ্রন্থপুস্তকে প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার প্রণীত *Orian, or Researches into the Antiquity of the Vedas*, এবং *The Arctic Home in the Vedas* গ্রন্থদ্বয়ে এই তত্ত্ব প্রমাণের জন্ত তিনি বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছেন।

করিতে সমর্থ হন নাই ! কি প্রাচ্য, কি পাশ্চাত্য, সকল পণ্ডিতেরই মতে—বেদ ভারত-বর্ষেরই আদি-গ্রন্থ । * তাহাই যখন প্রতিপন্ন হইতেছে, তখন আর্য্য-হিন্দুগণের অবস্থান-স্থান-নির্দেশে অগ্ৰত্ব বাইবার কি প্রয়োজন ? প্রত্যেক প্রাচীন জাতিরই পরিচয়-চিহ্ন—তাহাদের ভাষা ও পুরুষ-পারম্পরিক পরিচয় । আর্য্য-হিন্দুজাতির সেই ভাষা ও পুরুষ-পারম্পরিক পরিচয়—ভারত ভিন্ন অগ্ৰত্ব আর কোথায় পাওয়া যায় ? ষাঁহার বলেন,—মধ্য-এসিয়ায়, উত্তর-মেরু প্রদেশে বা জর্জরীয় উত্তর-প্রান্তে আর্য্যগণের আদি-বাস ছিল, তাহারা কেহ কি তত্তৎপ্রদেশে আর্য্যগণের তরুণ কোনও অভীত পরিচয়-চিহ্ন—ভাষা প্রভৃতির নিদর্শন—দেখাইতে পারেন ? পৃথিবীতে যে কোনও জাতি কখনও উন্নতির উচ্চ-সোপানে আরোহণ করিয়াছে, দিগ্গন্তে বিস্তৃত হইয়া পড়িলেও, তাহাদের আদি-বাসস্থানের এবং ভাষা-ভাবের কোনও-না-কোনও নিদর্শন আছেই আছে । ষাঁহার মধ্য-এসিয়া প্রভৃতিতে আর্য্যদিগের বাসস্থান নির্দেশ করেন, আর্য্যগণ-সম্বন্ধে তাহারা সে প্রমাণ কিছুই দেখাইতে পারেন না । উন্নতির উচ্চ-সোপানে আরোহণ করিয়া আপনাদের সংখ্যাধিক্য-হেতু ষাঁহার দেশে-বিদেশে উপনিবেশ-স্থাপন করেন এবং তত্তৎদেশে প্রতিষ্ঠাপন হন, স্বদেশে—আপন জন্মভূমিতে তাহাদের কোনও-না-কোনও নিদর্শন অবশ্যই বিদ্যমান থাকে । অপিচ, উন্নত জাতি স্বদেশের সংগ্রহ কখনই ত্যাগ করিতে পারে না । একটা স্থল দৃষ্টান্তেরই উল্লেখ করি না কেন ? ইংরেজ-জাতি অধুনা উন্নতিশীল এবং দিনদিনই তাহাদের সংখ্যা-বৃদ্ধি হইতেছে । খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী হইতে ইংরেজগণ পৃথিবীর নানা দেশে উপনিবেশ-স্থাপনে প্রবৃত্ত হন । এক্ষণে, আমেরিকায়, অষ্ট্রেলিয়ায়, আফ্রিকায়, এসিয়ায়—সর্বত্র তাহাদের বসবাস আরম্ভ হইয়াছে । কিন্তু, তাই বলিয়া, তাহাদের স্বদেশের ও স্বজাতির পরিচয়-চিহ্ন কি লোপ পাইয়াছে ? বরং বিদেশে উপনিবেশাধিক্য-হেতু তাহাদের আদি-স্থানে আদি-জাতির প্রতিষ্ঠাই বৃদ্ধি পাইতেছে । কেবল ইংরেজ বলিয়া নহে ; ফরাসী, দিনেমার, ওলন্দাজ, জর্জরীয়,—পাশ্চাত্য যে জাতির প্রতিই দৃষ্টিপাত করি না কেন, বিদেশে গিয়া উন্নতিলাভ করায়, সর্বত্রই দেখিতে পাই,—তাহাদের স্বদেশের মুখই উজ্জ্বল হইয়াছে । এমন কি, স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে এবং স্বদেশের সহিত সম্বন্ধ-বন্ধন-রক্ষণে তাহারা সদাই গৌরব-বোধ করেন । এরূপ ক্ষেত্রে, সুসভ্য আর্য্যহিন্দুগণ, জন্মভূমির স্বতি একেবারে বিস্মৃত হইয়া, বিদেশে গিয়া বিদেশের সহিত মিশিয়া যাইবেন,—ইহা কখনই সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না । একটা উন্নতিশীল জাতি আপনাদের সংখ্যাধিক্য-হেতু আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই বিদেশে চলিয়া গেল—তাহাদের

* বেদ যে পৃথিবীর আদি-গ্রন্থ, পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণকেও তাহা স্বীকার করিতে হয় । বহু দেশের বহু ভাষার আলোচনা করিয়া, অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে,—কয়েদই সভ্যজগতের আদি-গ্রন্থ । তিনি লিখিয়া গিয়াছেন,—“One thing is certain : there is nothing more ancient and primitive, not only in India, but in the whole Aryan world, than the hymns of the Rig Veda.” —*Origin and Growth of Religion*. কেবল ম্যাক্সমুলার কেন ;—যিনিই এ বিষয়ে অনুসন্ধান ও আলোচনা করিবেন, তাহাকেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে ।

আদি-বাসস্থানে তাহাদের পরিচয়-চিহ্ন-রূপে একটি প্রাণীও বিদ্যমান রহিল না,—
পৃথিবীর ইতিহাসে ইহা বড়ই বিচিত্র ও অসম্ভব ব্যাপার। সুতরাং, আৰ্য্যদিগের আদি-
বাসস্থান ‘আৰ্য্যাবর্তের’ অস্তিত্ব পরিচয় যখন একমাত্র এই ভারতবর্ষেই পাওয়া গাইতেছে,
তাঁহাদের ভাষা ও সাহিত্যের প্রকৃষ্ট নিদর্শন—বেদ-বেদান্ত শাস্ত্র প্রকৃতি—এই ভারতবর্ষেই
যখন বিদ্যমান রহিয়াছে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় যখন তাঁহাদেরই বংশধর বলিয়া
পুরুষাঙ্কমিক পরিচয় দিতে পারিতেছেন ;—তখন ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য কোথায় আর
তাঁহাদের আদিস্থান নির্দিষ্ট হইতে পারে ?

ভারতবর্ষই আৰ্য্য-সত্যতার আদিভূমি। ভারতবর্ষ হইতেই তাঁহারা দিগ্গন্তে দেশ-
দেশান্তরে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন। পৃথিবীতে যখন বৈদিক বর্ষ ভিন্ন অন্য বর্ষের
অস্তিত্ব ছিল না ; পৃথিবীতে যখন আৰ্য্যদিগের অপেক্ষা পরাক্রান্ত ও
আৰ্য্য-হিন্দুর
আধিপত্য-বিস্তার। প্রবল-শক্তি-সম্পন্ন জাতি কেহই জয়গ্রহণ করে নাই ; সে সময়ে আৰ্য্য-
হিন্দুগণই ‘ধরবীর অধীশ্বর’ নামে অভিহিত হইতেন। তখন, পৃথিবীর
সকল দেশে সকল রাজ্যে তাঁহাদের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। এখন, যেমন
সমুদ্র-পারে গমন করিলে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের জাতি-পাত হয় ; তখন পৃথিবীতে অন্য বর্ষের
অভ্যুদয় না হওয়ায়, তাঁহাদের সে আশঙ্কাও ছিল না। সুতরাং তখন অবাধে তাঁহারা
পৃথিবীর সর্বত্র গতিবিধি করিতে পারিতেন। আমরা শাস্ত্রাদিতে দেখিতে পাই,—আৰ্য্য-
হিন্দুগণের সেই উন্নতির দিনে, তাঁহারা আমেরিকা-মহাদেশে অধিকার-বিস্তার করিয়া-
ছিলেন, ইউরোপের প্রত্যেক প্রদেশে তাঁহাদের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল, আফ্রিকার
মুরগিম্য ভূ-খণ্ডও তাঁহাদের অধিকৃত ছিল না। শাস্ত্রে দেখিতে পাই—স্বয়ম্ভুব মনুর * পুত্র
প্রিয়ব্রত পৃথিবীকে সপ্তদ্বীপে বিভক্ত করিয়াছিলেন। জম্বু, দ্বীপ, পুষ্কর, ক্রৌঞ্চ, শক, শাল্মলী,
কুশ—এই সাত নামে সেই সপ্তদ্বীপ অভিহিত হইয়াছিল। এই সপ্তদ্বীপ এক্ষণে পর্য্যায়ক্রমে
এসিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা, উত্তর আমেরিকা, আফ্রিকা, ইউরোপ, আন্টার্কটিকা বা
দক্ষিণ-মেরুর সমিহিত প্রদেশ ও অষ্ট্রেলিয়া এবং ওশেনিয়া নামে পরিচিত হয়।
কোনও কোনও পাশ্চাত্য-পাণ্ডিতের এতদ্বিষয়ে যদিও মতভেদ দেখিতে পাওয়া
যায়, কিন্তু সুলভঃ এই সপ্তদ্বীপে সমগ্র পৃথিবীকেই যে বুঝাইয়াছিল, তাহাতে কেহই
সংশয় করিতে পারেন না। কর্ণেল উইলফোর্ড ভারতবর্ষকে জম্বু-দ্বীপ নামে
অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে, ‘দ্বীপ’-দ্বীপ অর্থে—এসিয়ার উত্তর ভাগ
এবং সমগ্র আমেরিকা মহাদেশ ; ‘পুষ্কর’ অর্থে—আয়র্লণ্ড ; ‘শক’ অর্থে—ব্রিটিশ দ্বীপ-
পুঞ্জ ; ক্রৌঞ্চ অর্থে—জর্মানী ; ‘শাল্মলী’ অর্থে—আফ্রিকা এবং বাল্টিক সাগরের সমিহিত
দেশসমূহ ; ‘কুশ’ অর্থে—ভারতবর্ষের পশ্চিম-সীমান্তস্থিত এবং কাস্পিয়ান সমুদ্র ও পারস্য

* এক এক মনুর নামানুসারে মন্বন্তর সূচনা হয়। শাস্ত্রে চতুর্দশ মনুর উল্লেখ আছে ; স্বয়ম্ভুব, মাদোচিব,
উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুস, বৈবস্বত, সাবর্ণি, দ্বাক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্ম্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি,
ইন্দ্রসাবর্ণি। এই গ্রন্থের ৯ম পৃষ্ঠায় যে মন্বন্তরের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তদনুসারে এক্ষণে সপ্তম বা বৈবস্বত
মন্বন্তর কাল চম্বিতেছে।

উপসাগরের সম্মিলিত দেশ-সমূহ। যাহাই হউক, প্রিয়ব্রত কর্তৃক পৃথিবী সম্পদ বিভক্ত এবং তৎসমুদায় আর্য্য-হিন্দুগণের অধিকারভুক্ত ছিল,—শাস্ত্র মানিতে গেলে, কোনক্রমেই তাহা অস্বীকার করা যায় না। রাজার ও রাজ-ভাষার পরিবর্তনে জনপদাদির সংজ্ঞা ও পরিমাণ প্রভৃতির পরিবর্তন সংঘটিত হয়। আমাদের শাস্ত্রে ও পুরাণেতিহাসে যে দেশ যে নামে অভিহিত ছিল, সে দেশের সে নাম ও সে পরিচয় প্রায় লোপ পাইয়াছে। অনেক অজস্রকান করিলে, কচিং কোথাও কোনও দেশের ও কোনও নামের পূর্ব-পরিচয় পাওয়া যায়। কালধর্ম্মে এরূপ বিলোপ-সাধন অবশ্যস্তাবী। স্থূল দৃষ্টান্তেই এ তত্ত্ব বোধগম্য হইতে পারে। এ পর্য্যন্ত এই ভারতবর্ষেরই কত-না নাম-পরিবর্তন সাধিত হইল! কখনও ‘জম্বু-দ্বীপ’, কখনও ‘ভারতবর্ষ’, কখনও ‘হিন্দুস্থান’—শেষ এখন ‘ইণ্ডিয়া’! আর্য্য-ঋষিগণের বেদনির্নাদে যখন ভারতবর্ষ মুখরিত ছিল, তখন ইহার নাম ছিল—আর্য্যাবর্ত; রাজা ভারতের রাজত্বকালে ইহার নাম হইয়াছিল—ভারতবর্ষ; মুসলমানগণের অধিকার-কালে—হিন্দুস্তান; আর এখন ইংরেজ-শাসনে—ইহার নাম হইয়াছে—‘ইণ্ডিয়া’। * ভারতবর্ষের ওভাদৃষ্ট, তাই এত পরিবর্তনের মধ্যেও এখনও তাহার অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু পৃথিবীতে এমন অনেক স্থান ছিল, যাহার পূর্ব-পরিচয় এখন কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; বরং পুরাণাদিতে উল্লিখিত কোনও কোনও প্রাচীন-স্থানের পরিচয় অবশেষে করিতে গিয়া এখন নিয়তই অন্ধকারে ঘুরিতে হইতেছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া পাণ্ডবগণ যে যে দেশ অধিকার করেন, মহাভারতের সভাপক্ষে তাহার বর্ণনা আছে। প্রথম যাত্রায়, তাঁহারা ব্রহ্ম, চীন, শ্যাম, তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, তাতার, পারস্ত প্রভৃতি জয় করিয়া, হীরাট, কাবুল, কান্দাহার এবং বেলুচিস্তান দিয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাবৃত্ত হন। দ্বিতীয় যাত্রায়, লঙ্কা হইতে আরব, মিশর, জাজীবার এবং আফ্রিকার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আপনাদের বিজয়-নিশান উদ্ভান করেন। সগর রাজা দেশ-বিজয়ে বহির্গত হইয়া

* হিন্দু ও ইণ্ডিয়া শব্দদ্বয়ের উৎপত্তির একটু বিচিত্র ইতিহাস পাওয়া যায়। হিব্রু-ভাষায় “হন্দ” শব্দের অর্থ,—বিদ্রোহ, তেজ, গৌরব, শক্তি ইত্যাদি। হিব্রু-ভাষায় ‘এন্টার’ গ্রন্থে লিখিত আছে,—“রাজা আহামুরেশ হন্দ হইতে ইথিওপিয়া পর্য্যন্ত রাজত্ব করিতেন।” অর্থাৎ, তাঁহার রাজ্যের এক সীমায় ভারতবর্ষ এবং অপর সীমায় মিশর-দেশ অবস্থিত ছিল। ভারতবর্ষকে তাঁহার “হন্দ” অর্থাৎ গৌরবান্বিত রাজ্য বলিয়া অভিহিত করিতেন। এই “হন্দ” পারসীকদিগের ‘জেন্দ আভেস্তা’ গ্রন্থের “হিন্দব” শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। উহাই আবার গ্রীক-ভাষায় “হন্দকোশ” (Handkosh), “ইন্ডিকোস” (Indikos) ও “ইণ্ডিওস” (Indios) প্রভৃতি শব্দে পরিণত হয়; আর তাহা হইতেই ইংরেজী ভাষায় “ইণ্ডিয়া” (India) শব্দের উৎপত্তি। “পস্ত” ভাষায় “হিন্দ” ও “হন্দ” শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপে পারসীকদিগের নিকট হইতে ইহুদীগণ এবং তাঁহাদের নিকট হইতে অস্রান্ত জাতি “হিন্দু” ও “ইণ্ডিয়া” শব্দ প্রাপ্ত হইয়াছেন। মূলতঃ, উভয় শব্দেরই অর্থ—পবিত্র গৌরবান্বিত জাতি। এখন, উহা যে অর্থেই ব্যবহৃত হউক, ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধরিলে, হিন্দুগণ অতি-প্রাচীনকালে প্রাচীন-জাতিগণের নিকট সম্মানিত ও সমাদৃত ছিলেন,—এতদ্বারা তাহাই বুঝা যায়। পারসীকগণের মতে,—তাঁহাদের ‘জেন্দ আভেস্তা’ সর্কাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ। কিন্তু সেই প্রাচীন গ্রন্থেই ভারতবর্ষ যখন “হন্দ” বা গৌরবান্বিত রাজ্য বলিয়া অভিহিত, তখন ভারতবর্ষে গৌরব-গরিমা আরও যে কত প্রাচীন কালের,—সহজেই প্রতিপন্ন হয় না কি ?

ভারত-মহাসাগরস্থিত ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করিয়াছিলেন—মহাভারতের আদি-পর্বে তাহার উল্লেখ আছে। অর্জুন কর্তৃক পাটল-দেশ জয়, এবং নাগকণ্ঠা উলুপীকে বিবাহ—এতৎপ্রসঙ্গে অর্জুনের আমেরিকা অধিকারের কথাই প্রতিপন্ন হয়। রাম-সীতার পূজা-পদ্ধতি আমেরিকায় এবং ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে সেদিন পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল। অমুসন্ধান করিলে, এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, ভারতবর্ষের সহিত এক সময়ে সকল দেশেরই সংশ্রব ছিল। এমন কি, যে উত্তর-মেরুর প্রসঙ্গে আর্ধ্যদিগকে উত্তর-মেরু-বাসী বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইয়া থাকে, সেই উত্তর-মেরু-প্রদেশও ভারতীয় আর্ধ্য-হিন্দুগণের অগম্য ছিল না। মহাভারতের বনপর্বে পাণ্ডুরাজা কুন্তীর নিকট উত্তর-কুরুতে জীজ্ঞাতির অবস্থা বর্ণন করিয়াছিলেন।* এতদ্বারাও বুঝা যায়, উত্তর-কুরুর বিষয়ে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা ছিল।

ভারতীয় আর্ধ্য-হিন্দুগণ পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন;—পৃথিবীর সকল দেশের সর্বত্রই তাঁহাদের গতিবিধি ছিল;—তাঁহাদের জ্ঞান-গরিমায় পাণ্ডিত্য-প্রভায় জগৎ অভিজ্ঞতাই উদ্ভাসিত হইয়াছিল;—ইহা অবিসম্বাদিত সত্য। এ সত্য স্বীকার করিলে, আর্ধ্য-হিন্দুগণের আদি-বাসস্থান সম্বন্ধে কদাচ কোনও সংশয়-পরিচায়ক নহে। প্রশ্ন উঠিতে পারে না। তাহা হইলে, মধ্য-এসিয়া বা উত্তর-মেরু হইতে তাঁহাদের আগমনের সকল যুক্তিই ফুৎকারে উড়িয়া যায়। ঋগ্বেদোক্তাধিত নদ-নদী বা নগর-জনপদাদির বিষয় তাঁহাদের গোচরীভূত ছিল বলিয়া, তাঁহাদের গ্রন্থে তৎসমুদায় স্থানলাভ করিয়াছে। তাঁহাদের গ্রন্থে কোনও নদনদী বা জনপদের নাম উল্লেখ আছে বলিয়া, সেই সেই নদনদী বা জনপদের মধ্যে তাঁহারা বসবাস করিতেন,—ইহা কিরূপে সিদ্ধান্ত হইতে পারে? উত্তর-মেরু-প্রদেশে ছয় মাস রাত্রি ও ছয় মাস দিন হইয়া থাকে,—এ তথ্য তাঁহারা অবগত ছিলেন। সেই অবগতি-হেতুই তাঁহারা যে সেই দেশের আদিম অধিবাসী হইবেন,—ইহাও কোনক্রমেই হৃদয়ঙ্গম হয় না। জ্ঞান-প্রভাবে, ভূ-দর্শনে, বিভিন্ন দেশে গতিবিধি-স্থত্রে, এবং বিভিন্ন ভূ-খণ্ডে রাজ্যাধিকার-বিস্তারের ঞ্জ, আর্ধ্য-হিন্দুগণ পৃথিবীর সকল সমাচার অবগত ছিলেন,—এতৎপ্রসঙ্গে তাহাই বরং স্বীকার করিতে হয়। কোনও দেশের সাহিত্যে, ইতিহাসে বা ধর্মগ্রন্থে, কোনও দূর-দেশের অবস্থা-বিবরণ বিবৃত হইলে, প্রথমোক্ত দেশবাসীদিগকে কি শেযোক্ত দেশের আদিম-অধিবাসী বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে? ইংরেজের ইতিহাসে বা ভূগোলে যদি কাম্‌স্কাট্‌কার একটা ক্ষুদ্র গ্রামের প্রাচীন কথা লিখিত থাকে, তাহা হইলে কি বলিতে হইবে,—ইংরেজের আদিপুরুষগণ কাম্‌স্কাট্‌কায় বসতি করিতেন? পাশ্চাত্য দেশ-সমূহের ভাষা-ভাবের সহিত আর্ধ্য হিন্দুগণের ভাষা-ভাবের যে কিছু কিছু সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতেই বা আমরা কি মনে করিতে পারি? একটা উন্নতিশীল

* বনপর্কের সেই বর্ণনায় উত্তর-কুরু তখন অসভ্য দেশ ছিল বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। পাণ্ডুরাজা বলিয়াছিলেন,—“সে দেশের স্ত্রীপণ এখনও অনাবৃত আছে।” ইহাতে তৎদেশের অসভ্যতাই সূচিত হয় না কি।

প্রাচীন জাতি পৃথিবীর চতুর্দিকে এককালে আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিয়া ছিল ;—কালক্রমে তাহাদের সে প্রভাব বিলুপ্ত হইয়া আসিয়াছে ;—উভয় জাতির ভাষা-ভাবের সাদৃশ্যে, তাহাই বরং প্রতিপন্ন হয় । কয়েক দিন পূর্বে ইউরোপ-খণ্ডে রোমীয়গণের কি অমিত-প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল ! স্পেন, ফ্রান্স, ইংলণ্ড,—তখন কে-না রোমীয়-ভাবাগ্রহণ হইয়া পড়িয়াছিলেন ? কিন্তু এখন—সব গিয়াছে ; আছে মাত্র স্মৃতি ! ভাষার সহিত কতক-গুলি রোমীয় (লাতিন) শব্দ মিশিয়া আছে ; আচারে-ব্যবহারে অল্প-অল্প রোমীয় ভাব বিস্তৃত রহিয়াছে ; আর সমস্তই বিলুপ্ত হইয়াছে । কত নিকটের, কয় দিন পূর্বের, রোমের সম্বন্ধেই যখন এতদূর বাতায় ঘটিয়াছে ; কত অতীতের, কত পুরাতন, ভারতীয় আর্য্য-হিন্দুগণের প্রভাব কতটুকু বিদ্যমান থাকিতে পারে,—সহজেই বুঝা যায় না কি ? অধিকাংশ প্রাচীন সভ্য-জাতির প্রতিষ্ঠা-সম্বন্ধে সেই সেই জাতির গ্রন্থ-পত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা কোনও এক বিশেষ সময়ে কোনও এক বিশেষ স্থান হইতে আসিয়া আপনাদের নূতন বাসস্থান প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । কিন্তু ভারতবর্ষের আর্য্য-হিন্দুগণ যে অত্র দেশ হইতে আসিয়া আর্য্যাবর্তে বসতি-স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাদের শাস্ত্রাদিতে সেরূপ উল্লেখ কিছুই নাই । বরং ভারতবর্ষ হইতেই তাহারা দিগ্দিগন্তে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, শাস্ত্রাদিতে তাহাই দেখিতে পাওয়া যায় । সুন্দর শ্বেত-মহুগুণে আর্য্যগণের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া, তাহারা যে অত্র দেশ হইতে আসিয়াছিলেন,—সে সিদ্ধান্তও সমীচীন বলিয়া মনে হয় না । ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ সাধারণতঃ সূর্য্যপ-সম্পন্ন । ভারতবর্ষের হিমালয়ে, কাশ্মীর প্রভৃতি দেশে, শ্বেতবর্ণ সুন্দর মহুগুণ অসম্ভাব্য নাই । আর্য্য ঋষি-মহর্ষিগণ হিমালয়ের ছরধিগম্য গিরিগুহায় নিযত যোগ-মন্ত্র থাকিতেন ; কৈলাসে, জম্বীকেশে, বদরিকাশ্রমে—তাহাদের সে পুণ্য-স্মৃতি আজিও কত-যতে বিদ্যমান রহিয়াছে । যদি শ্বেত-সুন্দর মহুগুণই আর্য্যগণের আদর্শ-স্থান-ভূত হন,—সেই ঋষি-মহর্ষিগণ ভিন্ন তাহারা আর কে হইতে পারেন ? স্বয়ংজীব যাদি হইতেই আর্য্য-হিন্দুগণ আজিও আপনাদের বংশ-পরিচয় নির্ণয় করিয়া থাকেন ? সে ক্ষেত্রে, অত্র কোনও স্থান হইতে আর্য্যগণের ভারতবর্ষ আগমনের কোনই সম্ভাবনা দেখা যায় না । শৈত্যাদিকা-নিবন্ধন উত্তর-মেরু বাসের অযোগ্য হওয়ায়, আর্য্যগণ দক্ষিণাভিমুখে চলিয়া আসেন,—নৈসর্গিক অবস্থার বিষয় আলোচনা করিলেও সে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না । পৃথিবীর আকর্ষিক গতি ও বার্ষিক গতির বিষয় তাহারা অবগত আছেন, তাহারা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন, মেরু-প্রদেশে কখনই অত্যধিক উত্তাপ-বৃদ্ধি অর্থাৎ সূর্য্যের প্রখর কিরণ-বিস্তার সম্ভবপর নহে । অধুনা বৈজ্ঞানিকগণ পৃথিবীর গতির বিষয় যেরূপভাবে নির্দেশ করিয়া থাকেন, তাহাতে কখনই যে মেরু-প্রদেশে সূর্য্যরশ্মিসম্পাতে শৈত্যাদিকোর হ্রাস ঘটিয়াছিল, তাহা উপলব্ধি হয় না । সূর্য্যের প্রখর রশ্মি প্রধানতঃ বিষুব-সামিথ্যেই নিপাতিত হয় । বিষুব-রেখা হইতে উত্তরে দক্ষিণে যে প্রদেশ যত দূরে অবস্থিত, ততঃপ্রদেশে তদনুরূপ সূর্য্যোত্তাপের হ্রাস-বৃদ্ধি ও শৈত্যাদিকা হওয়া সম্ভবপর । মেরু-প্রদেশে কচিং সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করিয়া থাকে । পৃথিবীর গতি পূর্বাগ্ন সমভাবেই বিদ্যমান আছে—যদি মানিয়া

লই ; তাহা হইলে, মেরু-প্রদেশে কখনও যে চির-বসন্ত বিরাজমান ছিল এবং সেখানে কখনও যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জনগণ বসবাস করিতেন ;—তাহা কোনমতেই সপ্রমাণ হয় না । তবে যদি কেহ আপনার মত-প্রতিষ্ঠার জন্ত পৃথিবীর গতান্তর নির্দেশ করেন ;—অর্থাৎ, পৃথিবীর আবর্তন পূর্ব-পশ্চিমে না হইয়া উত্তর-দক্ষিণে হইত বলিয়া নির্দেশ করিতে সাহসী হন ;—সে এক স্বতন্ত্র কথা ! কিন্তু সেরূপ অপূর্ব যুক্তিভাল এ পর্যন্ত কেহ কখনও বিস্তার করেন নাই ; কোনও গ্রন্থপত্রেও তাহার উল্লেখ দেখিতে পাই না ; বৈজ্ঞানিকগণের সিদ্ধান্তেও তাহা প্রতিপন্ন হয় না । আরও, বেদাদি গ্রন্থে মেরু-প্রদেশের যে বর্ণনাত্মক দৃষ্ট হয় ; এত কাল পরে—এখনও, সে প্রদেশের সেই অবস্থাই দেখিতে পাই । তখনও যাহা ছিল, এখনও যদি তাহাই রহিল, এতকালেও যদি কোনও পরিবর্তন ঘটিল না ; তবে কি লক্ষ্যে, মেরু-প্রদেশের অল্প অবস্থা ছিল, স্বীকার করিয়া লইতে পারি ? বেদে শৈত্যাধিক্যের বর্ণনা আছে—এই কথা বলিয়া বাঁহারা আর্য্যগণের উত্তর-মেরু-বাস সিদ্ধান্তে উপনীত হন, দুইটা প্রসঙ্গের অবতারণায় তাহাদের সে সিদ্ধান্ত ভ্রমসঙ্কুল বলিয়া প্রতিপন্ন হয় । প্রথমতঃ, বেদে অত্যধিক শৈত্যের বর্ণনা নাই । দ্বিতীয়তঃ, শৈত্যাতির যেরূপ উল্লেখ আছে, শরৎ ও হেমন্তাদি সম্বন্ধেও সেইরূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় । আরও, শীতের উল্লেখ আছে বলিয়াই যদি উত্তর-মেরু-বাস সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় ; তাহা হইলে, বেদে যে যে ঋতুর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাইবে, সেই সেই ঋতুপ্রধান স্থানেই তো আর্য্য-জাতির আদি-বাসস্থান নির্দিষ্ট হইতে পারে ? তাহা হইলে, তাহাদের আদি-বাস-স্থানের কোনও নীমাংসা—কখনও হওয়া সম্ভবপর কি ? তবে, শীত, হেমন্ত, শরৎ, বনস্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা—এই নানা ঋতুর উল্লেখ * থাকায় আমরা কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি ? ইহাতে বুঝা যায় না কি,—তাঁহারা এমন এক দেশে বাস করিতেন—যে দেশে সর্ব-ঋতুই সমভাবে বিদ্যমান ছিল ! যদি তাহাই হয়, সে দেশও এই ভারতবর্ষ ভিন্ন অল্প আর কোথায় সম্ভবপর ? বিভিন্ন ঋতুর এমন একত্র সমাবেশ,—পৃথিবীর আর কোথায় আছে ? কলতঃ ঋতু প্রভৃতির বর্ণনার বিষয় আলোচনা করিলেও, ভারতবর্ষই আর্য্য-হিন্দুগণের আদি-বাসস্থান বলিয়া প্রতিপন্ন হয় । বেদাদি-গ্রন্থে মেরু-প্রদেশের যে বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ শৈত্যাধিক্য এবং ছয় মাস রাত্রি ও ছয় মাস দিন—মেরু-প্রদেশে যখন আজিও বিদ্যমান ; তখন, সম-অবস্থা-সত্ত্বেও, সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া আসিবার তাঁহাদের কি হেতুবাদ ছিল ? ‘জেন্দ আভেস্তার’ উক্তি স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া মানিতে হইলেও, তাহাতে যাত্রা প্রতিপন্ন হয়,—পারসীকগণের কোনও আদি-পুরুষ উত্তর-মেরু প্রদেশে বসবাস করিতেন । কিন্তু তাহাতে কখনই এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, আর্য্য-হিন্দুদিগের আদিপুরুষগণ সেই মেরু-প্রদেশ হইতে এদেশে আগমন করেন । এদেশবাসীর মধ্যে বাঁহারা আর্য্যগণের উত্তর-মেরু-বাস সিদ্ধান্তের পরিপোষক, তাঁহাদের প্রধান-স্থানীয় ত্রিযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলকের মত,—“খৃষ্ট-জন্মের দশ সহস্র হইতে আট

* ঋতুদের ৭ম মণ্ডলে শরৎ ঋতুর, ৬ষ্ঠ ও ৫ম মণ্ডলে হেমন্ত ঋতুর, ১০ম মণ্ডলে গ্রীষ্ম ও বনস্ত ঋতুর এবং নানা স্থানে শীত ঋতুর প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায় ।

সহস্রাব্দিক বৎসর পূর্বে শৈত্যামিক্যে উত্তর-মেরু-বাসের অধোগ্য হইয়াছিল। সেই সময়, আট সহস্র হইতে পাঁচ সহস্র পূর্ব-খৃষ্টাব্দের মধ্যে, আর্য্যগণ উত্তর-মেরু পরিত্যাগ করিয়া বিভিন্ন স্থানে গমন করেন।” তিলকের মতে,—“বৈদিক মন্ত্র-সমূহ খৃষ্টজন্মের সাড়ে চারি হাজার বৎসরের অধিক পূর্বে বিরচিত হয় নাই।” এই সকল কথা বলিয়া, তিনি প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন,—“বৈদিক মন্ত্রে মেরু-প্রদেশের যে বর্ণনাভাস পাওয়া যায়, তাহা আর্য্যগণের পূর্ব-স্মৃতির নিদর্শন।” বলা বাহুল্য, তিলক আর্য্যগণের মেরু-প্রদেশ পরিত্যাগের যে কাল-পরিমাণ নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা প্রধানতঃ মার্কিনের ও ইউরোপের কয়েক জন পাশ্চাত্য-পণ্ডিতের মতের প্রতিধ্বনি মাত্র। * কিন্তু সেই সকল মতকে ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করিয়া, বৈদিক-মন্ত্রের কালনির্দেশ করা এবং আর্য্যগণের উত্তর-মেরু-বাসের সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া,—কতদূর যুক্তিযুক্ত হইয়াছে, সামান্য আলোচনাতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। মেরু-প্রদেশের আভাস বৈদিক গ্রন্থে পাওয়া যায় বলিয়া, তৎসহ আর্য্যগণের মেরু-প্রদেশ-বাসের পূর্ব-স্মৃতি বিজড়িত রহিয়াছে বুঝিতে হইবে,—ইহা বড়ই অদ্ভুত সিদ্ধান্ত! স্বয়ং তিলকের সিদ্ধান্তেই দেখা যায়,—মেরু-প্রদেশ ত্যাগের অন্যান্য সাড়ে চারি হাজার বৎসর পরে বৈদিক মন্ত্র বিরচিত হইয়াছিল। তাহাই যদি হয়, সাড়ে চারি হাজার বৎসর পরে পূর্ব-স্মৃতি কিরূপে প্রস্তুত হইতে পারে? ষাঁহারা উত্তর-মেরু পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহারা কি সাড়ে চারি হাজার বৎসর পরেও জীবিত ছিলেন যে, সেই স্মৃতি হৃদয়ে এতকাল পোষণ করিয়া রাখিয়া পরিশেষে তাহার অভিব্যক্তি করিলেন? উত্তর-মেরু ত্যাগের ও বেদ-রচনার মধ্যবর্তী যে সুদীর্ঘ সাড়ে চারি হাজার বৎসর অতীত হইল, সেই সময়ে তাঁহারা যে নানারূপ কষ্ট সহ করিয়া নানাদেশে ঘুরিয়া বেড়াইলেন;—তাহার কোনও নিদর্শন রহিল না; অথচ, যত কিছু নিদর্শন রহিল—তৎপূর্ব কালের! ইহা বিচিত্র নহে কি? সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারেই যদি সকল কথা মানিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে এ সকল সংশয়-প্রশ্নে কখনও উপেক্ষা করা যায় না। এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, দাক্ষিণাত্যের কতকগুলি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আপনাদিগকে ঋগ্বেদীয় ঋষিগণের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা কেহই নির্দেশ করিয়া দেখাইতে পারেন না—তাঁহাদের পূর্ব-বাস কোথায় ছিল? এই ভারতবর্ষেরই—আর্য্যাবর্তের কোনও এক নির্দিষ্ট স্থান হইতে দাক্ষিণাত্যে গমন করিয়া, কয় দিনের মধ্যেই তাহার পূর্ব-স্মৃতি বিস্মৃত হইয়া গেলেন;—আর সাড়ে চারি হাজার বৎসর পরেও সেই সুদূর উত্তর-মেরু-প্রদেশের পূর্বস্মৃতি স্মরণ রহিল—ইহা বড়ই আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হয় না কি? ভারতবর্ষের এক স্থানের সহিত অন্য স্থানের সম্বন্ধ-সংশয় কখনই বিচ্ছিন্ন হয় নাই; সকল প্রদেশে সকলেরই গতিবিধি সর্ব্বথা অক্ষুণ্ণ আছে। এ অবস্থায়, ভারতবর্ষের অধিবাসী

* আমেরিকার বোস্টন-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট ডাক্তার ওয়ারেন, উত্তর-মেরু সম্বন্ধে যে গ্রন্থ রচনা করেন, তাহা হইতেই প্রথমে তিলকের মনে ঐ চিন্তার উদয় হয়। তাহার পর মিঃ জিলবার্ট, মিঃ উইকেল, অধ্যাপক স্পেন্সার প্রভৃতি মার্কিন পণ্ডিতগণের এবং অধ্যাপক গিকি, মিঃ মার্লার্ড রিড (ইংলণ্ডে) মন্টগ্যুয়ার্ট জ্যেষ্ঠ (নরওয়ে) প্রভৃতির যত আলোচনা করিয়াও তিনি ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হন।

ব্রাহ্মণ-সন্তান, ভারতবর্ষেরই এক প্রদেশে গমন করিয়া, অল্প মাত্র ব্যাধানে থাকিয়াও, সে স্থিতি বিস্তৃত হইলেন; আর, কোন্ দূর অতীত কালে, কোন্ সুদূর উত্তর-মেরু পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া, আৰ্য্যগণ সেই স্থিতির পরিচয় দিতে পারিলেন,—ইহার অধিক আশ্চর্য্য আর কি হইতে পারে? জর্জলী, স্বাণেনেভিয়া বা পোলাণ্ড হইতে আৰ্য্যগণের দেশে-বিদেশে বিস্তৃতির বিষয় বঁাহারা সিদ্ধান্ত করেন, প্রধানতঃ নানা দেশের ভাষার সহিত ঐ সকল দেশের ভাষার সাদৃশ্য উপলব্ধি করিয়াই তাঁহারা উক্তরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকেন। কিন্তু যেক্রপভাবে ভাষার সাদৃশ্য হওয়া উচিত ছিল, ম্যাক্সমুলার প্রভৃতি পণ্ডিতগণের মতে, সেরূপ সাদৃশ্য দেখা যায় না। স্বাণেনেভিয়া প্রভৃতি—সমুদ্র-তীরবর্তী দেশ; ঐরূপ সমুদ্র-তীরবর্তী দেশ হইতে কোনও সভ্যজাতি যদি দূর-দূরান্তরে বিস্তৃত হইয়া পড়িত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ঐ সকল দেশের কোনও-না-কোনও সামুদ্রিক শব্দের বা মৎস্তাদির সংজ্ঞার সহিত অত্র দেশের তদ্রূপ শব্দের মিল থাকিত। যাহা বিশেষতঃ, তাহার সহিত কোন্ দেশের কতটুকু সাদৃশ্য বিদ্যমান,— তাহা দেখিয়াই তো যৌলিক-তত্ত্ব নির্ণয় করিতে হইবে! কিন্তু স্বাণেনেভিয়াদির সহিত অত্র দেশের শব্দের সেরূপ সাদৃশ্য কিছুই দেখা যায় না। সাদৃশ্য—কতকগুলি পতপকীর ও জীবজন্তুর নামের সহিত। সে সাদৃশ্য—পৃথিবীর অনেক দেশেই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তদ্বারা স্বাণেনেভিয়া প্রভৃতি দেশে কোনক্রমেই আৰ্য্যদিগের আদি-বাসস্থান নির্ণীত হইতে পারে না। অতএব, যখন অত্র কোনও দেশ হইতে আৰ্য্য-হিন্দুগণের এ দেশে আগমনের কোনই প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না,—সকলেই যখন কেবল অসুমান-সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়াই আৰ্য্যদিগের আদি-বাসস্থানের এক এক অভিনব কল্পনায় উপনীত হইয়াছেন; অথচ, যখন দেখিতে পাওয়া যায়,—ভারতবর্ষের ‘আৰ্য্যাবর্তের’ সহিত তাঁহাদের কীর্ত্তি-স্মৃতি চির-বিজড়িত রহিয়াছে, এবং ভারতবর্ষ হইতেই তাঁহারা পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উপনিবেশ-স্থাপনে আধিপত্য-প্রতিষ্ঠায় বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন; তখন ভারতবর্ষেই যে তাঁহাদের আদি-বাসস্থান ছিল, তাহা কোনও মতেই অস্বীকার করিতে পারা যায় না।

যখন ভারতবর্ষেই আৰ্য্যগণের আদিবাসস্থান নির্ণীত হইল; দেখা যাউক, ভারতবর্ষের কোন্ স্থানে তাঁহারা বসবাস করিতেন। তাঁহাদের আদি-বাসস্থানের পরিচয় পাওয়া যায়—‘আৰ্য্যাবর্ত’। আৰ্য্যাবর্ত শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধরিলেও,

আৰ্য্যাবর্ত। —“আৰ্য্যঃ শ্রেষ্ঠা আবর্তন্তে পুণ্যভূমিভেন বসন্ত্যত্র”—পুণ্যভূমি-হেতু আৰ্য্যগণ যেখানে বাস করিয়াছিলেন, তাহাকেই আৰ্য্যাবর্ত বলে।

কুলুক ভট্ট আৰ্য্যাবর্ত শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন;—“আৰ্য্য অত্রাবর্তন্তে পুনঃ পুনরুত্তবন্তীত্যার্য্যাবর্তঃ।” অর্থাৎ, আৰ্য্যেরা এইস্থানেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করেন, এইজন্ত এইস্থান আৰ্য্যাবর্ত নামে অভিহিত। ফলতঃ, আৰ্য্যগণের আদিবাসের জন্ত যে এই স্থান আৰ্য্যাবর্ত সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে, নানারূপে তাহা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু সে আৰ্য্যাবর্ত কোথায়? যদ্বি যদ্ব আৰ্য্যাবর্তের এইরূপ সীমা নির্ধারণ করিয়াছেন;—

“যাহার পূর্বে ও পশ্চিমে সমুদ্র বিদ্যমান, উত্তরে ও দক্ষিণে পর্বতমালা বিরাজমান, সেই পুণ্যভূমিই আর্য্যাবর্ত।” * ইহাতে প্রতাপন হয়,—উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে বিক্ষা-চল, পূর্বে ও পশ্চিমে ভারত-মহাসাগরের অন্তর্গত বঙ্গোপসাগর ও আরব-সমুদ্র,—এই চতুঃসীমার মধ্যবর্তী প্রদেশই আর্য্যাবর্ত। রামায়ণের আদিপর্কে সগর রাজার যজ্ঞ বর্ণন উপলক্ষে আভাসে আর্য্যাবর্তের পরিচয় আছে। তাহাতেও বুঝা যায়,—হিমালয় ও বিক্ষা-পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানেই আর্য্যদিগের বাসস্থান ছিল।† অমর-কোষে লিখিত আছে, ‘বিক্ষা ও হিমালয় পর্বতের মধ্যবর্তী দেশ আর্য্যাবর্ত অর্থাৎ আর্য্যদিগের বাসস্থান।’ এই আর্য্যাবর্ত আবার ব্রহ্মাবর্ত, ব্রহ্মর্ষি দেশ, মধ্যদেশ প্রভৃতি ভাগে বিভক্ত ছিল। স্বরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যবর্তী প্রদেশ—ব্রহ্মাবর্ত; কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পাঞ্চাল ও সুরসেন প্রভৃতি দেশ—ব্রহ্মর্ষি দেশ; হিমালয় ও বিক্ষার মধ্যে এবং বিনশনের পূর্বে ও প্রয়াগের পশ্চিমে যে দেশ, তাহাই মধ্যদেশ নামে অভিহিত হইত।‡ যাহা হউক, এই আর্য্যাবর্তের অবস্থান-স্থান-সম্বন্ধেও নানা-জনের নানা মত দৃষ্ট হয়। তাহাতে এক এক সময়ে ভারতবর্ষের সীমা-পরিমাণ অধিকতর বিস্তৃত ছিল বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। ‘বামন-পুরাণে’ জম্বু-দ্বীপ বা ভারতবর্ষের যে বর্ণনা আছে, তাহাতে প্রতাপন হয়,—উত্তরে তুরঙ্গ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের সীমানা বিস্তৃত ছিল। মহর্ষি মনুর নির্দিষ্ট “আর্য্যাবর্তের” সীমার ব্যাখ্যায় কেহ কেহ বলেন,—পূর্বে চীনসমুদ্র এবং পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর পর্য্যন্ত আর্য্যাবর্তের বিস্তৃতির সম্ভাবনা। গ্রীক ঐতিহাসিক ‘আরিয়ান’ বলেন,—“ভারতবর্ষের সীমানা—উত্তরে তরাস পর্বতমালা। উহা সাইলেশিয়া, লাইসিয়া, পাম্ফেলিয়া প্রভৃতি দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।” তরাস-গিরিশ্রেণী—এসিয়া মহাদেশের তুরঙ্গ-রাজ্যে অবস্থিত। তরাস হইতে ককেশাস এবং ককেশাস পর্বত হইতে হিমালয় পর্বতের উত্তর পর্য্যন্ত, আরিয়ানের মতে, ভারতবর্ষের সীমানা ছিল। তাহা হইলে, আরব, পারস্ত ও তুরস্কের কিয়দংশ এবং মধ্য-এসিয়ার বহুদূর পর্য্যন্ত (আফ-গানিস্থান ও বেলুচিস্থান সহ) ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত থাকা সম্ভবপর। চীন, পারসীক, পারদ, দরদ, হুণ প্রভৃতি জাতি ভারতবর্ষের সীমানার সন্নিকটে বাস করিত,—মহুসংহিতায় তাহার উল্লেখ দেখা যায়। আরিয়ান এবং মনুর মত মিলাইয়াই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ভারতবর্ষের তথা আর্য্যাবর্তের পূর্বোক্তরূপ সীমানা নির্ধারণ করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। গ্রীক ঐতিহাসিক ‘টলেমীর’ মতে আর্য্যাবর্তের সীমানা মধ্য-এসিয়ার

* মহুসংহিতায় আর্য্যাবর্তের সীমা এইরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে,—

“আসমুদ্রাস্তু বৈ পূর্বাদাসমুদ্রাস্তু পশ্চিমাং ।

তয়োরবাস্তরং সির্যোরার্য্যাবর্তং বিদুঃবা ॥”

মেঘাতিথি মনুর উক্ত শ্লোকের এইরূপ ভাষ্য করিয়া গিয়াছেন,—“পর্বতযোহিমবদিক্কার্য্যাবর্তস্যং মধ্যং সঃ আর্য্যাবর্তো দেশো বৃথৈঃ শিষ্টৈরুচ্চতে ॥”—বহু, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২১শ শ্লোক, মেঘাতিথির ভাষ্য ।

† আদিপর্ক, ৩৯শ অধ্যায়, ৪-৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য ।

‡ “আর্য্যাবর্তঃ পুণ্যভূমি মধ্যং বিক্ষাহিমালয়োঃ ॥”

§ মহুসংহিতা, দ্বিতীয় অধ্যায়, ১৭-২২ শ্লোক দ্রষ্টব্য ।

বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সে হিসাবে উহার উত্তরে ব্যাক্ত্রিয়া, পশ্চিমে পার্শিয়া বা পারস্ত এবং পূর্বে আরাবান ও ব্রহ্মদেশ প্রভৃতির বিদ্যমানতা বুঝিতে পারা যায়। এ বিষয়ে অবশ্য বলিবার কথা যথেষ্ট আছে। উন্নতিশীল আর্য্য-গণ সময়ে সময়ে আপনাদের রাজ্যের সীমা-পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, পারিপাশ্বিক দেশ-সমূহ জয় করিয়া তৎসমুদায়কে আপনাদের সীমান্তভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন,—ইহা বিচিত্র নহে। কিন্তু তাই বলিয়া, আর্য্যসভ্যতার আদিক্ষেত্র আর্য্যাবর্তই যে অতদূর বিস্তৃত ছিল, তাহা কোনক্রমেই প্রতিপন্ন হয় না। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ প্রাচীন রোম-সাম্রাজ্যের বিষয় উল্লেখ করিতেছি। রোম-সাম্রাজ্য যখন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তখন তাহার সীমা-পারমাণ কতটুকু ছিল, আর তাহার উন্নতির যুগে সে সীমা-পরিমাণ কতদূর পর্য্যন্ত পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল,—কে না তাহা অবগত আছেন? সম্রাট অগাষ্টাসের সময়, রোম-সাম্রাজ্যের যে সীমানা নির্দিষ্ট হয়, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়,—পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর; —উত্তরে ইংলিশ চ্যানেল, রাইন নদী, ডানিযুব নদী, ফ্রিসাগর ও ককেশস পর্বত; —পূর্বে আর্মেনীয় পর্বত, তাইগ্রাস নদী ও আরব মরুভূমি; —দক্ষিণে আফ্রিকার সাহারা মরুভূমি;—এই চতুঃসীমান্তগত প্রদেশ রোম-সাম্রাজ্য নামে অভিহিত হইত। কিন্তু, তাহা হইলেও, রোমের উৎপত্তিস্থান বা আদিক্ষেত্র-স্বৰূপে কখনই মতবৈধ দেখিতে পাওয়া যায় না। সেইরূপ, সময়ে সময়ে, ভারতবর্ষের সীমানা বিস্তৃত হইলেও, তদ্বারা কোনমতেই সপ্রমাণ হয় না—আর্য্য-সভ্যতার আদি স্থান অত্র ছিল! আর্য্য-হিন্দুগণ নানা দিশ্বেশে আধিপত্য-বিস্তার করিয়াছিলেন বলিয়া, তাহাদের আদি-কেন্দ্রক্ষেত্র কি অত্র সারিয়া পাড়া সম্ভবপর? ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছে বলিয়াই কি, ভারতবর্ষ ইংরেজজাতির আদি-বাসভূমি হইতে পারে? ফলতঃ, হিমালয় ও বিষ্ণাগিরির মধ্যবর্তী প্রদেশেই আর্য্যাবর্তের অবস্থান ছিল, এবং এখনও এই প্রদেশ আর্য্যাবর্ত-নামেই পরিচিত হইয়া থাকে।

আর্য্যাবর্তের আর্য্য-হিন্দুগণই যে পৃথিবীর আদিম সভ্য-জাতি, আরও নানাপ্রকারে তাহা প্রতিপন্ন হয়। পৃথিবীর আদি-গ্রন্থ ঋগ্বেদ-সংহিতায় পুনঃপুনঃ আর্য্য-শব্দের উল্লেখ আছে। আর্য্যগণ যজ্ঞাহুষ্ঠানে ব্রতী গ্রহিয়াছেন, আর্য্যগণ ইন্দ্রাদি দেব-গণের নিকট বরপ্রার্থনা করিতেছেন, আর্য্যগণ আর্য্যোত্তর জাতির নিধন-অনার্য্য সাধনে চেষ্টা পাইতেছেন,—ঋগ্বেদের বহুতর স্তোত্রে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়।* ঋগ্বেদে আর্য্যগণের এইরূপ পরিচয়—আর্য্যগণ যে এই আর্য্যাবর্তেরই আর্য্য-হিন্দু, তাহা বিশেষরূপে প্রমাণিত হয় না কি? আর্য্য শব্দের অর্থ—‘মহাকুলকুলীনার্য্য-সভ্যসজ্জনসাধবঃ’ (ইত্যমরঃ); “আরাজ্জাতান্তদেভ্য ইত্যার্য্যা, আর্য্যামতির্য্য স আর্য্য-মতি” (ইতি বাচস্পতি মিশ্রঃ); “কর্তব্যমাচরণ কামকর্তব্যমনাচরণ, তিষ্ঠতি প্রকৃত্যচারো যঃ স আর্য্য ইতি শ্রুতঃ।” যিনি মহাকুল, কুলীন, সজ্জন, সাধু; যিনি আর্য্যমতি অর্থাৎ বিশুদ্ধ তত্ত্বনিচয়ের নিকটবর্তী শ্রেষ্ঠবুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি; যিনি কর্তব্যপরায়ণ, অকর্তব্য-

*ঋগ্বেদের প্রথম, তৃতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ প্রভৃতি মণ্ডলে ‘আর্য্য’ জাতির উল্লেখ আছে।

বিষয়, আচারবান, তিনিই আর্য্য-নামে অভিহিত । স্থলতঃ, যাহারা সর্ব্বগুণাধার ছিলেন, তাঁহারা ই আর্য্য-নামে অভিহিত হইতেন ! অধিক কি, “আর্য্য ঈশ্বরপুত্রঃ”—আর্য্য-শব্দের অর্থ ঈশ্বর-পুত্র,—যাক আপন বেদব্যাক্য্যান ‘নিরুক্ত’-গ্রন্থে আর্য্যদিগকে এতাদৃশ উচ্চ আসন প্রদান করিয়া গিয়াছেন । আর্য্যদিগকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরপুত্র বলিয়া নির্দেশ করিবার কারণও যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় । ভগবৎ-সম্বন্ধে লাভের জন্তই তাঁহারা তন্ময় হইয়া ছিলেন, সাংসারিক সুখদুঃখে তাঁহারা কখনই বিচলিত হইতেন না,—ঈশ্বর-পুত্ররূপে অভিহিত হইবার চাহই হেতুভূত নহে কি ? ভারতীয় আর্য্য-হিন্দুগণ এক সময়ে পৃথিবীর নানা স্থানে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিলেন,—আর্য্য-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থে তাহা প্রতিপন্ন হয় । আর্য্যশব্দ “ঋ” ধাতু (ঋ—গ্যাৎ) হইতে উৎপন্ন । ‘ঋ’ ধাতুর অর্থ—‘গমন’, ‘ব্যাপ্তি’ । সায়নাচার্য্য সেই দ্ব্যর্থ-অনুসারে আর্য্য-শব্দের অর্থ করিয়াছেন—অরণীয় বা গন্তব্য । যাহারা নানা স্থানে গমন করিয়া আপনাদের কীর্ত্তিকেতন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন,—এই অর্থে আর্য্য-শব্দে তাঁহাদিগকেই বুঝায় । * তবে, এক্ষণে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে,—‘পৃথিবীতে কি কখন আর্য্যজাতি ভিন্ন অন্য জাতির অস্তিত্ব ছিল না ?’ সেরূপ কথা আমরা বলি না ; শাস্ত্রাদিতেও নাই । সুতরাং আর্য্য ভিন্ন অপরাপর জাতিকে প্রধানতঃ আর্য্যোত্তর বা ‘অনার্য্য’ সংজ্ঞায় অভিহিত করা যাইতে পারে । বেদে তাহারা কখনও দম্ব্য, কখনও বা দাস নামে পরিচিত হইয়াছে । পরবর্ত্তী অজ্ঞাত শাস্ত্রে তাহাদের নানা নাম দৃষ্ট হয় । সে হিসাবে, পৃথিবীর অজ্ঞাত স্থানের অধিবাসিগণ সকলেই অনার্য্য পর্য্যায়ভুক্ত ছিল । মধ্য-এসিয়া বা উত্তর-মেরুর কোনও কেন্দ্র-স্থান হইতে আর্য্যগণ যদি পৃথিবীর চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িতেন ;—তাহা হইলে, ‘আর্য্য’ ও ‘অনার্য্যের’ সংজ্ঞা এইরূপ ভাবে কখনই নির্দিষ্ট হইত না ; তাহা হইলে, একই বংশ-সমুদ্ভূত ব্যক্তিগণের জ্ঞান-বুদ্ধি আচার-ব্যবহারের এতাদিক তারতম্যও দৃষ্ট হইত না ; তাহা হইলে, ভারতে ‘ঋগ্বেদাদি’ শাস্ত্র-নিচয় প্রবর্ত্তিত হইবার সহস্র সহস্র বৎসর পরে পৃথিবীর অন্য দেশে ভাষা-সাহিত্যের উদ্ভব হইত না ; আর তাহা হইলে, একই সময়ে এক দেশ সভ্য-সমুন্নত এবং অপর দেশ অজ্ঞানান্যকারে সমাবৃত থাকিত না । ইউরোপের সভ্যতা কয় দিন পূর্বে হুচিত হইয়াছে, আর ভারতবর্ষের সভ্যতা কতকাল অব্যাহত আছে, পাশ্চাত্য জাতি-সমূহের সিদ্ধান্ত মানিত হইলেও, আকাশ-পাতাল সময়ের ব্যবধান দৃষ্ট হয় । যদি একই সময়ে একই জাতি ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িত, তাহা হইলে ভারতবর্ষেই বা সর্ব্বাগ্রে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উজ্জ্বল বিভা বিকীর্ণ হইবে কেন, আর অজ্ঞাত দেশই বা ভারতবর্ষের এত পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে কেন ?

* ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা কিন্তু আর্য্য শব্দের অজ্ঞাত অর্থ করিয়া থাকেন । তাঁহাদের অনুসারে আর্য্যোরা “কুবক” পর্য্যায়ভুক্ত । তাঁহারা বলেন—“অর” ধাতু হইতে আর্য্য-শব্দ নিষ্পন্ন এবং “অর” ধাতুর অর্থ ‘ভূমিক্ষণ’ ; অর্থাৎ ভূমিক্ষণ বা কৃষিকার্য্য যাহাদের জীবিকা ছিল, তাঁহারা ই ‘আর্য্য’ নামে পরিচিত । প্রাচীন লাতীন ও গ্রীক ভাষায় ‘অর’ (AR) ধাতুর অর্থ—‘কৃষণ’ । ইউরোপের অধিকাংশ ভাষায় ‘অর’ ধাতু ঐ অর্থে ব্যবহৃত হয় । সুতরাং ‘আর্য্য’-শব্দেরও তাঁহারা ঐরূপ অর্থ নির্দেশ করিয়া থাকেন । ইহা যে কিরূপ ভ্রমসঙ্কুল, সামান্য আলোচনাতেই তাহা বুঝিতে পারা যায় । সংস্কৃতে ‘অর’ নামে কোনও ধাতু নাই । পরন্তু ‘আর্য্য’-শব্দ ‘ঋ’ ধাতু হইতে উৎপন্ন । এক্ষণে ক্ষেত্রে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত যে কোন-ক্রমেই স্বীকার করা যায় না, তাহা বলা বাহুল্য ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

বেদ-চতুষ্টয় ।

[শাস্ত্রই হিন্দুর ইতিবৃত্ত ;—বেদ অপৌরুষেয়,—বেদের অর্থ,—ঋক, যজু, সাম, বেদের তিনটি অঙ্গ ;—বেদের রচয়িতা সম্বন্ধে আলোচনা ;—বেদ-বিভাগে বেদব্যাস ও অথর্ব ঋষির প্রসঙ্গ ;—বেদের সময়-সম্বন্ধে জানা জনের নানা মত ;—ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ, অথর্ববেদ ;—বেদোক্ত দেবতা ও ঋবিগণ ;—বেদোক্ত ধর্ম ;—বৈদিককালের আচার-ব্যবহার, সভ্যতা প্রভৃতি ;—বেদে জাতিভেদ ;—বেদ হইতেই অগ্ন্যস্ত্র শাস্ত্রের উৎপত্তি ;—বৈদিক ধর্মই সকল দেশের সকল ধর্মের ভিত্তি-স্থানীয় ।]

আর্য্য-হিন্দুগণের পরিচয়—তঁাহাদের শাস্ত্রগ্রন্থনিচয় । বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, দর্শন, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থে তঁাহারা চিরপরিদৃশ্যমান রহিয়াছেন । তঁাহাদের আচার-ব্যবহার, ধর্ম-কর্ম, রীতি-নীতি—সকলেরই নিদর্শন শাস্ত্রাদিতে জ্ঞাখ্যমান ।

শাস্ত্রই
পরিচয়-চক্ৰ ।

তঁাহারা কি প্রণালীতে জীবন-যাত্রা নিব্বাহ করিতেন ; কি প্রকারে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনায় তঁাহাদের জীবন অতিবাহিত হইত ; কি প্রকারে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তঁাহাদের প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল ; আর কি প্রকারেই বা তঁাহারা ইহলৌকিক সকল সুখের অধিকারী হইয়াছিলেন ;—শাস্ত্রাদিতে তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় । তঁাহাদের সমাজ-বন্ধন কিরূপ ছিল ; তঁাহারা কি নিয়মে ধর্ম-কর্মের অনুষ্ঠান করিতেন ;—তঁাহাদের মহত্ব, বীরত্ব, মহুত্ত্ব প্রভৃতির সকল পরিচয়ই শাস্ত্রমধ্যে নিহিত রহিয়াছে । শাস্ত্রই তঁাহাদের পুরাবৃত্ত ; শাস্ত্রই তঁাহাদের ইতিহাস ; শাস্ত্রই তঁাহাদের চরিত্র-চিত্র । শাস্ত্র-তত্ত্ব বুঝিতে পারিলেই তঁাহাদিগকে বুঝিতে পারা যায় ।

শাস্ত্রের আদিভূত—বেদ । ধর্ম ও ব্রহ্ম প্রতিপাদক অপৌরুষেয় বাক্য—বেদ । ব্রহ্ম-মুখনিঃসৃত ধর্মার্থজ্ঞাপক শাস্ত্র—বেদ । ফলে, বেদই হিন্দুর সর্বস্ব, বেদই হিন্দুর জনমিতা,

বেদই শাস্ত্রের চূড়ামণি । শব্দগত ধার্মার্থেও ‘বেদ’ তাহাই বুঝাইয়া বেদ-পরিচয় । থাকে । বেদ—‘বিদ্’ ধাতু হইতে নিশ্পন্ন ; ‘বিদ্’ ধাতুর অর্থ—ধর্ম্মা-

ধর্ম্ম ‘জানা’ ; অর্থাৎ, যদ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্ম সকল বিষয়ের অতিজ্ঞতা লাভ হয়, তাহাই ‘বেদ’ । আর যত কিছু শাস্ত্র, সকলই বেদ হইতে উৎপন্ন ; বেদ—কাণ্ড, অগ্ন্যস্ত্র শাস্ত্র—তাহার শাখা-প্রশাখা-বিশেষ । ঋক, যজু, সাম—বেদের তিনটি অঙ্গ ; সেই অঙ্গই বেদের অপর নাম—‘ত্রয়ী’ । অমৃনা-প্রচলিত ভাষায় যেমন পত্র, গজ, গীত—তিন শ্রেণীর তিন অঙ্গ প্রচলিত আছে ; ঋক, যজু, সাম অর্থেও যথাক্রমে তাহাই উপলব্ধি হয় । যজু-কর্ম্মের সুবিধার জন্য বেদকে চারি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল । সেই সময় হইতেই ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদের সৃষ্টি । বলা বাহুল্য, সেই চারি বেদের প্রতি বেদেই আবশ্যকানুসারে তখন ঋক, যজু, সাম (অর্থাৎ পত্র, গজ, গীত) স্থানলাভ করিয়া-

ছিল। এখনও সেই ভাবেই বেদের অস্তিত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রথমোক্ত তিন ব্বেদে (ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ ও সামবেদে) যজ্ঞবিধির সমাবেশ হওয়ায়, ঐ তিন বেদই পরবর্ত্তি কালে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অথর্ববেদে যজ্ঞবিধির অতিরিক্ত অত্যাশ্রিত্যাদি স্থান পাইয়াছিল বলিয়া, উহা তাদৃশ প্রতিষ্ঠাপন্ন হয় নাই। বেদের বিভাগ-কর্ত্তা সম্বন্ধে দুইটী বিভিন্ন মত দৃষ্ট হয়। কোষায়ও দেখিতে পাওয়া যায়,—মহর্ষি বেদব্যাস, যুগে যুগে ধর্ম্মের পাদক্ষয় ও মহুগ্ধদিগের আয়ুঃশক্তির হ্রাস দেখিয়া, বেদের বিভাগ করিয়াছিলেন; বেদবিভাগ-কর্ত্তা বলিয়াই তাঁহার নাম—বেদব্যাস। আবার কোষায়ও দেখিতে পাওয়া যায়,—যজ্ঞ-কর্ম্মের সুধিবার জন্ত অথর্ব ঋষি বেদ-বিভাগ করিয়াছিলেন। তিনি যজ্ঞ-কর্ম্মের উপযোগী হুক্তগুলিকে তিন বেদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া অত্যাশ্রিত্য-গুলির স্বাভাব্য-সাধন করেন। যাহারা প্রথমোক্ত মতের অনুসরণকারী, তাঁহারা বলেন,—‘যজ্ঞ-বিধির অনুপযোগী বা অকর্ম্মণ্য অর্থ বুঝাইবার জন্ত ঋক যজু সাম—এই তিন বেদের অতিরিক্ত হুক্তগুলি অথর্ববেদ নামে অভিহিত হইয়াছিল।’ কিন্তু শেবোক্ত মত-সমর্থনকারি-গণের সিদ্ধান্ত,—‘অথর্ব ঋষির নামানুসারেই শেষোক্ত বেদ অথর্ববেদ নামে অভিহিত হইয়াছে।’ কলতঃ, সর্ব্ব-প্রকারেই প্রতিপন্ন হয়,—প্রথমে এক বেদ ঋক-যজু-সাম তিন আদ্যে প্রকটমান ছিল। ক্রমশঃ তাহা চারিটী স্বতন্ত্র ভাগে বিভক্ত হয়। পরিশেষে, তাহার শাখা-উপশাখা-রূপে অত্যাশ্রিত্যাদির অভ্যুদয় হইয়াছে।

বর্ত্তমান কালে যে প্রণালীতে বেদ-সংহিতা সংগৃহীত হইয়াছে, বিশেষতঃ মহুগ্ধের বুদ্ধি-বৃত্তি যেরূপ বিপরীত ভাবধারণ করিয়া আছে, তাহাতে বেদের রচয়িতা-সম্বন্ধে মতদ্বৈধ

হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নহে। দৃষ্টান্তস্বলে ঋগ্বেদের কথা উল্লেখ
বেদ
রচয়িতা। করিতেছি। ঋগ্বেদের স্তোত্রসমূহ দশটী মণ্ডলে বিভক্ত। সেই মণ্ডল-সমূহে
বহু রচয়িতা ঋষির নাম দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম ও শেষ মণ্ডলের

রচয়িতার সংখ্যা—অনেকগুলি। দ্বিতীয় হইতে নবম পর্য্যন্ত সপ্ত মণ্ডলের রচয়িতা সাত জন ভিন্ন ভিন্ন ঋষির নাম আছে। দ্বিতীয় মণ্ডলের রচয়িতা—গৃৎসমদ; তৃতীয় মণ্ডলের রচয়িতা—বিখামিত্র; চতুর্থ মণ্ডলের রচয়িতা—বামদেব; পঞ্চম মণ্ডলের রচয়িতা—অত্রি; ষষ্ঠ মণ্ডলের রচয়িতা—ভরদ্বাজ; সপ্তম মণ্ডলের রচয়িতা—বশিষ্ঠ; অষ্টম মণ্ডলের রচয়িতা—কণ্ণ; নবম মণ্ডলের রচয়িতা—অঙ্গিরা। এত স্পষ্ট করিয়া যখন ভিন্ন ভিন্ন রচয়িতার নাম লিখিত আছে, তখন বেদ-সংহিতা—ঋষিগণের রচনা ভিন্ন লোকে অত্র আর কি মনে করিতে পারে? ইহাই স্বাভাবিক। বরং ইহার অধিক অত্র কিছু বলিতে গেলে, অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হওয়া সম্ভবপর। যদি তাহাই হয়, তবে হিন্দু-শাস্ত্রকারগণ বেদকে অপৌরুষেয় ব্রহ্মবাক্য বলিয়া নির্দেশ করিলেন কেন? অত স্পষ্ট করিয়া যখন রচয়িতাগণের নাম লিখিত আছে, তখন বেদকে ঋষি-প্রণীত না-বলিবার কারণ কি? সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ বহুদর্শী শাস্ত্রকারগণ, এতাদৃশ প্রমাণ সত্ত্বেও, জানিয়া শুনিয়া এইরূপ পরস্পর-বিরোধী মতের অব-তারণা করিবেন—ইচ্ছাও কদাচ বিশ্বাস হয় না। তবে কেন এমন হইল? এ বিষয় বুঝিতে হইলে, প্রথমতঃ বুঝিবার আবশ্যক—বেদ কি, বা বেদে কি আছে? পূর্বেই

বলিয়াছি, ধর্মার্থ বিষয়ের অভিজ্ঞতা-লাভই—বেদ। অর্থাৎ, ঈশ্বরের অনুকম্পা বা তাঁহার বিভূতি-প্রাপ্তিই বৈদিক মন্ত্রের উদ্দেশ্য। ঋষি মহর্ষিগণ—নরদেবতাগণ—ভগবৎ-সন্নিকর্ষ লাভের জন্ত তন্ময় হইয়া, আত্ম-বিসর্জন করিয়া, যে ভাষায়, যে ভাবে, তাঁহাকে ডাকিয়া-ছিলেন, বৈদিকমন্ত্রে স্তোত্রাকারে তাহাই গ্রথিত হইয়া আছে। প্রথমে কোন্ কণ্ঠের কোন্ সুধাস্বরে সে ধ্বনি বিনির্গত হইয়াছিল, তাহা কেহই অনুসন্ধান করিয়া বলিতে পারেন না। ব্রাহ্মণ-সন্তান, ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী জপ করেন; পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ বা অতিথ্য-প্রপিতামহের নিকট হইতে তিনি সে মন্ত্র প্রাপ্ত হইতে পারেন। কিন্তু তিনি কখনই অনুসন্ধান করিয়া নির্ণয় করিতে পারেন না,—সেই গায়ত্রী মন্ত্র তাঁহারাই বা কোথা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? যদি ততদূরও অগ্রসর হইতে পারেন, কিন্তু ঐ গায়ত্রী মন্ত্রের আদি কোথায়, কিছুতেই সন্ধান করিয়া পাইবেন না। বৈদিক-মন্ত্রাদি সম্বন্ধেও সেই একই কথা বলিতে পারা যায়। সৃষ্টি যত কালের, ঈশ্বরের আরাধনা-স্তোত্রও তত কালের। পুরুষানুক্রমে সে স্তোত্র সংসারে চলিয়া আসিতেছে। অল্প জাতির স্তোত্রাদির পরিবর্তন হইতে পারে; কিন্তু আৰ্য্য-হিন্দুর সেই প্রাচীন স্তোত্রাদি কখনই পরিবর্তিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তবে যে বেদের এক এক মণ্ডলে বা এক এক ভাগে ভিন্ন ভিন্ন ঋষির নাম দেখিতে পাই, তাহার কারণ অল্প প্রকার। এক এক সংসারে এক এক প্রকারের মন্ত্র প্রচলিত থাকা অসম্ভব নহে। সেই সেই সংসারের কর্তা আপন বংশ-পরম্পরায় ব্যবহারের জন্ত সেই সকল মন্ত্র যদি সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া যান, তাহা হইলে তাঁহাকে কখনই সেই মন্ত্রের রচয়িতা বলা যাইতে পারে না। বৈদিক মন্ত্রাদি সম্পর্কেও সেই কথাই প্রযোজ্য। পুরুষ-পরম্পরা যে যে মন্ত্র চলিয়া আসিতেছিল; এক এক ঋষি সেই সেই মন্ত্র সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন; পরবর্ত্তি-কালে তদনুসারেই সেই সেই মন্ত্রের রচয়িতা বলিয়া তাঁহারা অভিহিত হইয়াছেন। এক এক মণ্ডলের স্তোত্রাদি এক এক ঋষির রচনা বলিয়া প্রতিপন্ন করার পক্ষে অল্প অন্তরায়ও যথেষ্ট আছে। একই মণ্ডলের হস্ত-সমূহে নানা-ভাবের নানা স্তোত্রের অবতারণা আছে। বিভিন্ন কালের বিভিন্ন জনের উচ্চারিত মন্ত্রাদি একত্র নিবদ্ধ হওয়ায় একরূপ ঘটয়াছে বলিয়া বিশ্বাস হইতে পারে। ফলতঃ, যাহাদের নামে বৈদিক মন্ত্রাদি প্রচলিত, তাঁহারা সেই সেই মন্ত্রের সংগ্রহকর্তা, পরন্তু রচয়িতা নহেন। বেদ যে অনাদি, বেদ যে অপৌরুষেয়, বেদ যে ব্রহ্মমুখনিঃসৃত,—তাঁহা বলার তাৎপর্য্যও এই বলিয়া মনে হয়। সে মন্ত্র কোন্ পুরুষ, কোন্ কালে, প্রথম উচ্চারণ করিয়াছিলেন,—সন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না বলিয়াই, বেদ এইরূপ বিশেষণে বিশেষিত হইয়া থাকে। কোথা হইতে আসিল, অথবা কি কারণে সংঘটিত হইল,—মানুষ যখন সন্ধান করিয়া নির্ণয় করিতে পারে না, তখনই তাহা ‘দৈব’ নামে অভিহিত হয়। ‘অদৃষ্ট’, ‘বিশাতার লিপি’—সর্ব্বথা এই অর্থেই ব্যবহৃত দেখিতে পাই। একথা অবশ্য অস্বীকার করি না যে, একের যাহা অদৃষ্ট, অস্ত্রের পক্ষে তাহা দৃষ্ট হইতে পারে,—জান-কন্দের তারতম্যানুসারে একই সামগ্রী পর্য্যায়ক্রমে দৃষ্টাদৃষ্ট-সংজ্ঞা লাভ করিতে পারে; কিন্তু তাহা হইলেও, যাহা নিত্য-সত্য, তাহা যেরূপে মতানৈক্যের সম্ভাবনা কদাচ দেখিতে পাই না। বিশেষতঃ,

যাহারা জগদীশ্বরকে জগন্ময়-রূপে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন ; ‘শব্দ ব্রহ্ম’ যাহাদের শাস্ত্রে পুনঃ-পুনঃ প্রমাণিত হইয়া আছে, তাহারা সংসারের আদি-বাণী বেদকে ব্রহ্ম-বাক্য ভিন্ন আর কি বলিতে পারেন ? মহর্ষি জৈমিনি আপন ‘মীমাংসা-সূত্রের’ প্রমাণ-পাদে তাই বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন,—‘বৈদিক মন্ত্রাদির সঙ্কেত-কর্ত্তার নির্দেশ হয় না ; সূত্ররাং উহা যে মনুষ্ক-রচিত, তাহা কোনক্রমেই বলা যায় না ।’ শাস্ত্রাকার কপিল নানারূপ তর্ক-বিতর্ক উত্থাপন করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন,—‘বেদ অনন্তকাল বিদ্যমান আছে । কল্পান্তে ব্রহ্মা উহা প্রকাশ করেন মাত্র । জাগরণের পর সুপ্তোখিত ব্যক্তির পূর্ক-স্মৃতি যেরূপ অব্যাহত থাকে, কল্পান্তে বেদও সেইরূপ প্রকাশমান হয় ।’ মনু প্রভৃতিও এই মতেরই সমর্থনকারী । যাহা হউক, যখন বেদের রচয়িতাকে মনুষ্ক-বুদ্ধির অনুসন্ধান পাওয়া যায় না, বেদের রচনা কালেরও যখন সময়-নির্দেশ হয় না, বেদ অনাদি অপৌরুষেয় ব্রহ্মবাক্য ভিন্ন উহাকে আর কি বলা যাইতে পারে ? ফলতঃ, ভিন্ন ভিন্ন আকারে, অধিকারিভেদে উপাসনার পদ্ধতিরূপে, সৃষ্টির আদিকাল হইতে যে সকল স্তোত্র সংসারে চলিয়া আসিতে-ছিল, পরবর্ত্তী ঋষিগণ আবশ্যকানুসারে বাহা সংগ্রহ করিয়া সংসারে প্রচলিত রাখিয়াছিলেন ; তাহাই এখন সেই সেই ঋষি-প্রণীত সূক্ত বা মন্ত্র বা সংহিতা নামে অভিহিত,—তাহাই এখন বেদ নামে পরিচিত ।

বেদ—অনাদি । বেদ—অনন্তকাল হইতে বিরাজমান । শাস্ত্রানুশাসন-পরিচালিত হিন্দু-মাত্রেয়ই এই বিশ্বাস । পুরাণাদির বর্ণনায় দেখা যায়,—“প্রজাপতি ব্রহ্মার চতুষ্পুত্র হইতে

বেদ-চতুষ্টয়ের উৎপত্তি হইয়াছিল । সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার মুখ-নিঃসৃত, ^{বেদ} বাক্যই বেদ ।” * মনু বলেন,—‘স্বয়ং ঈশ্বর যজ্ঞকার্য্যের জন্ত অগ্নি-^{কত কালের ?} হইতে ঋগ্বেদ, বায়ু হইতে যজুর্বেদ, এবং সূর্য্য হইতে সামবেদ দোহন

করিলেন । এই বেদত্রয় সনাতন ।’ † এই সকল শাস্ত্রমত মান্ত করিলে, বেদের সময়-নিরূপণ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র । তবে সকলের জ্ঞান-বুদ্ধি-শিক্ষা সমান নহে । সূত্ররাং তৎসম্বন্ধে মতামত-প্রকাশেও বড় ক্রটি দেখিতে পাই না । হিন্দুগণ বেদকে সনাতন বলিয়া মান্ত করিলেও, পাশ্চাত্য-শিক্ষিত পণ্ডিতগণ কিন্তু তাহা স্বীকার করেন না । সূত্ররাং বেদের সময়-নিরূপণ জন্ত নানা জনের নানারূপ মন্তব্য-চালনা দেখিতে পাই । তবে যিনিই এ সম্বন্ধে যতই মন্তব্য আলোড়ন করুন না কেন, সকলেই যে অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, তাহা বলাই বাহুল্য । অধিক বলিব কি, বেদের সময়-নির্ধারণে এ পর্য্যন্ত কেহই এক মত হইতে পারেন নাই । প্রায় সকলেই বেদকে পৃথিবীর আদি-গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন বটে ; কিন্তু অনেকেই খৃষ্ট-জন্মের দুই সহস্রাব্দিক বৎসরের অধিক পূর্বে বেদের সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া ধারণা করিতে পারেন নাই । কেহ কেহ বলিয়া থাকেন,—“২৭৮০ পূর্ব-খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮২০ পূর্ব-খৃষ্টাব্দের মধ্যে বেদগ্রন্থ সম্বলিত হইয়াছিল এবং ৪৫০০ পূর্ব-খৃষ্টাব্দ হইতে ২৫০০ পূর্ব-খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সময়কে বৈদিক

* বিষ্ণুপুরাণ এবং অম্বাভূক্ত পুরাণ জটব্য ।

† মনুসংহিতা, প্রথম অধ্যায়, ২০শ শ্লোক ।

সভ্যতার যুগ বলা যাইতে পারে ।” * কিন্তু অপর এক পক্ষের মত,—“পাঁচ হাজার হইতে তিন হাজার পূর্ব-খৃষ্টাব্দের মধ্য-ভাগকে রাশিচক্রের যুগ বলে ; সেই যুগের প্রথম ভাগে কতকগুলি বৈদিক-মন্ত্র রচিত হইয়াছিল ।” † ফলতঃ বেদামুশাসন-পরিচালিত হিন্দু ভিন্ন, এ পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে কেহই কোনও অবিসম্বাদিত মীমাংসা করিতে পারেন নাই, কাহারও করিবার সম্ভাবনাও নাই। কোনও কোনও পাশ্চাত্য-পণ্ডিতের মতে—“ঋগ্বেদই আদি-গ্রন্থ ; অতীত বেদ তাহার পরবর্ত্তী কালে রচিত হইয়াছে ।” কিন্তু এ মতও সমাচীন বলিয়া মনে হয় না ; যেহেতু, ঋগ্বেদ-সংহিতায় তিন বেদের কথাই লিখিত আছে। সুতরাং বেদ-বিভাগ যে একই সময়ের,—তাহাতে কোনই সংশয় থাকিতে পারে না।

বেদ-চতুষ্টয়ের মধ্যে, আধুনিক পণ্ডিতগণের মতে, ঋগ্বেদই আদি-গ্রন্থ। উহা দশটি মণ্ডলে বিভক্ত। সেই দশটি মণ্ডলের মধ্যে পঁচাশিটি অম্বুবাক আছে। অম্বুবাক-সমূহে সর্বসাকুল্যে এক হাজার আটাইশটি স্তোত্র (স্তোত্র) দেখিতে পাওয়া যায়। অধুনা-প্রচলিত সাধারণ গ্রন্থাদিতে যেরূপ ঋগ্বেদ, পরিচ্ছেদ ও বিভিন্ন বিষয়-পরম্পরা দৃষ্ট হয়, মণ্ডল, অম্বুবাক ও স্তোত্র প্রভৃতি তাহারই আদি-রূপ মাত্র। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে চব্বিশটি, দ্বিতীয় মণ্ডলে চারিটি, তৃতীয় ও চতুর্থ মণ্ডলে পঁচাশিটি করিয়া দশটি, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম মণ্ডলে ছয়টি করিয়া আঠারটি, অষ্টম মণ্ডলে দশটি, নবম মণ্ডলে সাতটি এবং দশম মণ্ডলে ঐকটি অম্বুবাক আছে। এক এক মণ্ডলের স্তোত্র-সংখ্যার পরিমাণ,—প্রথম মণ্ডলে ১৯১টি, দ্বিতীয়ে ৪০টি, তৃতীয়ে ৬২টি, চতুর্থে ৫৮টি, পঞ্চমে ৮৭টি, ষষ্ঠে ৭৫টি, সপ্তমে ১০৪টি, অষ্টমে ১০৩টি, নবমে ১১৪টি, দশমে ১৯১টি। মণ্ডল, অম্বুবাক, স্তোত্র প্রভৃতির পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রে ঋগ্বেদের শ্লোক-সংখ্যা, প্রতি শ্লোকের পদ-সংখ্যা এবং শব্দাংশের পরিমাণ নির্দিষ্ট আছে। অধিক বলিব কি, প্রতি স্তোত্রে অকারান্ত, আকারান্ত, ইকারান্ত, নাস্ত, সান্ত প্রভৃতি যে সকল পদ আছে, সেই সকল পদের মোট সংখ্যাই বা কত,—শাস্ত্রকারগণ তাহাও নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ঋগ্বেদের শব্দ-সমষ্টির এতদূর বাধাবাদি হিসাব থাকায়, পণ্ডিতগণ বলেন,—উহার সহিত প্রকৃষ্ট-পদ-সংযোগের সম্ভাবনা অনেক দিন হইতেই অন্তর্হিত হইয়াছে। কিন্তু ক্রোড়ের বিষয়, সেরূপ পদসংখ্যা ও শব্দসমষ্টিসম্পন্ন ঋগ্বেদ এখন সন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। যাহারা তাহা মিলাইয়া বেদোদ্ধারের চেষ্টা পান, তাহারাত্তা যে সকল সময় সফলকাম হইতে পারেন, তাহাও বিশ্বাস হয় না। ঋগ্বেদের কবিতা-সংখ্যা লইয়াই এখন কত মতান্তর দেখা যায়। ঋগ্বেদে কতগুলি কবিতা আছে, তাহা গণনা করিয়া কেহ কেহ দেখিয়াছেন, সেই কবিতাগুলির সংখ্যা—১০ হাজার ৪০২ হইতে ১০ হাজার

* ব্যাক্সমুলার প্রমুখ প্রায় সকল পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরই এই মত। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত “প্রাচীন ভারতের সভ্যতার ইতিহাস” (A History of Civilisation in Ancient India.) গ্রন্থে এই মতই সমর্থন করিয়াছেন।

† শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলক, ‘বেদে উত্তর-মেরু বাসের কথা’ (The Arctic Home in the Vedas) গ্রন্থে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন।

৬২২টী; উহার শব্দ-সংখ্যা—১ লক্ষ ৫৩ হাজার ৮২৬টী; শব্দাংশের সংখ্যা—৪ লক্ষ ৩২ হাজার। কিন্তু অনেকের দৃষ্টিতে ইহার ইতর-বিশেষ লক্ষিত হয়। বিষ্ণুপুরাণ এবং শ্রীমদ্ভাগবৎ প্রভৃতিতে * বর্ণিত আছে,—বেদব্যাস বেদ-বিভাগ করিয়া পৈলকে ঋগ্বেদ-সংহিতা প্রদান করিয়াছিলেন; বৈশম্পায়নকে যজুর্বেদ-সংহিতা, জৈমিনিকে সামবেদ-সংহিতা এবং শ্রুমন্তকে অথর্ববেদ-সংহিতা শিক্ষা দিয়াছিলেন। পৈল আবার ঋক-সংহিতাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া ইন্দ্রপ্রমতি ও বাঙ্কলি (বাঙ্কল) নামক আপন শিষ্যদ্বয়কে তাহা প্রদান করেন। বোধ্য, অগ্নিমাঠার (অগ্নিমিত্র), যাজ্ঞবল্ক্য ও পরাশর নামে বাঙ্কলির চারিজন শিষ্য ছিলেন। বাঙ্কলি আপনার অধীত বেদ-সংহিতাকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া, সেই চারি ভাগ আপনার চারি শিষ্যকে শিক্ষা-দান করেন। ইন্দ্রপ্রমতি যে সংহিতা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, আপন পুত্র মাণ্ডুকেয়কে তাহা অধ্যয়ন করান। মাণ্ডুকেয় হইতে ক্রমশঃ তাঁহার পুত্র শাকল্য এবং শিষ্য বেদমিত্র (মতান্তরে দেবমিত্র) ও সৌভরি প্রভৃতির মধ্যে উহা প্রচারিত হয়। শাকল্য আবার পাঁচখানি সংহিতা সঙ্কলন করিয়া, যুগল, গালব, বাৎস্য, শালীয় ও শিশির নামক পাঁচ জন শিষ্যকে তদ্বিধয়ে উপদেশ দেন। এইরূপে ঋগ্বেদ-সংহিতা নানা ভাবে নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়ে। শাখা-অনুসারে মণ্ডল ও অনুবাক প্রভৃতিরও নাম পরিবর্তন দৃষ্ট হয়। শৌনক মুনি স্বরচিত ‘চরণ-বাহ’ গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন,—“ঋগ্বেদের আটটি ভেদ বা স্থান আছে। তাহা যথাক্রমে চর্চা, প্রাবক চর্চক, শ্রবণীয় পার, ক্রমপার, ক্রমজটা, ক্রমরথ, ক্রমশট, ক্রমদণ্ড নামে অভিহিত হয়। ঐ ভেদ-সমূহ চারিটি পারায়ণে বিভক্ত। ঋগ্বেদের শাখা—পাঁচটি। তাহাদের নাম,—আখ্যায়িনী, সাঙ্খ্যায়িনী, শাকলা, বাঙ্কলা ও মাণ্ডুকা। উহার অধ্যায়—চৌষটিটী; মণ্ডল—দশটী; বর্গ-সংখ্যা—দুই হাজার ছয়টী; হুক্তের পরিমাণ—এক হাজার সতেরটী; পদক্রম—বাশিষ্টের ১ লক্ষ ৫২ হাজার ৫১৪টী; অপরের ৫৮টী। ঋকের ১০ হাজার ৫৮০ পদ—পারায়ণ নামে অভিহিত। প্রথম অষ্টকে এক বর্গ ও এক ঋক্, দ্বিতীয় অষ্টকে দুই বর্গ ও দুই ঋক্, তৃতীয়ে এক শত ঋক্, চতুর্থে এক শত পাঁচস্তর ঋক্, পঞ্চমে এক হাজার দুই শত পঁয়ত্রিশ ঋক্, ষষ্ঠে তিন শত ঋক্, সপ্তমে কুড়ি ঋক্, অষ্টমে পঞ্চাশ ঋক্,—পাঁচটি শাখায় সর্বশুদ্ধ দুই হাজার দশটী ঋক্।” চরণ-বাহের মতে,—“বেদের অনেক অধ্যায় এখন পাওয়া যায় না। কালক্রমে তৎসমুদায় বিলুপ্ত হইয়াছে। ঋগ্বেদের শাখা-সম্বন্ধেও এইরূপ মতদ্বৈধ দৃষ্ট হয়। প্রধানতঃ পাঁচটি শাখা বলিয়া পরিচয় পাওয়া যায় বটে; কিন্তু কোথাও কোথাও একুশটি শাখারও উল্লেখ আছে। ইহাতে পারে—সেগুলি উপশাখা! কিন্তু পাঁচ শাখাও এখন যে সন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না, তাহা বলাই বাহুল্য। শাকলের শাখাই এখন প্রচলিত বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন। নির্দিষ্ট আছে,—বাঙ্কল শাখার কবিতা-সংখ্যা—১০ হাজার ৬২২টী, শাকল শাখার কবিতা-সংখ্যা ১৫ হাজার ৩৮১টী। যাহাই হউক, আমরা নানা গ্রন্থ আলোচনা করিয়া

* বিষ্ণুপুরাণ, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় এবং শ্রীমদ্ভাগবৎ দ্বাদশ স্কন্ধ বর্ত্ত অধ্যায়ে এই বিবরণ বিশদভাবে বর্ণিত আছে। অন্তান্ত মহাপুরাণেও ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

দেখিয়াছি,—এ গণনায়ও একটীর সহিত অপরটীর প্রায়ই মিল নাই। সুতরাং ঋগ্বেদ-সংহিতা প্রথমে কি আকারে বিদ্যমান ছিল, এবং শেষে কিরূপে পরিবর্তিত হইয়া আসিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। কতকগুলি মন্ত্র পূর্বাঙ্গের অব্যাহত আছে বটে; কিন্তু অপর কতকগুলিতে যে সংযোগ-বিয়োগ অনেক ঘটিয়াছে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। বাগবজ্ঞের নিয়মাবলী এবং ক্রিয়া-প্রণালী বিবৃত করিয়া ঋগ্বেদের দুইখানি শাখা প্রণীত হয়। সেই দুই শাখা—দুই খানি ‘ব্রাহ্মণ’ নামে অভিহিত। তাহার একখানির নাম—ঐতরেয়; অপর খানি—কৌষিতকী বা সাম্ভায়ন। মহিদাস ঐতরেয় নামক জনৈক ঋষি ঐতরেয় ব্রাহ্মণের এবং কুশিতক নামক ঋষি কৌষিতকী ব্রাহ্মণের প্রণেতা।

ঋগ্বেদের পর, অপর তিনখানি বেদের নাম উল্লিখিত হয়। সেই বেদত্রয়—যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ। যজুর্বেদ দুই অংশে বিভক্ত; কৃষ্ণ যজুর্বেদ এবং গুরু যজুর্বেদ।

যজু, সাম
ও
অথর্ববেদ।
তৈত্তিরীয় এবং বাজঙ্গনয়ী সংহিতা নামেও উহা অভিহিত হইয়া থাকে।
যজুর্বেদের দুই খানি ব্রাহ্মণ আছে। গুরু যজুর্বেদের ব্রাহ্মণ ভাগের নাম—শতপথ ব্রাহ্মণ, এবং কৃষ্ণ যজুর্বেদের ব্রাহ্মণ ভাগের নাম—

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ। যজুর্বেদ তিন শাখায় বিভক্ত। সেই তিন শাখা—তৈত্তিরীয়, মাধন্দিন ও কাণ্। সামবেদ-সংহিতার—দুই ভাগ; উত্তর ও পূর্ব। শাখা অনেক ছিল; কিন্তু এখন পাওয়া যায়—দুইটি মাত্র। সেই শাখাঘরের নাম,—কৌথুমী (কৌথুম) ও রাণ্যায়ন। কৌথুম ঋষি প্রথম শাখার এবং রাণ্যায়ন ঋষি দ্বিতীয় শাখার প্রবর্তক। সামবেদের ব্রাহ্মণ-সংখ্যা—আট খানি। কেহ কেহ বলেন,—‘অজুত ব্রাহ্মণ’ নামে সামবেদের আরও এক খানি ব্রাহ্মণ আছে। বঙ্গদেশের অধিকাংশ সামবেদী ব্রাহ্মণ সামবেদের কৌথুমী শাখার অন্তর্ভুক্ত। অথর্ব বেদ প্রধানতঃ নয় ভাগে বিভক্ত। পূর্বে অথর্ব বেদের বহু শাখা বিদ্যমান ছিল। * কিন্তু একমাত্র শৌনক-শাখা ভিন্ন এখন আর অন্য শাখা পাওয়া যায় না। চরণ-ব্যাহের মতে—অথর্ববেদে বার হাজার তিন শত মন্ত্র ছিল; কিন্তু এখন অথর্ববেদের মন্ত্র-সংখ্যা পাঁচ হাজার আট শত ঐশটি মাত্র। অথর্ববেদের ব্রাহ্মণ-ভাগের নাম—‘গো-পথ’ ব্রাহ্মণ। বর্তমান-প্রচলিত অথর্ববেদ বিংশতি কাণ্ডে বিভক্ত। এখন ৩০১৫টির অধিক শ্লোক অথর্ববেদে পাওয়া যায় না। অথর্ববেদের সঙ্কলয়িতা সম্বন্ধে তিনটি মত প্রচলিত। কাহারও মতে অথর্ব ও অঙ্গিরা ঋষির বংশধরগণ এবং কাহারও মতে কৃষ্ণ-বংশীয়েরা অথর্ববেদ সঙ্কলন করিয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন,—অথর্ব ঋষি যজ্ঞ-ক্রিয়া প্রবর্তনার সময় অথর্ববেদ সঙ্কলন করেন। যজু, সাম, যজু, অথর্ব—চারি বেদেই কতকগুলি সাধারণ মন্ত্র দৃষ্ট হয়। তদ্বারা বুঝিতে পারা যায়,—এক হইতেই ক্রমে ক্রমে বেদ-চতুষ্টয়ের বিভাগ হইয়াছিল।

* বেদের শাখা প্রভৃতি সম্বন্ধে নানা মত দৃষ্ট হয়। যজুর্বেদের শাখার বিষয় কোথাও দেখিতে পাই—৮৬ শাখা; কোথাও দেখিতে পাই—এক শত শাখা। সামবেদের শাখাও কোথাও কোথাও এক সহস্র বলিয়া উল্লিখিত আছে। সামবেদের সেই সহস্র শাখার মধ্যে কেহ কেহ বলেন, আটটি শাখা এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

বেদ-চতুষ্টয়ে নানা দেবতা ও নানা ঋষির নাম উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদ-সংহিতায়—অগ্নি, অদিতি, ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ, মরুৎ, দাব্যা, পৃথিবী, গন্ধা, বিশ্বকর্মা, প্রজাপতি, সবিতা, বিশ্ব প্রভৃতি অনূন তেত্রিশ হাজার দেবতার নাম দৃষ্ট হয়। ঋষি মহর্ষির বেদোক্ত দেবতা ও ঋষি। সংখ্যা—অগণ্য, অসংখ্য। অগস্ত্য, অদিতি, কশ্যপ, অঙ্গিরস, বিশ্বামিত্র, ভরদ্বাজ, নারদ, কথ, যযাতি, মাক্রাতা, প্রহ্লদ, কুৎস, হিরণ্যগর্ভ ইত্যাদি এক এক নামেই কত কত ঋষির পরিচয় পাওয়া যায়। এক ‘আঙ্গিরস’ নামে অনূন পঁয়তাল্লিশ জন ঋষির উল্লেখ আছে; অযাস্য আঙ্গিরস, পবিত্র আঙ্গিরস, ঐব আঙ্গিরস, কৃক আঙ্গিরস, ভিক্ষু আঙ্গিরস, শিশু আঙ্গিরস ইত্যাদি। এইরূপ কাথ নামে অনূন পনের জন (আয়ু কাথ, বৎস কাথ, মেধাতিথি কাথ, সৌতরী কাথ ইত্যাদি) এবং কাশ্যপ নামে অনূন পাঁচ জন ঋষির (অবৎসার কাশ্যপ, রেভ কাশ্যপ, ভূতাংশ কাশ্যপ ইত্যাদি) উল্লেখ দেখা যায়। পুনঃপুনঃ একই নামের এইরূপ উল্লেখ থাকায়, পরবর্তী প্রেরিতদ্বাহুসন্ধিসুগণ সময়-নিরূপণে নানা ভ্রম-প্রমাদে পতিত হইয়াছেন। ঐ সকল নাম যে তাঁহাদের পরিবারিক পরিচয়-চিহ্ন, তাহা বলাই বাহুল্য। অর্থাৎ, অঙ্গিরস (অঙ্গিরাঃ) ঋষির বংশে যে সকল মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিরস নামে তাঁহারা ইতিহাসে হইয়াছেন; কশ্যপ বংশ হইতে বহুতর কাশ্যপ এবং কথ বংশ হইতে বহুতর কাথের উৎপত্তি। এই বিষয়টি বিশদরূপে বোধগম্য না হইলে, কাল-পরিমাণ-নির্দেশে পদে পদে প্রমাদ ঘটবার সম্ভাবনা। কোন্ ঘটনা কোন্ কাশ্যপের বা কোন্ আঙ্গিরসের সময় সংঘটিত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা দুষ্কর। সুতরাং, সকল বিষয়েরই সময়-নির্দেশে নানা জনের নানা মত দেখিতে পাই। বৈদিক সূক্তে যে পঁয়তাল্লিশ জন বিভিন্ন আঙ্গিরস ঋষির নাম উক্ত হইয়াছে, যদি সেই ঋষিগণই বিশেষ বিশেষ সূক্তের রচয়িতা হন, তাহা হইলে প্রথম যে আঙ্গিরস ঋষি সূক্ত-রচনা করেন,—শেষের রচয়িতা তাঁহার বংশধর আঙ্গিরস হইতে কত অধিক পূর্বে তিনি বিজ্ঞমান ছিলেন, সহজেই তাহা বুঝা যায় না কি? আর এক কথা, এক এক বংশের প্রসিদ্ধ পুরুষগণের নামই বেদে স্থান পাওয়া সম্ভবপর। তাহা হইলে, কয় পুরুষ পরে এক জন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহাও চিন্তার বিষয় নহে কি? কেবল ঋগ্বেদ বলিয়া নহে,—অত্যাশ্চর্য বেদ-সম্বন্ধেও এই কথাই বলা যাইতে পারে। চারি বেদেই প্রায় একরূপ দেবতা ও ঋষিগণের নাম দৃষ্ট হয়। বেলীর ভাগ, অথর্ক-বেদে যম, মৃত্যু, কাল, দানব প্রভৃতির কতকগুলি স্তোত্র আছে। বৈদিক-দেবতাগণের উপাসনা-পদ্ধতি—প্রধানতঃ দুই প্রকার। কোনও কোনও দেবতার মহিমা বর্ণনা করিয়া স্তোত্র-পাঠ হইয়া থাকে; কোনও কোনও দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞাদি আছতি প্রদান করা হয়। এই হিসাবে, প্রথমোক্ত দেবতাগণ ‘যাগাদ’ দেবতা, এবং শেষোক্ত দেবতাগণ ‘স্তোত্রাদ’ দেবতা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। জৈমিনির মতে,—“দেবতা কখনও শরীরী জীব হইতে পারেন না।” তিনি বলেন,—“মন্ত্রই দেবতা। দেবতা শরীরী হইলে, স্তোত্রকারীর প্রত্যক্ষীভূত হইতেন। তাঁহার অপ্রত্যক্ষ অবস্থান ধরনা করিলেও,

একই সময়ে নানা স্থানে তাঁহার উপস্থিতি অসম্ভব । কিন্তু মন্ত্রই যদি দেবতা হন, তাহা হইলে একই সময়ে সর্বত্রই কার্য্যাসিদ্ধি সম্ভবপর ।” জৈমিনির এই মত যে সর্ব্ববাদিসম্মত, তাহা নহে । দেবতা ও ঋষি—অসংখ্য ও অগণ্য । তাঁহাদের পূজা-পদ্ধতিও তদনুরূপ বিভিন্ন প্রকারের । অন্ততঃ শাস্ত্রানুশাসন-পরিচালিত হিন্দু তাহাই মান্য করিয়া থাকেন ।

পূর্বে বলিয়াছি,—বেদই হিন্দুর ধর্ম্ম, বেদই হিন্দুর কর্ম্ম, বেদই হিন্দুর হিন্দুত্ব । এক কথায়, যিনি বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন,—তিনিই হিন্দু-নামে অভিহিত হন । হিন্দু হইতে হইলে, বেদ মানিয়া চলিতে হয় । বেদ মানিয়া চলার অর্থ—

বেদোক্ত ধর্ম্ম । বর্ণাশ্রম মানিতে হয়, অদৃষ্ট মানিতে হয়, মন্ত্রশক্তি মানিতে হয় । বেদ-মানার ঠাই-তাৎপর্য্য । যিনি বেদ মানেন, তিনি নিশ্চয়ই বর্ণাশ্রম-

ধর্ম্ম মানেন ; যিনি বেদ মানেন, তিনি নিশ্চয়ই অদৃষ্টে বিশ্বাস করেন ; যিনি বেদ মানেন, তিনি নিশ্চয়ই মন্ত্র-শক্তিতে আস্থাবান আছেন । ইহাই হিন্দুর লক্ষণ—ইহাই হিন্দুর বিশেষত্ব । শাস্ত্রে এমনও দেখা যায়,—কেহ বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই ; তিনিও আন্তিক হিন্দুর উচ্চ আসন প্রাপ্ত হইয়াছেন ; আবার, কেহ বেদ মানেন নাই, অথচ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন,—তিনি নাস্তিক অহিন্দু নামে অভিহিত হইয়াছেন । দৃষ্টান্ত-স্বলে, সাংখ্যকার মহর্ষি কপিল এবং বৌদ্ধমত-প্রচারক গৌতম মুনির নাম উল্লেখ করা বাইতে পারে । মহর্ষি কপিল, ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়াও, একমাত্র বেদ মানিয়াই হিন্দুর আদর্শ-আসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; আর গৌতম মুনি, ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াও, বেদ অমান্য করায়, নাস্তিক-সংজ্ঞা লাভ করিয়াছিলেন । সুতরাং, বেদ-মানাই হিন্দুর ধর্ম্ম । বেদোক্ত ধর্ম্মই—হিন্দুধর্ম্ম । বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া চলিতেন বলিয়াই হিন্দুগণ আৰ্য্য-হিন্দু নামে অভিহিত । বর্ণাশ্রম, অদৃষ্ট, মন্ত্রশক্তি,—সকলই বেদানুগত । হিন্দু বিশ্বাস করেন,—জাতি-বর্ণ কখনই মনুষ্যের সৃষ্টি নহে,—উহা ঈশ্বরেরই সৃষ্টি করিয়াছেন । হিন্দু বিশ্বাস করেন,—জন্মান্তরের কর্ম্মফলই অদৃষ্ট-রূপে প্রতিভাত হয় । মনুষ্য যখন মৃত্তিকা-মধ্যে বীজ-বপন করে, মৃত্তিকা-প্রোধিত বীজ কিছুকাল পর্যান্ত দৃষ্টির অগোচরে অ-দৃষ্ট থাকে ; জন্মশঃ, অঙ্কুরাদি উদ্ভাত হইলে, সেই অ-দৃষ্ট বীজের পরিচয় পাওয়া যায় । হিন্দুর বিশ্বাস—মনুষ্যের কর্ম্মফল মৃত্তিকা-প্রোধিত বীজ-রূপেই অ-দৃষ্ট থাকে, এবং যথা-সময়ে মনুষ্য জাহার কলভাগী হয় । এইরূপ, মন্ত্রশক্তিও হিন্দুর দৃষ্টিতে অনৌকিক শুভফলপ্রদ । হিন্দুর বিশ্বাস,—বিশুদ্ধ-চিত্তে বিশুদ্ধ-মনে অভ্যাস-দেবতাকে আহ্বান করিলে, নিশ্চয়ই তিনি সদয় হইয়া মনুষ্যের ইহ-পরকালের সকল মঙ্গল বিধান করেন । বেদ হইতে হিন্দু প্রধানতঃ এই শিক্ষাই পাইয়া থাকেন । তাহার অত্যাশ্রয় যে কিছু শিক্ষা, তাহাও এই শিক্ষারই অনঙ্গভূত । তাহার অধিকারিভেদের বীজমন্ত্রও এই বেদেই নিহিত আছে । বৈদিক স্তোত্র-সমূহে দেখিতে পাই,—হিন্দু ইন্দ্রের উপাসনা করিতেছেন, হিন্দু বায়ুর উপাসনা করিতেছেন, হিন্দু অগ্নির উপাসনা করিতেছেন, হিন্দু জলের উপাসনা করিতেছেন,—হিন্দু কত কত দেবতার

উপাসনা করিতেছেন । আরও দেখিতে পাই,—হিন্দু যাগ-যজ্ঞ করিতেছেন, হিন্দু বলি-প্রদান করিতেছেন, হিন্দু যজ্ঞাহতি কার্য্যে ব্রতী আছেন । এক দিকে হিন্দুর—এই ভাব ! অত্ৰদিকে আবার দেখিতে পাই,—হিন্দুর ঈশ্বর—অবাস্থানসোগোচর ; হিন্দুর ঈশ্বর—অনাদি, অনন্ত ; হিন্দুর ঈশ্বর—চিস্তার অতীত, জ্ঞানের অতীত, ধারণার অতীত । ফলতঃ, হিন্দু কখনও সাকাররূপে নাম-মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছেন ; আবার কখনও বা নিরাকার চৈতন্ত্যরূপ বলিয়া ভয় হইয়া আছেন । হিন্দু কখনও ইহ-সংসারেই তাঁহার স্বরূপ-মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিতেছেন ; হিন্দু কখনও অগণ্য অসংখ্য—তেত্রিশ কোটি দেবতার—অগ্নি, বায়ু, বরুণ, ইন্দ্র, শিব, নারায়ণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কালী, দুর্গা প্রভৃতির—উপাসনা করিতেছেন ; আবার কখনও বা তিনি ‘একমেবাদ্বিতীয়ম্’ বলিয়া নিশ্চিত হইয়া আছেন । এইরূপে নানা-শ্রেণীর জ্ঞান নানা পথ নির্দিষ্ট হইয়া আছে । বসিতে গেলে, বুঝিতে গেলে, ইহাই অধিকারিভেদ । যাঁহার যেরূপ শক্তি, যাঁহার যেরূপ জ্ঞান, যাঁহার যেরূপ ধ্যান-ধারণা, তিনি তদনুরূপ অহুষ্ঠানের অধিকারী । ইহাই হিন্দুর অধিকারিভেদ । বেদে সকল শ্রেণীর সকল হিন্দুর সকল উপাসনার সার-সামগ্রী নিহিত আছে । পরবর্ত্তি-কালে সংসারে যত কিছু উপাসনা-পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে, সকলই বৈদিক উপাসনার অনুরূপিত মাত্র । তাই বেদে দেখিতে পাই,—বৈদিক ঋষিগণ, প্রকৃতির ত্বনাদপিতৃগৃহস্থ সামগ্রী হইতে আরম্ভ করিয়া, মহৎ হইতে মহত্তর মহত্তম পথে আপনাদের লক্ষ্য সঞ্চালন করিয়াছেন । তাঁহারা কখনও নদ-নদীর উপাসনা করিতেছেন ; তাঁহারা কখনও আলোক-অন্ধকারের ধ্যানে নিমগ্ন আছেন ; তাঁহারা কখনও ক্রিয়াপতেজোমরুদ্ব্যোম পঞ্চভূতের আরাধনায় ব্রতী রহিয়াছেন ; আবার কখনও বা তাঁহারা প্রকৃতির যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা, সকলের যিনি আদিভূত, তাঁহারই অনুধ্যানে ব্যাকুল হইয়া আছেন । ছই একটা বৈদিক মন্ত্রের উল্লেখ করিতেছি ; তাহার মর্ম্ম অনুধাবন করিলেও, আর্য্যগণের সেই উপাসনা-পদ্ধতির আভাস পাওয়া যাইতে পারে । ঋগ্বেদের প্রথম স্তোত্রের প্রথম শ্লোকের অধুনা-প্রচলিত অর্থ—“যজ্ঞের পুরোহিত অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা বহুব্রহ্মপ্রদাতা ঋষিকে অগ্নিকে আমরা স্তুতি করি । প্রাচীন এবং আধুনিক ঋষিগণ কর্ত্তক অগ্নি স্তুত হইয়াছেন ও হইতেছেন । দেবগণকে তিনি যজ্ঞ-কার্য্যে যজ্ঞস্থলে আহ্বান করেন ।” এইরূপ দ্বিতীয় স্তোত্রের বায়ু দেবতার উপাসনায় দেখিতে পাই, মধুচ্ছন্দা ঋষি স্তুতি করিতেছেন,—“হে বায়ু ! আমাদের আহ্বান শ্রবণ করুন, আমাদের এই সোমরস পান করুন ।” অষ্টম স্তোত্রে ইন্দ্রের উপাসনায় দেখিতে পাই, সেই ঋষিই আবার প্রার্থনা করিতেছেন,—“হে ইন্দ্র ! আমাদের সন্তোষের উপযুক্ত শত্রুবিজয়কর্ম প্রচুর ধন প্রদান করুন । হে ইন্দ্র ! আপনার কর্ত্তক রক্ষিত হইয়া আমরা যেন যজ্ঞের ক্রায় কঠোর অস্ত্র ধারণ করিতে পারি এবং উন্নতশির শত্রুকে জয় করিতে সমর্থ হই ।” এক দিকে যেমন এইরূপ ব্যাখ্যাভাবের এক এক স্তোত্রে এক এক দেবতার স্তুতি-গান দেখিতে পাই, অত্ৰদিকে আবার সেইরূপ সমষ্টি-ভাবেও ভগবদারাধনা দেখিতে পাওয়া যায় । প্রথম মণ্ডলেরই উন-নবতি স্তোত্রের শেষে ঋষি কথ বিষ্ণুদেবতার স্তোত্রে বলিতেছেন,—“ভূমি অদিতি, ভূমি আকাশ, ভূমি অন্তরীক্ষ,

তুমি পিতা, তুমি মাতা, তুমি পুত্র, তুমি সর্বদেব, তুমি গন্ধর্ব, তুমি দেবতা, তুমি অশ্বর, তুমি রাক্ষস, তুমি পিতৃদেব, তুমি জন্ম ও জন্মের মূল কারণ ।” এইরূপ, দশম মণ্ডলের দ্ব্যশীতি স্তোত্রে আর এক ঋষি স্তব করিতেছেন,—“যিনি আমাদের সকলেরই সৃষ্টিকর্তা, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সকল অবস্থাই যাহার গোচরীভূত ; যিনি এক, যিনি অদ্বিতীয়,—অথচ যিনি সংসারে বহু নামে বহু দেবদেবীর আকারে বিরাজমান ; তাঁহাকে জানিবার জন্য সংসার ব্যাকুল হইয়া বেড়াইতেছে।” ঐ মণ্ডলেরই আর এক স্তোত্রে আছে,—“যখন মৃত্যু ছিল না, তখন সেই একমাত্র তিনিই আপনাতে অবস্থিত হইয়া, আপনিই বিরাজমান ছিলেন । তখন তিনি ভিন্ন আর কিছুই ছিল না ; ছিলেন কেবল তিনি।” শ্রীমদ্ভবগীতার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন অর্জুনকে আপন বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিতেছেন, তখন অর্জুন যেমন দেখিতেছেন,—“ভগবানের দেহের মধ্যে স্থাবর-জঙ্গম সমস্তই বিদ্যমান ; কমলাসন ব্রহ্মা, রুদ্র, সমস্ত ঋষি-মণ্ডল এবং বায়ুকী প্রভৃতি দিব্য উরগগণ—সকলেই তাঁহাতে অবস্থিত করিতেছেন ; তাঁহাতে অসংখ্য বাহু, অসংখ্য উদর, অসংখ্য বক্ষু, অসংখ্য নেত্র, অসংখ্য প্রাণী বিরাজমান রহিয়াছে ;—চন্দ্র-সূর্য্য তাঁহার নেত্ররূপে, মুখমণ্ডলে প্রদীপ্ত হতাশন, আদি-অন্ত-মধ্য-বিরহিত বিশ্বরূপে তিনি প্রকাশ পাইতেছেন ;”—ঋগ্বেদের উল্লিখিত সূক্তদ্বয়ে এবং অন্যান্য স্থানেও ভগবানের সেই বিশ্বরূপের পরিচয় পাওয়া যায় না কি ? যদি কেহ শ্রীমদ্ভবগীতার একাদশ অধ্যায় এবং ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের অংশবিশেষ মিলাইয়া পাঠ করেন, তাঁহার প্রাণে এই একই ভাবের উদ্বেগ হইতে পারে । * ফলতঃ, ভগবানকে নানারূপে কল্পনা করিয়া বেদে যে তাঁহার নানা উপাসনা-পদ্ধতি প্রবর্তিত আছে, তাহাতে আমরা কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি ? আমরা স্পষ্টতঃই বুঝিতে পারি না কি,—সকল মনুষ্যের জ্ঞান-বুদ্ধি শক্তি-সামর্থ্য সমান নহে ; মহৎ হইতে মহত্তর ও মহত্তমের ধারণা করিতেও সকল মনুষ্য সমভাবে ক্ষমবান্ নহে। সুতরাং পর-পর স্তর-পর্যায়-অনুসারে মনুষ্যের অনুষ্ঠান-পদ্ধতিও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সৃষ্টি হইয়াছে । আর, সেই জন্যই—হিন্দু-ধর্ম বিজ্ঞান-সম্মত । যিনি যে ভাবে যে পথ দিয়া ভগবৎ-সাদৃশ্য লাভ করিতে পারিবেন, তাঁহার জন্য সেই পথ নির্দেশ করিয়া দেওয়াই—বৈদিক হিন্দু-ধর্মের উদ্দেশ্য । তাহাতেই হিন্দু-ধর্ম জ্ঞান-বিজ্ঞানের দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত । সৃষ্টি, স্রষ্টা, আত্মা ;—জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম ;—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান ;—ইহকাল, পরকাল, অদৃষ্ট ;—সকল বিষয়েরই সম্বন্ধ-তত্ত্ব বৈদিক হিন্দু-ধর্মের অন্তর্ভুক্ত । এই ধর্মের সার-সম্পাদ অধিগত হইলে,

* গীতার একাদশ অধ্যায়ের পঞ্চদশ হইতে একত্রিংশ শ্লোকে ভগবানের এই বিশ্বরূপের বর্ণনা আছে । অর্জুন বলিতেছেন,—

“পশ্যামি দেবং স্তব দেবদেহে সর্বাংস্তথা ভূতবিশেষ সংযান্ ।

ব্রহ্মাণীশং কমলাদনয়নুষীশং সর্বারূপগাং চ দিব্যান্ ॥”

এইরূপ ঋগ্বেদে দেখিতে পাই,—

“চন্দ্রো বা মনসো জাতশ্চকোঃ সূর্য্যো অজায়ত ।

সুহৃদিজ্জগদ্রিশং আপাহ্যুরজায়ত ॥” ইত্যাদি ।

সৃষ্টি ও স্রষ্টার সম্বন্ধ মানুষ অবগত হইতে পারে ; এবং তাহা বুঝিয়া, তন্নির্দিষ্ট পথে প্রধাবিত হয়। যাহারা সেই সার সামগ্রী উপলব্ধি করিতে না পারেন, তাঁহারা ই ভিন্ন ভিন্ন পথে ঘুরিয়া বেড়ান। একই বৈদিক-ধর্মের অনুসরণকারী হইয়াও, পরিবর্তি-কালে যে বিভিন্ন-সম্প্রদায় ধর্মমত লইয়া পরস্পর শত্রুতাচরণ করিয়া গিয়াছেন, বৈদিক ধর্মের সার মর্ম উপলব্ধি না হওয়া—অথবা কোনও বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান-পদ্ধতির প্রতি অধিকতর আস্থাভাবন হওয়াই,—তাহার প্রধান কারণ বলিয়া মনে হয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, শাক্ত-শৈব-বৈষ্ণব প্রকৃতির স্বম্ভের বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাঁহারা সকলেই হিন্দু—সকলেই বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন; অথচ, কর্ম-পদ্ধতির এক-এক অংশের প্রতি তাঁহাদের কাহারও কাহারও লক্ষ্য নিপতিত হওয়ায়, একের হস্তি-দর্শনের ন্যায়, তাঁহারা সময় সময় দ্রাস্তবুদ্ধিতে পরিচালিত হইয়া থাকেন। প্রকারান্তরে ইহারও মূল—অধিকারভেদ। অধিকার-ভেদ-তত্ত্বটুকু হৃদয়ঙ্গম হইলে, হিন্দুর সহিত হিন্দুর বিরোধ ঘটবার সম্ভাবনা নাই।

বেদে আর দেখিতে পাই,—আর্য্য-হিন্দুগণের উচ্চ-সত্যতার উজ্জ্বল প্রতিকৃতি। অসুনা সংসার, সভ্য-সমুন্নত জাতির পরিচয়-চিহ্ন বলিয়া যে সকল গুণ-পরম্পরার আর্য্যগণের আচার-ব্যবহার সত্যতা প্রকৃতি। তাঁহাদিগকে দেখাইতে পারেন,—পৃথিবীতে এমন নূতন ধর্ম আজি পর্য্যন্ত কিছুই হয় নাই, বেদে যাহার উপাদান-সামগ্রী বিद्यমান নাই! যাহারা বলেন,—বেদে প্রকৃতি-পূজা বা পৌত্তলিক-ধর্মের প্রাধান্য আছে; তাঁহাদিগকেও নিঃসন্দেহে দেখাইতে পারা যায়,—অদ্বিতীয় ঈশ্বরের অনন্ত মহিমা বেদে বিস্তৃত রহিয়াছে। যাহারা বলেন,—হিন্দুর মধ্যে উদার বিশ্বজনীন ভাবের অভাব; বেদ তাঁহাদিগকেও চক্ষে অমূল্য দিয়া দেখাইতে পারেন,—হিন্দুর ন্যায় উদার বিশ্বজনীন প্রাণ কচিং দেখিতে পাওয়া যায়। যাহারা বলেন,—‘বেদ কৃষকের গান’; বেদে কৃষি-কার্য্যের উন্নতির জন্য উপাসনা আছে,—বৈদিক ঋষিগণ কৃষি-কার্য্যে জীবিকা নির্বাহ করিতেন, সূত্ররং ঋষিগণ কৃষক ছিলেন; তাঁহাদের ন্যায় দ্রাস্তবুদ্ধি ব্যক্তিকেও বেদ দেখাইতে পারেন,—কৃষির উন্নতির জন্য ভগবানের করুণা-প্রার্থনা উদার বিশ্বজনীন ভাবেরই অতিব্যক্তি মাত্র। কৃষির উন্নতি হইলে, বসুন্ধরা শস্য-সম্পদে পরিপূর্ণ হইলে, জনসাধারণ সকলেরই সুখ-সৌভাগ্যে দেশ সমুন্নত * শ্রীবুদ্ধিসম্পন্ন হইতে পারে;—আর্য্য-হিন্দুগণ মনে প্রাণে তজ্জন্যই কৃষির উন্নতি প্রার্থনা করিতেন। ইহা তাঁহাদের স্বদেশ-বাৎসল্য ও স্বজাতি-হিতৈষণারই পরিচায়ক। আর্য্য-ঋষিগণ কৃষির উন্নতির জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন * ;—গো-মেবাদি পশুর এবং কৃষি-যন্ত্রাদির শুভকামনা করিতেছেন;—ইহাতে কদাচ তাঁহাদিগকে কৃষক-পর্য্যায়ভুক্ত করিতে পারা যায় না। যেমন বিভিন্ন ব্যক্তির ধর্ম্মানুষ্ঠান ও উপাসনা-পদ্ধতি বিভিন্ন আকারে বিद्यমান ছিল, বিভিন্ন প্রকার কর্ম্ম-পদ্ধতিও তেমনি বিভিন্ন লোকের বা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দ্বারা বিহিত হইয়াছিল। একই ব্যক্তি ভূমিকর্ষণ করিতেছেন, বজ্র-কর্মে ব্রতী রহিয়াছেন,

* ঋগ্বেদের চতুর্থ এবং দশম মণ্ডলে কৃষির উন্নতি-বিষয়ক ভোজাদি দেখিতে পাওয়া যায়।

শাস্ত্র-গ্রন্থ রচনা করিতেছেন,—ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। ইহার কোনও প্রমাণও পাওয়া যায় না। কৃষক এবং কৃষি-কার্যের উন্নতির জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন বলিয়া, আৰ্য্য-হিন্দু-মাত্রকে কখনই কৃষক-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে না। ব্রাহ্মণ-পুরোহিত যদি যজ্ঞমানের ব্যাধি-শাস্তি-কামনায় দেবতার আরাধনা বা শাস্তি-সম্বলন করেন; তাহা হইলে কি বুঝিতে হইবে,—পুরোহিত ব্রাহ্মণ স্বয়ংই সেই যোগাক্রান্ত? এ সিদ্ধান্তও যেরূপ ভ্রমবৃক্ষক; আৰ্য্য-হিন্দুগণ কৃষক ছিলেন এবং বেদ কৃষকের গান,—এ সিদ্ধান্তও তদ্রূপ ভ্রান্ত-বুদ্ধির পরিচায়ক। পাঠের এবং অর্থোদ্ধারের ব্যতিক্রমেও অনেকের ভ্রম-সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপর। সাধারণ সংস্কৃত-সাহিত্যে একই শব্দের নানা অর্থ দেখিতে পাওয়া যায়। বৈদিক শব্দের অর্থ-পরিগ্রহ—আরও দুইরূপ ব্যাপার। অর্থ-বিপর্য্যয় যে কতই ঘটিয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বিভিন্ন মতের বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের সৃষ্টির অন্ততম কারণও—বৈদিক শব্দের অর্থান্তর গ্রহণ। পরবর্ত্তি-কালে, কেহ যে জ্ঞানের প্রাধিক্ত স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, কেহ যে কর্মের প্রাধিক্ত কার্ত্তন করিয়াছেন, আবার কেহ যে ভক্তির মাহাত্ম্যে বিভোর হইয়াছেন;—বৈদিক শব্দের অংশবিশেষের সাহায্য-গ্রহণে আপনাপন মত-প্রতিষ্ঠা-চেষ্টাই তাহার হেতুভূত। বাহা হউক, ধর্মবিষয়ে আৰ্য্য-হিন্দুগণ কতদূর উন্নত হইয়াছিলেন, সকল ধর্মের সার সামগ্রী কিরূপভাবে তাঁহাদের অধিগত হইয়া ছিল,—বেদে তদ্বিষয়ের অভিজ্ঞতা লাভ হয়। আৰ্য্য-হিন্দুগণের আচার-ব্যবহারের পরিচয়ও বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। অধুনা বেদের যে সকল সংস্করণ এতদংশে প্রচারিত ও ভাষান্তরিত হইয়া বিরাজমান আছে, তাহা হইতেই সকল বিষয়ের আভাস পাইতে পারি। অধুনা সভ্যজাতির সংসার-বন্ধন যেরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধ, প্রাচীন আৰ্য্য-হিন্দুগণই তাহার আদর্শ-স্থানীয় ছিলেন। এখন যেমন সংসারের প্রধান ব্যক্তিই সংসারের সর্বময় কর্তা, তখনও সেই ভাবই বিद्यমান ছিল। এখন যেমন সংসার ও বিবাহ-পদ্ধতি প্রচলিত আছে, তাহারও আদর্শ—প্রাচীন আৰ্য্য-হিন্দুগণের সংসারে ও বিবাহ-পদ্ধতিতে দেখিতে পাই। এখন যেমন সভ্যজাতির মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ-যুটিত ব্যভিচার দোষাবহ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে, তখনও স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে যথেষ্টাচার-সম্বন্ধ তদ্রূপ দোষাবহ ছিল। এখন যেমন বিশেষ বিশেষ পূজা-পার্বণে স্ত্রী সহধর্মিণী-রূপে স্বামীর সহিত যাগযজ্ঞে ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত হইয়া থাকেন, বৈদিক কালেই তাহার আদর্শ দেখিতে পাই; অথেষ্টের প্রথম ও পঞ্চম মণ্ডলে, হিন্দু-দম্পতি ইজ্ঞের উপাসনার ত্রতী রহিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। পিতার পরিচয়ে পুত্রের পরিচয়, বৈদিক কালের আৰ্য্য-হিন্দুগণেরই অল্পসৃষ্টি মাত্র। হিন্দুর সংসারে এখন যেমন পিতাই তরণ-পোষণ-দাতা রক্ষাকর্তা, তখনও তাহাই ছিল। এখন যেমন জননী সন্তান-পালনে ও সংসার-পরিচর্যায় ত্রতী আছেন, তাহাও সেই বেদোক্ত কালের আৰ্য্য-হিন্দুগণের পদাঙ্ক অনুসরণ মাত্র। এখন যেমন হিন্দুর সংসারে পুত্র-পৌত্রাদি-সহ একান্তভূক্ত পরিবারের ব্যবস্থা আছে, বৈদিক কালেও সেই প্রথা প্রচলিত ছিল; প্রথম মণ্ডলের শততম চতুর্দশ শ্লোকে দেখিতে পাই, কুংস ঋষি কুন্দের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন,—“হে অমর ব্রহ্ম।

আমাকে এবং আমার পুত্র-পৌত্রদিগকে সুখে রাখ এবং অন্নদান কর।” এখন যেমন পিতা উপযুক্ত পাত্রে আপন সালঙ্কারা কল্পা সমর্পণ করেন, বৈদিক কালেও সেই প্রথা প্রচলিত ছিল; ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে তাহার উল্লেখ আছে। এখন যেমন উত্তরাধিকার-বিধি প্রবর্তিত আছে; পুত্র পিতৃধনের অধিকারী হন এবং পুত্র না থাকিলে দৌহিত্র সে সম্পত্তির অধিকারী হয়, তাহারও মূল সূত্র—ঋগ্বেদের তৃতীয় ও সপ্তম মণ্ডলে দেখিতে পাই। এখন যেমন সতীত্বের গৌরব আছে, বৈদিক কালেও সেই গৌরবের নিদর্শন পাওয়া যায়। এখন যেমন হিন্দুর অস্তোষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা আছে, বৈদিক কালেও সেইরূপ দাহ-সংকার-প্রথাই বিদ্যমান ছিল। বৈদিক যুগের রমণীগণ যেমন গৃহ-কার্য্যে পারদর্শী ছিলেন, শ্রুশিকার দিব্য-জ্যোতিও তাঁহাদের হৃদয়ে তজ্জগৎ প্রবিষ্ট হইয়াছিল। তাঁহারা যেমন রন্ধন-কার্য্যে দক্ষ ছিলেন, বিহুযী বলিয়াও তাঁহাদের অনেকের সেইরূপ খ্যাতি ছিল। দেবাহুতি, অদিতি, যমী, উরুশী, অপালা, রোমাশা, লোপামুদ্রা প্রভৃতি বিহুযী রমণী-মণিগণের কাহিনী স্মরণ করিলেও হৃদয় বিম্বর-রসে আপ্ত হইয়া যায়। কেহ কেহ বলেন,—বৈদিক যুগের সঙ্কলন-কার্য্যও ঐ সকল রমণী সহায়তা করিয়াছিলেন। বৈদিক কালে—রাজা, নগরপতি, গ্রামপতি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পদের উল্লেখ দেখা যায়। সুনয়মে রাজ্য-শাসনের, রাজকর-সংগ্রহের এবং যুদ্ধাদির সর্বপ্রকার সুব্যবস্থার আভাস—বৈদিক যুগে বিদ্যমান রহিয়াছে। তখন, বীরত্বের আদর ছিল; কেহ ধন-গৌরবে উন্নত, কেহ অম্লের জন্ত লালায়িত, কেহ বা বাণিজ্যাদির দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিত। তখন, কামার, কুমার, ভূতার, কাঠুরিয়া, নাপিত, মাষি, বৈস্ত, পুরোহিত,—সত্য-সমাজের উপযোগী কিছুই অভাব ছিল না। তখনও বয়ন-কার্য্য সূত্র-বস্ত্র প্রচলিত ছিল; তখনও স্বর্ণরৌপ্যের অলঙ্কারাদি ব্যবহৃত হইত; তখনও নগর ছিল, গ্রাম ছিল, অট্টালিকা ছিল, পাহনিবাস ছিল, রাজপথ ছিল, শকট ছিল, যুদ্ধাঙ্গ ছিল, যোদ্ধা ছিল, আনন্দ ছিল, নৃত্য ছিল, গীত ছিল, বাণিজ্য ছিল, অতিথি-সংকার ছিল, সংসারীর যাহা কিছু আবশ্যক—সকলই ছিল। আবার অস্ত্রদিকে, ধর্ম্ম ছিল, কর্ম্ম ছিল, বাগযজ্ঞ ছিল, সত্য ছিল, সরলতা ছিল। একথা যে কেবল আমরা বলিতেছি, তাহা নহে; পান্চাত্য-ভাবাপন্ন পান্চাত্য-পণ্ডিতগণও এ সকল কথা কখনই অস্বীকার করিতে পারেন নাই। কেবল যে সংসার-ধর্ম্মেই তাঁহাদের প্রতিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়—এমন নহে। এক কথায় কহিতে গেলে, সত্যতার পরিচায়ক যে কিছু সম্পৎ-সামগ্রী, তাঁহারা তাহার সকলেরই অধিকারী ছিলেন। তাঁহাদের অজ্ঞাত কোনও নূতন তত্ত্ব আজি পর্য্যন্ত কেহ আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন বলিয়াও মনে হয় না। কয়েকটী দৃষ্টান্তই উল্লেখ করি না কেন? আধুনিক পণ্ডিতগণের মত,—সত্যতার আদিকালে বিনিময় যুদ্ধের প্রচলন ছিল না। কিন্তু ঋগ্বেদের চতুর্থ ও পঞ্চম মণ্ডলে এই বিনিময়-যুদ্ধের উল্লেখ আছে। স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ প্রভৃতি ধাতব দ্রব্য ব্যবহারের অভিজ্ঞতাও যে আর্য্য-হিন্দুগণের ছিল,—বেদে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীন বিশ্বের ও বাবিলনের প্রত্নতত্ত্ব-প্রভৃতির নিদর্শন পাইয়া, প্রত্নতত্ত্ববিদগণের আনন্দের অবধি নাই;

কিন্তু আৰ্য্য-হিন্দুগণ পূৰ্ণকাৰ্য্যে কিরূপ সুদক্ষ ছিলেন,—সহস্রভুজবৃত্ত বিশাল অট্টালিকার প্রসঙ্গে ঋগ্বেদের দ্বিতীয় ও পঞ্চম মণ্ডলে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। পূর্বে প্রতিপন্ন করিয়াছি,—মিশরের সভ্যতার কত কোটি-কল্প বৎসর পূর্বে ঋগ্বেদ প্রচলিত ছিল। সেই ঋগ্বেদে যখন এতাদৃশ অট্টালিকার প্রসঙ্গ উত্থাপিত আছে, তখন বিচার করিয়া দেখুন, আদিকালেও আৰ্য্য-হিন্দুগণ পূৰ্ণকাৰ্য্যে কৌদৃশ পারদর্শী ছিলেন! অধুনাতন সভ্য-জাতি-মাজেরই মত,—“পৃথিবী দিন দিন সভ্যতার পথে অগ্রসর হইতেছে।” সেই মত সর্ব্বব্রহ্মের ব্যপদেশে তাঁহারা পৃথিবীর আদিম অধিবাসীদিগের সভ্যতার নানা স্তর নির্দেশ করিয়া থাকেন। আদিম জাতিগণ প্রথমে অস্ত্রশস্ত্র ও অগ্নির ব্যবহার করিতে জানিত না, তাহারা আম-মাংস ও অপরিশুদ্ধ দ্রব্যাদি ভক্ষণ করিয়া জীবন-যাপন করিত, গিরিগুহা ও বৃক্ষ-কোঠর প্রভৃতি তাহাদের আবাস-স্থান মধ্যে পরিগণিত ছিল; পরে ক্রমশঃ ধাতব পদার্থ অস্ত্র-শস্ত্রাদি ব্যবহার করিতে তাহারা অভ্যস্ত হয় এবং ধীরে ধীরে পূর্ব অভ্যাস পরিত্যাগ করে। কিন্তু হিন্দু-শাস্ত্রের মত—উহার সম্পূর্ণ বিরোধী। শাস্ত্রের মতে,—মনুষ্য প্রথমে সভ্য-সমুন্নত ছিল; সভ্য-ব্রহ্ম-স্বাপর-কলি প্রভৃতি যুগ-বিবর্তনে দিন দিনই তাহাদের অধঃপতন সাধিত হইতেছে। অত্র দেশের ও ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস তুলনা করিলে, আপাতঃ-দৃষ্টিতে উভয় সিদ্ধান্তই প্রমাদশূন্য বলিয়া মনে হইতে পারে। ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য দেশে প্রথমে অসভ্য বর্ষের জাতির বসতি ছিল,—তন্ত্ৰদেশের প্রকৃতদ্ব্যহুসন্ধিৎসুগণ তাহাই অনুসন্ধান করিয়া পাইয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসে ভারতবর্ষ আদিকাল হইতেই সভ্য-সমুন্নত বলিয়া কীর্ত্তি হইয়াছে। সুতরাং, উভয় দেশের সিদ্ধান্তে মতবৈধ ঘটিবে,—তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বাহ্য হউক, যখন ভারতবর্ষের কথাই কহিতেছি;—আৰ্য্য-হিন্দুগণের ইতিহাস আলোচনায় ব্রতী হইয়াছি; তখন তাঁহাদের আচার-ব্যবহার প্রভৃতির যে পরিচয় তাঁহাদের গ্রন্থপত্রে পাওয়া যায়, তাহার আলোচনায়, তাঁহাদের সিদ্ধান্তই সমীচীন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। সে সিদ্ধান্তে, আদিকালে আৰ্য্য-হিন্দুগণ সভ্যতার উচ্চ সোপানে সমারূঢ় ছিলেন, পরবর্ত্তি-কালে ক্রমশঃ তাঁহাদের অধঃপতন সাধিত হইয়াছে,—ইহাই বুঝিতে পারা যায়।

আৰ্য্য-হিন্দুগণের সমাজ-ধর্ম্মের বিষয় আলোচনা করিতে গেলে, জাতি-বর্ণের কথা না বলিলে সে আলোচনা অসম্পূর্ণ রহিল বলিয়া মনে হয়। তাঁহাদের জাতিবর্ণের প্রসঙ্গ লইয়া বহু দিন হইতেই দ্বন্দ্ব চলিয়া আসিতেছে। শাস্ত্রানুশাসন পরিবেদে জাতিভেদ। চালিত হিন্দুগণের মত,—“জাতি-বর্ণ-ভেদ সৃষ্টির আদিকাল হইতেই অব্যাহত আছে; উহা সর্ব্বথা বেদ-বিহিত।” তৎপক্ষে তাঁহারা বেদ হইতে প্রমাণ উদ্ধার করিতেও ক্রটি করেন না। এ দিকে কিন্তু দেখিতে পাই,—অত্র পক্ষ বলেন,—“বেদে জাতিভেদ নাই; সৃষ্টির আদি-কালেও জাতিভেদ ছিল না; উহা ব্রাহ্মণগণের গুঢ় উদ্দেশ্য-সিদ্ধির কল্পনা মাত্র।” যখন এতাদৃশ মতবৈধ, তখন দেখা উচিত নহে কি—বেদে জাতি-বর্ণের বিষয় বাস্তবিক কিছু আছে কি না? অথবা, জাতিবৈজ্ঞান-সঙ্গত কি না? এ বিষয়ে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে নীমাংসা আছে। প্রথমে প্রঃ

করা হইয়াছে,—“পুরুষ যখন বিভক্ত হন, তখন তিনি কয় ভাগে বিভক্ত হইয়াছিলেন ? তাঁহার মুখ, বাহ, উরু, পদ—কি আকার ধারণ করিয়াছিল ?” পরক্ষণেই তাহার উত্তর দেখিতে পাই,—“তাঁহার মুখে ব্রাহ্মণ, বাহ-যুগলে রাজক্য, উরুদ্বয়ে বৈশ্য এবং পদ-যুগলে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছিল।” * তবেই বুঝা যায়,—পুরুষ-সৃষ্টির আদিকালেই ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-চতুষ্টয়ের সৃষ্টি। পরবর্তী শাস্ত্রাদিতে এই বিষয় অধিকতর বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই জাতি-বর্ণ-ভেদই ভারতবর্ষের বিশেষত্ব। পৃথিবীর অন্য যে কোনও দেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইলেও, সকল দেশের অধিবাসিগণই আপনাদিগকে এক-জাতি বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হয় না ; কিন্তু ভারতবর্ষের আৰ্য্য-হিন্দুগণ তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত-ভাবাপন্ন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র,—প্রধানতঃ তাঁহাদের এই চারি বর্ণ। তাহা হইতেই অসংখ্য শাখা-উপশাখা উৎপন্ন হইয়া, ভারতবর্ষের সমাজ-শরীর পুষ্ট করিয়া আছে। ভারতবর্ষের জল-বায়ুর সহিত বৃষ্টি বা এই জাতিভেদ-প্রথাও ওতঃপ্রোত সম্বন্ধ। বিভিন্ন ধর্মের, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের, বিভিন্ন মতের অভিঘাতে ভারতের সমাজ-শরীর এখন জীর্ণশীর্ণ ; কিন্তু জাতিভেদ-প্রথা এখনও এমনভাবে মজ্জায় মজ্জায় শিরায় শিরায় অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে যে, কোনক্রমেই তৎপ্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের ক্ষমতা সমাজের নাই। এখনও, ব্রাহ্মণ দেখিলে, নং-শূত্র মাত্রেই প্রণাম না করিয়া ভূমিলাভ করিতে পারেন না। এখনও—এতাদৃশ সাম্য-স্বাধীনতার দিনেও, এক বর্ণ অন্য বর্ণের সহিত বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপন করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন। এখনও, সমাজে, ধর্মে, ক্রিয়া-কর্মে, আচারে-ব্যবহারে, বর্ণগত-পার্থক্য সর্বত্র দৃষ্ট হয়। এ পার্থক্য যদি মনুষ্য-কৃত হইবে, তাহা হইলে এত কাল ধরিয়া এমন অবিসম্বাদিত সত্য-রূপে ইহা কখনই অব্যাহত থাকিতে পারিত না। যাহা মনুষ্য-সৃষ্ট, তাহা বিনশ্বর—অস্থায়ী। অপিচ, যাহা অবিনশ্বর, অনাদি অনন্তকাল হইতে বিরাজমান, ঈশ্বরের সৃষ্ট তিনি তাহাকে আর কি বলিতে পারি ? যাহারা বেদ মানেন, বেদের অপৌরুষেয়ত্ব স্বীকার করেন,—তাঁহারা কখনই জাতিবর্ণ-সম্বন্ধে অন্যমত হইতে পারিবেন না। তবে যাহারা বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না, তাঁহারা যে এ বিষয়ে অন্তমত প্রকাশ করিবেন,—তাঁহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে ? অধিক বলিব কি, তাঁহারা ঐ বৈদিক স্মৃতিটিকেই উড়াইয়া দিবার চেষ্টা পাইয়া থাকেন। প্রথমে ইউরোপীয় গণিত মিঃ কোলক্লক ঐ বৈদিক স্মৃতিটিকে প্রাক্কিপ্ত বলিয়া প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তিনি বলেন,—বৈদিক-ভাষার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে গেলে, ঐ স্মৃতি পরবর্ত্তি-কালে বেদের সহিত সংযুক্ত হইয়াছিল বলিয়া বুদ্ধিতে পারা যায়। সাহেব কোলক্লক যখন এই কথা

* বেদের পুরুষ-সৃষ্টির দশম মণ্ডলে জাতিভেদ বিষয়ক এই কৃষ্ণ-দৃষ্ট হয়,—

“যৎ পুরুষং বাদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন।

মুখং কিমন্ত কো বাহু কা উরুপাদা উচ্চেতে ॥

ব্রাহ্মণোহন্ত মুখমাসীদাহ রাজক্যঃ কৃতঃ।

উরু ভদন্ত বৈশ্যঃ পদ্যাস শূদ্রো অজারতঃ ॥”

বেদে জাতিভেদের কথা নাই বলিয়া যাহারা অত্ৰকে ভ্রান্তপথে পার্শ্বালনার প্রয়াস পান, তাঁহাদের জাতি অপনোদনের জন্য দশম মণ্ডলের এই স্মৃতি উদ্ধৃত করা হইল।

বলিতে সাহসী হন, পাশ্চাত্য-মতাবলম্বী অজ্ঞাত পণ্ডিতগণও অমনি তাহার প্রতিধ্বনি আরম্ভ করেন। সঙ্গে সঙ্গে এখন, ঐ যুক্তটী প্রকিপ্ত বলিয়া মানিয়া লইয়া, তাঁহারা জাতিভেদ-প্রথার মূলে কুঠারাঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমার আবশ্যকানুযায়ী আমার বুদ্ধি-বৃত্তির সহায়তাকারী বাহা, তাহাই ঠিক—আর অজ্ঞাত সকল প্রকিপ্ত, ইহা বড়ই অদ্ভুত সিদ্ধান্ত নহে কি? যদি মানিতেই হয়, সমস্তই মানিয়া লও; যদি না মানিতে হয়, কোনটাই মানিবার প্রয়োজন নাই। উহাতে কেবল লোকের মনে প্রমাদ-সংশয় উপস্থিত করে; সত্য তথ্য অল্পই নির্ণীত হইয়া থাকে। বাঁহারা জাতি-ধর্মের বিরোধী, তাঁহারা শাস্ত্রের অংশ-বিশেষের দোহাই দিয়া আপনাদের সিদ্ধান্তের সার্থকতা প্রতিপাদনে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। শাস্ত্রে আছে,—‘গুণকর্ম-বিভাগ অনুসারেই জাতি সৃষ্টি হইয়াছে।’ এই শাস্ত্রোক্তির দোহাই দিয়া, জাতি-ধর্মের প্রতিপক্ষণ বলিয়া থাকেন,—‘কর্ম ও গুণ অনুসারেই তো জাতি হইবার কথা! যে যেমন উচ্চ কর্ম করিবে, সেই সেইরূপ উচ্চ-জাতি হইবে; যে যেরূপ নীচ-কর্ম করিবে, তাহাকে সেইরূপ নীচ-জাতি হইতে হইবে।’ এক হিসাবে, এ সিদ্ধান্তও ভ্রম-সঙ্কুল;—শাস্ত্রের একাংশ পরিত্যাগ করিয়া অপরাংশ গ্রহণের ফল। ভারতবর্ষের জাতি-ধর্ম-সৃষ্টির ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাই,—আগে জাতি, পরে কর্মভাগ। ভারতবর্ষের ইহাই চিরন্তন প্রথা। বাঁহারা এ কথা অস্বীকার করিবার চেষ্টা পান, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি,—তাঁহারা কি বলিতে পারেন,—‘আগে যজ্ঞকন্ধ্যোপাসনা—না, আগে ব্রাহ্মণের জন্ম? আগে বিপ্রসেবা—না, আগে শূদ্রের উৎপত্তি? আগে বৃদ্ধ বিগ্রহ—না, আগে ক্ষত্রিয়?’ ফলতঃ, জাতি-বর্ণ-ক্রমে জন্মগ্রহণ করিয়াই মানুষ এক-এক কর্মের অধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে; পরন্তু, অধিকার প্রাপ্ত হইবার পর কেহই জন্মগ্রহণ করে না। আর এক কথা, যদি আগে গুণ-কর্মের বিচারই হইবে, তাহা হইলে, চতুর্ভূজ না হইয়া, অসংখ্য বর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না কি? ইহ-সংসারে গুণ-কর্মের কি কখনও সংখ্যা নির্দেশ করা যায়? গুণকর্মীসূত্রে জাতি-বিভাগ হইলে, বংশানুক্রমিক জাতি-বর্ণ কেনই বা অব্যাহত থাকিবে? তাহা হইলে, ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের পুত্র ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের পুত্র বৈশ্য, শূদ্রের পুত্র শূদ্র,—এরূপ নিয়ম-পদ্ধতিই বা কেন চলিয়া আসিবে? ভগবান বলিয়াছেন,—‘গুণ-কর্ম-বিভাগ অনুসারে চতুর্ভূজ সৃষ্টি করিয়াছি।’* ইহাতে সৃষ্টি-শব্দের উল্লেখ থাকায়, বুঝা যায়,—সৃষ্টির আদি হইতেই, জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই, জাত-ব্যক্তির জাতিধর্ম নির্দিষ্ট হইয়া আছে; জন্মগ্রহণের পর, বৃত্তি-গ্রহণানন্তর, তাহার জাতিধর্ম-প্রাপ্তির বিষয় কোনক্রমেই প্রতিপন্ন হয় না। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে, এতদিন কোন কালে, কত শূদ্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিত, আবার কত ব্রাহ্মণ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইত। এই কথার উত্তরে, কেহ কেহ বিদ্বা-মিত্রের ব্রাহ্মণত্ব-প্রাপ্তির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া থাকেন; কেহ বা, অস্ত্র দুই একটী দৃষ্টান্তের অকতারণা করিবারও চেষ্টা পান।* বিখ্যামিত্রের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে হইলে, প্রথমতঃ বুদ্ধিবার প্রয়োজন হয়—কোন বিখ্যামিত্র ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন? আমরা

* ‘চতুর্ভূজঃ যস্য সৃষ্টিং গুণকর্মবিভাগঃ।’—ঐমত্তগবদগীতা।

ঋগ্বেদেই একাধিক বিশ্বামিত্রের পরিচয় পাই। পুরাণাদিতেও নানা সময়ে নানা আকারে বিশ্বামিত্রের প্রসঙ্গ উল্লিখিত আছে। সূতরাং বিশ্বামিত্র নাম দেখিলেই তাঁহাকে এক ব্যক্তি বলিয়া ধারণা করিতে পারা যায় না। ঋগ্বেদে কোথাও বিশ্বামিত্র ঋষি দেবতারূপে স্তুত হইয়াছেন, কোথাও হস্তসঙ্কলয়িতারূপে পরিচিত আছেন, কোথাও বা তাঁহার নামের শেষে ‘গাথিন’ শব্দের সংযোগ আছে। ঋগ্বেদের সত্যযুগে বিশ্বামিত্র আছেন, আবার রামায়ণের ত্রেতাযুগেও বিশ্বামিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। সূতরাং বিশ্বামিত্র যে এক ব্যক্তি নহেন, তাহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হয়। সে হিসাবে, বেদোক্ত বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ ভিন্ন অল্প বর্ণ হওয়া কোনক্রমেই সম্ভবপর নহে। বেদে, বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণেতর অল্প বর্ণ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার কোনই প্রমাণ দেখা যায় না। তার পর, যে বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন, পুরাণে তাঁহার যে জন্ম-বিবরণ বর্ণিত আছে, তদ্বারা তিনি ব্রাহ্মণ-বীৰ্য্যে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়াই প্রতীত হয়। • যদি অতিরঞ্জিত উপাখ্যান বলিয়া সে পৌরাণিক প্রসঙ্গে কেহ আস্থা-স্থাপন করিতে পরাঙ্মুখ হন, এতৎপ্রসঙ্গে তাঁহাদিগকে আরও একটী কথা বলা যাইতে পারে। বিশ্বামিত্র, কৰ্ম্মবলে, তপঃপ্রভাবে, ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। ইহা তাঁহার কৰ্ম্মফল। পূৰ্ব্ব-জীবনের কৰ্ম্মফলের সহিত ইহাজীবনের প্রবল কৰ্ম্মফল সংযুক্ত হওয়ায়, বিশ্বামিত্র আপন অ-দৃষ্ট প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছিলেন। এক বিশ্বামিত্রই তাহা পারিয়াছিলেন,—আর কেহ তাহা পারেন নাই :—ইহা বিশেষত্ব, ইহা দৃষ্টান্ত-মাত্র ; কিন্তু ইহা প্রচলিত সামাজিক রীতি-পদ্ধতি নহে। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে আরও কত কত ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারিত। তাহা যখন হয় নাই, সেরূপ দৃষ্টান্ত যখন আর খুঁজিয়া পাই না ; তখন, একটী মাত্র বিশেষ দৃষ্টান্তে, কি করিয়া সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি ? বিশেষতঃ, সে বিশ্বামিত্র কখনই তোমার-আমার দ্বায় সাধারণ মনুষ্য ছিলেন না। তিনি অলৌকিক অমাহুষিক শক্তি-সম্পন্ন পুরুষ ছিলেন ; সূতরাং তিনি অলৌকিক ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। তেমন শক্তি-সম্পন্ন যদি কোনও মহাপুরুষ কখনও জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু তাই বলিয়া, বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব-লাভে, শাস্ত্রে বর্ণাশ্রমের বিরুদ্ধবাদ আছে,—ইহা কোনক্রমেই স্বীকার করিতে পারি না। বেদের আর একটী ঋষির কথা উল্লেখ করিয়া, পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন পণ্ডিতগণ বুকাইবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন,—ব্রাহ্মণেতর বর্ণও বৈদিক হস্তের রচয়িতা ছিলেন। তাঁহাদের সে প্রয়াসও বিড়ম্বনা মাত্র। বেদের নবম মণ্ডলের হস্ত-বিশেষের ভাষান্তরে তাঁহারা বলেন,—একজন বেদ-রচয়িতা ঋষি, সোমের আরাধনার সময় বলিতেছেন,—“আমার পিতা চিকিৎসক, মাতা গীতায় শস্ত্র পেষণ করেন ; কিন্তু দেখুন, আমি বৈদিক-মন্ত্র রচনা করিয়াছি।” † ঋষিপ্রবরের এই মাত্র কথার উপর নির্ভর করিয়া, জাতিভেদের প্রতিপক্ষগণ প্রমাণ করিতে চাহেন,—‘ঋষি বর্ণসঙ্কর ছিলেন ; অথচ, তিনি বৈদিক-মন্ত্রের রচয়িতা, সূতরাং ব্রাহ্মণ-পদবাচ্য।’ ইহা বড়ই হান্তকর সিদ্ধান্ত। আমাদের মনে হয়, বৈদিক হস্ত-রচয়িতা ঋষির ঐরূপ উক্তিতে পুরুষাণুক্রমিক বর্ণধর্মেরই প্রাধান্ত

* মহাভারত, শান্তিপর্ক ও অশ্বশাসন-পর্ক, বিশ্বামিত্রের জন্ম-বিবরণ দ্রষ্টব্য।

† নবম মণ্ডলের ১১২শ সূক্ত দ্রষ্টব্য।

প্রতিপন্ন হইতেছে। ঋষি যে ব্রাহ্মণ-সন্তান নহেন, তিনি কোথাও তাহা বলেন নাই। তিনি কেবলমাত্র বলিয়াছেন,—তাহার পিতামাতার জীবিকার কথা। সে হিসাবে, হয় তো তাহার পিতামাতা কোনরূপ পাতিত্য-দোষে দুষ্ট হইতে পারেন; কিন্তু তাহাতে তিনি যে ব্রাহ্মণ-বংশ-সত্ত্ব নহেন,—তাহা কোনমতেই প্রমাণিত হয় না। বরং, এখন যে সকল ব্রাহ্মণ-সন্তান বৃত্তান্তের গ্রহণ করিয়া জীবিকার্জন করিতেছেন, তাহাদের সন্তান-সন্ততির পাতিত্য-দোষ হইতে রক্ষা-প্রাপ্তির পক্ষে ইহা এক দৃষ্টান্ত-রূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে। কসভা, এ দৃষ্টান্ত জন্মগত বর্ণধর্মেরই প্রতিপোষক; ইহা কখনই তাহার অন্তরায়-সাধক নহে। এইরূপ, ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ‘কবষ’ ও ‘লুশ’ ঋষির প্রসঙ্গে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন,—‘তাহারা শূদ্র ছিলেন; অথচ বৈদিক যুক্ত রচনা করিয়া গিয়াছেন।’ এই সম্বন্ধেও, আমাদের সেই একই উত্তর। ‘কবষ ও লুশ’ ঋষি যে শূদ্র ছিলেন, বেদে তাহার কোনই উল্লেখ নাই। অথচ, যেখানে যেখানে বর্ণান্তরের ব্রাহ্মণত্ব-প্রাপ্তির প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়, কোথাও দৃঢ়-ভিত্তির উপর তাহা প্রতিষ্ঠিত নহে। যদ্যদি সংহিতা—বেদের অনুবর্তিনী। সূতরাং যদ্যদি সংহিতায় যদি ঐরূপ কোনও প্রসঙ্গ আছে দেখাইতে পারা যায়, তাহা হইলে বর্ণাশ্রম-বিরোধিগণের উদ্দেশ্য অনেকাংশ সিদ্ধ হইতে পারে। তাই তাহারা, সময়ে সময়ে, মনুসংহিতার একটা শ্লোকের দোহাই দিয়াও বর্ণাশ্রম-ধর্মের মূলে কুঠারাঘাত করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন। তাহারা বলেন,—‘মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ের পঞ্চাশটি শ্লোকে লিখিত আছে,—ব্রাহ্মণের শূদ্র হইবে এবং ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদির ব্রাহ্মণত্ব লাভ হইতে পারে।’ মনুসংহিতায় যে এই মর্মের কোনও প্রসঙ্গ আদৌ নাই, তাহা আমরা কখনই বলি না। তবে সে সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই,—ঐ শ্লোকের পূর্বে ও পরে কি কি বিষয়ের উল্লেখ আছে, এবং সে হিসাবে এই শ্লোকটি সম্পূর্ণ কি না,—তাহা বিবেচনা করিয়া, তৎপরে ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে বোধ হয় ত্রায়সঙ্গত ও সমীচীন কার্য হইত। কিন্তু তাহা না করায় একদেগদর্শিতা—প্রকারান্তরে শ্লোকাকর্ষের অনুবর্তিতা—প্রকাশ পাইতেছে। মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ে যে বর্ণ-সঙ্গের অথবা এক বর্ণের বর্ণান্তর-প্রাপ্তির বিষয় লিখিত আছে, বলা বাহুল্য, প্রোক্ত শ্লোকটি তাহারই অংশ-বিশেষ। সে সকল মিলাইয়া দেখিলে, স্পষ্টতঃই প্রতিপন্ন হয়, শূদ্রাদি বর্ণের যে ব্রাহ্মণত্ব-প্রাপ্তির কথা সেখানে লিখিত আছে, তাহাই সপ্ত জন্মের পরে; * অপিচ, সেরূপভাবে ব্রাহ্মণত্ব লাভ কখনই প্রশংসনীয় বলিয়া গণ্য হয় নাই। আর এক কথা, একটু দৃষ্টিতে দেখিলে দেখিতে পাই, জাতিভেদ-প্রথার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের চেষ্টা করিয়াও কোনও সমাজ এ পর্যন্ত অভীষ্ট লাভ করিতে পারেন নাই। বরং তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন নূতন জাতির (বা সম্প্রদায়ের) সৃষ্টি হইয়াছে। বৌদ্ধগণ এক-জাতি সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার ফলে দাড়াইয়াছিল,—তাহারাই পৃথক হইয়া পড়িয়াছিলেন। এইরূপ, খৃষ্টানগণ, ব্রাহ্মণগণ, বিনিই যখন একাকার বা একজাতি সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছেন, তিনিই তদ্বারা আর এক নূতন জাতির বা নূতন সম্প্রদায়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া

গিয়াছেন মাত্র। অধিক বলিব কি, হিন্দুজাতির অন্তর্ভুক্ত বৈষ্ণব-সম্প্রদায় পর্যন্ত এই হিসাবে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছেন। তার পর, যাহারা ঐ সকল নূতন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়া আছেন, তাঁহারা কি আপনাপন সংস্কার পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছেন ? হয় তো কোথাও কোথাও আহারে ব্যবহারে বা লৌকিকতার তাঁহাদের এক-জাতিত্ব প্রতিপন্ন হইতে পারে ; কিন্তু বিবাহাদি ব্যাপারে, এখনও তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে জাতিগত সংস্কারের ফল বিশেষরূপে প্রত্যক্ষীভূত হয় না কি ? সে সংস্কার—আমরা কোথায় না দেখিতে পাই ? এক-জাতি মধ্যে পরিগণিত হইলেও, পূর্বে যিনি ব্রাহ্মণাদি উচ্চ-বর্ণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তিনি নিঃসঙ্কোচে কখনও চণ্ডালাদি অস্বাক্ষর বর্ণের সহিত বিবাহাদি-সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত হইতে পারেন কি ? হয় তো তিনি তাঁহার দৃষ্টিতে শিক্তি-সভ্য-ভব্য কোনও নীচ জাতির সহিত সম্বন্ধ-স্থাপনে কুণ্ঠিত না হইতে পারেন ; কিন্তু অসভ্য কদাচারী, ব্যক্তির সহিত কখনই তিনি সম্বন্ধ-বন্ধনে আবদ্ধ হইবেন না। আধুনিক বহু সম্প্রদায়ের আচার-ব্যবহার দেখিয়া, অন্ততঃ এই কথাই আমাদের মনে হয়। ফলতঃ, একাকারের পক্ষপাতী হইলেও, সকলেরই মধ্যে জাতিভেদের কঙ্ক-প্রবাহ প্রবাহিত রহিয়াছে। কেবল এ দেশে বলিয়া নহে ;—পাশ্চাত্য ইউরোপেও এ ভাবের অসম্ভাব নাই। যদিও এদেশের সহিত সে দেশের তুলনা হইতে পারে না এবং সে তুলনা করিতেও চাহি না ; তথাপি মোটামুটি দেখিতে পাই,—এক ধর্ম-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইলেও, সেখানকার কোনও অভিজাত ব্যক্তি কখনও কোনও নীচ-বংশীয়ের সহিত সম্বন্ধ-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে চাহেন না ; সময় সময়, এক পংক্তিতে ভোজনেও তাঁহাদের আপত্তি দেখা যায়। কি হিন্দু, কি অহিন্দু, কি আর্য্য, কি অনার্য্য, সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই কোন-না-কোন আকারে এই জাতিভেদ-প্রথার বীজ নিহিত আছে। আর সেই জগুই, জাতিভেদ যে ঈশ্বরের সৃষ্টি, সৃষ্টির আদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহা স্বতঃই মনে হয়। তবে, ভারতের সহিত অন্যান্য দেশের যে পার্থক্য দৃষ্ট হয়, তাহার কারণ,—ভারতবর্ষ সর্বাবয়বসম্পন্ন সভ্যতা লাভ করিয়াছিল, তাই ভারতীয় হিন্দুগণের জাতিভেদ-প্রথার সর্বাদীপ পুষ্টি সাধিত হইয়াছিল। জন্মগত অধিকার-ভেদ—আর্য্য-হিন্দুগণের সেই সর্বাদীন সভ্যতারই পরিচায়ক। আমরা প্রধানতঃ দেখিতে পাই—জন্মগত জাতি-বর্ণানুক্রমে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির উন্মেষ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণাদি উচ্চ-বর্ণের বুদ্ধি-বৃত্তির সহিত নিম্নতম বর্ণের বুদ্ধি-বৃত্তির তারতম্য—কে না লক্ষ্য করিয়াছেন ? কৃষক-পুত্রের কৃষিকার্য্যে সংস্কার আপনিই সঞ্চিত হয় ; কর্মকার, কুস্তকার, স্ত্রোত্র প্রভৃতি বৃত্তি-জীবীদিগের সম্ভান-সম্ভতির উপর বংশানুক্রমিক প্রভাব আপনি আসিয়া পড়ে ; অন্যান্য জাতিবর্ণ-সম্বন্ধেও সেই একই ভাব দেখিতে পাই। ইহাই বংশানুক্রমিক বর্ণ-ধর্মের ভিত্তি। সেই জগুই, ধর্মাস্ত্রের পরিগ্রহ করিয়াও, মানুষ আপন সংস্কার পরিত্যাগ করিতে পারে না। বিপদে বা প্রলোভনে পতিত হইয়া, মানুষ অনেক সময় ধর্মাস্ত্রের গ্রহণ করে ; কিন্তু সর্বদা তাহার পূর্বসংস্কার দূর হয় কি ? তাই দেখিতে পাই, মুসলমান-ধর্ম অবলম্বন করিয়াও, এ দেশের বহু অধিবাসী আজিও হিন্দু-দেব-দেবীর উপাসনার যোগ দেয়।

তাই দেখিতে পাই, যাদ্রাজী খৃষ্টানগণ অনেকেই এখন শিখা ধারণ করে এবং দেবদেবীর পূজা করিয়া থাকে। তাহাদিগের ধারণা,—তাহারা ধর্মাস্ত্রের গ্রহণ করিয়াছে বটে, কিন্তু জাতিত্যাগ করেন নাই। বর্ণ, ব্রাহ্মণ, বিপ্র, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি শব্দ—বেদে একাধিক বার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তৃতীয় মণ্ডলের চতুস্ত্রিংশ সূত্রে বিখ্যাত্তি ঋষি ইন্দ্র দেবতার উপাসনা-স্তোত্রে বলিতেছেন,—“হত্বী দম্মান প্র আৰ্য্যং বর্ণং আবৎ।” ঋগ্বেদের ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য তাহার অর্থ করিয়াছেন,—“হে ইন্দ্র, আপনি দম্মাদিগের বধ-সাধন করিয়া আৰ্য্যবর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতি জাতিকে রক্ষা করুন।” ষাঁহার জাতি-ভেদ মানিতে চাহেন না। তাঁহারা কোশলে উক্ত সূক্তান্তর্গত ‘বর্ণ’ শব্দটিকে একরূপ উড়াইয়া দিবার চেষ্টা পাইয়াছেন বলিলেও অত্যাুক্তি হয় না। তাঁহারা বলেন,—“সায়ণের অর্থ ঠিক নহে; ঋগ্বেদের সময় দুই জাতি ছিল—আৰ্য্যজাতি ও অনার্য্য-জাতি। এখানে ‘বর্ণ’ শব্দে তাহাই বুঝাইতেছে।” * ইহার উপর বাঙালি সম্প্রতি বাহুল্য মাত্র। বেদ-ব্যাখ্যায় ষাঁহার সায়ণের উপর হস্তক্ষেপ করিতে চাহেন, তাঁহাদের স্পর্ধার বলিহারি যাই! বিপ্র ও ব্রাহ্মণ শব্দের অর্থ, তাঁহারা করিয়াছেন—স্তোত্র-রচয়িতা। ক্ষত্রিয়-শব্দের অর্থ করিয়াছেন,—বীর্য্যবান্। অথচ, বেদে যে যে স্থলে ঐ সকল শব্দের প্রয়োগ আছে, তত্তৎস্থলে সায়ণাচার্য্যের অর্থ গ্রহণ করিলে, ঐ সকল শব্দে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণের ভাবই মনে উদয় হয়। সপ্তম মণ্ডলের উননবতি সূক্তে বরুণের উপাসনা আছে। সেই উপাসনায় তাঁহাকে ‘রাজা’ বলা হইয়াছে এবং তিনি ‘সুক্ষত্র’ বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন। সূক্তটা পাঠ করিলে, সেই বরুণ রাজাকে কোনও ক্ষত্রিয় রাজা বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু, পাছে ‘ক্ষত্রিয়’ বর্ণের সৃষ্টির কথা স্বীকার করিতে হয়,—এই জন্ত, পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ ‘সুক্ষত্র’ শব্দের অর্থ—‘বলবান’ করিয়াছেন। * ইহাও বিষয়ের বিষয় নহে কি? যাহা হউক, সায়ণাচার্য্য প্রভৃতির ভাষ্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া, আধুনিক পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন পণ্ডিতগণের স্বকপোল-কল্পিত অর্থ যে কেহ গ্রহণ করিবেন,—তাহা কখনই মনে হয় না। যিনিই যাহা বলুন, ফলে দেখা যায়,—বর্ণ-ভেদ প্রথা বৈদিক কাল হইতেই এদেশে প্রচলিত আছে; এবং ঐ প্রথা এ দেশের প্রকৃতির সহিত মজ্জাগত-ভাবে অবস্থিত।

বেদ হইতেই যে অত্যাুক্ত শাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে, হিন্দুকে তাহা বুঝাইবার আবশ্যক হয় না; অপরও তাহা স্বীকার করিতে পারেন না। যাহা বেদান্তমত—তাহাই শাস্ত্র।

বেদই শাস্ত্র—বেদেরই অভিব্যক্তি মাত্র। বেদ—হৃদয়ের সামগ্রী; বেদ—হৃদয়েই সঞ্চিত ছিল। যতদূর প্রমাণ পাওয়া যায়, বেদ প্রথমে লিপিবদ্ধ হয় নাই; বৈদিক সূক্ত-সমূহ তখন ঋষিগণের হৃদয়ে হৃদয়ে কণ্ঠে কণ্ঠে সংগৃহীত ছিল। পিতা, পুত্রকে সে স্তোত্র কণ্ঠস্থ করাইতেন; পুত্র, প্রপৌত্রকে সে মন্ত্র

* যাজ্ঞমূল্য প্রথমে এই অর্থ (সুক্ষত্র=Almighty) করিয়াছিলেন। তাঁহারই অনুসরণে শ্রীযুক্ত রামেশ্বর দত্ত মহাশয়ও ঐ শব্দে ‘অতিশয় বলবান’ অর্থ গ্রহণ করেন। ‘বর্ণ’ শব্দের পূর্বোক্তরূপ অর্থও বোধ হয়, রামেশ্বর বাবুরই কল্পনা-প্রসূত।

দীক্ষিত করিতেন। * পুরুষানুক্রমে এই ভাবেই বৈদিক স্তোত্র-সমূহ সংসারে চলিয়া আসিতেছিল। বেদের অপর নাম—ঋতি ; শিষ্যানুশিষ্যক্রমে ঋতি-পরম্পরায় চলিয়া আসিয়াছিল,—সেই জগুই বেদের অপর নাম—‘ঋতি’। কালক্ষেত্রে মনুষ্যের শ্রুতি-শক্তির হ্রাস হইতেছে—উপলব্ধি করিয়া, জনহিত-ব্রতধারী ঋষিগণ বেদের হুক্ত-সমূহ লিপিবদ্ধ করিতে আরম্ভ করেন ; এবং তাহারই কিছুকাল পরে, কোন্ হুক্ত কিরূপভাবে যাগ-যজ্ঞ-ক্রিয়াকাণ্ডে ব্যবহৃত হইবে,—তাহা নির্দেশ করিবার জগু, বেদের ব্রাহ্মণ-ভাগের সৃষ্টি হয়। ব্রাহ্মণ-ভাগ—গণ্ডে রচিত। বেদের শাখা-অনুসারে ব্রাহ্মণ-ভাগের সংখ্যাধিক্য ঘটিয়াছিল,—পূর্বেই তাহা বলা হইয়াছে। ব্রাহ্মণ-ভাগকে পরবর্ত্তি-কালে বেদের উপসংহার-ভাগ বলিয়াও কেহ কেহ নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। বেদের ব্রাহ্মণ-ভাগের পর, আরণ্যক ও উপনিষদের নাম উল্লেখযোগ্য। ব্রহ্মচর্য্য-গ্রহণে অরণ্যাশ্রমে বাস করিবার সময়, গুরুর নিকট বেদ-বিষয়ক যে আলোচনা ও শিক্ষালাভ হইত, আরণ্যক-গ্রন্থে তাহাই লিপিবদ্ধ হয়। অরণ্যাশ্রমে উহা সৃষ্টিত হইয়াছিল বলিয়াই, উহার নাম—আরণ্যক। বেদ-সংহিতা পাঠের পর, সেই আরণ্যক অর্থাৎ বেদ-সংক্রান্ত আলোচনা পাঠ করার রীতি ছিল। আরণ্যকেতর পর—উপনিষৎ। কাহারও কাহাও মতে,—আরণ্যক ও উপনিষৎ একই সময়েই রচিত হইয়াছিল। উপনিষৎ শব্দের অর্থ—[উপ+নি+সদ(গমন)+কিপ] সমীপ গমন ; অর্থাৎ যদ্বারা ব্রহ্মের সমীপস্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়, আত্মতাব উপলব্ধি হয়,—তাহাই উপনিষৎ। ব্রাহ্মণ-ভাগ—কর্ম্মকাণ্ড ; উপনিষৎ—জ্ঞানকাণ্ড। ব্রাহ্মণ-ভাগে কর্ম্মকাণ্ড দ্বারা পুণ্যালাভের সার্থকতা প্রতিপন্ন হইয়াছে ; উপনিষদে জ্ঞানের দ্বারা আত্মতত্ত্ব-নিরূপণের বীজ নিহিত আছে। অধুনা উপনিষৎ নামে বহু গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু আদি উপনিষৎ বারখানি বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। তৎসমুদায়, বেদের ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক ভাগের অংশ-মধ্যে পরিগণিত। উপনিষদের পর—দর্শন। দর্শন-শাস্ত্র প্রধানতঃ ছয় ভাগে বিভক্ত এবং ষড়্দর্শন নামে উহা অভিহিত। বেদে যাহার আভাস ছিল ; আরণ্যক ও উপনিষদে যাহার বিবৃতি হইয়াছিল ; দর্শন-শাস্ত্রে তাহারই প্রমাণ-প্রয়োগ প্রদর্শিত হয়। ব্রাহ্মণ-ভাগের অপর অঙ্গ—স্মৃতি। স্মৃতি শব্দের অর্থ—[স্ম (স্মরণ) + তি] পূর্নানুভূতি। বেদে যাহা আছে, মহাদি ঋষিগণের স্মৃতি, তাহারই মর্ম্ম-গ্রহণ করিয়া যে গ্রন্থ রচনা করেন,—তাহাই স্মৃতি। স্মৃতি—সম্পূর্ণরূপ বেদানুবর্ত্তিনী। স্মৃতি-সমূহ—মহাদি-প্রণীত সংহিতা নামে অভিহিত। স্মৃতি এবং দর্শন-শাস্ত্রের প্রণয়ন সম্বন্ধে মতদ্বৈধ দৃষ্ট হয়। অনেকেই বলেন,—দর্শনের পূর্বে স্মৃতি বিরচিত হইয়াছিল। স্মৃতির পর,—পুরাণ, উপপুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি। পুরাণের সংখ্যা—অষ্টাদশ ; উপ-পুরাণের সংখ্যা—অনেকগুলি। বেদ-বিহিত ধর্ম্ম-কর্ম্ম, দৃষ্টান্ত উপদেশাদি দ্বারা জনসাধারণের বোধগম্য করিবার উদ্দেশ্যেই, প্রধানতঃ পুরাণ-পরম্পরা প্রণীত হয়। ইহাতে সময়-বিশেষের আচার-ব্যবহার ক্রিয়া-কলাপ প্রভৃতিরও পরিচয় পাওয়া যায়। এক হইতে যেমন বহুতর পদার্থের উৎপত্তি হইয়া থাকে ; এক বৃক্ষ হইতে যেমন বহুতর বৃক্ষ

* ঋবেদের পঞ্চম মণ্ডলের অষ্টাদশ সূক্তে এই বিষয়ের উল্লেখ আছে।

উৎপন্ন হয় ; এক অগ্নিস্থলিঙ্গ হইতে যেমন বহুতর দীপ-শিখার উদ্ভব হইয়া থাকে ; ঐক বৈদ্য হইতে তদ্রূপ বেদান্ত বেদান্ত প্রভৃতির সৃষ্টি-পরিপুষ্টি সাধিত হইয়াছে ।

ভগবদ্ব্যসরগই—মহুয়ের ধর্ম । সেই অমুসরগের ফলেই - মহুয়ের সমাজ-বন্ধন, মহুয়ের সভ্যতা, মহুয়ের জ্ঞানোন্নতি । যে জাতি যতটুকু পরিমাণে তাহার অমুসরণ করিতে পারিয়াছে, তাহার ধর্ম ততদূর সমুন্নত, তাহার সভ্যতা ততদূর বৈদিক-ধর্মই পারিয়াছে, তাহার ধর্ম ততদূর সমুন্নত, তাহার সভ্যতা ততদূর সকল ধর্মের পরিমার্জিত । আর্য্য-হিন্দুগণ তদ্বিষয়ে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়া আদিভূত ।

আছেন । বেদাদি শাস্ত্র—তাহার জীবন্ত নিদর্শন । এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত জাতি—যত ধর্ম-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে, সকল জাতির সকল ধর্মের সার সামগ্রী—বৈদিক-ধর্মের অন্তর্ভুক্ত আছে, দেখিতে পাই । ফলতঃ, এমন কোনও অবিসম্বাদিত তত্ত্ব এ পর্য্যন্ত কেহ আবিষ্কার করিতে পারেন নাই, বৈদিক-ধর্মে তাহার অন্তিত্ব নাই । পৃথিবীর প্রচলিত ধর্ম-সমূহের আলোচনা করিলে, আমরা কি দেখিতে পাই ? আমরা দেখিতে পাই না কি,—আর্য্য-হিন্দুগণের বৈদিক-ধর্ম হইতেই অত্যাশ্চর্য্য ধর্মের সার-সামগ্রী সংগৃহীত হইয়াছে ? আমরা দেখিতে পাই না কি,—অনেক সামগ্রী দেশ-ভেদে কাল-ভেদে রূপান্তরিত হইয়াছে মাত্র ; কিন্তু সকলেরই মূল—সনাতন আর্য্য-ধর্ম । কোনও এক সময়ে, আর্য্য-হিন্দুগণের আচার-ব্যবহার ও কর্ম-পদ্ধতির সাহিত পৃথিবীর প্রাচীন জাতি-সমূহের অনেকেরই আচার-ব্যবহার এবং কর্ম-পদ্ধতির সামঞ্জস্য ছিল । পুরাতত্ত্বে তাহার ভূয়োভূয় পরিচয় পাওয়া যায় । এখনও ভিন্ন ভিন্ন জাতির ধর্ম-কর্মের ও নীতি-তত্ত্বের অনেক অংশ—আর্য্য-হিন্দুগণের আদর্শের অমুসরণকারী । এক জ্যোতিঃ হইতে যেমন সকল জ্যোতির উৎপত্তি হয় ; অথচ, সেই জ্যোতিঃ-সমূহের কোনটী উজ্জ্বল, কোনটী ক্ষাণপ্রভ, কোনটী বিমলিন হইয়া থাকে ; ধর্মের উৎপত্তি ও বিস্তার সম্বন্ধেও সেই ভাব মনে আসিতে পারে । আর্য্য-হিন্দুগণের আদর্শ বৈদিক-ধর্মের দিব্য-জ্যোতিঃ এককালে দিগ্গমস্তে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল ; এখনও তাহার অংশ-মাত্র কোথাও কোথাও সঞ্চিত আছে ;—আর্য্য-ধর্মের সহিত অত্যাশ্চর্য্য ধর্মের তুলনা করিলে, তাহা বুঝিতে পারা যায় । পৃথিবীর ধর্ম-সমূহের উৎপত্তি ও বিস্তারের বিষয় আলোচনা করিলেও, এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হই । পূর্বে বলিয়াছি,—“পৃথিবীর অধিকাংশ লোক যে ধর্মের অমুসরণকারী, সে ধর্ম—এই ভারতবর্ষেরই ।” তাহা যদি অবিসম্বাদিত-রূপে প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে, প্রোক্ত সিদ্ধান্তে কোনই সংশয় থাকিতে পারে না । সুতরাং, এখন দেখাইতেছি,—পৃথিবীর অধিকাংশ লোক এখনও কি প্রকারে ভারতীয় ধর্মের অমুসরণকারী ! মহুয়ের গণনার যতদূর নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে দেখিতে পাই,—পৃথিবীতে এখন মোটামুটি এক শত কোটি লোকের বসতি আছে । এই এক শত কোটি লোকের মধ্যে তিনগুন কোটি লোক হিন্দু-ধর্ম ও বৌদ্ধ-ধর্মের অমুসরণকারী ; অবশিষ্ট সাতচল্লিশ কোটি লোক অত্যাশ্চর্য্য ধর্মের উপাসক । বলা বাহুল্য, সেই সাতচল্লিশ কোটির মধ্যে—খৃষ্ট-ধর্ম আছে, মুসলমান-ধর্ম আছে, জোরাস্ট্রিয়ানিজম (প্রাচীন পারসীকগণের ধর্ম) আছে, কুডাইজম (মোজেস-প্রবর্তিত ইহুদিগণের ধর্ম) আছে,

আরও কত ধর্ম আছে। কিন্তু যতই বাহা থাকুক, আমরা স্পর্শ-সহকারে বলিতে পারি,—তাহার কোনটাই আদিভূত নহে। কোন্ ধর্মের কোন্ সময় অভ্যুদয় হইয়াছিল,—ইতিহাসে তাহার প্রমাণ-পরম্পরা বিদ্যমান আছে। সে প্রমাণ-পরম্পরা দেখিয়া, কেহই কখনও বলিতে সাহসী হন নাই যে, আর্য্য-হিন্দু-ধর্মের পূর্বে ঐ সকল ধর্মের উৎপত্তি হইয়াছিল। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, খৃষ্ট-ধর্ম, মুসলমান-ধর্ম প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। বৈদিক-ধর্মের কত কাল পরে ঐ সকল ধর্মের উৎপত্তি হইয়াছিল,—কে না তাহা অবগত আছেন? বিশেষ বিশেষ সভ্য-তত্ত্বের আবিষ্কার-সম্বন্ধে আমরা দেখিতে পাই,—প্রথম যে স্থান হইতে তাহা আবিষ্কৃত হয়, প্রাধিক্ত—সেই স্থানেরই পরিকীর্তিত হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য-জাতির মধ্যে ‘সার আইজাক নিউটন’ মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির তত্ত্ব-কথা প্রথম প্রচার করিয়াছিলেন; তাই, মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির আবিষ্কর্তা বলিয়া, তাঁহার নাম দেশে-বিদেশে বিধোষিত। এখন যদি অপর কেহ, নিউটনের কথা না জানিয়াও, মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্ব আবিষ্কার করিলাম বলিয়া প্রচার করেন, কখনই তিনি নিউটনের উচ্চ-আসন লাভ করিতে পারিবেন কি? ধর্ম-প্রচারকগণ সম্বন্ধেও নিঃসংশয়ে সেই কথাই বলিতে পারি। যদি এক ধর্মের কোনও সার-তত্ত্বের সহিত অপর ধর্মের সার-তত্ত্বের সাদৃশ্য লক্ষিত হয়, তাহা হইলে, প্রথমে যে ধর্ম বিদ্যমান ছিল, শেষোক্ত ধর্ম কখনই তদ্বিষয়ে উচ্চ-স্থান লাভ করিতে পারিবে না। নিরপেক্ষভাবে যাঁহারা বিভিন্ন ধর্মের আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই দেখিতে পাইয়াছেন,—বৈদিক-ধর্ম হইতে কিরূপভাবে কোন্ ধর্ম পরিবর্তিত হইয়া আসিয়াছে।* তার পর, খৃষ্ট-ধর্ম, মুসলমান-ধর্ম অথবা ইহুদী ও পারসীকদিগের প্রাচীন ধর্ম প্রভৃতির উৎপত্তি-স্থানের বিষয় আলোচনা করিলেও, ঐ সকল ধর্মে আর্য্য-হিন্দুগণের বৈদিক-ধর্মের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায়। আর্য্যাবর্তের (ভারতবর্ষের) সীমানা, সময়ে সময়ে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়া, নানা স্থানে উল্লেখ দেখিতে পাই। গ্রীক ঐতিহাসিক আরিয়ানের মতে,—‘আরব, পারস্ত, তুরস্ক ও মধ্য-এসিয়ার বহুদূর পর্য্যন্ত এককালে ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত ছিল।’† হিন্দু-সভ্যতার, হিন্দু-গৌরবের—সে এক দিন গিয়াছে। সে দিনের কথা, কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। যদি তাহাই হয়, তৎকালে ঐ সকল দেশে বৈদিক-ধর্মের প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল—ইহা নিঃসন্দেহ। যে দেশ, যে রাজ্য, যে জনপদ, একেবারে ভারতবর্ষের—এমন কি আর্য্যাবর্তের—অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল; সে দেশে, সে রাজ্যে, সে জনপদে, আর্য্য-হিন্দুগণের বৈদিক-ধর্মের প্রাধিক্ত-বিস্তৃতি কখনই অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। যে ধর্ম রাজ্য মাত্র করেন, যে ধর্ম রাজ-ধর্ম, প্রজার মধ্যে অনেকেই সেই ধর্মের অনুসরণ করে,—সকল দেশের সকল ইতিহাসেই তাহা দেখিতে পাই। যখন মুসলমানগণ কোনও দেশ অধিকার করিয়াছিলেন, তখন সে দেশের অনেকেই মুসলমান হইয়াছিল;—অন্ততঃ কতক

* কোন্ ধর্মের উপর কোন্ ধর্মের প্রভাব কিরূপভাবে বিস্তৃত হইয়া আছে; অথবা কোন্ ধর্মের সার-তত্ত্বের সহিত কোন্ ধর্মের সামঞ্জস্য আছে,—স্থানান্তরে তাহার আলোচনা করা যাইবে।

† এই গ্রন্থের “আর্য্যজাতি” শীর্ষক পরিচ্ছেদে ২৩ পৃষ্ঠায় এই বিষয়ের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

মূলমান সে দেশে গিয়া নিশ্চয় বসবাস করিয়াছিলেন। ইংরেজও যখন যে দেশে আধিপত্য-
 বিস্তার করিয়াছেন, সে দেশেরও কতক লোক খুঁটান হইয়া গিয়াছে;—অন্ততঃ কতক খুঁটান
 পে দেশে গিয়া বসবাস করিয়াছেন। এ কথা প্রমাণ করিবার জন্য, অধিক আলোচনার
 আবশ্যক হয় না। এক ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই, এ তথ্য অবগত
 হওয়া যায়। ইহাই মনুষ্যের প্রকৃতি। আর্য্য-হিন্দুগণ যখন দেশ-বিদেশে রাজ্য-বিস্তার করেন,
 তখন তাঁহাদের অনেকে যে সেই সেই দেশে বসবাস করিয়াছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য।
 সুতরাং রাজবর্ষ-রূপে তত্তদদেশে হিন্দু-ধর্মের প্রভাব বিস্তৃত হওয়া কখনই অসম্ভব নহে।
 আর তদন্তই আর্য্য-হিন্দু-ধর্মের শেষ-স্থিতি অনেক প্রাচীন জাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া
 যায়। এই যে দেখিতে পাই,—প্রাচীন পারস্যকগণ অগ্নি-পূজক ছিলেন; তাহাই বা কি?
 তাঁহাদের সেই অগ্নি-পূজা—বৈদিক যাগযজ্ঞেরই অমুসৃতি নহে কি? আরবে, তুরস্কে,
 এশিয়া মাইনরে এবং অন্যান্য স্থানে হিন্দুদিগের আধিপত্য-বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের
 যে প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, ইতিহাসে কত দিন পর্য্যন্ত তাহা দেখিয়া আসিয়াছি।
 কোন্ দেশে সে পরিচয় বিদ্যমান নাই? ইউরোপে, আমেরিকায়, আফ্রিকায়—যেদিকেই
 দৃষ্টিপাত করি, সেইদিকেই সে স্মৃতি ওতঃপ্রোত বিজড়িত আছে। প্রাচীন গ্রীস, প্রাচীন
 রোম, প্রাচীন মিশর,—যে সকল দেবদেবীর পূজা করিতেন, তাহার অধিকাংশই ভারত-
 বর্ষের দেবদেবীর রূপান্তর মাত্র। স্থান-ভেদে, কাল-ভেদে, উচ্চারণ-ভেদে, কোথাও
 কোথাও নামের পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে; কোথাও কোথাও উপাসনা-প্রণালী বিকৃত
 হইয়া গিয়াছে। কাল-বর্ষে একই দেশে কত পরিবর্তন সাধিত হয়! প্রদেশ-ভেদেও একই
 দেশে উচ্চারণের কত পার্থক্য দেখিতে পাই! এই বাঙ্গালারই বিভিন্ন-প্রদেশে, জল-
 বায়ুর তারতম্য-হেতু, একই শব্দের উচ্চারণে কত রূপান্তর ঘটয়া থাকে! সে হিসাবে,
 চট্টগ্রামের সহিত বিক্রমপুরের এবং বিক্রমপুরের সহিত নবদ্বীপের উচ্চারণে এতই তার-
 তম্য দেখা যায় যে, একই শব্দ, উচ্চারণগত পার্থক্যে, অন্য শব্দ বলিয়া প্রতীয়মান হয়।
 একই দেশে, একই সময়ে, যখন এতাদৃশ পার্থক্য বিদ্যমান; তখন, কোন্ দূর অতীতের,
 কোন্ দূর-দেশে, কিরূপ উচ্চারণ-পার্থক্য হওয়া সম্ভবপর,—সহজেই বুঝা যায় না কি?
 সুতরাং আমাদের ‘অগ্নি’, লাটিনে ‘ইগ্নিস’, গ্রীকোনিতে ‘ওগ্নি’-রূপে পরিবর্তিত হইবে,
 তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যুগের পর যুগ চলিয়া গিয়াছে; পরিবর্তনের পর পরিবর্তনের
 স্রাবধিতে সকল পরিচয়-চিহ্ন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে; কিন্তু তথাপি যাহা অবশিষ্ট
 আছে, তাহাই কি উপেক্ষার সামগ্রী? গভীর জলধির অতল-তলে প্রবেশ করিয়া
 অবগাহনকারী ব্যক্তি শুষ্কির সন্ধান লাভ করে; জ্যোতির্বিদ-গণ দূরবীক্ষণ সাহায্যে
 জ্যোতিষ্ক-যন্ত্রণীর দ্বন্দ্ব-তত্ত্ব আবিষ্কার করেন; ঐকান্তিকতার সহিত শাস্ত্র-সমুদ্র মনন
 করিলে, সকল বিষয়েরই স্বরূপ-তত্ত্ব অধিগত হয়। তখন, বুঝিতে পারা যায়,—সকল
 বর্ষের সার-সামগ্রী এক, এবং সেই সামগ্রী বেদের মধ্যেই নিহিত আছে।



চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

বৈদিক-প্রসঙ্গ ।

। বেদে পুরাবৃত্ত,—ইতিহাস কি?—গীবন, কোন্, বাকুলে, ইবারদান প্রভৃতির মতামত,—শাস্ত্রই ইতিহাসের সার-সামগ্রী,—আধুনিক ও প্রাচীনে পার্থক্য,—শাস্ত্র-নিহিত ইতিহাসের বিশেষত্ব;—বৈদিক কালের রাজস্ববর্গ,—দেবরাজ ইন্দ্র এবং তাঁহার সহিত পারসীক ও গ্রীক-দিগের দেবগণের সাদৃশ্য-প্রসঙ্গ,—রাজা হুদাস ও তাঁহার দিগ্বিজয়,—সাহিত্য-সেবার ও ধর্ম-কর্মে তাঁহার উৎসাহ-দান;—বৈদিক-কালের যুদ্ধ-বিগ্রহ, ধর্ম-সংস্থাপন ও প্রজা-রক্ষা,—দম্ভ্য-দমন;—বেদ-বিষয়ক বিবিধ প্রসঙ্গ,—যাত্র, সায়ণাচার্য্য প্রভৃতির বেদ-ব্যাখ্যা,—বৈদিক ধর্ম-সম্বন্ধে পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত,—বেদ-বিষয়ে মতের মত ।]

বেদে যেমন হিন্দুর পারলৌকিক সমাচার প্রাপ্ত হওয়া যায়, উহাতে ইহলৌকিক সমাচারও সেইরূপ নিহিত আছে। বৈদিক-কালের রাজস্ববর্গ এবং তাঁহাদের আচার-ব্যবহার শাসন-প্রণালী প্রভৃতির আভাস, বেদেই দেখিতে পাই। সে বেদে পুরাবৃত্ত । হিসাবে, পক্ষান্তরে, বেদকে পুরাবৃত্ত-ইতিহাসও বলা বাইতে পারে।

তবে, পুরাবৃত্ত বা ইতিহাস শব্দে অধুনা যে সামগ্রীটিকে বুঝাইয়া থাকে, বেদে বা অজ্ঞাত শাস্ত্র-গ্রন্থাদিতে হয় তো ঠিক সেটুকু না বুঝাইতে পারে; কিন্তু ইতিহাসের যাহা সার-সামগ্রী, পুরাবৃত্তের যাহা উপাদানভূত, বেদ বা শাস্ত্র-গ্রন্থে তাহার কিছুই অসম্ভাব নাই। হইতে পারে,—সময়-কাল-নির্দেশে ধারাবাহিক ঘটনাবলীর বা রাজস্ববর্গের বিবরণ উহাতে নাই; হইতে পারে,—দিবা-মান-দণ্ড-নিরূপণে যুদ্ধ-বিগ্রহের বর্ণনাও উহাতে দেখিতে পাওয়া যায় না; হইতে পারে,—বর্তমান ইতিহাসের ভাষাভাসে ও শাস্ত্র-বর্ণিত কাহিনী-কলাপে, আরও শত-পার্থক্য বিদ্যমান আছে; কিন্তু তথাপি বলিতে সাহস করিতেছি,—বেদাদি শাস্ত্র-গ্রন্থ, হিন্দুজাতির ইতিহাস;—একটা সভ্য-সমুদয় জাতির যে ইতিহাস হওয়া উচিত, তাহা সেই ইতিহাস। একথা কেন বলিলাম, তাহা বুঝিতে হইলে, ‘ইতিহাস কি’,—অগ্রে তাহা বুঝিবার প্রয়োজন হয়। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ ইতিহাসের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ নির্দেশ করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গীবন বলেন,—“মহুদ্র-সমাজের দুর্ভাগ্য, পদাঙ্কলন এবং দুষ্ক্রিয়ার ধারাবাহিক-বিবরণীর নাম—ইতিহাস।” গেজো, বাকুলে প্রভৃতি প্রখ্যাত-নামা ঐতিহাসিকগণের মত,—“ইতিহাস কেবল ঘটনাবলীর সমাবেশ মাত্র নহে; কি কারণে কি ঘটনা-স্রোত প্রবাহিত হয়, তাহা নির্ণয় করাই ইতিহাসের মুখ্য উদ্দেশ্য।” প্রসিদ্ধ ফরাসী দার্শনিক কোন্ বলেন,—“চিন্তার তিনটি স্তর আছে। প্রথম স্তরে মহুদ্র জাগতিক ব্যাপার-পরম্পরাকে কোনও এক দৈব শক্তির কার্য্য বলিয়া বিশ্বাস করে। দ্বিতীয় স্তরে সে কার্য্যকে মানুষ বস্তু-বিশেষেরই গুণ বা শক্তি বলিয়া স্থির করিয়া লয়। তৃতীয় স্তরে, মহুদ্র, সেই ঘটনাবলীর বিজ্ঞান-সম্মত কারণ-পরম্পরা নির্দেশ করিয়া থাকে।” * এ হিসাবে, তিন স্তরের ইতিহাস—তিন প্রকার। প্রথম স্তরে, যখন সকল ঘটনাকেই কোনও অচিন্ত্য-শক্তির কার্য্য বলিয়া বিশ্বাস হয়, তখন তখন

* সেই তিন স্তরের নাম—Theological, Metaphysical and Positive or Scientific; অর্থাৎ আধি-দৈবিক, আদিভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক বা বৈজ্ঞানিক ।

তাহাতে অলৌকিকত্বের সমাবেশ করে। প্রাচীন জাতির পুরাণ-পরম্পরা, কৌমুতের বতে, সেই প্রথম স্তরের সামগ্রী। দ্বিতীয় স্তরে, বস্তুগত শক্তির অমুভূতিতে, মানুষ অলৌকিক কল্পনার কথা ভুলিয়া যায়। তখনকার ইতিহাস—শক্তি-সামর্থ্যের ও বীরত্বের কাহিনীতে পরিপূর্ণ হয়। তৃতীয় স্তরে, মানুষ যখন বুঝিতে পারে,—কি কারণে কি ঘটনা সংঘটিত হইল, তখন তাহার ইতিহাস—বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত; প্রকারান্তরে তাহাই তাহার সভ্যতার ইতিহাস। নেপোলিয়ন বলিভেন,—“ইতিহাস—প্রচলিত গল্প মাত্র।” কিন্তু ইমার্সান বলেন,—“যিনি অসংখ্য লোকের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিয়া, তাহাদের আদর্শ বা মূর্তিরূপে বিরাজমান, তাহার চরিত্র-কথা যাহাতে বিবৃত আছে—তাহাই ইতিহাস। ইতিহাসের ভিত্তি—ব্যক্তি-বিশেষের জীবনী। সে হিসাবে, এক সময়ের ইউরোপকে বা ত্রাঙ্গকে ‘নেপোলিয়ন’ সংজ্ঞা প্রদান করিলেও করা যাইতে পারে; যেহেতু, তৎকালে জনসাধারণের শক্তি তাহাতে কেন্দ্রীভূত হইয়া ছিল।” আমরা কিন্তু ইতিহাসকে আর এক নূতন সামগ্রী বলিয়া মনে করি। আমরা বলি,—যাহা লোক-শিক্ষার অমুকুল, অর্থাৎ যদ্বারা মানুষ আপনার জীবনগতি নির্ণয় করিয়া লইতে পারে, তাহাই ইতিহাস। ইতিহাসে অতীতের উজ্জ্বল চিত্র প্রতিকলিত দেখি; ইতিহাসে বর্তমানের ভাব-পরম্পরা বিশদীকৃত হয়; ইতিহাসে ভবিষ্যতের গন্তব্য-পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়। অতীত ঘটনার ফলাফল দর্শনে, বর্তমানকে কিরূপভাবে আয়ত্ত করিতে পারিলে, ভবিষ্যতে সুফল লাভ হয়,—ইতিহাস তাহাই নির্দেশ করে। এই জন্তই ইতিহাস—কখনও দর্শন, কখনও বা বিজ্ঞান নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বেদাদি শাস্ত্রগ্রন্থনিচয়—তাই আর্য্য-হিন্দুগণের সর্বাধার-সম্পন্ন ইতিহাস। জীবনগতি নির্ধারণে মানুষের যাহা কিছু আবশ্যক, যে পথে যে আদর্শের অনুসরণ করিয়া চলিলে শ্রেয়ঃ-লাভ সম্ভবপর,—শাস্ত্র মুণ্ডান্ত দ্বারা তাহাই নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন। আধুনিক ইতিহাসে সদস্য পাপ-পুণ্য উভয় কণ্ঠেরই প্রাধিক্ত-প্রতিপত্তি দেখিতে পাই। কিন্তু শাস্ত্র, লোক-শিক্ষার উপযোগিতা প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে, অসত্যের ন্যূনতা এবং সত্যের প্রাধিক্ত, অধর্ম্মের পরাজয় এবং ধর্ম্মের জয়—এই চিত্র হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিফলিত করিবার জন্ত, তত্পরযোগী উপাদান-সমূহ সংগ্রহ করিয়া লোক-লোচনের সমক্ষে স্থাপন করিয়াছেন। আধুনিক ইতিহাসে এবং শাস্ত্র-নিহিত ইতিহাসে ইহাই পার্থক্য। রাজা কিরূপ প্রজাপালক হওয়া প্রয়োজন, তাহার কিরূপ ত্যাগশীলতা-আত্মোৎসর্গ আবশ্যক,—ক্রীয়াচল, হরিশ্চন্দ্র, দাতাকর্ণ, যুধিষ্ঠির প্রভৃতির শত শত চিত্রে শাস্ত্র সে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতির পতি-ভক্তির আদর্শে সংসার অমুপ্রাণিত হউক; লক্ষণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, অর্জুন প্রভৃতির ভ্রাতৃত্বপ্রেম দেখিয়া জগৎ সৌভাগ্য শিক্ষা করুক; পিতৃভক্তি, স্বজন-প্রীতি, আত্ম-ত্যাগ, বীরত্ব, সত্য-ধর্ম্ম প্রভৃতির আদর্শ-চিত্র নয়নে নয়নে প্রতিভাত থাকুক;—শাস্ত্র তদনুরূপ উপাদান-সামগ্রীই সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন। যাহা অনাবশ্যক, যাহাতে লোক-শিক্ষার কোনও বীজ নিহিত নাই,—শাস্ত্রে তাহা পরিভ্যক্ত হইয়াছে। শাস্ত্র-নিহিত ইতিহাসের ইহাই বিশেষত্ব। আরও এক কথা!—জলোচ্ছ্বাসের প্রবল প্রাবনে নগর-জনপদ ভাসমান

হইলে, সে স্মৃতি অনেকেই বিস্মৃত হইতে না পারেন ; কিন্তু কাল-সাগরের তরঙ্গ-প্রবাহে কত কত জলবুদ্বুদ উখিত হয়, কে তাহা গণনা করিয়া রাখিতে সমর্থ হন ? ঐতিহাসিক ঘটনা-পরম্পরাও অনেকটা সেইরূপ বলিয়া মনে হয়। বর্তমান ইতিহাসে যাহা উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত থাকে, ভবিষ্যতের ঘটনা-পরম্পরার ঘাত-প্রতিঘাতে নিশ্চয়ই তাহার ঔজ্জ্বল্য কিয়ৎপরিমাণে কমিয়া যায়। এইরূপে কমিতে কমিতে, কালক্রমে অত্যাশ্চর্য স্মৃতির চিহ্ন মাত্র অবশিষ্ট থাকে ; সাধারণ ঘটনা-পরম্পরা কেহই আর তখন গণনার মধ্যে আনিতে চাহেন না। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, ভারতে মুসলমান-রাজত্বের ও ইংরেজ-রাজত্বের সেদিনের ঘটনাই উল্লেখ করি না কেন ? মামুদ ঘোরীর ভারতলুণ্ঠন-কাহিনী স্মৃতি-পটে যতটা উজ্জ্বল হইয়া আছে, দাসবংশীয় রুক্মদীন বা নসিরুদ্দীনের কথা কি ততদূর মনে থাকিবে ? পলাশীর যুদ্ধ-কাহিনী, অথবা সিপাহি-যুদ্ধের পর ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা-বাণী যতদূর স্মরণ থাক। সম্ভবপর, রিস্তাশ্বর বা পলিলুরের যুদ্ধ-কথা অথবা সেগোলীর সন্ধি-কথা ইতিহাসে তাদৃশ প্রশস্ত স্থান লাভ করিবে কি ? ফলে, পরবর্ত্তি-কালে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাবলী একে একে ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে অন্তর্হিত হইবে ;— গুরুত্ব অনুসারে প্রসিদ্ধ ব্যাপার-পরম্পরাই ইতিহাসে স্থানলাভ করিবে। কয়েক দিনের কয়েক শতাব্দীর ইতিহাসের পৃষ্ঠা আলোড়ন করিলেই, এই তথ্য সংগৃহীত হয়। সে ক্ষেত্রে, কত কালের—কত কোটি কোটি বৎসরের—আর্য্য-সভ্যতার ইতিহাস, কিরূপে ধারাবাহিক সমস্ত ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনায় সমর্থ হইবে ? বিশেষতঃ, তাহার আবশ্যকতাও উপলব্ধি হয় নাই বলিয়া মনে হয়। যাহা বিশিষ্ট, যাহা সারভূত, যাহা প্রয়োজনীয়,—শাস্ত্র-নিহিত ইতিহাসে তাহাই স্থান পাইয়াছে। ইতিহাস-শব্দের ব্যুৎপত্তি-গত অর্থ আলোচনা করিলেও, অদুনা পাশ্চাত্য-জাতিগণ যাহাকে ইতিহাস বলেন, আমাদের ইতিহাস তাহা হইতে এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সামগ্রী ছিল। তাহাতে, ইতিহাস-শব্দে [ইতিহ (পরম্পরাগত উপদেশ) + অস্ (হওয়া) + অ] যাহাতে পরম্পরাগত উপদেশ আছে—তাহাই বুঝাইয়া থাকে। মহাভারতে ইতিহাসের সংজ্ঞা নির্দিষ্ট হইয়াছে,— “যাহাতে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের উপদেশসহ পূর্ব-রক্তান্ত বর্ণিত আছে, তাহাই ইতিহাস।” * সে হিসাবে, শাস্ত্রমাত্রকেই প্রকারান্তরে ইতিহাস বলা বাইতে পারে। বেদ—সেই ইতিহাসের আদিভূত। বেদ—হিন্দুর পুরাণস্তু।

কিন্তু সেই পুরাণভেদে—বেদে—প্রাচীন রাজত্ববর্ণের ও আচার-ব্যবহারের কি পরিচয় প্রাপ্ত হই ? বলিয়াছি তো, ধারাবাহিক ঐতিহাসিক ঘটনাবলী বেদাদি শাস্ত্র-গ্রন্থে নিবদ্ধ হয় নাই।

বৈদিক-কালের
রাজত্ববর্ণ।

প্রাচীন কালে অল্প কোনও আকারে ইতিহাসের অস্তিত্ব হয় তো বিদ্যমান ছিল। কিন্তু যুগ-যুগান্তরের বিপ্লব-বিবর্তনে তৎসমুদায় লোপ পাইয়া গিয়াছে। বেদ কণ্ঠে কণ্ঠে অবিস্তীর্ণ ছিল বলিয়া, উহার অস্তিত্ব লোপ পায় নাই। আর সেই জন্তই মনে হয়, বেদে ইতিহাসের সারভূত কয়েকটি তথ্যের উল্লেখ

* “ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামুপদেশসম্বন্ধিতং।

পূর্ববৃত্তকথায়ুকনিতিহাসং প্রচকডেহ।”

ব্যতীত বিশেষ ঐতিহাসিক তত্ত্ব অন্য কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। বেদে যে সকল রাজত্ববর্ণের নাম উল্লেখ দেখিতে পাই, তন্মধ্যে দেবরাজ ইন্দ্র প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছেন। তিনি কখনও বজ্র-অস্ত্র গ্রহণ করিয়া দম্বাদিগের সংহার-সাধন করিতেছেন; তিনি কখনও দেবতাদিগের রক্ষা-কার্য্যে ব্রতী রহিয়াছেন; তিনি কখনও পূজা-উপচার প্রাপ্ত হইতেছেন। ঋগ্বেদের অধিকাংশ স্তোত্রেই দেবরাজ ইন্দ্রের গুণ-কীর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়। ইন্দ্রের সহিত রত্নাসুরের ঘোর যুদ্ধ এবং তৎসংক্রান্ত বহু বিবরণ বেদে বর্ণিত আছে। সেই বর্ণনা হইতে কেহ কেহ স্থির করিয়াছেন,—“রত্ন বা অহি বেদের নামান্তর যাত্র। ইন্দ্র বজ্র দ্বারা মেঘকে আঘাত করিয়া বৃষ্টি-বর্ষণ করিয়াছিলেন, রত্নাসুর-বধ-বর্ণনায় তাহাই উপলব্ধি হয়। পুরাণাদিতে রত্নাসুর-বধের যে উপাখ্যান বৃষ্টি হয়, এই রূপক হইতেই তাহার উৎপত্তির সম্ভাবনা।” * মতান্তরে দেখিতে পাওয়া যায়,—“বাবিলন-নগরে সেমিটিক-জাতীয় এক প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। ইন্দ্র ঘোর যুদ্ধে তাঁহাকে পরাজিত করেন। সেই হইতেই রত্নাসুর-বধের উপাখ্যান চলিয়া আসিতেছে।” পারসীকগণের ‘জেন্দ আভেস্তা’ গ্রন্থেও উক্ত ঘটনার আভাস পাওয়া যায়। ‘জেন্দ আভেস্তার’ বৃত্তকে ‘বেরেথু’ এবং ইন্দ্রকে ‘বেরেথুয়’ (রত্নর) বলিয়া উল্লিখিত আছে। বেদে যে রূপ ইন্দ্রের মহিমা পরিকীর্ত্তিত; ‘জেন্দ আভেস্তার’ অন্তর্গত ‘বহ্মার বহং’ অংশ তদ্রূপ বেরেথুয়ের স্তুতিবাদ-পরিপূর্ণ। বৃত্তের ‘অহি’ নামের আভাসও ‘জেন্দ আভেস্তার’ পাওয়া যায়। এই জন্ত বেদের ‘ইন্দ্র’ এবং জেন্দ আভেস্তার ‘বেরেথুয়’কে পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের অনেকেই এক ব্যক্তি বলিয়া নির্দেশ করেন। প্রাচীন গ্রীকদিগের ‘জিয়স’ দেবতার সহিতও অনেকে ইন্দ্রের তুলনা করিয়া থাকেন। ইন্দ্রের ন্যায় জিয়সও দেবতাদিগের রাজা ছিলেন; ইন্দ্রের ন্যায় জিয়সও বজ্র ধারণ করিতেন। মানব-দমনে ইন্দ্রের সাহায্যার্থ মহর্ষি দধীচির পবিত্র অস্ত্র লইয়া বিশ্বকর্মা যে রূপ বজ্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন, আর সেই বজ্রে ইন্দ্র যেমন রত্নাসুরকে হনন করিয়াছিলেন; গ্রীকদিগের ‘জিয়স’-সদৃশেও তদ্রূপ উপাখ্যান প্রচলিত আছে। জিয়সের পুত্র ‘হিফেইস্,’ পিতার যুদ্ধের জন্য বজ্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন, এবং তাহাতে ‘টিটান’-কুল নির্মূল হইয়াছিল। গ্রীকদিগের ‘আপোলো’ দেবতার সহিতও অনেকে ইন্দ্রের সামঞ্জস্য দেখাইবার চেষ্টা পাইয়াছেন। † ইন্দ্রের ন্যায় আপোলোর সুরবর্ণ-নির্মিত তুবীর ছিল। ‘আপোলো’ সুর্য্যের ন্যায় মেঘ হইতে বৃষ্টি উৎপাদন করিতেন, এবং তদ্বারা পৃথিবীর উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধি পাইত। ইন্দ্রের ন্যায় গ্রীক-দেবতা ‘ফোরেবসের’ কণা ছিল; ইন্দ্রের ন্যায় তাঁহাদের

* ব্যাক্সমুলার বলেন,—“বেদের এই রত্নাসুর বধ হইতেই হোমারের ইলিয়ড-গ্রন্থে ট্রয়-যুদ্ধের কল্পনা। বেদের সরমা—ট্রয়-যুদ্ধের হেলেন (Helen), বেদের পণিগণ (Pannis)—ট্রয়ের পারিস (Paris) নাম পরিগ্রহ করাই সম্ভবপর।” হানান্তরে আমরা এ বিষয়ের আলোচনা করিব।

† গ্রীকদিগের জিয়স (Zeus) লাতিন ভাষার জুপিটার (Jupiter) নামে অভিহিত। টিটান (Titan) আপোলো (Apollo), ফোরেবস (Phoebus), হেলস্ (Helos) প্রভৃতির বিবরণ যে কোনও ইংরেজী অভিধান দেখিলেই জানিতে পারা যাইবে।

‘হেলিয়স’ দেবতা অধিময় রর্বে পরিভ্রমণ করিতেন ;—এইরূপ নানা বিষয়ে ইজের সহিত গ্রীক-দেবতাদিগের সাদৃশ্যের কথা উল্লিখিত হইয়া থাকে । ইজের হতী—ঐরাবত ; ইজের অশ্ব—উচ্চৈঃশ্রবা ; ইজের পুরী—অমরাবতী ; ইজের উদ্ভান—নন্দন ; ইজের প্রাসাদ—বৈজয়ন্ত ; ইজের পত্নী—শচী ; ইজের পুত্র—জয়ন্ত । এ সকলের সহিতও গ্রীকদিগের অনেক দেবতার ঐশ্বর্য্য-সম্পদের সাদৃশ্য দেখা যায় । এই সকল দেখাইয়া, ইজের সহিত পারসীক-দিগের এবং গ্রীকদিগের দেবদেবীর একত্ব-প্রতিপাদনে অনেকে প্রয়াস পান । তাঁহাদের সহিত আমরা অবশ্য এক-মত হইতে পারি না । প্রাচীন আর্য্য-হিন্দুগণের দেবরাজ ইজের মাহাত্ম্য-কথা চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, আর তাহা হইতেই অন্যান্য জাতি আপনাপন দেবদেবীর আদর্শ গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন,—এই সকল সামঞ্জস্য তাহাই বরং মনে হইতে পারে । দেবরাজ ইজের পর, যে সকল নরপতির প্রসঙ্গ বেদে উল্লেখ দেখিতে পাই, তন্মধ্যে ‘রাজা সুদাস’ সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন । স্বয়ং ইজ সুদাসকে অনেক সময় সাহায্য করিয়াছিলেন । প্রধানতঃ সেই বলে বলীয়ান হইয়া, রাজা সুদাস বহুদেশে আপন বিজয়-পতাকা উড্ডান করেন । ‘ঐতরেয় ব্রাহ্মণে’ লিখিত আছে,—রাজা সুদাস সমগ্র পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন । ঋগ্বেদে সুদাসের যে বীরত্ব-কাহিনীর পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে সুদাসকে অদ্বিতীয় বীর বলিয়া মনে হয় । অহু এবং ক্রতু নামক দুই বীরের অধিনায়কত্বে এক সময়ে যষ্টিশত এবং ষটসহস্র বড়খিক যষ্টিসংখ্যক যোদ্ধা, রাজা সুদাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছিল । কিন্তু সুদাস তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়াছিলেন । সুদাসের এই বীরত্ব-বর্ণনা—ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলের অষ্টাদশ স্তোত্রে দেখিতে পাওয়া যায় । এক সময়ে রাজা সুদাস দশ জন স্বাধীন নৃপতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন বলিয়া, বেদে উল্লিখিত আছে । সুদাসের একটী প্রধান প্রতিষ্ঠার পরিচয়—তিনি সাহিত্য-সেবী কবিগণের উৎসাহদাতা ছিলেন । বসিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্রের বংশধর কবিগণ তাঁহার নিকট যে উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, নানা স্থানে তাহা বর্ণিত আছে । এক সময়ে কবি ত্রিংশু বা বসিষ্ঠ, রাজা সুদাসের নিকট দুই শত গাভী, দুইখানি রথ, চারিটি অশ্ব এবং বহু স্বর্ণালঙ্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । অন্যান্য কবিগণও রাজা সুদাসের নিকট সর্বদা বিবিধ প্রকার উপকার প্রাপ্ত হইতেন । ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলে অষ্টাদশ স্তোত্রের ষাণ্মিংশ ও ত্রয়োবিংশ শ্লোকে মহর্ষি বসিষ্ঠ সুদাসের গুণ-গাথা কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন । কেবল বসিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের বংশধরগণকে বলিয়া নহে ;—বিভ্রা এবং ধর্ম্মকার্য্যে উৎসাহ-দানের জন্য রাজা সুদাস সর্বদাই অর্থ-সাহায্য করিতেন । তিনি প্রজাপালক, তিনি অতিথিবৎসল ছিলেন । সুদাসের পিতার নাম—দ্বিবোদাস (পিজবন) ; তাঁহার পিতামহ ছিলেন—রাজা দেববান । সুদাসের ন্যায় আরও বহু রাজার বিবরণ বেদে নিবদ্ধ আছে ;—কোনও নৃপতি দূরদেশে অধিকার-বিস্তারে ত্রস্তী আছেন, কোনও নৃপতি যজ্ঞকার্য্য সমাপন করিতেছেন, কোনও নৃপতি সংকর্ণ-প্রভাবে রাজর্ষি আখ্যা প্রাপ্ত হইতেছেন, কোনও নৃপতি প্রজাপালনে যশোদাম্বান লাভ করিতেছেন । সেই প্রসিদ্ধ রাজগণের মধ্যে তুর্নসু, অঙ্গদশু, বহু, তুর্নোতি, বৃহদ্রথ, গুরু, বরুণ, অতিথি, ঋজিষ্ঠান, সুপ্রবা, তুর্ধ্যবান, কুৎস,

আরু মর্য্য প্রভৃতির নাম পুনঃপুনঃ উল্লিখিত আছে। কোনও রাজা একচ্ছত্র সম্রাট-পদ লাভ করিয়াছিলেন ; কোনও রাজা করদ-মিত্র রাজ্য-মধ্যে পরিগণিত ছিলেন।

রাজা সুদাস প্রভৃতির সময়-প্রসঙ্গে বৈদিক কালের যুদ্ধ-প্রণালীর বিষয় অভিজ্ঞতা লাভ হয়। তখনও রাজস্ববর্ণ, সুসজ্জিত হস্তী ও অশ্ব প্রভৃতি লইয়া, পাত্র মিত্র সহ, মহা সমারোহে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইতেন। তখনও, বর্ষ শিরদ্বাণ এবং বৈদিক-কালের যুদ্ধ-বিগ্রহ। তরবারি প্রভৃতি ব্যবহৃত হইত। তখনও রণবাঘ, ভেরি এবং পতাকা প্রভৃতির প্রচলন ছিল। তখনকার দেবরাজ ইন্ড্রের বজ্র—এখনকার

গোলাগুলি কামান প্রভৃতিকেও উপেক্ষা করে না কি ? তখনকার তীর-পরিচালনার কি অপূর্ণ চিত্র দেখিতে পাই ! তীরই কত প্রকারের ? কোনও তীর অগ্নি উল্গারণ করে ; কোনও তীর হইতে বিষ উল্গারণ হয় ; কোনও তীরের অগ্রভাগে তীক্ষ্ণ-ধার লোহময় শলাকা ; কোনও তীরে সুতীক্ষ্ণ হরিণ-শৃঙ্গ বিরাজমান। * এক্ষণে একটা যুদ্ধের ভীষণতাই কি ভয়ানক ! রাজা সুদাস, একটা যুদ্ধে বৃষ্টি সহস্রাধিক শত্রু-সৈন্যকে ভূতল-শায়ী করিয়াছিলেন। বীরবর কুংস, দম্যুগণের সহিত যুদ্ধে তাহাদের পঞ্চাশ সহস্র সৈন্য নিহত করেন। ইন্ড্রের এক দিনের একটা যুদ্ধে সহস্রাধিক পাঁচ লক্ষ শত্রু-সৈন্য প্রাণদানে বাধ্য হয়। † এইরূপ আরও কত কত যুদ্ধের কত কত লোমহর্ষণ কাহিনী বেদে বর্ণিত আছে। সে তুলনায়, কোথায় লাগে—বর্তমান অনলবর্ষী কামানের ভীষণতা ! সে তুলনায়, কোথায় লাগে—শত্রু-সংহারে বর্তমান বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া ! সমর-প্রাঙ্গণে কামানের ব্যবহার এবং ক্ষিপ্তগতিতে শত্রু-সংহার,—যাঁহার সভ্যতার পরিচয়-চিহ্ন বলিয়া মনে করেন, ঋগ্বেদের কোন স্মরণাতীত যুগের ইতিহাস, তাঁহাদিগকে সে দৃশ্য দেখাইতে পারে ! তবে এখনকার যুদ্ধে ও তখনকার যুদ্ধে পার্থক্য কি কিছুই নাই ? পার্থক্য অবশ্যই আছে। প্রধান পার্থক্য—উদ্দেশ্যগত। তখনকার যুদ্ধের উদ্দেশ্য ছিল—ধর্ম্ম-রক্ষা, প্রজারক্ষা ; আর এখনকার যুদ্ধের উদ্দেশ্য—আত্মপ্রাধান্ত-রক্ষা। তখনকার রাজস্ববর্ণ প্রধানতঃ ধর্ম্মদ্রোহী সমাজদ্রোহী দম্যুর বিরুদ্ধেই যুদ্ধযাত্রা করিতেন ;—প্রজাগণের মঙ্গলের জন্য, ধর্ম্ম-সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে, বত কিছু যুদ্ধ সজ্জাটিত হইত ; কিন্তু এখনকার যুদ্ধ প্রায় স্তলেই স্বার্থসিদ্ধি-মূলক অথবা অভিসান-সজ্জাত। হুংঘের বিষয়, আমাদের দেশের কোনও কোনও পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন পণ্ডিত, আর্য্য-হিন্দুগণকে কোনও এক অভিনব দেশের আগন্তুক বলিয়া মনে করিয়া লইয়া, এই যুদ্ধ-বচনা-সমূহকে অন্ত রঙে রঞ্জিত করিয়াছেন ! তাঁহারা বলেন,—“আর্য্য ও অনার্য্যের এই যুদ্ধের সহিত স্পেনীয়গণের আমেরিকা অধিকারের তুলনা করা যাইতে পারে। স্পেনীয়গণ আমেরিকায় গিয়া আমেরিকার আদিম

* ঋগ্বেদের চতুর্থ মণ্ডলের চতুর্থ সূক্তে সুসজ্জিত গজস্বাক্ষর রাজার যুদ্ধ-গমনের দৃষ্টান্ত আছে। ‘ঐরাবত’ হস্তী এবং ‘উল্লৈঃশ্রবা’ ও ‘দধিরা’ (চতুর্থ মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তে) প্রভৃতি অশ্ব তৎকালে কি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। বর্ষ মণ্ডলের ১৫ সূক্তে বোটক ও ধর্ম্মরূপ প্রভৃতির বিশদ বর্ণনা দৃষ্ট হয়।

† সপ্তম মণ্ডলে ১৮শ সূক্তে সুদাসের এবং চতুর্থ মণ্ডলের ১৬শ ও ২৮শ সূক্তে কুংসের ও ইন্ড্রের শত্রু-সংহার বিষয় লিখিত আছে।

অধিবাসিগণকে যেরূপ নিৰ্দ্ধূল করিয়াছিল, আৰ্য্যগণও ভারতে আসিয়া ভারতীয় অনাৰ্য্য-জাতির তদ্রূপ মূলোচ্ছেদ করিয়াছিলেন। আৰ্য্য ও অনাৰ্য্যের যুদ্ধ-ব্যাপারে তাহাই প্রতীত হয়।” এ বিষয়ে অধিক আলোচনা নিম্নায়োজন। যেহেতু, আমরা পূৰ্বেই প্রতিপন্ন করিয়াছি,—আৰ্য্য-হিন্দুগণ এদেশেরই অধিবাসী, তাহারা কখনই অন্য দেশের আগন্তুক নহেন। বেদে যে সকল ধৰ্ম্মপ্রোহী ও সমাজপ্রোহী দম্ভ্যর বিবরণ লিখিত আছে, তন্মধ্যে কুবব, অযু এবং কৃষ্ণ-নামা দম্ভ্য বিশেষ প্রসিদ্ধ। প্রথমোক্ত দম্ভ্যর প্রধানতঃ সিফা, অঙ্গসী, কুলিশী ও বীরপত্নী নদী-সমূহের নিকটস্থিত বহু-প্রদেশে বসবাস করিত; এবং একটু সুযোগ বুঝিলেই দলবলসহ নগর-গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়া গৃহস্থগণের সৰ্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিত। কৃষ্ণ-নামা দম্ভ্য অংগমতী নদীর তীরে অবস্থিতি করিত; তাহার দলে দশ সহস্র সৈন্য সৰ্ব্বদা সুসজ্জিত থাকিত। ঐ সকল দম্ভ্যর উপদ্রবে নিরাহ জনসাধারণ বড়ই উভ্যক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহা ঐ দম্ভ্যদলের সংহার-সাধন করেন। কেবল দম্ভ্যদল বলিয়া নহে,—আৰ্য্য-রাজগণের মধ্যেও তাহারা ধৰ্ম্মাচারবিরোধী ও অবিমুখকারী ছিলেন, ইহা তাহাদিগেরও যথোপযুক্ত দণ্ডবিধান করিয়াছিলেন। সরযু-নদীর তীরের যুদ্ধে ইহাদের হস্তে অৰ্ণ ও চিত্রব্রথ নামক আৰ্য্য-নরপতিদ্বয় নিহত হন। প্রজাপালক রাজা দিবোদাসকে ইহা শতসংখ্যক প্রস্তরনির্মিত পুরী দান করিয়াছিলেন। তিনি কুষবাচকে নিহত করিয়া দুৰ্য্যোনি রাজাকে রাজ্য দিয়াছিলেন; এবং অনাৰ্য্য-জাতীয় নববান্ধ ও বৃহদ্রথকে নিহত করিয়া আৰ্য্য-রাজগণকে সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন। ইহা কর্তৃক বহু অবাধ্য ব্যক্তি বহুজনের বশতা-স্বীকারে বাধ্য হইয়াছিল।* এক কথায়, দেশপতি সম্রাট যেরূপ হুষ্টির দমন ও শিষ্টির পালন করেন, তিনি যেরূপ দুৰ্জিনীত করদ রাজাকে সিংহাসন-চ্যুত করিয়া আশ্রিত অমুগত ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসাইয়া থাকেন,—এই সকল ঘটনা-পরম্পরা দর্শনে, তাহাও সেই বৈদ্যাক্ত কালেরই অনুসরণ বলিয়া মনে হয়।

বেদ-বর্ণিত সময়ের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই,—তখন অধিকাংশ লোকই ধৰ্ম্ম-পরায়ণ, সত্যবাদী ও জিতেজয়ী ছিল। এক দম্ভ্য-

ভীতি ভিন্ন তাহাদের অপর কোনরূপ কষ্টের কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। পৃথিবী ধনধান্তে পরিপূর্ণ ছিলেন; হুৰ্ভিক্ষ বা অন্নকষ্টের বিতীৰ্ণিকা

বেদ-বিষয়ক
বিবিধ প্রসঙ্গ।

কদাচিত্ উপস্থিত হইত; ক্রিয়া-কৰ্ম্ম বাগ-যজ্ঞের প্রভাবে ধৰ্ম্মিগণ

দেবরোষ নিবারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তখন, রাজ্য-শাসনের সুব্যবস্থা ছিল; প্রজাপুঞ্জের সুখ-সাধনেই রাজা নিরত নিরত থাকিতেন। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতিতে শস্যহানি, অথবা অকাল-বার্ধক্য অকাল-মৃত্যুর কথা আদৌ শুনা যাইত না। কুবকেরা কুবিকার্য্যে নিযুক্ত থাকিত; বৈশ্বগণ বাণিজ্য-ব্যবসারে, ক্রত্বিগণ শাস্তি-রক্ষায় এবং ব্রাহ্মণগণ ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সৰ্ব্ববিধ মঙ্গল-কামনায় ঈশ্বরপ্রার্থনার ত্রতী থাকিতেন।

* কুবব, অযু ও কৃষ্ণ দম্ভ্যর বিবরণ যথাক্রমে প্রথম মণ্ডলে ১০৪ সূক্তে এবং সপ্তম মণ্ডলে ২৬ সূক্তে দেখিতে পাওয়া যায়। দুৰ্য্যোনি রাজার বিবরণ প্রথম মণ্ডলের ১১৪ সূক্তে এবং নববান্ধদির ও ব্রহ্মদ্রথ ব্যক্তির বশতা-স্বীকার-প্রসঙ্গ দশম মণ্ডলের ৪২ সূক্তে দ্রষ্টব্য।

তখনও, সৌষ্ঠব-সম্পন্ন গ্রাম-নগর ছিল ; ইষ্টক-প্রস্তরাদি দ্বারা অট্টালিকা নির্মিত হইত ; গতিবিধির সুবিধার জন্য সুপরিসর রাজপথ ছিল ; দুরারোহ পর্বত-শৃঙ্গে আরোহণের নিমিত্ত সুগম পথ প্রস্তুত হইত ; অশ্বযোজিত শকট, নৌকা, অৰ্ণবপোত এবং অগ্নিযানাদির কিছুই অভাব ছিল না। তৎকালে, বাণিজ্য-বাপদেশে, রাজ্যাধিকার-উদ্দেশ্যে, আৰ্য্যগণ দেশে-বিদেশে গমন করিতেন ; দূর সমুদ্র-পথেও তাঁহাদের গতিবিধির অবধি ছিল না। * উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে ধাতু, যব, কলাই, তিল এবং নানাবিধ ফলমূলের উল্লেখ দেখা যায়। স্বত, হুন্ধ, পায়স, পিষ্টক প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্যের কিছুই অভাব ছিল না। আৰ্য্যগণ ‘সোমরস’ পান করিতেন ও দেবতাদিগকে ‘সোমরস’ দান করিতেন বলিয়া উল্লেখ আছে ; কিন্তু সেই ‘সোমরস’ যে কি, এখন তাহা কোনপ্রকারেই নির্ণীত হয় না। কেহ কেহ বলেন,—“চন্দ্র-দেব ‘সোম’-নামে এবং চন্দ্রের স্মৃতি ‘সোমরস’ নামে অভিহিত হইত।” কাহারও কাহারও মতে,—“সোমরস, সিন্ধি-পত্রের রসের তায় ; আৰ্য্যগণ এবং তাঁহাদের দেবতারূপে সেই রস পান করিতেন।” সে হিসাবে তাঁহারা সোমরসকে মাদক-সামগ্রী বলিয়াই মনে করেন। বৈদিক কালের আর আর আচার-ব্যবহারের মধ্যে দেখিতে পাই,—তৎকালে পণ্ডবলি প্রচলিত ছিল, এবং আৰ্য্যগণের কেহ কেহ পশুদির মাংস ভক্ষণ করিতেন। এখনও পশ্চিমাঞ্চলে কূপ হইতে জল তুলিয়া সময়ে সময়ে যেরূপ ভাবে চাষ-আবাদ করা হয়, ঋগ্বেদের সময়েও কোথাও কোথাও সে প্রথা প্রচলিত ছিল। কোথাও কোথাও ঘোটকের দ্বারা চাষ-আবাদ হইত বলিয়াও প্রমাণ পাওয়া যায়। সত্য আৰ্য্য-হিন্দুগণ তখন সংস্কৃত-ভাষায় কথাবার্তা কহিতেন ; অসত্য অনার্য্যগণ অনার্য্য-ভাষায় মনোভাব ব্যক্ত করিত। তবে সে ভাষা এখনকার ভাষা হইতে যে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। বৈদিক-ভাষার সহিত পরবর্ত্তি-কালের সংস্কৃত-ভাষার প্রায়ই ঐক্য নাই। বর্ত্তমান-কালের সংস্কৃত-ভাষা ব্যাকরণের নিয়মালুবর্ত্তী। কিন্তু বৈদিক-ভাষা সে ব্যাকরণের নিয়মাবলী নহে। ভাষার গতি দিন দিনই পরিবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে। সুতরাং বেদের অর্থ-পরিগ্রহ দিন দিনই দুঃসাধ্য হইয়া আসিতেছে ;—বিকৃত অর্থ প্রবর্ত্তিত হইতেছে। সেই অর্থ-বিপর্যায়-হেতু, আৰ্য্য-হিন্দুগণের প্রাচীন আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, ধর্ম-কর্ম সম্বন্ধেও ভ্রান্তমতের প্রচলন হইয়াছে। প্রথমতঃ, শব্দার্থের কতই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তখন যে শব্দে যে অর্থ উপলব্ধি হইত, এখন সে শব্দের অর্থান্তর দেখিতে পাই। দ্বিতীয়তঃ, পদার্থাদির নাম কতই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তখন যে পদার্থ যে নামে পরিচিত হইত, এখন সে পদার্থের সে নাম প্রায়ই অন্য আকার ধারণ করিয়াছে। তৃতীয়তঃ, বাক্য-সমাবেশেও বহু পার্থক্য দৃষ্ট হয়। তখন যে বাক্য যে ভাবে অবস্থিত হইলে যে অর্থ প্রত্যুত হইত, এখন সে বাক্যে সে অর্থ প্রায়ই উপলব্ধ হয় না। সুতরাং তখন যে ঋকের যে অর্থ হইত, এখন সে ঋকের সে অর্থ প্রতিপাদন করা বিশেষ আয়াস-সাপেক্ষ। সেইজন্য বেদ-ব্যাখ্যায় এখন পরবর্ত্তী শাস্ত্রের সাহায্য

* ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে ১১৬শ সূক্তে দেখিতে পাওয়া যায়,—রাজর্ষি ‘ভূত্র’ আপন পুত্র ভূত্ব্যকে সসৈন্তে সমুদ্র-পথে দিবিজয়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন। চতুর্থ মণ্ডলের ৫৫ সূক্তে দেখিতে পাই, ধনদাত্ত্বকু ঋগ্নিকগণের সমুদ্র-যাত্রার বিবরণ উল্লিখিত আছে।

আবশ্যক ; সেইজন্য, বেদ-ব্যাখ্যায় এখন নিরুক্তকার ভাষ্যকার প্রভৃতির পদাঙ্ক অমুসরণ করিতে হয়। আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি,—বেদ কিরূপে বংশ-পরম্পরায় পুরুষাত্মক্বে চলিয়া আসিয়াছে। আমরা আরও দেখিয়াছি,—বেদব্যাংস ও অর্থর্ব ঋষি কিরূপে বেদ-বিতাগ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সময় কোন্ ঋকের কিরূপ অর্থ প্রচলিত ছিল, যদি কেহ তাঁহাদের গ্রন্থ-সমুদ্রে অবগাহন করিতে পারেন, তিনিই সে অর্থ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। কিন্তু সকলের পক্ষে সে শাস্ত্র-সমুদ্রে-মহন সম্ভবপর নহে ;—সেই জন্য সাধারণতঃ যাক্বের নিরুক্ত এবং সায়ণাচার্য্যের ভাষ্য অমুসারেই অধুনা বেদের ব্যাখ্যা হইয়া থাকে। নিরুক্ত—বেদাঙ্গ-গ্রন্থ বিশেষ ; বেদান্তর্গত দুইরূপ শব্দের ব্যাখ্যা নিরুক্তে লিখিত আছে। যাক্বের নিরুক্তই এখন প্রচলিত। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অমুমান করেন,—“মহামুনি যাক্বে খৃষ্ট-জন্মের পূর্ববর্তী পঞ্চম শতাব্দীতে বিচরমান ছিলেন।” কিন্তু যাক্বেই যে প্রথম নিরুক্তকার, তাহা নহে। তাঁহার পূর্বে বেদ-ব্যাখ্যাতা অত্যাশ্চর্য্য নিরুক্তকার বর্তমান ছিলেন, যাক্বের গ্রন্থেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। শাকপুর্নি (শাকপুণি), উর্ণনাভ (উর্ণনাভ) স্থালাষ্টিবি (স্থলোষ্টিবি) প্রভৃতি নিরুক্তকারগণের এখন নাম-মাত্রের উল্লেখ দেখি ; কিন্তু তাঁহাদের গ্রন্থ-পত্র কিছুই এখন সন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। পূর্ববর্তী নিরুক্তকারগণের গ্রন্থ-সমূহের উদ্ধার সাধন হইলে, বৈদিক ঋক-সমূহের আদি-অর্থ অনেকাংশে উপলব্ধ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তার পর, যাক্বের তুলনায় সায়ণাচার্য্য—সেদিনের বলিলেও অত্যাশ্চর্য্য হয় না। প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসু পণ্ডিতগণ নির্ণয় করিয়াছেন,—“বিজয়-নগরের রাজার দরবারে খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মাধব বিজ্ঞানরায় নামে এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বিচরমান ছিলেন। তিনিই বেদের ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য, এবং তাঁহারই ভাষ্যানুসারে অধুনা বেদের ব্যাখ্যা হইয়া থাকে।” পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের সকলেরই এখন অবলম্বন—সেই সায়ণাচার্য্যের টীকা বা ভাষ্য। * সেই ভাষ্য বাহীত বেদ বুঝিবার অল্প উপায় এখন আর কিছুই নাই। সুতরাং সে দিনের সায়ণাচার্য্য বেদ-ব্যাখ্যায় যদি কোনও ভুল-ত্রাস্তি করিয়া

* উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে (১৮২২ খৃঃ—১৮৫২ খৃঃ) ইউরোপে বেদের চর্চ্চা আরম্ভ হয়। শার উইলিয়ম জোন্স, কোলকক, ডাক্তার উইলসন, প্রথমে সংস্কৃত সাহিত্য লইয়া আলোচনা আরম্ভ করেন। ঐ সময়ে ফরাসী-পণ্ডিত বাপুঁফ, ‘জেন্ন’ ও বৈদিক-ভাষার শব্দ-ভত্ত্বের আলোচনায় সাহিত্য-জগতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের বন্ধু ও সমসাময়িক রোসেন, এই সময়েই ঋগ্বেদের প্রথম অষ্টক (আট অধ্যায়ে এক অষ্টক ; ঋগ্বেদে আট অষ্টকে চৌষটি অধ্যায় আছে।) ‘লাটিন’-ভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁহার পর, ফরাসী-পণ্ডিত লাভলো, ফরাসী-ভাষায় সমগ্র ঋগ্বেদের অনুবাদ করিয়াছিলেন। অতঃপর পঞ্চবিংশ বৎসর পরিশ্রম করিয়া (১৮৪২ খৃঃ—১৮৭৪ খৃঃ) অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার সায়ণের টীকা-সহ সমগ্র ঋগ্বেদ-সংহিতা প্রকাশ করেন। তৎপূর্বে একজন সর্কস-ভ্রম্মর সংস্করণ আর মুদ্রিত হয় নাই। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক অফ্রেট, বালিন-সহরে বেদের কিয়দংশ প্রকাশ করিয়াছিলেন। অতঃপর, ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে লর্ড উইগ এবং গ্রাস্মান নামক দুই জন জর্মন-পণ্ডিত জর্মন-ভাষায় ঋগ্বেদ প্রচার করেন। ইতিমধ্যে ক্রমে ক্রমে অধ্যাপক বের্নফি, অধ্যাপক ওয়েবর, অধ্যাপক রথ ও হুইটনি প্রভৃতি, সামবেদ, যজুর্বেদ, অর্থর্ববেদের অংশবিশেষ প্রকাশ করেন। ইহারায় আর সকলেই রোমান্স অক্ষরে বেদ-প্রচার করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের মধ্যে উইলসন, ডাক্তার ডিভেন্সন এবং অধ্যাপক হোপ ভারতবর্ষে বেদ-প্রচারে প্রসিদ্ধি-লাভ করেন। পরিশেষে, অক্ষদেহীয় পণ্ডিত-প্রবর রমানাথ শ্রবস্তী, পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ প্রভৃতি কর্তৃক বেদের অংশবিশেষ প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়। শেষে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সানপ্রসাদী মহাশয় সামবেদ প্রকাশে এবং শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ সম্পন্ন করিয়া বঙ্গবাহী হইয়াছেন।

গিয়া থাকেন, সকলই এখন সেই ভ্রান্তির অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। বৃষ্টি বা সে ভ্রান্তি অপনোদনের আর সম্ভাবনাও নাই। চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, ভারতে মুসলমান-রাজত্বের অভ্যুদয়-কালে, মাধব বিজ্ঞান্য বা মাধবাচার্য্য, বিজয়-নগরের রাজা বুকার্য্য এবং হরি-হরের মন্ত্রী ছিলেন; সায়ণাচার্য্য নাম তাঁহার কেন হইল, তাহার কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় না। পরন্তু, যতান্তরে বুকা যায়,—তাঁহার বহু পূর্বে বেদের ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য বিদ্যমান ছিলেন এবং তাঁহারই অস্থি-কঙ্কালের উপর বেদের ভাষ্য প্রণয়ন করিয়া, মাধবাচার্য্য সেই ভাষ্যকে সায়ণাচার্য্যের ভাষ্য-নামে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণ যজুর্বেদের ব্রাহ্মণের টীকাকার 'সায়ণমাধব' এবং গুরু যজুর্বেদের ব্রাহ্মণের টীকাকার 'সায়ণাচার্য্য' বলিয়া উল্লেখ আছে; তাহাতে দুই টীকাকারকে দুই জন স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলিয়া বিশ্বাস হয়। মাধবাচার্য্যের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া সায়ণাচার্য্যের সহিত তাঁহার তুলনাচ্ছলে, লোকে হয় তো 'সায়ণমাধব' বলিয়া তাঁহার সম্বন্ধনা করিত, এবং তাহা হইতেই হয় তো তিনি পরবর্ত্তি-কালে সায়ণাচার্য্য নামে পরিচিত হইয়া থাকিবেন। কেহ কেহ আবার বলেন,—“সায়ণাচার্য্য, মাধবাচার্য্যের সহোদর ছিলেন। মাধবাচার্য্য, ব্রাহ্মণের টীকা প্রণয়ন করেন, আর সায়ণাচার্য্য ঋগ্বেদের ভাষ্য লিখিয়া যান।” যাহা হউক, কাল-বিপর্য্যয়ে বেদের এবং বেদ-ব্যাখ্যার যে বহু বিপর্য্যয় সংঘটিত হইয়াছে, তাহাতে আর কোনই সংশয় নাই। এখন যাহা বেদ বলিয়া পরিচিত, অথবা এখন যাহা বেদের ব্যাখ্যা বলিয়া প্রচারিত, তাহা যে বহুরূপে বিকৃত হইয়া আছে, অনেক স্থলেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

বেদোক্ত সনাতন ধর্ম্মের সার-মর্ম্ম আমরা পূর্বেই বিবৃত করিয়াছি। পাশ্চাত্য-পণ্ডিত-গণ সে ধর্ম্মের কিরূপ পরিচয় দিয়া থাকেন, এক্ষণে সেই আভাস প্রদান করিতেছি।

বেদ-ব্যাখ্যায়
অধিকারী
অনধিকারী।

তাঁহারা বলেন,—“প্রকৃতি-পূজাই বৈদিক-ধর্ম্মের মূলীভূত। আর্য্য-হিন্দুগণ যখনই প্রকৃতির যে বিভূতির বিকাশ দেখিয়াছেন, তখনই তাহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অনন্ত-বিস্তৃত আকাশের বিশালতা

নির্ণয় করিতে না পারিয়া, তাঁহারা আকাশের পূজা করিয়াছেন। সূর্য্যের অত্যাশ্চর্য্য জ্যোতির নিকট পৃথিবীর সকল জ্যোতিঃ পরাভূত দেখিয়া, তাঁহারা সৌর উপাসনায় ব্রতী হইয়াছেন। নৈশ-অন্ধকারের ভীষণতার পর উষার মনোমোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া, তাঁহারা উষার পদ-প্রান্তে মস্তক লুটাইয়াছেন। এইরূপে, পঞ্চভূতাত্মক পৃথিবীর সকল সামগ্রীই তাঁহাদের উপাস্ত-দেবতা মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। তাই তাঁহারা, অসংখ্য নাম ও অসংখ্য গুণের আরোপ করিয়া, প্রকৃতির ঐশ্বর্য্যাদির পূজা করিতেন। এক আকাশকেই তাঁহারা কত-নামে কত-প্রকারে পূজা করিয়া গিয়াছেন! 'দ্যু' (জ্যোতিঃ) রূপে আকাশের পূজা-কল্পনা অতি প্রাচীন-কালে বিদ্যমান ছিল। বহু প্রাচীন-জাতির পূজা-পদ্ধতির সহিত আর্য্য-হিন্দুগণের এই প্রকার সাদৃশ্য দেখা যায়। এই 'দ্যু' হইতেই গ্রীক-দিগের 'জিগস', জর্মন-দিগের 'জিও', স্ক্যান্ডিনেভিয়ার 'জিউ' এবং রোমান-দিগের 'জু' (জুপিটারের প্রথম শব্দার্থ) প্রকৃতি উৎপন্ন হওয়া সম্ভবপর। আর্য্য-হিন্দুগণের বরুণ এবং মিত্র দেবতাও—আকাশেরই নামান্তর মাত্র। তাঁহাদের বরুণ-দেবতা গ্রীক-দিগের 'ইউরেনাস'

এবং জেন-আভেস্তায় ‘মিথ্রা’ নামে পরিচিত । ইরাণের ‘আহুরো মজ্‌দ’—এই বরুণেরই অজ্ঞ নাম । * আকাশের অবস্থা নিয়ত পরিবর্তন-শীল । সেই পরিবর্তন অনুসারেই বিবিধ নামে আকাশের পূজা-পদ্ধতি এ দেশে প্রচলিত ছিল । ইজের পূজাও সেই আকাশ-পূজারই অন্তর্ভুক্ত । সংসারে সৃষ্টি আনয়নের কর্তা ছিলেন বলিয়া, ইজ ক্রমশঃ হিন্দুগণের পূজার প্রধান আসন লাভ করেন । সূর্য্য, সাবিত্রী, অদিতি, গায়ত্রী, পুষ্প, বিষ্ণু প্রভৃতি আকাশ-সংক্রান্ত আরও নানা দেবতার কল্পনা বেদে দেখিতে পাওয়া যায় । বায়ু, মরুৎ, রুদ্র, যম, সোম,—সে সকল দেবতার ইয়ত্তা আছে কি ? তবে দেবতার মধ্যে প্রধানতঃ তিন দেবতার সম্বন্ধে অধিক ঋক্ সৃষ্ট হয় । অগ্নি-দেবতার পরই ইজ-দেবতা এবং তৎপরে সূর্য্য-দেবতার স্তোত্রের প্রাধান্য ।” ফলতঃ, প্রকৃতির উপাসনা করিতে করিতে, আর্য্য-হিন্দুগণ ক্রমে ক্রমে প্রকৃতির সৃষ্টি-কর্তা জগতের আদিভূত পরমেশ্বরের উপাসনায় প্ররুত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন,—বেদের আলোচনায়, পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ প্রধানতঃ এই দিকান্তে উপনীত হইয়াছেন । তার পর, আর আর সম্বন্ধে, যাঁহার যাহা মনে হইয়াছে, তিনিই তাহা বলিয়া গিয়াছেন ;—যাঁহার যাহা কল্পনায় উদয় হইয়াছে, তিনিই তাহা প্রকাশ করিয়াছেন । সে হিসাবে, আর্য্য-হিন্দুগণকে কেহ গাছ-পাথর-পূজক জড়োপাসক, কেহ বা অসত্য বর্কর বলিয়া কীর্জন করিতেও ক্রটি করেন নাই । বেদের এখন এতই বিঘ্নিত অবস্থা,—বেদের এখন এতই অর্থ-বিপর্য্যয়,—বেদের এখন এমনই দুর্দশায় দিন উপস্থিত ! বেদের এই দুর্দশা হইবে বলিয়াই তো, ভবিষ্যদর্শী শাস্ত্রকারগণ বেদ-পাঠের অধিকারী অনধিকারী নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন ! বেদের এইরূপ পরিণতি ঘটবে আশঙ্কা করিয়াই তো, শাস্ত্রকারগণ ব্রহ্মচর্যাশ্রমে বেদ-পাঠের ব্যবস্থা বিহিত করিয়া গিয়াছেন ! আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, বেদে সকল শাস্ত্রের সার মর্ম্ম নিহিত আছে ; স্মরণ্য শাস্ত্র-মর্ম্মানুসারে বেদ-মর্ম্ম বুঝিতে হইলে, বহু সাধনার, বহু অধ্যবসায়ের প্রয়োজন । কিন্তু সেরূপভাবে শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করিয়া বেদ-পাঠের ক্ষমতা এখন আর কাহার আছে ? তাই, বেদ লইয়া এখন নানা জনে নানা কথাই কহিতে পারিতেছেন ! তাই, লোকের অসুবিধা-অসুবিধা-অনুসারে, বেদের এখন নানা অর্থ সৃচিত হইতেছে ! কিরূপ চিত্ত-স্থির করিয়া শুদ্ধ-শাস্ত্র হইয়া বেদ পাঠ করিলে অভীষ্ট-লাভ হয়, মনু-সংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ে তাহা বিশদ-রূপে বর্ণিত আছে । কোন্ বেদের কি প্রতিপাদ্য বিষয়, মনু সজ্জপে তাহাও উল্লেখ করিতে ক্রটি করেন নাই । তিনি বলিয়া গিয়াছেন,—“ঋগ্বেদে দেব-দৈবত্ব অর্থাৎ দেবতার স্তুতিই প্রধানভাবে বিস্তারিত আছে । যজুঃগণ বজ্রকর্ষেদের দেবতা, অর্থাৎ যজুঃগণের কর্ম্মকাণ্ডই বজ্রকর্ষেদের মুখ্য বিষয় । সামবেদ পিতৃ-দেবতাক অর্থাৎ পিতৃ-লোকের মাহাত্ম্য-কীর্জন—সামবেদের মুখ্য উদ্দেশ্য । বিধানগণ, তিন বেদের এইরূপ তিন অধিষ্ঠাতা জানিয়া, সকল বেদের সারভূত গ্রন্থ, ব্যাখ্যাত ও গায়ত্রী পূর্বে উচ্চারণ করিয়া পশ্চাৎ বেদাধ্যয়ন করিবেন ।”

* পাশ্চাত্য পণ্ডিত-গণের মত—“Dyu (দ্যু:) is the Zeus of the Greeks, Zio of the Germans, Tiu of the Saxons, Jupiter Of the Romans ; Varuna (বরুণ) is the Uranus of the Greeks ; and Mitra (মিত্র) is the Mithra of the Zend-avesta, and Ahura Mazda of the Irans, &c.”

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।



ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষৎ ।

[বেদের ব্রাহ্মণ-ভাগের মন্ত্র,—সৃষ্টি-তত্ত্বে জল-প্লাবন,—মহু ও নোয়া,—প্রজাপতির সৃষ্টি-প্রসঙ্গ,—উপাখ্যানে কুমারিল ভট্টের মন্তব্য,—হরিশ্চন্দ্র ও শুনঃশেপের প্রসঙ্গে নরবলির কল্পনা-কাহিনী,—আরণ্যক ভাগের উদ্দেশ্য ও পরিচয়,—উপনিষদের সারতত্ত্ব,—উপনিষদের সংখ্যা-পর্যায়,—উপনিষদে মুসলমানের হস্তক্ষেপ,—অলৌপনিষদে শেখ ভাবন ও বদাউনীর কল্পনা-কোশল,—উপনিষদের বর্ণনা ও কবিত্বের আভাস,—উপনিষদে দার্শনিক চিন্তার উন্মেষ-সম্বন্ধে মতামত,—উপনিষৎ রচনার কাল-নির্ণয়ে বাদামুবাদ ।]

‘ব্রাহ্মণ’ ও ‘আরণ্যক’ বেদের উপসংহার ভাগ বলিয়া কথিত হয় । বৈদিক মন্ত্রসমূহ কিরূপে ক্রিয়া-কর্মে ব্যবহৃত হইবে, ব্রাহ্মণ-ভাগে প্রধানতঃ তাহাই বিবৃত আছে ।

ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক । প্রসঙ্গতঃ, কর্মকাণ্ডের উপদেশ-ছলে, ব্রাহ্মণ-ভাগে অত্যাশ্চর্য্য কথাও অনেক লিখিত হইয়াছে । ব্রাহ্মণে সৃষ্টি-তত্ত্বের কথা আছে ; ব্রাহ্মণে বহু পৌরাণিক কাহিনীর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই ; ব্রাহ্মণে বলিদান-

প্রথার প্রাধান্য লক্ষিত হয় । জল-প্লাবনের উপাখ্যান—প্রথমতঃ ব্রাহ্মণেই দেখিতে পাওয়া যায় । শতপথ ব্রাহ্মণে এইরূপভাবে সে উপাখ্যান বর্ণিত আছে :—বৈবস্বত মহু একদিন তর্পণাঞ্জলি প্রদান করিতেছিলেন । সহসা সেই অঞ্জলি-জল-মধ্যে একটা ক্ষুদ্র মৎস্ত দেখিতে পাইলেন । মৎস্ত তাঁহাকে কহিল,—“আপনি আমার প্রতিপালন করুন । আমার দ্বারা আপনার উপকার হইবে ।” মহু সেই মৎস্তকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন । ইতিমধ্যে মৎস্ত এত বড় হইয়া উঠিল যে, মহু তাহাকে সমুদ্রে রাখিতে বাধ্য হইলেন । সেই সময় মৎস্ত একদিন মন্ত্রকে সাবধান করিয়া বলিল,—“অমুক বৎসরের অমুক দিনে জল-প্লাবনে মহাপ্রলয় উপস্থিত হইবে । আপনি একখানি অর্ণব-পোত প্রস্তুত করিয়া আত্মরক্ষার উপায় করুন ।” মৎস্তের সেই ভবিষ্যদ্বাণী-ক্রমে যথাসময়ে জল-প্লাবন উপস্থিত হইলে, অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া মহু আত্ম-রক্ষা করিলেন । জল-প্লাবনের সময় মহুর অর্ণব-পোত পরিচালনা করিয়া, মৎস্ত উত্তর-দেশের গিরিশৃঙ্গে এক রন্ধের নিকট রক্ষা করে । সেই রন্ধে তরঙ্গী বাধিয়া প্লাবনের সময় মহু তথায় অবস্থান করেন । পরিশেষে, বন্যার প্রকোপ হ্রাস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, অর্ণবপোত-সহ মহু নিজে অবতরণ করিয়াছিলেন । তখন, সংসারের সকল লোকই ইহলীলা সংবরণ করিয়াছিল ; একমাত্র মহুই আত্ম-রক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন । সেই মহু হইতেই সংসারে পুনরায় মনুষ্যের সৃষ্টি হয় । মনুষ্যের উৎপত্তিও—সেই হইতেই । শতপথ ব্রাহ্মণের এই উপাখ্যানটী পুরাণে রূপান্তরে স্থান-লাভ করিয়াছে, এবং অন্যান্য দেশেও এই উপাখ্যানের প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে । বাইবেলোক্ত ‘নোয়ার’ কাহিনী যাহারা অবগত আছেন, এই উপাখ্যান পাঠ করিলে, তাঁহারা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন, জল-প্লাবনের সময় ‘আরারত’-পর্বতে নোয়ার জাহাজ (আর্ক) অবস্থান—শতপথ ব্রাহ্মণের এই উপাখ্যানেরই পুনরাবৃত্তি মাত্র । এমন কি, এই জন্য কেহ কেহ নোয়া এবং মহুকে এক ব্যক্তি বলিয়া নির্দেশ করিতেও

কৃষ্টিত হন নাই। শতপথ ব্রাহ্মণে এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণে সৃষ্টি-সম্বন্ধে এইরূপ আরও একটা উপাখ্যান আছে। সে উপাখ্যানের মর্ম্ম এই,—“প্রজাপতি সৃষ্টিকর্ত্তা আপন কন্যা উষা হইতে মনুষ্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন।” ঋগ্বেদের উষা ও সূর্য্যের স্তোত্র হইতে রূপান্তরিত হইয়া যে এই কল্পনার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা সহজেই বুঝা যায়। ঋগ্বেদে আছে,—‘সূর্য্য, উষার পশ্চাতে ধাবমান হইতেছেন।’ উষার পর সূর্য্যের প্রথর রশ্মি বিস্তীর্ণ হয়, তাহাতে সেই অর্থই উপলব্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু এই উপলক্ষে, কবি-কল্পনায় উষা-সুন্দরী বালিকা-রূপে এবং সূর্য্য সৃষ্টি-কর্ত্তা প্রজাপতি-রূপে পরিবর্ণিত হইয়া, কি বীভৎস উপাখ্যানেরই সৃষ্টি হইয়াছে! ‘বীভৎস’ কেবল আমরা বলিতেছি না;—শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তি-কালে যিনি বৌদ্ধ ধর্ম্মের ঘোর বিরুদ্ধবাদী হইয়া হিন্দু-ধর্ম্মের প্রাধান্য-রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই কুমারিল ভট্টও এই কথা বলিয়া গিয়াছেন। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে এই সৃষ্টি-প্রণালী আর এক নূতন রূপ ধারণ করিয়া আছে। তাহার মতে,—“সৃষ্টির প্রারম্ভে জল ভিন্ন অল্প পদার্থ কিছুই বিদ্যমান ছিল না; জলের উপর কেবল একটা পদ্মপত্র ভাসমান ছিল। প্রজাপতি বরাহ-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সেই জলমধ্যে গমন করেন, এবং তাহা হইতে মৃত্তিকা উত্তোলন করিয়া চতুর্দিকে ছড়াইয়া দেন; তখন, প্রস্তর-খণ্ডের সহিত সেই মৃত্তিকা-রাশি সম্মিলিত হইয়া এই পৃথিবীর সৃষ্টি হয়।” শতপথ ব্রাহ্মণে এই উপাখ্যানও অল্প আকারে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে আরও লিখিত আছে,—“সৃষ্টির পর, প্রজাপতি হইতে অশ্বর ও দেবতাগণ উদ্ভূত হন। তখন দেবাসুরের পরস্পরের প্রাধান্য লইয়া তাঁহাদের ঘোর দ্বন্দ্ব পৃথিবী পদ্মপত্রের ত্রায় প্রকম্পিত হইয়া উঠে।” ঐ ব্রাহ্মণেরই অল্প আর এক স্থলে আছে,—“সৃষ্টির আদিতে একমাত্র প্রজাপতি ব্রহ্মা বিরাজমান ছিলেন; তিনি প্রথমে জীব সৃষ্টি করেন; তৎপরে পক্ষী ও সরীসৃপ প্রভৃতির সৃষ্টি হয়। কিন্তু অসহ্যভাবে তাহারা সকলেই পঞ্চত প্রাপ্ত হওয়ার, জীব-জন্তুর স্তনে প্রজাপতি হৃদ-সঞ্চার করেন।” কোবীতকী এবং শতপথ ব্রাহ্মণে শিব এবং রুদ্রের প্রাধান্য কীর্ষিত হয়। দক্ষ পার্বতীর পূজা-প্রসঙ্গ শতপথ ব্রাহ্মণেই প্রথম দেখিতে পাওয়া যায়। অশুরদিগকে পরাজয় করিয়া দেবতাগণের সমগ্র পৃথিবী অধিকারের বিষয়,—ঐতরেয় এবং শতপথ ব্রাহ্মণে বর্ণিত আছে। শতপথ ব্রাহ্মণে প্রথমতঃ বিষ্ণুর প্রাধান্য পরিকীর্ষিত হয়। ইন্দ্র কর্ত্তক বিষ্ণুর মন্তকচ্ছেদ হইয়াছিল বলিয়া, শতপথ ব্রাহ্মণে একটা উপাখ্যান আছে। সামবেদের ‘তান্দ্য ব্রাহ্মণে’ ব্রাত্য-ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হইয়া বাহারা ব্রাহ্মণ-বৃত্তি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অল্প বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের বিষয় বর্ণিত আছে। এই ব্রাত্যগণ ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৃত্তান্তর গ্রহণ করায়, ব্রাহ্মণত্ব-ভ্রষ্ট হন নাই,—তান্দ্য ব্রাহ্মণে তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়। যজ্ঞ-মাহাত্ম্য এবং যজ্ঞের প্রণালী বর্ণনা ব্যাপদেশে, ব্রাহ্মণ-ভাগে আরও নানা আখ্যানিকার অবতারণা আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে, হরিশ্চন্দ্র ও শুনশেপের প্রসঙ্গে নরবলির উল্লেখ প্রথম দৃষ্ট হয়। তাহাতে লিখিত আছে,—“রাজা হরিশ্চন্দ্র আপনার পুত্র রোহিতকে যজ্ঞে বলি দিতে চাহেন। পুত্র সম্মত না হওয়ার, রাজা হরিশ্চন্দ্র, অজীর্ণত্বকে বুঝাইয়া তাঁহার পুত্র

শুনঃশেপকে বলি দিবার ব্যবস্থা করেন। শুনঃশেপ দেবগণের স্তুতি করিয়া যুক্তিলাভ করিয়া ছিলেন।” রামায়ণ, বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবৎ প্রভৃতিতেও শুনঃশেপের কাহিনী বর্ণিত আছে। রামায়ণে দেখিতে পাওয়া যায়,—“তাহার পিতার নাম ঋচীক এবং অযোধ্যার অধিপতির নিকট তিনি বিক্রীত হইয়াছিলেন। কিন্তু বিখ্যামিত্রের পরামর্শে, দেবগণের স্তোত্র পাঠ করায়, তাহার জীবন রক্ষা হয়।” ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, সম্ভবতঃ ঋগ্বেদের একটি হুক্ত অবলম্বন করিয়া, শুনঃশেপকে বলি দিবার উপাখ্যান রচনা করিয়াছিলেন; এবং তাহার পর, ক্রমশঃ তাহা অধিকতর পল্লবিত হইয়া নানা আকারে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। বৈদিক-কালে এদেশে নরবলি ছিল—এ কথা যাহারা প্রমাণ করিতে চাহেন, শুনঃশেপের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া তাহারা আপনাদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির চেষ্টা পান। সায়ণাচার্য্যের ভাষ্যই ঐ মত পরিপোষণে তাহাদের প্রধান অবলম্বন। কিন্তু সায়ণাচার্য্য কোথা হইতে ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, কিছুতেই তাহা বুঝিতে পারা যায় না। বেদে কোথাও নরবলির কথা নাই; পরন্তু প্রথম মণ্ডলের চতুর্বিংশ হুক্তে শুনঃশেপ যেখানে অগ্নি প্রভৃতি দেবতার স্তুতিগান করিতেছেন, সেখানেও কোনক্রমে তাহার বলির প্রসঙ্গ উঠিতে পারে না। হুক্তটী পড়িলে, স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়,—‘তিনি পৃথিবীর বন্ধন হইতে যুক্তি পাইবার জন্ত দেবগণের স্তুতি করিতেছিলেন।’ শতপথ ব্রাহ্মণে রাজর্ষি জনকের উল্লেখ প্রথম দেখিতে পাওয়া যায়; বিদেহ-রাজ্য এবং কোশল-রাজ্যের সমৃদ্ধির আভাসও প্রথম প্রাপ্ত হই। ব্রাহ্মণের পরই আরণ্যক। সংসারাত্মম পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে সন্ন্যাসাশ্রমে গিয়া বেদ-পাঠের আবশ্যকতা আরণ্যকে প্রতিপন্ন হয়। আরণ্যক—ব্রাহ্মণের উপসংহার ভাগ। সায়ণের ব্যাখ্যায় জানা যায়,—গৃহস্থের যজ্ঞাদি কর্মের জন্ত যেমন ‘ব্রাহ্মণের’ প্রয়োজন; অরণ্যে বাণপ্রস্থ অবলম্বনের জন্ত সেইরূপ ‘আরণ্যকের’ আবশ্যক। কিরূপ আচার-সম্পন্ন হইলে কিরূপে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইতে পারে এবং ব্রহ্মই বা কি,—আরণ্যকে তাহারই মূল-তত্ত্ব নিহিত আছে। বেদ-পাঠ শেষ করিয়া আরণ্যক অধ্যয়ন করিতে হয়,—মহর্ষি যম্ম এইরূপ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। যজ্ঞবল্ক্য বলেন,—“যাহারা যোগ অভ্যাস করিতে চাহেন, তাহারা আরণ্যক এবং আমার যোগ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করুন।” * প্রত্যেক ব্রাহ্মণের একখানি করিয়া ‘আরণ্যক’ আছে; ঋগ্বেদের যেমন দুই খানি ব্রাহ্মণ, তেমনি দুই খানি আরণ্যক—কৌষীতকী ও ঐতরেয়। কৃষ্ণ যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের তৈত্তিরীয় আরণ্যক, গুরু যজুর্বেদের শতপথ ব্রাহ্মণের আরণ্যকের নাম বৃহদারণ্যক। সামবেদ এবং অথর্ববেদের আরণ্যক নাই অথবা এখন আর পাওয়া যায় না। ঐতরেয় আরণ্যকে ঋগ্বেদের প্রত্যেক ঋষির পরিচয় আছে। ঐতরেয় আরণ্যকেই ঋগ্বেদের হুক্ত, পদ, পদাংশ, শব্দ, শব্দাংশ প্রভৃতির সংখ্যা-নির্ণয় দেখিতে পাই। গুরু যজুর্বেদের অন্তর্গত তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে আর্ষ্য-হিন্দুগণের দাহ-সংকার-প্রথা বর্ণিত আছে। তৎপূর্বে কোথাও কোথাও অহি ও চিতাত্তম যুক্তিকা প্রোথিত হইত,—এরূপও প্রমাণ পাওয়া যায়।

আরণ্যকের পর—উপনিষৎ । আরণ্যকই উপনিষদের মূলভূত । আরণ্যকে ব্রহ্মতত্ত্বের যে মূল স্বত্র নিহিত আছে, উপনিষদে তাহাই বিবৃত হইয়াছে । ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণের জন্য, ঋগিগণ অনেকেই উপনিষদকে বেদান্ত বা বেদের শিরোভাগ বলিয়া উপনিষৎ । নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন । ‘উপনিষৎ’ শব্দের বাস্তবর্থে আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি,—“ঈশ্বর-সামীপ্য-লাভই উপনিষদের উদ্দেশ্য ।” বাহ্যার সংসার-পক্ষে নিমজ্জমান ব্রহ্ম-চিন্তার বাহাদের চিত্ত কখনও প্রধাবিত নহে, উপনিষৎ তাঁহাদিগকে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভের পথ দেখাইয়া দেন । জীবাত্মা এবং পরমাত্মার অতদ-ভাব উপনিষদেই প্রতিপন্ন হয় । প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি—ধর্ম-সাধনার দুই অঙ্গ । ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সুখ-সাধনের উদ্দেশ্যে হিন্দু যে অক্লান্তান করিয়া থাকেন, তাহাই প্রবৃত্তি অঙ্গ ; আর যদ্বারা সংসারের মায়া-মোহ পরিত্যাগ করিয়া পরমাত্মার লীন হওয়া যায়, তাহাই নিবৃত্তি অঙ্গ । উপনিষদে সেই নিবৃত্তি-অঙ্গই বর্ণিত আছে । সে হিসাবে উপনিষৎ—জ্ঞানযোগ নামে অভিহিত হইয়া থাকে । উপনিষদের সংখ্যা অনেক ছিল । কোথাও এক শত আট খানি উপনিষদের, কোথাও দুই শত পঁয়ত্রিশ খানি উপনিষদের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় । বিদ্যারণ্য-স্বামীর মতে,—ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য, মুণ্ডক, প্রশ্ন, কোষীতকী, মৈত্রায়ণীয়, কঠবল্লী, খেতাশ্বর, বৃহদারণ্যক, তলবকার, নৃসিংহোত্তর-তাপনীয়,—এই বারখানিই প্রধান উপনিষৎ । মতান্তরে, বত্রিশখানি উপনিষদের প্রাধান্য কথিত হইয়া থাকে ; যথা, ঋগ্বেদান্তর্গত—ঐতরেয়, কোষীতকী ; কৃষ্ণ যজুর্বেদের অন্তর্গত—কঠ, তৈত্তিরীয়, ব্রহ্ম, কৈবল্য, খেতাশ্বতর, গর্ত, নারায়ণ, ব্রহ্মা বা অমৃতবিন্দু, অমৃতনাদ, কাণাগ্নি রত্ন, ক্ষুরিকা ; শুক্ল যজুর্বেদের অন্তর্গত—ঈশ, বৃহদারণ্যক, জাবাল, হংস, পরমহংস, সুবাল, মল্লিকা ; সামবেদান্তর্গত—কেন, ছান্দোগ্য, আরুণি, মৈত্রায়ণী, মৈত্রয়ী ; অথর্ব-বেদান্তর্গত—প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, অথর্বশির, অথর্বশিখা, বৃহজ্জাবাল, নৃসিংহতাপনি । এই বত্রিশখানি উপনিষৎ আজিও এদেশে প্রচলিত আছে । কিন্তু অজ্ঞাত উপনিষৎ এখন আর তাদৃশ প্রচলিত নাই । পরবর্ত্তি-কালে উপনিষৎ-সম্বন্ধে অনেক ব্যতিচার ঘটিয়াছিল ;—এমন কি, তখন যে কোনও ব্যক্তি আপন মত-প্রতিষ্ঠার জন্য উপনিষৎ-নামে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । অল্লোপনিষৎ প্রভৃতিই ইহার প্রমাণ । অল্লোপনিষৎ—বাদসাহ আকবরের সময়, মুসলমান-ধর্মের প্রাধান্য প্রতিপাদনের জন্য বিরচিত হয় । ‘মন্তেখুৎ তবারিক’ গ্রন্থে অল্লোপনিষৎ-রচনার কারণ-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায় । কথিত হয়,—হিজরি ১৮৩ সালে (১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে) সম্রাট আকবর বদাউনি নামক জনৈক মুসলমানকে অথর্ববেদের অনুবাদ করিতে বলেন । ইসলাম-ধর্মের সহিত অথর্ববেদের কতকগুলি ধর্মোপদেশের ঐক্য আছে—জনিতে পাইয়া, বাদসাহ সেই আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন । অনুবাদ-কালে বদাউনি অথর্ববেদের অর্থ উপলব্ধি করিতে পারেন না । তখন, ফৈজি ও ইব্রাহিমের উপর সেই অনুবাদের ভার স্তূত হয় । কিন্তু তাঁহারা ই বা কি করিবেন ? ইতিমধ্যে ভাবন নামক জনৈক দক্ষিণ-দেশীয় ব্রাহ্মণ, মুসলমান-ধর্ম অবলম্বন করেন । তখন তাঁহারই সাহায্যে পারস্ত-ভাষার অথর্ববেদের

অমুবাদ আরম্ভ হয়। বদাউনি এবং ইব্রাহিমকে শেখ ভাবন যেরূপভাবে বুঝাইয়া দিতেন, তাহারাই সেই ভাবেই অমুবাদ-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া যাইতেন। সেই অমুবাদের সময় বেদের এক স্থানে কোরাণের 'লা ইল্লাহ্' বচনের মত কোনও অংশ দেখিতে পাইয়া, শেখ ভাবন তাহার রূপান্তর সংঘটিত করেন। অনেকে, ভাবনের কৌশল বুঝিতে না পারিয়া, সত্য সত্যই বেদে 'আল্লাহ' কথা আছে মনে করিয়া, ভ্রমে পতিত হয়; এবং তদনুসারে মুসলমান-বর্ষ গ্রহণ করে। অথর্ববেদের যে দুইটি মন্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া শেখ ভাবন আপনাদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধি করিয়াছিলেন, সে দুইটি মন্ত্র এই :—“আদল্লাবুক-মেককঃ। অল্লাবুক নিখাতঃ।” এই হইতে প্রথমে “আদল্লাবুকমেককঃ। অল্লাবুকঃ।”—ইত্যাদি বাক্যের সৃষ্টি হয়; এবং পরিশেষে ‘অল্লোপনিষৎ’ রচিত হইয়া যায়। অল্লোপনিষদের উপসংহারে পরিবর্তনের মাত্রা চরম পন্থা পরিগ্রহ করে। তাহাতে লিখিত হয়,—“ইল্লাকবর ইল্লাকবর ইল্লেন্তি ইল্লাল্লাঃ ইল্লা ইল্লাল্লা অনাদিস্বরূপা অথর্বলী শাখাঃ হুঃ হ্রো জনান্ পশূন্ সিদ্ধান্ জলচরান্ অদৃষ্টং কুরু কুরু ফট্।” অর্থাৎ, আকবর বাদসাহ পর্য্যন্ত উপনিষদে স্থান লাভ করেন। ইহার অধিক শাস্ত্রের তুচ্ছতা আর কি হইতে পারে? বাহা হউক, এই সকল কারণেই অথর্ববেদকে এক সময়ে মুসলমানের বেদ বলিয়া কাহারও কাহারও মনে সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল।

ব্রহ্মত্ব নিরূপণ-বাপদেশে উপনিষদে যে যে বিষয় আলোচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে চারিটি বিষয় প্রধান উল্লেখযোগ্য। প্রথম,—আত্মার বিশ্বব্যাপকতা; দ্বিতীয়,—আত্মার দেহান্তর-গ্রহণ; তৃতীয়,—সৃষ্টিতত্ত্ব; চতুর্থ,—লয়-রহস্ত। আমরা একে উপনিষদের একে সংক্ষেপে এই চতুর্বিধ বিষয়েরই আভাস প্রদান করিতেছি; তাহাতে উপনিষদের মূলতত্ত্ব কতকটা স্ফুটমান হওয়া সম্ভবপর।

প্রথমতঃ—আত্মার বিশ্বব্যাপকতা। উপনিষদের মত এই,—পরমাত্মা সর্বভূতে সমভাবে বিরাজমান আছেন; ইহসংসারের সকল পদার্থেই তিনি ওতঃপ্রোত অবস্থিতি করিতেছেন। অতীন্দ্র ‘একমেবাদ্বিতীয়ম্’ বা একেশ্বর বলিতে যে ভাব সচরাচর উপলব্ধি হয়, সে হিসাবে উপনিষদের পরব্রহ্মের আদর্শ স্বতন্ত্র বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। এক্ষণে ‘একেশ্বর’ শব্দে ‘একমাত্র ঈশ্বরই এই জগতের সৃষ্টিকর্তা এবং এই বিশ্বসংসার তাঁহার সৃষ্ট-সামগ্রী’ এই অর্থ বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু উপনিষদের অর্থ তাহা হইতে স্বতন্ত্র। উপনিষদের মতে,—‘জগদীশ্বর এক বটেন, পরব্রহ্ম এক বটেন; কিন্তু সৃষ্ট-সামগ্রী তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে; অর্থাৎ, পরমাত্মা অভিন্নভাবে বিশ্বসংসারে মিশিয়া রহিয়াছেন;—এ বিশ্ব তাঁহারই প্রতিকৃতি মাত্র।’ উপনিষদে শত শত উপমা ও দৃষ্টান্ত দ্বারা এই পরব্রহ্ম-তত্ত্ব বুঝান হইয়াছে। ছান্দোগ্য, কেম ও দীশ উপনিষদের দুই এক স্থলের মর্ম্ম নিম্নে প্রদান করিতেছি। তাহাতে আত্মার এই বিশ্বব্যাপকতা-তত্ত্ব কতকটা বুঝিতে পারা যাইবে। ছান্দোগ্যোপনিষদের তৃতীয় ‘প্রপাঠক’ চতুর্দশ ঋকে লিখিত হইয়াছে,—“সর্বং বরিদং ব্রহ্ম তচ্ছরানিতি শাস্ত্র উপাসীত।” অর্থাৎ,—“এই সংসারই ব্রহ্ম। ব্রহ্মই এই পরিবৃত্তমান বিশ্বের আদি, অন্ত ও প্রাণভূত। এই বুঝিয়া মনস্ত তাঁহার

উপাসনা করিবে।” তার পর, আরও উক্ত হইয়াছে,—“তিনি মনোবর, তিনি প্রাণবর, তিনি জ্যোতির্ষর, তিনি সর্ষকর্ষা, তিনি সর্ষকাম, তিনি সর্ষগন্ধ, তিনি সর্ষরস, তিনি সত্যসন্ধ, তিনি আকাশাত্মা, তিনি সকলেরই মধ্যে বিরাজমান। এক দিকে তিনি, আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ে, ততুলের কণা হইতে ক্ষুদ্র, যবের কণা হইতে ক্ষুদ্র, সরিষার কণা হইতে ক্ষুদ্র, তৃণবীজের কণা হইতে ক্ষুদ্র, আত্মাক্রমে অবস্থিত ; অন্য দিকে, তিনিই আবার সেই আত্মাক্রমে, পৃথিবী অপেক্ষা বৃহৎ, আকাশের অপেক্ষা বৃহৎ, দিব্যালোকের অপেক্ষা বৃহৎ, সকল ভুলোকের অপেক্ষা বৃহৎ। তিনিই সকল কার্য্য করাইতেছেন ; তাহার ইচ্ছাতেই সকল কার্য্য হইতেছে ; সকল গন্ধ, সকল রস,—তিনিই সকলের মূলীভূত। এখানেও তিনি ; আবার ইহসংসার পরিত্যাগের পরও তাঁহাতেই আশ্রয় পাইব।” পরব্রহ্মের এই বিশ্বব্যাপক ভাব, উপমা দ্বারা কিরূপ বিশদীকৃত হইয়াছে, উক্ত ছান্দোগ্য উপনিষদেরই ঋষ্ঠ প্রাণীক নবম খণ্ড হইতে তাহাও দেখাইতেছি। ঋষি উদালক আকুণি আপন পুত্র শ্বেতকেতুকে পরমাত্মার বিষয়ে এইরূপ উপদেশ দিতেছেন,—“বৎস! মধুমক্ষিকাগণ বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে পরিভ্রমণ করিয়া মধু সংগ্রহ-পূর্ব্বক মধুচক্র রচনা করে। সেই মধু-চক্রে বিবিধ বৃক্ষের বিবিধ পুষ্পের মধু একত্রীভূত হইলে, কোন্ বৃক্ষের বা কোন্ জাতীয় পুষ্পের মধু কোথায় রহিল, কেহই তাহা নির্ণয় করিতে পারে না। প্রাণি-সমূহও সেইরূপ জানিবে। তাহারাও যখন সেই পরমাত্মায় বিলীন হইবে, তখন আর কোনক্রমে আপন অস্তিত্ব অনুসন্ধান করিয়া পাইবে না। আরও পুত্র, ঐ দেখ নদী-সমূহ!—কোনটি পূর্বাভিমুখে, কোনটি পশ্চিমাভিমুখে প্রধাবিত ; কিন্তু সকলেই সাগরে সম্মিলিত হইতেছে ; প্রকৃত পক্ষে সাগরেই মিশিয়া বাইতেছে। কেবল তাহাই নহে ;—সাগর হইতেই তাহাদের উৎপত্তি—সাগর-সম্মত বাশেই তাহাদের পরিপুষ্টি। অথচ, তাহারা কখনও বলিতে পারে কি,—সাগরের কোন্ প্রান্তে কোথায় কাহার অবস্থিতি ছিল ? কখনই না। পুত্র ! প্রাণি-সমূহকেও সেইরূপ জানিবে। তাহারাও সেই সত্যস্বরূপ পরমাত্মা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে বটে ; কিন্তু জানে না যে, কোথা হইতে আসিয়াছে।” বিষয়টি অধিকতর বিশদভাবে বুকাইবার জন্য, পুত্রকে ঋষি আরও কহিলেন,—“পুত্র ! আপাততঃ এই লবণগুলিকে ঐ জল মধ্যে রাখিয়া আইস। কাল প্রভাতে পুনরায় এই বিষয়ে কথাবার্তা হইবো।” পুত্র শ্বেতকেতু পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিলে, পরদিন প্রভাতে ঋষি উদালক কহিলেন,—“কাল রাত্রে জলমধ্যে যে লবণ রাখিয়া আসিয়াছ, তাহা আনয়ন কর।” পুত্র দেখিলেন,—জলে লবণের চিহ্ন যাত্র নাই ; সমস্তই গলিয়া গিয়াছে। পিতা কহিলেন,—“ভাল, উপর হইতে একটু জলের আশ্রয় লইয়া দেখ দেখি ! কেমন লাগিতেছে ?” পুত্র উত্তর করিলেন,—“লবণাক্ত।” পিতা পুনরপি কহিলেন,—“মধ্যে একটু জলের আশ্রয় লইয়া দেখ দেখি।” আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, পুত্র একই উত্তর দিলেন। পিতা অন্তঃপর নির হইতে কিঞ্চিৎ জল তুলিয়া লইয়া আশ্রয় করিতে কহিলেন। পুত্র শ্বেতকেতু সেবারও উত্তর দিলেন,—“একই আশ্রয়।” তখন পিতা কহিলেন,—“জল ফেলিয়া দেও। বাহা বলিতেছি, বুঝিবার চেষ্টা কর।” পুত্র একাগ্রচিত্তে পিতার

উপদেশ শুনিতে লাগিলেন। পিতা বুঝাইয়া বলিলেন,—“পরমাত্মাও এই প্রকার !
কলের মধ্যে অদৃষ্টভাবে লবণের বিস্তারমানতা যেরূপ সম্ভবপর, পরমাত্মাও তদ্রূপ অদৃষ্টভাবে
সর্বভূতে বিরাজমান আছেন।” ছান্দোগ্যোপনিষদের * এই ভাব, ‘ঈশ’ ও ‘কেন’
উপনিষদের † কেমন সুন্দর প্রকটিত দেখুন ! ‘কেন’ উপনিষদে প্রথমেই প্রশ্ন করা
হইয়াছে,—“মন কাহার প্রেরণায় কার্য্য করিতেছে ? কাহার আদেশে প্রথম প্রাণবায়ু
নিঃসরণ হইতেছে ? কাহার ইচ্ছায় আমরা বাক্য কহিতেছি ? চক্ষু এবং কর্ণকেই
যা কোন্ দেবতা পরিচালনা করিতেছেন ?” পরক্ষণেই উপনিষৎ উত্তর দিতেছেন,—

“শ্রোত্রস্ত শ্রোত্রং মনসো মনো যদ, বাচো হ বা বাচং স উ প্রাণস্ত প্রাণঃ। ... ॥

যজ্ঞানভূতাদিতং যেন বাগ্ভূতায়তং । তদেব ব্রহ্ম তং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥

যজ্ঞানসান মনুতে যেনাছম নোমতম্ । তদেব ব্রহ্ম তং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥

যজ্ঞকৃষা ন পশ্চতি যেন চক্ষুংষি পশ্চতি । তদেব ব্রহ্ম তং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥

বজ্রোজ্জেষ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্ । তদেব ব্রহ্ম তং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥

কং প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে । তদেব ব্রহ্ম তং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥”

অর্থাৎ,—“কর্ণের যিনি কর্ণ, মনের যিনি মন, বাক্যের যিনি বাক্য, প্রাণের যিনি
প্রাণ, চক্ষুর যিনি চক্ষু,—তিনিই সকল কার্য্য করাইতেছেন ও করিতেছেন। বাক্যের
দ্বারা যাহাকে বাক্ত করা যায় না, পরন্তু যোগ হইতে বাক্য উদ্ভূত হয়; মনের দ্বারা
তাহাকে চিন্তা করা যায় না, পরন্তু মনই যদ্বারা পরিচিন্তিত হয়; নেত্রের দ্বারা যাহাকে
দেখিতে পাওয়া যায় না, পরন্তু যিনি সকলই দেখিতে পান; কর্ণের দ্বারা যাহাকে
উপলব্ধি করা যায় না, পরন্তু কর্ণ যাহার দ্বারা পরিচালিত হয়; প্রাণ-বায়ু যাহার অস্তিত্ব
অনুসন্ধান করিয়া পায় না, পরন্তু যাহার দ্বারা প্রাণ-বায়ু প্রবাহিত হয়;—একমাত্র
তিনিই ব্রহ্ম, একমাত্র তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে; তিনি ভিন্ন অন্য উপাসনা
কদাচ প্রেয়ঃ নহে।” † সেই তিনি; কিন্তু যিনি তাহাকে কিকিমাত্র উপলব্ধি করিতে
পারিয়াছেন, তাহার কি অল্পম আনন্দ ! ঈশোপনিষদে সেই আনন্দ কি সুন্দর পরিবর্ণিত !

“বস্তু সর্বাণি ভূতান্ধ্যাত্তেনামুপশ্চতি । সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজ্ঞপ্সতে ॥

যস্মিন্ সর্বাণি ভূতান্ধ্যাত্তেনাবাহুর্জানতঃ । তত্র কো বোহঃ কঃ শোক একতমুপশ্চতঃ ॥”

অর্থাৎ,—“যিনি পরমাত্মায় সর্বভূতের অবস্থান দেখিতে পান এবং যিনি সর্বভূতে
পরমাত্মার অবস্থিতি প্রত্যক্ষ করেন, তিনি কদাচ তৎপ্রতি বিমুখ হইতে পারেন না।
যে মানুষ একবার বৃত্তিতে পারিয়াছে—অষ্টা ও দ্বষ্ট পদার্থে কোনও প্রভেদ নাই,
পরমাত্মাই সর্বভূতে সর্ব অবস্থার বিরাজমান আছেন; তাহার আর কিসের দুঃখ, কিসের
ক্লেশ ?” † পরমাত্মার সর্বভূতে অবস্থিতির বিষয় উপনিষদে বহুপ বিশদভাবে বিবৃত
হইয়াছে, আত্মার দেহাত্মর-গ্রহণ-তত্ত্বও উহাতে স্তূৰ্প পরিবর্ণিত আছে। তৎসম্বন্ধে
বৃহদারণ্যক উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ের কয়েক পংক্তির মর্ম্ম নিম্নে প্রদান করিতেছি।

* উদ্যালক ব্যাকৃণি ও শেতকেতুর প্রসঙ্গ ছান্দোগ্য উপনিষদের বর্ষ প্রণাঠক ৯ম, ১০ম ও ১৩শ শ্লোকে
বর্ণিত আছে।

† ঈশোপনিষৎ, প্রথম বক্তৃতা হইতে ৮ম শ্লোক এবং ঈশোপনিষৎ ৬ষ্ঠ প্রঃ ৭ম শ্লোক হইয়াছে।

তাহা এই :—“ভূগ-জলোকা একটা ভূণের আন্তর্ভাগে উপনীত হইয়া প্রথমে অপর ভূণের প্রতি দেহ-সম্প্রসার করে ; পরে ক্রমশঃ প্রথম ভূণ পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণভাবে দ্বিতীয় ভূণে আশ্রয় লয় । এই ভাবে ক্রমে ক্রমে জলোকা যদৃচ্ছা অগ্রসর হয় । আত্মার গতিও তদ্রূপ জানিবে । আত্মাও এক দেহ পরিত্যাগ করিয়া, এই ভাবেই দেহান্তরে আশ্রয় করেন ।” পুনশ্চ,—“স্বৰ্ণকার পুরাতন স্বর্ণখণ্ডের মলামাটী পরিষ্কার করিয়া তদ্বারা অভিনব স্কন্দর সামগ্রী নির্মাণ করে । পরমাত্মাও সেইরূপ এক দেহ পরিত্যাগ করিয়া, অজ্ঞানতা পরিহার-পূর্বক, অভিনব নূতন দেহ গ্রহণ করেন । এইরূপে ইচ্ছাক্রমে তিনি কখনও পিতৃ-পুরুষের, কখনও গন্ধর্ব্বের, কখনও প্রজাপতির, কখনও ব্রহ্মের, কখনও অন্যান্য প্রাণীর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া থাকেন । ... কামনা অনুসারেই এইরূপ দেহান্তর ঘটয়া থাকে । কিন্তু যাহারা কামনামুক্ত অথবা পরব্রহ্মেই কামনামুক্ত এবং তাঁহাতেই নির্ভরশীল, তাঁহাদের আত্মা অন্তর কোথাও বিচালিত হয় না ; তাঁহাদের সেই ব্রহ্মভূত আত্মা, ব্রহ্মেই লীন হইয়া যায় । ... সর্প যেরূপ প্রাণহীন বস্ত্রীক (খোলস) পরিত্যাগ করিয়া যথাস্থানে চলিয়া যায়, জ্যোতিষ্ময় আত্মাও সেইরূপ দেহ পরিত্যাগ করিয়া জ্যোতিষ্মরূপ পরমাত্মায় বিলীন হন ।” আত্মার দেহান্তর-গ্রহণ বা পরমাত্মায় লীন হওয়া সম্বন্ধে উপনিষদের মত এই,—“জ্ঞান-কর্মানুসারে আত্মার গতান্তর-প্রাপ্তি ঘটে । সংসারে যিনি যেরূপ কর্ম্ম করিবেন, তাঁহার আত্মা তদনুরূপ গতি প্রাপ্ত হইবে ।” ছান্দোগ্যোপনিষদের অষ্টম প্রপাঠকের প্রথম খণ্ডের বর্ত্ত সূত্রে এই তত্ত্ব স্পষ্টতঃ পরিবর্ণিত আছে । তাহার মর্ম্ম,—“পৃথিবীতে মনুষ্য কর্ম্ম দ্বারা যাহা কিছু লাভ করে, তৎসমস্তই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় । এই পৃথিবীতে যাগ-যজ্ঞ এবং সংকর্ম্ম প্রভৃতির দ্বারাও যাহা কিছু অর্জন করা যায়, পরজন্মে তাহাও বিধ্বংস হইয়া থাকে । যিনি পরমাত্মাকে চিনিতে না পারিয়া, তাঁহার স্বরূপ তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ না হইয়া, কাম্য কর্ম্ম অনুষ্ঠান-পূর্বক ইহলোক হইতে অন্তহিত হন, তাঁহাকে পুনরায় ইহলোকেই প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয় ; কর্ম্ম-ঘোরে আবদ্ধ থাকিয়া, তাঁহার আত্মা কখনই স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে না ।” বলা বাহুল্য, উপনিষদের এই জন্মান্তর-বাদ বা আত্মার দেহান্তর-গ্রহণ-তত্ত্বের সহিত খৃষ্ট-ধর্ম্মের আত্মার অবস্থান্তর-গ্রহণের কিয়ৎ পরিমাণে সাদৃশ্য থাকিলেও পুনর্জন্মগ্রহণ-সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে মতপার্থক্য দৃষ্ট হয় । খৃষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থের মতে আত্মা দেহ পরিত্যাগ করিয়া ভৌতিক জগতে অবস্থান করে ; তাহাকে পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হয় না ; ঈশ্বরের নিকট শেষ বিচারের দিন সে তাহার কর্ম্মাকর্ম্মের ফলভাগী হইয়া থাকে । কিন্তু উপনিষদের মতে ইহলোকেরই কর্ম্মাকর্ম্মের নিয়ন্তা । ইহলোকে যে যেরূপ কর্ম্ম করিবে, তাহার ফলভোগের জন্য জন্মজন্মান্তরে তাহাকে সংসারে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে । কাম্য কর্ম্মের শেষ না হইলে, জীবাত্মা কখনই পরমাত্মায় মিলিত হইতে পারিবে না । সূত্র-তত্ত্ব সম্বন্ধে উপনিষদের বিবিধ মত দৃষ্ট হয় । এক স্থলে হৈয়ালীর ভাবে লিখিত আছে,—“আদিতে কিছুই অস্তিত্ব ছিল না । প্রথমে একটা ডিম্ব হয় । সেই ডিম্ব দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া, এক ভাগে রৌপ্যবদ পৃথিবী এবং অপর ভাগে সূর্য্যময় আকাশ উৎপন্ন হইয়াছিল ।” কিন্তু অত্র প্রায়ই দেখা যায়,—“প্রথমে একমাত্র তিনিই

(পরব্রহ্মই) বিরাজমান ছিলেন, তিনি ভিন্ন অস্ত্র কিছুই অস্তিত্ব ছিল না।” লয় বা মৃত্যু-সম্বন্ধেও উপনিষদের এই একই মত। উপনিষৎ বলেন,—“যিনি আত্মা ও পরমাত্মার অভেদ-জ্ঞান উপলব্ধি করিয়াছেন, যিনি সর্বভূতে পরমাত্মাকে দর্শন করিয়াছেন, এবং পরমাত্মার সর্বভূতের সমাবেশ দেখিতেছেন; বাঁহার স্পৃহা নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই, পাপ নাই, সংশয় নাই, কলঙ্ক নাই; তিনিই পাপকে পরাজিত করিতে পারেন, কিন্তু পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না;—তিনিই পাপকে ভস্মীভূত করিতে পারেন, কিন্তু পাপ তাঁহাকে জ্বালা দিতে পারে না;—তিনিই ব্রহ্মরূপে পরব্রহ্মে লীন হইয়া থাকেন, সংসারের সুখদুঃখ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে পারে না।” কঠোপনিষদে ঋষিগুরু নাটিকেত ও যমের প্রসঙ্গে এই মৃত্যু-রহস্য আরও বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। ঋষিকুমারের প্রশ্নের উত্তরে মৃত্যুরূপী যমরাজ বলিতেছেন,—“যিনি পরমাত্মার স্বরূপ শুদ্ধ বুদ্ধিতে পারিয়াছেন, তিনি আর মৃত্যুর অধীন নহেন। তিনি জানেন—আত্মা কখনও জন্মগ্রহণ করেন না, আত্মা কখনও মরেন না। আত্মা অজ অর্থাৎ জন্মবিরহিত, আত্মা শরীত অর্থাৎ অবিনশ্বর, আত্মা পুরাণ অর্থাৎ অতি প্রাচীন। যদিও শরীর ধ্বংস হয়, কিন্তু আত্মা কখনই ধ্বংস প্রাপ্ত হন না।” ফলতঃ, উপনিষদের মতে,—“এই বিশ্বসংসারের আদিও নাই, অন্তও নাই, মধ্যও নাই। পরব্রহ্মই অনাদিকাল ইহসংসাররূপে বিরাজমান আছেন।” বলা বাহুল্য, এই মত—বেদেরই অনুলসরণকারী।

উপনিষদের উপদেশ-পরম্পরা আলোচনা করিলে, এক গভীর সমস্তায় নিপতিত হইতে হয়। উপনিষৎ ব্রহ্ম-পরিচয়ে কোথাও বলিয়াছেন,—“তিনি স্থূল নহেন, তিনি সূক্ষ্ম নহেন, তিনি হ্রস্ব নহেন, তিনি দীর্ঘ নহেন; তিনি শব্দের অতীত, তিনি স্পর্শের অতীত, তিনি রূপের অতীত, তিনি ক্ষয়ের অতীত; তাঁহার আদিতে বা অন্তে, অন্তরে বা বাহ্যে, অস্ত্র কিছুই নাই। তিনি অদৃশ্য, অপ্রাহ, অগোত্র, অবর্ণ।” আবার উপনিষদে কোথাও দেখিতে পাই,—“তিনি সর্বকণ্ঠা, সর্বকাম, সর্বগন্ধ, সর্বরস; তিনি আত্মারূপে সর্বভূতে অবস্থিত আছেন; তিনি অণু হইতেও অণু, তিনি মহৎ হইতেও মহান; তিনি সর্বৈশ্বর, সর্বজ্ঞ, অন্তর্ধ্যায়ী, এবং বিশ্বের আদি উৎপত্তি ও লয়-স্থান।” * এইরূপে, একবার দেখিতেছি, তাঁহার অস্তিত্ব নাই; আবার দেখিতেছি, তিনি সকল অস্তিত্বের সারভূত। অল্পবুদ্ধি অল্পজীবী মনুষ্য, এই সমস্তায় পড়িয়াই তো সময় সময় বিভ্রান্ত হয়। ফলতঃ, উপনিষদের আলোচনার দেখিতে পাই, তাঁহার স্বরূপ-নির্ণয় মনুষ্যের সাধ্যাতীত,—সত্য সত্যই তিনি ‘অবাস্তবসাগোচর’। এই জটিল তত্ত্বের ঘোরাবর্তে পড়িয়া মনুষ্য মুহমান হয় দেখিয়া, শঙ্করাবতার শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য, উপনিষদের এই তত্ত্ব বুঝাইবার প্রয়াস পান। তিনি বলেন,—ব্রহ্মের দুইটা বিভবের পরিচয় ঐ দুই ভাবে প্রকাশ পায়। সেই দুইটা বিভবের একটীর নাম,—‘স্বিশেষ লিঙ্গ’; অপরটির নাম,—‘নির্কিশেষ লিঙ্গ’। ভাষান্তরে সেই দুই ভাবে

* “অসুখমবদ্যমবদীর্ঘম”, “অশব্দমস্পর্শরূপমরসম” এবং “সর্বকণ্ঠা সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ”, “অণোরণীমান্ মহতো মহীমান্” প্রভৃতি।

‘সবিশেষ সত্ত্ব’ এবং ‘নির্কিশেষ নিষ্ঠ’ তাব বলা যাইতে পারে । যখন বিশেষ করিয়া ব্রহ্মের কোনও পরিচয় দেওয়া হয়; যখন বিশেষ করিয়া বলা হয়,—“তিনিই সব; এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁহারই অতিব্যক্তি যাত্র; তিনিই এতৎসহ ওতঃপ্রোত বিস্তমান্ আছেন;” আর যখন বিশেষ করিয়া বলা হয়,—“যতো বা ইমানি চূতানি জায়ন্তে । যেন জাতানি জীবন্তি । যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি ।...তদ্ ব্রহ্মেতি । অর্থাৎ, যাহা হইতে সর্বভূত উৎপন্ন হইয়াছে, যাহা কর্তৃক সর্বপ্রাণী জীবিত রহিয়াছে, এবং অন্তকালে যাহাতে সকলেই প্রবেশ করিবে;...তিনিই ব্রহ্ম”; অপিচ, যখন বৃক্ষান হয়,—“উর্ণনাভ হইতে যেমন তন্তু উৎপাদিত হয়, অগ্নি হইতে যেমন শূলিঙ্গ নির্গত হয়, আত্মা হইতে সেইরূপ সর্বপ্রাণ, সর্বলোক, সর্বদেব, সর্বভূত নিঃসৃত হয়;” তখন, তিনি ‘সত্ত্ব’, ‘সাকার’ বা ‘সবিশেষ লিঙ্গ’; তখন, তাঁহার রূপগুণ ঐশ্বর্য কিছুই অস্তাব নাই । এইরূপ আবার যখন তিনি কোনই রূপগুণে পরিচিত না হন; যখন বলা হয়,—“তাঁহার আদি নাই, মধ্য নাই, অন্ত নাই; তিনি কিছুই নহেন;” তখন তিনি ‘নিষ্ঠ’, ‘নিরাকার’ বা ‘নির্কিশেষ লিঙ্গ’; তখন তাঁহার কোনই পরিচয়-চিহ্ন অনুসন্ধান পাওয়া যায় না । ফলতঃ, সাকার নিরাকার উভয়ভাবেই ব্রহ্মের পরিচয় উপনিষদে প্রদত্ত হইয়াছে; এবং উপনিষদের সেই সার-তত্ত্বই শঙ্করাচার্য্য উদ্ঘাটন করিয়া গিয়াছেন । বলা বাহুল্য, এ তত্ত্ব—বড়ই কঠোর তত্ত্ব । এ তত্ত্বের রহস্তোদ্ঘাটন—মহুগ্ন সহজে করিতে পারে না । আর এই তত্ত্বের সমাধান অচ্ছই উপনিষদে অধিকারি-ভেদের এবং গুরু নিকট উপদেশ-গ্রহণের এসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে । যুক্তোপনিষদে লিখিত আছে,—“ক্রিয়াবান বেদাভুগত ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিকে এই বিজ্ঞা শিক্ষা দিবে।” যেতাবতর ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে,—“পুত্র বা শিষ্য ভিন্ন অস্ত্র কাহারও নিকট এ তত্ত্ব প্রকাশ করিবে না ।” কঠোপনিষদে আছে,—“বিশেষ পরীক্ষা ভিন্ন শিষ্য-গ্রহণও কর্তব্য নহে।” * নাটিকেত যখন যনের নিকট তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, যন নানারূপে নাটিকেতকে পরীক্ষা করিয়া—সর্ববিধ কাম্যবস্ত্র দান ও দীর্ঘজীবন প্রভৃতির প্রলোভন দেখাইয়া তাহাতেও ভুলাইতে না পারিয়া—পরিশেষে তাঁহাকে ব্রহ্মের স্বরূপ-তত্ত্ব-সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন । বাস্তবিক কথাই তাই । নচেৎ, পল্লবগ্রাহীর ত্রায় যে-সে ব্যক্তি উপনিষৎ পাঠ করিলে স্বরূপ-তত্ত্ব অবগত হইতে পারে কি ?

উপনিষৎ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ যাহা আলোচনা করিলাম, উপনিষদের কবিত্ব ও দার্শনিক তত্ত্বের আভাস তাহাতেই অল্প-বিস্তর পাওয়া যাইবে । পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ বলেন,—

উপনিষৎ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য-মত । “বৈদিক যাগযজ্ঞাদিতে একমাত্র কর্মকাণ্ডের প্রতি মাহুঘের মন যখন প্রধাবিত হইয়াছিল, মহুগ্ন সাধারণ যখন কর্মকাণ্ড ভিন্ন অস্ত্রাদিকে মনঃ-সংযোগ করিতে কুঠা বোধ করিত; সেই সময় কয়েক জন জন-হিত-পরায়ণ ঋষির মন সন্দেহ-দোলায় দোলায়মান হয় । তাঁহার চিন্তা করিতে থাকেন,—“কর্ম

* উপনিষৎ শিক্ষার অধিকারী সম্বন্ধে যুক্তোপনিষৎ, প্রথম যুক্তক, ১৩ শ শ্লোক; যেতাবতর উপনিষৎ, বর্ত অধ্যায়, ২২ শ শ্লোক; ছান্দোগ্যোপনিষৎ, তৃতীয় অধ্যায়, ১১ শ শ্লোক; বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, বর্ত অধ্যায়, ৩য় ব্রাহ্মণ, ১৩শ পদক্ষেপ হইয়াছে।

কি? কর্ত্ত্ব কেন করি? সবে সবে তাঁহাদের চিত্তে এক অতিনব দার্শনিক চিন্তার উন্মেষ হয়। তাঁহারা ভাবিতে আরম্ভ করেন,—বিষ কি? পরব্রহ্ম কি? আত্মা ও পরমাশ্রয় কি সম্বন্ধ বিद्यমান আছে? সেই চিন্তার ফলেই—উপনিষদের সৃষ্টি। উপনিষৎ মাহাত্ম্যের গন্তব্য পথ দেখাইয়াছেন, উপনিষৎ মাহাত্ম্যকে চিন্তা করিতে শিখাইয়াছেন, উপনিষৎ মাহাত্ম্যের বিবেক-শক্তির উন্মেষণ করিয়া দিয়াছেন, উপনিষৎ কর্ম্মকাণ্ডের অসারত্ব প্রতিপাদন করিয়া জ্ঞান-কাণ্ডে বহুস্তরের বুদ্ধি-বৃত্তি নিয়োগ করাইয়াছেন; মাহাত্ম্য অন্ধ-বিশ্বাসীর জ্ঞান কর্ম্ম-পথে প্রধাবিত না হয়,—মাহাত্ম্যের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া উপনিষৎ মাহাত্ম্যকে সত্যাপন প্রদর্শন করিয়াছেন। স্মৃত্যং, পরবর্ত্তি-কালে যে দর্শন-শাস্ত্রসমূহের উৎপত্তি হইয়াছে, উপনিষৎ তাহারই মূলভূত। উপনিষৎ-সম্বন্ধে পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের এই মত যে সর্ব্বথা স্বীকার্য্য, আমরা তাহা মনে করি না। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি,—কি কর্ম্মকাণ্ড, কি জ্ঞানকাণ্ড, বেদে সকল কাণ্ডেরই বীজ নিহিত আছে। হইতে পারে,—উপনিষদে একবিধ বীজের অনুরোধ; হইতে পারে,—উপনিষদে জ্ঞান-বীজ অনুরূপিত পল্লবিত শাখাপ্রশাখা-সম্বিত; কিন্তু তাই বলিয়া উপনিষৎ যে বেদ-বিরোধী, তাহা কোনক্রমেই প্রতিপন্ন হয় না। উপনিষৎ—বেদেরই একাত্তের ব্যাখ্যা-বিস্তৃতি মাত্র। যাহা হউক, উপনিষদের জ্ঞান-কাণ্ডের যিনি একবার পরিচয় পাইবেন, কি প্রাচ্য, কি পাশ্চাত্য, তিনি কখনই তাহা ভুলিতে পারিবেন না। জগৎপীর প্রসিদ্ধ দার্শনিক ‘সোপেনহার’ এই উপনিষৎ-সাগরে অবগাহন করিয়া কি শাস্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারই কথার মর্ম্মাভাষে সে পরিচয় পাওয়া যায়। উপনিষৎ পাঠ করিয়া, সোপেনহার একদিন উচ্চকণ্ঠে কহিয়াছিলেন,—“পৃথিবীতে উপনিষদের জ্ঞান উচ্চতাবর্ণূর্ণ শাস্তিপ্রদ গ্রন্থ বাক্য আর নাই। উপনিষৎ আমার ইহজীবনের সাধনা;—উপনিষৎ আমার মরণের সাধনা।” * অধুনা যে যে উপনিষৎ অহুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশেরই আকার ক্ষুদ্র; কোনও কোনও উপনিষৎ ছুইতিন পৃষ্ঠাতেই শেষ হইয়াছে। কেন, কঠ প্রভৃতি ধর্ম্মিণের নামাহ্বারে উপনিষদের নামকরণ হইয়া থাকে। উপনিষৎ-সমূহ কোনও এক নির্দিষ্ট সময়ে রচিত হইয়াছিল বলিয়া বুঝা যায় না। সুতরাং উপনিষৎ-রচনার কাল-নির্ণয়-সম্বন্ধে নানা মতান্তর দেখিতে পাই। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত এই যে, খৃষ্টজন্মের এগার শত হইতে সহস্র বৎসর পূর্বে উপনিষৎ-সমূহ রচিত হইয়াছিল। কিন্তু সে সিদ্ধান্ত যে সমীচীন নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধের অনেক পূর্বে উপনিষৎ বিद्यমান ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। মহাভারতে পুনঃপুনঃ উপনিষদের উল্লেখ আছে। সে হিসাবে, সাত আট সহস্র বৎসর পূর্বে উপনিষদের বিद्यমানতা সহজেই প্রতিপন্ন হয়; খৃষ্ট-জন্মের দশ সহস্র বৎসর পূর্বেও উপনিষদের অস্তিত্ব উপলব্ধি হইতে পারে। †

* “It has been the solace of my life; it will be the solace of my death.”—Schopenhauer.
Latin translation of the Upanishads quoted in Ancient India.

† মহাভারত ও কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ-বিষয়ক পরবর্ত্তী অধ্যায়ে তাহার সময়-নির্ণয়াদি দ্রষ্টব্য।

ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষদে ভারতবর্ষের কয়েকটি প্রধান রাজ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কুরু, পাঞ্চাল, কোশল, বিদেহ প্রভৃতি রাজ্য—ঐ সময়ে উন্নতির উচ্চচূড়ায় সমাক্রান্ত ছিল। দিল্লী ও তাহার চতুর্পার্শ্ববর্তী প্রদেশে প্রবল পরাক্রান্ত রাজস্বর্গের কুরুগণ রাজত্ব করিতেন ;—ঐ প্রদেশ কুরু রাজ্য ; কনৌজ ও তাহার চতুর্পার্শ্ববর্তী প্রদেশ পাঞ্চাল-রাজ্য ; উত্তর বিহার বিদেহ-রাজ্য ; অযোধ্যা ও তদন্তর্গত প্রদেশ কোশল-রাজ্য ; এবং বারাণসী ও তৎসন্নিকট প্রদেশ কানী-রাজ্য নামে অভিহিত হইত। জনক এবং অজাতশত্রু প্রভৃতি রাজগণ তৎকালে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যামন্দির এবং পরিষৎ প্রভৃতির পরিচয়ে পৃথিবীর সত্য-জ্ঞাতিগণ আশ্রিত ও গৌরব অনুভব করিয়া থাকেন। জনক, বিদেহ-দেশের এবং অজাত-শত্রু কানীর রাজা ছিলেন। উভয়েই বিদ্যোৎসাহী এবং সাহিত্যের উৎসাহদাতা বলিয়া প্রতিষ্ঠাযিত। যাজ্ঞবল্ক্য যজ্ঞসনৈয়ী প্রভৃতি পণ্ডিতমণ্ডলীতে রাজর্ষি জনকের রাজ-ভবন সর্বদা সমলঙ্কৃত ছিল। বিদ্যালোচনার জন্ত জনকের রাজধানীতে দেশ-দেশান্তর হইতে শিক্ষার্থিগণ আগমন করিত। বিদ্যোৎসাহিতার জন্ত রাজর্ষি জনকের প্রতিষ্ঠার অবশি ছিল না ; দেশ-দেশান্তরের অধিবাসিগণ সকলেই তাঁহাকে আপনাদের সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক বলিয়া মান্য করিত। রাজা অজাতশত্রু তজ্জন্ত এক সময়ে দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন,—“রাজা জনককে পৃষ্ঠপোষক বলিয়া মনে করিয়া সকলেই তাঁহার রাজ্যে চলিয়া যাইতেছে। ইহার অধিক আমার ক্ষোভের বিষয় আর কি হইতে পারে ?” বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই মর্মে রাজা অজাতশত্রুর আক্ষেপ প্রকাশ পাইয়াছে। রাজর্ষি জনকের সাহায্যে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য যজুর্বেদ সংকলন করেন। তৎ-সংকলিত যজুর্বেদ—‘শুক্র-যজুর্বেদ’ নামে পরিচিত। শতপথ ব্রাহ্মণের মূল ভিত্তিও যাজ্ঞবল্ক্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। যাজ্ঞবল্ক্য এবং তাঁহার বংশধরগণ পুরুষাভুক্রমে রাজর্ষি জনকের বৃত্তি-ভোগী হইয়া শাস্ত্রগ্রন্থ সংকলনে যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন, সংসারে চিরদিন তাহা রাজর্ষি জনকের এবং ঋষিগণের কীর্তিস্মৃতি-রূপে বিরাজমান থাকিবে। রাজর্ষি জনক এবং অজাতশত্রু—উভয়েরই পাণ্ডিত্য অতুলনীয়। কি ধর্ম্মালুচানে, কি পাণ্ডিত্য-প্রদর্শনে, ইহার দুই জনে সময়ে সময়ে পণ্ডিতগণকেও আশ্চর্য্যান্বিত করিতেন। সেই পাণ্ডিত্য-প্রভাবেই রাজর্ষি জনক ব্রাহ্মণের জায় সম্মান-সম্মত লাভ করিয়াছিলেন। উপনিষদে রাজর্ষি জনকের প্রতিষ্ঠার পরিচয় পদে পদে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সাহিত্যের ও সাহিত্যসেবার উৎসাহদাতা ছিলেন বলিয়া, রাজর্ষি জনক উপনিষদেও স্থান পাইয়াছেন। জনকের ব্রাহ্মণত্ব লাভ সম্বন্ধে শতপথ ব্রাহ্মণে একটী উপাখ্যান দৃষ্ট হয়। তাহাতে জানা যায়,—শ্বেতকেতু আরুণি, সোম, স্বয়ম্ভা, সত্যায়ি এবং যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি এক দিন জনকের রাজসভায় উপনীত হন। সভায় অগ্নিহোত্র যজ্ঞের বিষয় আলোচনা চলিতে থাকে। সেই আলোচনায় রাজর্ষি জনক ব্রাহ্মণগণেরও ভ্রম প্রদর্শন করেন ;—তাঁহার পাণ্ডিত্যে সকলকেই মুগ্ধ হইতে হয়। ফলে, সেই দৃষ্টেই জনক ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। শাস্ত্র-জ্ঞান সম্বন্ধে কেবল দেশের রাজা অশ্বপতি, গান্ধার্য্যী দেশের রাজা চিত্র এবং কানীর রাজা অজাতশত্রু প্রভৃতিও প্রতিষ্ঠাযিত ছিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

ষড়বেদাঙ্গ ।

[সূত্র-গ্রন্থ,—যাগযজ্ঞে জ্যোত-সূত্র, সমাজ-ধর্ম-পালনে ধর্মসূত্র, গার্হস্থ্য-ধর্মে গৃহসূত্র,—সূত্রের প্রকৃতি-পরিচয় ;—সূত্র-সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতামত ;—ষড়বেদাঙ্গের পরিচয়,—কল্পসূত্র, শিক্ষা, ছন্দসূ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ,—শিক্ষা-অঙ্গের স্বরবিজ্ঞানই আধুনিক সঙ্গীতের ও রাগ-রাগিণীর মূল,—ছন্দসূ-অঙ্গের বৈদিক সপ্ত ছন্দ হইতে অসংখ্য ছন্দের উৎপত্তি-পরিচয়,—বাল্মীকিই লৌকিক ছন্দের প্রবর্তক,—ব্যাকরণ-অঙ্গে পাণিনির প্রসঙ্গ,—নিরুক্ত অঙ্গে যাক্,—জ্যোতিষে ভাস্করাচায়া, বরাহ-মিহির,—অশ্বক্লমণিতে বিশদ সূচীপত্র বা নির্ঘণ্ট ;—বেদাঙ্গ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত,—বিভিন্ন বেদাঙ্গের সমালোচনা ।]

বেদ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষৎ,—এতৎসমুদায় ভগবৎ-প্রেরিত ; অত্যাশ্চ শাস্ত্র তদনুসরণেঋষিগণ প্রণয়ন করিয়াছিলেন ;—ইহাই হিন্দুর বিশ্বাস । ঋষিগণ-প্রণীত সেই

শাস্ত্র-সমূহের মধ্যে সূত্র প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আছে । উপ-
নিষদের পর, অথবা উপনিষৎ-প্রচারের সম-সময়ে, সূত্র-গ্রন্থ-সমূহ প্রণীত
হইয়াছিল,—ইহাই অনেকে অনুমান করেন । উপনিষদের দার্শনিক

চিন্তার ফলে, মনুষ্যের মন যখন চঞ্চল হইয়া উঠিল ; অধিকারি-ভেদে অনুষ্ঠান-ভেদ-নীতি যখন অনেকে বিস্তৃত হইতে লাগিল ; জনহিত-পরায়ণ ঋষিগণ, বেদের ব্রাহ্মণ-ভাগ হইতে সার-তত্ত্ব গ্রহণ করিয়া, সূত্রাকারে সংসারে প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন । ‘ব্রাহ্মণে’ যাহা বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ ছিল, সংক্ষিপ্ত সূত্রাকারে তাহাই হৃদয়ে হৃদয়ে গ্রথিত রাধিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল । হিন্দু-সন্তান মাঝেই ধর্মবিধি কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতে পারেন ;—আচারে, ব্যবহারে, আহারে, বিহারে, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহে,—সর্বকালে, সর্বকার্য্যে, সেই বিধি বিস্তৃত না হন ;—সূত্র-সমূহ এমনই ভাবে বিরচিত এবং প্রচারিত হইল । যিনি যত সংক্ষিপ্তভাবে সূত্র রচনা করিয়া তদ্ব্যবহারে অধিক তত্ত্বের সমাবেশ করিতে পারিলেন, তাঁহারই সূত্র তদনুরূপ সমাদর লাভ করিল । উপনিষদাদির ন্যায় ‘সূত্র’-গ্রন্থসমূহের অনেকই এখন বিলুপ্তপ্রায় । ক্রিয়াকর্ম্মে অধুনা যাহা ব্যবহৃত হয়, প্রধানতঃ তাহা তিন ভাগে বিভক্ত । প্রথম—শ্রোত-সূত্র ; দ্বিতীয়—ধর্ম-সূত্র ; তৃতীয়—গৃহ-সূত্র । শ্রোত-সূত্রে যাগযজ্ঞ বলিদান প্রভৃতির বিধি-বিধান নিবদ্ধ আছে ; কল্পসূত্র নিয়মাদি পরিপালন করিয়া সমাজ-মধ্যে বসবাস করিতে হয়, ধর্ম-সূত্রে সেই কর্তব্য-পালনের ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছে ; গৃহ-সূত্রে গৃহধর্ম্মের কথা,—অর্বাণ্ড পিতা, মাতা, পুত্র, পতি, পত্নী প্রভৃতি পরস্পরের অন্তর্ভুক্ত কর্ম্ম পরিবর্তিত আছে । জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সারাজীবনে গৃহস্থের যে কিছু কর্তব্যানুষ্ঠান প্রয়োজন, গৃহ-সূত্রে তাহাই নির্দিষ্ট হইয়াছে । হিন্দুগণ আজিও গৃহ-সূত্র অনুসারে জাতকর্ম্ম, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া থাকেন । তিন শ্রেণীর

হৃত্রের আবার নানা শাখা আছে। শ্রোত-হৃত্রের শাখার মধ্যে—আখ্যায়ন, সাঙ্খ্যায়ন, মশক, লাট্টায়ন, দ্রাহায়ন, বৌধায়ন, ভারদ্বাজ, আপস্তম্ব, হিরণ্যকেশীন, কাত্যায়ন; ধর্মহৃত্রের শাখার মধ্যে—বাসিষ্ঠ, গৌতম, বৌধায়ন, আপস্তম্ব; গৃহ-হৃত্রের শাখার মধ্যে—সাঙ্খ্যায়ন, আখ্যায়ন, পারশ্বর এবং গোভিল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। শ্রোত-হৃত্রের আখ্যায়ন এবং সাঙ্খ্যায়ন শাখা—ঋগ্বেদের অন্তর্গত; মশক, লাট্টায়ন এবং দ্রাহায়ন,—সামবেদের অন্তর্গত; বৌধায়ন, ভারদ্বাজ, আপস্তম্ব ও হিরণ্যকেশীন,—কৃষ্ণ-যজুর্বেদের অন্তর্গত; কাত্যায়ন শাখা—গুরু-যজুর্বেদের অন্তর্গত। আখ্যায়ন, সুবিখ্যাত শৌনকের শিষ্য ছিলেন। কথিত হয়,—শৌনক এবং আখ্যায়ন, গুরু শিষ্য একযোগে, ঐতরেয় আরণ্যকের শেষ দুই ভাগ সঙ্কলন করিয়াছিলেন। শৌনক-প্রণীত যোগহৃত্র তাঁহার প্রিয় শিষ্য আখ্যায়নের নামেই প্রচারিত হয়। কেহ কেহ বলেন—ঋগ্বেদে শৌনক ঋষি গৃহসমদ নামে পরিচিত ছিলেন। এদিকে আবার জন্মেজয় পরীক্ষিতের যজ্ঞক্ষেত্রেও শৌনকের আবির্ভাব দেখিতে পাই। ইহাতে মনে হয়, শৌনক-বংশ বহুকাল হইতেই পাণ্ডিত্যের জ্ঞান প্রসিদ্ধ ছিলেন। শ্রোত-হৃত্রের সাঙ্খ্যায়ন শাখা পশ্চিমে এবং আখ্যায়ন শাখা পূর্ব-প্রদেশে প্রচলিত বলিয়া অনুমিত হয়। সামবেদের অন্তর্গত মশক শ্রোত-হৃত্রে ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞকর্মের মন্ত্র-সমূহ ধারাবাহিকরূপে সজ্জিত আছে, এবং লাট্টায়ন শ্রোত-হৃত্রে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের উপদেশ-সমূহ নিবদ্ধ হইয়াছে। সামবেদের তান্দ্য বা পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণের সহিত এই দুই হৃত্রের বিশেষ সম্বন্ধ বিদ্যমান। লাট্টায়নের সহিত দ্রাহায়নের পার্থক্য অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। বৌধায়নাদি কৃষ্ণ-যজুর্বেদান্তর্গত শ্রোত-হৃত্র-চতুষ্টয়ে কৃষ্ণ-যজুর্বেদের যজ্ঞাদি প্রণালী বর্ণিত আছে। কাত্যায়ন শ্রোত-হৃত্র প্রধানতঃ শতপথ-ব্রাহ্মণের অনুসরণকারী। এই হৃত্রের প্রথম অষ্টাদশ কণ্ডিকার (অধ্যায়ের) সহিত শতপথ ব্রাহ্মণের প্রথম নয় অধ্যায়ের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য রহিয়াছে। কাত্যায়ন কেবল শ্রোত-হৃত্র-রচয়িতা বলিয়া নহেন; গৃহহৃত্র এবং প্রতিহার-হৃত্র রচনাও তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি আছে। ধর্মহৃত্রের মধ্যে প্রধান ধর্ম হৃত্র ছিল—“মাম্ব ধর্ম-হৃত্র” অর্থাৎ মমুর হৃত্র। প্রাচীন কালে সেই হৃত্রই অধিকতর আদরণীয় ছিল। কিন্তু এখন আর তাহা সন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। তবে বাসিষ্ঠ ও গৌতম ধর্মহৃত্রের মধ্যে তাহার অনেকাংশ উদ্ধৃত হইয়াছিল এবং সেই সকল অংশ এখনও প্রচলিত আছে। মমু এবং বাজবল্ক্য প্রভৃতির সংহিতা-সমূহ, বলা বাহুল্য, ধর্মহৃত্র হইতেই সমুদ্ভূত হইয়াছিল। পূর্বে যে হৃত্র-সমূহ কণ্ঠে কণ্ঠে অধিষ্ঠিত ছিল, পরবর্ত্তি-কালে পরিবর্ত্তিত আকারে তাহাই স্মৃতিরূপে প্রকটিত হয়। বিবাহের সময়, উপনয়নের সময়, শ্রাদ্ধের সময়, যে যজ্ঞ কর্মাদি হইয়া থাকে, গৃহহৃত্র অনুসারেই তাহা সম্পন্ন হয়। গৃহহৃত্র আজিও হিন্দুর দৈনন্দিন কর্মপরম্পরা নির্দেশ করিয়া রাখিয়াছে। শ্রোত-হৃত্র, ধর্মহৃত্র, গৃহ-হৃত্র—এই তিন হৃত্র একযোগে ‘কল্প-হৃত্র’ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। আপস্তম্বের কল্প-হৃত্র এখনও বর্ত্তমান আছে। তাহার প্রথম চতুর্বিংশ প্রণে বা ভাগে শ্রোত বা যাগযজ্ঞের কথা আছে, ষড়বিংশ ও সপ্তবিংশ ভাগে গৃহ-হৃত্রের বা গৃহ-ধর্মের কথা আছে; অষ্টাবিংশ ও উনত্রিংশ

সূত্রে ধর্মসূত্রের অর্থাৎ সামাজিক ভাবে চলিবার নিয়মাদি নিবদ্ধ রহিয়াছে ; এবং ত্রিংশ শ্লোকে ‘সুলভ-সূত্রে’ যজ্ঞের বেদী প্রভৃতি কিরূপভাবে প্রস্তুত হইবে, তাহাই নির্দিষ্ট হইয়াছে,—তাহাতে আর্ষ্য-হিন্দুগণের জ্যামিতি-বিজ্ঞার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

সূত্রসমূহ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের নানা মত দৃষ্ট হয় । কোন্ সূত্র কোন্ সময়ে রচিত হইয়াছিল, তাহার কালনির্ণয়েও আকাশ-পাতাল প্রভেদ দেখিতে পাই । ডাক্তার

বুলার প্রাচীন কালের বাবহারিক সাহিত্যের আলোচনা করিয়া

সূত্র-সম্বন্ধে

পাশ্চাত্য-মত ।

পাশ্চাত্য-জগতে প্রতিষ্ঠাপন্ন । ভারতবর্ষ সূত্রের পুনরুদ্ধার করিয়াও তিনি

যশস্বী হইয়াছেন । বোধায়ন এবং আপস্তম্ব ধর্ম-সূত্রের কাল-নির্ণয়

এসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন,—‘উভয় সূত্র-গ্রন্থ বহু শতাব্দী ব্যবধানে রচিত হইয়াছিল ।

আপস্তম্ব ধর্মসূত্র দক্ষিণ-ভারতে অন্ধ্র-রাজ্যগণের অভ্যুদয়কালে বিরচিত হইয়াছিল

বলিয়া বুঝিতে পারা যায় । কৃষ্ণা-নদীর তীরে এখন যেখানে অমরাবতী নগর প্রতিষ্ঠিত,

তাহারই সন্নিকটে অন্ধ্র-রাজ্যগণের রাজধানী ছিল । সেই রাজধানীতেই আপস্তম্ব জন্ম-

গ্রহণ করিয়াছিলেন । খৃষ্ট জন্মের তিন শত বৎসর পূর্বে তাঁহার জন্মকাল নির্দিষ্ট হইতে

পারে । আপস্তম্বের গ্রন্থে বেদান্ত, বেদান্ত এবং পূর্ব-মীমাংসার উল্লেখ আছে ; সুতরাং

ঐ সকল গ্রন্থ-রচনার পরবর্ত্তি-কালে তাঁহার বিদ্যমানতা প্রতিপন্ন হয় ।” কাত্যাযন-সম্বন্ধে

ম্যাক্সমুলারের মত,—‘কাত্যাযন খৃষ্টজন্মের চারি শতাব্দী পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন ।

তাঁহার গ্রন্থে পাণিনির ব্যাকরণের সমালোচনা আছে ; সুতরাং তিনি যে পাণিনির

পরবর্ত্তি-কালের, তাহাতে কোনই সংশয় থাকিতে পারে না ।” লাট্যায়ন এবং কাত্যাযনে

‘মগধ-দেশীয় ব্রহ্মবকু’ শব্দের উল্লেখ আছে বলিয়া, কেহ কেহ অনুমান করেন,—এই দুই গ্রন্থ

বৌদ্ধযুগে প্রণীত হইয়াছিল ; ‘যেহেতু ‘মগধ-দেশীয় ব্রহ্মবকু’ নামে প্রথম বৌদ্ধধর্মাবলম্বী-

দিগকে বুঝাইয়া থাকে । ‘সুলভ-সূত্রে’ যজ্ঞ-বেদী রচনার প্রণালী যে ভাবে বর্ণিত আছে,—

তাহা দেখিয়া ডাক্তার থিবে বিশ্বয়াবিষ্ট হইয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন,—‘এই বেদী-নির্মাণ-

প্রণালী ভারতীয় হিন্দুগণের জ্যামিতি-বিদ্যা-পারদর্শিতার প্রকৃষ্ট পরিচয় । এই হইতেই

পাশ্চাত্য-জাতি জ্যামিতি-জ্ঞান লাভ করিয়াছিল ।” প্রসিদ্ধ প্রাচ্য-ভাষাবিদ জর্জবীর ভন-

শ্রেডার একদিন বলিয়াছিলেন,—‘গ্রীক দার্শনিক পীথাগোরাস, খৃষ্ট-জন্মের ছয় শত বৎসর

পূর্বে, ভারতবর্ষ হইতে যে কেবল আশ্রয় দেহান্তর-গ্রহণ-তত্ত্ব শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা

নহে ; গণিত-বিজ্ঞানের মূল তত্ত্বও তিনি ভারতবর্ষ হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।” ‘সুলভ-

সূত্র’ সম্বন্ধে ডাক্তার থিবের আলোচনায়, ভন-শ্রেডারের সিদ্ধান্তই এখন দৃঢ়ীকৃত হইতেছে ।

যাহা হউক, পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের অনেক সিদ্ধান্ত সমীচীন হইলেও, শাস্ত্রাদি রচনার সময়-

নির্ণয়-সম্বন্ধে অনেক স্থলেই আমরা তাঁহাদের সহিত একমত হইতে পারি না । বোধায়ন

এবং আপস্তম্বের সময়-নির্ণয়-সম্বন্ধে ডাক্তার বুলার যাহা বলিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আমাদের

মতভেদ আছে । প্রথমতঃ, আপস্তম্ব ও বোধায়ন নামে একাধিক ঋষির পরিচয় পাওয়া যায় ।

স্মৃতিকারের মধ্যেও আপস্তম্ব আছেন ; সূত্রকারের মধ্যেও আপস্তম্ব আছেন ; আবার

বহুরূপেও আপস্তম্বের নামোল্লেখ আছে । সুতরাং সকল আপস্তম্বই যে একজনকে

বুঝাইয়াছে, তাহা কোনক্রমেই প্রতীত হয় না। সে হিসাবে, পরবর্তী আপস্তম্বগণকে প্রথম আপস্তম্বের বংশধর বলিয়া মনে হইতে পারে। অমরাবতীর নিকটস্থিত অকু-রাজগণের রাজধানীতে যে আপস্তম্ব বিদ্যমান ছিলেন, তিনি এবং বৈদিক কালের আপস্তম্ব কখনই এক-ব্যক্তি হওয়া সম্ভবপর নহে। কাত্যায়ন-সম্বন্ধেও এই একই কথা বলা যাইতে পারে। কাত্যায়ন নামে পুঙ্খাধিক ঋষির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম কাত্যায়ন,—কাত্যায়ন-গোত্র-প্রবর্তক অতি প্রাচীন ঋষি। তৈত্তিরীয় ও সাংখ্যায়ন আরণ্যক প্রভৃতিতে তাঁহার নাম উল্লিখিত হইয়াছে। দ্বিতীয় কাত্যায়ন,—ধর্ম্মগ্রন্থ-রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। কাত্যায়ন শ্রোত-সূত্রাদি তিনিই প্রণয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়। তৃতীয় কাত্যায়ন—গোভিল-পুত্র। গৃহ-সংগ্রহ ছন্দঃপরিশিষ্ট-প্রণেতা বলিয়া তিনি প্রসিদ্ধ। এই তৃতীয় কাত্যায়নই স্মৃতিপ্রণেতা কাত্যায়ন। কেহ কেহ বলেন,—ইনি এবং শ্রোত-সূত্র-প্রণেতা কাত্যায়ন উভয়েই এক ব্যক্তি; কিন্তু তাহার বিশেষ কোনও প্রমাণ নাই। চতুর্থ কাত্যায়ন,—বরকৃষ্ণি কাত্যায়ন নামে পরিচিত। ইনি পাণিনি-সূত্রের ব্যক্তিককার। পঞ্চম কাত্যায়ন,—একজন বৌদ্ধাচার্য্য ছিলেন। এতদ্ভিন্ন ‘হরিবংশে’ বিশ্বামিত্র-বংশীয় বহু কাত্যায়নের নাম পাওয়া যায়। জৈনদিগের একজন স্মৃতিবিরের নামও কাত্যায়ন ছিল। স্মৃতরাং শ্রোত-সূত্র-রচয়িতা কাত্যায়ন, আর বৌদ্ধ-যুগের ‘মগধ-দেশীয় ব্রহ্মবজ্জ’ নামে অভিহিত কাত্যায়ন,—অভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না। ধর্ম্মসূত্র-সমূহের মধ্যে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে, গৌতম-সূত্র সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। বোধায়ন-সূত্রে গৌতম-সূত্রের প্রায় সমস্ত অংশই উদ্ধৃত আছে; আবার বাসিষ্ঠ-সূত্রে বোধায়নের উদ্ধৃত অংশ পুনরুদ্ধৃত হইয়াছে। আপস্তম্ব সূত্রে, বোধায়ন-সূত্রের বহু অংশ দেখিতে পাওয়া যায়। স্মৃতরাং এতৎসমুদায়ের মধ্যে গৌতম-সূত্রই আদি-সূত্র। এই সকল ধর্ম্ম-সূত্রের মধ্যে বাসিষ্ঠ, গৌতম, বোধায়ন, আপস্তম্ব প্রভৃতি সূত্র—ডাক্তার বুলার কর্তৃক পাশ্চাত্য-ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। অথচ, ক্ষেত্রের বিষয়, ঐ সকল সূত্র এদেশে এখন অল্পসন্ধান করিয়া পাওয়া দুর্লভ।

প্রধানতঃ, বেদের ছয়টি অঙ্গ; ষড়বেদাঙ্গ নামে তাহা অভিহিত হয়। সূত্র-গ্রন্থ সমূহ—‘কল্প-সূত্র’ নামে ষড়বেদাঙ্গেরই অন্তর্ভুক্ত। এই ষড়বেদাঙ্গের নাম,—(১) শিক্ষা, (২) ছন্দসু, (৩) ব্যাকরণ, (৪) নিকৃন্ত, (৫) জ্যোতিষ, (৬) কল্পসূত্র।

ষড়-বেদাঙ্গ। ‘শিক্ষা’ গ্রন্থ,—স্বর-বিজ্ঞান-বিশেষ। বৈদিক যজ্ঞসমূহ কিরূপ স্বরে উচ্চারণ করা কর্তব্য, ‘শিক্ষা’-গ্রন্থে তাহাই বিবৃত আছে। উদাত্ত, অমুদাত্ত,

স্বরিত,—এই তিন স্বরে বৈদিক যজ্ঞসমূহ গীত হইত। উচ্চারণের তারতম্যানুসারে, স্বরের শুদ্ধাভিক্রমে, পূজোপাসনা সিদ্ধ অসিদ্ধ হয়,—বৈদিক যুক্তে স্বরযোজনায় পদ্ধতিতে তাহাই বুঝা যায়। আধুনিক লৌকিক গানে প্রধানতঃ সাতটি স্বর প্রচলিত আছে। স, ঋ, গ, ঞ, প, ধ, নি,—সেই সপ্ত স্বরের অভিব্যক্তি। বৈদিক যজ্ঞসমূহ—উদাত্ত, অমুদাত্ত, স্বরিত—এই তিন স্বরেই গীত হইত। এখনকার উদারী, মৃদারী, তারী,—এই ত্রিবিধ উচ্চারণ-স্থানের সহিত তাহাদের সাদৃশ্য ছিল,—অনেকে এইরূপ অনুমান করেন। বাহা উচ্চস্বর, তাহাই ‘উদাত্ত’; বাহা মৃদুস্বর, তাহাই ‘অমুদাত্ত’; আর বাহা উভয় স্বরের

মধ্যবর্তী কোমলে কঠোরে সংমিশ্রিত, তাহাই ‘স্বরিত’ স্বর। উদাত্ত, অম্লদাত্ত, স্বরিত,— এই তিন স্বরের সংমিশ্রণে যে স্বরের উৎপত্তি হয়, তাহা ‘একশ্রুতি স্বর’; রোদনে বা আত্মান-কালে এই স্বর ব্যক্ত হয়। বাহা হউক, বৈদিক মন্ত্র পাঠের উপযোগী সেই স্বর-সমূহের পরিচয়, এখন ক্ৰটিং পাওয়া যায়; এখনকার স্বর-বিজ্ঞানে স-ঋ-গ-ম-প-ধ-নি অর্থাৎ ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ,— এই সপ্তস্বরই প্রচলিত। অধুনা-প্রচলিত এই সপ্তস্বর যে বৈদিক স্বরত্রয় হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। ‘শিক্ষা’-গ্রন্থে এই স্বর-বিজ্ঞানেরই পরিচয় পাওয়া যায়। উদাত্ত হইতে নিষাদ ও গান্ধার স্বরের উৎপত্তি; অম্লদাত্ত হইতে ঋষভ ও ধৈবত; এবং স্বরিত হইতে ষড়্জ, মধ্যম ও পঞ্চম স্বরের উৎপত্তি হইয়াছে। উদাত্ত, অম্লদাত্ত, স্বরিত—এই তিন প্রকার উচ্চারণ-ভেদ বুঝাইবার জন্ত, বৈদিক গ্রন্থসমূহে অনেক স্থলে শব্দান্তর্গত বর্ণের উপরে ও নিম্নে ত্রিবিধ পরিচয়-চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। নিম্নে সেইরূপ পরিচয়-চিহ্ন-সমন্বিত একটা ঋক্ উদ্ধৃত করিতেছি। ঋকের কোন্ অংশ কিরূপ স্বরে উচ্চারণ করিতে হইবে, তদ্বশে বুঝা যাইবে। ঋক্টি এই:—

চন্দ্রমা অপ্স স্তুরা সুপর্ণো ধাবতে দিবি। নবে হিরণ্য

নেময়ঃ পদং বিন্ধতি বিহ্বাতো বিত্তং মে। অশ্ব রোদসী।

ঋক্টির উপরে ও নীচে লক্ষ্য করিলে, দেখিতে পাওয়া যাইবে—ত্রিবিধ সঙ্কেত-চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রথমতঃ, চন্দ্রমা, সুপর্ণো, নবে, নেময়ঃ শব্দের অন্তর্গত চ্, প, বে, যঃ প্রভৃতি বর্ণের শিরোভাগে দণ্ডাকারে বিস্তৃমান যে রেখা (|) আছে, তাহা উদাত্ত-সঙ্কেত। উদাত্ত-উচ্চারণ ঐরূপ রেখায় বুঝাইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ, ঐ রেখা ঐরূপ লম্বভাবে বর্ণের নিম্নভাগে অবস্থিত হইলে, তদ্বারা অম্লদাত্ত স্বর সূচিত হইবে; সুপর্ণো, হিরণ্য শব্দদ্বয়ের অন্তর্গত স্ ও র বর্ণের নিম্নস্থিত রেখা-চিহ্ন অম্লদাত্ত উচ্চারণের পরিচায়ক। তৃতীয়তঃ, ঐ রেখা শায়িতভাবে শব্দের নিম্নে অবস্থিত হইলে তদ্বারা স্বরিত উচ্চারণের সঙ্কেত বুঝিতে হইবে; স্তুরা, দিবি, বিহ্বাতো প্রভৃতি শব্দের নিম্নস্থিত শায়িত ঋক্ রেখা (—) তাহারই পরিচায়ক। অধুনা সঙ্গীত-শাস্ত্রে রাগরাগিনী-তাললয়ের যে সঙ্কেত-চিহ্ন ব্যবহৃত হয়, বলা বাহুল্য, তৎসমুদায় এই বৈদিক মন্ত্রাদির উচ্চারণ-চিহ্নেরই অমূলকৃতি মাত্র। উদাত্তাম্লদাত্তস্বরিত স্বরে গীত হইলে ত্রিস্বর্য বা ত্রিস্বরে গীত, এবং স-ঋ-গ-ম প্রভৃতি সপ্তস্বরে গীত হইলে গানগুলি সপ্তস্বর্য বা সপ্তস্বরযুক্ত গান বলিয়া কথিত হইত। শ্রীরাষচন্দ্রের রাজসভায় কুশীলব যে রামায়ণ-গান করেন, তাহা সপ্তস্বর্য বা সপ্তস্বরে গীত হইয়াছিল। বাহা হউক, সঙ্গীত-স্বর-সম্বন্ধেও প্রাচীন আর্য্য-হিন্দুগণ কিরূপ অভিজ্ঞ ছিলেন,—বৈদিক কালেও ভারতবর্ষ যে স্বর-বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠা-লাভ করিয়াছিল,— ‘শিক্ষা’ তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ এবং আরণ্যক হইতেই যে ‘শিক্ষা’-গ্রন্থ সম্বলিত হইয়াছিল, বিবিধ প্রকারে তাহা প্রতিপন্ন হয়। প্রত্যেক বেদের প্রত্যেক শাখার

উচ্চারণের জন্য এইরূপ শিক্ষা-গ্রন্থের প্রচলন ছিল, এবং তৎসমুদায় ‘প্রতিশাখা’ (প্রতিশাখ্য) নামে অভিহিত হইত। সকল প্রতিশাখাই এখন বিলুপ্তপ্রায়। এখন মাত্র তিন বেদের তিনটি মাত্র প্রতিশাখা খুঁজিয়া পাওয়া যায়। সামবেদের প্রতিশাখা একেবারেই লোপ পাইয়াছে। ঋগ্বেদের প্রতিশাখা মহামুনি সনক কর্তৃক বিরচিত হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। গুরু-যজুর্বেদের প্রতিশাখা কাত্যায়ন প্রণয়ন করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু তাহাও এখন লোপ পাইয়াছে। কৃষ্ণ-যজুর্বেদের এবং অথর্ববেদের প্রতিশাখাও এখন বিলুপ্তপ্রায়। তবে কৃষ্ণ-যজুর্বেদের একটি প্রতিশাখা-প্রবর্তকের মধ্যে বায়্বাকির নাম দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু তিনি কোন্ বায়্বাকি, কেহই তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন না। শিক্ষা বা স্বর-বিজ্ঞানের পর, ছন্দঃজ্ঞানের উপযোগিতা অল্পভূত হয়। এই ছন্দঃ-গ্রন্থের বীজ—বেদে, অঙ্কুরোদগম—আরণ্যকে, শাখা-প্রশাখা—উপনিষদে। ছন্দঃজ্ঞান ভিন্ন যজ্ঞকর্ম বা বেদাধ্যয়ন অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়; ছন্দঃজ্ঞান ভিন্ন বেদ-পাঠ পণ্ড হয়; তাই ‘ছন্দঃ’-গ্রন্থ বেদাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত। ছন্দঃজ্ঞান ভিন্ন রস-গুণ-দোষ উপলব্ধি হয় না; ছন্দঃজ্ঞান ভিন্ন উচ্চারিত শব্দ-সমূহ স্বরূপে প্রবেশ করে না; তাই ছন্দের প্রাধান্য পরিকল্পিত হইয়াছে। বেদে সাতটি ছন্দের উল্লেখ দেখিতে পাই;—গায়ত্রী, উষিক, অমৃষ্টুভ, বৃহতী, পংক্তি, ত্রিষ্টুভ, জগতী। সন্ধ্যা-বন্দনায় ব্রাহ্মণ মাঝেই প্রত্যহ এই সকল ছন্দের পরিচয় পাইয়া থাকেন। চব্বিশ অক্ষরে (বা স্বরবর্ণে) তিন চরণে নিবদ্ধ যে ছন্দঃ, তাহাই গায়ত্রী। উষিক ছন্দে আটাইশটি অক্ষর, অমৃষ্টুভে বত্রিশটি, বৃহতীতে ছত্রিশটি, পংক্তিতে চল্লিশটি, ত্রিষ্টুভে চুয়াল্লিশটি, এবং জগতীতে আটচল্লিশটি অক্ষর আছে। বেদ-ব্যবহৃত এই সাতটি ছন্দঃ,—‘দৈবিক ছন্দঃ’ নামে অভিহিত। মহর্ষি কাত্যায়ন তাঁহার সর্বাঙ্গুক্রমণিকা-গ্রন্থে এই সাতটি দৈবিক ছন্দের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তি-কালে আর আর যে সকল ছন্দঃ প্রচলিত হইয়াছে, তাহা লৌকিক ছন্দঃ। বায়্বাকিই লৌকিক ছন্দের আবিস্কর্তা বলিয়া কথিত হন। তাঁহার মুখনির্গলিত “মা নিষাদ” ইত্যাদি কবিতাই লৌকিক ছন্দের আদিভূত।

“মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাংস্বগমঃ স্বাশ্বতীঃ সমাঃ । যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধাঃ কামমোহিতং ॥”

শ্লোকের পর, কত শ্লোক, কত ছন্দঃ, বিভিন্ন ভাষায় বিরচিত হইয়াছে,—কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? সংস্কৃত-সাহিত্যে দুই শতাব্দিক ছন্দের প্রচলন আছে, এবং তন্মধ্যে পঞ্চাশ প্রকার ছন্দঃ সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। রক্ত ও মাত্রারূপ ভেদে লৌকিক ছন্দঃ-সমূহ দ্বিবিধ। গুরু লঘু ও স্বর সংখ্যার নিয়মানুসারে রক্ত এবং কেবলমাত্র মাত্রার নিয়মানুসারে মাত্রারূপ ছন্দঃ রচিত হইয়া থাকে। লৌকিক ছন্দের যে সকল গ্রন্থ অধুনা প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে পিজলাচার্য্য রচিত ছন্দঃগ্রন্থ এবং ছন্দঃ-মঞ্জরী প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ। ঋগ্বেদের ‘প্রতিশাখার’ শেষভাগে বৈদিক ছন্দঃ-সম্বন্ধে কয়েকটি অধ্যায় আছে। সাম-বেদান্তর্গত নিদান-সূত্রেও ছন্দের আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। ছন্দের পর, ব্যাকরণের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়া থাকে। ব্যাকরণও বেদাঙ্গ-বিশেষ। বৈয়াকরণের মধ্যে পাণিনিই এখন আদি-স্থান অধিকার করিয়া আছেন। পাণিনির ব্যাকরণের পূর্বে আর যে সকল ব্যাকরণ প্রচলিত ছিল, এখন আর তাহার অস্তিত্ব প্রায়ই অহুসঙ্কান করিয়া পাওয়া যায় না।

পাণিনির ব্যাকরণে “ব্যাখ্যা: প্রাচ্য”, “লভ: শাকটায়ন” প্রভৃতি হ্রস্ব দেখিয়া প্রতীত হয়,—পাণিনির পূর্বে অজ্ঞাত আচার্য্যগণের ব্যাকরণ প্রচলিত ছিল। পাণিনির ব্যাকরণে যাক, পারস্কর, শাকটায়ন, ব্যাস এবং তাঁহাদের শিষ্য-পরম্পরার উল্লেখ আছে; তাহাতেও বুঝিতে পারা যায়,—পাণিনির পূর্বে ঐ সকল বৈয়াকরণের রচিত ব্যাকরণ প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছিল। অমুসন্ধানে আরও প্রতিপন্ন হয়, অপিশালী, কাশ্যপ, গার্গেয়, গালব, শত্রু-বর্ষণ, ভারদ্বাজ, শাকল্য, সেনাকা এবং ক্ষোটায়ন প্রভৃতি বৈয়াকরণ পাণিনির পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন। কেহ কেহ বলেন,—তখন সন্ধি, সুবন্ত, কৃদন্ত, তদ্ধিত প্রভৃতি শিক্ষার জন্ত ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ অমুসন্ধান করিতে হইত; কিন্তু পাণিনির হ্রস্ব-সমূহে তৎসমুদায় সংক্ষেপে একত্র লিপিবদ্ধ হওয়ায়, সেই সকল গ্রন্থের প্রচার কমিয়া আসে। যাহা হউক, এখন আর সে সকল গ্রন্থ সম্ভান করিয়া পাওয়া যায় না। অমুনা-প্রচলিত ব্যাকরণের মধ্যে পাণিনি, যুদ্ধবোধ, কলাপ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। বৈদিক সাহিত্যের পরিচয়ের জন্ত যে ‘প্রতিশাখা’-সমূহ বিদ্যমান ছিল, প্রকারান্তরে তাহাকে বৈদিক ব্যাকরণ বলা যাইতে পারে। পাণিনি, কাত্যায়ন, বাড়ি, গালব, ভাণ্ডরি, পতঞ্জলি, বর্ষ প্রভৃতি যে সকল বৈয়াকরণ ছিলেন, তাঁহাদের ব্যাকরণ অল্পসারে পরবর্ত্তি-কালে যে ভাষা লিখিত হইতে আরম্ভ হয়, তাহাতে বেদের ভাষা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়;—সংস্কৃত ভাষায় সেই হইতে যেন এক নূতন স্তরের উৎপত্তি হয়। বেদান্তের অপর গ্রন্থের নাম—‘নিকৃক্ত’। এই নিকৃক্তের বিষয় পূর্বেই আমরা উল্লেখ করিয়াছি। * সেই নিকৃক্তকারগণের মধ্যে যাকের নিকৃক্তই এখন প্রচলিত। নিকৃক্ত বলিতে এখন যাকের নিকৃক্তই বুঝাইয়া থাকে। অপরাপর নিকৃক্ত লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে। নিকৃক্ত গ্রন্থে বৈদিক শব্দের ও বাক্য-সমূহের অর্থ লিখিত আছে বলিয়া, উহা বেদান্ত-মধ্যে পরিগণিত। অজ্ঞাতম বেদান্তের নাম—‘জ্যোতিষ’ বা জ্যোতিষশাস্ত্র। বদ্বারা সূর্য্যাদি গ্রহের অবস্থান-বিষয়ে জ্ঞান-লাভ হয়,—গ্রহাদির গতি-স্থিতি প্রভৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞতা জন্মে,—তাহাই জ্যোতিষশাস্ত্র। বেদবিহিত যজ্ঞকর্ম্ম সম্পন্ন করিতে হইলে, গ্রহাদির অবস্থান-কাল সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ প্রয়োজন, আর জ্যোতিষ-শাস্ত্রই সে জ্ঞান-প্রদানের উৎসস্থানীয়,—এই জন্তই জ্যোতিষ-শাস্ত্র বেদান্ত-মধ্যে পরিগণিত। বেদে জ্যোতিষের বীজ নিহিত ছিল; পুরাকালে ঋষি-মহর্ষিগণ তদনুসারে কাল-গণনা করিয়া লইতেন; পরিশেষে ভাস্করাচার্য্য, বরাহ-মিহির প্রভৃতি তৎসমুদায় লিপিবদ্ধ করিয়া যান। কি ঋগ্বেদে, কি যজুর্বেদে, কি অথর্ববেদে,—কোনও-না-কোনও আকারে এই জ্যোতিষ-শাস্ত্রের পরিচয় আছে। ষড়্-বেদান্তের সঙ্গে সঙ্গে অমুক্রমণি বা অমুক্রমণিকা উল্লেখযোগ্য। উহা নির্ঘণ্ট বা বিশদ সূচীপত্রবিশেষ। কি বেদ, কি হ্রস্ব, কোন গ্রন্থের কোথায় কি আছে, অমুক্রমণি বা নির্ঘণ্টে তাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ঋগ্বেদের সাতখানি অমুক্রমণির নামোল্লেখ আছে। তন্মধ্যে কাত্যায়ন-প্রণীত ঋগ্বেদ-অমুক্রমণি বিশেষ প্রসিদ্ধ। যজুর্বেদের তিন খানি অমুক্রমণির পরিচয় পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কৃষ্ণ-যজুর্বেদের আত্রেয় এবং গুরু-যজুর্বেদের

* এই গ্রন্থের চতুর্থ পরিচ্ছেদে ৫৯ পৃষ্ঠায় ‘নিকৃক্ত’ বিষয়ক আলোচনা দ্রষ্টব্য।

মাধ্যমিক প্রভিষ্ঠা দ্বিত। সামবেদের অমুক্তমণির মধ্যে আৰ্য অমুক্তমণি প্রসিদ্ধ ; তাহার নাম—নৈগেয়ানামুক্তমণি । অথর্ববেদের অমুক্তমণির নাম—বৃহৎ সর্গামুক্তমণি ।

বেদ, বেদান্ত, বেদান্ত—সাত্ত্বিক-সাহিত্যের তিনটি স্তর-বিশেষ । সে হিসাবে, তদ্বারা ত্রিবিধ সাহিত্যের তিনটি যুগ-পরিচয় নির্দিষ্ট হয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না । একই সংস্কৃত

পাশ্চাত্য
পণ্ডিতগণের
মত ।

ভাষার ক্রমে ক্রমে কিরূপ পরিবর্তন সাধিত হইয়া আসিয়াছে, তাহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায় । বেদের সহিত ব্রাহ্মণের, ব্রাহ্মণের সহিত আরণ্যকের, আরণ্যকের সহিত উপনিষদের, এবং উপনিষদের সহিত

সূত্র-গ্রন্থের—ভাষা-ভাবের কি আকাশ-পাতাল পার্থক্য ! বেদ হইতে সূত্র-গ্রন্থের ভাষা-ভাবের তারতম্য আলোচনা করিলে, কত কালে ঐ পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল, কে নির্ণয় করিতে পারেন ? তার পর, আজি পর্য্যন্ত কত স্তরে কত কালে কত ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহারও সময়-নির্ণয় করিতে গেলে বিশ্বয়-সাগরে নিমজ্জিত হইতে হয় । সেই কত কোটী কল্প কালের বেদ,—কোন্ অরণ্যভীত যুগের ব্রাহ্মণ, উপনিষৎ, সূত্র-গ্রন্থ ;—অথচ, আজিও—এই বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য-উন্নতির পূর্ণ-প্রভাবের দিনেও—তাহার সমকক্ষতা-লাভে কেহই সমর্থ নহে । অধিক বলিব কি !—এখন যতই যিনি সেই পুরাতন কাহিনী আলোচনা করিতেছেন, কি প্রাচ্য, কি পাশ্চাত্য, সকলেই তাহাতে চমকিত হইতেছেন । কোন্ বিষয়ের কথা বলিব ? ‘ব্রাহ্মণের’ বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া, অধ্যাপক ওয়েবার বলিয়াছেন,—“মন্ত্রগ্ৰন্থের জ্ঞান যতদূর উচ্চ-চিন্তার সমাধান করিতে সমর্থ, ব্রাহ্মণে হিন্দুগণ তাহারই পরিচয় দিয়া গিয়াছেন ।” গুরু-যজুর্বেদের প্রতিশাখার কথা কহিতে গিয়া, অধ্যাপক উইলসন বলিয়াছেন,—“স্বর-বিজ্ঞান-সম্বন্ধে এমন সর্গব্যবসম্পন্ন সূক্ষ্ম-তত্ত্ব আবিষ্কারে পৃথিবীর কোনও জাতি আজি পর্য্যন্ত সমর্থ হয় নাই ।” তিনি আরও বলিয়াছেন,—“প্রাচীন গ্রীকগণ ব্যাকরণের পদ-পরিচয়-সম্বন্ধে কত কাল পর্য্যন্ত অনভিজ্ঞ ছিলেন ! প্লেটোর সময়ে বিশেষ্য এবং ক্রিয়াপদ যাত্রের ব্যবহার প্রচলিত ছিল । আরিস্টোটল ঐ দুই পদের অধিক পদের ব্যবহার জানিতেন না । অলঙ্কার-বিষয়ক নিয়মাবলী আলোচনার সময় আরিস্টোটল, অব্যয় এবং বিশেষণ (Conjunction এবং Article) পদের আবশ্যকতা কিয়ৎপরিমাণে উপলব্ধি করিয়াছিলেন । জেনোডোটারের পূর্বে সর্গনামের প্রয়োগ গ্রীক-ভাষায় প্রচলিত হয় নাই ; আরিস্টারকোস প্রথম অব্যয় (Preposition) ব্যবহার করেন । কিন্তু গুরু-যজুর্বেদের প্রতিশাখায় পদ-পরিচয় কি বিশদভাবেই পরিবর্ণিত !” আগরা কলেজের অধ্যাপক অধ্যাপক টমসন একজন প্রসিদ্ধ ভাষাবিজ্ঞানবিৎ ছিলেন । তিনি বলিয়া গিয়াছেন,—“সংস্কৃত ভাষায় ব্যঞ্জনবর্ণের সৃষ্টি—মানব-প্রতিভার অদ্বিতীয় পরিচয় । এ বিষয়ে ইউরোপীয়গণ আজি পর্য্যন্ত হিন্দুগণের পশ্চাতে পড়িয়া আছেন ।” অধ্যাপক ম্যাকডোনাগ বলেন,—“বিজ্ঞানের এই উন্নতির যুগে, আড়াই হাজার বৎসর পরে, আজিও আমরা (ইউরোপীয়গণ) বর্ণমালার অসম্পূর্ণতা দূরীকরণে সমর্থ হইলাম না । আমাদের বর্ণমালা এখনও আমাদের ভাষায় সর্ববিধ শব্দ প্রকাশ করিতে সমর্থ নহে । তিন সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে আদিম সেমিটিক জাতির

নিকট হইতে গ্রীকগণ যে উপাদান গ্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহাই এখন ‘তাল পাকাইয়া’ আমাদের বর্ণমালা-রূপে অসম্বন্ধভাবে বিরাজমান আছে।” রেভারেন্ড মিঃ ওয়ার্ড বলেন,—“কি প্রাচীন, কি আধুনিক, কোনও জাতিই ভাষা-বিজ্ঞানে হিন্দু-জাতির সমকক্ষতা লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই।” অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার বলেন,—“সমগ্র ভাষা কতকগুলি ষাতুর উপর প্রতিষ্ঠিত—এই অভিনব ভাবের উন্মেষ ইউরোপে ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে দেখিতে পাওয়া যায় না। ঐ সময়ে হেনরী এষ্টন প্রথমে এই বিষয়ে মস্তিষ্ক-চালনা করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু ভারতবর্ষে, খৃষ্ট-জন্মের অনূন পাঁচ শত বৎসর পূর্বে, ভারতীয় ব্রাহ্মণগণ এই দার্শনিক-বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ ছিলেন।” সার উইলিয়ম হার্টারকে পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে হইয়াছে,—“পাশ্চাত্য-দেশের বৈয়াকরণ-গণ যখন ভাষা-বিজ্ঞান-সম্বন্ধে সন্দেহ-দোলায় দৌড়াইয়াছেন, ভারতে তখন ভাষা-বিজ্ঞানের পূর্ণতা সাধিত হইয়াছিল।” ব্যাকরণ-বিষয়ে ভারতবর্ষ কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে একমাত্র পাণিনির ব্যাকরণ দেখিয়াই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ চমকিত। অধ্যাপক মনিয়ার উইলিয়ামস্ বলেন,—“ব্যাকরণ-সম্বন্ধে এরূপ মৌলিক গ্রন্থ পৃথিবীতে আজিও প্রকাশিত হয় নাই।” অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারেরও মত,—“হিন্দুগণ ভাষা-ব্যাকরণ সম্বন্ধে যে রূপ উচ্চ-স্থান অধিকার করিয়া আছেন, পৃথিবীর কোনও জাতি আজি পর্য্যন্ত সে স্থান অতিক্রম করিতে সমর্থ নহেন।” * কত দেখাইব? আৰ্য্য-হিন্দুগণ যে সর্ব বিষয়েই শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া ছিলেন, যে দিক দিয়াই দেখি, তাহাই প্রতিপন্ন হয়। বেদাঙ্গ প্রভৃতি রচনার কাল-নির্ণয় দুষ্কর। বড়বেদাঙ্গ এক-সময়ে রচিত হইয়াছিল বলিয়া কখনই মনে হয় না। পণ্ডিতগণ অনুমান করিয়া দেখিয়াছেন,—খৃষ্ট-জন্মের সহস্র বৎসর পূর্বে হইতে তিন শত বৎসর পূর্ববর্তী কালে বেদাঙ্গ-গ্রন্থ রচিত হওয়া সম্ভবপর। তাঁহাদের মতে, নিকরুক্তকার যাক্ষ খৃষ্ট-পূর্ব নবম শতাব্দীতে, এবং বৈয়াকরণ পাণিনি খৃষ্ট-পূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।† সুশভ-সূত্র বা জ্যামিতি-তত্ত্ব খৃষ্ট-পূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে এবং অত্রায়া হুত্র-সমূহ খৃষ্ট-পূর্ব অষ্টম হইতে চতুর্থ শতাব্দীতে বিরচিত হইয়াছিল। কিন্তু এই সকল সিদ্ধান্ত যে প্রামাণ্য-পরিপূর্ণ, তাহা কোনক্রমেই স্বীকার করা যায় না। যিনি যাহা বলিয়াছেন, সকলেই আপনাপন অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া আপন মত-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই বলিয়াছেন।

* “হিন্দু-সুপিরিওরিটি”-গ্রন্থে (*Hindu Superiority*) এই বিষয়ের বিশদ আলোচনা দ্রষ্টব্য।

† পাণিনির পূর্ববর্তী বৈয়াকরণ-গণের যথার্থ্যোপায় পরিচয় প্রদান করিবার উপাদান এখন বড়ই বিয়ল। হুত্রাং, পাণিনির ব্যাকরণই এখন আদি-স্থান অধিকার করিয়া আছে। প্রচার এই,—পাণিনি মহেশ্বরের নিকট উপদেশ পাইয়া আপন ব্যাকরণ রচনা করেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে গোষ্ঠষ্ট্কার পাণিনি-সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। গোষ্ঠষ্ট্কারের মতে,—পাণিনি ও তাঁহার বার্ত্তিককার কাত্যায়ন ১৪০ হইতে ১২০ পূর্ব-খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। পাণিনির ব্যাকরণ আট অধ্যায়ে বিভক্ত বলিয়া, উহা “অষ্টাধ্যায়ী” নামে অভিহিত হয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের পাদসংখ্যা চারিটী করিয়া। গ্রন্থের মোট সূত্র-সংখ্যা ৩২৬৫টি। সূত্র-সমূহের আকৃতি-পরিচয় বুঝাইবার জন্ত, নিম্নে তিনটি সূত্রের উল্লেখ করিতেছি,—
(১) ছন্দসো গঃ (২) ক বা পা জি মি স্বদি সাধাঃ পুতউন্ (৩) দু সনি জনি চরি চটিভো তুণ। মুদ্বোধ-ব্যাকরণ-রচয়িতা বোণদেব এবং কলাপ-ব্যাকরণ-রচয়িতা শর্কবর্মা পাণিনির সূত্রগুলিকে অধিকতর সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনটি সূত্র কলাপ ব্যাকরণে “ক বা পা জি মি স্বদি সাধাঃ দু সনি জনি চরি চটিভা উপ” এই একটি সূত্রে গ্রথিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, টীকা ভিন্ন এ সকল সূত্র বোধগম্য হওয়া দুষ্কর।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।



ষড়দর্শন ।

[দর্শন-শাস্ত্রে জ্ঞানকাণ্ড,—ষড়দর্শনের পরিচয়,—চার্কাব-দর্শনে নিরীখরবাদ,—দর্শন-শাস্ত্রের সারসংক্ষেপ,—
চুঃখনাশে বোকালাভই প্রধানতঃ প্রতিপাদ্য,—ভিন্ন ভিন্ন দর্শনের পার্থক্য-তত্ত্ব ;—হিন্দু-দর্শনের ও পাশ্চাত্য
দর্শনের ('কিস্তজিকি') অর্থভেদ,—প্রসিদ্ধ ইউরোপীয় দার্শনিকগণ,—পদার্থ-তত্ত্ব নিরূপণে প্রমাণের
আবশ্যকতা,—ভিন্ন ভিন্ন দর্শনের প্রমাণ-প্রসঙ্গ,—আধ্যাত্মিক ও জড়জাগতিক উন্নতি ।]

পূর্বেই বলিয়াছি,—ভারতবর্ষে যুজ-সাহিত্যের এক যুগ আসিয়াছিল । তখন এক
দিকে যেমন সমাজ-ধর্ম, গার্হস্থ্য-ধর্ম, যজ্ঞবিধি প্রভৃতি যুজ্যাকারে গৃহে গৃহে প্রচারিত
ততৈতেছিল ; অন্য দিকে তেমনই দার্শনিক কোদিদগণ আবির্ভূত হইয়া
বড়দর্শন । অপর দী-শক্তিব পরিচয় প্রদান করিতেছিলেন । ষড়দর্শন-রূপ যে মহান
(সার-সঙ্কল্প ।) মহীকৃত ভারতীয় সাহিত্য-কাননের অল্পপম শোভা সম্বর্দ্ধন করিয়া আছে,
যুজ-সাহিত্যের যুগে সে এক অপরূপ সৃষ্টি । এক দিকে কর্মকাণ্ড-প্রতিপাদক ষড়বেদাদ্ধ,
অন্য দিকে পরমতত্ত্বজ্ঞানপদ ষড়দর্শন ;—জগতে ইহার ভুলনা আছে কি ? উভয়ই অল্প-
বাক্যে অধিকভাবপূর্ণ যুজ্যাকারে * সংগৃহীত ;—উভয়ই আধ্যাত্মিক জ্ঞান-গবেষণা-প্রতিভার
অপরূপ পরিচায়ক । ব্রাহ্মণ-ভাগে কর্মকাণ্ডের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে আরণ্যক ও
উপনিষদে যেমন জ্ঞানকাণ্ডের প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠার পরিচয় পাই, কল্পযুজ্যে কর্মকাণ্ডের
প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে দর্শন-যুজ্যে সেইরূপ জ্ঞানকাণ্ডের প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠা দেখিতে
পাই । দর্শন-শাস্ত্রের সংখ্যা প্রধানতঃ ছয়টি ;—(১) কপিল-প্রণীত সাংখ্যদর্শন, (২) কণাদ-
প্রণীত বৈশেষিক দর্শন ; (৩) গৌতম-প্রণীত জায়দর্শন ; (৪) পতঞ্জলি-প্রণীত পাতঞ্জল বা
যোগশাস্ত্র ; (৫) জৈমিনি-প্রণীত পূর্ন-মীমাংসা ; (৬) বাদরায়ণ বা ব্যাস-প্রণীত উত্তর-
মীমাংসা বা বেদান্ত-দর্শন । এই ছয়খানি দর্শন—ষড়দর্শন নামে অভিহিত । এতদ্ভিন্ন,
বৌদ্ধদর্শন এবং নিরীখরবাদমূলক দর্শনাদি 'চার্কাব-দর্শন' নামে অভিহিত হইয়া থাকে ।
সকল দর্শনেরই মুখ্য উদ্দেশ্য,—চুঃখ-নাশ । সকল দর্শনেরই সার-সঙ্কল্প—যুজ-সাধন ।
সকল দর্শনই প্রকারান্তরে প্রতিপাদন করিতেছেন,—“ইহসংসার চুঃখের আলয় ; এ

* যুজ শব্দের ব্যুৎপত্তি,—“যুজনাচ্চি যুজ্জ ।” অর্থাৎ, বহু অর্থের সূচনাকারী বাক্যই যুজ । যুজের
লক্ষণ,—“অল্লাক্ষরমগলিঙ্কং সারবৎ সর্বতোমুখং । অস্তোভয়নবদ্যক যুজং যুজবিদোবিচঃ ।” অর্থাৎ,
অল্লাক্ষর-সংযুক্ত যে সার সিদ্ধান্ত, বাহাতে সংশয় নাই, সংশয় হইলে ভাষা নিবারণের উপায় আছে,
বাহার একটা অক্ষরও নিরর্থক প্রযুক্ত নহে, অথচ বাহাতে ভ্রমের পথ সর্বতোভাবে প্রদর্শিত,—ভাহাই
যুজ নামে অভিহিত হইয়া থাকে ।

সংসারে মানুষ যাহাকে সুখ বলিয়া মনে করে, তাহা দুঃখেরই আদিভূত। সামান্যিক সুখ ক্ষণস্থায়ী; তদ্বারা কেবল দুঃখই বৃদ্ধি হয়। সংসার অহরহ সুখের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; সুবিমল চিরসুখ ও চিরশান্তি লাভই মানুষ-জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।" স্থূলতঃ, দুঃখবাদ—দর্শন-শাস্ত্রের ভিত্তি; দুঃখনাশ—দর্শন-শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য। দুঃখ-নিবারণের উপায়-পরম্পরা নির্দেশ করিয়া, দর্শন-শাস্ত্র নিত্য-সুখলাভের পথ নির্ধারণ করিয়াছেন। সকল দর্শন-শাস্ত্রেরই মূল উদ্দেশ্য এক বটে; কিন্তু সকলেই যে একই পথে প্রধাবিত, তাহা নহে। ভিন্ন ভিন্ন পথে, ভিন্ন ভিন্ন তর্ক-যুক্তির অবতারণায়, দর্শন-শাস্ত্রসমূহ দুঃখ-নিবৃত্তির অর্থাৎ নিত্যসুখলাভের উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। দর্শনশাস্ত্রের মতে,—পদার্থ-তত্ত্বের জ্ঞানই দুঃখনিবৃত্তির উপায়। দর্শন-শাস্ত্রে তাই পদার্থ-তত্ত্বের আলোচনায় পদার্থের স্বরূপ-তত্ত্ব অবগত করাইয়া চিরসুখ-লাভের (মোক্শের) পথ নির্ণীত হইয়াছে। সে হিসাবে, দর্শন-শাস্ত্রসমূহ জ্ঞান-গবেষণার উৎস-স্থানীয় বটে; তবে, দর্শন-শাস্ত্রসমূহের উদ্ভাবিত সুখ-সাধনের উপায়-পরম্পরার সহিত সর্বত্র ঈশ্বরের নৈকট্য সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে হয় না। সাধ্যা-দর্শনে এবং মীমাংসা-দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রকারান্তরে অস্বীকার করা হইয়াছে। জ্ঞান-দর্শন এবং বৈশেষিক দর্শন ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নাই বটে; কিন্তু মানুষের দুঃখ-নিবৃত্তির সহিত ঈশ্বরের যে কোনও সম্বন্ধ আছে, তাহা স্বীকার করেন নাই। পতঞ্জলির যোগ-শাস্ত্রে ঈশ্বর-সান্নিধ্য-লাভের উপায়-পরম্পরা নির্দিষ্ট আছে বটে; কিন্তু সে উপায়ও মুখ্য উপায় বলিয়া মনে হয় না। একমাত্র বেদান্ত-দর্শনেই ঈশ্বরের (ব্রহ্মের) প্রাধান্য কীর্তিত হইয়াছে। বেদান্তের মতে,—ব্রহ্মই সত্য, আর সকলই মিথ্যা। বেদান্ত বলেন,—যুক্তির পর আত্মা চিন্তানন্দরূপে অবস্থান করেন। উপনিষদে যে দেখিতে পাই—পরমাত্মার সহিত আত্মার মিলন হইলেই সকল দুঃখের অবসান হয়; বেদান্তের মত—তাহারই অমূল্যস্বরূপ। পণ্ডিতগণ বড়দর্শনকে প্রাধান্যতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করেন। তাহাদের মতে,—সাধ্য ও পূর্ব-মীমাংসা একশ্রেণীর দর্শন; জ্ঞান ও বৈশেষিক একশ্রেণীর দর্শন; এবং পাতঞ্জল ও বেদান্ত একশ্রেণীর দর্শন। মূল দর্শন-শাস্ত্রসমূহ এখন লোপ পাইয়াছে বলিলেও অতুষ্টি হয় না। দর্শন-শাস্ত্রসমূহের ভাষা ও টীকা প্রভৃতি কখনও কখনও দর্শনশাস্ত্র-রূপে প্রচারিত হইয়া থাকে। সুতরাং সাধ্যা, জ্ঞান, বৈশেষিক, পাতঞ্জল, মীমাংসা, বেদান্ত,—হিন্দু-দর্শনের এই ছয়টি প্রধান সম্প্রদায় বা শাখা হইলেও, এক এক শাখায় এখন বহু মত এবং বহু উপশাখা দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া অপবর্ণের সাধনভূত তত্ত্বজ্ঞান-লাভ কি প্রকারে হইতে পারে, তাহা নির্দেশ করাই—বড়দর্শনের উদ্দেশ্য। বেদে ভগবান জগৎ-জীবনরূপে প্রতিষ্ঠিত আছেন। উপনিষদে বুঝান হইয়াছে,—‘তিনিই পরমাত্মা; জীবাত্মা তাহার অংশ মাত্র। তিনিই সত্য; জগৎ মিথ্যা। আত্মা পরমাত্মায় লীন হইলেই জীবমুক্তি ঘটে।’ দর্শনশাস্ত্র তর্ক-যুক্তি দ্বারা সেই স্বরূপ-তত্ত্ব নির্ণয় করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। কিসে মানবের দুঃখ দূর হয়, কি প্রকারে জীবাত্মা মুক্তি-লাভ করিতে পারে,—প্রমাণাদি দ্বারা দর্শনশাস্ত্র তাহারই অনুসন্ধান করিয়াছেন।

মানুষের জ্ঞান ও চিন্তা-শক্তি কতদূর পরিস্ফুট হইয়াছে, তাঁহাদের দর্শন-শাস্ত্রে সেই পরিচয় পাওয়া যায়। দর্শন-শব্দের অর্থ—জ্ঞান; দর্শন-শাস্ত্র—জ্ঞান-শাস্ত্র। বিচার ও হিন্দু-দর্শনে মীমাংসা দ্বারা লৌকিক ও পারলৌকিক বিষয়ের যে জ্ঞান,—তাহাই দর্শন-শাস্ত্রে প্রকটিত অধ্যাপক মাক্সমুলার বলেন,—“যে রাজ্য পাশ্চাত্য-দর্শনে উন্নতির উচ্চ-চূড়ায় অধিকৃত হয়, যে রাজ্যে বহিঃশক্তি বা অন্তঃশক্তির উপদ্রবের আশঙ্কা মাত্র থাকে না, ধন-সম্পৎ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ বিদ্যামন্দির ও বিশ্ববিদ্যালয়াদি প্রতিষ্ঠায় যে রাজ্যের অধিবাসিগণ নিৰ্ব্বিয়ে বিদ্যালোচনায় নিবিষ্ট হইতে পারে,—সেই সভ্য সমুদ্রত রাজ্যেই দর্শন-শাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়া থাকে।” সে হিসাবে, কৌশল সভ্য-সমুদ্রত অবস্থার দিনে, ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্রের অভ্যুদয় হইয়াছিল,—তাহা সহজেই প্রতিপন্ন হয় না কি? ভারতবর্ষই দর্শন-শাস্ত্রের আদিভূত; ভারতবর্ষ হইতেই পৃথিবীর অকাণ্ড দেশে দার্শনিক চিন্তার স্রোত প্রবাহিত;—এ তরুও বিবিধ প্রকারে প্রতিপন্ন হইতে পারে। জার্মান দার্শনিক সেকেলের মতে,—“হিন্দুদর্শনের মূলভূত আত্মার দেহান্তর-গ্রহণ তত্ত্ব, গ্রীক দার্শনিক পীথাগোরাস ভারত হইতেই গ্রীসে আনয়ন করিয়াছিলেন।” মনিয়ার উইলিয়ম্‌সের মতেও,—“ইউরোপীয় আদি-দার্শনিক পোটাও পীথাগোরাস উভয়েই দর্শন-জ্ঞান সম্বন্ধে ভারতীয় হিন্দুগণের নিকট অশেষ প্রকারে খণী।” যাহা হউক, দর্শন-শাস্ত্রের মূল-তরু সম্বন্ধে ইউরোপ ভারতবর্ষের নিকট খণী হইলেও, চিন্তা-শক্তির ভারতমাতৃসারে ইউরোপের দর্শনে এবং ভারতীয় দর্শনে কালক্রমে অনেক ভারতমাতৃ বটিয়াছে। যদিও পদার্থ-মাত্ত্বেরই জ্ঞান-লাভ দর্শন-শাস্ত্রের মূখ্য উদ্দেশ্য; কিন্তু সে জ্ঞান কোন্ বিষয়ে কিরূপ ভাবে প্রযোজ্য, ইউরোপে ও ভারতে তৎসম্বন্ধেই মতভেদ। তাই, ভারতবর্ষের দর্শন-শাস্ত্র বলিতে আমরা এখন যাহা বুঝিয়া থাকি, ইউরোপের ‘ফিলজফি’ শব্দে ঠিক সেই অর্থ উপলব্ধি হয় না। আমাদের দর্শন-শাস্ত্রের উদ্দেশ্য,—সেই জ্ঞান-লাভ—যে জ্ঞানে নিঃশ্রেয়স বা মুক্তি বা মোক্ষ লাভ হয়—যে জ্ঞানে আর কখনও জন্ম-জরা-মৃত্যুর অধীন হইতে হয় না—যে জ্ঞানে আত্মজ্ঞিক হৃৎ-নিয়ন্ত্রিত মনে আত্মা চিরস্থখে চিরশান্তি লাভ করিতে পারে। কিন্তু ইউরোপের ‘ফিলজফি’ বা দর্শনের উদ্দেশ্য অল্পবিধ। ইউরোপের ‘ফিলজফিতে’—সমাজ-নীতি আছে, অর্থ-নীতি আছে, ধর্ম-নীতি আছে, প্রকৃতি-বিজ্ঞান আছে। ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্রের মতে,—‘ইহসংসার হৃৎখের আলয়। মহম্মদ যতই হৃৎখের জন্ত চেষ্টা করিতেছে, প্রকৃতি ততই বাধা দিতেছে। প্রকৃতির সহিত যেন মহম্মদের চিরসমর চলিয়াছে। ইহজন্মেও সে ঘন্দের অবসান নাই; কর্ম-ঘোরে জন্মজন্মান্তরেও মানুষ সেই ঘন্দে রত রহিয়াছে। সেই ঘন্দে জয়লাভ করিতে হইলে, প্রকৃতির সহিত সকল সম্বন্ধ ছেদ করিতে হইবে। একমাত্র জ্ঞানই—সেই জয়লাভের ব্রহ্মাঙ্গ। জ্ঞান-অন্ত্রে প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে পারিলেই—আত্মার মুক্তি।” ইহাই ভারতীয় হিন্দু-দর্শনের সার সিদ্ধান্ত। কিন্তু ইউরোপের দর্শন-শাস্ত্রের উদ্দেশ্য,—“প্রকৃতির দ্বারাই প্রকৃতিকে জয় করা।” প্রকৃতির নিগূঢ়-তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া, প্রকৃতির বলে ইহজীবন সুখকর করিতে হইবে,—পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের

ইহাই প্রধান লক্ষ্য । এই লক্ষ্যের ফলেই, পাশ্চাত্য-দর্শনে জড়-বিজ্ঞানের এতাদৃশ উন্নতি সাধিত হইয়াছে । এই লক্ষ্যের ফলেই, মানুষ প্রকৃতিকে আরও করিয়া আপনার ইহ-লৌকিক সুখ-সাধনের চেষ্টা করিতেছে । এই লক্ষ্যের ফলেই, বিজ্ঞান, বাণ্যীয়-পোত, বৈদ্যাত্তিক আলোক, তাড়িত-বাহ্যি, প্রভৃতির আবিষ্কার করিয়া, ইহলৌকিক সুখের একবিধ উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে । ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিকের আবির্ভাব হইয়াছিল । সকলের সকল পার্চয় এ প্রসঙ্গে উত্থাপন করা অসম্ভব । প্রাচীন গ্রীসের সফ্রেটিস, আরিষ্টটল, প্লেটো, পীথাগোরাস ; জর্জীয় কার্ট, সেক্সেল, সোপেনহার ; ফ্রান্সের কোমুং ; এবং ইংলণ্ডের বেকন, জন ষ্টুয়ার্ট মিল, হার্বার্ট স্পেন্সার, লোক, হামিল্টন, হিউম, বার্কলে প্রভৃতি দার্শনিকগণ বিশেষ প্রসিদ্ধ । ইহাদের সকলেরই মত অবশ্য এক নহে ; পরন্তু সময়ে সময়ে একের মতের প্রতিবাদ বা খণ্ডন অন্য মতে সাধিত হইয়াছে । তবে, স্থূলতঃ যে মত এখন প্রচলিত, তাহারই আভাস উপরে আমরা প্রদান করিলাম । ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্রের সহিত ইউরোপীয় দর্শন-শাস্ত্রের যে পার্থক্য দৃষ্ট হয়, সে পার্থক্যের প্রধান কারণ, আমাদের মনে হয়, প্রমাণ-বিষয়ক জ্ঞানের তারতম্য-হেতু । পদার্থ-নিরূপণ—প্রমাণ-সাপেক্ষ । এইজন্ত পদার্থ-জ্ঞান-লাভ সম্বন্ধে দর্শনকারগণ প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছেন । বৈশেষিক-মতে, প্রমাণ দ্বিবিধ ; সাংখ্য-মতে ত্রিবিধ ; শ্রায়মতে চতুর্বিধ । মীমাংসকগণ প্রমাণ-পঞ্চকবাদী ; বৈদ্যাত্তিকগণ ষড়বিধ প্রমাণ মান্য করেন ; পৌরাণিকগণ প্রমাণাষ্টকের পক্ষপাতী । নিরীখর চার্ল্যাকবাদীরা দুইটির অধিক প্রমাণ স্বীকার করেন না । ইউরোপীয় দার্শনিকগণ ঘুরিয়া ফিরিয়া চার্ল্যাক-মতেরই অনুসরণকারী হইয়াছেন । চার্ল্যাক-মতাবলম্বিগণ ‘প্রত্যক্ষ’ ও ‘অনুমান’ দুইটি মাত্র প্রমাণ স্বীকার করেন । বৈশেষিক-কার কণাদেরও স্থূলতঃ সেই মত । সাংখ্যকার কপিল, ‘প্রত্যক্ষ’, ‘অনুমান’ ও ‘শব্দ’—এই তিন প্রমাণের পক্ষপাতী । নৈয়ায়িকগণ, সাংখ্যের ঐ প্রমাণত্রয় বাতীত ‘উপমান’ প্রমাণ মানিয়া থাকেন । মীমাংসকগণ তদধিক ‘অর্থাপত্তি’ প্রমাণ স্বীকার করেন । বৈদ্যাত্তিকগণ উক্ত পঞ্চপ্রমাণাতিরিক্ত ‘অনুপলব্ধি’ প্রমাণের পক্ষপাতী । পৌরাণিকগণ ঐ ষড়বিধ প্রমাণাতিরিক্ত ‘সম্ভব’ ও ‘ঐতিহ্য’ প্রমাণবাদী । বিশেষ বিশেষ দর্শনের আলোচনার সময়, এই সকল প্রমাণের বিষয় বথাসম্ভব বিশদভাবে আলোচিত হইবে । আপাততঃ এই মাত্র বলিয়া রাখি,—সকল প্রমাণেরই মূল—প্রত্যক্ষ প্রমাণ ; প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতেই অন্যান্য প্রমাণের অনুমিতি বাহারা, যুদ্ধ হইতে যুদ্ধাদি তর্কে চিত্ত-নিবেশ করিতে পারদর্শী, তাহার আধ্যাত্মিক জগতে উন্নতিলাভ । আর বাহারা কেবলমাত্র ইঞ্জিয়-গ্রাহ্য বহির্বিষয়ের প্রমাণই প্রমাণ বলিয়া মান্য করিয়া থাকেন, তাহার বহির্বিষয়ে জড়-জগতে উন্নতি-শীল ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

সাক্ষ্য-দর্শন ।

[কপিল ও সাক্ষ্য-দর্শন.—বিভিন্ন কপিল ও সাক্ষ্য-দর্শনের বিভিন্ন রূপান্তরের আলোচনা ;—সাক্ষ্যের প্রতিপাদ্য,—ত্রিবিধ হুঃখনিবৃত্তিই মুক্তি,—ত্রিবিধ হুঃখের স্বরূপ তত্ত্ব,—হুঃখের তুল ও স্বল্প প্রকারভেদ,—পুরুষ ও প্রকৃতি,—প্রকৃতির অবস্থা ও বিকৃতি,—পুরুষের পদার্থ বা তত্ত্ব,—পুরুষের হুঃখোৎপত্তি ও হুঃখনিবৃত্তি,—হুঃখোৎপত্তি-নিবৃত্তিই পুরুষার্থ ;—সাক্ষ্য নিরীক্ষর-বাদ,—প্রত্যক্ষ, অমুমান, শব্দ—ত্রিবিধ প্রমাণ-প্রসঙ্গ,—ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্তৃত্ব অপ্রামাণ্য,—প্রকৃতিই সৃষ্টির আধার-স্থানীয় ;—বেদ-বিষয়ে কপিলের মত,—পুরুষ বা আত্মার ভেদজ্ঞান,—ঐপনিষদের সহিত মতানৈক্য,—সাক্ষ্য-দর্শনই বৌদ্ধ-দর্শনের ভিত্তি-স্থানীয়,—সাক্ষ্য-মতে স্বর্গ-নরক ও নির্বাণ-মুক্তি ।] “

যড়দর্শনের মধ্যে সাক্ষ্য-দর্শনকে অনেকে আদি-দর্শন বলিয়া অনুমান করেন । সাক্ষ্য-দর্শন—মহর্ষি কপিল-প্রণীত ; অর্থাৎ, সাক্ষ্য-মত প্রথমে মহর্ষি কপিল কর্তৃক প্রচারিত হয় ।

কপিল কপিল, আপন শিষ্য আত্মরিকে এই দর্শন-জ্ঞান প্রথম প্রদান করেন ।
ও আত্মরিক শিষ্য পঞ্চশিখ আপন গুরুর নিকট সেই জ্ঞান লাভ করিয়া শিষ্য-
সাক্ষ্যদর্শন । পরম্পরায় তাহা প্রচার করিয়াছিলেন । তৎপরে, কি ভাবে সাক্ষ্য-সূত্র-
সমূহ প্রচারিত হয়, তাহার বিশেষ কোনও নিদর্শন নাই । অনেকের মতে,—সাক্ষ্য-শাস্ত্রের
মধ্যে ‘তত্ত্বমসি’ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ।* কিন্তু অনেকে, আবার বলেন—সাক্ষ্যসূত্র নামে
অপূনা যে গ্রন্থ প্রচলিত আছে, অর্থাৎ বিজ্ঞান-ভিক্ষু যাহার ‘সাক্ষ্য-প্রবচন’ ভাষ্য
এবং অনির্ভুক্ত যাহার টীকা করিয়া যান, তাহাই মূল গ্রন্থ । বলা বাহুল্য, এই গ্রন্থই
এখন সাক্ষ্য-দর্শন নামে বিদ্যালয়াদিতে পাঠিত হইয়া থাকে । ইহার পর, ঈশ্বরকৃষ্ণের
নাম উল্লেখযোগ্য । ঈশ্বরকৃষ্ণাচার্য্য সাক্ষ্য-সূত্রসমূহ ‘আর্য্য্যছন্দে’ গ্রথিত করিয়া ‘সাক্ষ্য-
কারিকা’ গ্রন্থ প্রচার করেন । অনেকে সেই গ্রন্থকেও এখন সাক্ষ্য-দর্শন বলিয়া চালাইতে
আরম্ভ করিয়াছেন । ঈশ্বরকৃষ্ণের সাক্ষ্যকারিকা গ্রন্থ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে
চীনদেশে চীন-ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল । সে হিসাবে, ষষ্ঠ শতাব্দীর অনেক পূর্বে
ঈশ্বরকৃষ্ণাচার্য্য সাক্ষ্যকারিকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন,—সহজেই তাহা প্রতিপন্ন হয় । *
ঈশ্বরকৃষ্ণের পর, বাচস্পত্য মতের নাম উল্লিখিত হইয়া থাকে । তিনি খৃষ্টীয় দ্বাদশ

* বিজ্ঞানভিক্ষু এই মত প্রচার করেন । মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারের ‘হিন্দুদর্শন’ এবং
ম্যাক্সমুলারের (Six Systems of Indian Philosophy) ভারতীয় যড়দর্শনালোচনা-গ্রন্থে এই মত
সমর্থিত হইয়াছে ।

† ঈশ্বরকৃষ্ণের সাক্ষ্যকারিকার সপ্তভি ও একসপ্তভি সংখ্যক শ্লোকে, কি ভাবে লোক-পরম্পরায়
সাক্ষ্য-দর্শন প্রচলিত হয়, তাহার পরিচয় আছে । যথা,—

“এতৎ পবিত্রমগ্র্যং মুনিরাত্মরয়েহুঃকম্পয়া এদমো । আত্মরিকপি পঞ্চশিখায় তেন চ বচধাকৃতং তত্ত্বম্ ॥

শিষ্যপরম্পরায়গতবীশ্বরকৃষ্ণেন সৈততদার্থাভিঃ । সংকিণ্তনার্থ্য্যমভিনা সম্যগবিজায় সিদ্ধান্তম্ ॥”

শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। ‘সাম্মা-তত্ত্ব-কৌমুদী’ নামক ভাষ্য-গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া, বাচস্পতি মিত্র সাম্মা-দর্শন প্রচারের পথ অধিকতর প্রশস্ত করিয়া যান। অতঃপর ‘সাম্মা-তত্ত্ব’ নামে যে গ্রন্থ প্রচলিত, অনেক অনুমান করেন, সাম্মা-তত্ত্ব-কৌমুদী হইতেই তাহা সংগৃহীত হইয়াছিল। যাহা হউক, এখন সাম্মা-দর্শন নামে যে সকল গ্রন্থ প্রচলিত আছে, তাহাতে কপিলের মত-মাত্র ব্যক্ত হইয়াছে,—ইহাই অনুমান করা যাইতে পারে। নচেৎ, কপিলের মূল গ্রন্থ কি ছিল, কে অনুসন্ধান করিয়া পাইবে? মহর্ষি কপিলের আবির্ভাব-সম্বন্ধেই কত মতান্তর দেখিতে পাই। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে মহর্ষি কপিলকে ব্রহ্মার পুত্র বলিয়া উল্লেখ আছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় কপিল নামে এক নিদ্ধর্ষির পরিচয় পাওয়া যায়। রামায়ণে দেখিতে পাই,—সগর রাজার যষ্টি-সহস্র পুত্র কপিলের কোপানলে ভস্মীভূত হইয়াছিল। মহাভারতে কপিলের ধর্ম-তত্ত্ব বিবৃতির এক অভিনব উপাখ্যান আছে; তৎপ্রসঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়,—হর্য্য-রশ্মি গো-দেহে প্রবেশ করিয়া কপিলের নিকট ধর্ম-তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। শিব-সংহিতায় এক যোগিশ্রেষ্ঠ কপিলের বর্ণনা আছে। বৌদ্ধদিগের গ্রন্থে দুই হয়,—ইক্ষাক-বংশীয় রাজা বিরোধক আপনার দ্বিতীয়া মহিবীর মনোরঞ্জনার্থ পরলোকগতা প্রথমা মহিবীর গর্ভজাত কুমার-চতুষ্টয়কে নির্ধাসিত করেন। পাঁচটা সহোদরা ভগ্নীর সতিত কুমারগণ কপিল যুনির আশ্রমে উপনীত হইয়াছিলেন। সেই কপিল যুনিই পরে গৌতম বুদ্ধরূপে আবির্ভূত হন। বুদ্ধদেবের জন্মভূমি কপিলাবস্ত-নগরী তাঁহারই নামানুসারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এতদ্ভাতিত বিতথ-পুত্র কপিল এবং বসুদেব-পুত্র কপিল প্রভৃতি আরও নানা কপিলের পরিচয় পাওয়া যায়। ভাগবতের মতে,—সাম্মা-দর্শন-প্রণেতা কপিলের পিতার নাম—কর্দম; তাঁহার মাতার নাম—দেবহতি। ভাগবতে তিনি ভগবানের পঞ্চম অবতার বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। ভাগবতে লিখিত আছে,—“তাঁহার জন্ম-কালে আকাশে বাত্মধ্বনি হইয়াছিল; পক্ষিগণ গুণ্ণবৃষ্টি করিয়াছিল; অঙ্গরা গন্ধর্ব্বগণের নৃত্যামোদে দিঙ্গিগন্ত মুগ্ধরিত হইয়াছিল। স্বয়ং ব্রহ্মা, কর্দমকে কহিয়াছিলেন,—তোমার এই পুত্র ঈশ্বরাবতার; সাম্মা-জ্ঞান প্রদানের নিমিত্ত ইনি সংসারে ‘কপিল’ নামে সম্পূজিত হইবেন।” তবে, ভাগবতে কপিলের যে মত উল্লিখিত হইয়াছে, সাম্মা-দর্শনে কপিলের সে মত দেখিতে পাওয়া যায় না। সেইজন্য, কেহ কেহ সাম্মা-দর্শনকার কপিল—এবং ভাগবদোল্লিখিত কপিল—এতদ্ব্যতীকে অভিন্ন বলিয়া স্বীকার করেন না। যাহা হউক, সাম্মা-দর্শনকার কপিল অনেকের নিকট ভগবানের অবতার বলিয়া পরিকীর্তিত হইতে। উদয়ানাচাৰ্য্যকৃত ‘সাম্মা-তত্ত্ব-বিবেক’ গ্রন্থের চীকাকারগণ সেই মতই ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মত—‘সাম্মা-তত্ত্ব-বিবেক’ মঙ্গলাচরণে “পূর্ব্বগুরুতমায়” বাক্যে কপিল-কবলাসনামি ঋষিগণকে ব্রহ্মাইয়া থাকে। সাম্মা-দর্শন-প্রণেতা কপিল যিনিই হউন, তাঁহার দর্শন-শাস্ত্র বেঙ্গবতের এক অমূল্য সম্পদ,—তাঁহার দর্শন-শাস্ত্র যে জ্ঞান-গবেষণা-প্রতিভার এক প্রসূত চিত্র,—তাহা বলাই বাহুল্য। মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত এবং পুরাণাদিতে সাম্মা-দর্শনের মত উদ্ধৃত হইয়াছে। স্বয়ং শঙ্করাচার্য্য সাম্মা-দর্শনকে প্রধান দর্শন

বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। সাম্ব্য-দর্শনের মত-ধন্তন উপলক্ষে শঙ্করাচার্য্য ‘ব্রহ্ম-সূত্রের’ ভাষ্যে এই মর্মে লিখিয়া গিয়াছেন,—“প্রধান মন্ত্রকে পরাক্রান্ত করিতে পারিলে, মন্ত্রদলের পরাক্রম বানিয়া লইতে হয়। সাম্ব্য-দর্শনের মত ধন্তন করায়, অস্ত্রান্ত্র দর্শনের মত ধন্তন করা হইল,—ইহাই ব্রহ্মিতে হইবে।” সাম্ব্য-মত অবলম্বন করিয়া পরবর্ত্তি-কালে সাম্ব্য-কারিকা, সাম্ব্য-সার, সাম্ব্য-প্রদীপ, সাম্ব্য-তত্ত্ব-প্রদীপ, তত্ত্ব-সমাস, ভোক্ত-বার্ত্তিক প্রভৃতি বহু গ্রন্থ এবং সেই সকল গ্রন্থের ভাষ্য-টীকা প্রণীত হয়। কিন্তু কপিল-সূত্র বলিয়া যাহা প্রচলিত, সাম্ব্য-দর্শন বলিতে প্রধানতঃ তাহাই বুঝাইরা থাকে। সাম্ব্যের মতে,—পঞ্চ-বিশংগতি তত্ত্বের জ্ঞান-লাভই মুক্তি ; আর, সেই পঞ্চবিশংগতি তত্ত্বের সংখ্যা গণনা করা হইয়াছে বলিয়াই কপিল-প্রণীত দর্শন ‘সাম্ব্য-দর্শন’ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

সাম্ব্যাদর্শনের মুখ্য প্রতিপাদ্য—দুঃখনিবৃত্তি। সাম্ব্যাকারের মত,—“সংসার দুঃখময় ; পুরুষার্থ দ্বারা সেই দুঃখ দূর হয় ; জ্ঞানই পরম পুরুষার্থ।” এক কথায়, জ্ঞানলাভ হইলেই মানুষ্যের দুঃখ দূর হইল ;—মানুষ্য মুক্তিলাভ করিল ;—ইহাই সাম্ব্য-কারের মীমাংসা। সাম্ব্যাকার প্রথমেই তাই বলিয়াছেন,—“অথ ত্রিবিধ-দুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরতাত্ত্বপুরুষার্থঃ ।” এই প্রথম সাম্ব্য-সূত্রের লব্ধি,—

সাম্ব্যের
প্রতিপাদ্য ।

“ত্রিবিধ দুঃখনিবৃত্তিই পুরুষার্থ।” কিন্তু এই ত্রিবিধ দুঃখ কি ? সাম্ব্যাকারের নির্দেশ মতে, ‘আধ্যাত্মিক’, ‘আধিদৈবিক’ ও ‘আধিভৌতিক’—দুঃখ এই ত্রিবিধ। আধ্যাত্মিক দুঃখ আবার দুই প্রকার,—শারীরিক ও মানসিক। বাত-পিত্ত-শ্লেষাদি পীড়াজনিত যে দুঃখ, তাহা শারীরিক দুঃখ ; আর, কাম, ক্রোধ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, ঈর্ষা, ভয়, শোক ইত্যাদি জনিত যে দুঃখ, তাহাই মানসিক দুঃখ। দেবতা হইতে অর্ঘ্য বাত-রুষ্টি-ব্রহ্মপাতাদি দ্বারা যে দুঃখের উৎপত্তি, তাহা ‘আধিদৈবিক দুঃখ’। যজ্ঞ, পুণ্ড্র, পক্ষী, সরীসৃপ, বৃক্ষ প্রভৃতি হইতে যে দুঃখের উৎপত্তি, তাহাই ‘আধিভৌতিক দুঃখ’। প্রোক্ত ত্রিবিধ দুঃখের যে অত্যন্ত-নিবৃত্তি, তাহাই পরম পুরুষার্থ। সেই পুরুষার্থ লাভ করিলেই আত্যন্তিক সুখ বা যোক-লাভ হয়। এই পুরুষার্থ কি প্রকারে সিদ্ধ হয়,—সাম্ব্যাদর্শনে তাহারই আলোচনা হইয়াছে। সাম্ব্যের মতে, দুঃখের দুই অবস্থা ; এক অবস্থা—দুঃখ, অল্প অবস্থা—সুখ। সংসারের অনেক দুঃখ যজ্ঞ চেষ্টা করিয়া নিবারণ করিতে পারে, সেই দুঃখ—দুঃখ দুঃখ ; যেমন, ক্ষুধার নিবৃত্তি অন্নদ্বারা, রোগের নিবৃত্তি ঔষধ সেবনে, ইত্যাদি। ইহাকে লৌকিক উপায়ে দুঃখ-নিবৃত্তি বলে। কিন্তু এরূপ দুঃখ-নিবৃত্তি যে অব্যর্থ আত্যন্তিক সুখপ্রদ, তাহা কোন-ক্রমেই বলা যায় না। প্রথমতঃ, ঔষধ-সেবনে রোগ-উপশমন-চেষ্টায়, কটু-তিক্ত-কষায় ঔষধের পরিবর্ত্তে সুস্বাদু ঔষধ প্রাপ্ত হইবার আকাঙ্ক্ষা হওয়ার, আত্যন্তিক-দুঃখ-নিবৃত্তি হইল বলা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, ঔষধ-সেবনে আপাততঃ রোগ-শান্তি হইলেও ভবিষ্যতে সে রোগের পুনরুৎপত্তির সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং, লৌকিক চেষ্টায় আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি কদাচ সম্ভবপর নহে। বৈদিক যাগযজ্ঞাদিতে দুঃখ-নাশে সুখধাম বর্গলোক প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে ; কিন্তু কর্ত্তব্যসাধনে তাহারও ফলভোগ হইরা থাকে। বাজকের জীব-হিংসা প্রভৃতি কর্ম্মের পরিণতি কখনই সুখপ্রদ হইতে পারে না,—সাম্ব্যের ইহাই মত।

ইহার উপর আমার হৃৎ হৃৎ আছে বাহ্য হৃৎ হৃৎ, তাহা লৌকিক উপায়ে নিবৃত্ত হইবার নহে । তোমার পুত্র-শোক হইয়াছে, তুমি অল্প চিন্তায় মনোনিবেশ করিয়া সে শোক-নিবৃত্তির চেষ্টা পাইতে পার ; কিন্তু একেবারে সে শোক বিস্মৃত হইতে পারিবে কি ? এইরূপ, কোনও রোগে তোমার কোনও অঙ্গবিশেষ দাব্যচন্দ করিতে হইয়াছে ; রোগমুক্ত হইয়াও, তোমার সে অভাব—সে হৃৎখের নিবৃত্তি হয় কি ? ইহাই হৃৎ হৃৎ । আরও, বর্তমানের হৃৎ আপাততঃ দূর করিতে পারিলেও, অনাগত ভবিষ্যৎ-হৃৎ দূর করিবার সামর্থ্য তোমার নাই । সেই অনাগত অদৃষ্ট ভবিষ্যৎ-হৃৎ—হৃৎ হৃৎ । পুরুষার্থ এখানে এই সর্ববিধ হৃৎ দূর হয়,—সাম্রাজ্যকার তাহাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পায়েছেন । সাম্রাজ্যের মতে,—ত্রিবিধ হৃৎখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির উপায়—জ্ঞান । জ্ঞান-লাভই পুরুষার্থ,—“জ্ঞানামুক্তি”—জ্ঞানই মুক্তির মূলভূত । কিন্তু জ্ঞান কি দ্বিধা ? কি বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিলে, পরম পুরুষার্থ লাভ হয় ? সাম্রাজ্য বলেন,—প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদ-জ্ঞানই তৎ জ্ঞান বা মুক্তিলাভের মূলভূত । এক্ষণে, প্রকৃতি ও পুরুষ কি,—সাম্রাজ্যকার কি ভাবে তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার একটু আভাস দেওয়া প্রয়োজন । ‘আমি’ বলিলে প্রধানতঃ আমরা কি বুঝিয়া থাকি ? আমার এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, আমার এই বাহ্য, আমার এই পরিদৃশ্যমান্ দেহ,—‘আমি’ বলিতে ইহার কোনটাকে বুঝাইবে ? অথবা, ইহার আত্মবিশেষ কিছু আছে,—যাহাকে ‘আমি’ বলিতে পারি ? আমার শরীরে কোনও আঘাত লাগিলে, আমি বলি,—‘লাগিয়াছে ।’ কাহারও নিকট অপমানিত বা দাঙ্ঘিত হইয়া কষ্ট পাইলে, আমি বলি,—‘কষ্ট পাইয়াছি ।’ আমার এতদ্বয় অবস্থার বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে, বেশ বুঝিতে পারি,—আমার শরীর, আমার দেহ, আমার মন প্রভৃতি হইতে ‘আমি’ স্বতন্ত্র । স্বথ-হৃৎখাদির ভোগকর্তা অথচ ইন্দ্রিয়গোচর নহি,—এই যে ‘আমি’, সাম্রাজ্যকারের মতে, ইহারই নাম ‘পুরুষ’ । যতান্তরে,—ইহারই নাম ‘আত্মা ।’ এই পুরুষ বা আত্মা ভিন্ন অল্প যত কিছু, সাম্রাজ্যের মতে, ‘প্রকৃতি’ নামে অভিহিত । সমস্তকল্পমঃ—এই তিন অবস্থার সাম্য-ভাবই মূল-প্রকৃতি । ঐ তিন অবস্থার বৈষম্য-ভাবকে ‘বিকৃতি’ কহে । যে বিকৃতি সুখকর, তাহা সত্ত্বপ্রধান ; যে বিকৃতি দুঃখকর, তাহা রজঃপ্রধান ; যে বিকৃতি মোহকর, তাহা তমঃপ্রধান । দুঃখই যেমন দধাদির মূল ; অর্থাৎ যেমন দুঃখ হইতে দধি, দধি হইতে নবনী, নবনী হইতে ঘৃত উৎপন্ন হয়, প্রকৃতি সেইরূপ সর্বকার্যের মূল । প্রকৃতির এই পরিবর্তনের নাম—বিকৃতি । সাম্রাজ্য অষ্ট-প্রকৃতি ও ষোড়শ বিকারের পঞ্চরূপ পাওয়া যায় । সেই অষ্ট-প্রকৃতি,—অব্যক্ত মূল-প্রকৃতি (অন্তঃকরণ বা মহত্ত্ব), দুঃখ অহঙ্কার, পঞ্চভ্রমাত্র (রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শ) । সেই ষোড়শ বিকার,—প্রাণোন্মেষ (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক), পঞ্চকর্ষেঞ্জিয় (বাক, পাণি, পাদ, পায়ু ও শির) এবং মন,—এই একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ-মহাত্বতের সম্মিশ্রণ । পঞ্চ-মহাত্বত—কিঞ্চিৎ, অংশ, ভেদ, মরুৎ, স্যোম । অষ্ট-প্রকৃতি, ষোড়শ বিকার এবং পুরুষ,—ইহাই পঞ্চবিংশতর বা পঞ্চবিংশ পরার্থ নামে অভিহিত । পুরুষ বা আত্মা—প্রকৃতি ও বিকৃতি দুই অতীত । প্রকৃতি ও প্রকৃতি,—উভয়েই শিতা, উভয়েই অগ্নি, উভয়েই অনাদি । প্রকৃতি হইতে

পুরুষ পর্যাঙ্ক উল্লিখিত এই পুরুষাংশ পদার্থ এবং তাহার জ্ঞান-লাভই—তত্ত্বজ্ঞান-লাভ । সাধাকার পুরুষকে নিত্যসম্বাদিত্বগুণশূন্য কূটস্থ চৈতন্যরূপে বর্ণন করিয়াছেন । পুরুষ নির্লিপ্ত—প্রকৃতির সহিত তাহার কোনই সংশ্লিষ্ট নাই । প্রকৃতির সংযোগে তাহার চরণেই উৎপত্তি এবং প্রকৃতির সহিত বিচ্ছিন্নতাই তাহার দুঃখনিবৃত্তি বা মুক্তি । প্রকৃতি হইতে পুরুষ স্বতন্ত্র; পুরুষ স্বাধ-দুঃখ ও কর্তব্যবৃত্তির অতীত । আর, প্রকৃতি—সর্ব-বিকৃতির—সকল স্থপ-চরণের মূলভূত । কেবল নৈকট্য-বশতঃ প্রকৃতির স্বধঃখাদি পুরুষে অধিগত হয় । যেমন ফটিক-সমিধানের ক্ষবাক্ষয় রাখিলে, ফটিকে পুষ্পবর্ণের সমাবেশ হয়, প্রকৃতি-সমিহিত পুরুষে সেইরূপ স্বাধ-দুঃখাদি-বুদ্ধির আবেশ হইয়া থাকে । স্বচ্ছ দর্পণে কালিমা প্রতিবিম্বিত হইয়া দর্পণের স্বচ্ছতা যেমন বিমলিন করিয়া রাখে, তদু-জগতের স্বাধ-দুঃখ-বিকৃতি প্রকৃতিতে সেইরূপ পুরুষকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে । উভয়েই মধো দাবধান থাকিলেও, কাচ-পাত্রে নিপতিত ছায়াই জায়, প্রকৃতি পুরুষের স্বচ্ছতা ঢাকিয়া রাখে । প্রকৃতির সেই ছায়া দূর করিতে পারিলেই পুরুষ আশ্রয়ত বৃত্তিতে পারেন । সেই বুদ্ধির অবস্থাই—পুরুষাংশ-লাভ বা দুঃখ-নিবৃত্তি । এই দুঃখ-নিবৃত্তির বিষয়, দ্বিতীয় সূত্রে, সাধাকার আরও একটু বিশদী-কৃত করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন,—“ন দৃষ্টাং তৎসিদ্ধিনিবৃত্তেঃ পান্নবৃত্তির্দর্শনাং ।” অর্থাৎ, কেবল দুঃখ-নিবৃত্তিই পুরুষাংশ নহে;—দুঃখোৎপত্তি-নিবৃত্তিই পুরুষাংশ । পুরুষই বলিয়াছি, সাধারণ দুঃখ-নিবৃত্তির নানা উপায় আছে । শাবীরিক দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য ঔষধ-পথের ব্যবস্থা থাকিতে পারে; মানসিক দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য স্মরণী স্ত্রী ও ধনৈশ্বর্যের অভাব না ঘটতে পারে; আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য বৈদিক ক্রিয়া-কর্ম এবং শাস্তি-দ্বন্দ্বায়নাদির ব্যবস্থা হইতে পারে; এবং তাহাতে অনেকে মনে করিতেও পারেন,—“অক্রে চেদম্মু বিন্দেত কিমর্থঃ পর্দন্তঃ ব্রজেৎ । ইষ্টার্থাজ সংসিদ্ধৌ কে বিদ্বান যত্নমাত্রয়েৎ ।” গৃহকোণে যদি মধু পাই, পর্দন্তে যাওয়ার কি প্রয়োজন ? ইষ্ট পদার্থ সহজপ্রাপ্য হইলে, কে বল, রথ পরিশ্রম করিতে যত্নবান হয় ? দুঃখ-নিবৃত্তি হইলেই যদি পুরুষ-পুরুষাংশ লাভ হইত, তবে আর ভাবনা রহিল কি ? কিন্তু কেবল দুঃখ-নিবৃত্তিই তো বৃত্তি নয় । সাধাকার প্রথম সূত্রে তাই ত্রিবিধ দুঃখ-নিবৃত্তির কথা বলিয়াই, দ্বিতীয় সূত্রে তাহা বিশদীকৃত করিয়া বলিয়াছেন,—“কেবল দুঃখ-নিবৃত্তি নহে, দুঃখোৎপত্তি-নিবৃত্তিই পুরুষাংশ;—দুঃখোৎপত্তি-নিবৃত্তি করিতে পারিলেই বৃত্তি লাভ হইয়া থাকে ।” এখন প্রশ্ন হইতে পারে,—সে দুঃখোৎপত্তি-নিবৃত্তির উপায় কি ? সে উপায়ও—পুরুষই বলিয়াছি তো,—সাধাকার নির্দেশ করিয়াছেন, “জ্ঞানাবৃত্তি ।” জ্ঞান-লাভই বৃত্তি ।

প্রকৃতি ও পুরুষের সম্বন্ধালোচনাই সাধা-দর্শনের মেরুদণ্ড-স্বরূপ । জাগতিক পদার্থ-সমূহকে পঞ্চবিংশতি ভাগে বিভক্ত করিয়া, তাহার আদি-পদার্থ প্রকৃতি এবং অন্ত্য-

সাধামতে
সমীতঃ ।

পদার্থ পুরুষ—এতদ্ব্যতীত সাধাকার নিত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন ;

আর মধ্যবর্তী সমস্ত পদার্থই, সাধার মতে, অনিত্য;—“প্রকৃতি

পুরুষায়োরণ্যং সর্বমনিত্যং ।” প্রকৃতির পরিণামেই সেই অনিত্য পদার্থের

উৎপত্তি হইয়া থাকে । প্রকৃতির সাম্যবিহার (স্বা, স্বাঃ, ভবের সমতাধের) পরিণামে

‘মহত্ত্ব’। সেই মহত্ত্ব হইতে অহংজ্ঞান বা অহংকারের উৎপত্তি। অহংকারের কালে শব্দভাষ্য—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতির অস্তিত্ব অনুভূত। এইরূপে প্রকৃতির বিকারে মূলস্থল ভগতের সৃষ্টি হইয়া থাকে। সৃষ্টিকালে প্রকৃতির ভগ পুরুষে, এবং পুরুষের ভগ প্রকৃতিতে জড় হয়। তখন, প্রকৃতি অচেতন হইলেও, চেতনের জ্ঞান প্রকৃতির হন; পুরুষের কর্তৃত্ব না থাকিলেও, পুরুষ কর্তার জ্ঞান প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। কুটাম্ব-মূলে, সাংখ্যিকার বলিয়াছেন,—দর্পণে তেজ না থাকিলেও যেমন সূর্যের প্রতিবিম্ব দর্পণের তেজ প্রভূত হয়; সূর্যো মলিনতা বা চাকলা না থাকিলেও দর্পণের মলিনতার বা চাকল্যে সূর্যের প্রতিবিম্ব যেরূপ মলিন বা চকল হইয়া থাকে; সেইরূপ চেতন-পুরুষ-সন্নিধানে প্রকৃতি চৈতন্যযুক্ত, এবং প্রকৃতি-প্রতিবিম্বিত পুরুষ কর্তৃত্ব-শূন্য হইয়াও কর্তৃত্বযুক্ত হন। দীক্ষরকৃষ্ণাচার্য্য প্রকৃতি-পুরুষের সেই ভাব এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন,—

“পুরুষত্ব দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানত্ব। পশুছবদুভয়োরাপি সংযোগভুক্ততঃ সর্গঃ ॥”

অন্ধ ও পশুর স্বভাবভাবে কোনও বিশেষ কার্য্য করিবার শক্তি নাই। কিন্তু উভয়ে মিলিত হইলে, অনেক কার্য্যই সম্পন্ন হয়। “অন্ধ পশুকে স্বন্ধে করিলে দর্শনশক্তিসম্পন্ন পশু এবং চলচ্ছক্তিসম্পন্ন অন্ধ মিলিয়া একটা অবিকলেন্দ্রিয় মানুষের কার্য্য করিতে পারে। সেইরূপ ক্রিয়াশক্তিহীন চেতন পুরুষ এবং ক্রিয়াশীল অচেতন প্রকৃতি উভয়ে মিলিত হইয়া এক ক্রিয়াশীল চেতন ব্যক্তির জ্ঞান কার্য্য করিয়া থাকেন। সেই কার্য্যই মহত্ত্ব প্রভৃতি।” ফলে, উভয়ের মিলনেই—সৃষ্টি বা কার্য্য। সৃষ্টিই—ভোগ। ভোগের পরই—বিচ্ছেদ বা মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। সেই মুক্তি বা কৈবল্য-লাভই—পুরুষের হৃৎখনাশ। এ সম্বন্ধে সাংখ্যের ভাস্কর্য্যকার পৌড়পাদ বলিয়াছেন,—“কার্য্যাসিদ্ধি হইলে অন্ধ ও পশু যেমন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে; ভোগ বা সৃষ্টির পর, পুরুষ ও প্রকৃতি সেইরূপ বিচ্ছিন্ন হন। তাঁহাদের সেই বিচ্ছিন্নতার অবস্থাই যোক বা কৈবল্য। জ্ঞানের উদয় হইলেই প্রকৃতি ও পুরুষের বিচ্ছেদ ঘটিয়া থাকে। পক্ষবিংশতি তত্ত্বের ভেদজ্ঞান-লাভই—সর্বদুঃখনিবৃত্তির অর্থাৎ মুক্তির উপায়।” এ হিসাবে, প্রকৃতি পুরুষের সংযোগই সৃষ্টির মূলীভূত; প্রকৃতি হইতেই সৃষ্টি সামগ্ৰী উৎপন্ন হয়, সৃষ্টিকর্তা বা দীক্ষরের কোনই আবশ্যক অনুভূত হয় না। সাংখ্যিকার তাই সৃষ্টিকর্তা বা দীক্ষরের কোনও অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। সাংখ্যের মতে, বস্তু-মাত্রাই ‘সদ’ অর্থাৎ চির-বিদ্যমান আছে; আবির্ভাবেও বস্তুর সত্তা, তিরোভাবেও বস্তুর সত্তা। অমানিত হয়। ষট পটাদির মূল যেরূপ সৃষ্টিকা, সৃষ্টির মূল সেইরূপ প্রকৃতি। একটী কল দেখিয়া যেমন বুদ্ধের কথা মনে পড়ে, বুদ্ধের কথা মনে পড়িলে যেমন বুদ্ধের মূলীভূত মূল-বুদ্ধের কথা মনে পড়ে; সেইরূপ এতোক বস্তুরই উৎপত্তির কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া বস্তু মূল কারণ অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না, তখন প্রকৃতিই সেই মূল-কারণ বা মূল-প্রকৃতি নামে অভিহিত হন। ভিক্ষ হইতে বহির্গত হইবার পূর্বে, অণুজাদির পরিচয় পাওয়া যেমন সম্ভবপর নহে; উৎপত্তির পূর্বে অণু-মধ্যে অণুজ যেমন অবশ্যক অবস্থার অবস্থিতি করে,—প্রকৃতির মধ্যে সৃষ্ট-পদার্থও সেইভাবে অবস্থিত আছে। সাংখ্যের মতে, সৃষ্টিকর্তা কেহই নাই; প্রকৃতি হইতেই সবার উৎপন্ন হইয়াছে।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব-সম্বন্ধেই সাধ্যাকার সন্ধিধান । তাহার মতে “ঈশ্বরাসিদ্ধিঃ”, অর্থাৎ ঈশ্বর অসিদ্ধ । বলা বাহুল্য, এই ক্ষুদ্র সাধ্যাকারকে অনেকে নিরীক্ষণবাদী এবং সাধ্যা-

দর্শনকে নিরীক্ষণবাদেরূপে বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন । সাধ্যা বলেন, সাধ্যমতে ঈশ্বর যদি থাকিতেন, তিনি যদি সৃষ্টিকর্তা হইতেন, তাহা হইলে, ঈশ্বর অসিদ্ধ ।

হয় তিনি যুক্ত-নয় তিনি বদ্ধ ;—ইহার একতর হইবেনই হইবেন ।

যুক্ত হইলে, রাগাদি প্রেরিত্তির অতাব-প্রযুক্ত তাঁহার ক্রিয়ারাহিত্য ঘটিয়া থাকে । যিনি ক্রিয়াহীন তিনি আবার সৃষ্টিকর্তা হইবেন কিরূপে ? যদি তিনি বদ্ধ হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার অপরিচ্ছিন্ন অসীম শক্তির কল্পনা কখনই করা বাইতে পারে না । সাধ্যাতত্ত্বের পঞ্চম অধ্যায়ে এই সম্বন্ধে কয়েকটা সূত্র আছে । সেই সূত্র কয়েকটার মর্ম্ম,—“কেবলমাত্র ঈশ্বরের অধিষ্ঠান দ্বারা ফলনিষ্পত্তি হয় না । আবশ্যকানুরূপ কর্ম্ম দ্বারাই ফলনিষ্পত্তি হইয়া থাকে ।

যদি কার্য্যশক্তি বা অতিপ্রায় থাকে, তাহা হইলে ঈশ্বর সাংসারিক মনুষ্যের মধ্যে পরিগণিত হন । সেক্ষেপ কল্পনা পরিভাষা মাত্র । রাগ বা উৎকট ইচ্ছা ভিন্ন সৃষ্টি সম্ভবপর নহে ; কিন্তু তাহাতে যুক্তবের অসম্ভাব প্রতিপন্ন হয় । ঈশ্বরের যদি রাগ বা উৎকট ইচ্ছাই থাকিল, তাহা হইলে তিনি তো মানুষের ছায় বিঘ্নী হইয়া দাঁড়াইলেন । তার পর সন্ধ্যা আছে বলিয়াই তিনি যদি ঈশ্বর হন, তাহা হইলে সকল পদার্থকেই তো ঈশ্বর বলিতে হয় । সুতরাং প্রমাণাতাবে ঈশ্বর সিদ্ধ হইল না ।” সাধ্যাকার তাই উচ্চকণ্ঠে কহিলেন,—

“প্রমাণাতাবাসংসিদ্ধিঃ ।” প্রত্যক্ষ প্রমাণ তো নাই-ই ; অহুমান প্রমাণেও ঈশ্বর সম্ভবে না,—যেহেতু তাঁহার সহিত সম্বন্ধাভাব । শব্দ-প্রমাণেও তিনি প্রতিপন্ন হন না ; যেহেতু, প্রতিও প্রকৃতির কার্য্য । সাধ্যা যে প্রমাণের কথা বলিলেন, তাঁহার মতে সেই প্রমাণ—ত্রিবিধ ;—প্রত্যক্ষ, অহুমান ও শব্দ । বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সরিকর্ষ হইতে যে অধাবসায় (বুদ্ধিরতিবিশেষ) হয়, তাহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ ; ব্যাপ্যব্যাপক ভাব ও পঞ্চধর্ম্মতা জ্ঞান জন্ত যে বুদ্ধিবৃত্তি, তাহা অহুমান প্রমাণ ; এবং আপ্তবাক্য জ্ঞান বাক্যার্থ-জ্ঞান—শব্দ-প্রমাণ ।

অনেকে বলেন,—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা উপলব্ধি হয়, তাহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ । কিন্তু সাধ্যা-চর্চাগণ তাহাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলেন না । তাঁহাদের মতে,—ইন্দ্রিয় সময়ে সময়ে ভ্রান্ত হইতে পারে ; শুভ কুসুম-ভ্রমে কার্পাস আহরণে প্রবৃত্ত হওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব নহে । সুতরাং কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ জ্ঞানকে কখনও প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলা বাইতে পারে না । ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা উপলব্ধি হয়, বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা তাহা পরিপূরিত হইলে,—তাহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ । প্রত্যক্ষ প্রমাণ বতাসিদ্ধ ; তাহার আর কখনও প্রমাণের আবশ্যক নাই ; তাহা কখনও প্রমাণ এবং কখনও অপ্রমাণ হয় না । অহুমান প্রমাণও বুদ্ধিবৃত্তি-বিশেষ । ব্যাপ্যব্যাপক ভাব অর্থে—বাতাবিক সম্বন্ধ । কার্য্য-কারণ-সহচর প্রভৃতি দর্শনে অহুমান-প্রমাণ-জ্ঞান লাভ হয় । যেমন, অক্ষপাত দর্শনে ক্রেশাদির অহুমান ; নীলবর্ণ মেঘ-দর্শনে বৃষ্টির অহুমান, ধূম দর্শনে অগ্নির অহুমান, ইত্যাদি । সম্বন্ধই অহুমান-প্রমাণের বলাভূত । ধূম দেখিয়া অগ্নির অস্তিত্ব প্রমাণ হয় ; যেহেতু, যেখানেই ধূম দেখিয়া থাকি, সেখানেই অগ্নির সম্বন্ধ দেখিতে পাই ; আগুন এগিতাবহ, বৃদ্ধ এগিতাবহ প্রভৃতি

অনেকেই হয় তো দেখেন নাই; অথচ তাঁহাদের সম্বন্ধ প্রমাণিত হয়। তাহা অমুমান প্রমাণ। শ্রুতগেনির-গ্রন্থে অথচ ভ্রমপ্রমাদাদি পরিশূদ্ধ শব্দই,—শব্দ-প্রমাণ। শব্দ-প্রমাণ বলিয়া শব্দ-প্রমাণের প্রতিপন্ন হয়। সেই শব্দ যদি প্রমাদশূন্য হয়, তাহাই শব্দ-প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। আপ্তবাক্য বেদাদি,—এই শব্দ-প্রমাণ। এই তিনটি প্রমাণ ভিন্ন সাক্ষ্যকার অন্য প্রমাণ স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে, এই তিন প্রমাণই আবার পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত; প্রত্যক্ষ প্রমাণ—সর্ব-মূল্যধার; অমুমান ও শব্দ-প্রমাণ তাহার অন্তর্ভুক্ত। পূর্বে কোনও বস্তু দেখা থাকিলে বা পূর্বে কোনও শব্দ শুনা থাকিলে, পরে সেইরূপ কোনও বস্তু দেখিলে বা সেইরূপ কোনও শব্দ শুনিলে, ততদ্বিষয়ের যে জ্ঞান, এক হিসাবে, তাহাই অমুমান জ্ঞান। সুতরাং অমুমান-জ্ঞানের সহিত প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের সম্বন্ধ অনিবার্য। শব্দজ্ঞান-সম্বন্ধেও ঐ একই কথা বলা যাইতে পারে। যাহা ইউক, এই ত্রিবিধ প্রমাণের বিষয় আলোচনা করিয়া, তদ্বারা যে ঈশ্বর সিদ্ধ হইতে পারে না, সাক্ষ্যকার তাহাই দেখাইয়াছেন। তাঁহার মতে,—প্রত্যক্ষ প্রমাণে ঈশ্বরের সত্তা তো খুঁজিয়াই পাওয়া যায় না; পরন্তু, “সদ্ব্যভাবানুমানম্”, অর্থাৎ সম্ব্যভাব-নিবন্ধন অমুমান প্রমাণেরও অভাব; “কৃতিরপি প্রধানকার্যদত্ত” অর্থাৎ প্রতিও প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। দুইদিকস্থলে তিনি বলিয়াছেন,—যেমন অমুরাদি। তিনি আরও বলেন,—ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্তা বলিয়া স্বীকার করিতে গেলে, ঈশ্বরের পক্ষপাতিত্ব দোষ আসিয়া পড়ে। একজনকে সূখী, আর একজনকে দুঃখী করা,—নিরপেক্ষ ঈশ্বরের কর্তব্য কি? অপিচ, অচেতন প্রকৃতিতে সৃষ্টি-প্রকৃতি অসম্ভব নহে। অরকাস্তমসি লৌহ আকর্ষণ করে; মণি অচেতন হইলেও, এ আকর্ষণ-প্রকৃতি—তাহার স্বভাব-বর্ণন। এই সকল নানা কারণে, সাক্ষ্যকারকে অনেকে নিরীশ্বরবাদী বলেন।

কিন্তু অপর পক্ষ বলেন,—“সাক্ষ্যকার কপিল নিরীশ্বরবাদী নহেন। ‘ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ’ এই সূত্র দ্বারাই প্রতিপন্ন হয়, তিনি ঈশ্বর স্বীকার করতেন। যদি তিনি ঈশ্বর স্বীকার না করিতেন, তাহা হইলে ‘ঈশ্বরভাবাৎ’ ইত্যাকার কোনও সূত্র রচনা করিতে পারিতেন। কিন্তু ‘ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ’ এই সূত্র রচনা দ্বারা প্রতিপন্ন হয়,—তিনি বলিয়াছেন, ঈশ্বর সিদ্ধ করা যায় না বটে, কিন্তু ঈশ্বর আছেন।” সাক্ষ্য-প্রবচন-ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু নানারূপ বুদ্ধি-তর্ক দ্বারা এই তত্ত্বই প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। সাক্ষ্যদর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের সমুপপাদ্যং ও সড়পপাদ্যং সূত্রে “ঈশ্বরেশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধা এবং “স হি সর্ববিৎ সর্বকর্তা” এই দুই বাক্য আছে দেখিয়াস্ত কৈহ কেহ সাক্ষ্যকারকে আন্তিক বলিয়া মান্য করেন; অপিচ, সাক্ষ্যকার বেদ মানিতেন,—একজ্ঞও তিনি আন্তিক-সংক্রায় প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু প্রতিপক্ষগণ এ বিষয়েও যোত্র আপত্তি করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন,—“ঈশ্বরেশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধা” প্রকৃতি বাক্য ঈশ্বর-সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয় নাই; উহা মুক্ত-পুরুষের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে। কপিল বলিয়াছেন,—জ্ঞান ভিন্ন বুদ্ধি নাই, বজ্রাদি পুণ্যস্থানে পুনর্জন্ম ও জরামরণাদি আছে; জন্মময়ের পুনরুৎপাদনের জ্ঞান, তাহাতে পুরুষের পুনরুৎপাদন বটিয়া থাকে। সেজন্য পুরুষকে ঈশ্বর বলিলে বলিতে পারি,—কপিলের “ঈশ্বরেশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধা” প্রকৃতি বাক্যের অর্থ এই মাত্র। আরও কপিল

যে বেদ মানিতেন,—সে কেবল শৌকিকতার ভয়ে। বেদ না মানিলে নাস্তিক ব'লয়া অবজ্ঞাত হইতে হইবে। বেদ-বিরোধী হইলে সমাজ-চাতি ঘটিবে,—এই সকল কারণেই তিনি বেদ-বিদ্যে কোনও বিতর্ক উপস্থিত করেন নাই। তবে তিনি যে বলিয়াছেন,—‘বেদ পৌরুষেরও নহে, অপৌরুষেরও নহে; বেদ আপনাপনিই প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে’;—তাহাতে তিনি যে অন্তরে বেদ মানিতেন না, কেবল মৌখিক বেদ-ভক্তি প্রকাশ করিতেন,—ইহাই বুঝা যায়। কপিলের মতে,—পুরুষ বা আত্মাও এক নহেন। তিনি বলেন,—শরীর-ভেদে নানা পুরুষ, নানা আত্মা। যদি এক পুরুষই সকল শরীরের অধিষ্ঠাতা হইতেন তাহা হইলে একের সুখ-দুঃখে বা একের জন্ম-মৃত্যুতে অপরের সুখ-দুঃখ বা জন্ম-মৃত্যু ঘটিত না কি? কিন্তু যখন জনন-মরণ সুখ-দুঃখের ভারতম্য দেখিতে পাই, তখন কোনক্রমেই পুরুষ বা আত্মাকে এক বলিতে পারা যায় না। বলা বাহুল্য, এই ক্ষেত্রে উপনিষদের সঙ্গিত কপিলের মতভেদ ঘটিয়াছে। উপনিষৎ পরমাছার সর্বব্যাপক প্রভুত্ব করিয়াছেন; সাম্ব্যকার তাহার পার্থক্য-সাধনে প্রয়াসী হইয়াছেন। পঞ্চবিংশ তমের আলোচনায়, মহর্ষি কপিল, সৃষ্টির হেতু, সৃষ্টির ক্রম, শরীরের স্থল-সূক্ষ ভেদ এবং স্বর্গ ও নরক প্রভৃতির তৎকথা আলোচনা করিতেও ক্রটি করেন নাই। শরীর-সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন,—স্থল ও সূক্ষ-ভেদে শরীর দ্বিবিধ। মাতা পিতা হইতে যে শরীরের উৎপত্তি, সেই শরীরই স্থল শরীর; সে শরীরের, হয় মাটিতে, নয় অগ্নিতে, নয় পশু-পক্ষীর উদরে পরিসমাপ্তি হয়। অদৃষ্ট-ভোগের জন্তই সে শরীরের উৎপত্তি। অদৃষ্টভোগের অবসান হইলেই সে শরীরের ধ্বংস-প্রাপ্তি। সূক্ষ-শরীর বা লিঙ্গ-শরীর অর্থে—আত্মা বলিয়া বুঝা যাউতে পারে। কর্ম-অনুযায়ী সূক্ষ শরীরের ভোগাভোগ ঘটয়া থাকে। স্বর্গ-নরক-সম্বন্ধে সাম্ব্যর মত—উর্দ্ধগমন স্বর্গ-গমন, আর অধোগতি নরক-গমন। ধর্ম ও অধর্মের ফলে এই স্বর্গ ও নরক-প্রাপ্তি ঘটে। জ্ঞানের ফল—মুক্তি; অজ্ঞানের ফল—বন্ধন। তৎসাক্ষাৎকারে অর্থাৎ প্রকৃতি-পুরুষের ভেদ-জ্ঞান উপস্থিত হইলে, ধর্মার্থ অর্থাৎ ভোগাদি কারণ লোপ পায়। ভোগাদি অবশিষ্ট না থাকিলেই,—কৃতার্থতা। সেই কৃতার্থতাই কৈবল্য বা নির্বাপ-মুক্তি। সাম্ব্যদর্শনের এই নির্বাপ-মুক্তিই, অনেকে মনে করেন, বৌদ্ধ-দর্শনের মূল-ভিত্তি। এই নির্বাপ-মুক্তির স্বরূপ—আত্মাত্তিক হৃৎ-নিরুত্তি। মূলে এই হৃৎ-নিরুত্তি বা নির্বাপ-মুক্তি সাম্ব্যর প্রতিপাত হইলেও, সাম্ব্য-স্বয়ং-সমূহের অর্থ নানা জনে নানা ভাবে গ্রহণ করায়, উহা হইতে নানা মতের উৎপত্তি হইয়াছে। যে সাম্ব্যের নিঃশ্রেয়স অবলম্বনে বৌদ্ধগণ নির্বাপ-মুক্তি-তৎ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া অনেকে অনুমান করেন; সেই সাম্ব্যর প্রকৃতি-পুরুষ অবলম্বন করিয়া এ দেশে তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের পরিপুষ্টি হইয়াছে,—এ সিদ্ধান্তেও অনেকে উপনীত হইয়াছেন। বাহার যেমন চিন্তা, যাহা যেমন শিক্সা, তাহার চিন্তে সেইরূপ চিত্তই প্রতিফলিত হইয়া থাকে। মূল বেদ-বিষয়েই যখন নানা জন্মের চিত্রে নানা চিত্র প্রতিভাত, তখন বর্ণনাদি সম্বন্ধে সেরূপ ঘটিবে,—তাহাতে আর আশ্চর্য কি?

নবম পরিচ্ছেদ ।

বৈশেষিক দর্শন ।

[কণাদ ও বৈশেষিক দর্শন,—কণাদের প্রকৃত নাম উল্লুক,—বৈশেষিক দর্শনের ও তাহার ভাব্যকার-
গণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়;—বৈশেষিক দর্শনের প্রতিপাদ্য,—নিঃশ্রেয়স বা আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তিই ধর্ম,—
পদার্থ-তত্ত্ব-বিচার-প্রদক্ষে পদার্থাদির পরিচয় ও সংজ্ঞা-নির্দেশ;—পরমাণুবাদ-তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা,—পরমাণু-
সমষ্টিতেই সৃষ্টি;—বৈশেষিকের মতে দেহান্তর-গ্রহণ অদৃষ্ট-সাপেক্ষ,—প্রমাণ চিহ্নিধ,—কণাদের বেদ ও
জৈমিনি-স্বীকার সম্বন্ধে বাদানুবাদ,—শঙ্করাচার্য্য কর্তৃক কণাদের পরমাণুবাদ-তত্ত্ব খণ্ডন ।]

ষড়দর্শনের মধ্যে বৈশেষিক দর্শনও—এক প্রধান দর্শন-শাস্ত্র । অনেকে বিশ্বাস করেন,
শাস্ত্রা-দর্শনের পূর্বে সর্বপ্রথমে বৈশেষিক দর্শন প্রণীত হইয়াছিল । মহর্ষি কণাদ বৈশেষিক
কণাদ দর্শনের প্রবর্তক । ততুল-কণামাত্র ভক্ষণ করিয়া, ইনি দেবাদিদেব
ও মহাদেবের আরাধনা করেন, এবং সেই আরাধনার ফলে জগতের অমূল্য
বৈশেষিক দর্শন । সম্প্রদ এই বৈশেষিক দর্শন শাস্ত্র প্রাপ্ত হন । ততুল-কণা ভক্ষণ করিয়া

উপাসনা করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম হইয়াছিল,—কণাদ. কণভক্ষ, কণভূজ, ইত্যাদি ।
কণাদের প্রকৃত নাম—উল্লুক ; সেইজন্ত ইহার দর্শন কখনও কখনও ‘উল্লুক্য দর্শন’ নামে
অভিহিত হয় । মহর্ষি উল্লুক কষ্টপ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন ; এইজন্ত ইনি কান্তপ
নামেও পরিচিত । ‘বিশেষ’ নামে এক অতিরিক্ত পদার্থ স্বীকার করায়, ইহার দর্শন-
শাস্ত্রের নাম—‘বৈশেষিক দর্শন ।’ বৈশেষিক দর্শনে বৌদ্ধ-মতের উল্লেখ নাই, পরন্তু
মহাভারতাদিতে বৈশেষিক দর্শনের আলোচনা আছে,—এই জন্ত আধুনিক পণ্ডিতগণ
বৈশেষিক দর্শনকে তিন সহস্রাব্দিক বৎসর পূর্বের রচিত দর্শন বলিতে কুণ্ঠিত নহেন ।
বৈশেষিক সূত্রের মতাবলম্বন করিয়া পরবর্ত্তি-কালে বহুতর ভাষ্যগ্রন্থ বিরচিত হয় । অনেক
ভাষ্যই এখন বিলুপ্তপ্রায় । প্রমত্তপাদাচার্য্য ‘পদার্থ-ধর্ম-সংগ্রহ’ নামে বৈশেষিক দর্শনের যে
ভাষ্য প্রণয়ন করেন, সেই ভাষ্য এবং শঙ্কর মিশ্র প্রণীত ‘বৈশেষিক সূত্রোপস্কার’
ভাষ্য বিশেষ প্রসিদ্ধ । পদার্থ-ধর্মসংগ্রহের উপর শ্রীধরাচার্য্য ‘স্মারকদলী’ টীকা এবং
উদয়নাচার্য্য ‘কিরণাবলী’ টীকা প্রণয়ন করেন । শঙ্করমিশ্র প্রণীত ‘উপস্কার’ নামী টীকা
এখন বিশেষ সমাদৃত ; গবরমেণ্টের উপাধি-পরীক্ষামতেও এখন সেই টীকাই পাঠ্যভূক্ত ।
বৈশেষিক দর্শনে দশটি অধ্যায় আছে । প্রত্যেক অধ্যায় আছিক নামক হইলী করিয়া
পরিচ্ছেদে বিভক্ত । প্রথম অধ্যায়ে, প্রথম আছিকের সূত্র-সংখ্যা একত্রিশটি এবং দ্বিতীয়
আছিকের সূত্রসংখ্যা সাতেরটি । দ্বিতীয় অধ্যায়ে, প্রথম আছিকের সূত্র-সংখ্যা এক-
ত্রিশটি এবং দ্বিতীয় আছিকের সূত্রসংখ্যা সাইত্রিশটি । তৃতীয় অধ্যায়ে, প্রথম আছিকের
সূত্রসংখ্যা উনিশটি এবং দ্বিতীয় আছিকের একুশটি । চতুর্থ অধ্যায়ে, প্রথম আছিকের
সূত্রসংখ্যা তেরটি এবং দ্বিতীয় আছিকের এগারটি । পঞ্চম অধ্যায়ে, প্রথম আছিকের সূত্র-
সংখ্যা আঠারটি এবং দ্বিতীয় আছিকের ছাট্টিশটি । ষষ্ঠ অধ্যায়ে, প্রথম আছিকের সূত্রসংখ্যা

ষোলটি এবং দ্বিতীয় আঙ্কিকেরও ষোলটি । সপ্তম অধ্যায়ে, প্রথম আঙ্কিকের পঁচিশটি এবং দ্বিতীয় আঙ্কিকের আটাইশটি । অষ্টম অধ্যায়ে, প্রথম আঙ্কিকে এগারটি ও দ্বিতীয় আঙ্কিকে ছয়টি । নবম অধ্যায়ে, প্রথম আঙ্কিকে পনেরটি এবং দ্বিতীয় আঙ্কিকে তেরটি । দশম অধ্যায়ে, প্রথম আঙ্কিকে সাতটি এবং দ্বিতীয় আঙ্কিকে নয়টি । বৈশেষিক দর্শনের মোট সূত্রসংখ্যা তিন শত সত্তরটি । বৈশেষিক দর্শনের প্রথম অধ্যায়ে দ্রব্যাদি সত্ত্ব পদার্থ এবং সেই সত্ত্ব পদার্থের গুণ, লক্ষণ, সম্বা ও বর্নাদির বিষয় আলোচনা হইয়াছে । দ্বিতীয় অধ্যায়ে, দ্রব্যাত্ত্ব আলোচনায়, পৃথিবীর, জলের, তেজের, বায়ুর লক্ষণাদি এবং প্রমাণাদি-বিষয় বিশদ-রূপে বর্ণিত আছে । তৃতীয় অধ্যায়ে, আত্মা ও অন্তঃকরণের বিষয় এবং তাহাদের মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ বিদ্যমান, তাহারই আলোচনা হইয়াছে । চতুর্থ অধ্যায়ে, পরমাণুর মূল কারণ এবং শরীর ও দ্রব্য-তত্ত্বের সম্বন্ধ নিরূপিত আছে । পঞ্চম অধ্যায়ে, কর্মবিচার ও কর্ম-পরম্পরার (কৃমিকল্প, বৃষ্টিপাত প্রভৃতির) হেতু-নির্দেশ হইয়াছে । ষষ্ঠ অধ্যায়ে, বৈদিক ধর্মের আলোচনা, ক্রমফল-কথা ; সপ্তম অধ্যায়ে, গুণ ও সমবায়-বিচার ; অষ্টম অধ্যায়ে, জ্ঞান-প্রকরণ, প্রত্যক্ষের হেতু-নির্দেশ এবং ইন্দ্রিয়াদির উৎপত্তি বিচার ; নবম অধ্যায়ে, অভাব, ভ্রম, অবিদ্যা প্রভৃতির আলোচনা ও 'বিশেষ' পদার্থ নির্ণয় ; এবং দশম অধ্যায়ে সুখ-দুঃখের ভেদাভেদ-বিষয়ক জ্ঞান-সম্বন্ধে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে ।

বৈশেষিক দর্শনেরও প্রতিপাদ্য—আত্মাত্তিক হুঃখ-নিবৃত্তি । দর্শনকার প্রথমেই “অধাতো ধর্মঃ ব্যাখ্যাস্তামঃ”—অনন্তর ধর্মব্যাখ্যা করিব, এই বলিয়া প্রহারমুদ্র করিয়াছেন ।

তার পরই দ্বিতীয় সূত্রে তিনি বলিয়াছেন,—“যতোহি ভ্রাত্ময়নিঃশ্রেয়স-
বৈশেষিকের
প্রতিপাদ্য ।
সিদ্ধিঃ স ধর্মঃ ।” অর্থাৎ, যদ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়, এবং বাহ্য আত্মাত্তিক

হুঃখ-নিবৃত্তির বা মোক্ষ-লাভের হেতু-ভূত—তাহাই ধর্ম । সাংখ্যও বলিয়াছিলেন,—তত্ত্বজ্ঞান হইলেই নিঃশ্রেয়স (আত্মাত্তিক হুঃখনিবৃত্তি) বা মুক্তি লাভ হয় । বৈশেষিকও বলিলেন,—তত্ত্বজ্ঞানই নিঃশ্রেয়স বা মোক্ষের মূল, তত্ত্বজ্ঞান-লাভই ধর্ম । এক হিসাবে, সাংখ্যও বাহ্য দেখিয়াছি, বৈশেষিকেও তাহাই দেখিতে পাই । তবে পার্থক্য এই,—পদার্থ ও প্রমাণ-সম্বন্ধে বৈশেষিক ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছেন । মহর্ষি কণাদের মতে পদার্থ দ্বিবিধ,—ভাব পদার্থ ও অভাব পদার্থ । ভাব পদার্থ ছয়টি,—দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ এবং সমবায় । ভাবের অভাবই—অভাব পদার্থ, স্তম্ভরায় অভাব পদার্থ—একমাত্র । বড়বিধ ভাব-পদার্থের সাধারণ্য ও বৈধর্ম্য প্রদর্শন-পূর্বক নিঃশ্রেয়স-লাভের উপায়-নির্দেশই—বৈশেষিক দর্শনের উদ্দেশ্য । সাধারণ্য অর্থে—সাধারণ ধর্ম ; যেমন,—পৃথিবী, জল ইত্যাদি দ্রব্যের সাধারণ্য—‘দ্রব্যত্ব’ । দ্রব্যের বৈধর্ম্য—গুণত্ব ; যেহেতু, দ্রব্যের গুণত্ব দৃষ্ট নহে । এইরূপ হুঃখ দৃষ্টিতে দেখিলে, গুণের বৈধর্ম্য—দ্রব্যত্ব, দ্রব্যের বৈধর্ম্য—কর্মত্ব ইত্যাদি বিষয় বুঝিতে পারা যায় । বৈশেষিক মতে, দ্রব্য নয়টি,—কিষ্টি, অপ, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক, আত্মা ও মন ; গুণ-পদার্থের সংখ্যা চব্বিশটি,—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, রেব, প্রেয়স প্রভৃতি সত্ত্বেরটী এবং তাত্ত্বকার প্রদত্তপাদ্যের

বসন্ত, শুষ্কতা, জলবায়ু, মেঘ, সংস্কার, ধর্ম, অধর্ম ও শল এই সাতটি। কণ্ঠপদার্থ পাঁচটি,— উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আবহুকন, প্রসারণ এবং গমন। সামান্য অর্থে—জাতি। উহা দুই প্রকার,—সামান্য বা সাধারণ জাতি, এবং বিশেষ জাতি। ঐ দুই জাতি 'পরা' এবং 'অপরা' নামেও অভিহিত হয়। প্রাণিত্ব বলিতে সাধারণ জাতিই বুঝায়। মনুষ্যত্ব, পশুত্ব বলিতে বিশেষ জাতি বুঝাইয়া থাকে। বিশেষ পদার্থ—একটি; তাহাই পরমাণুর বিশেষত্ব। পরমাণুর সমষ্টিতে পৃথিবী গঠিত, এবং সমান পরমাণু হইতে বিভিন্ন দ্রব্যের উৎপত্তি হইতেছে। সাধারণ দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, কোন্ পরমাণুর মধ্যে কোন্ অবয়ব নিহিত আছে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না; কিন্তু এক এক পরমাণু হইতে এক এক জাতীয় দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে,—ইহা আমরা দেখিতে পাই। তাহার কারণ—মহর্ষি কণাদেবর মতে—বিশেষ পদার্থ। যে পরমাণুতে ঐক্যোৎপত্তি হয় এবং যে পরমাণুতে বৃক্ষের উৎপত্তি হয়,— উভয়ের মধ্যে যে বিশেষত্ব, তাহাই বিশেষ পদার্থ। একই পৃথিবীতে, দৃশ্যতঃ একই পরমাণু-রূপে বিরাজমান থাকিয়া, বিভিন্ন দ্রব্যের উৎপত্তি হয়। যে কারণে ঐরূপ ঘটিয়া থাকে, বৈশেষিক দর্শনের তাহাই বিশেষ পদার্থ। এই পদার্থের বিশ্লেষণ-হেতুই কণাদেবর দর্শন 'বৈশেষিক দর্শন' নামে অভিহিত। সমবায় অর্থে—নিত্য সম্বন্ধ। ঘটের সহিত মুক্তিকার, তন্তুর সহিত বস্ত্রের, জাতির সহিত ব্যক্তির যে নিত্য-সম্বন্ধ বিদ্যমান,—তাহাই সমবায়। অভাব পদার্থের—প্রধানতঃ দুই ভাব;—সংসর্গাভাব ও অজ্ঞোক্তাভাব। সংসর্গাভাব আবার ত্রিবিধ;—ধ্বংসাত্মক, প্রাপ্তাত্মক, অত্যন্তাভাব। স্থূলতঃ, ভাবের অভাবকে অভাব বলা হইয়াছে,—যেমন, আলোকের অভাব অন্ধকার। ঘট ছিল, চূর্ণ হইয়া গিয়াছে; দেহ ছিল, ভস্মসাৎ হইয়াছে;—তাহাই ধ্বংসাত্মক। যেমন,—মুক্তিকা আছে, ঘট প্রস্তুত হইবে; সূত্র আছে, বস্ত্র প্রস্তুত হইবে;—এস্থলে, মুক্তিকা ও সূত্র, ঘট ও বস্ত্রের প্রাপ্তাত্মক। অত্যন্তাভাব অর্থে,—একে অন্তের একান্তাভাব; যেমন, জড় দেহে চৈতন্যাত্মক। ঐ স্থানে ঘট নাই বলিলে, ঘটের প্রাপ্তাত্মক বা ধ্বংসাত্মক কিছুই সূচিত হয় না, স্তব্ধতা, তাহার অত্যন্তাভাব বুঝিতে হইবে। অজ্ঞোক্তাভাব অর্থে—একে অন্তের অভাব; যেমন, ঘটে পটের অভাব, পটে ঘটের অভাব, সিংহে শৃগালের অভাব, আবার শৃগালে সিংহের অভাব, ইত্যাদি। বৈশেষিক দর্শনে প্রধানতঃ উল্লিখিত সপ্ত-পদার্থের সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়া, পরিশেষে তত্ত্বপদার্থাস্তর্গত বিভাগ-সমূহেরও সংজ্ঞা নির্দেশ করা হইয়াছে। ক্ষতি বলিতে, জল বলিতে, তেজ বলিতে, অথবা উৎক্ষেপণ আবহুকন প্রভৃতি বলিতেই বা কি বুঝায়, মহর্ষি কণাদ আপন সূত্রে তাহারও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সে হিসাবে, পৃথিবীর লক্ষণ, জলের লক্ষণ, তেজের লক্ষণ, বায়ুর লক্ষণ, শুণের লক্ষণ, কশের লক্ষণ,—সকল লক্ষণই সংজ্ঞাকারে নিবদ্ধ আছে। পৃথিবী কি?—বুঝাইবার জন্ত তিনি বলিয়াছেন,—“রূপরসগন্ধস্পর্শবতী পৃথিবী।” অর্থাৎ, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ বাহ্যতে আছে,—তাহাই পৃথিবী। ‘জল’ পদার্থ বুঝাইবার জন্ত তিনি বলিয়াছেন,—“রূপরসস্পর্শবত্যা আপোজ্বাতি দ্বিধাঃ।” অর্থাৎ, বাহ্যতে রূপ, রস, স্পর্শ আছে, বাহ্যত্ব ও দ্বিধা, তাহাই জল। ‘তেজো রূপস্পর্শবৎ’,—অর্থাৎ বাহ্যতে রূপ ও স্পর্শ আছে, তাহা তেজ; ‘স্পর্শবান বায়ু’,—অর্থাৎ বাহ্যতে স্পর্শ আছে,

তাহার বাহ্য; “অ আকাশে ন বিভাষে”—অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, যাহাতে নাই, তাহাই আকাশ । এইরূপে প্রত্যেক পদার্থের সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়া, তত্তৎপদার্থের কারণ-পরম্পরা অন্বেষণের পথ, মহাক্ষিকপাদ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন,—“সদৃকারণব্রিত্যম্” ; অর্থাৎ, সংপদার্থের মধ্যে যাহা কারণরূপ নহে অর্থাৎ যাহার কারণ নাই, তাহা নিত্য । সে হিসাবে, একমাত্র পরমাণুই—সৎ-পদার্থ, নিত্য ; তাহার আর কারণ নাই । ফলতঃ, পরমাণুবাদ-তত্ত্ব কণাদের দর্শন-স্থলে প্রচারিত । তাহার মতে,—“ইহ-সংসার পরমাণু-সংযোগে উৎপন্ন হইয়াছে ; এবং কোনও অব্যক্ত কারণে সে সংযোগ সাধিত হয় । পৃথিবীর সকল পদার্থই সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম পরমাণুর সমষ্টি মাত্র । বিভাগ করিতে করিতে সকল পদার্থই এক সূক্ষ্মতম অবস্থায় উপনীত হয় । সে অবস্থায়, আর তাহার বিভাগ করা যায় না । সেই অবিভাজ্য সূক্ষ্মতম পদার্থই নিত্য পরমাণু ; তাহারই সংযোগে স্থল সংসারের উৎপত্তি হয় ।” *

কণাদের মতে,—দ্রব্যাদি সপ্ত পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে, নিয়ন্ত্রণের অর্থাৎ আত্যন্তিক হুঃখ-নিবৃত্তি-রূপ মোক্ষ লাভ হয় । তিনি বলেন,—“ভোগাভোগ এবং দেহান্তর-গ্রহণ সমস্তই অদৃষ্ট-সাপেক্ষ । কর্ম্মাহুতান-জ্ঞাত-কর্ম্মের ভ্রান্তভাব ফলভোগের বৈশেষিকের জ্ঞাত শরীরের প্রয়োজন হয় ; তাহাই অদৃষ্ট । তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা সেই অদৃষ্টের নাপ হয়, এবং তাহাতেই জীবের মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে ।”

এ হিসাবে, ঈশ্বরের সহিত জীবের সম্বন্ধ নাই বলিলেও অভুক্তি হয় না ; যেহেতু, দ্রব্যাদি সপ্ত পদার্থের সাধর্ম্মা ও বৈধর্ম্মা জ্ঞান জন্মিলেই মুক্তিলভ্য বটিয়া থাকে,—বৈশেষিক দর্শনের ইহাই মত । ঈশ্বরের কোনও কার্য্যকারিতা বৈশেষিক দর্শন স্বীকার করেন নাই ; পরন্তু অদৃষ্টকেই তিনি সকল সৃষ্টির মূলধার বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন । তিনি স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন,—“অগ্নে রুদ্ধজ্বলনং বায়োত্তিথ্যকৃপবনমণুনাং মনস্শান্তং কর্ম্মাদৃষ্টকারিতম্” ; অর্থাৎ, অগ্নির উর্দ্ধজ্বলন, বায়ুর তিথ্যকৃ গমন এবং পরমাণু ও মনের আন্ত-ক্রিয়া অদৃষ্টের দ্বারা নিশ্চয় হয় । ফলতঃ, অদৃষ্ট-বশে পরমাণুতে ক্রিয়া ; পরমাণুর ক্রিয়া-হেতু সৃষ্টি । সূতরাং সৃষ্টির সহিত ঈশ্বরের কোনই সম্বন্ধ নাই ; পরমাণু ও অদৃষ্টই সর্ব-মূলধার । অদৃষ্টের অভাবে শরীর-সংযোগের অভাব হয়, এবং ভবিষ্যতে তাহার আর পুনরুৎপত্তি হয় না ; তাহাই মোক্ষ । বৈশেষিক, প্রত্যক্ষ ও অনুমান—দুই প্রকার প্রমাণ স্বীকার করেন । শব্দ-প্রমাণ—তাহার মতে—অনুমান প্রমাণের অন্তর্গত । কোনও দ্রব্য আনয়ন করিতে বলিলে, শব্দ শ্রবণ করিয়া সেই দ্রব্য-বিষয়ে অনুমিতি জন্মে ; অর্থাৎ, কোন দ্রব্য আনিতে বলা হইয়াছে বা তাহার স্বরূপ কি,—বুঝিতে পারা যায় । বৈশেষিকের মতে ইহাও অনুমান প্রমাণ । যাহারা ‘শব্দ’-প্রমাণকে অনুমান-প্রমাণের অন্তর্ভুক্ত করিতে প্রস্তুত

* পরমাণুবাদ-তত্ত্ব মহাবি কণার সর্বপ্রথম প্রচার করেন । ভারতবর্ষে অধুনা পরমাণুবাদ-তত্ত্বের তাৎপন্য সম্বন্ধে না থাকিলেও, ইউরোপের দার্শনিকগণ অনেকেরই এই মতের পরিচোষণ করিয়া থাকেন । গ্রীক দার্শনিক ডেমোক্রেটাস ৪৪০ খৃষ্টাব্দে গ্রীসদেশে এই পরমাণুবাদ-তত্ত্ব প্রচার করেন । ডেমোক্রেটাস ভারতবর্ষে আসিয়া ব্রাহ্মণদিগের মুখে শুনিয়া কণাদের মত শিখি করিয়া যান । তাহার পর, এপিকিউরাস এই পরমাণুবাদ-তত্ত্ব বিশেষরূপে প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় । পরিশেষে ডাক্টর পরমাণুবাদ-তত্ত্বের পুনরুদ্বোধ করিয়া এতৎসম্বন্ধে ইউরোপের জ্ঞানচক্ৰ উন্নীত করিয়া দেন ।

নছেন, তাঁহারা বলেন,—“এমন অনেক ভাষা আছে, বাহা প্রত্যক্ষ বা অনুমান প্রমাণে গাঁতরা যায় না, অথচ বাহা অবিসম্বাদিত সত্য; যেমন, আশু বাক্য, গুরু উপদেশ প্রভৃতি। শব্দ-প্রমাণে পদার্থ-জ্ঞান; যেমন,—পূর্বে কোনও পদার্থ না দেখিলেও, প্রায়শঃ শব্দ-কর্তার প্রতি বিশ্বাস-বশতঃ, শব্দ-সুচিত পদার্থ মানিয়া লইতে হয়। পুত্র পিতৃ-উচ্চারিত শব্দ-সাহায্যে বহু তত্ত্ব অবগত হইয়া থাকে; সেই পিতৃ-উচ্চারিত শব্দই তাহার নিকট প্রমাণ। মোটামুটি তাহাকেই শব্দ-প্রমাণ বলা যাইতে পারে।” কিন্তু, বৈশেষিক তাহাকে অনুমান প্রমাণের মধ্যে গণ্য করিয়া লইয়াছেন। বৈশেষিক দর্শনের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় এবং দশম অধ্যায়ের শেষ সূত্রে “তদ্বচনাদান্নায়ত্ত প্রামাণ্যম্”—তাঁহার বাক্য বলিয়াই ইহা প্রমাণ,—এইরূপ উক্তির অন্তর্গত ‘তৎ’ বা তাঁহার শব্দের, স্বীকারগণ ঈশ্বর-বাক্য বা বেদবাক্য বলিয়া অর্থ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন,—বদ্বারা প্রমা অর্থাৎ ভ্রম ভিন্ন জ্ঞান জন্মে (যথার্থ জ্ঞান জন্মে), তাহাই প্রমাণ। বেদ সেই যথার্থ জ্ঞান জন্মাইয়া থাকেন;—কেন-না, বেদ ঈশ্বরের বাক্য। বেদ যদি মনুষ্য-প্রণীত হইত, তাহা হইলে ভ্রম-প্রমাদ, বিরোধ, অপটুত্ব প্রভৃতি দোষ আসিয়া পড়িত। কিন্তু বৈশেষিক-কার বেদে সে দোষ স্বীকার করেন নাই; তিনি স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন,—“বুদ্ধিপূর্বা বাক্য-কৃতি-কর্ত্তে।” অর্থাৎ, বুদ্ধিপূর্বক বেদ-বাক্য রচনা হইয়াছে; বেদবাক্য—ঈশ্বর-বাক্য; বেদবাক্য—বর্ণনাম্বয়ের প্রমাণ; বেদবাক্য—অভাস্ত।” কিন্তু অপর পক্ষ বলেন,—“পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত স্বীকৃতি নহে; যেহেতু, কণাদ তাঁহার গ্রন্থে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা বেদের অপৌরুষেয়ত্ব কোথাও স্বীকার করেন নাই। ঈশ্বর শব্দটা পর্য্যন্ত বৈশেষিক দর্শনে দেখিতে পাওয়া যায় না; এবং ‘বুদ্ধিপূর্বা বাক্যকৃতি-কর্ত্তে’ বাক্যে—‘পুরুষ-বুদ্ধি দ্বারা বেদ রচিত হইয়াছে’ অর্থ করা যাইতে পারে। ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্ত্তা বা জগতের কারণ বলিয়াও কণাদ কোথাও উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং নিরীশ্বরবাদী ভিন্ন তাঁহাকে আর কি বলা যাইতে পারে?” ইহার উত্তরে পূর্ব-পক্ষের মত,—“তদ্বচনাদান্নায়ত্ত প্রামাণ্যম্” এই সূত্রের ‘তৎ’-শব্দ ঈশ্বর-বাচক। শব্দরমিত্র উপকার নামক ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—“তদিত্যত্মপ্ৰকৃত্তমপি প্রসিদ্ধিসিদ্ধতত্ত্বেরং পরাম্ভতি।” অর্থাৎ, প্রসিদ্ধি-সিদ্ধি-হেতু সর্বপ্রসিদ্ধি-নির্ণয়-নিবন্ধন ‘তৎ’-শব্দে ঈশ্বরকে বুঝাইয়া থাকে। “ও তৎসদিত্তি নির্দেশো ব্রহ্মণ্ডত্রিবিধ স্বতঃ”—এই স্মৃতি-বাক্যেও তৎ-শব্দ ব্রহ্মবোধক। ফলতঃ, পূর্বসূচনা না থাকিলেও, তৎ-শব্দে ঈশ্বর প্রতিপন্ন হয়, এবং তদ্বারা গোপনভাবে মহর্ষি কণাদ ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য কিন্তু এই পরমাণুবাদের অল্প দোষ প্রদর্শন করেন। তাঁহার মতে, পরমাণু অবিভাজ্য অদৃষ্ট অবয়ব-হীন হইতে পারে না। পরমাণুর সংযোগে ফলন দৃষ্ট পদার্থের উৎপত্তি হয়, তখন পরমাণুর স্বক্সাদপিতৃস্ব অবয়ব আছে। তাহার অবয়ব আছে, তাহা কখনই অবিভাজ্য অদৃষ্ট হওয়া সম্ভবপর নহে। সুতরাং, পরমাণুর অনিত্যত্ব সপ্রমাণ হইতে পারে না।

* শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যে বুদ্ধিমানুষ্য এইরূপে গণিত হইয়াছে,—“সংযোগশ্চাপৌরুষত্বেরং সর্বাঙ্গানা বা আদ্যকবেশেন বা সর্বাঙ্গানা চেহপদ্যাদ্বৈপপত্তেরেণুযাত্রপ্রসঙ্গো দৃষ্টে বিপর্যয়প্রদগ্ধঃ।” সর্বাঙ্গ কিংবা একদেশ ভাবে হই অণুর সংযোগ সম্ভবপর। সর্বাঙ্গে ভাবে সংযোগ ঘটিলে, তাহা দৃষ্ট পদার্থ হয়। একদেশ ভাবে সংযুক্ত হইলেও অণুর সংযববহু প্রতি পন্ন হইয়া থাকে।

দশম পরিচ্ছেদ ।

জ্ঞান-দর্শন ।

[জ্ঞানদর্শন ও গৌতম,—জ্ঞান ও আত্মিকিকী নামের উৎপত্তি,—জ্ঞান-দর্শনের সূত্র ও প্রকরণাদি,—গৌতম ও ভাষ্যকারগণ,—গৌতম যুনির আশ্রম-অঙ্গ,—রঘুনাদেবের মিথিলায় জ্ঞানশিক্ষা,—জ্ঞান-দর্শনের প্রতিপাদ্য,—প্রমাণ, প্রমের প্রতিতি বোদ্ধ শ্রমার্থের স্বরূপ ভঙ্গ,—প্রমাণ চতুষ্টয়,—অনুমান প্রমাণের বিশেষত্ব,—নব্য ও প্রাচীন জ্ঞান,—ব্যাকরণ কাব্যাদি পাঠে জ্ঞানের উপযোগিতা,—নৈবদ্য কাব্যের দৃষ্টান্ত,—জ্ঞানদর্শন সংক্রান্ত বিবিধ ভঙ্গ,—ইহর, আত্মা, অদৃষ্ট, জন্মান্তর, বেদ, পরমাণু প্রভৃতি,—বেদের প্রামাণ্য,—গণকায়বীর জ্ঞান,—গ্রীসদেশে শরৎপাচার্য,—নব্য জ্ঞানের আলোচনা ।]

জ্ঞান-দর্শন মহর্ষি গৌতম-প্রণীত । গোত্রপতি গৌতম ঋষির ‘জ্ঞানসূত্র’—উহার ভিত্তি-স্থানীয় । * প্রমাণ দ্বারা পদার্থ নিরূপণে অথবা পরপ্রত্যয়নার্থ (পরকে বুকাইবার জন্য) গৌতম প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন—এই পঞ্চ অবয়বের অব-তারণার নাম ‘জ্ঞান’ । জ্ঞান-দর্শনের আরও একটী নাম আছে ; যে জ্ঞান-দর্শন । নাম—আত্মিকিকী । আগম-শাস্ত্র-প্রতিপাদিত বস্তুতত্ত্ব জানিবার পর যে দর্শন (অর্থাৎ আত্ম-তত্ত্বের অবগতির তাহার অনুশা-রূপ মনন) তদ্বিকীর্ষক শাস্ত্র আত্মিকিকী । আত্মিকিকী শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ,—“অনুশ্রবণাদনু সীকামননং তদ্বিকীর্ষিকা বিজ্ঞা আত্মিকিকী ।” অর্থাৎ শ্রবণাধ্য উপাসনার অনন্তর মননাদ্য উপাসনা, তদ্বিকীর্ষিকা বিজ্ঞাই আত্মিকিকী বিজ্ঞা । সুলভ্য, মুক্তিলাভই এই বিজ্ঞার মুখ্য উদ্দেশ্য । এই আত্মিকিকী শাস্ত্রকে মনন-শাস্ত্রও বলা যাইতে পারে । গৌতম ঋষির অপর নাম—অক্ষপাদ ; † তজ্জন্ম তাঁহার এই দর্শন-শাস্ত্র ‘অক্ষপাদ-দর্শন’ নামেও অভিহিত হইয়া থাকে । জ্ঞান-দর্শন পাঁচটি অধ্যায়ে ৫২১টী সূত্রে প্রণীত । প্রতি অধ্যায়ে দুইটী করিয়া আত্মিক আছে । আত্মিকের অপর নাম ‘প্রকরণ’ । প্রকরণে এক একটী প্রস্তাবের পরিসংখ্যতি । কোথাও চারি পাঁচটী সূত্রে, কোথাও তদ্বিক সূত্রে, এক একটী প্রকরণ শেষ হইয়াছে । পণ্ডিতগণ প্রধানতঃ জ্ঞানদর্শনকে তিন অংশে বিভক্ত করেন,—তর্ক্যাংশ, জ্ঞান্যাংশ ও বর্ণনাংশ । তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, ছল, বিতণ্ডা প্রভৃতি লইয়া

* কাহারও কাহারও মতে, আদি-ঋষি গোত্রপতি গৌতমই জ্ঞান-দর্শনের প্রকর্তৃক । কেহ কেহ বলেন, উহার গোত্রপতি গৌতম কবিই জ্ঞানসূত্রসমূহ প্রণয়ন করেন ।

† গৌতমের অক্ষপাদ নাম-সম্বন্ধে একটী উপাখ্যান প্রচলিত আছে । মহর্ষি বেদব্যাস একদা জ্ঞান-দর্শনের শিক্ষা করিয়াছিলেন গৌতম তজ্জন্ম বেদব্যাসের মুখদর্শন করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন । ইহার পর, গৌতমের তুষ্টি-বিধানের জন্য বেদব্যাস চেষ্টা করিলে, প্রতিজ্ঞাভঙ্গ-ভয়ে, গৌতম বেদব্যাসের প্রতি দৃষ্টি-সঞ্চালন করেন নাই । তখন গৌতমের চরণে দৃষ্টিশক্তি প্রকাশ পায়, এবং তদ্বারা তিনি বেদব্যাসকে দেখিতে পান । “অক্ষদর্শনশক্তিঃ পাদে প্রকাশিতং যতঃ”—এইজন্মই গৌতমের অক্ষপাদ নাম । কেহ কেহ আবার বলেন,—“অক্কে চকুসি জ্ঞানে ন্য গবনং যতঃ”—অর্থাৎ যিনি অক্ষ বা জ্ঞান দ্বারা বিদ্যাত, তিনিই অক্ষপাদ ।

জ্ঞান-দর্শনের 'ভরুং' পরিপূর্ণ। প্রমাণাদির আলোচনার অর্থাৎ প্রমাণ কত প্রকার, কিরূপে প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে ইত্যাদিতে 'জ্ঞানং' নিয়োজিত। আত্মা ও দেহ প্রভৃতির সম্বন্ধতথালোচনাই 'দর্শনাংশের' উদ্দেশ্য।

গৌতম নামেও অনেক ঋষির পাওয়া যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদে গৌতম ঋষির প্রসঙ্গ আছে ;—তিনি মহর্ষি জাবালির গুরু বলিয়া পরিচিত। শ্বেত-বরাহ কল্পে ব্রহ্মার মানস-

গৌতম

ও
ভাব্যকারগণ।

পুত্ররূপে মহর্ষি গৌতম জন্মগ্রহণ করেন,—বাম্-পুরাণে উল্লেখ আছে।

রামায়ণে অহল্যা-উপাখ্যানে এবং হরিবংশে সপ্তদ্বির মধ্যে গৌতমের

নাম দেখিতে পাওয়া যায়। তরঙ্গাঙ্ক মূনির অপর নাম—গৌতম। শাক্য-

সিংহ শাক্যমুনি বুদ্ধদেব—গৌতম নামেও অভিহিত হন। স্মৃতিশাস্ত্রকারের মধ্যে

গৌতম একজন এসিদ্ধ। বৌদ্ধাচার্যগণের মধ্যেও গৌতম ঋষি ছিলেন। জ্ঞান-দর্শন-সংক্রান্ত

জ্ঞান-গ্রন্থসমূহের মধ্যে, অনেকে বলেন,—পঞ্চদশাব্দ-বিরচিত 'জ্ঞানভাষ্য' সর্বাপেক্ষা

প্রাচীন গ্রন্থ। তিনি খৃষ্ট-জন্মের পূর্ববর্তী চতুর্থ শতাব্দীতে বিজ্ঞমান ছিলেন। * পঞ্চিল-

জ্ঞানীর পর, উক্তোক্তের 'জ্ঞানবার্ত্তিক' গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ৩৭পরে বাচস্পতি মিশ্র

কর্তৃক 'নান্দবার্ত্তিক-তাৎপর্য্য-টীকা' এবং উচয়নাচার্য্য কর্তৃক 'বার্ত্তিক-তাৎপর্য্যটীকা-পরিভাষ্য'

বিরচিত হয়। জ্ঞান-শাস্ত্রের অজ্ঞাত গ্রন্থের মধ্যে উচয়নাচার্য্য-কৃত—দ্রব্য-প্রকাশ,

কুসুমাজলি, কিরণাবলী, আত্মতত্ত্ববিবেক, রামকৃষ্ণকৃত—ভরুংজিকা, বল্লভ পণ্ডিত কৃত—

জ্ঞান-লালাবতী, সহদেব পণ্ডিত কৃত—জ্ঞান-কৌমুদী, রঘুদেব ভট্টাচার্য্য কৃত—জ্ঞানসার-

সংগ্রহ প্রভৃতি এসিদ্ধ। বৌদ্ধাচার্য্যগণের মধ্যে ধর্ম্মোত্তরাচার্য্য এবং দিগ্‌নাগাচার্য্য

প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। দিগ্‌নাগাচার্য্যের কৃতক-জাল ছিন্ন করিবার জগ্‌ই উদ্যোক্তকর

ও বাচস্পতি মিশ্র বদ্ধ-পত্রিকর হইয়াছিলেন। ধর্ম্মোত্তরাচার্য্যের 'জ্ঞানবিন্দু-টীকা'—বৌদ্ধমত-

প্রতিষ্ঠার জন্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত মিথিলা এবং নবদ্বীপ জ্ঞানসম্ম

চর্চার জন্য চির-বিখ্যাত। অনেকে মিথিলাকেই গৌতমের জন্মভূমি বলিয়া নির্দেশ

করেন। কাহারও কাহারও মতে স্বারবঙ্গ হইতে সাতারারী বাইবার পথে স্বারবঙ্গের

জেলায় উত্তর-পূর্বে, গৌতমের আশ্রম ছিল। তত্রত্য একখণ্ড প্রস্তরকে অনেকেই

অহল্যার পাষণ-দেহ বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। কাহারও কাহারও মতে, বঙ্গার নগরের

নিকটস্থিত তাগীরখী-ভায়ে গৌতমের আশ্রম ছিল। সারণ জেলার রেভেলগঞ্জের

নিকটস্থিত গট্টন-গ্রামকেও কেহ কেহ গৌতমের আশ্রম বলিয়া অনুমান করেন।

পঞ্চিলবাসী, নরেশ উপাধ্যায়, পঞ্চধর মিশ্র, বাচস্পতি মিশ্র, বর্জমান উপাধ্যায় প্রভৃতি

পণ্ডিতগণের জন্মভূমি বলিয়াও মিথিলা প্রতিষ্ঠাযিত। যে মণ্ডন মিশ্রের সহিত বিচারে

জয়লাভ করিয়া শঙ্করাচার্য্য মিথিলায় বিজয়-পতাকা উড্ডীন করেন, সেই এসিদ্ধ

মৈয়্যারিক মণ্ডন মিশ্র মিথিলাতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নবদ্বীপের মৈয়্যারিকরিরের

মধ্যে বাবুদেব সার্কোজয়, রঘুনাথ শিরোমণি, রামভদ্র ভরুংবাসী, জগদীশ ভরুংকার,

* এইমতের প্রতিপক্ষে পঞ্চিলবাসী ও চাপকা একব্যক্তি বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছেন। পঞ্চিলবাসী বা

চাপকায় অপর নাম—বাংভারন। চতুর্ভুজের রাজসভায় তাঁহার বিদ্যমানতা-সংপ্রমাণ হয়।

গদাধর ভট্টাচার্য্য, যখননাথ তর্কবাগীশ—কত নাম করিব?—সকলেই চিরস্মরণীয় হইয়া
আছেন। যখননাথ শিরোমণি মিথিলায় জ্ঞান-দর্শন শিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। যখননাথের
শিক্ষাগুরু ছিলেন—পঞ্চধর মিশ্র। জ্ঞানশাস্ত্র শিক্ষা করিয়া কোনও ছাত্র জ্ঞানগ্রন্থ বিদেশে
লইয়া যাইতে না পারে,—মিথিলায় ইহাই রীতি ছিল। তদনুসারে, শিক্ষা শেষ হইলে, গুরুর
নিকট বিদায় লইবার সময়, যখননাথের নিকট হইতে গুরু গ্রন্থ-পত্র কাড়িয়া লন। কিন্তু
যখননাথের মেধা-শক্তি এতই প্রবল ছিল যে, তিনি সমগ্র জ্ঞানশাস্ত্র কষ্টে করিয়া
লইয়াছিলেন। সুতরাং, গুরু কর্তৃক গ্রন্থ-পত্র গৃহীত হইবার সময়, তিনি গুরুকে
বলিয়াছিলেন,—“গ্রন্থ-পত্রে কি হইবে? আমার হৃদয়ে হৃদয়ে এ গ্রন্থ অঙ্কিত হইয়া
আছে।” অতঃপর নবদ্বীপে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, যখননাথ জ্ঞানগ্রন্থ সঞ্চলন করেন; এবং
সেই গ্রন্থ দেশে-বিদেশে সমাদৃত হয়। পাণ্ডিত্য-প্রভাবে যখননাথ এক সময়ে আপন
গুরুকে পর্যাস্ত পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন,—এইরূপ কিংবদন্তী আছে।
জ্ঞানশাস্ত্রের বহু গ্রন্থ এক্ষণে প্রচলিত। ঋষি-প্রণীত জ্ঞানশাস্ত্র ‘প্রাচীন জ্ঞান’ নামে এবং
পরবর্তী পাণ্ডিতগণ-বিরচিত জ্ঞানগ্রন্থ ‘নব্য জ্ঞান’ নামে পরিচিত।

জ্ঞান-দর্শনেরও মুখ্য প্রতিপাদ্য—সেই দুঃখ-নিবৃত্তি। দুঃখ কেন উৎপন্ন হয়, আর
কিভাবে বা সেই দুঃখের নিবৃত্তি হইতে পারে,—নানারূপ তর্ক উপস্থাপন করিয়া, জ্ঞান-

দর্শনে তাহারই সিদ্ধান্ত ওইয়াছে। একটী যুক্ত উদ্ধৃত করিতেছি;
জ্ঞান-দর্শনের
প্রতিপাদ্য।
সেই যুক্তিই জ্ঞান-দর্শনের মূল উদ্দেশ্য বুঝিতে পারা যাইবে। যুক্তী
এই,—“দুঃখ-জন্ম-প্রযুক্তি দোষ-মিথ্যা জ্ঞানানান্যুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরা-

পারাদপর্ব্বণঃ।” পক্ষিল স্বামী উহার ভাষ্য এইরূপ লিখিয়াছেন,—“যদা তু তত্ত্বজ্ঞানং
মিথ্যা জ্ঞানম্ অটপতি তদা মিথ্যা জ্ঞানোপায়ে দোষা অপযন্তি দোষোপায়ে প্রযুক্তিরটপতি
এবমুপায়ে জন্ম অটপতি জন্মোপায়ে দুঃখম্ অটপতি দুঃখোপায়ে চাত্যন্তিকোহপর্ব্বণো-
নঃশ্রেয়সামতি।” অর্থাৎ, নিঃশ্রেয়স বা ত্রিবিধ দুঃখের নিবৃত্তিই যুক্তি; সেই যুক্তিলাভ
করিতে হইলে, ত্রিবিধ দুঃখের নিবারণ করিতে হয়; দুঃখের নিবারণ করিতে
হইলে, জন্ম নিবারণ করিতে হয়; জন্ম নিবারণ করিতে হইলে, প্রযুক্তির বিনাশ করিতে
হয়; প্রযুক্তির বিনাশ করিতে হইলে, ত্রিবিধ দোষ অর্থাৎ রাগ-দ্বेष-মোহ দূর করিতে
হয়; দোষ নিবারণ করিতে হইলে, মিথ্যা জ্ঞানের নিবারণ করিতে হয়। মিথ্যা জ্ঞানের
নিবৃত্তি হইলেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায়;—আর সেই তত্ত্বজ্ঞান-লাভই যুক্তি। ফলতঃ,
তত্ত্বজ্ঞান লাভ না হইলে মিথ্যা জ্ঞান ধ্বংস হয় না এবং তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারিলেই
আত্যন্তিক দুঃখনাশ বা নিঃশ্রেয়স লাভ হইয়া থাকে। এই তত্ত্বজ্ঞান-লাভ সম্বন্ধে প্রথম
যুক্তিই মহাবি গৌতম লিখিয়াছেন—“প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দৃষ্টান্ত-সিদ্ধান্তাবয়ব-তর্ক-
নির্ণয়-বাদ-জল্প-বিতণ্ডা-হেতুভাস-জল-জাতি-নিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানামিশ্রেয়সাধিগমঃ।”
অর্থাৎ, নিঃশ্রেয়স-রূপ পুরষ মঙ্গল লাভ করিতে হইলে, তত্ত্বজ্ঞান চাই,—প্রমাণ, প্রমেয়,
সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেতুভাস, জল
জাতি, নিগ্রহ-স্থান—এই বোদ্ধ পদার্থের। এই বোদ্ধ পদার্থ কি প্রকার, তাহা বুঝাইবার

জ্ঞান দর্শনকার বিশেষরূপ প্রয়াস পাইয়াছেন। তদনুসারে জ্ঞান-দর্শনে প্রথমে পদার্থের উদ্বেগ, পরে তাহার লক্ষণ-বিচার এবং শেষে তাহার পরীক্ষা-প্রণালী নির্দিষ্ট হইয়াছে। বৈশেষিক দর্শন আলোচনার বৈরূপ সংজ্ঞা ও পদার্থ-বিচার দেখা যায়, জ্ঞান-দর্শনের পদার্থ-বিচারও অনেকটা তদনুরূপ। জ্ঞান-মতে, প্রথম পদার্থ—প্রমাণ। প্রমাণ শব্দের অর্থ—বস্তুার্থ জ্ঞান-লাভের উপায়। ইলা বাহুল্য, জ্ঞান দুই প্রকার—যথার্থ এবং অবযথার্থ; রজ্জ্বকে রজ্জ্ববোধ—যথার্থ-জ্ঞান, এবং রজ্জ্বকে সর্পজ্ঞান—অবযথার্থ-জ্ঞান। প্রমাণ দ্বারা এই যথার্থ ও অবযথার্থ ভেদ উপলব্ধি হয়। ফলতঃ, প্রমাণ—যথার্থ-জ্ঞান; আর যাহা অবযথার্থ অথচ প্রমাণবৎ প্রতীয়মান, তাহা প্রমাণ নহে,—প্রমাণাতাস মাত্র। জ্ঞান-দর্শনের মতে,—প্রমাণ চতুর্বিধ;—প্রত্যক্ষ, অহুমান, উপমান ও শব্দ। পূর্বেই বলিয়াছি, ইঞ্জির দ্বারা উপলব্ধ জ্ঞানই—প্রত্যক্ষ। গৌতমের মতে, সেই প্রত্যক্ষ আবার দুই প্রকার;—স্বকিকল্পক ও নিক্কিকল্পক। ঘট, পট প্রভৃতি পদার্থ যখন ‘ঘট-পট’ নামে অভিহিত হয়, তখন স্বকিকল্পক-জ্ঞান বলিয়া থাকি। আর যখন ঘট-পটাদি পদার্থমিচর সাধারণ ‘বস্তু’ সংজ্ঞা লাভ করে, তখন উহা নিক্কিকল্পক জ্ঞান। সুত্রে এই প্রত্যক্ষের লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে,—“ইঞ্জিরার্থস্বকিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানং অব্যাপদেস্তং অব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষং।” ভাষ্যকারগণ ইহার ব্যাখ্যায় নানারূপ তর্ক-বিতর্ক উত্থাপন করিয়াছেন। ‘অহুমান’ প্রমাণ-সম্বন্ধে গৌতমের হুত্র,—“অথ তৎপূর্বকং ত্রিবিধমহুমানং পূর্ববৎ শেষবৎ সাম্যাত্তোদুট্টকং।” অর্থাৎ, অহুমান তিন প্রকার—পূর্ববৎ, শেষবৎ ও সাম্যাত্তোদুট্টাহুমান। যেখ দর্শন করিয়া বৃষ্টির অহুমান—‘পূর্ববৎ’ অহুমান। এ হলে, ‘পূর্ব’ শব্দের অর্থ—কারণ; অর্থাৎ, পূর্ববর্তী কারণ দর্শনে পরবর্তী ঘটনার অহুমান। ‘শেষবৎ’ অহুমান—যেমন, নদীর জল-বৃদ্ধিতে পার্শ্বভাগ-প্রদেশে বৃষ্টির অহুমান। এখানে ‘শেষ’ অর্থ—কার্য; অর্থাৎ, অতীত কার্য দেখিয়া কার্যান্তরের অহুমান। কারণ বা কার্য নাই, অথচ দর্শনাধীন যে অহুমান, তাহাই সাম্যাত্তোদুট্টাহুমান। এই অহুমান বুঝিতে হইলে, ‘অবিনাভাব-সম্বন্ধ’—এই বাক্যার্থ বুঝিতে হয়। অবিনাভাবের মোটামুটি অর্থ—হারিষ। যদি বলি,—লৌহপিণ্ডে ধূম নাই, কিন্তু অগ্নি আছে; তাহা হইলে ধূমের ‘বিনাভাব’ এবং অগ্নির ‘অবিনাভাব’ সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে। ‘শব্দ’ প্রমাণ-সম্বন্ধে গৌতম-হুত্র “আত্মোপদেশঃ শব্দঃ”;—অর্থাৎ, ভ্রম, প্রমাদ, প্রভারণা-ইচ্ছা এবং ইঞ্জিরাদির অগতীতা প্রভৃতি গোর-পুত্র যে বাক্য, তাহাই আত্মবাক্য। সেই আত্মবাক্যই ‘শব্দ-প্রমাণ’ মর্মেণ পণ্য। দেখানো একের সহিত অন্তের উপমা দেওয়া যায়, তাহাই উপমান। ন্যায় মতে উপমান সাবুত্ত-জ্ঞান-সাধন। গৌতমের উপমান হুত্রটি এই,—“প্রসিদ্ধ সর্বগ্যাং সাধ্যসাধনরূপমানং।” পণ্ডিতে গোর সাবুত্ত, যুখে চক্রে সাবুত্ত ইত্যাদি জ্ঞান বন্ধুরা লাভ হয়, তাহাই উপমান। প্রত্যক্ষাদি চতুর্বিধ প্রমাণ বিবৃতি করিবার জন্ত নব্য-নৈসারিকগণ চারিখানি বিবৃতি প্রমাণ-গ্রহ প্রণয়ন করিয়াছেন। সেই গ্রহ চতুর্ভয়ের নাম,—প্রত্যক্ষ-পরিচ্ছেদ, অহুমান-পরিচ্ছেদ, উপমান-পরিচ্ছেদ এবং শব্দ-পরিচ্ছেদ। এই গ্রহ-চতুর্ভয়ে নব্য-নৈসারিকগণ পপ্রমাণ করিয়াছেন,—নব্য-ন্যায়শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি না করিলে, কি বেদ, কি বেদান্ত, কি

কাব্য, কি ব্যাকরণ, কোনও শাস্ত্রেই জ্ঞান অন্বেষিতে পারে না। এই জন্য ন্যায়-শাস্ত্র পড়িবার পূর্বে, প্রথমে প্রমাণ-গ্রন্থ-চতুষ্টয় অধ্যয়ন করিতে হয়। কাব্য-গ্রন্থ পাঠে ন্যায়-শাস্ত্রের সাধারণ জ্ঞান আবশ্যিক,—নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণ তাহাও প্রমাণ করিয়া থাকেন। দৃষ্টান্ত-রূপ মহাকবি শ্রীহর্ষ-প্রণীত ‘নৈষধ’-কাব্যের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি,—

“উদয়তি সত্তদত্ত মালিভিধং রণিত্ব ভূবিত্ত্বং বিদ্যায়নং ।

অহুবিতোপিত বাম্পমিরীকণাদ্ ব্যভিচচার ন তাগকরোহনলঃ ॥”

নলবিরহে দময়ন্তী যখন রোদিন করিতেছিলেন, দময়ন্তীর সখীগণ তাহার নয়নবাম্প দেখিয়া অহুমান করেন,—অনলই অর্থাৎ নলাভাবই সন্তাপের কারণ। এই শ্লোকে বাম্প ও অনল এই দুইটা শব্দ লইয়া সাধারণতঃ বিরোধ উপস্থিত হয়। কবি বলিতেছেন,—নয়ন-বাম্প দেখিয়া সন্তাপকর অনল অহুসিত হইতেছে। কিন্তু এ অহুমান কি যথার্থ। পূর্বেই ধ্যায়মান বাম্প দেখিতে পাইলেই যে তাহাতে অগ্নির অস্তিত্ব বুঝিতে হইবে, তাহা কোনও ক্রমেই বলা যায় না। ধূম নাই, ধূমের সদৃশ বাম্প আছে,—ইহাতে কি অগ্নির অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয়? অথচ, এখানে সখীগণের অহুমানও মিথ্যা নহে। দময়ন্তীর নয়নে বাম্প ও সময়ে অনল,—কে না উপলব্ধি করিতে পারেন? স্মৃতরাং সখীগণের অহুমান আশ্চর্যজনক হইলেও, শ্লোকের বাম্প ও অনল পদদ্বয় অশিষ্ট-প্রয়োগ নহে। এখানে ঐ দুই পদ স্বার্থবোধক; ‘বাম্প’ অর্থে ‘উষ্মা’ ও ‘নয়ন-জল,’ ‘অনল’ অর্থে ‘অগ্নি’ ও ‘নলাভাব’। বৈয়াকরণ ইহাতেও আপত্তি করিয়া বলিতে পারেন,—‘নলাভাব’ অর্থ সিদ্ধ করিতে গেলে, শ্লোকস্থিত ‘অনল’-পদ ‘নপুংসক লিঙ্গ’ হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু তাহা না হইয়া উহা পুংলিঙ্গ-বৎ ব্যবহৃত হইয়াছে। স্মৃতরাং ‘অনল’ ও ‘বাম্প’-পদ-দ্বয়ের ঐরূপ ব্যবহার ভ্রমমূলক। কিন্তু শ্রীহর্ষ কবির কি সেরূপ ভ্রমপ্রমাদ সম্ভাবনা? শ্রায়শাস্ত্রের ‘শব্দ-খণ্ড’ বিভাগে জগদীশ ভট্টাচার্য্য ইহার সমীক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—‘বিবাদস্তাভাবঃ’ অর্থে যখন ‘অবিবাদঃ’ এই পুংলিঙ্গ-পদ নিষ্পন্ন হয়, তখন ‘নলস্তাভাবঃ’ অর্থে ‘অনলঃ’ পুংলিঙ্গ-পদ, কেন না নিষ্পন্ন হইবে? এ সম্বন্ধেও নানা তর্ক-বিতর্ক আছে; কিন্তু সে তর্কের স্থান ইহা নহে। এখানে আমরা এইমাত্র দেখাইতেছি, কাব্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার সর্ব-বিষয়েই নব্য শ্রায়-শাস্ত্র এক্ষণে আপনার প্রভাব বিস্তার করিয়া বসিয়াছেন। নৈয়ায়িকগণের মত এই,—শ্রায়-শাস্ত্র আলোচনা না করিলে সংস্কৃত সাহিত্যে সম্যকরূপে প্রবেশ করিবার কোনও উপায় নাই। প্রমাণের পর প্রবেশ, অর্থাৎ প্রমাণের বিষয়। শ্রায়-মতে এই প্রমেয় আবার দ্বাদশ প্রকার; আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্ধ, বুদ্ধি, মন, প্রকৃতি, দোষ, প্রোক্ত্যভাব, কল, চূঃখ, অপবর্ণ। বলা বাহুল্য, এই দ্বাদশ প্রমেয়েরও অনেক প্রকার-ভেদ আছে; যেমন, ইন্দ্রিয় প্রমেয়ের মধ্যে চক্ষু কণ ইত্যাদি, দোষ প্রমেয়ের মধ্যে রাগ দ্বেষ ইত্যাদি। ফলতঃ, প্রমাণ হইতে নিগ্রহস্থান পর্যন্ত বোদ্ধ শব্দার্থের আলোচনার বা অর্থ-গ্রহণে কত কথারই অবতারণা হইয়াছে ও হইতে পারে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। শ্রায়-দর্শন সেই সকল কথার হুসারপিস্তর আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন,—উক্ত বোদ্ধ শব্দার্থের তৎক্ষণাত্ লাভ করিতে পারিলেই নিঃশ্রেয়স বা অপবর্ণ মুক্তি লাভ হয়।

ঈশ্বর, অদৃষ্ট, আত্মা, অস্বাভাবিক, বৈদ্য প্রভৃতি সম্বন্ধেও ভ্রান্ত-দর্শনে স্থানাদিশিষ্ট আন্দোলন।
দেখিতে পাওয়া যায়। মহর্ষি গৌতম ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু ঈশ্বরের সৃষ্টি-

ভ্রান্ত-দর্শনের
বিবিধ
তত্ত্ব।

কর্তৃত্ব স্বীকার করেন নাই। সৃষ্টি-বিষয়ে ঈশ্বরাত্তিরিক্ত অল্প এক কৃপা
কারণ আছে,—ইহাই তাহার অভিপ্রায়। তিনি প্রথমে ঈশ্বর
প্রতিপাদনের জন্য তর্ক উত্থাপন করেন,—“ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষকর্মাফল্য-

দর্শনাৎ।” অর্থাৎ, মহাকাব্য কর্মের সর্বদা সাফল্য দেখা যায় না; সুতরাং ঈশ্বরই জগতের
কারণ। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি আবার মীমাংসা করিতেছেন,—“ন পুরুষকর্মাভাবে

ফলনিশ্চয়ঃ।” অর্থাৎ, পুরুষ-কর্ম ভিন্ন ফলনিশ্চয় হয় না। ফলনিশ্চয় ঈশ্বরাত্তিরিক্ত হইলে,

কখনও পুরুষ-চেষ্টার প্রয়োজন হয় না। সুতরাং ঈশ্বর ভিন্ন সৃষ্টির অল্প কারণ অবশ্যই আছে।
সেই কারণই—অদৃষ্ট বা কর্মফল। এ বিষয়ে গৌতম আত্মার অনাদিত্ব স্বীকার করেন।

তিনি বলেন,—“পূর্বাভ্যন্ত-স্বতানুভবজ্ঞাতস্য হর্ষভয়শোকসম্প্রতিপত্তেঃ।” অর্থাৎ, সদ্যোজাত
শিশুর হর্ষ, ভয়, শোক হইয়া থাকে; তাহার কারণ—পূর্বাভ্যন্ত স্মৃতি। ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র

জ্ঞাপানে শিশুর প্রবৃত্তি জন্মে। আহারই যে ক্ষুরিহৃতির উপায়, শিশু কি করিয়া বুঝিতে
পারিল? পূর্বাভ্যাস শ্রবণ ভিন্ন শিশুর আহারে প্রবৃত্তি কি প্রকারে হইতে পারে? এ জন্মে

সে তো আহারের উপযোগিতা শিক্ষা করে নাই। সুতরাং তাহার আত্মা নূতন শরীর গ্রহণ
করিয়া তাহার পূর্বাভ্যন্ত স্মৃতি—শরীর রক্ষার জন্য আহার করা প্রয়োজন—শ্রবণ করাইয়া

দিল। এই স্থলে বাস্তবিক-কারণ তর্ক উত্থাপন করিয়াছেন,—“পদ্মাদিনু প্রবেশঃ সন্নিগম-
বিকারবন্তবিকারঃ।” অর্থাৎ, কমল যেমন আপনাপনিই প্রস্ফুটিত হয়, তাহার যেমন পূর্ব-

সংস্কার থাকা সম্ভবপর নহে, বালকের হর্ষ-শোক-জন্মিত বিকারও সেইরূপ বলিয়া মনে করা
বাইতে পারে। কিন্তু ভ্রান্ত-দর্শন তাহার এইরূপ উত্তর দিয়াছেন,—“উৎকণ্ঠিতবর্ধাকাল-

নিমিত্তত্বাৎ পঞ্চাশ্বক বিকারাণাং।” গৌর-বর্ধা-শীত ঋতু-প্রভাবে এই বিকার পঞ্চভূতাত্মক
পদার্থে সম্ভবপর; বিনা কারণে কখনই কার্য্য হয় না; কার্য্যের কারণ অবশ্যই আছে।

এইস্থলে পুনরায় তর্ক উল্লিখিত পারে,—“তাহাই যদি হয়, অস্বাভাবিকের প্রতি লৌহ আকৃষ্ট হয়
কেন?” ইহারও উত্তর, অস্বাভাবিকের প্রতি লৌহ যে আকৃষ্ট হয়, সে আকর্ষণে কালিকাল নাই,

প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিরও পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু সূচ্য না পাইলে শিশু কখনই জ্ঞান পান
করে না; পরন্তু সূচ্য নিবৃত্তি হইলেই সে জ্ঞাপানে অনভিলাষ প্রকাশ করে। শিশু এ

প্রবৃত্তি নিবৃত্তি কোথা হইতে আসিল? উহাও তাহার সেই পূর্বস্মৃতির কার্য্য নহে কি? ভূমিষ্ঠ
হইবামাত্রই শিশু যে রাগবেদাদি প্রকাশ করে, পূর্বজন্মের স্মৃতির কার্য্য ভিন্ন তাহাকেই বা

আর কি বলিতে পারি? মহর্ষি গৌতম তাই স্পষ্টই বলিয়াছেন—সকলই “পূর্বজন্মফল্য-
বদ্ব্যভিপ্রায়ঃ।” অর্থাৎ, পূর্বজন্ম কর্মের ফলাফলস্বরূপেই এরূপ ব্যাপার-পরম্পরা সংঘটিত

হইয়া থাকে। ফলতঃ, নৈমায়িকগণের বুদ্ধি এই—পূর্ব-জন্মের স্মৃতিই সর্বমূল্যধার;
আমরা বাহ্য কিছু করি, বাহ্য কিছু ভাবি, সকলই সেই স্মৃতি হইতে সমুৎপন্ন। ইহজন্মে

যেমন সাদৃশ্য দেখিয়া পদার্থ-ভব নির্ণয় করি; এমন কি, বর্ণমালা শিক্ষার সময়ও শিশু
যেমন তাহার পূর্বস্মৃতি আকারাদিক সহিত বর্ণমালা-সমূহের সাদৃশ্য বুঝিবার চেষ্টা করে;

আত্মা সেইরূপ পূর্ণ-বৃত্ত বিষয়ের স্মৃতি দ্বারা পরিচালিত হয়। ইহজীবনে শৈশবের স্মৃতি যোগস্বস্তির সহিত মানুষ যেমন ধীরে ধীরে ভুলিয়া যায়; পূর্বজন্মের অভীত-স্মৃতিও ইহ-জন্মে মানুষ তেমনই ভুলিতে থাকে। শেষে সে স্মৃতি কিছুমাত্র তাহার মনে আর উদয় হইতে পারে না; ইহজীবনের নবনব চিন্তার বাত-প্রতিবাত্তে পূর্বস্মৃতি সকলই ছিন্ন বিছিন্ন হইয়া যায়। জন্মিয়াই মানুষ যে সুখঃখতাগী বা ধনী দরিদ্র হয়, নব্য ভ্রাম্যতে, তাহাও পূর্বজন্মের কর্মফল বা অদৃষ্ট ভিন্ন আর কি হইতে পারে? তবে স্মার-দর্শন পুরুষের এই কর্মফল বা অদৃষ্টকে ঈশ্বরাদীন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন,—“ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষকর্মাকাল্যাদর্শনাৎ।” যেমন বীজাহুসারে ভূমিতে শস্ত উৎপন্ন হয়, ভূমির তাহাতে কোনও দোষাদোষ নাই, সেইরূপ অদৃষ্টাহুসারে ঈশ্বর জীবের সুখ-দুঃখের বিধান করেন,— ইহাতে তাহাই বুঝিতে পারা যায়। ঈশ্বরের সহিত সৃষ্টির বা সৃষ্টির সম্বন্ধ ইহার অধিক আর কিছু স্মারদর্শন-কার স্বীকার করেন নাই। গৌতমের মতে,—শরীর হইতে আত্মা বিভিন্ন; শরীরের সহিত আত্মার সংযোগ হওয়ার, ‘আমি বড়—আমি ছোট’ ইত্যাদি অহংজ্ঞানের উদয় হয়; আর তাহা হইতেই যত কিছু কষ্টের সূত্রপাত। তাই স্মার-দর্শন বলেন,—শরীর হইতে আত্মার পার্থক্য বুঝিবার চেষ্টা কর; আত্মাত্তিক দুঃখনিয়তি বা নিঃশ্রেয়স লাভ হইবে। বেদ-বিষয়ে, নৈয়ায়িকগণ প্রথমে বহু তর্ক বিতর্ক উত্থাপন করিয়া, অবশেষে বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন। গৌতম বেদের প্রামাণ্য-বিষয়ে তর্ক উত্থাপন করিয়াছেন,—“তদ্প্রামাণ্যমনুতব্যাঘাতপুনরুক্ত্যদোষেভ্যঃ।” অর্থাৎ, বেদে মিথ্যাবাদ, ব্যাঘাত এবং পুনরুক্তি দোষ আছে; সুতরাং বেদ-বাক্য মিথ্যা। বেদে কোথাও আছে—উদয়কালে হোম করিবে, কোথাও আছে—অহুদয়-কালে হোম করিবে, এবং তাহাতে এক কালের এসঙ্গে অল্প কালের নিন্দাবাদও দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং পদে পদেই ব্যাঘাত ঘটিবার আশঙ্কা। এইরূপ আরও দেখা যায়, ঈশ্বর-সম্বন্ধেও প্রতিবাক্যের পরস্পর ঐক্য নাই। প্রতিতে কোথাও আছে—“একমেবাবিভীক্যং ব্রহ্ম”; কোথাও আছে—“যে ব্রহ্মণী বেদিতব্যো পরমাপরমেব চ।” অর্থাৎ, একটিতে অদ্বৈত-বাদ, অপরটিতে বৈতবাদ প্রতিপন্ন হয়। পুনরুক্তির তো কথাই নাই; একই কথা বেদে পুনঃপুনঃ উক্ত হইয়াছে। এই ত্রিবিধ দোষ প্রদর্শনে সাধারণতঃ বেদের অপ্রামাণ্য প্রতিপন্ন হইতে পারে—এই আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া, মহর্ষি গৌতম নিজেই তাহার খণ্ডন করিয়াছেন। বেদবাক্য যে মিথ্যা নহে, তৎসম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন,—“ন কর্মকর্তৃ-সাধনবৈত্তগ্যাৎ।” তাহার মতে,—তিন কারণে বৈদিক কর্মে ফললাভ হয় না; (১) কর্মকর্তা অনধিকারী, (২) মন্ত্রের উচ্চারণে দোষ, (৩) বিধি-বিগহিত কর্মাহুতান। এই তিনটাই অভীষ্ট ফললাভের অন্তরায়-সাধক। উপযুক্ত কর্ম না করিলে, ফলের আশা কিরূপে করা যাইতে পারে? সুতরাং বেদ-বাক্য মিথ্যা নহে; কর্মকারীর কর্মদোষেই কর্মাহুতান পণ্ড হইয়া থাকে। দ্বিতীয়, কালকাল-ঘটিত ব্যাঘাত-দোষ-বিষয়ে গৌতমের উত্তর,—উদয় অহুদয় উভয় কালই হোমানির পক্ষে প্রশস্ত ঘটে; কিন্তু এক কালের সমস্ত করিয়া অল্প কালে কার্য করিলে অভীষ্ট-লাভে বিঘ্ন ঘটিতে পারে,—বস্ত্রের ইহাই যাত্র উদেহ। ব্রহ্ম-সম্পর্কেও

‘তিনি এক’ ‘তিনি দুই’—এই যে অদ্বৈত ও দ্বৈতবাদ দুই হয়, তাহারও কারণ,—জীবের জ্ঞান-বৈশিষ্ট্য। জীবের যখন অজ্ঞানাবস্থা, জীব তখন আত্ম-পরমাশ্রয় অভেদভাবে বুদ্ধিতে পারে না; তাই তখন আপনাকে ও ব্রহ্মকে দুই বলিয়া মনে করে। কিন্তু যখন তাহার তত্ত্বজ্ঞান উপস্থিত হয়, সে তখন সর্বত্রই ব্রহ্ম-কর্তৃত্ব দেখিতে পায়। জীবের সেই অবস্থায় ব্রহ্মাইবার জগৎই ঐত্যাঐতবাদ-প্রসঙ্গ। বেদের প্রামাণ্য-বিষয়ে উহাতে ব্যাখ্যাত ঘটবার কি আছে? পুনরুক্তি-সম্বন্ধে গৌতম বলিয়াছেন,—প্রয়োজন ব্রহ্মাইবার জগৎ যে বাক্য পুনঃপুনঃ উচ্চারিত হয়, তাহা পুনরুক্তি নহে। পাছে ভ্রান্তিবেশে জীব কর্তব্যব্রত হয়, তাই তাহাকে উদ্বোধিত করিবার জন্য বেদে কোনও কোনও বিষয় একাধিকবার উল্লিখিত হইয়াছে। উহা জীবের মঙ্গলার্থ প্রযুক্ত,—উহা পুনরুক্তি-দোষ-হুই নহে। অপিচ, বেদ বহু কাল হইতে প্রচলিত—এজগৎ উহার নিত্য; বেদে সত্য তব নিহিত আছে—এজগৎ উহা প্রামাণ্য। তবে বেদ যে কোনও অজ্ঞান পুরুষের প্রণীত, ন্যায়দর্শনে তাহারই আভাস পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত-স্বলে দর্শনকার বলেন,—ঘট দেখিয়া যেমন তাহার নিশ্চিন্তা কৃত্যকারের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয়, অজ্ঞান বেদ-বাক্যেরও সেইরূপ পুরুষোক্ততা সম্ভবপর। মহর্ষি গৌতম প্রকারান্তরে পরমাণুবাদ স্বীকার করিয়াছেন। মুক্তি তাহার মতে একপ্রকার মুক্তি-বিশেষ। তাহার জন্মান্তর-তর আলোচনা করিলে বুদ্ধিতে পারা যায়, একমাত্র ব্রাহ্মণই অপবর্ণ-লাভের অধিকারী; কর্ত্ত্বগুণে ব্রাহ্মণ-জন্ম লাভ করিয়া তত্ত্বজ্ঞান উদয় হইলে মুক্তি হইতে পারে। জ্ঞানদর্শনের বিশেষত্ব—উহার যুক্তিবাদে। জ্ঞানাত্মকের যুক্তিবাদ প্রধানতঃ পঞ্চ অবয়বে বিভক্ত। অবয়ব অর্থে—বিচারাদি বাক্য-বিশেষ। জ্ঞানাত্মকের সেই পঞ্চ অবয়ব,—(১) প্রতিজ্ঞা, (২) হেতু, (৩) উদাহরণ, (৪) উপনয়, (৫) নিগমন। এই জ্ঞানাত্মকে প্রথমে একটা প্রস্তাব বা প্রতিজ্ঞা উত্থাপন করা হয়; তার পর, তাহার হেতু নির্দিষ্ট হয়; অতঃপর উদাহরণ দ্বারা সেই হেতুর কারণ দৃঢ়ীভূত করা হয়; এইরূপে হেতু নির্দিষ্ট হইলে, কার্যস্বলে তাহার উপনয় বা প্রয়োগ হয়; অবশেষে, তদ্বারা নিগমন বা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। একটা দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি,—(১) প্রতিজ্ঞা—‘পর্যতো বহিমান’—পর্যতো আশ্রয় আছে; (২) হেতু—‘পর্যতো বহিমান্ ধূমাৎ’—যেহেতু পর্যন্ত হইতে ধূম নির্গত হইতেছে; (৩) উদাহরণ,—এই উদাহরণ আবার দুই প্রকারে প্রদর্শিত হইতে পারে—(ক) অঘরী, (খ) ব্যতিরেকী। অঘরী উদাহরণ অর্থ—বিচ্ছিন্নতা; আর ব্যতিরেকী উদাহরণ অর্থ—অবিচ্ছিন্নতা। যেমন, (ক) ‘যো যো ধূমবান্ স বহিমান্’; অর্থাৎ, যে যে স্থান হইতে ধূম নির্গত হয়, সেই সেই স্থানেই আশ্রয়ের অস্তিত্ব আছে; দৃষ্টান্ত—রজনগৃহ প্রভৃতি; এবং (খ) ‘বৃট্রবং তট্রবং’; অর্থাৎ, যেখানে বহি নাই, সেখানে ধূমও নাই; দৃষ্টান্ত—জলাশয় প্রভৃতি। কলা কাহল্য, প্রথমোক্ত উদাহরণের নামই—অঘরী উদাহরণ, এবং শেষোক্ত উদাহরণের নামই—ব্যতিরেকী উদাহরণ। (৪) উপনয় অর্থাৎ প্রমাণপ্রয়োগে ব্রহ্ম গেল,—অগ্নি হইতেই ধূম নির্গত হয়। অতঃপর (৫) নিগমন অর্থাৎ সিদ্ধান্ত বা সংশয়-নিবৃত্তি। ইহাই তর্কের শেষ। পূর্বাবয়ব-চতুষ্টয়ে প্রতিপন্ন হইল,—যাহা হইতেই ধূম নির্গত হয়, তাহাতেই অগ্নি আছে; অতঃপর পর্যন্ত হইতে যখন ধূম নির্গত হইতেছে, তখন পর্যন্তে নিশ্চয়ই অগ্নি

আছে। এই সিদ্ধান্তই নিগমন। মূলতঃ ইহাই ত্রায়শ। এই ত্রায়শের আলোচনার আৰ্য্য হিন্দুগণ যে জ্ঞান-সংবেদগার পরিচয় দিয়াছেন, তাহার তুলনা হয় না। ভাষা, চিন্তা ও বিষয় প্রধানতঃ এই তিনটিকে অবলম্বন করিয়া ত্রায়শাস্ত্র প্রবর্তিত। এই তিন বিষয়ের বিচারই—ত্রায়ের প্রধান বিচার। ভাষা-বিচারের সময়, বাক্য, প্রতিজ্ঞা এবং ব্যাপ্তি নামক ভাগত্রে তাহাকে বিভক্ত করা হয়। চিন্তা-বিচারের সময়, সামান্য জ্ঞান, বিশেষ জ্ঞান ও ব্যাপ্তি জ্ঞান—এই ভাগত্রে চিন্তাকে ভাগ করা হইয়া থাকে। বিষয়-বিচারের সময়, প্রত্যক্ষ, স্মৃতি ও উপমিতি—এই তিন ভাগে বিচার্য্য-বিষয় বিভক্ত হয়। এই সকল ভাগের আবার কত উপভাগ আছে। ভাষা বুদ্ধিতে হইলে, শব্দ-পদ-বাক্য বুদ্ধিতে হয়; শব্দ বুদ্ধিতে হইলে, তাহার প্রকৃতি-প্রত্যয়, শক্তি ও বৃত্তি বুদ্ধিতে হয়, এবং পদ-জ্ঞানের আবশ্যক হয়; আবার আকাঙ্ক্ষা আসক্তি প্রভৃতি পদ-সমূহ হইতেই বাক্যের উৎপত্তি। এইরূপ, কোনও একটি পদার্থকে মূল-স্বরূপ গ্রহণ করিয়া, অসংখ্য অবয়বের কল্পনা-পূর্বক, তাহার যে বিচার পদ্ধতি—সংক্ষেপতঃ তাহাই ত্রায়-শাস্ত্র। মনে করুন, কেহ বলিলেন,—“রাম মৃত্যুর অধীন।” সেই কথা লইয়া ত্রায়ের তর্ক উপস্থিত হইল। তখন, “রাম মৃত্যুর অধীন”—এই বাক্যটিকে প্রতিজ্ঞা-রূপে গ্রহণ করিয়া, তাহার হেতু দেখাইবার চেষ্টা চলিল। “হেতু” হইল,—“রাম একজন মনুষ্য।” তখন আবার, কেন এইরূপ ‘হেতু’ নির্দেশ করা হয়, তাহার ‘উদাহরণ’, প্রদর্শনের আবশ্যক হইল। এই ‘উদাহরণ’—পূর্বেই বলিয়াছি, অবয়ী ও ব্যতিরেকী—দুই প্রকারে দেখান বাইতে পারে। অবয়ী স্থলে বলা হইল,—“দেখা গিয়াছে, যে মনুষ্য—সে মৃত্যুর অধীন।” ব্যতিরেকী স্থলে বলা হইল,—“যাহারা মৃত্যুর অধীন নহে, তাহারা মনুষ্য নহে।” অবয়ী ও ব্যতিরেকী—এই দুইরূপ উদাহরণের দ্বারা ‘উপনয়’ বা সংশয়-নিরসন হইল,—“যাহারা মৃত্যুর অধীন, তাহারা মনুষ্য; সুতরাং রাম একজন মনুষ্য ” কাজেই নিগমন বা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল,—“মনুষ্য যাত্রেই মৃত্যুর অধীন; রাম একজন মনুষ্য; সুতরাং রামও মৃত্যুর অধীন।”

শ্রায়দর্শনে এইরূপ কত বিষয়ের কত তর্কই উত্থাপিত ও মীমাংসিত হইয়াছে; কত পরিভাষায় কত সংজ্ঞায় কত ভ্রমেরই বিচার চলিয়াছে। মূলতঃ, জ্ঞান-বুদ্ধির পরিস্ফুটনে ত্রায়শাস্ত্র প্রধান-স্থানীয়। কথিত হয়, গ্রীকগণ ভারতবর্ষ হইতে ত্রায়শাস্ত্রের মূলতত্ত্ব ইউরোপে লইয়া গিয়াছিলেন। শর্ম্মণাচার্য্য নামক জনৈক ব্রাহ্মণ, আলেকজান্ডার কর্তৃক গ্রীসদেশে নীত হন। শর্ম্মণাচার্য্য শ্রায়দর্শনে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন; আলেকজান্ডারের আদেশে গ্রীসদেশে তিনি শ্রায়দর্শন প্রচার করেন। তাহারই প্রচারিত দর্শন-তত্ত্ব অবগত হইয়া আরিস্টটল প্রতিষ্ঠাপন হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ শর্ম্মণাচার্য্য শ্রায়দর্শন প্রচার-রূপ আপন কার্য্য সমাপনান্তে অগ্নিতে আত্ম-বিসর্জন দিয়াছিলেন—এইরূপ কিংবদন্তী আছে। অজ্ঞাত দর্শনের প্রভাব অধুনা কতক পরিমাণে লোপ পাইলেও, শ্রায়-দর্শনের চর্চা এখনও এদেশে বিশেষরূপ দেখা যায়। তবে নব্য-ত্রায়ের আবির্ভাব প্রমাণ-পরিচ্ছেদ-চতুষ্টয়ের শব্দভর্য্য আলোচনাতেই আজকাল অনেক সময় কাটিয়া যায়।

একাদশ পরিচ্ছেদ ।

পাতঞ্জল-দর্শন ।

[মহর্ষি পতঞ্জলি ও তাঁহার যোগশাস্ত্রের পরিচয়,—সাধ্য ও পাতঞ্জলে সাদৃশ্য,—পতঞ্জলি কর্তৃক অতিরিক্ত পুরুষ বা ঈশ্বর স্বীকার,—কৈবল্যপ্রাপ্তিই পাতঞ্জল-দর্শনের প্রতিপাদ্য,—একমাত্র যোগই কৈবল্য-প্রাপ্তির উপায়,—যোগের অঙ্গার-ভেদ,—চিত্তবৃত্তি ও তাহার অবস্থার বিচার,—স্বরূপপ্রাপ্তি বা চিত্তরূপে অবস্থিতিই কৈবল্য;—বিবিধ যৌগিক ক্রিয়া,—মহারাজ রণজিৎ সিংহের দরবারে সাধুর অলৌকিক সমাধি,—যোগ-মাহাত্ম্য ।]

মহর্ষি পতঞ্জলি-প্রণীত দর্শন—পাতঞ্জল-দর্শন বা যোগশাস্ত্র নামে অভিহিত । পাতঞ্জল-দর্শন চারি পাদে (ভাগে) বিভক্ত । (১) সমাধি-পাদ,—এই পাদে যোগের লক্ষণাদি বর্ণিত হইয়াছে; (২) সাধন-পাদ,—কিছুতে যোগক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হইবে, ইহাতে তাহার প্রকরণাদি লিখিত আছে; (৩) বিভূতি-যোগশাস্ত্র । পাদ,—ইহাতে ধ্যান-ধারণাদি বিভূতি-বিবরণ পরিবর্ণিত; (৪) কৈবল্য-পাদ,—ইহাতে স্তিমিপঙ্ককাদি দ্বারা কৈবল্য বা মোক্ষলাভের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে । এই চারি পাদে সর্বসমেত এক শত পঁচানব্বইটি সূত্রে আছে । সাংখ্যদর্শনের সহিত পাতঞ্জল-দর্শনের বিবিধ সাদৃশ্য দেখা যায় । সেই জন্য এই দর্শনের অপর নাম—সাংখ্য-প্রবচন । পরন্তু এই দর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত হওয়ায়, ইহা ‘সেশ্বর সাংখ্য’ নামেও অভিহিত হইয়া থাকে । মহর্ষি পতঞ্জলির জন্ম-সম্বন্ধে এক অদ্ভুত কিম্বদন্তী আছে;—তিনি স্বর্ণ হইতে সর্পাকারে পাণিনি মূনির হস্তে নিপতিত হইয়াছিলেন,—এই জন্যই তাঁহার নাম পতঞ্জলি হইয়াছিল (পাণিনির ‘অঙ্গলিতে পতন’ এই জন্যই ‘পতঞ্জলি’) । যাহা হউক, পতঞ্জলি নামেও একাধিক ঋষির পরিচয় পাওয়া যায় । পাণিনির একজন ভাষ্যকারের নাম পতঞ্জলি ছিল । যোগশাস্ত্র-প্রযোক্তা বলিয়াও একজন পতঞ্জলির পরিচয় পাওয়া যায় । পাতঞ্জল-দর্শন-প্রণেতা পতঞ্জলি তো আছেনই । পাতঞ্জল-দর্শনের ভাষ্যের মধ্যে ‘বাস-ভাস্ক’ বিশেষ প্রসিদ্ধ । সেই ব্যাসভাষ্যের দুইটি টীকা আছে; ‘তত্ত্ব-বৈশাখী’ নামী টীকা বাচস্পতি মিশ্র প্রণয়ন করেন, এবং ‘যোগবার্ত্তিক’-টীকা বিজ্ঞান-ভিক্ষু কর্তৃক রচিত হয় । ভোক্তরাজ কর্তৃক পাতঞ্জল-দর্শনের এক বৃত্তি লিখিত হইয়াছিল । সে বৃত্তিও এখন পণ্ডিত-সমাজে বিশেষ আদরণীয় ।

সংসারকে ছাঃখনিদান বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া, পতঞ্জলি ছঃখ-নিবৃত্তির যে উপায় নির্দেশ করিয়াছেন,—এই পাতঞ্জল-দর্শনে বা যোগশাস্ত্রে তাহাই লিপিবদ্ধ হইয়াছে । এ

বিষয়ে পতঞ্জলির মত প্রধানতঃ সাংখ্যমতের অনুসরণকারী । প্রত্যুতঃ, পাতঞ্জল বসেন,—প্রকৃতি-পুরুষের ভেদজ্ঞান লাভ করিতে হইলে যোগ অবশ্যক । যোগ তির, তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না;—কৈবল্য বা

মোক্ষলাভ সম্ভবপর নহে । পদার্থ-তত্ত্ব-নিরূপণ-সম্বন্ধেও সাংখ্যের সহিত পাতঞ্জলের সাদৃশ্য পার্থক্য আছে । সাংখ্যের পুরুষ-বিশিষ্ট তত্ত্ব বা পদার্থের উপর পাতঞ্জল-দর্শন অতিরিক্ত

এক পুরুষ বা “ঈশ্বর” স্বীকার করেন । তিনি বলেন,—পঞ্চবিংশতি ভব ব্যতীত সেই এক পুরুষ আছেন,—যিনি “ক্লেশকর্ম্মবিপাকশয়েরপরামৃষ্টঃ ।” অর্থাৎ, যিনি অবিষ্টামূলক ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক ও আশয়ের সহিত সম্বন্ধশূন্য, সেই পুরুষ-বিশেষই ঈশ্বর; তিনি জ্ঞানাদায়, তিনি ব্রহ্মাদি গুরুগণের গুরু, তিনি ত্রিকালের অতীত । পাতঞ্জলের মতে,—সাধারণ পুরুষ রাগদ্বেষাদি ক্লেশের, পাপপুণ্য কর্ম্মের, জন্মায়ত্তোগ কর্ম্মকালের এবং তদনুরূপ সংসারের অধীন । কিন্তু বিশেষ পুরুষ বা ঈশ্বর সে সকলের অতীত,—সকলেরই সহিত সম্পর্কশূন্য; তিনিই সর্বজ্ঞ, তিনিই অনন্ত, তাহাতেই জ্ঞানের পরাকর্ষী । যোগ-প্রভাবে জ্ঞানের সেই পরাকর্ষী লাভ হয় । সেই জ্ঞানলাভই—কৈবল্য । কৈবল্য-নিকরূপই পাতঞ্জল-দর্শনের প্রতিপাদ্য । তাই প্রথমে স্থলভাবে পদার্থাদির বিচার করিয়া, যোগের প্রকরণ এবং যোগপ্রভাবে কিরূপে কৈবল্যলাভ হয়,—এই দর্শনে তাহাই দেখান হইয়াছে । পতঞ্জলি ‘যোগ’-শব্দের সংজ্ঞা-নির্দেশ করিয়াছেন,—“যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ” অর্থাৎ, যদ্বারা চিত্তবৃত্তি রোধ করিতে পারা যায়, তাহারই নাম যোগ । যোগের আট অঙ্গ;—“যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাদ্যানসমাধয়োহষ্টাঙ্গানি” ; অর্থাৎ, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি । এতদ্ব্যতীত প্রথমোক্ত পাঁচটি বহিরঙ্গ এবং শেষোক্ত তিনটি অন্তরঙ্গ; যেহেতু, যম-নিয়মাদির সহিত শরীরের এবং ধ্যান-ধারণাদির সহিত চিত্তের সম্বন্ধ । হেয়, হেয়-হেতু, হান ও হানোপায়—যোগশাস্ত্রের এই চারটি পর্ব । পতঞ্জলির মতে সংসার হেয়; কেন-না, দুঃখময় । প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগই দুঃখের হেতু; কেন-না, তাহাতেই যত কিছু অবিষ্টার উপপত্তি । প্রকৃতি-পুরুষের সেই সংযোগ-বিচ্ছিন্নিই হান; কেন-না, তদ্বারা অবিষ্টা হনন হইয়া থাকে । প্রকৃতি-পুরুষের ভেদজ্ঞানই হানোপায়; কেন-না, তদ্বারা তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে মিথ্যাজ্ঞান তিরোহিত হয় । যোগদ্বারাই পুরুষ এই হানোপায় স্থির করিতে পারেন । “যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ”—যোগের এই সংজ্ঞা নির্দেশের পর, পতঞ্জলি চিত্তের অবস্থা ও চিত্তের বৃত্তির আলোচনা করিয়াছেন । তাহার মতে,—চিত্তের অবস্থা পাঁচ প্রকার; বৃত্তিও পঞ্চবিধ । চিত্তের সেই পাঁচ অবস্থার নাম,—ক্ষিপ্ত, মুঢ়, বিক্লিপ্ত, একাগ্র, নিরুদ্ধ । চিত্তে নিতান্ত চাকল্য উপস্থিত হইলে চিত্ত ক্ষিপ্ত, অর্থাৎ রজোগুণাধিক্যযুক্ত; চিত্ত মোহাচ্ছন্ন হইলে, চিত্ত মুঢ় (অর্থাৎ ভ্রমোভাবাপন্ন); চিত্তে কখনও স্বৈর্য্য কখনও অস্বৈর্য্য ভাবের সমাবেশে, চিত্ত বিক্লিপ্ত (অর্থাৎ, সম্বরণাদির স্বন্দ-ভাব-পূর্ণ); চিত্ত অবিচলিত ভাবে ধ্যেয় বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট থাকিলে, চিত্ত একাগ্র; এবং সকল বৃত্তির নিরোধ হইলে, চিত্ত নিরুদ্ধ । বৃত্তি-পঞ্চক,—প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিজ্রা, স্থিতি । প্রমাণের প্রসঙ্গ পুনঃপুনঃ আলোচিত হইয়াছে; বিপর্য্যয় অর্থ—বৈপরীত্য অর্থাৎ মিথ্যা জ্ঞান; বিকল্প—ইচ্ছাহুয়ারী কল্পনা বিশেষ ইত্যাদি । যোগ-প্রভাবে এই সকল চিত্ত-বৃত্তির রোধ হইতে পারে; অর্থাৎ, পুরুষে কোনরূপ বিকৃতি উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না । পতঞ্জলির যোগ-শাস্ত্র তাই, বিবিধ প্রকারে চিত্তবৃত্তি-নিরোধের উপায়-পরম্পরা নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন । তাহার মতে,—চিত্তের বিক্লিপ্ত অবস্থার যোগের আরম্ভ হইয়া থাকে; নিরুদ্ধ-চিত্তেই পূর্ণ

যোগ। কিন্তু চিন্তাবৃত্তি-নিরোধ কি একায়ে হইতে পারে? তদন্তরে পতঞ্জলি বলেন,—
 “অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাস তত্রিরোধঃ।” অর্থাৎ, অভ্যাস ও বৈরাগ্য-দ্বারা চিন্তাবৃত্তি-
 নিরোধ হয়। সেই চিন্তাবৃত্তি-নিরোধের অপর নাম—সমাধি। সমাধি নানাপ্রকার এবং
 নানাক্রমে সিদ্ধ হইয়া থাকে। ঈশ্বর-প্রতিপাদন দ্বারা সমাধি হয়; চিত্ত-স্বৈর্য্যের দ্বারা
 সমাধি হয়। যে সমাধি দ্বারা সমস্ত বৃত্তি নিরুদ্ধ হয়, তাহা নির্বীজ সমাধি; সেই সমাধি
 আরম্ভ হইলেই পুরুষ শুদ্ধ-মুক্ত; সেই অবস্থার নামই—পুরুষের কৈবল্য-লাভ। কৈবল্য-লাভ
 হইলে পুরুষ কি অবস্থার অবস্থিতি করেন, পতঞ্জলি তাহার এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন,—

“পুরুষার্ধগুণানাং গুণানাং প্রতিগ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরতি।”

শুণের সহিত পুরুষ সম্বন্ধ-শূন্য হইলে, পুনরায় বিকার উপস্থিত হয় না। সেই অবস্থার
 কৈবল্য অর্থাৎ আত্মার স্ব-রূপে অবস্থিতি। সে অবস্থায় ভেদজ্ঞান থাকে না; আত্মা
 স্ব-রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। কপিলাদি যে অবস্থাকে নিঃশ্রেয়স বা মোক্ষ প্রভৃতি নামে অভিহিত
 করিয়াছিলেন, পতঞ্জলি-কথিত স্ব-রূপে অবস্থান বা কৈবল্য সেই-অর্থেই প্রযোজ্য।
 পতঞ্জলির মতে,—সুখ-দুঃখ আত্মার ধর্ম নহে; উহা চিত্তের ধর্ম, আত্মায়
 প্রতিবিম্বিত হয় মাত্র। সূত্রাং, রাগদ্বेषাদি চিত্ত-বৃত্তির সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া, স্ব-রূপে
 অবস্থান করিতে পারিলেই আত্মার কৈবল্য বা মোক্ষলাভ হয়।

পতঞ্জলি-কথিত যোগ-ক্রিয়ার যে নানা প্রকার-ভেদ আছে, পূর্বেই তাহার উল্লেখ
 করিয়াছি। প্রাণায়াম, নিশ্বাস-রোধ, অঙ্গভাশ প্রভৃতি যৌগিক ক্রিয়া,—উপযুক্ত গুরু

নিকট যোগ-শাস্ত্র শিক্ষা না করিলে কলপ্রদ হয় না। যথাবিহিত

যোগ-
 মাহাত্ম্য।

পদ্ধতি-ক্রমে যোগ-শিক্ষা করিলে, অসাধ্য সাধন সম্ভবপর। যোগ-

প্রভাবে যোগীর দেহ হৃদয় হইতে হৃদয়তর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া যথেষ্ট

উর্দ্ধে আরোহণ করিতে পারে। যোগবলে যোগী ত্রিকালের বার্তা অবগত হইতে পারেন।

কিন্তু যোগ-শিক্ষার পাত্রও এখন বিরল এবং শিক্ষকও এখন অল্পসংখ্যক করিয়া পাওয়া যায়
 না। যখন যোগ-শাস্ত্রের পূর্ণ-প্রভাব এদেশে বিস্তারিত ছিল, তখন যোগ-বলে যে সকল

অলৌকিক ব্যাপার সম্পন্ন হইত, এখন তাহা উপত্যালেরও অধিক আশ্চর্য্য-জনক। অধিক
 বলিব কি, অর্দ্ধ-শতাব্দী পূর্বেও এদেশের যোগিগণের যে ক্রিয়া-কলাপ প্রদর্শিত হইয়াছে,

তাহা স্মরণ করিলেও চমকিত হইতে হয়। কয়েকটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতেছি,—যে সকল
 ব্যাপারের সাক্ষ্য, ঐশ্বর্য্যশক্তি ইংরেজগণ পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত আছেন। প্রথম,—পঞ্জাব-

কেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহের দরবারে সাধু হরিদাসের যোগ-সমাধি। ভক্তার ম্যাক-
 গ্রীগর আপনার ‘শিখ-ইতিহাস’ গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন,—“১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে মহারাজ রণজিৎ

সিংহের উদ্ভানে এই অভাবনীয় ব্যাপার সংঘটিত হয়। লাহোরে এক ককির
 আনিয়াছিলেন। ককির বলেন,—তাঁহাকে বাস্তব মধ্যে বন্ধ করিয়া বৃত্তিকা-প্রোথিত

করিলে, তিনি বিনা পানাহারে যতদিন ইচ্ছা বাচিয়া থাকিতে পারেন। মহারাজ রণজিৎ
 সিংহ সে কথা বিশ্বাস করেন না; তিনি প্রমাণ দেখিতে চান। সূত্রাং সাধুকে বাস্তব

মধ্যে পুরিয়া ঢাবি বন্ধ করা হয় এবং সেই অবস্থার উদ্ভান-অধ্যাহিত কোনও নির্দিষ্ট স্থানে

বার্হ-সহ সাধু মৃত্তিকা-প্রোধিত হন। অতঃপর উজ্জান-বাটিতে দ্বারদেশ ক্রম করিয়া, চারিদিকে প্রহরীর বন্দোবস্ত হয়। উজ্জান-বাটিকার চতুঃসীমায় যাহাতে জন-প্রাণী পদার্পণ করিতে না পারে, মহারাজ রণজিৎ সিংহ সেইরূপ আদেশ প্রদান করেন। এই ভাবে চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত্রি সাধুকে মাটির মধ্যে পুতিয়া রাখা হয়। অবশেষে মহারাজ স্বয়ং, তাঁহার পৌত্র, তাঁহার কয়েক জন প্রধান সর্দার, জেনারেল ভেটম, কাপ্তেন ওয়েড এবং ডাক্তার ম্যাকগ্রীগর (ইতিহাস লেখক স্বয়ং) প্রভৃতি উপস্থিত থাকিয়া সাধুকে কবর হইতে উত্তোলন করেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়—সাধুর তখনও পর্য্যাপ্ত কোনই বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই; বাক্সের আবরণ উন্মোচন হইলে, সাধু, যথারীতি অভিবাদন করিয়া, সহস্র-বদনে সকলের সহিত কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। ব্যাপার দেখিয়া, সকলেই আশ্চর্য্য ও স্তম্ভিত! সাধুর সম্মানার্থ তখন রাজ্য-মধ্যে ঘনঘন তোপধ্বনি হইতে লাগিল; মহারাজ রণজিৎ সিংহ স্বহস্তে সাধুর গলদেশে রত্নহার পরাইয়া দিলেন।”

যে উজ্জানে হরিদাস সাধুকে মৃত্তিকা-প্রোধিত করা হইয়াছিল, সেই উজ্জানের নাম—‘সর্দার গওলা সিং ভণিয়াওয়ালা’; ইরাবতী (রাভী) নদীর তীরে ঐ উজ্জান বিद्यমান ছিল। সে ব্যাপার বাহারা দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই বিস্মিত হইয়াছিলেন; এবং অনেকেই তাহার নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। কাপ্তেন ওয়েডের বর্ণনায় প্রকাশ,—হরিদাস সাধুকে যখন মৃত্তিকা-মধ্যে হইতে উত্তোলন করা হইয়াছিল, তখন তাঁহার সর্কাজ শীতল, কেবল মস্তকে উয়া মাত্র ছিল। হানিপ্‌বাজ্জারের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত-গ্রন্থে আর এক সাধুর অপূর্ব সমাধির কথা বর্ণিত আছে। অমৃতসহরে মৃত্তিকা-খননের সময় মজুরেরা মাটির মধ্যে সাধুকে প্রাপ্ত হইয়াছিল। সাধু কতকাল মৃত্তিকা-প্রোধিত ছিলেন, কেহই তাহা নির্ণয় করিতে পারে নাই। সাধুও যোগভঙ্গে অমৃতসহরের পরিবর্তনাদি দেখিয়া আশ্চর্য্য-বিত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার সমাধির পূর্বে সহরের এক অবস্থা ছিল; আর সমাধির পর, সহরের সম্পূর্ণ নূতন অবস্থা। তিনি সহরের যে অতীত কথা কহিয়াছিলেন, তাহাতে শতাব্দিক বর্ষ পূর্বে তিনি সমাধিস্থ হইয়াছিলেন,—ইহাই প্রতিপন্ন হয়। শিখ-গুরু অর্জুন-সিংহের সময়ে, প্রায় তিন শতাব্দিক বৎসর পূর্বে, এই ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। যোগদ্বারা অসাধ্য সাধনের এইরূপ কত ঘটনাই শুনিতে পাওয়া যায়। যোগবলে মানুষ আকাশে উঠিতে পারে, জল-মধ্যে ভাসমান সোলের ন্যায় বায়ু-মধ্যে ভাসমান থাকিতে পারে,—এ দৃষ্টান্ত অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে দার্জিলিং পাহাড়ে কতকগুলি ইংরেজের সমক্ষে একজন তিব্বত-দেশীয় লামা এই আশ্চর্য্য যোগ-ক্রিয়া প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যোগবলে মানুষ দীর্ঘ-জীবন লাভ করে, যথেষ্ট-স্থানে গমন করিতে সমর্থ হয় এবং সর্ববিষয়ে তাহার অভিজ্ঞতা জন্মে,—যোগের এইরূপ কত মহিমাই কীর্তিত আছে। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি তো—শিক্ষকের ও শিক্ষার অভাবে যোগ-সাধনা এখন বিলুপ্ত-প্রায়। যোগশাস্ত্র-বিষয়ক যে সকল গ্রন্থাদি আছে, তাহার প্রকৃত অর্থ হৃদয়লব্ধ করা এবং তদনুসারে কার্য্য করা—এখন ক্রমশঃই কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ।

মীমাংসা-দর্শন ।

[জৈমিনি ও মীমাংসা-দর্শন,—বিভিন্ন জৈমিনির এসঙ্গ,—কর্মকাণ্ডের প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠার জ্ঞানকাণ্ডের অপ্রাধান্য,—ভাষা ও টীকা-কারণ ;—বেদের নিত্যত্ব,—যাগযজ্ঞ ক্রিয়াবর্ধনই মোক্ষের মূলীভূত,—বেদের পঞ্চ অঙ্গ,—বিধি-চতুষ্টয়,—ঈশ্বর-বিষয়ক বাদান্তবাদ,—অধিকারি-প্রসঙ্গ,—শব্দের নিত্যত্ব,—জ্ঞান ও মীমাংসার শব্দ-প্রমাণ-বিচারে তর্ক-বিতর্ক,—বেদ-বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানই মোক্ষফলপ্রদ ।]

মহর্ষি জৈমিনি-প্রবর্তিত দর্শন—প্রধানতঃ ‘মীমাংসা-দর্শন’ নামে পরিচিত। জৈমিনি নামেও একাধিক ঋষির পরিচয় পাওয়া যায় ; সুতরাং কোন্ জৈমিনি মীমাংসা-

জৈমিনি দর্শন প্রণয়ন করেন, তাহা নির্ণয় করা দুঃসহ। কৃষ্ণদৈবায়ন বেদব্যাসের
ও এক শিষ্যের নাম জৈমিনি ছিল। ‘জৈমিনি ভারত’ নামক গ্রন্থ
মীমাংসা দর্শন। তাঁহারই রচিত বলিয়া কথিত হয়। তিনি বেদব্যাসের নিকট মহাত্মারত

ও সামবেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। জৈমিনির নামে সামবেদের এক শাখা আছে ;
কোন্ জৈমিনি কর্তৃক সে শাখা প্রবর্তিত হইয়াছিল, তিনি ও বেদব্যাস-শিষ্য জৈমিনি
এক কি-না,—তাহারও কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না। জৈমিনি-প্রমুখ ছয় জন ঋষি
বজ্রবারক নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন ; তাঁহাদের নাম স্মরণে বা উচ্চারণে বজ্রাহত হইতে
হয় না,—এইরূপ লিখিত আছে। এতদ্ভিন্ন দর্শনকার জৈমিনির প্রসিদ্ধির বিষয়—কে না
অবগত আছেন ? যাহা হউক, জৈমিনি-প্রণীত দর্শন এখন মীমাংসা-দর্শন, জৈমিনি-দর্শন
ও পূর্ব-মীমাংসা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই দর্শন-সংক্রান্ত শব্দ-স্বামি-রচিত
ভাষ্য, কুমারিল ভট্ট-কৃত ‘বার্ত্তিক,’ মাধবাচার্য্য-কৃত ‘অধিকরণ’ এবং অপদেব ও লৌগাক্ষী
ভাষ্যের ‘প্রকরণ’ প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ প্রসিদ্ধ।* বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডের প্রতিষ্ঠাই—এই
দর্শন-শাস্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য। কর্ম্মকাণ্ডের প্রাধান্য প্রতিপাদন করিয়া ধর্ম্মতত্ত্বের মীমাংসা
হইয়াছে বলিয়াই, এই দর্শন—মীমাংসা-দর্শন সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। কর্ম্ম-মীমাংসা, অধ্বনু-
মীমাংসা বা কর্ম্ম-কাণ্ড নামেও জৈমিনি-দর্শন পরিচিত। ধর্ম্মতত্ত্ব-নিরূপণে মীমাংসার
প্রয়োজন—“ধর্ম্মাখ্যং বিষয়ং বক্তুং মীমাংসায়াঃ প্রয়োজনম্”,—এই হেতুবাদে, প্রতি-
স্থিতির বিরোধভঙ্গনোদ্দেশ্যে, মীমাংসা-দর্শন বিরচিত হয়। এই দর্শনের প্রথম সূত্র,—
“অথাতো ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা।” ধর্ম্ম-মীমাংসার জন্মই এই দর্শনের অবতারণা। বেদের
মীমাংসা আছে বলিয়া, সেই মীমাংসায় বেদ-বিহিত বজ্রাদি কর্ম্মকাণ্ডের প্রাধান্য কীর্ত্তিত
হইয়াছে বলিয়া, মীমাংসা-দর্শনের প্রাধান্য। কেহ কেহ বলেন,—উপনিষৎ এবং দর্শন-
শাস্ত্রের জ্ঞান-কাণ্ডের প্রভাব যখন দেশমধ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, জন-সাধারণ যখন ক্রমে

* শব্দ-স্বামীর ভাষ্যের ‘ভজ্ববার্ত্তিক’ নামক যে টীকা আছে, কুমারিল ভট্ট তাহা প্রণয়ন করেন।
মাধবাচার্য্যের গ্রন্থের নাম—জৈমিনি ও জ্ঞানশাস্ত্র বিজ্ঞান। অপদেবের গ্রন্থের নাম—মীমাংসা-জ্ঞান-প্রকাশ।
লৌগাক্ষী ভাষ্যের গ্রন্থের নাম—অর্থ-সংগ্রহ।

ক্রমে কর্ম-কাণ্ডে উদাসীনতা প্রকাশ করিতে আশঙ্ক করে, সেই সময় এই মীমাংসা-দর্শন প্রবর্তিত হইয়াছিল। মীমাংসা-দর্শন দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। যজ্ঞ, অগ্নি-হোত্র, দান প্রভৃতি বিষয় এই দর্শনে বিশদ-ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

মীমাংসা দর্শন বেদের নিতান্ত-স্বীকার করেন। বেদ অপৌকষেয় ও অভ্রান্ত; বেদ চিরদিন বিদ্যমান আছে, এবং চিরদিন বিদ্যমান থাকিবে; বেদ সত্যসিদ্ধ;—মীমাংসা-

মীমাংসার
প্রতিপাদ্য।

দর্শন ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। জৈমিনির মতে,—বেদের কর্ম-

কাণ্ডেই সর্বস্ব; তদতিরিক্ত বেদে আর যাহা আছে, সে কেবল কর্ম-

কাণ্ডে প্রবর্তিত জ্ঞানইবার উদ্দেশ্যে। মীমাংসাকার বেদকে পঞ্চাঙ্গে

বিভক্ত করিয়াছেন। তাঁহার মতে,—বিধি, নিষেধ, মন্ত্র, নামধেয়, অর্থবাদ,—বেদের এই পাঁচটি অঙ্গ। বেদের যে বাক্যে মনুষ্যের কর্তব্য নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাই বিধি; এবং যদ্বারা অকর্তব্যো নিবৃত্ত করা হইয়াছে, তাহাই নিষেধ। যেমন,—স্বর্ণলাভের জন্ত যজ্ঞ করিবে,—ইহাই বিধি; দিবাভাগে নিদ্রা যাইও না,—ইহাই নিষেধ। উৎপত্তি, বিনিয়োগ, প্রয়োগ, অধিষ্ঠার প্রভৃতি ভেদে ‘বিধি’ নানাবিধ। কোন্ যজ্ঞ করিবে, কাহার উদ্দেশ্যে বা কি দ্রব্যে সে যজ্ঞ সাধিত হইবে, যজ্ঞানুষ্ঠানে কি কি অঙ্গের প্রয়োজন, কোন্ যজ্ঞ কাহার অনুষ্ঠেয়,—বিধি-চতুষ্টয়ে তাহাই নির্দেশ করিয়া দেয়। মনে করুন,—কেহ ‘অগ্নিগোত্র’-যজ্ঞ করিবেন। তাঁহার অবশ্যই জানা প্রয়োজন—কোন্ দ্রব্যের দ্বারা কোন্ দেবতার উপাসনা আবশ্যক। তার পর, আরও জানা প্রয়োজন,—সেই যজ্ঞে কোন্ ক্রিয়ার পর কোন্ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান বিধি-সম্মত। আর জানা আবশ্যক,—তিনি কিরূপ যজ্ঞের অধিকারী। ফলে, যে কোনও ব্যক্তি যে কোনও দ্রব্যে যে কোনও যজ্ঞানুষ্ঠানের অধিকারী নয়,—বিধি-চতুষ্টয়ে তাহাই নির্দেশ করিয়া দেয়। নিয়ম ও পরিসংখ্যার দ্বারা এই বিধির আবার বিচার হইয়া থাকে। মন্ত্র অর্থ,—দেবতাদিগের আবাহন। তাহার ক্রমভঙ্গ, শব্দ-বিপর্যায় বা উচ্চারণ-দোষ অভীষ্ট কার্যের অন্তরায়-সাধক। যে উদ্দেশ্যে যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়,—তাহাই সেই যজ্ঞের নামধেয়। অর্থবাদ দ্বারা বিধি-নিষেধের প্রশংসা-নিন্দা হুচিত হয়। অর্থবাদ ত্রিবিধ;—গুণবাদ, অনুবাদ, ভূত্বার্থবাদ। সকল বাদের সকল শব্দের সংজ্ঞা-নির্দেশ এস্থলে সম্ভবপর নহে; এখানে মূলতঃ এই মাত্র বলিয়া রাখি,—বেদে কি কি বিষয় আছে এবং তদ্বারা যাগ-যজ্ঞাদির প্রাধান্ত কি প্রকারে হুচিত হইতেছে,—মীমাংসা-দর্শন প্রধানতঃ তাহাই দেখাইয়াছেন। তাঁহার মতে,—যজ্ঞই দারভূত; অন্ত্যজ সকলই অবাস্তব মাত্র। তাই তিনি স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন,—“আত্মারস্ত ক্রিয়ার্থত্বাৎ আনর্থকামভদর্থানাং।” অর্থাৎ, কর্মই বেদের সার; কর্ম ভিন্ন বেদে অস্ত্র যে অংশ দৃষ্ট হয়, তাহা অনর্থক। অধিক বলি কি, মীমাংসাকার দেবতার পর্য্যন্ত অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তিনি বলেন,—“মন্ত্রই দেবতা। দেবতা কখনও শরীরী হইতে পারেন না; শরীরী হইলে, একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তাঁহার অবস্থান অসম্ভব; পরন্তু, তাহাতে তাঁহার স্তবিকারীর চাক্ষুষ । তাক্ষ দৃশ্য সম্ভবপর ছিল।” জৈমিনির মতে,—যজ্ঞাদি কর্মই মোক্ষ-কলপ্রদ। তবে যজ্ঞের

জিয়া-পদ্ধতি এবং মল্লোচ্চারণাদি বিশুদ্ধ-ভাবে সমাহিত না হইলে, অভীষ্ট-লাভে বিঘ্ন ঘটিতে পারে,—ইহাই তাঁহার মীমাংসা। জৈমিনির দর্শনের মধ্যে ঈশ্বরের নাম নাই। শঙ্করাচার্য্য এইজন্য জৈমিনির মীমাংসা-দর্শনকে নাস্তিকা-দর্শন নামে অভিহিত করিয়াছেন। অপরাপর ভাষ্যকার কিন্তু জৈমিনির প্রতি সেরূপ কটাক্ষপাত করেন নাই। তাংরা বলেন,—“জৈমিনির মীমাংসা-দর্শনে যদিও ‘ঈশ্বর’-শব্দ নাই; তথাপি, উহাকে নিরীশ্বরবাদ-পূর্ণ বলা যাইতে পারে না। মীমাংসা-দর্শনের “ব্রহ্মাণীতি চেষ্টা” সূত্রে জৈমিনি ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, সপ্রমাণ হয়।” জৈমিনি অধিকারভেদ স্বীকার করিতেন; জৈমিনি বেদ মানিতেন; কিন্তু বেদকে ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া স্বীকার করিতেন না। তাঁহার মতে,—বেদের কর্ত্তা থাকিতে পারে না; শব্দের নিত্যত্ব ও একত্বই বেদের মূলীভূত। তাই শব্দের নিত্যত্ব প্রমাণের জন্ত তিনি একাধিক সূত্র প্রয়োগ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—(১) “নিত্যস্ত স্মাৎ দর্শনস্ত পরার্থহাং,” (২) “সর্বত্র যোগপত্যাং,” (৩) “সংখ্যাভাবাং,” (৪) “অনপেক্ষহাং,” এবং (৫) “লিপদর্শনাচ্চ।” অর্থাৎ—উচ্চারণ-মাত্র শব্দের অর্থ-পরিগ্রহ হয়, শব্দ বিনষ্ট হয় না, সূত্ররাং শব্দ নিত্য; সর্বত্র সর্বত্র এক শব্দের একই অর্থ গৃহীত হইয়া থাকে,—এজন্যও শব্দ এক ও নিত্য; শব্দের ক্ষয়বৃদ্ধি নাই, যেহেতু একই শব্দ পুনঃপুনঃ উচ্চারিত হইলে তদ্বারা শব্দোচ্চারিত বস্তুর সংখ্যা-বৃদ্ধি হয় না, শব্দ বিনষ্ট হইবারও কোনও হেতু দেখা যায় না। * সেই নিত্য অপৌরুষেয় শব্দই—বেদ; বেদ-বিহিত কর্ম্মাশ্রয় নাই—মোক্ষলাভের একমাত্র শরণি।

১* নৈয়ায়িকগণ শব্দের নিত্যত্ব স্বীকার কবেন না। তাঁহাদের যুক্তি,—(১) “কর্ম্ম একে তত্র দর্শনাৎ,” (২) “অস্থানাৎ,” (৩) “করোতি শব্দাৎ,” (৪) “সদাস্তরে যোগপদ্যাং,” (৫) “প্রকৃতি বিকৃতিশ্চ,” (৬) “বুদ্ধিষ্চ কর্ত্তভূম্যাত্।” অর্থাৎ, যত্ন দ্বারা শব্দ উচ্চারিত হইয়া থাকে; সূত্ররাং তাহার সর্বকাল-বিদ্যমানতা বা নিত্যত্ব নাই। উৎপত্তি মাত্র শব্দ নষ্ট হয়; শব্দ অস্থায়ী; সূত্ররাং তাহাতে নিত্যত্ব সম্ভবে না। ‘শব্দ করিয়া থাকে’ অর্থাৎ লোকে শব্দের সৃষ্টি-কর্ত্তা; সূত্ররাং শব্দের নিত্যত্ব সপ্রমাণ হয় না এককালে বহু ব্যক্তির কর্ণগোচর হয়; সূত্ররাং বহুত্ব-হেতু তাহার একত্ব ও নিত্যত্ব অসম্ভব। প্রকৃতি-প্রত্যয়-হেতু শব্দের রূপান্তর বা বিকৃতি ঘটিয়া থাকে; সূত্ররাং শব্দ নিত্য হইতে পারে না। একই শব্দ একাধিক ব্যক্তি উচ্চারণ করিলে, একাধিক বার সেই শব্দ উচ্চারিত হইতে পারে; শব্দকর্ত্তার সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি-হেতু শব্দেরও হ্রাস-বৃদ্ধি হয়; সূত্ররাং শব্দের নিত্যত্ব নাই। মীমাংসকগণ কিন্তু নৈয়ায়িকগণের ঐ আপত্তিও খণ্ডন করেন। তাঁহারা বলেন,—(১) “সত্যঃ পরমদর্শনং বিবয়ানাগম্যৎ,” (২) “প্রয়োগস্ত্ পরমং,” (৩) “আদিত্যবৎ যোগপদ্যাং,” (৪) “বর্ণান্তরমবিকারঃ” এবং (৫) “নাদবুদ্ধিঃ পরা।” অর্থাৎ, শব্দ সর্বসময়ে উচ্চারণকারীর সহিত সমন্ধযুক্ত থাকে না,—এই জন্য উহা অনিত্য বলিয়া বোধ হয় বটে; কিন্তু যে শব্দে যে জ্ঞান, সে জ্ঞান ঐককালই সমভাবে রহিয়া যায়। সূত্ররাং শব্দ অনিত্য নহে—নিত্য। ‘শব্দ করে’ ইহার ভাবপূর্ণ—শব্দের উচ্চারণমাত্র, শব্দের নির্মাণ নহে। সূর্য যেমন সর্বত্র পরিদৃশ্যমান, শব্দও তদ্রূপ এক হইয়াও বহুব্যক্তির গ্রাভা হইয়া থাকে। প্রকৃতি-প্রত্যয়ে বর্ণের পরিবর্ত্তনে বর্ণের বিকার হয় না; বর্ণ বর্ণান্তরে অবস্থিতি করে মাত্র। একই শব্দ বহুবার উচ্চারিত হইলে, ধ্বনিমাত্র বৃদ্ধি হয়; শব্দ-বুদ্ধি কর্ত্তা সম্ভবপর নহে। সূত্ররাং শব্দের নিত্যত্ব স্বতঃ-প্রমাণিত।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ।

বেদান্ত-দর্শন ।

[বাদরায়ণ ও বেদান্ত-দর্শন,—বেদান্ত-দর্শনের প্রণেতা ও তাঁহার নানা নাম-পরিচয়,—অধ্যায় ও সূত্র-সংখ্যা,—অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত তত্ত্ব,—শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, বঙ্ক্যাচার্য্য, বল্লাভাচার্য্য প্রভৃতির ভাষ্যে দ্বৈতাদ্বৈত-বিবিধ মত প্রতিষ্ঠা,—বেদান্ত-দর্শন সম্বন্ধে নানা মতের নানা গ্রন্থ :—দ্বৈতাদ্বৈত মতের পার্থক্য-প্রসঙ্গ :—প্রথম সূত্রে অধিকার-তত্ত্ব,—তৎসম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্য ও বলদেব ভাষ্যের মত :—অদ্বৈত মতের পরিচয়,—জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নত্ব,—শ্রবণ-বননাদি সাধন-পরম্পরা,—জ্ঞানের বিক্ষেপ ও আবরণ-শক্তি,—সজ্ঞান-নাশে তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে মুক্তি :—সত্য-মিথ্যার সংজ্ঞা-নির্দেশ,—ঘট ও সৃষ্টিকার দৃষ্টান্তে জীব ও ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদন,—ব্রহ্মের স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ,—অদ্বৈতবাদীর উপাসনার তাৎপর্য্য :—দ্বৈতবাদীর সহিত অদ্বৈতবাদীর মত-পার্থক্য,—ব্রহ্ম ও জীবের স্বাতন্ত্র্য,—ব্রহ্ম উপাস্ত, জীব উপাসক,—ধ্যান-ধারণা-উপাসনা-পদ্ধতি :—বেদান্ত-দর্শনে বিবিধ তত্ত্ব,—সৃষ্টি-প্রসঙ্গ (দ্বৈতাদ্বৈত মতে),—উপাসনা-পদ্ধতি (সগুণ নিগুণ ভেদে),—পারম্যমবাদ ও বিবর্তবাদ,—মায়াবাদ ও প্রকৃতিবাদ,—প্রলয় :—বেদান্ত-সূত্রে ব্যাসের অভিপ্রায়, বেদান্তসূত্রে জীবের ইষ্টানিষ্ট ।

বেদান্ত-দর্শন—দর্শন-শাস্ত্রের শিরোমণি-স্বরূপ । বেদান্ত জ্ঞান-কাণ্ডের প্রতিষ্ঠা—বেদান্ত-দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য । তন্মত এই দর্শনের নাম—বেদান্ত (বেদের অন্ত বা শেষ ভাগ) বা বেদান্ত-সূত্র । মহর্ষি বাদরায়ণ বা বেদব্যাস * এই দর্শন প্রণয়ন করেন । এই বাদরায়ণ বা বেদব্যাস সম্বন্ধে অনেক মতভেদ বেদান্ত-দর্শন । দেখিতে পাওয়া যায় । কেহ বলেন, উঁহারা দুই জন স্বতন্ত্র ঋষি ছিলেন । কেহ বলেন,—উঁহারা একই ব্যক্তি । আবার কেহ বলেন,—বদরিকাশ্রমে নিত্যবাস-হেতু বেদব্যাস এবং তাঁহার বংশধরগণ ‘বাদরায়ণ’-নামে অভিহিত হইতেন । অষ্টাদশ মহাপুরাণ বেদব্যাসের রচিত দেখিয়া, কেহ কেহ বেদব্যাস-নামধেয় বহু ঋষির কল্পনা করিতেও ক্রটি করেন না । কিন্তু যতদূর প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাতে পরাশর-তনয় বেদ-ব্যাসই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বাদরায়ণ প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ এবং বেদান্ত-দর্শন তাঁহারই প্রণীত । বেদান্ত-দর্শনের সূত্র-সমূহ প্রধানতঃ ব্রহ্ম-নির্ণয়ার্থ রচিত হইয়াছিল বলিয়া, এই দর্শন ‘ব্রহ্মসূত্র’ নামে অভিহিত হইয়া থাকে । বাচস্পতি মিশ্র বেদান্ত-দর্শনকে ‘ভিক্সু-সূত্র’ সংজ্ঞা প্রদান করেন । সংসার-ত্যাগী চতুর্থাশ্রমিগণ প্রধানতঃ বেদান্ত-দর্শনের আলোচনা করিতেন বলিয়া, বেদান্ত-সূত্রে ভিক্সু-সূত্র নামে পরিচিত হয় । জৈমিনির মীমাংসা-দর্শনে কর্ণকান্ডের উপযোগিতা প্রতিপন্ন হইয়াছিল ; আর এই বেদান্ত-দর্শনে জ্ঞানকান্ডের উপযোগিতা প্রতিপন্ন হয় । প্রকারান্তরে দুই দর্শনে বেদের দুই অঙ্গের (একে কর্ণকান্ডের, অত্রে জ্ঞানকান্ডের) আলোচনা হইয়াছে । সেই হেতু, জৈমিনির দর্শন ‘পূর্বমীমাংসা’ নামে এবং বাদরায়ণের দর্শন ‘উত্তর-মীমাংসা’ নামেও পরিচিত । বেদান্ত-দর্শনে চারিটি অধ্যায় আছে । প্রত্যেক অধ্যায় আবার চারিটি করিয়া ‘পাদে’ বিভক্ত । ইহার সূত্রসংখ্যা—পাঁচ শত আটাত্তরী ;—প্রথম অধ্যায়ের চারি পাদে এক শত পঁয়ত্রিশটি, দ্বিতীয় অধ্যায়ের চারি

পাদে এক শত পঞ্চাশতী (শঙ্করাচার্যের মতে এক শত ছাপাশতী), তৃতীয় অধ্যায়ের চারি-পাদে একশত নব্বইতী, এবং চতুর্থ অধ্যায়ের চারি পাদে আটাত্তরতী। গণনায় হুত্র-সংখ্যার কোথাও কোথাও কমিবেশী দেখিতে পাই ; তাহার কারণ,—কেহ বা একাধিক হুত্রে কে একটি হুত্র এবং কেহ বা একটি হুত্রে একাধিক হুত্রে গ্রথিত করিয়া লইয়াছেন । প্রথম অধ্যায়ের সাধারণ নাম—সমবয়্যাদ্যায় । এই অধ্যায়ে নানাবিধ ঋতি-বাক্যের সম্বয়-সাধন বা বিরোধ-ভঞ্জন হইয়াছে । প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদে স্পষ্ট-জ্ঞাপক ঋতি-সমূহের, দ্বিতীয় পাদে অস্পষ্ট ব্রহ্ম-ভাবায়ক ঋতি-সমূহের এবং তৃতীয় ও চতুর্থ পাদে সংশয়াত্মক ঋতি-সমূহের সম্বয় করা হইয়াছে । দ্বিতীয় অধ্যায়ের সাধারণ নাম—অবিরোধাদ্যায় । এই অধ্যায়ের প্রথম পাদে স্বমত প্রতিষ্ঠার জন্য স্বতি-তর্কাদি বিরোধের পরিবর্জন, দ্বিতীয় পাদে বিরুদ্ধ-মতে দোষারোপ, তৃতীয় পাদে ব্রহ্ম হইতে তত্ত্বসমূহের উৎপত্তি-প্রমাণ, এবং চতুর্থ পাদে ভূত-বিষয়ক ঋতি-সমূহের বিরোধ ভঞ্জন করা হইয়াছে । ফলে, এই অধ্যায়ে বিরোধী দার্শনিক মত খণ্ডন-পূর্বক মহর্ষি বাদরায়ণ বেদান্ত-মতের অবিরোধ প্রতিপন্ন করিয়াছেন । তৃতীয় অধ্যায়ের সাধারণ নাম—সাধনাদ্যায় । এই অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় পাদে ব্রহ্ম ভিন্ন অস্ত্রের প্রতি আকাজক্ষা পরিহার-পূর্বক ব্রহ্ম-প্রাপ্তির সাধনভূত ব্রহ্ম-তত্ত্বের সার্থকতা প্রদর্শিত হইয়াছে ; তৃতীয় পাদে ভগবদ্গুণ নিরূপণ করিয়া দর্শনকার নিখিল পুরুষার্থ-হেতু বর্ণন করিয়াছেন । সাধন-তত্ত্ব বিচারিত হইয়াছে বলিয়াই, তৃতীয় অধ্যায় ‘সাধন অধ্যায়’ নামে অভিহিত হয় । চতুর্থ অধ্যায়ের সাধারণ নাম—কলাদ্যায় । এই অধ্যায়ের হুত্রসমূহে নানাবিধ সাধনের কলা বিচারিত হইয়াছে । বেদান্ত দর্শনের ভাষ্যসমূহের মধ্যে বোধায়ন-কৃত ভাষ্যই সর্বাধিক প্রাচীন । শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, বল্লাভাচার্য্য, মধ্বাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণ যে সকল ভাষ্য-গ্রন্থ রচনা করেন, তৎসমুদায় বিশেষ প্রসিদ্ধ । শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যের নাম—শারীরিক ভাষ্য ; রামানুজের ভাষ্যের নাম—শ্রীভাষ্য ; মধ্বাচার্য্যের ভাষ্যের নাম—পূর্ণপ্রজ্ঞ ভাষ্য ইত্যাদি । এতদ্ব্যতীত, বিষ্ণুস্বামী, নিম্বাদিত্য, বিজ্ঞানভিক্ষু, নীলকণ্ঠ, বলদেব, যাদবমিশ্র, বল্লভ, শ্রীকণ্ঠ প্রভৃতির ভাষ্যও উল্লেখযোগ্য । শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যে অদ্বৈতবাদ, রামানুজের ভাষ্যে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, বল্লাভাচার্য্যের ভাষ্যে শুদ্ধাদ্বৈতবাদ এবং মধ্বাচার্য্যের ভাষ্যে দ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত । নীলকণ্ঠের শৈবভাষ্যে শৈবমত এবং বলদেবের গোবিন্দ-ভাষ্যে বৈষ্ণব-মত স্থাপিত হইয়াছে । এইরূপ নানা ভাষ্যে নানা মত প্রতিষ্ঠিত হইলেও, পণ্ডিতগণ বেদান্ত-দর্শনকে প্রধানতঃ দ্বৈতাদ্বৈত দুই মতের পরিপোষক বলিয়া নির্দেশ করেন । বেদান্ত-দর্শনের যত ভাষ্যই প্রচলিত থাকুক, তাঁহাদের মতে, সকল ভাষ্যই প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত,—(১) অদ্বৈত ভাষ্য, (২) দ্বৈত ভাষ্য । শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য-বিরচিত ভাষ্যই অদ্বৈত-ভাষ্যের মধ্যে প্রধান ; এবং রামানুজ, মধ্বাচার্য্য, বিষ্ণুস্বামী, নিম্বাদিত্য, প্রভৃতি প্রণীত ভাষ্য—চারি-সম্প্রদায়ের চারিখানি দ্বৈত-ভাষ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ । ‘সকড় পুরাণ’ প্রভৃতি মহাপুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়,—বেদান্ত-হুত্র দুর্কোধ্য বুলিয়া, স্বয়ং ঋগ্বেদেও উহার এক ভাষ্য প্রণয়ন করেন ; সেই ভাষ্যই—শ্রীমদ্ভাগবত । দেবর্ষি

নারদের উপদেশে সমাধি-যোগ-সাধনার বেদব্যাস ঐ ভাষ্য প্রাপ্ত হন—পুরাণাদি শাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে । বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মতে মধ্বাচার্য্যের ভাষ্যই শ্রীমদ্ভাগবতের অমূল্য-মোদিত ; শ্রীমদ্ভাগবত-রূপ ভাষ্যগ্রন্থ প্রচলিত ছিল বলিয়া, শ্রীচৈতন্যদেব বেদান্ত-দর্শনের কোনরূপ নূতন ভাষ্যগ্রন্থ প্রণয়ন করা আবশ্যক বলিয়া মনে করেন নাই । তবে যে যে স্থলে মধ্বাচার্য্যের মতের সহিত চৈতন্যদেবের মতবিরোধ ঘটিয়াছিল, তত্বেই তিনি যে অর্থ পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তি-কালে বলদেব-বিজ্ঞানভূষণ-কৃত গোবিন্দভাষ্যে তাহাই লিপিবদ্ধ হইয়াছিল । আনন্দগিরি ও বাচস্পতি মিশ্র শঙ্করাচার্য্য-কৃত ভাষ্যের এবং সুদর্শন রামানুজ-কৃত ভাষ্যের টীকা প্রণয়ন করেন । বাচস্পতি মিশ্রের সেই টীকার নাম—‘ভামতী’ এবং সুদর্শনের টীকার নাম—‘শ্রুতপ্রকাশিকা’ । ঐ দুই টীকা এখন বিশেষ প্রসিদ্ধ । মূল বেদান্ত-সূত্রের অর্থ ও উদ্দেশ্য—শ্রুতি-স্মৃতির সামঞ্জস্য রাখিয়া ব্রহ্ম-প্রতিপাদন হইলেও, ভাষ্য ও টীকাকারগণের গবেষণা-প্রভাবে তাহা হইতে নানা মত ও নানা অর্থোৎপত্তি হইয়াছে । তদনুসারে, বেদান্ত-দর্শনকে ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করিয়া, বিভিন্ন মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ বিভিন্ন গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন । বেদান্ত-সূত্রের ভাষ্য-সমূহে অদ্বৈতাদি যে মত-পরম্পরা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বেদান্ত-দর্শন প্রণয়নের পূর্বেও তাহা প্রচলিত হইল । যে অদ্বৈতবাদ মাণ্ডুক্যোপনিষদে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত ছিল, গোড়পাদাচার্য্য আপন কারিকায় বাহার আভাস প্রদান করিয়া গিয়াছিলেন, শঙ্করাচার্য্য কর্তৃক তাহা প্রসুত হইয়াছিল । এইরূপ বিশিষ্টা-দ্বৈত মতও বৌদায়ন-প্রমুখ আচার্য্যগণের অহুসরণে রামানুজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল—প্রমাণ পাওয়া যায় । * শঙ্করাচার্য্য এবং রামানুজের মত এখন বিশেষ প্রচলিত । শঙ্করাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত অদ্বৈতমতের পরিপোষণ-কল্পে পরবর্ত্তি-কালে যে সকল গ্রন্থ বিরচিত হয়, তন্মধ্যে পঞ্চদশী, বেদান্তসার, বেদান্ত-পরিভাষা, তত্ত্বপ্রদীপিকা, অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ । বিশিষ্টা-দ্বৈত মত সংস্থাপন জ্ঞাত রামানুজ যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তন্মধ্যে বেদার্থসংগ্রহ, বেদান্তসার, বেদান্তদীপ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । বেদান্ত-দর্শন সম্বন্ধে এইরূপ বিভিন্ন মতের সৃষ্টি-পরিপুষ্টি সাধিত হইলেও, উহার একই সূত্রের কতরূপ অর্থ হইতে পারে, ভাষ্যসমূহ আলোচনা করিলে, তাহা বুঝিতে পারা যায় ; এবং তদ্বারা প্রাচীন মনীষি-গণের জ্ঞান-গবেষণার বিস্তার-বিমুক্ত হইতে হয় ।

ভাষ্যকারগণের ব্যাখ্যামুসারে বেদান্ত-সূত্রে দ্বৈত ও অদ্বৈত দ্বিবিধ ভাবের আভাস প্রতিফলিত হইলেও, বেদান্ত-দর্শনেরও মুখ্য-উদ্দেশ্য—সেই নিঃশ্রেয়স বা আত্মাত্মিক হুঃখ-নিবৃত্তি । অদ্বৈতবাদীর মতে,—“জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন ; অবিন্ধ্য বা মায়ায় আবরণে আবৃত হইয়া, সে আপনাকে ও ব্রহ্মকে ভেদভাবে ভাবিয়া থাকে ; তত্ত্বজ্ঞান উদয় হইলে, অর্থাৎ জীব যে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন—এই ভাব অন্তরে জাগরুক হইলে, অবিন্ধ্য দূর হয় ; অবিন্ধ্য দূর হইয়া জীব ও ব্রহ্মের এক্য জ্ঞান সাধিত হইলেই, জীবের মুক্তিলাভ হইয়া থাকে । ‘সোহং’, ‘অহং ব্রহ্মস্মি’,—‘তিনিই

* পণ্ডিতগণের দিকান্ত,—শঙ্করাচার্য্য পূর্নীর অষ্টম শতাব্দীতে এবং রামানুজ ষোড়শ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন । সে আলোচনা অন্তর হইবে ।

‘আমি’, ‘আমিই ব্রহ্ম’,—জীব তখন ইহাই বুঝিতে পারে ।” দ্বৈতবাদীর (বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী প্রভৃতির) মতে,—“জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন নহে । যাহা হইতে জগতের উৎপত্তি, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই নিয়ামক,—সকলই তাঁহার কর্তৃত্বাধীন । সাধনাদির দ্বারা জীব তাঁহার ত্রায় গুণ-সম্পন্ন হইতে পারিলেই মুক্তির অধিকারী হয় । মুক্ত পুরুষ, ব্রহ্মের সহিত সমগুণসম্পন্ন হইলেও, ব্রহ্মের কর্তৃত্বাধীন । মুক্তপুরুষ সকল ক্ষমতা লাভ করেন ; তাঁহার সকল সঙ্কল্প সিদ্ধ হয় ।” অদ্বৈতবাদীরা বলেন,—“ব্রহ্মই সত্য, আর সমস্তই মিথ্যা । ব্রহ্ম ভিন্ন অত্ন কিছুই অস্তিত্ব সম্ভবপর নহে ; জগৎ বলিয়া যাহা প্রতীত হয়, তাহা ব্রহ্মের নাম ও রূপের ভেদ মাত্র ; বস্তুর প্রভেদ তাহাতে কিছুই নাই । যাহা স্বতন্ত্র বলিয়া মনে হয়, তাহা ভ্রম বা মায়া ;—রজ্জুতে সর্পভ্রম, তরিতে মুক্তা-ভ্রম, অথবা মরীচিকায় জলভ্রম মাত্র । কুণ্ডল-বলয়াদি স্বর্ণালঙ্কার, স্থূল-দৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও, মূলতঃ তাহাই যেমন সুবর্ণের বিকার মাত্র ; নাম-রূপের ভেদ থাকিলেও, জগতের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধও তদ্রূপ । অলঙ্কারের যেমন নানা নাম, নানা রূপ, জাগতিক পদার্থেরও তেমনই নানা নাম, নানা রূপ । সে হিসাবে,—মহুয়া, পদ্ম, পক্ষী, বৃক্ষ, পর্বত, নদী প্রভৃতি—নানা নাম-রূপে জগৎ পরিকল্পিত হইলেও, জগৎ, ব্রহ্ম ভিন্ন অত্ন আর কিছুই নহে ।” ইহাই শঙ্করা-চার্য্য-প্রবর্তিত অদ্বৈত-সম্প্রদায়ের মত । কিন্তু রামানুজাচার্য্য-প্রবর্তিত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী সম্প্রদায় বলেন,—“জীব ও ব্রহ্ম এক নহে । জীব অপেক্ষা ব্রহ্ম শ্রেষ্ঠ । ব্রহ্ম উপাত্ত ; জীব উপাসক । ব্রহ্ম ইষ্ট ; জীব ইষ্ট-প্রার্থী । ধ্যান-ধারণা-উপাসনা প্রভৃতির দ্বারা জীব ব্রহ্মের সাম্য-লাভ করিতে পারে ।” এক হিসাবে এই দ্বৈতাদ্বৈত উভয় মতে ঘোর পার্থক্য দৃষ্ট হয় ; অত্ন হিসাবে আবার দুই মতে সামঞ্জস্যও দেখিতে পাওয়া যায় । নদীর জল ভিন্ন দেশ দিয়া প্রবাহিত হইলেও, শেষে যেমন একই মহাসমুদ্রে গিয়া মিলিত হয় ; সেইরূপ, একই অভিপ্রায়ে, বিভিন্ন-প্রকৃতির মহুয়া বিভিন্ন পথে প্রবাহিত হইলেও, তাঁহাদের সকলেরই উদ্দেশ্য অভিন্ন,—একই ব্রহ্ম-সাগরে আত্ম-লীন । পণ্ডিতগণ তাই বলেন,—“দ্বৈতাদ্বৈতের বিরোধ, সে কেবল প্রণালী-ভেদ-মাত্র । অদ্বৈতবাদিগণের যাহা মায়া-বিজৃম্বিত জীব ও গুরু-চৈতন্য ব্রহ্ম ; দ্বৈতবাদিগণের তাহাই জীব ও ব্রহ্ম । মাত্র বিশেষ্য-বিশেষণের ব্যবহার-ভেদ ।”

বেদান্ত-দর্শনের প্রথম সূত্র—“অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ।” শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ এই সূত্রোক্তগত ‘অথ’ শব্দের ব্যাখ্যায় বুঝাইয়াছেন,—উপযুক্ত অধিকার লাভ করিয়া, পরিশেষে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্ত চেষ্টা করিতে হইবে,—‘অথ’-শব্দের ইহাই তাৎপর্য্যার্থ । অর্থাৎ, ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের উপযুক্ত অধিকারী না হইয়া যে-কোনও ব্যক্তি যখন-তখন ব্রহ্ম-তত্ত্ব জানিতে চাহিলে, সে তব্ব কখনই তাহার অধিগত হইবে না । শঙ্করাচার্য্য তাই ‘অথ’ শব্দের ভাষ্যে বলিয়াছেন,—“বিবিধদবীভবেদবেদাদেহনাশতোধিগতাখিলবেদার্থঃ অগ্নিনি জগ্নানি জগ্নাস্তরে বা কাম্য-নিবিদ্ধ-বর্জন-পুরঃসর নিত্যনৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্তোপাসনানুষ্ঠানেন নির্গত-নিখিল-কল্পবতয়া নিত্যতত্ত্বনির্মলহৃদঃ সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্নঃ প্রমাতা অধিকারী ।” অর্থাৎ, অধ্যয়ন-বিধি-

অনুসারে বেদ-বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়া যিনি বেদার্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন ; ইহজন্মেই হউক বা জন্মান্তরেই হউক, যিনি স্বর্গাদিজনক যজ্ঞ বা দানাদি কাম্য কর্ম সমাপন করিয়াছেন ; যিনি নরকাদিজনক ব্রহ্মহত্যাदि নিবন্ধ কর্ম পরিবর্জন করিয়াছেন ; অপিচ, যিনি নিত্যনৈমিত্তিক (সঙ্ক্কা-বন্দনা, ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, নৃ-যজ্ঞ, পার্শ্বশ্রাদ্ধাদি) প্রারশ্চিত্ত এবং সপ্তগব্রহ্মবিষয়ক মনন-রূপ উপাসনা প্রকৃতির অহুষ্ঠানে নিম্মাপ এবং নিত্যস্ত নিম্মলাচিত্ত হইয়া শমদমাদি সাধন-চতুষ্টয় অভ্যাসে অভ্রান্ত হইয়াছেন ; তিনিই ব্রহ্মজ্ঞানলাভের অধিকারী । ব্রহ্মজ্ঞানলাভের অধিকারী হইতে হইলে, কত দূর কঠোর সাধন আবশ্যক, শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য অথ-শব্দের অর্থে প্রথমেই তাহা নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন । কেবল শঙ্করাচার্য্য নহেন ;—ভাস্করাকরণ অনেকই ‘অথ’-শব্দের ঐ অর্থ করিয়াছেন । এমন কি, বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মাত্ৰ বলদেব-বিজ্ঞানভূষণ-কৃত ভাস্কোও ‘অথ’ শব্দের ঐরূপ অর্থ নির্দিষ্ট হইয়াছে । তবে, বলদেব গোবিন্দ-ভাষ্যে সাধুশব্দের প্রাধান্য কীৰ্ত্তন করিয়াছেন । তিনি বলেন, — যজ্ঞাদি সম্পন্ন হইলেও সাধু-শব্দের অতাব নিবন্ধন ব্রহ্ম জিজ্ঞাসায় বিষয় ঘটে । ‘অথ’-শব্দের ‘মাসুলিক’ অর্থও কোনও কোনও ভাষ্যে সূচিত হইয়া থাকে । বিষয়বিনাশ-শব্দায় ‘অথ’ শব্দের প্রয়োগ—ভাস্করাকরণ সমর্থন করেন । মতান্তরে যে অর্থই সূচিত হউক, ‘অথ’-শব্দের অনন্তর অর্থ হইলেও, উহা দ্বারা সাধারণতঃ পূর্ববর্তী কোনও কার্যের পরিসমাপ্তি অহুমিত হয় । শঙ্করাচার্য্য পূর্ববর্তী সেই অহুষ্ঠানকে অধিকার-লাভের সোপান বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । প্রকারান্তরে অধিকার-অনধিকার-ভেদ-তত্ত্ব ঐ স্থানে পরিকল্পিত হইয়াছে । শঙ্করাচার্য্যের মতে, — সাধন চতুষ্টয় :—নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক-ইহামুক্তফলভোগবিরাগ, শমদমাদি-সম্পত্তি, যুগ্মজ্ঞান । কোন্ বস্তু নিত্য, কোন্ বস্তু অনিত্য—তাহা বিচার করিয়া, ‘ব্রহ্মই সত্য, আর সকলই মিথ্যা’—এইরূপ পরিকল্পনাই নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক ; ইহা প্রথম সাধন । শ্রু-চন্দন-সন্তোষাদি ইহলৌকিক এবং স্বর্গাদি-ভোগ-রূপ পারলৌকিক সূত্বের প্রতি একান্ত বিভূষার নামই—ইহামুক্তফলভোগ-বিরাগ ; ইহাই দ্বিতীয় সাধন । শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা—এই যড়বিধ সম্পৎ—শমদমাদি-সম্পত্তি । ব্রহ্ম ভিন্ন অস্ত্র বিষয়ের প্রবণাদি হইতে মনকে নিবৃত্ত করার নাম—শম ; ব্রহ্ম ভিন্ন অস্ত্র বিষয় হইতে বাহ্যেচ্ছিয়াদিকে নিবৃত্ত করার নাম—দম ; বিধিপূরক বিহিত-কর্মসমূহ পরিত্যাগ অর্থাৎ বাসনাত্যাগ বা বৈরাগ্যের নাম—উপরতি ; শীতোষ্ণাদি ষড়-সহিবুতার নাম—তিতিক্ষা ; ইন্দ্রিয়াদি নিগ্রহ বা সংঘমের পর, ব্রহ্ম-বিষয়ে মনোনিবেশের বা একাগ্রতার নাম—সমাধান ; গুরু ও বেদান্তবাক্যে অর্থাৎ ধর্ম-কার্যে বিশ্বাসের নাম—শ্রদ্ধা । এতৎ-সমুদায়ের অহুষ্ঠানই—তৃতীয় সাধন । চতুর্থ সাধন—যুগ্মজ্ঞান ; অর্থাৎ, যুক্তিলাভের ঐকান্তিক ইচ্ছা । পর-পর এই সাধন-চতুষ্টয় সম্পন্ন করিয়া, অহং-জ্ঞানে অধিকার জন্মিলে যুক্তি লাভ হয় । বৈদান্তিকগণ তাই বলেন,— সাধন-চতুষ্টয়-রূপ বিবিধ সোপান অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার জন্মিলে, জ্ঞানকাণ্ডাত্মক বেদান্ত-শাস্ত্র আলোচনা করিতে করিতে জীব ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে ।

অবৈত-মতে, ব্রহ্ম সৎ, ব্রহ্ম চিৎ, ব্রহ্ম আনন্দ । তিনি অনাদি, তিনি অনন্ত, তিনি অপরিবর্তনীয় । তিনি নিঃশব্দ, তিনি নিষ্কির, তিনি নিত্য-বুদ্ধ-শুদ্ধ-সৎ । তবে তাঁহাতে

অবৈত-মতের
পরিচয় ।

যে নানা জ্ঞানের নানা রূপের অলুভব হয়, তাহা ভ্রান্তি মাত্র ;—তাহা

মায়া বা অবিজ্ঞান কার্য্য মাত্র । সাংখ্যের আলোচনায় যেমন দেখিয়াছি—

পুরুষ নির্লিপ্ত, প্রকৃতির বিকৃতিই সর্ব-পরিবর্তনের মূলধার ;—সৃষ্টি-

সম্বন্ধে বেদান্তের মতও অনেকাংশে তাহারই অলুরূপ বলিয়া মনে হয় ; সাংখ্যের প্রকৃতির বিকৃতিই প্রকারান্তরে বেদান্তের মায়া বা অবিজ্ঞান । যাহা অবিজ্ঞান বা মায়া—তাহাই অজ্ঞান ; যাহা জ্ঞান—তাহাই ব্রহ্ম । ব্রহ্মও এক—জ্ঞানও এক । যখন ভিন্ন বোধ হয়, তখন তাহা অজ্ঞান । যে জ্ঞানে আমি যটকে যট বলিয়া মনে করি, সেই জ্ঞানেই আমি পটকে পট বলিয়া বুঝিতে পারি ; বিষয়-বিশেষের উপাধির বিভিন্নতা-হেতু কখনই জ্ঞানের বিভিন্নতা প্রতিপন্ন হয় না । একই পদার্থ দর্পণে-জলে নানা-স্থানে প্রতিবিম্বিত হইলেও, পদার্থের নানাত্ব যেরূপ সম্ভবপর নহে ; জ্ঞান-ব্রহ্মও তরূপ নানা অবয়বে প্রতীত হইলেও, তিনি এক ভিন্ন কখনই বহু হইতে পারেন না । একই নৃপতি ভিন্ন ভিন্ন দেশের শাসনকর্ত্তা বলিয়া পরিচিত হইলেও, এক ভিন্ন তিনি যেমন দ্বিতীয় নহেন, ব্রহ্মও সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হইলেও, তিনি কখনই এক ভিন্ন দ্বিতীয় নহেন । যাহারা ইহা বুঝিতে না পারে, তাহারাই ভ্রান্ত—তাহারাই অবিজ্ঞানপন্থ । সেই অবিজ্ঞান জীবই মিথ্যা জগৎকে সত্য জ্ঞান করে ; মিথ্যা জগতের সত্য-জ্ঞানই তাহার ভ্রান্তি । তাহার সেই ভ্রান্তি যতদিন না দূর হইবে, ততদিন সে সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ থাকিবে ; ততদিন তাহাকে কর্ম্মঘোরে ইহ-সংসারে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে হইবে ; ততদিন তাহার মুক্তির পথ অবরুদ্ধ থাকিবে । জ্যোতির আধার সূর্য্যদেব মেঘাচ্ছন্ন হইলে যেমন দৃষ্টি-শক্তির বহির্ভূত হন ; সত্যস্বরূপ জ্ঞান-স্বরূপ ব্রহ্ম, অসত্য অজ্ঞানাকারে আচ্ছন্ন হইলে, জীব তাহার স্বরূপ তত্ত্ব বুঝিতে পারে না । ক্ষুদ্র একখণ্ড মেঘে বহু-যোজন-ব্যাপী সূর্য্যমণ্ডলের কতটুকু আচ্ছন্ন করিতে পারে ? কিন্তু অজ্ঞান মনে করে,—মেঘে বুঝি সমগ্র সূর্য্যমণ্ডলকেই আচ্ছন্ন করিয়াছে । মূঢ় জীব আরও মনে করে,—মেঘাচ্ছন্ন হইলেই, বুঝি বা সূর্য্যদেব প্রভাহীন হন । এ সকল যেমন ভ্রান্তি, মিথ্যা জগৎকে সত্য বলিয়া মনে করাও সেইরূপ ভ্রান্তি মাত্র । বৈদাস্তিকগণ তাই বলেন,—“ঘনাচ্ছন্নদৃষ্টির্বনাচ্ছন্নমর্কং যথা নিম্প্রভং মন্যতে চাতিমুঢ়ঃ । তথা বদ্ধবস্ত্রাতি যো মূঢ়দৃষ্টেঃ স নিত্যোপলব্ধিবরূপোহয়মাত্মা ।” মেঘাচ্ছন্ন-দৃষ্টি অতি-মূঢ় ব্যক্তির নিকট সূর্য্য যেরূপ মেঘাচ্ছন্ন নিম্প্রভ বলিয়া প্রতীত হয় ; যে বিমূঢ়-বুদ্ধি, আপনাতে পরমাত্মার অধিষ্ঠান-সত্ত্বেও, অজ্ঞানতা-নিবন্ধন সে আপনাকে বদ্ধ বলিয়া মনে করে । ফলতঃ, বৈদাস্তিকগণের মতে, অজ্ঞানতাই মুক্তির অন্তরায়-সাধক ; অজ্ঞানতা দূর করিতে না পারিলে, ‘ব্রহ্মই সত্য—আর সমস্তই মিথ্যা’—এই তত্ত্ব না বুঝিলে, জীবের কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন হয় না । তাহার বলেন,—অজ্ঞানের দুই শক্তি দুই ভাবে জীবকে বেঁধে রাখিয়া আছে । তাহার ‘আবয়ণ-শক্তি’ দ্বারা স্বরূপ-তত্ত্ব আচ্ছন্ন হয় ; আর তাহার ‘বিক্ষেপ-

শক্তি' দ্বারা মিথ্যা বস্তু কল্পিত হয়। সে যখন অন্ধকারে রজ্জুদৃষ্টে সর্পজ্ঞানে চমকিয়া উঠে, তখন অজ্ঞানতার আবরণ-শক্তি রজ্জুর স্বরূপ তত্ত্ব আবৃত করিয়া রাখে; আর অজ্ঞানতার বিক্ষেপ-শক্তি-রজ্জুতে মিথ্যা-বস্তু সর্প করুনা করিয়া দেয়। অদ্বৈতবাদীরা এই ভ্রান্তি-তত্ত্ব উপলব্ধি করাইবার জন্য কত দৃষ্টান্তেরই অবতারণা করেন। শিশুর কণ্ঠে সুবর্ণ-হার দোহুলামান; অথচ, হার অপসৃত হইয়াছে বলিয়া, শিশু ভ্রান্তিবশে চারিদিকে অন্বেষণ করিতেছে। এমন সময় কেহ যদি তাহাকে দেখাইয়া দেন,—হার তাহার কণ্ঠদেশেই বিদ্যমান; এমন সময় কেহ যদি তাহাকে বুঝাইয়া দেন,—সে কেন নিকটস্থ বস্তুকে দূরস্থ বলিয়া মনে করিতেছে; তাহাতে শিশুর যে আনন্দ—সদৃশ্যের উপদেশ-লাভে যে জন আশ্র-তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন, জীব ও ব্রহ্মের অভেদ-ভাব বুঝিতে সমর্থ হন, তাহারও সেই আনন্দ,—তিনিই তখন অবিদ্যাজাল ছিন্ন করিয়া মুক্ত-বুদ্ধ-শুদ্ধ-পুরুষ। সিংহশাবক মেঘদলে মিশিয়া ভ্রান্তিবশে আপনাকে যদি মেঘ বলিয়া মনে করে, আর সেই সময় যদি কেহ তাহাকে জলাশয়ের নিকটে লইয়া গিয়া স্বচ্ছজলে তাহার প্রতিবিম্ব দেখাইয়া দেয়;—সে তখন আপন স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে; সদৃশ্যের রূপা প্রাপ্ত হইলে, জীবেরও সেইরূপ ভ্রান্তি-বুদ্ধি দূর হয়,—জীব সত্য-তত্ত্ব উপলব্ধি করে। মায়া বা অবিদ্যার প্রভাব—যেন ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া। শকরাচার্য্য মায়াব কুহক-জাল বিস্তারের দৃষ্টান্তে ঐ উপমাই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। বাজীর ফত্বে-সাহাবো শূন্যমার্গে ক্রীড়া করে; লোকের চক্ষের উপর জীবন্ত মহম্মকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলে; জ্বলন্ত অনলে জীবন্ত দেহ ভস্মীভূত করিতে পারে; অথচ, সে সমস্তই মিথ্যা—চোখের ধাঁধা মাত্র। মায়াবশে মানুষও সেইরূপ মিথ্যা জগৎকে সত্য বলিয়া মনে করে; আশ্র-স্বরূপ বুঝিতে না পারিয়া, স্বপ্নঘোরে ঘুরিয়া বেড়ায়। ফলে, যতদিন সেই মায়া, ভ্রান্তি বা অজ্ঞানতা, ততদিন জীবের দুঃখভোগ,—ততদিন জীবকে এই নরককুণ্ডীরসমূল আবর্ত-বহুল সংসার-সমুদ্রে পড়িয়া হাবুডুপু খাইতে হইবে। এই অজ্ঞানতা দূর করিতে না পারিলে, জীবের গতান্তর নাই। এই অজ্ঞানতা দূর করিতে পারিলেই তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে জীবের ব্রহ্ম-প্রাপ্তি হয়। কিন্তু কিরূপে এই অজ্ঞানান্ধকার দূর হয়?—কিরূপে জ্ঞান-স্বর্গের দিবা জ্যোতি প্রতিভাত হইতে পারে? দর্শনকার তাহারও উপায়নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—“আশ্রসাক্ষাৎকার-রূপ তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তিলাভের মুখ্য উপায়।” তিনি বুঝাইয়াছেন,—প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা প্রথমে ইহলৌকিক সূক্ষ্মস্তোম্যাদির অনিত্যত্ব দর্শন করিতে হইবে; তার পর, পরম-সূক্ষ্ম-স্বরূপ পরব্রহ্ম-লাভের জন্য সাধনার আবশ্যক। সাধনা চতুর্বিধ;—শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, সমাধি। শ্রবণ অর্থে—শ্রুতিবাক্য-শ্রবণে ব্রহ্মের তাৎপর্য্যাবধারণ; মনন অর্থে—দর্শনশাস্ত্র-বিহিত যুক্তির দ্বারা পরব্রহ্মের চিন্তন, নিদিধ্যাসন অর্থে—দেহাদি সমস্ত বুদ্ধি পরিত্যাগ পূর্বক একাগ্রচিত্তে অদ্বিতীয় ব্রহ্মের নিরন্তর ধ্যান; সমাধি অর্থে—চিত্তের নিরোধ বা একাগ্রতা;—অর্থাৎ, ধ্যান ধারণা নিদিধ্যাসন প্রভৃতির অমুষ্ঠানে চিন্তা যখন একমাত্র ব্রহ্মেই লীন হয়,—সেই অবস্থা। ব্রহ্ম হইতে জীব স্বরূপতঃ অভিন্ন; অথচ, ভ্রান্তিবশে ভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। শ্রবণ মননাদি সাধন-পন্থায়া জীবের সেই ভেদজ্ঞান দূর হয়। ভেদজ্ঞান দূরই—যুক্তি।

অদ্বৈতবাদীরা সত্য ও মিথ্যার বিবিধ লক্ষণ নির্দেশ করেন । তাঁহারা বলেন,—যাহা ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান তিন কালেই একরূপে অবস্থিত, যাহা নির্বাক, তাহাই সত্য ।

আজ আছে, কিন্তু কাল নাই ; ছয় মাস পূর্বে ছিল না, কিন্তু আজ হইয়াছে ;—অদ্বৈতবাদীদিগের মতে তাহা মিথ্যা । যাহা পরিবর্তনশীল, অস্থায়ী কথা ।

যাহাতে বাধ বা ক্রমভঙ্গ আছে,— তাহা কখনই সত্য হইতে পারে না ।

শঙ্করাচার্য্য বলেন,—“একরূপেণ হবন্তিতো যোহর্থঃ স পরমার্থঃ ।” অর্থাৎ, যাহা সর্বকালে সকল অবস্থায় একভাবে অবস্থিত,—তাহাই পরমার্থ; জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, তুরীয়—মানুষের এই চারি অবস্থায় যাহা একইরূপে প্রতীয়মান হয়, কোনও অবস্থাতেই যাহার বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় না, তাহাই সত্য, তাহাই ব্রহ্ম ; তাহা ভিন্ন আর সমস্তই মিথ্যা, মায়া বা বিকার মাত্র ।

সূত্রে আছে,—“তদনন্তমাপ্রভৃৎশব্দাভিভাঃ ।” শঙ্করাচার্য্য তাহার ভাষ্যে লিখিয়াছেন —“ব্রহ্ম ব্যতিরেকেন কার্য্যজাতস্তাভাঃ । বিকারজাতস্তানুষ্ঠাভিধানাৎ ” ইত্যাদি । অর্থাৎ, ব্রহ্ম ব্যতীত কার্য্য হয় না ; কিন্তু কার্য্যমাত্রই বিকার বা অসত্য মিথ্যাজ্ঞান-বিজৃম্বিত । বলদেব কৃত পোবিন্দ-ভাষ্যেও ঐ সূত্রের ব্যাখ্যায় একই সিদ্ধান্ত দেখিতে পাওয়া যায় । তাঁহার ভাষ্যের মর্ম্মার্থ,—ব্রহ্ম হইতে জগৎ ভিন্ন নহে । কারণ, ‘বাচারন্তণং বিকারনামধেয়ং মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যম্’ ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যে জগৎ ও ব্রহ্মের অভিন্নত্ব সূচিত হইতেছে । দৃষ্টান্ত-স্থলে, তিনি শ্বেতকেতুর উপাখ্যান উল্লেখ করিয়াছেন । শ্বেতকেতু, উপাদেয় ও উপাদানের অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে জগৎ অভিন্ন নহে—এতদ্বাক্যের অর্থ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, আচার্য্যকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ; আচার্য্য তাহাতে উত্তর দেন —“একাদ্বাদেব মৃৎপিণ্ডোপাদানাৎ জাতং ঘটাদি সর্বং তেনৈব সিদ্ধান্তেন বিজ্ঞাতং জ্ঞাৎ তস্মৈ ততো নতিরেকাৎ ।” অর্থাৎ, একই মৃৎপিণ্ডরূপ উপাদান হইতে ঘটাদি বস্তু-সমূহ উৎপন্ন হয় ; স্তবরাং মৃত্তিকাকে জানিলেই ঘটাদিকে জানা হয় ; বুদ্ধি ও শব্দের তারতম্য-হেতু উপাদান ও উপাদেয় কখনও ভিন্ন হইতে পারে না ; মৃৎপিণ্ডের কঙ্কু-গ্রীবাди রূপ-বিকার সংঘটিত হইলেই ব্যবহার-সিদ্ধির নিমিত্ত লোকে ঘটাদি নামান্তর প্রদান করে, কিন্তু বাস্তব পক্ষে মৃত্তিকাই সত্য । মৃত্তিকা ও ঘট যে ভিন্ন নহে,—তাহা প্রতিপন্ন করিবার জ্ঞান, ভাবাকারগণ আরও কত কত দৃষ্টান্তেরই অবতারণা করিয়াছেন । তাঁহারা বলেন,—ঐ দুই পদার্থ যে পরস্পর ভিন্ন নহে, তাহার কারণ,—মৃত্তিকার রূপান্তরে বা বিকারে ঘটাদি নির্মিত হইলেও উহার পরিমাণাদির কখনও তারতম্য হয় না । যে পরিমাণ মৃত্তিকায় যে ঘট প্রস্তুত হয়, তুল্যদণ্ডে পরিমাপ করিলে উপাদানভূত মৃত্তিকার সহিত ঘটের পরিমাপ কখনই বৃদ্ধি হয় না । ব্রহ্ম এবং জগৎ যে অভিন্ন, একের বিকারেই যে অন্তের উৎপত্তি,—বেদান্ত নানা-প্রকারে তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন । ব্রহ্ম ও জগতের একত্ব প্রতিপাদনের জন্য শঙ্করাচার্য্য যে সকল শ্রুতিবাক্যের অবতারণা করিয়াছেন, তাহাতেও দেখা যায় —একই ভূতাত্ম্য সর্বভূতে অবস্থিত । জলমধ্যে চন্দের প্রতিবিম্ব পতিত হইলে ভিন্ন ভিন্ন জলাশয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয় ; অথচ, চন্দ্র একই । সেইরূপ, পরব্রহ্মও জগৎ-রূপে ভিন্ন ভিন্ন আকারে প্রতীত হইলেও, তিনি একই ;—তিনি ভিন্ন অন্তের অস্তিত্ব ভ্রান্তিমাত্র । শ্রুতিতে ব্রহ্মের যে বিবিধ লক্ষণ দৃষ্ট

হয় ; প্রতি যে কখনও বলেন—“সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম”, কখনও বলেন,—“বতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে” ; অদ্বৈতবাদীরা তাহাতে প্রতি দুইটি লক্ষণ নির্দেশ করিয়া থাকেন । প্রথমোক্ত প্রতি, তাঁহাদের মতে, ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ ; শেষোক্ত প্রতি—তটস্থ লক্ষণ । ব্রহ্ম চিৎস্বরূপ, ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, ব্রহ্ম অনন্ত রূপ—ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ প্রকাশ পায় । এতদ্বারা তাঁহার কোনই কর্মকর্তৃত্ব উপলব্ধি হয় না ; কেবল তাঁহার স্বরূপ মাত্র বুঝাইয়া থাকে । কিন্তু, তিনি কর্তা, তিনি বিধাতা, তিনি সংহর্তা—ইত্যাদি বাক্যে গুণ-বিশেষণের সাহায্যে তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করা হয় ; ইহাই তাঁহার তটস্থ লক্ষণ । বেদান্তের যেটি দ্বিতীয় সূত্র—“জন্মানাদ্যন্ত যতঃ”—অদ্বৈতবাদিগণ সেটিকে ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ বলিয়া নির্দেশ করেন । তাঁহারা বলেন, ঐ সূত্রের অর্থ—যাহা হইতে জন্মাদি অর্থাৎ সৃষ্টি-স্থিতি-লয় সাধিত হয়, তিনিই ব্রহ্ম । তিনিই আদি, তিনিই অনন্ত, তিনিই সৎ ; আর সমস্তই তাঁহার বিকার বা মায়া মাত্র । ফলতঃ, অদ্বৈতবাদীরা ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুই অস্তিত্ব মানিতে চাহেন না । যখন ব্রহ্ম ও জীব অভিন্ন, তখন অদ্বৈতবাদীদিগের মতে, ব্রহ্মের উপাসনা-প্রথাও স্বতন্ত্র । তাঁহারা উপাস্ত-উপাসক-ভাবে, ভক্ত ও ভজনীয় রূপে, ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধ রাখিতে চাহেন না । সাধারণতঃ উপাসনা অর্থে যাহা প্রতীত হয়, সে হিসাবে অদ্বৈতবাদীদিগের উপাসনা এক অভিনব সামগ্রী । সে উপাসনা অর্থ,—আমি ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, ‘সোহং’ ইত্যাদি পরিচিন্তন মাত্র । সেই উপাসনার নাম—‘অহংগ্রহ’ বা ‘আত্মগ্রহ উপাসনা’ । * দৃষ্টান্তস্থলে বৈদান্তিকগণ “আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ” সূত্রটি উদ্ধৃত করেন । শঙ্করাচার্য্য ঐ সূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—“আত্মেত্যেব পরমেশ্বরঃ প্রতিপত্তব্যঃ ।” অর্থাৎ, আত্মকেই পরমেশ্বর বলিয়া মনে করিবে । বলা বাহুল্য, সেই মননই অদ্বৈতবাদীর উপাসনা । তাঁহারা বলেন,—‘আত্মা ও ব্রহ্ম অভিন্ন ; আত্মাই ব্রহ্ম—এই ভাবনা ভাব ; তুমি মুক্তপুরুষ হইবে ।’ প্রতি-দৃষ্টান্তে তাঁহারা প্রতিপন্ন করেন,—“তং যথাযথোপাসতে তদেব ভবাত ।” অর্থাৎ, যে যেভাবে উপাসনা করে, সে সেইভাবে প্রাপ্ত হয় । ভক্তজ্ঞানীর পাপ-পুণ্য নাই । পদ্মপত্রে যেমন জল থাকিতে পারে না, তত্ত্ব-জ্ঞানীতে সেইরূপ পাপ থাকিতে পারে না । মুক্তজীব ব্রহ্মে লীন হইলে, তাহার নাম-রূপ সমস্তই লয় প্রাপ্ত হয় । “নদা সমুদ্রাদি নির্দর্শনানি চ”—নদা সমুদ্রে মিলিত হইলে, তাহার যেমন নাম-রূপ অস্তিত্ব সমস্তই সমুদ্রে লীন হয়, তেদাভেদ জ্ঞান দূর হইলে, জীবও তদ্রূপ পরব্রহ্মে লীন হয় ।

অদ্বৈতবাদীর সহিত দ্বৈতবাদীর প্রধান পার্থক্য,—অদ্বৈতবাদী যাহাকে নির্বিকল্প নিগুণ বলিয়া অভিহিত করেন, তাঁহারা যাহাকে জগৎ হইতে অভিন্ন বলিয়া মনে করেন, দ্বৈতবাদীরা সেই ব্রহ্মকে অন্তরূপে নির্দেশ করিয়া থাকেন । একই সূত্রের ব্যাখ্যায় দুই পক্ষের দুই মত পরিস্ফুট দেখিতে পাই । দৈতবাদীরা বলেন,—ঈশ্বর সগুণ, ঈশ্বর সবিশেষ ; তিনি নিখিল-হেয়-প্রত্যনীক (অর্থাৎ দোষশূন্য), তিনি অখিল-কল্যাণ-গুণাকর ; তিনি জ্ঞানের অতীত নহেন, তিনি চিন্তার

দৈত-বক্তার
পরিচয় ।

* উপাসনা তিন প্রকার,—অঙ্গপ্রবন্ধ, প্রতীক, অহংগ্রহ । প্রথমোক্ত উপাসনায় ব্রহ্মকে ব্রহ্মানুভূতি । দ্বিতীয়ায় উপাসনায় ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য পদার্থে (স্বর্গ, চন্দ্র, মন প্রভৃতিকে) ব্রহ্ম-ভাবনা । শেষোক্তে আত্মচিন্তন ।

অতীত নহেন, পরন্তু তিনিই সকলের কর্তা ও উপাদান। অদ্বৈতবাদীরা ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণেরই প্রাধান্ত স্বীকার করেন; কিন্তু দ্বৈতবাদীরা লক্ষণের কোনই ভেদাভেদ স্বীকার করেন না। “জন্মান্তর যতঃ”—বেদান্তের দ্বিতীয় সূত্রে অদ্বৈতবাদিগণ ব্রহ্মের ‘তটস্থ লক্ষণ’ নির্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু দ্বৈতবাদিগণ ঐ সূত্র হইতেই জীব ও ব্রহ্মের পার্থক্য প্রতিপন্ন করেন। তাঁহারা বলেন,—যাহা হইতে জগতের উৎপত্তি, তিনি স্বতন্ত্র, তিনি সর্ব-গুণাধার, তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের মূলীভূত,—তিনিই ব্রহ্ম। জীব ও জগৎ যে তাঁহা হইতে পৃথক, তাঁহাদের মতে, ‘জন্মান্তর’-সূত্রেই তাহা প্রতিপন্ন হয়। খেতাস্থতর উপনিষদের দৃষ্টান্তে তাঁহারা উল্লেখ করেন,—পরমেশ্বর ও জীব দুইটি পক্ষি-বিশেষ। উভয়েই তুল্যভাবে দেহরূপ ব্রহ্মে আশ্রয় করিয়া আছেন। এক জন সুস্বাদু ফল ভোজন করিতেছেন; অন্য জন অনাহারী থাকিয়া কেবল তাহা দর্শন করিতেছেন। অর্থাৎ, ঈশ্বর-রূপ পক্ষী সুখদুঃখরূপ কর্মফলাদির অধীন নহেন; কিন্তু জীব-রূপ পক্ষী তৎসমুদায়ের একান্ত অধীন। * দ্বৈতবাদিগণ আরও বলেন,—“উপলব্ধি হয় বলিয়াও জগতের সত্তা স্বীকার করিতে হয়।” এ সম্বন্ধে “ভাবে চোপলব্ধে” ও “ন ভাবেহুপলব্ধে” পর্যায়ক্রমে দুইটি সূত্র (দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদের পঞ্চদশ এবং দ্বিতীয় পাদের ত্রিংশ) উদ্ধার করিয়া, ‘যাহা উপলব্ধি হয় তাহা আছে’ এবং ‘যাহা উপলব্ধি হয় না তাহা নাই’—এইরূপ অর্থ-সঙ্গতি-পূর্বক, “জগৎ উপলব্ধি হয় সুতরাং জগতের সত্তা আছে”—ইহাই প্রতিপন্ন করেন। অপিচ, যে নদী ও সমুদ্রের দৃষ্টান্তে, যে ঘট ও মুক্তিকার দৃষ্টান্তে, যে কুণ্ডল-বলয়াদি ও সুবর্ণের দৃষ্টান্তে, অদ্বৈতবাদিগণ আপনাদের মত প্রতিষ্ঠা করেন; সেই সেই দৃষ্টান্তেরই অবতারণার রূপান্তরে দ্বৈতবাদিগণ দ্বৈতমত প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বৈতবাদীরা বলেন,—“নদীর ও সমুদ্রের জল দৃষ্টতঃ অভিন্ন বলিয়া মনে হইলেও, উহাতে বিবিধ ভেদ দৃষ্ট হয়। নদীর জল বিশুদ্ধ; সমুদ্রের জল লবণাক্ত। নদী—ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ; সমুদ্র—অসীম অনন্ত। নদী যখন সমুদ্রে মিলিত হয়, তখন তাহার ইতর-বিশেষ বুদ্ধিতে পারা যায় না বটে; কিন্তু বস্তগত জলের মধ্যে বিত্তকতা ও লবণাক্ততার প্রভেদ থাকেই থাকে। জীব ও ঈশ্বরের সম্বন্ধও ঠিক সেইরূপ। প্রলয়ে জীব পরব্রহ্মে মিলিত হইলেও, উভয়ের পার্থক্য অবশ্যই আছে। দুগ্ধ ও জল মিশ্রিত হইলে, তাহার পার্থক্য অসুভূত হয় না বটে; কিন্তু হংসগণ সে পার্থক্য ভেদ করিতে পারে; তাহারা অনায়াসেই জল ত্যাগ করিয়া দুগ্ধ পান করিয়া থাকে। সেই দুগ্ধ ও জলের প্রভেদ—ব্রহ্ম ও জীবের প্রভেদ তুল্য। জল ও দুগ্ধের প্রভেদ যেমন হংসগণ বুদ্ধিতে পারে; গুরুপদেশ-প্রাপ্ত নিশ্চলচেতা সাধুগণ সেইরূপ জীব ও ব্রহ্মের প্রভেদ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন। তখন, জীব আপনাকে সেবক ও ঈশ্বরকে সেবারূপে বুদ্ধিতে পারেন। বুদ্ধিতে পারিয়া, জীব যখন ব্রহ্মের উপাসনার প্রবৃত্ত হন, তখনই তাঁহার দুঃখভোগের অবসান হয়। আপনাকে ঈশ্বর ভিন্ন জানিয়া, ঈশ্বরের তজনা দ্বারাই জীবের মুক্তিলভ হয়।” যুক্ত-সম্বন্ধে রামাহঙ্কাচার্য্য-প্রমুখ দ্বৈতবাদিগণের ইহাই সিদ্ধান্ত। রামাহঙ্কাচার্য্য, বেদান্ত-দর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের

* “দা সুপর্ণা সমুদ্রা সমানং ব্রহ্মং পরিবব্রজাতে। ভরোরন্তঃ পিঙ্গলং স্বাধস্তানন্তর্য্যোহভিলাক-
শীতি ॥”—খেতাস্থতরোপনিষৎ, চতুর্থ সর্গাধ্য, ৩৪ শ্লোক।

দ্বিতীয় পাদের চতুর্দশাদি সূত্রের ভাষ্য-প্রসঙ্গে অদ্বৈতবাদীদিগের মত খণ্ডন-পূর্বক বলিয়াছেন,—“জীব আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ দুঃখের অধীন ; ব্রহ্ম দুঃখের অতীত ; ব্রহ্ম ও জীব কখন কি এক হইতে পারে ?” শ্রুতি-দৃষ্টান্তেও তিনি দেখাইয়াছেন,—“স কারণং কারণাধিপাধিপ”, “য আত্মনি তিষ্ঠন” ; তিনি কারণ এবং কারণাধিপতি জীবের অধিপতি, তিনি আত্মায় আত্মার মধ্যে অধিষ্ঠিত ;—এই সকল শ্রুতিবাক্যে শ্রষ্টা ও সৃষ্টি, ব্রহ্ম ও জীবের, স্বাতন্ত্র্য সূচিত হয়। অদ্বৈতবাদীরা প্রকৃতির বিকারের যে দৃষ্টান্তে জগৎকে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করেন ; দ্বৈতবাদীরা সেই দৃষ্টান্তের উল্লেখই বলেন,—“প্রকৃতি যখন বিকারী অর্থাৎ পরিবর্তনশীল, তখন সেই অপরিবর্তনীয় নিত্য-শুদ্ধ ব্রহ্মের সহিত তাহার সমান সত্ত্বা কখনও সম্ভবপর কি ? তাহা যদি না হইল, তবে ব্রহ্ম ও জীব স্বতন্ত্র বৈ কি !” ফলতঃ, অদ্বৈতবাদিগণ যেখানেই জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নত্ব প্রতিপাদনে প্রয়াসী, দ্বৈতবাদিগণ সেখানেই পার্থক্য প্রদর্শনে অগ্রসর। অপিচ, দ্বৈতবাদে জীব ও ব্রহ্মের এই যে পার্থক্য,—দ্বৈতবাদিগণের মধ্যে যাহারা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, তাহারা সেই পার্থক্যভূত প্রকৃষ্ট সামগ্রীকে “বিশিষ্ট” এবং যাহারা শুদ্ধাদ্বৈতবাদী, তাহারা তাহাকে “শুদ্ধ” ইত্যাদি সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়া থাকেন। আর তাহা হইতেই, কেহ বাসুদেব ত্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে, কেহ মহেশ্বর মহাদেবের সম্বন্ধে, কেহ ব্রহ্মাদি দেবগণের সম্বন্ধে, সূত্র-বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া নির্দেশ করেন। দ্বৈতবাদিগণ দুঃখ-নিবৃত্তির বা মুক্তির উপায় কিরূপে নির্দেশ করিয়াছেন, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজাচার্য্যের ‘বেদার্থ-সংগ্রহে’ তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি এই মধ্যে বলিয়াছেন,—“ভক্তিই ব্রহ্ম-লাভের একমাত্র উপায় ; যিনি প্রকৃত সাধক, তিনি স্তব, শরণ, নমস্কার, বন্দন, কীর্তন, অর্চন প্রভৃতি দ্বারা ব্রহ্মের করুণা প্রাপ্ত হন। তদ্বারা তাহার অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হয়। অজ্ঞানতা দূর হইলে, তিনি পরম পুরুষের অমুগ্রহ-লাভে কৃতার্থ হন।” দ্বৈতবাদীর মতে,—“ব্রহ্ম ভক্তবৎসল ও করুণাময়। তিনি প্রতিমায় আছেন, তিনি অবতारे আছেন, তিনি নানা স্তরে অবস্থান করিতেছেন। ধ্যান-ধারণা-উপাসনাদি দ্বারা জীব তাহার অনুকম্পা লাভ করিলে, তাহার স্বভাব প্রাপ্ত হন, তাহার গুণপরম্পরা লাভ করেন।” তাহা হইলেও, ব্রহ্মের সহিত তাহারা এক হইতে পারেন না ; “নাপি সাধনানুষ্ঠানেন নিরন্তাবিচ্ছিন্ন পরেণ স্বরূপৈক্যাসম্ভবঃ ;” সাধনানুষ্ঠানে অবিচ্ছিন্ন হইলেও পরমেশ্বরের স্বরূপালাভ সম্ভবপর নহে। মুক্তজীব “প্রদীপবদাবেশস্তথাহি দর্শয়তি” সর্বগুণ-বিষয়ক জ্ঞান প্রাপ্ত হইতে পারেন ; প্রদীপ যেমন প্রভা দ্বারা অনেক দেশ প্রকাশ করে, ঈশ্বর কর্তৃক প্রসূত প্রজা দ্বারা মুক্তজীবে সেইরূপ তত্ত্ব-জ্ঞান আবিষ্ট হইয়া থাকে। ফলতঃ, আলোকের অন্তির্দে যেমন দর্শন-শক্তি নির্ভর করে, দর্শকের দর্শনেন্দ্রিয় উপলব্ধ যাত্রী ; সেইরূপ মুক্তপুরুষ, সর্বজ্ঞ লাভ করিতে পারিলেও, সর্বস্বত্বের অধিকারী হইলেও, ব্রহ্মের স্বরূপ-লাভ করিতে পারেন না। “জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং প্রকরণাদসমিহিতত্বাৎ”—এই সূত্রের ভাষ্যেও দ্বৈতবাদিগণ ঐ কথাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। জগদ্ব্যাপার অর্থাৎ সৃষ্টি প্রভৃতি সমস্তই ব্রহ্মের কার্য্য ; মুক্তজীবে জগদ্ব্যাপার বা সৃষ্টিকর্তৃর কখনই সম্ভবপর নহে ;—শ্রুতি-বাক্যেও তাহারা তাহা প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। ‘যতো বা

ইমানি ভূতানি’—এই বাক্যের প্রকরণে এবং ‘জন্মান্তরা যতঃ’ ইত্যাদি শব্দের লক্ষণে ব্রহ্ম-কর্তৃত্বই প্রতিপন্ন হয়। অতএব, যুক্তপুরুষ ভগবদানুগ্রহেই সমস্ত বিভূতি লাভ করিয়া থাকেন ; নচেৎ, সৃষ্টি-ব্যাপারের সহিত জীবের কোনই সম্পর্ক নাই। নানা-প্রকারে অদ্বৈত-মতের প্রতিবাদ করিয়া, রামানুজাচার্য্য তাই বলেন,—“অদ্বৈতাত্ম্যং মতং বিহায় ঋটিতি দ্বৈতি প্রযুক্তো ভব। সোহং জ্ঞানমিদং ব্রহ্মস্বভাৱং পাদপদ্মং হরে।” অর্থাৎ, অদ্বৈত-মত পরিহার-পূর্ব্বক সত্ত্ব দ্বৈত-মতে প্রবৃত্তি-পরায়ণ হও ;—‘আমিই ব্রহ্ম’ এই ব্রহ্ম-জ্ঞান দূর করিয়া শ্রীহরির পাদপদ্ম ভজনা কর।

দুঃখ-নিবৃত্তির বিচার-প্রসঙ্গে বেদান্তদর্শনে নানা ভাবের আলোচনা দেখিতে পাই। জীব ও ব্রহ্ম, সৃষ্টি ও প্রলয়, স্বর্গ ও নরক, অদৃষ্ট ও কর্ম্মফল,—কত কথাই কত ভাবে

উত্থাপিত ও মীমাংসিত হইয়াছে। শ্রুত্রে অভাস-মাত্র আছে কি না—
 বেদান্ত-দর্শনে
 বিবিধ তত্ত্ব।

সন্দেহ ; কিন্তু ভাষ্যকারগণের গবেষণা-প্রভাবে তাহা হইতে অনন্ত

বিষয়ের অবতারণা ও বিচার চলিয়াছে। জীব ও ব্রহ্ম সম্বন্ধে, পূর্বেই

দেখাইয়াছি, নানা-মত নানা-বিতর্ক আছে। কেহ প্রমাণ করিয়াছেন,—“জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন ; জীব মিথ্যা, ব্রহ্ম সত্য।” কেহ প্রতিপন্ন করিয়াছেন,—“জীব ও ব্রহ্ম অশেষ পার্থক্য ; জীব উপাসক ব্রহ্ম উপাস্য।” কেহ দেখাইয়াছেন,—“এই জগৎপটেই ব্রহ্ম বিরাজমান ; ইহসংসার তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-স্বরূপ।” আবার কেহ দেখাইয়াছেন,—“জগৎ বলিয়া কোনও পদার্থের সন্ধান নাই ; বাহ্যকে জগৎ বলিয়া মনে হইতেছে, তাহা মায়া বা স্বপ্ন মাত্র।” সৃষ্টি ও প্রলয় সম্বন্ধেও একপ নানা-মত নানা-বিতর্ক দেখিতে পাই। একবিধ শ্রুত্রে প্রতীত হয়,—“ব্রহ্মই সৃষ্টি কর্তা ; তিনিই কারণ ; তাঁহার সঙ্কল্প-বশতঃ ইহসংসার সৃষ্টি হইয়াছে ; অথবা, সৃষ্টি তাঁহার লীলা মাত্র ;—সুখোন্মত্ত ব্যক্তির কলাফল বিবেচনা না করিয়া বেক্রপ নৃত্যাদিতে প্রযুক্ত হয়, ঈশ্বরও সেইরূপ লীলা-বশতঃ সৃষ্টিকার্য্যে প্রযুক্ত হন।” * অত্রবিধ শ্রুত্রে আবার দেখিতে পাই,—“বিপর্য্যয় বা বিকার হইতেই উৎপত্তি হয় ; দুষ্ক ও জলের বিকারে বেক্রপ ক্ষীর ও তুষার প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে, জগতের সৃষ্টিও সেইরূপ বিকার মাত্র।” † প্রথমোক্ত মতাবলম্বীরা বলেন,—“ইন্দ্রাদি দেবগণ দৃশ্যমান না হইলেও এই পৃথিবীতে বেক্রপ তাঁহাদের বর্ণণাদি কর্ম্ম-কর্তৃত্ব সিদ্ধ হয়, তদ্রূপ ঈশ্বর অদৃশ্যলভ্যমান হইলেও তাঁহার বিশ্ব-কর্তৃত্ব সিদ্ধ হইতেছে।” শেষোক্ত মতাবলম্বীরা বলেন,—“মহাপ্রভাবসম্পন্ন চেতন পুরুষ কিঙ্কিমাাত্র বাহ্য সাধন না করিলেও, তাঁহার সঙ্কল্প মাত্রই সৃষ্টিকার্য্য সমাহিত হয়।” বৈদান্তিকগণ আরও বলেন,—“অজ্ঞানই জগতের কারণ। তাহার দুই অবস্থা, বিবিধ শক্তি। অবস্থাদ্বয়ের নাম—মায়া ও অবিদ্যা ; শক্তিদ্বয়—আবরণ ও বিকল্প শক্তি। যে

* “জগৎপ্রতিষ্ঠাৎ”—১ম অধ্যায়, ৪র্থ পাদ, ১৬শ শ্লোক ; “তদভিধানাদেব তু ভুল্লিঙ্গাৎ সঃ”—২য় অধ্যায়, ৩য় পাদ, ১২শ শ্লোক ; “লোকবন্তু লীলাকৈবল্যান্”—২য় অধ্যায়, ১ম পাদ, ৩০ শ্লোক।

† “বিপর্য্যয়েণ তু ক্রমোহত উৎপন্নমতে চ”—২য় অধ্যায়, ৩য় পাদ, ১০শ শ্লোক ; “উৎপন্নসংহার মর্শ্বনাত্তেতি চেদ ক্ষীরবৎ”—২য় অধ্যায়, ১ম পাদ, ২৩শ শ্লোক।

শক্তি বুদ্ধিবৃদ্ধি দ্বারা আত্মাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, তাহাই তাহার আবরণ-শক্তি ; আর যে শক্তি উপাদান-রূপে জগৎ সৃষ্টি করে, তাহাই বিক্ষেপ-শক্তি । মায়ী বিপুল, অবিদ্যা মলিন ; মায়ী-প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মই জৈশ্বর, আর অবিদ্যা-প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মই জীব । ঐ মায়ী ও অবিদ্যা আবার যথাক্রমে ব্রহ্মের ‘আনন্দময় কোষ’ ও ‘কারণ-শরীর’ নামে অভিহিত হইয়া থাকে । জীবের কর্মফল-দানের জন্য ব্রহ্মের বশন সঞ্চল হয়, মায়ীচ্ছন্ন ব্রহ্ম হইতে তখনই পঞ্চতন্ত্রাত্মের উৎপত্তি । ব্রহ্ম হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী—উৎপত্তির ইহাই ক্রম । এইরূপ ক্রম-পর্যায়ে মনুষ্যাদি-সমস্তই সৃষ্টি হইয়া থাকে ।” এতৎপ্রসঙ্গে ব্রহ্মকে কেহ ‘উপাদান কারণ’ বলিয়া অভিহিত করেন, কেহ বা ‘নিমিত্ত কারণ’ বলিয়া নির্দেশ করেন ; কেহ আবার বলেন,—“তিনি নিমিত্ত-কারণ ও উপাদান-কারণ উভয় কারণই বটেন ।” উপাদান-কারণ ও নিমিত্ত-কারণকিরূপ অর্থে প্রযুক্ত হয়, তাহারও একটু আভাস দিতেছি । স্থূলতঃ, বাহ্য হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাই উপাদান-কারণ ; আর, বাহ্য কর্তৃক উৎপন্ন, তাহাই নিমিত্ত-কারণ । যেমন,—ঘটের উপাদান-কারণ মৃত্তিকা, বলয়ের উপাদান-কারণ স্রবণ ; যেমন,—ঘটের নিমিত্ত-কারণ কুন্তকার, বলয়ের নিমিত্ত-কারণ স্বর্ণকার ; ইত্যাদি । বাহ্য হউক, কোনও মতে কর্মকর্ত্ত্ব, কোনও মতে সঞ্চল-মাত্র, কোনও মতে বিকার-বণতঃ,—এইরূপ নানা-মতে নানাক্রমে সৃষ্টি-কার্য্য সংসাধিত হইয়া থাকে । সকল মতেরই প্রায় সার সিদ্ধান্ত,—সৃষ্টি ও লয় অহুলোম-বিলোম ক্রিয়া-বিশেষ । অহুলোম অর্থে—এক হইতে অন্তের উৎপত্তি ; বিলোম অর্থে—একে অন্তের লয় । ব্রহ্ম হইতেই উৎপত্তি, ব্রহ্মেই লয়,—অহুলোম-বিলোমে তাহাই বুঝাইয়া থাকে । এই উৎপত্তি ও বিলয় অবস্থাকেই বিশিষ্টাষ্টৈতবাদীরা ব্রহ্মের কার্য্যাবস্থা ও কারণাবস্থা বলিয়া নির্দেশ করেন । কার্য্যাবস্থায় নাম-রূপের ব্যক্ত-ভাব, কারণাবস্থায় তাহার তিরোভাব । সাক্ষ্যের সহিত বেদান্তের প্রধান পার্থক্য, আমাদের মনে হয়, এই উৎপত্তি ও লয় লইয়াই । সাক্ষ্যে প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে, বিকৃতি-বশতঃ, সৃষ্টি-ক্রিয়া সম্পাদিত হয় ; বেদান্তেও বিকৃতির কথা আছে ঘটে ; কিন্তু সর্বমূল্যধার—“জন্মান্তান্ত যতঃ”—সেই ব্রহ্ম । ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণন-প্রসঙ্গে বেদান্ত-সূত্রে তাঁহার সত্ত্ব ও নিগুণ উভয় ভাবেরই পরিচয় আছে । আবার সেই সত্ত্ব ও নিগুণ উভয় ভাবেই ব্রহ্মের স্বরূপ কিরূপে উপলব্ধি হইতে পারে, দৃষ্টান্ত দ্বারাও বেদান্ত তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন । সত্ত্বগ্ভাবদ্যোতক সূত্র,—“সর্বধর্ম্মোপপত্তেঃ”, “সর্বোপেতা চ তদগ্গনং” ইত্যাদি ; নিগুণগ্ভাবদ্যোতক সূত্র,—“অদৃশ্যাদি গুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ”, “প্রতিষেধাচ্চ”, ইত্যাদি ; সত্ত্ব-নিগুণ উভয় ভাবদ্যোতক সূত্র,—“ন স্থানতোহপি পরস্তো-ভয়লিংগং সর্বত্র হি”, “উভয়ব্যাপদেশাৎস্বহিকুণ্ডলবৎ”, ইত্যাদি । শেবোক্ত দৃষ্টান্তে ব্রহ্মের বিশেষ্য-বিশেষণ নিগুণ-সত্ত্বগ্ভাব বড় সুন্দর পরিষ্কৃত হইয়াছে । ‘অহিকুণ্ডলবৎ’—অর্থাৎ সর্ব কুণ্ডলাকারে থাকিলে, তাহাকে যেমন সর্ব ও বলা যায়, সর্বকুণ্ডলীও বলা যায়, ব্রহ্মও তদ্রূপ জানিবে । এইরূপ আরও সূত্র আছে—“প্রকাশাশ্রয়বহা তেজস্বাৎ”, “প্রকাশশ্চ কর্ম্মণ্যভ্যাসাৎ”, ইত্যাদি ; অর্থাৎ, সূর্য্যের জ্যোতিঃ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পতিত হইয়া বিভিন্ন আকারে ও বিভিন্ন বর্ণে প্রতিফলিত হইলেও, এবং ঋজু-বক্র বা নীল-সীত প্রভৃতি

তাহার নানা নাম-বিশেষণ কল্পিত হইলেও, তাহা যেমন স্বরূপতঃ এক; ব্রহ্মও তদ্রূপ সসীম-অসীম সগুণ-নিগুণ নানানাম-বিশেষণে কল্পিত হইলেও স্বরূপতঃ এক। সমুদ্র ও তাহার জলে যদিচ কোনই পার্থক্য নাই; তথাপি বেলা, তরঙ্গ, বৃদ্ধ, প্রবাহ—তাহার কত নাম-রূপেরই পরিচয় পাই; ব্রহ্ম-সম্বন্ধেও তাহাই বৃদ্ধিতে হয়। তথাপি কেহ যে সগুণ উপাসনার, কেহ যে নিগুণ উপাসনার প্রাধান্ত্য কীৰ্ত্তন করিয়া থাকেন; তাহার কারণ, যাহার চিত্তে যে ভাব প্রতিকলিত হয়, তিনি সেই ভাবেই ব্রহ্মের কল্পনা করিয়া লন। জীব ব্রহ্ম, জগৎ ব্রহ্ম, সকলই ব্রহ্ম,—বেদান্ত-মতের এই ভিত্তির উপর, ‘পরিণাম-বাদ’ ও ‘বিবর্তবাদ’ দুই মতের সৃষ্টি হইয়াছে। যাহারা বলেন—জগৎ ব্রহ্মেরই পরিণাম, তাহারা পরিণামবাদী; আর যাহারা বলেন—ব্রহ্মই জগদ্রূপে ব্যাহত (অবস্থিত), তাহারা বিবর্তবাদী। এই দুই মতেই উপাস্ত-উপাসকের ভেদ নষ্ট; সূত্রাং কেহ কেহ এই দুই মতকে নাস্তিক্য-মত বলিয়া কটাক্ষ করিয়া থাকেন। এ হিসাবে সাংখ্যের প্রকৃতি-বাদকে তাহারা বরাং অতুচ্ছ বলিয়া মনে করেন; কিন্তু বেদান্তের মায়াবাদকে প্রচ্ছন্ন নাস্তিক্য-বাদ বলিতেও কুপ্তি হন না। * প্রলয় (লয়) যে বিলোম-ক্রিয়া, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। তবে বৈদান্তিকগণ বলেন,—“এই প্রলয় আবার চারি প্রকার; নিত্য, প্রাকৃত, নৈমিত্তিক, আত্যন্তিক। স্রুষ্টি-কালে বাহ্য-বস্তুর জ্ঞান-লোপে নিত্য-প্রলয়; প্রারম্ভ-করে দেহত্যাগে প্রাকৃত-প্রলয়; যুগান্তে ব্রহ্মার রাত্রিতে নৈমিত্তিক-প্রলয়; মুক্তিলাভে আত্যন্তিক-প্রলয়। শেবোক্ত প্রলয়ে মুক্তিলাভ হইলে, জন্মজরামরণশীল দেহ ধারণ করিয়া জীবকে আর ইহসংসারে কষ্টভোগ করিতে আসিতে হয় না।”

ব্যাক্যায়নসারে বেদান্তদর্শনে নানা মতের নানা আভাস প্রতিকলিত হইলেও, বেদান্ত-সূত্র-সমূহে বাদরায়ণ বেদব্যাঙ্গের প্রধানতঃ কি উদ্দেশ্য প্রতীত হইতে পারে?

সূত্র-সমূহের আলোচনায় আমরা দেখিতে পাই, তিনি পূর্বপক্ষ উত্তর-বেদান্ত-সূত্রে পক্ষ-রূপে অজ্ঞাত দার্শনিক মত-সমূহের বিচার-বিতর্ক উত্থাপন করিয়া, ব্যঙ্গের অভিপ্রায়।

তৎসমুদায়ের সমন্বয়-সাধন-পূর্বক, বিজ্ঞা বা জ্ঞানকে মোক্ষলাভের উপায় বলিয়া কীৰ্ত্তন করিয়াছেন। বাদরায়ণ মনে করেন,—বিজ্ঞা হইতেই পরমপুরুষার্থ লাভ হয়; “পুরুষার্থোহতঃ শব্দাৎ ইতি বাদরায়ণঃ” (তৃতীয় অধ্যায়, ৪র্থ পাদ, ১ম সূত্র)। তাহার মতে,—জৈমিনি-কথিত যোগাদি বৈদিক ক্রিয়া-কর্ম, বিজ্ঞা-লাভের উপায় নাত্র; বিজ্ঞাই কর্মের শেষ; যজ্ঞাদি কর্ম—জ্ঞানের সোপান বিশেষ। † তুতাই তিনি পূর্ব-পক্ষরূপে জৈমিনির মত আলোচনা করিয়া, সেই মত খণ্ডন পূর্বক, বলিয়াছেন,—“বিহিতত্বাচ্চাত্মকর্ম্মাপি। সহকারিভেদে চ।” অর্থাৎ,—জ্ঞানের জ্ঞাত কর্ম্মানুষ্ঠান বিহিত বটে; কিন্তু উহা বিজ্ঞার সহকারিতাবে অন্তর্ভুক্ত;—মুক্তির সাধন-স্বরূপ অন্তর্ভুক্ত নহে। ‡ আরও,

* এ সম্বন্ধে শাস্ত্রে এরূপ উক্তি আছে,—“বেদার্থবদ্ব্যপাশস্তঃ মায়াবাদমবৈদিকম্”; “মায়াবাদমসচ্ছাত্তং প্রচ্ছন্নবোধমেব চ”; ইত্যাদি।

† জৈমিনি বলিয়াছিলেন,—কর্ম্মের জ্ঞাত জ্ঞান আবশ্যক; কিন্তু বাদরায়ণ বলেন,—জ্ঞানের জ্ঞাত কর্ম্মের আবশ্যক। তৃতীয় অধ্যায়, ৪র্থ পাদ, ২য় সূত্র,—“শেবত্বাৎ পুরুষার্থবাদো যথাযথ ইতি জৈমিনিঃ।”

‡ বেদান্তদর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের ৪র্থ পাদে ৩য় হইতে ৭ম সূত্রে জৈমিনির মত আলোচনা, ৮ম হইতে ১৭ম সূত্রে তাহার শব্দন এবং পরিশেষে উপরি উক্ত ৩২শ ও ৩৩শ সূত্রে এরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছে।

তিনি যজ্ঞাদি কৰ্ম-পরম্পরাকে বহিরঙ্গ সাধনের অন্তর্ভুক্ত করিয়া, শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন অন্তরঙ্গ-সাধনের প্রাধান্যই প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মকে আত্মরূপে সাক্ষাৎকারই, তাঁহার মতে, উপাসনার প্রধান অঙ্গ। “আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ”, * “মুক্তঃ প্রতিজ্ঞান্যং,” “আত্মা প্রকরণ্যং,” “অবিভাগেন দৃষ্টব্যং” † ইত্যাদি সূত্রে ব্রহ্মকে আত্মবদ্ধিতে উপাসনা করিবে অর্থাৎ ব্রহ্মরূপে আপনাকে উপগন্ধি করিবে,—এই অর্থই সূচিত হয়। বেদান্ত-দর্শনে ভক্তির প্রাধান্য কচিং দেখিতে পাওয়া যায়। গৌণভাবে কোথাও ভক্তির প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলেও, আত্মজ্ঞানই যে মোক্ষলাভের উপায়,—উহাতে সেই চিত্রই বিশদ প্রতিফলিত। সুতরাং শঙ্করাচার্য্য বেদান্ত-সূত্রের যে ভাষ্য প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, অনেকে তাহাকেই ‘বিশেষভাবে সূত্রানুসারী’ বলিয়া মনে করেন; অত্যাশ্চর্য্য যে ভাবে ভক্তির প্রাধান্য পরিকীর্তিত হয়, তাঁহাদের মতে, তাহা দূর-অবয়-মূলক। এ হিসাবে, প্রায় বার আনা লোক বেদান্তে শঙ্কর-ভাষ্যের অনুসারী, এবং অবশিষ্ট চারি আনা মাত্র লোক রামানুজাদির ভাষ্যের অনুসরণকারী। ব্রহ্ম চেতন, জগৎ অচেতন;—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা;—এ সকল বিষয়েও বাদরায়ণ যাহা বলিয়াছেন, হৃদ্ধদৃষ্টিতে দেখিলে, তাহাও শঙ্করাচার্য্যের মতেরই অনুকূল বলিয়া প্রতীত হয়। ফলতঃ “আমি ব্রহ্ম,” “আমিই তিনি”—এই অভেদ-জ্ঞান লাভ হইলেই মুক্তি বা সৰ্বসংক্ৰমণ হয়,—বেদান্তের ইহাই প্রধান প্রতিপাত্ত, এবং বেদান্ত-মত বলিতে গেলে সাধারণতঃ এই মতই এখন বুঝাইয়া থাকে। যাহা হউক, সেই অভেদ-জ্ঞান-লাভও যে সাধনা-সাপেক্ষ, অদ্বৈতবাদিগণ তাহা অস্বীকার করিতে পারেন নাই। সাধনা-গুণে ‘অহংজ্ঞান’ লাভ করিলে জীব মুক্তিলাভ করিবে,—স্থলতঃ দ্বৈতাদ্বৈতবাদী সকল সম্প্রদায়েরই এই মত। তবে যত কিছু বিতণ্ডা—সে কেবল সাধনার প্রকার-ভেদ লইয়া। ফলে, তাহাতেও অধিকারী অনধিকারীর কথা উঠিতে পারে; কেহ সিধা-পথে, কেহ বক্র-পথে, সকলে একই স্থানের উদ্দেশ্যে রওনা হইয়াছেন—বুঝা যায়। কিন্তু যাহারা ভ্রান্তবুদ্ধি, তাহারা সে নিগূঢ় তত্ত্বে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে না,—তাহারা একেবারেই ‘অহং ব্রহ্ম’ হইয়া। শেষে নাস্তিক্য-মতের পরিপোষণ করে। ঐ শ্রেণীর লোকের ভ্রান্ত-বুদ্ধি অপনোদনের জন্ত মনীষিগণ সূন্দের একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেন। তাঁহারা বলেন,—“মানিলাম—জীব ব্রহ্ম, জগৎ ব্রহ্ম, সকলই ব্রহ্ম, সকলই এক; কিন্তু তাই বলিয়া সকল ব্রহ্মই কি সকলের পক্ষে সমান কার্য্যকরী? পুত্রও ব্রহ্ম, কন্যাও ব্রহ্ম, আগুনও ব্রহ্ম, সর্পও ব্রহ্ম,—সকলই যদি এক-ব্রহ্মই হয়, সকলের সহিত কি সমান বাবহার সম্ভবপর? পুত্র-কন্যাকে মানুষ যেভাবে আলিঙ্গন করে, আগুন ও সর্পকেও কি সেইভাবে আলিঙ্গন করিতে পারে?” স্থলতঃ, ইহাও অধিকার-তত্ত্ব। এই অধিকার-তত্ত্ব লইয়াই হিন্দুসমাজে যত কিছু বিতণ্ডা-বিতর্ক [হিন্দু বলেন,— “অধিকারী হও, তৎজ্ঞান লাভ কর, মুক্তি অধিগত হইবে।” বলা বাছিয়া, বেদান্তেরও ইহাই সার সঙ্কল্প।

* চতুর্থ অধ্যায়, ১ম পাদ, ৩য় সূত্র। এই সূত্রের ব্যাখ্যায় অদ্বৈতবাদীদের ‘সোহং’ ভাব প্রকাশ পায়। কিন্তু দ্বৈতবাদীরা, পূর্বেই খণ্ডন করা হইয়াছে বলিয়া, এই সূত্রটির অসামর্থ্যতা প্রতিপাদন করেন।

† চতুর্থ অধ্যায়, ৪র্থ পাদ, ২য়, ৩য়, ৪র্থ সূত্র।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ।

চার্কাক ও বৌদ্ধ-দর্শন ।

[চার্কাক-দর্শন,—বৃহস্পতির প্রসঙ্গ,—চার্কাক, নিরীশ্বরবাদী, নাস্তিক, লোকায়ত, পাষণ্ড প্রভৃতি ;—চার্কাক-দর্শনের সার সঙ্কল্প—স্বথবাদ,—‘ইহকাল সত্য, পরকাল মিথ্যা, ইহজীবনেই সুখভোগ করিয়া লও’ ইত্যাদি মত-প্রচার,—ঈশ্বর ও বেদাদির প্রামাণ্য অস্বীকার ;—বৌদ্ধ-দর্শন,—প্রমাণ-পার্থক্য,—অমঙ্গলমুখতার প্রসঙ্গ,—প্রতীত্যসমুৎপাদ—বৌদ্ধ-দর্শনের মূল ভিত্তি,—জীবাদি উৎপত্তির হেতুাদি ;—বৌদ্ধ-দর্শনের প্রতিপাদ্য,—ভূত-তত্ত্বাদির আলোচনা,—ক্ষণিকত্ব প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা ;—বৌদ্ধ-দর্শনের বিভিন্ন মত,—মাত্ৰ্যমিকাদি সম্প্রদায়-চতুষ্টয় ।]

চার্কাক-দর্শন নাস্তিক্যবাদপূর্ণ, অথবা নাস্তিক্য দর্শন-মাত্রই অধুনা চার্কাক-দর্শন নামে পরিচিত । সুরগুরু বৃহস্পতি এই দর্শনের প্রবর্তক । তাঁহার শিষ্য চার্কাক বৃহস্পতি কর্তৃক এই দর্শন সংসারে প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া, ইহা চার্কাক-দর্শন নামে অভিহিত । ‘চার্ক’ আপাতঃ-মনোহর ‘বাক্য’-পরম্পরায় পরিপূর্ণ চার্কাক-দর্শন । বলিয়াও নাস্তিক্য-দর্শনের নাম চার্কাক-দর্শন । বৃহস্পতি নামে একাধিক ঋষির এবং চার্কাক নামে বিভিন্ন ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায় । সুতরাং চার্কাক-দর্শনের প্রকর্তক ও প্রচারক সম্বন্ধেও নানা মতভেদ দৃষ্ট হয় । ঋগ্বেদে দুই জন বৃহস্পতি ঋষির উল্লেখ আছে ; তাঁহাদের একজন অঙ্গিরস (অঙ্গিরস-বংশোদ্ভব) এবং অপর জন লৌক্য (লোক-বংশোদ্ভব) । * তৈত্তিরীয় সংহিতায় ‘দেব-পুরোহিত’ বলিয়া এক বৃহস্পতির পরিচয় আছে । মৈত্রেয়্যপনিষদে দৃষ্ট হয়, অসুরগণের বুদ্ধিব্রংশের জন্ত বৃহস্পতি কর্তৃক নাস্তিক্য-মত প্রবর্তিত হইয়াছিল । তদনুসারে তিনি দৈত্যগুরু গুক্রাচাৰ্য্যের রূপ পরিগ্রহ করিয়া অবিদ্যার সৃষ্টি করেন, এবং সেই অবিদ্যা-ঘোরে পড়িয়া অসুরেরা বেদাদি-শাস্ত্রে অবজ্ঞা প্রকাশ করে ও হিত-বাক্যকে অহিত-বাক্য বলিয়া মনে করে । † ফলে, তাহাতেই তাহাদের পতন হয় । সংহিতাকারগণের মধ্যেও বৃহস্পতির প্রসিদ্ধি আছে ; বৃহস্পতি-সংহিতা—উনবিংশ সংহিতারই অন্তর্ভুক্ত । মহাভারতে দুই জন বৃহস্পতির পরিচয় পাওয়া যায় ; একজন ‘অহিংসা পরম ধর্ম’ এই মত প্রচার করেন ; অপর জন বঞ্চনাশাস্ত্র-প্রণেতা বলিয়া উল্লিখিত হন । মৈত্রেয়্যপনিষদোল্লিখিত এবং মহাভারতোক্ত বঞ্চনাশাস্ত্র-প্রণেতা বৃহস্পতিকে অনেকে এক ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন । তিনিই চার্কাক-দর্শনের আদিভূত, তিনিই সুরগুরু বৃহস্পতি,—ইহাই পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত । চার্কাক নামেও বহু জনের পরিচয় পাই । বৃহস্পতির শিষ্য চার্কাক তো আছেনই ; মহাভারতের শাস্তিপর্বে দ্রুপদাধন-সখা চার্কাক, বুদ্ধিষ্টির নিন্দা করিয়া, ব্রহ্ম-কোপানলে ভস্মীভূত হন ; খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে এক জন চার্কাক, নাস্তিক্য-

* এই লৌক্য বৃহস্পতি কর্তৃক লোকায়ত নাস্তিক্য মত প্রবর্তিত হইয়াছিল—কেহ কেহ অনুমান করেন ।

† মতান্তরে প্রজাপতি ব্রহ্মা নাস্তিক্য-মতের প্রবর্তক বলিয়া উক্ত হন । মৈত্রেয়্যপনিষদের অন্তর্ভুক্ত এবং মৈত্রেয়্যপনিষদে তিনি অসুরগণকে আত্ম-তত্ত্ব বুঝাইবার সময় ঐরূপ উপদেশ দিতেছেন—দেখা যায় ।

মত প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়াও প্রমাণ পাওয়া যায় । লোকায়তিক, নাস্তিক্য, বারহ্মপত্য, পাম্বও প্রভৃতি নামেও চার্কাকের পরিচয় আছে । পরলোক স্বীকার করেন না বলিয়া এই দর্শন ‘লোকায়ত’, দৈবর মানেন না বলিয়া এই দর্শন ‘নাস্তিক্য’, ব্রহ্মপতি-প্রবর্তিত বলিয়া এই দর্শন ‘বারহ্মপত্য’ নামেও অভিহিত হইয়া থাকে ।

এই দর্শনের সংক্ষিপ্ত মত এই,—“দেহ ভিন্ন অল্প আত্মার অস্তিত্ব নাই । আত্মাই দেহ ; আত্মার ধ্বংসেই দেহের ধ্বংস । ইহসংসারের সুখই পরম পুরুষার্থ । প্রত্যক্ষ ভিন্ন প্রমাণ

নাই । পৃথিবী, জল, বায়ু, অগ্নি,—এই চারি ভূত হইতেই সমস্ত সৃষ্টি হইয়াছে । চৈতন্যও ভূত হইতে উৎপন্ন । পরলোক ও পুনর্জন্ম নাই ।

চার্কাক-দর্শনের
সারসংক্ষেপ ।

মৃত্যুই অপবর্ণ ।” * চার্কাক-বাদীরা বলেন,—“সংসারের সুখ দুঃখমিশ্রিত

বলিয়া যাহারা সে সুখ-ভোগে উপেক্ষা করে, তাহারা পণ্ডবৎ মুখ । মাছে কাঁটা ও জাঁইস আছে বলিয়া কি মাছ ত্যাগ করিতে হইবে? ধাত্তে তুব-কুটা আছে বলিয়া কি অন্নাহার পরিত্যাগ করিব?” † ফলে, তাঁহাদের মতে, ইহকালের সুখই সুখ, পরকাল মিথ্যা । তাঁহারা বলেন,—“যেমন গুড় তণ্ডুল প্রভৃতির সংযোগে মাদকতা-গুণবিশিষ্ট সুরার উৎপত্তি হয় ; ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ—এই ভূতচতুষ্টয়ের সংযোগে সেইরূপ চৈতন্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে । ঐ চারি ভূতের অভাব হইলেই দেহের নাশ হয় । দেহ-নাশে আর পুনরুৎপত্তির সম্ভাবনা নাই । দেহ ধারণ করিয়া, চৈতন্যলাভ করিয়া, আমরা যে মনে করি—আমি স্থূল, আমি কৃশ, আমি হইতে আত্মা বিভিন্ন, তাহা লৌকিক কল্পনা মাত্র । দেহ-নাশে শরীর-ত্যাগে সকলই শেষ হইয়া যায় ।” তাই তাঁহারা উপদেশ দেন,—“বাহা কিছু পার, সুখভোগ এই জন্মেই করিয়া লও । যত দিন বাঁচ, সুখ করিয়া যাও ; ঋণ করিয়াও ঘৃত-পান কর । দেহ একবার ভস্মীভূত হইলে, তাহার আর পুনরাগমনের সম্ভাবনা কোথায়?” লোকে যে সচরাচর বলিয়া থাকে,—“যাবজ্জীবৎ সুখ জীবদৃগং কুশা ঘৃতং পিবেৎ । ভস্মীভূতস্ত দেহস্ত পুনরাগমনং কুতঃ।”—ইহা সেই চার্কাক-দর্শনেরই উপদেশ । স্বর্গ, অপবর্ণ, পরলোক, আত্মা, বর্ণাশ্রম-ধর্ম বা বৈদিক-ক্রিয়াকর্ম—চার্কাক-গণ কিছুই সার্থকতা স্বীকার করেন না । তাঁহাদের মতে,—“সকলই ধূর্তের চাতুরী মাত্র ; এক শ্রেণীর লোকের জীবিকার উপায় মাত্র । নচেৎ, জ্যোতিষ্কোম-বক্ষে নিহত জীব যদি সত্য সত্যই স্বর্গে গমন করিত, তাহা হইলে লোকে আপন জনক-জননীকে ঐ বক্ষে রলি দেয় না কেন? শ্রাদ্ধাদির শিঙ-দানে যদি প্রেত-লোকের পরিভূক্তি হইত, তাহা হইলে

* নাথবাচার্য্য-কৃত ‘সর্বদর্শন-সংগ্রহে’ চার্কাক-মতসমূহ উল্লিখিত আছে । সেই মতের সার-সংক্ষেপ,—“সর্বথা লোকায়তমেব শাস্ত্রম্ যত্র প্রত্যক্ষমেব প্রমাণম্ পৃথিব্যগতেজোবায়বস্তত্তানি । অর্থকানো পুরুষার্থে । ভূতাত্ত্বং চেতয়ন্তে । নাস্তি পরলোকঃ । মৃত্যুরেবাণবর্ণ ইতি ।”

† “সুখমেব পুরুষার্থঃ । স চাস্য দুঃখসংভিন্নতয়া পুরুষার্থমেব নাস্তীতি মন্তব্যং অবজ্ঞানীয়তয়া প্রাপ্তম্ দুঃখস্ত পরিহারেণ সুখমাত্রস্তৈব ভোক্তব্যম্ । তদবধা মন্তব্যম্ সশক্যম্ স কটিকান্ববস্ত্রাপাদভে স্য বাবদাদেয়ং তাবদাদায় নিবর্ততে ।...তন্মাদুঃখতয়ানুকূলবেদনীয়ং সুখং ভোক্তব্যম্ । যদি কচিৎ ভীক-দুঃখং তাভ্যেৎ স তহি পণ্ডবকুর্থে ভবেৎ ।”—সর্বদর্শন-সংগ্রহোক্ত চার্কাক-মত ।

উঠানে অন্ন রাখিলে অটালিকার উপরিস্থিত ব্যক্তির উদরপূর্তি হয় না কেন ?” চার্বাক-দিগের মতে,—শাস্ত্রাপেক্ষা যুক্তিই শ্রেষ্ঠ ; “কেবলং শাস্ত্রমাত্রাশ্রিত্য ন কৰ্ত্তব্যোহিব্যর্থ-নির্ণয়ঃ । যুক্তিহীন বিচারেতু ধর্মহানিঃ প্রজায়তে ।” প্রমাণের মধ্যেও প্রত্যক্ষ প্রমাণ মাত্র তাঁহারা মাত্র করেন । তাঁহারা বলেন,—“অমুমানাদি প্রমাণ, ভ্রমসম্বল । যেহেতু, অমুমান প্রমাণ ব্যাপ্তিজ্ঞান-সাপেক্ষ । কিন্তু প্রত্যক্ষ ভিন্ন ব্যাপ্তিজ্ঞান সম্ভবপর নহে । অথচ, প্রত্যক্ষ বর্তমান-সম্বন্ধেই প্রযুক্ত ; ভূত বা ভবিষ্যৎ বিষয় প্রত্যক্ষ হওয়া অসম্ভব ।” চার্বাক-গণ শব্দ-প্রমাণ স্বীকার করেন না ; সুতরাং, তাঁহাদের মতে, বেদ অপ্রামাণ্য । ফলতঃ, দৈবের অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া, বেদাবাহিত ধর্মকর্ম প্রভৃতির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন-পূর্বক ইহলৌকিক সুখকে সারসামগ্রী বলিয়া মনে করাই—চার্বাক-দর্শনের মুখ্য লক্ষ্য । দেবগুরু ব্রহ্মপতি অশুরগণের বিনাশ-সাধনের জন্য তাহাদের বুদ্ধি-বিকৃতি ঘটাইবার উদ্দেশ্যে এই দর্শনশাস্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন ; সুতরাং, এই দর্শন-শাস্ত্রের মতামতসারী হইলে, জীবের অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী—হিন্দু-শাস্ত্রের ইহাই অভিপ্রেত ।

চার্বাক-দর্শনের সহিত বৌদ্ধ-দর্শনের নিকট সম্বন্ধ । সুতরাং, তুলনায় পরবর্ত্তি-কালে রচিত হইলেও, চার্বাক-দর্শনের প্রসঙ্গেই বৌদ্ধ-দর্শনের আলোচনা হইয়া থাকে ।

মাধবাচার্য্য সংগৃহীত ‘সর্বদর্শন-সংগ্রহ’-গ্রন্থে চার্বাক-দর্শনের পরই বৌদ্ধ-দর্শন । বৌদ্ধ-দর্শনের পরিচয় আছে । চার্বাক-দর্শনের সহিত বৌদ্ধ-দর্শনের

পার্থক্য,—চার্বাকগণ একমাত্র ‘প্রত্যক্ষ’ প্রমাণ স্বীকার করেন । কিন্তু

বৌদ্ধগণ ‘প্রত্যক্ষ’ ও ‘অমুমান’—দুইটি প্রমাণ স্বীকার করিয়া থাকেন । বৌদ্ধ-দর্শনের প্রারম্ভে ‘অমুমান’ প্রমাণ সম্বন্ধে চার্বাক-গণের বিরুদ্ধ-মত খণ্ডন করিয়া ‘অমুমান’ প্রমাণের প্রাধান্য স্থাপন করা হইয়াছে । ভগবান বুদ্ধদেব এই দার্শনিক মতের প্রবর্ত্তক ; সুতরাং উহা বৌদ্ধ-দর্শন নামে অভিহিত । সংসার জন্মজরামৃত্যুর অধীন, দুঃখভোগই সংসারের চরম ফল ;—সংসারের এই ভাব লক্ষ্য করিয়া বুদ্ধদেব ব্যাকুল হন । কি প্রকারে সংসারের দুঃখ দূর হইতে পারে,—এই চিন্তায়, সংসারাত্মক ত্যাগ করিয়া, তিনি বধন সন্ন্যাসপ্রম গ্রহণ করেন, সেই সময়ই বৌদ্ধ-দর্শনের উৎপত্তি হয় । প্রায় ছয় বৎসর কাল গয়া-তীর্থের সন্নিকটে নৈরঞ্জন-নদীর তীরে বোধি-বৃক্ষমূলে বুদ্ধদেব তপস্তায় নীরত রছিলেন । সেই সময়ে দুঃখোৎপত্তি এবং দুঃখনিবৃত্তির কারণ-পরম্পরা তাঁহার মনোমধ্যে উদ্ভূত হইয়াছিল । তখন দুঃখ ও দুঃখের উৎপত্তি-সম্বন্ধে এবং দুঃখস্বংস ও দুঃখস্বংসের উপায়-বিষয়ে তাঁহার মনে যে চিন্তাপ্রবাহিত হয়,—বৌদ্ধ-দর্শনের তাহাই মূলীভূত । বুদ্ধদেব জন্মজরামৃত্যু প্রভৃতি দুঃখের বিবিধ রূপ-নির্দেশ করেন । তাঁহার মতে,—রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান,—এই ‘পঞ্চদ্বন্দ্ব-সমুপেত’ দেহই দুঃখস্বরূপ । যে অবস্থায় আর এই দেহ ধারণ করিতে না হয় অর্থাৎ নির্বাণ হয়, তাহাই মুক্তি । বুদ্ধদেব স্থির করেন,—জন্ম-গ্রহণই সকল দুঃখের হেতুভূত ; জন্ম না হইলে, জরা, মরণ, ব্যাধি, শোক, নৈরাত্ম প্রভৃতির সম্ভাবনা থাকে না ; সুতরাং বাহ্যভেদে জন্মগ্রহণ করিতে না হয়,—দুঃখনাশে তাহাই প্রয়োজন । তিনি বুঝিছেন,—“কর্মই জন্মের মূল ; কর্মে যে ধর্মাবধা—তাহাই

জন্মের হেতু। সেই কৰ্মের আবার তৃষ্ণা হইতে উৎপত্তি। ইচ্ছিয় হইতেই তৃষ্ণার সূচনা। ইচ্ছিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নির্কৰ্ষ হইলে যে বেদনা সমুৎপত্তি হয়, তাহাই তৃষ্ণার মূলীভূত। তৃষ্ণা বা বাসনা অবিজ্ঞানমূলক।” এইরূপে কারণ-পরম্পরা অনুসন্ধান করিয়া, বুদ্ধদেব স্থির করেন,—“অবিজ্ঞা দূর করিতে পারিলে, তৃষ্ণার উচ্ছেদ-সাধন হইলে, জন্মগতি রোধ হয়। সেই জন্মরোধই নিৰ্বাণ; তাহাই আত্যন্তিক দুঃখনাশ। জন্ম না হইলে, ‘তুমি’ ‘আমি’ ভেদ থাকে না; রূপ-রসাদির বোধ হয় না; আশা-নৈরাশ্যের ব্যতীতপ্রত্যাভাবের সম্ভাবনা থাকে না।” বুদ্ধদেব যখন ধ্যাননিবিষ্ট ছিলেন, প্রথমেই তাঁহার মনে এই চিন্তার উদয় হয়,—‘জরামরণঃ কিং মূলকং?’ পরক্ষণেই উত্তর হয়,—‘জাতিপ্রত্যয়ংহি জরামরণং।’ তখন পুনরায় প্রশ্ন উঠে,—‘কি মূলকং জাতি?’ উত্তর,—‘জাতিৰ্ভবতি ভবপ্রত্যয়া।’ অর্থাৎ, সিদ্ধান্ত হয়,—উৎপত্তিই জাতির হেতুভূত। তিনি দেখিতে পান,—উৎপত্তির বীজ উপাদান (ক্ষিত্যপতেজ ইত্যাদি), উপাদানের বীজ তৃষ্ণা, তৃষ্ণার বীজ বেদনা। ইচ্ছিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নির্কৰ্ষ-জাতিই বেদনার কারণ; চক্ষু, কণ, নাসিকা, জিহ্বা, হৃদয়, মন,—এই ষড়ায়তনেই সেই সন্নির্কৰ্ষ সাধিত হয়। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ,—এই পঞ্চ বিষয়েই ষড়ায়তনের প্রবর্তনা। রূপ-রসাদির বীজ বিজ্ঞান; বিজ্ঞানোৎপত্তির বীজ সংস্কার; সংস্কারের মূল অবিজ্ঞা। দুঃখের এই হেতুসমূহ অবগত হইয়া তাহার উচ্ছেদ-চিন্তায় বুদ্ধদেব যখন নিমগ্ন হন, তখন তাহার মনে হয়, অবিদ্যা রোধ করিলে সংস্কার নিকৃষ্ট হইবে; সংস্কার রোধ হইলে, বিজ্ঞান দূর হইবে; তৎপরে ক্রমে ক্রমে সমস্ত দুঃখ নিকৃষ্ট হইলে, নিৰ্বাণ মুক্তি লাভ হইবে। বলা বাহুল্য, বুদ্ধদেব স্বয়ং এই সম্বন্ধে কোনও গ্রন্থ রচনা করেন নাই। তাঁহার নিকট উপদেশ পাইয়া পরবর্ত্তি-কালে তাঁহার শিষ্যগণ এই দুঃখ-নিবৃত্তি বা নিৰ্বাণ-বিষয়ে যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়া যান, তাহাই বৌদ্ধ-দৰ্শন নামে অভিহিত হইয়াছিল। বৌদ্ধ-দৰ্শনে এই দুঃখোৎপত্তি ‘প্রতীত্যসমুৎপাদ’ নামে অভিহিত হয়। সকল বস্তুই অস্তিত্ব প্রতীতি মাত্র। প্রতীতি হইতে বস্তু ও কার্য্য মাত্রের জ্ঞান উৎপন্ন হয়;—এই জ্ঞানই ইহার নাম—‘প্রতীত্যসমুৎপাদ’। * বাহ্য ও আধ্যাত্মিক ভেদে প্রতীত্যসমুৎপাদ দুই প্রকার। এই দুই প্রকার প্রতীত্য-সমুৎপাদের প্রত্যেকে আবার ‘হেতুপনিবন্ধ’ ও ‘প্রত্যয়োপনিবন্ধ’ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। হেতুপনিবন্ধ অর্থ,—কার্য্যোৎপত্তিকালে যাহাতে কেবলমাত্র হেতুভাব বিদ্যমান; প্রত্যয়োপনিবন্ধ অর্থ,—কার্য্যোৎপত্তির পূর্বে কারণ-প্রবোধ সমবায়-ভাব। যেমন,—

* বুদ্ধদেব স্বয়ং প্রতীত্যসমুৎপাদ বিষয়ে উপদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার উপদেশের কিয়দংশ এই,—
“উৎপাদায়া তথাগতানামসমুৎপাদায়া স্থিতেবৈবাং ধৰ্ম্মাণাং ধৰ্ম্মিতা ধৰ্ম্মস্থিতিতা ধৰ্ম্মনিয়ামকতা প্রতীত্য-সমুৎপাদাতুলোমতা ইতি। অথ পুনরয়ং প্রতীত্যসমুৎপাদো দ্বাভ্যাং কারণভ্যাং ভবতি হেতুপনিবন্ধতঃ প্রত্যয়োপনিবন্ধতঃ। যদিৎ বীজাদক্কুরোহক্কুরাৎ পজ্জং পজ্জাৎ কাত্তং কাত্তালাং নালান্নপৰ্ভো পৰ্ভাক্কুং শূকো পুশ্পং পুশ্পাৎ ফলমিতি।ইত্যুক্তো হেতুপনিবন্ধঃ।প্রত্যয়ো হেতুনাং সমবায়ঃ হেতুং হেতুং প্রতি অয়ন্তে হেতুস্তরাণীতি তেষাময়ম্বাণীনাং ভাবঃ প্রত্যয়োগেহেতুসমবায় ইতি ধাবৎ। বহাং বাতুনাং সমবায়ো বীজ হেতুস্তরো জাহতে।” ইত্যাদি।

বীজে অঙ্কুরোৎপত্তির হেতু-ভাব; যেমন,—অঙ্কুরোৎপত্তির পূর্বে বীজে ক্ষিত্যপতেজাদি পার্থিব দ্রব্যের সংযোগ। বাহ ও আধ্যাত্মিক ভেদে যে চারি প্রকার প্রতীত্যসমুৎপাদ, তাহার দৃষ্টান্ত এইরূপ;—মূল বীজ হইতে অঙ্কুর, পত্র, কাণ্ড, নাল, পুষ্প, ফল প্রভৃতির যে উৎপত্তি-পর্যায়, তাহাই হেতুপনিবন্ধ বাহ প্রতীত্যসমুৎপাদ। আর, ক্ষিত্যপতেজো-মরুদ্যোম ও কাল এই ষড়বিধ পদার্থের সমন্বয়ে বীজাঙ্কুরাদির যে উৎপত্তি, তাহাই প্রত্যয়ো-পনিবন্ধ বাহ প্রতীত্যসমুৎপাদ। অবিজ্ঞা হইতে বিজ্ঞান, নাম, রূপ, স্পর্শ, তৃষ্ণা, উপদান, ভব, জ্ঞাতি প্রভৃতির যে উৎপত্তি, তাহাই হেতুপনিবন্ধ আধ্যাত্মিক প্রতীত্যসমুৎপাদ; আর, ক্ষিত্যপতেজোমরুদ্যোম ও বিজ্ঞানের সংযোগে যে জীবাদির উৎপত্তি, তাহাই প্রত্যায়োপনিবন্ধ আধ্যাত্মিক প্রতীত্যসমুৎপাদ। মাধবাচার্য্য সংগৃহীত ‘সর্বদর্শন-সংগ্রহ’-গ্রন্থে ‘বৌদ্ধদর্শন’ অধ্যায়ে এই প্রতীত্যসমুৎপাদের বিবরণ বিশদভাবে বর্ণিত আছে। কাহারও কোনও চেতনা নাই, কাহারও কোনও নিয়ামক নাই, আপনাপনিই সকল পদার্থের সৃষ্টি হয়,—স্থূলতঃ ইহাই প্রতীত্যসমুৎপাদের অভিপ্রায়। সুতরাং এই মতে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের প্রয়োজন নাই; নির্দোষ-মুক্তি লাভ করিতে পারিলেই সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হয়।

ষড়দর্শন আলোচনায় দেখিয়াছি,—দার্শনিকগণ মূল তত্ত্বকে কেহ পঞ্চবিংশতি ভাগে, কেহ বোড়শ ভাগে, কেহ বা সাত ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। কিন্তু বৌদ্ধ-দার্শনিকগণের

বৌদ্ধ-দর্শনের
প্রতিপাদ্য।

মতে জগতের মূলতত্ত্ব দুইটি মাত্র—চিত্ত ও ভূত। তাঁহারা বলেন,—

“ভূতং ভৌতিকং চিত্তং চৈতন্যক।” অর্থাৎ, ভূত হইতে জগতাদি

ভৌতিক পদার্থের এবং চিত্ত হইতে রূপ-বিজ্ঞানাদি পঞ্চদ্বন্দ্বাত্মক চৈত

পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছে। সে হিসাবে ভৌতিক পদার্থ চারিটি;—পৃথিবী, অপ, তেজ, বায়ু। এই চতুর্বিধ ভূত বা ‘ধাতু’ হইতে পরিদৃশ্যমান বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছে। পৃথিব্যাदि চতুর্বিধ ধাতুর (পরমাণুর) সংহতিক্রমে স্থূল সৃষ্টি সাধিত হয়। চতুর্বিধ ধাতুর আবার—ধর, মেঘ, উষ্ণ, ঈরণ (গতিশীল) চতুর্বিধ স্বভাব। আকর্ষণ, বিকর্ষণ, বিক্রিয়া, ধর্মবস্ত প্রভৃতিও ধাতুচতুষ্টয়ের স্বভাবাস্তর্গত। স্বভাব-বশে সংযোগ-বিয়োগে স্থূল জগতের সৃষ্টি হয়, ভৌতিক জগৎ উৎপন্ন হয়। চৈতন্য পদার্থের মধ্যে,—“রূপ-বিজ্ঞান-বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কার-সংজ্ঞা: পঞ্চদ্বন্দ্বাশ্চৈতন্যাত্মকাঃ”,—রূপ, বিজ্ঞান, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার—এই পাঁচটি অবয়ব। ইন্দ্রিয়ের সহ বিধের সম্বন্ধ—রূপদ্বন্দ্ব; সূক্ষ্মদৃশ্যাদির অনুভব—বেদনা-দ্বন্দ্ব; আমি, আমার ইত্যাদি অহংভাব—বিজ্ঞানদ্বন্দ্ব; ইহা মনুষ্য, ইহা পশু ইত্যাদি ভেদভাব,—সংজ্ঞাদ্বন্দ্ব; রাগদ্বेषাদি ভাব—সংস্কার-দ্বন্দ্ব। পূর্বেই বলিয়াছি,—সংস্কারই অবিজ্ঞার মূল। ক্ষণস্থায়ী পদার্থের স্থায়িত্ব-কল্পনাই অবিজ্ঞা। অবিজ্ঞা হইতে রাগ, দ্বेष, ধর্ম, অধর্ম প্রভৃতি চিন্তবৃত্তির আবির্ভাব হয়। বৌদ্ধেরা ঈশ্বর স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে,—সৃষ্টি স্বভাবের ক্রিয়া; সৃষ্টি চিরদিন সমভাবে চলিতেছে; কর্মস্বারা জীব সংসারে আবদ্ধমন করে, এবং কর্মফলভোগে বাধ্য হয়। সুতরাং কর্মবন্ধন ছিন্ন করিয়া, প্রজ্ঞালাভের দ্বারা নির্দোষপ্রাণিই বৌদ্ধ-দর্শনের সার সিদ্ধান্ত। করুণা, চিত্তবৈরাগ্য, গৌরবত্যাগ, শম,

দম, কান্তি প্রভৃতি দ্বারা প্রজালাত হইয়া থাকে । সুতরাং বৌদ্ধগণের মতে,—সকল পদার্থই কণিক ; সকল পদার্থই দুঃখময় ; সকল পদার্থই বিসদৃশ ; সকল পদার্থই অলীক ।

“সর্বং কণিকং কণিকং দুঃখং দুঃখং । অসক্কণং অসক্কণং শূন্যং শূন্যং ॥”

এবম্বিধ ভাবনাই, এবম্বিধ অভ্যাসই, এবম্বিধ ভাবনার ঐক্যই, আত্মাত্মিক দুঃখ-নিরাস্তি-রূপ নির্বাণের হেতুভূত । করুণাদি গুণ-পরম্পরায় বিভূষিত হইয়া যাহারা সংসারের এবাধন নশ্বরত্ব ধারণা করিতে পারেন, তাহারা নির্বাণ-মুক্তি লাভের অধিকারী হন । প্রায় সমস্ত বৌদ্ধ-দর্শনেরই মূলতত্ত্ব এইরূপ । এই মূল-তত্ত্ব-বিষয়েই বেদান্তের সহিত বৌদ্ধমতের বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হয় । বৈদান্তিকগণের মুক্তি বা নির্বাণে জীবাশ্মা-স্বরূপ পরব্রহ্ম নাম-রূপ ইত্যাদি মায়োপাধি হইতে নিম্মুক্ত হন । কিন্তু বৌদ্ধ-নির্বাণে সকলই ভৌতিক পদার্থে বিলীন হইয়া যায় । ভৌতিক পদার্থে লীন হওয়াই বৌদ্ধগণের নির্বাণ । নির্বাণ-সম্বন্ধে বৌদ্ধগণের মূল-তত্ত্ব এক হইলেও, বুদ্ধদেবের উপদেশ অভিন্ন হইলেও, বৌদ্ধগণ কিন্তু নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত । ‘সর্বং কণিকং’ ইত্যাদি চতুর্বিধ ভাবনা দ্বারা নির্বাণ লাভ হয়,—সকলেই ইহা স্বীকার করেন বটে ; কিন্তু তথাপি তাহাদের মধ্যে সম্প্রদায়-ভেদের ক্রটি নাই । সেই সম্প্রদায়-সমূহের মধ্যে চারিটি সম্প্রদায় বিশেষ প্রসিদ্ধ ;—(১) মাধ্যমিক, (২) যোগাচার, (৩) সৌত্রান্তিক, এবং (৪) বৈভাষিক । মাধ্যমিকগণ শূন্যবাদী ; ইহঁরা সর্বশূন্যত্ব প্রচার করেন । ইহঁদের মতে,—জ্ঞান ও বিষয় সকলই শূন্য । সৃষ্টির পূর্বে আত্মস্থান শূন্যই বিরাজমান ছিল ; শূন্য অবলম্বনেই বিশ্ব-প্রপঞ্চের সৃষ্টি ; আবার শূন্যেই তাহার লয় হইবে । যোগাচারগণ বাহ্যশূন্যবাদী । তাহারা বলেন,—‘বাহ্য বিষয়ের কোনও অস্তিত্ব নাই ; জ্ঞানমাত্রই প্রত্যক্ষ ; জ্ঞানের দ্বারাই সর্বশূন্যত্ব প্রতিপন্ন হয় । নীল, পীত প্রভৃতির কণিকত্ব বিজ্ঞান সাহায্যেই নির্ণীত হইয়া থাকে ; সুতরাং বিজ্ঞানের সত্য আছে,—বিজ্ঞান ভিন্ন আর সমস্তই অসত্য ।’ সৌত্রান্তিকগণ বাহ্যবাস্তবত্বের স্বীকার করেন । তাহারা বলেন,—‘জ্ঞান প্রত্যক্ষ, বিষয় অমুমেয় । জ্ঞান আত্মাংশে অমুভূত হয়, বাহ্যবস্তুর বহিরংশে অমুভাব্য । সুতরাং জ্ঞান সত্য হইলে, বাহ্যবস্তুর অবশ্যই সত্য হইবে ।’ বৈভাষিকগণ বাহ্য-প্রত্যক্ষত্ব স্বীকার করেন । তাহারা বলেন,—‘জ্ঞানও প্রত্যক্ষ, বিষয়ও প্রত্যক্ষ । আত্মাংশে অবস্থিত বলিয়া জ্ঞান যদি প্রত্যক্ষ হয়, জ্ঞানামুভূত বাহ্য বস্তুই বা প্রত্যক্ষ-পর্যায়ভূক্ত না হইবে কেন ?’ যাহা হউক, অতীত বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও, পদার্থের কণিকত্ব-সম্বন্ধে বৌদ্ধগণের মধ্যে কোনই মতভেদ দৃষ্ট হয় না । দীপনিষা এবং বায়ুচালিত মেঘসমূহ যেমন কণিক, অথচ সং ; বৌদ্ধগণের মতে—পৃথিবীও তদ্রূপ কণিক ও সং । সকলেই এক-মত স্বীকৃত করিয়াছেন, সকলেই এক নির্বাণ-মুক্তির পথে প্রধাবিত হইয়াছেন ; অথচ, সকলেরই পরিগৃহীত লক্ষ্য স্বতন্ত্র । সেই স্বতন্ত্রতা-নিবন্ধনই পরবর্ত্তি-কালে তৈজস-দর্শন প্রভৃতি আরও বিভিন্ন দর্শনের উৎপত্তি হইয়াছে । তত্ত্ব বিবরণও স্বাধিকানে আলোচিত হইবে ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ।

ষড়দর্শন-সম্বন্ধ ।

[হিন্দু-দর্শনের সাদৃশ্য,—দুঃখ-নাশে সুখ-সাধন সকল দর্শনেরই মুখ্য উদ্দেশ্য,—মতভেদ একায়-ভেদ মাত্র,—তত্ত্বজ্ঞান লাভই দুঃখনাশের মূলীভূত,—বিভিন্ন দর্শনে দুঃখনাশ ও মুক্তির এসজ,—বেদান্তের মুক্তি,—পদার্থবাদি বিচারে পার্থক্য-তত্ত্ব,—কর্মকল-ভোগ জন্ম-নিবন্ধ,—ব্রহ্মতত্ত্ব, বিশ্বতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব, পরলোকতত্ত্ব এই তত্ত্ব-চতুষ্টয়ে দর্শনশাস্ত্র,—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন,—প্রাচ্যের প্রকৃতি পাশ্চাত্যে নামান্তরে একাশয়ান,—সাধারণ বিকৃতি ভারতইনের 'ইভলিউশন', কণাদের পরমাত্ম পাশ্চাত্যের 'স্পাটম' প্রকৃতি,—ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও অমায় বিষয়ে ঐক্যাত্মক্য,—স্পেন্সার, বার্কলে, মেটো, কার্ট, ডেকার্টে প্রভৃতির মতালোচনা,—অহং-তত্ত্বাদি বিশেষ বিশেষ বিষয়ে সাদৃশ্য,—পার্থক্য অদৃষ্টবাদে,—ইউরোপে হিন্দু-দর্শনের অমুবাদাদি ।]

দর্শন-শাস্ত্রসমূহ আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই,—সকল দর্শনেরই মুখ্য উদ্দেশ্য এক, সকল দর্শনেরই প্রতিপাদ্য অভিন্ন, সকল দর্শনই জীবের দুঃখনাশ ও সুখ-সাধনের উপায় নির্ধারণে নিয়োজিত । মূলে সকল দর্শনেরই সম্বন্ধ হিন্দু-দর্শনের সাদৃশ্য । আছে ; তবে মীমাংসার পরম্পরের মধ্যে যে মতভেদ দৃষ্ট হয়, তাহা প্রকার ভেদমাত্র । সকল দর্শনকারই সংসারকে দুঃখময় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ; সকল দর্শনকারই সেই দুঃখনিবৃত্তির উপায় উদ্ভাবনে যত্নবান হইয়াছেন । এতদ্বিষয়ে কোনও দর্শনের মধ্যেই বিরোধ নাই । দুঃখনিবৃত্তি বা সুখ-প্রাপ্তি—কোনও দর্শনে নিঃশ্রেয়স বা কৃতকৃত্যতা, কোনও দর্শনে কৈবল্য বা স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা, কোনও দর্শনে আত্মাত্মিক দুঃখনিবৃত্তি বা মুক্তি,—এইরূপ বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়াছে বটে ; কিন্তু সকলেরই উদ্দেশ্য যে এক, সকলই যে কেবল শব্দের বিভিন্নতা মাত্র, তাহা বলাই বাহুল্য । 'জল' পদার্থ বুঝাইতে—কখনও পানীয়, কখনও তোর, কখনও সলিল—নানা শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; অথচ, বস্তুগত জল পদার্থ, যেমন এক ভিন্ন দুই নহে ; সেইরূপ মুক্তি, নিঃশ্রেয়স, কৈবল্য প্রকৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত হইলেও, আত্মাত্মিক-দুঃখনিবৃত্তি পদার্থটীও মূলতঃ এক ভিন্ন দুই নহে । বিবেকীর দৃষ্টিতে সংসারের সকলই যে দুঃখময়,—কি সামান্য, কি পাতঞ্জল, কি বৈশেষিক, কি মীমাংসা, কি শ্যাম, কি বেদান্ত,—সকলেই তাহা একবাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন । পতঞ্জলি বলিয়াছেন,—“পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈশ্বৰ্যগুণবৃত্তিবিয়োধ্যাত্ত্ব দুঃখমেব সৰ্ব্বং বিবেকিনঃ ।” অর্থাৎ, পরিণাম, তাপ ও সংস্কার এবং গুণবৃত্তির বিরোধ-হেতু সংসারের সকলই বিবেকীর দৃষ্টিতে দুঃখময় । কপিল বলিয়াছেন,—“তদপি দুঃখক। চলমিতি দুঃখ-পক্ষে নিক্ষেপস্তে বিবেচকঃ ।” অর্থাৎ, যাহা আপাতঃ-সুখকর বলিয়া প্রতীত হয়, তাহাও দুঃখমিশ্রিত ; তজ্জন্ত বিবেকিগণ ঐরূপ সুখকে দুঃখের মধ্যেই গণনা করিয়া থাকেন । বেদান্ত জ্ঞো সংসারের সকল পদার্থকেই দুঃখময় 'অবস্ত' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । দুঃখাবস্থানের অর্থবা সেই সুখ-লাভের অবস্থা-বিষয়ে অবস্ত মতান্তর দৃষ্ট হয় । কেহ বলেন,—ব্রহ্মানন্দে মিলনই বিদেহ-মুক্তি ; কেহ বলেন,—স্বরূপে অবস্থানই মুক্তি ; কেহ বলেন,—আত্মাত্মিক দুঃখনিবৃত্তিই মুক্তি । স্থলজ, কাহারও মতে—চিদ্র-আনন্দ-লাভই মুক্তি ; কাহারও মতে—

সুখ-দুঃখের সংশ্লেষ-শূন্যতাই মুক্তি। বেদান্ত বলেন,—ব্রহ্মের সহিত অভিন্নতাই মুক্তি ; “অবিভাগেন দৃষ্টবাৎ।” পতঞ্জলি বলেন,—স্বরূপে অবস্থানই মুক্তি ; “ভদা ত্রষ্টুঃ স্বরূপেইবস্থানম্।” সাংখ্য বলেন,—আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তিহেতু কৃতকৃত্যতাই মুক্তি ; “অত্যন্তদুঃখনিবৃত্ত্যা কৃত-কৃত্যতা।” জ্ঞান বলেন,—আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তিই মুক্তি ; “আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিমুক্তিঃ।” বৈশেষিক বলেন,—পদার্থের সাধর্ম্য-বৈধর্ম্য-জ্ঞান দ্বারা যে দুঃখনিবৃত্তি, তাহাই নিঃশ্রেয়স বা মুক্তি ; “ধর্ম্যবিশেষপ্রযতাদুদ্রব্যগুণকর্মসায়াত্তবিশেষ-সমবয়ানাং পদার্থানাং সাধর্ম্যবৈধর্ম্যাত্যাং তত্তজ্ঞানাং নিঃশ্রেয়সম্।” মীমাংসকের মতে,—কর্মকাণ্ডের দ্বারা স্বর্গাপবর্গ-প্রাপ্তিই সুখলাভ অর্থাৎ মুক্তি। সকলেরই লক্ষ্য যে এক—দর্শনশাস্ত্রসমূহ আলোচনা করিলে তাহাতে আর কোনই সংশয় থাকে না। জন্মাবধি মরণ পর্যন্ত আজীবন অহরহ জীব এই দুঃখ-নিবৃত্তির জন্ত চেষ্টা করিয়া বেড়াইতেছে। মানুষ যে কোনও কর্মই করে, সকলেরই মূল উদ্দেশ্য—দুঃখ-নিবৃত্তি বা সুখ-লাভ। সাংখ্য, পাতঞ্জল, জ্ঞান, বৈশেষিক প্রভৃতি দর্শন এইরূপভাবে সংসারের সেই দুঃখের নিবৃত্তি করিতে চাহেন,—বাহাতে আর কখনও দুঃখের মুখ দেখিতে না হয়। সুখলাভ হউক বা না হউক, সর্বতোভাবে দুঃখের নিবৃত্তি হইলেই মুক্তিলাভ হইল,—প্রধানতঃ ইহাই তাঁহাদের অভিপ্রায়। এক হিসাবে, বৌদ্ধগণের নির্মাণ-মুক্তি এবং সাংখ্য প্রভৃতির আত্যন্তিক-দুঃখ-নিবৃত্তিরূপ মুক্তি একই পর্যায়ভুক্ত বলা যাইতে পারে। বেদান্তের মত কিন্তু তাহা হইতে আর একটু স্বতন্ত্র। বোধ হয়, সে মত—ভুলনায় উচ্চতর। এই জন্তই শঙ্করাচার্য্য বেদান্ত-মতেরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা পাইয়াছিলেন ; এবং সেই জন্তই শঙ্করাচার্য্যের মতের অমুদ্বর্তী হইয়া, মাধ্বাচার্য্য সর্বদর্শন-সংগ্রহ গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন,—“সর্বদর্শনশিরোমণিত্বং শাক্তদর্শনম্।” অর্থাৎ, শঙ্করাচার্য্য-পরিগৃহীত বেদান্তদর্শনই সর্বদর্শনের শিরোমণিরূপ। বেদান্ত-মতকে কেন এতদূর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হইয়াছে, তাহার কারণ অমুসন্ধান করিলেই বা কি দেখিতে পাই ? দেখিতে পাই,—বেদান্ত-দর্শন কেবল দুঃখ-নাশকেই সার বলিয়া মনে করেন নাই ; তাহার মতে,—দুঃখ-নিবৃত্তির পরবর্তী যে আনন্দময় অবস্থা, যে অবস্থায় জীব ও ব্রহ্মের কোনই ভেদাভেদ থাকে না, সেই অবস্থা-প্রাপ্তিই মুক্তি। উপনিষদে আছে,—‘সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মঃ।’ অর্থাৎ, ব্রহ্ম—সত্য-স্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ। কিন্তু তিনি কেমন সত্য, কেমন জ্ঞান, কেমন আনন্দ, বৈদান্তিকগণ তাহারও বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। সংসারে সত্য আছে, জ্ঞান আছে, আনন্দ আছে ; কিন্তু সে সত্য, সে জ্ঞান, সে আনন্দ, বেদান্তের মতে, অপূর্ণ, বিকৃত বা ভ্রান্তি-বূলক। অলঙ্ঘিত স্বর্ঘ্য-প্রতিবিম্ব প্রভা আছে ; কিন্তু সে প্রভা এবং স্বর্ঘ্যমণ্ডলস্থিত প্রভার মধ্যে যে রূপ বিভিন্নতা, সংসারের আনন্দ বা জ্ঞানের সহিত ব্রহ্মানন্দ বা ব্রহ্মজ্ঞানের সেইরূপ পার্থক্য। একই উদ্ভানের একই মৃত্তিকার রস আকর্ষণ করিয়া, বিভিন্ন বৃক্ষের বিভিন্ন ফল বিভিন্ন আহার-বিশিষ্ট হইয়া থাকে ; সেইরূপ, একই ব্রহ্মানন্দ ইহসংসারে কণ্ঠাসুসারে বিভিন্ন জীব বিভিন্ন প্রকার ফল দান করে। বেদান্ত বলেন,—সকল পার্থক্য পরিত্যাগ করিতে হইবে, অধিকণা হইয়া অগ্নিতে মিশিতে হইবে। অনন্ত আনন্দলাপের

আত্মলীন হওয়াই বেদান্তের মুখ্য উদ্দেশ্য । সে হিসাবে জীবের তিন অবস্থা ;—বদ্ধাবস্থা, জীবমুক্তাবস্থা এবং বিদেহমুক্তি বা নির্ভাণাবস্থা । বদ্ধাবস্থার দৃষ্টান্তে পণ্ডিতগণ বলেন,— উহা গঙ্গাজলনিমগ্ন ছিদ্রশূন্য জলপূর্ণ কলসবৎ । অর্থাৎ, কোনও জলপূর্ণ কলসীর মুখ বন্ধ করিয়া গঙ্গাজলের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিলে কলসীর মধ্যস্থিত জল যেমন বিকৃত হইয়া যায়, সংসারাবদ্ধ জীব মায়া-দ্বারা আবদ্ধ হইয়া সেইরূপ বিকৃতি-প্রাপ্ত হয় । জীবমুক্তের দৃষ্টান্তে তাঁহার গঙ্গাজলনিমগ্ন জলপূর্ণ সচ্ছিন্ন কলসের উপমা দিয়া থাকেন । সেরূপ অবস্থায়, ছিদ্র-মধ্য দিয়া কলসীর ভিতর গঙ্গার জল প্রবেশ করে ; এবং প্রবাহ-মুখে কখনও তাহা নির্গত হয়, কখনও বা তাহা সঞ্চিত হয় । ফলে, জীব যখন আপনার সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ রক্ষা করে, তখন তাহার জীবমুক্ত অবস্থা । বিদেহ-মুক্তি-অবস্থা ঐ চুই অবস্থা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক । সে অবস্থায় কলসীর অস্তিত্ব নাই ; সে অবস্থায় জলে জল মিশিয়া সকলই এক হইয়া গিয়াছে ; তখন আর, কতটুকু ব্রহ্ম, কতটুকু জীব, কতটুকু গঙ্গার জল, কতটুকু কলসীর জল,—কোনক্রমেই তাহা উপলব্ধি হয় না । ইহাই বেদান্তের ব্রহ্মানন্দ বা মুক্তি । মুক্তিলাভ করিতে হইলে, তত্ত্ব-জ্ঞানের আবশ্যক,—প্রায় সকল দর্শনেই এই মত প্রতিকলিত । সাংখ্য বলেন,—প্রকৃতি পুরুষের ভেদজ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান । বৈদান্তিকগণের মতে,—জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্মই সত্য, এই জ্ঞানই অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য-জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান । জ্ঞায় বলেন,—প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের আলোচনায়, আত্মা যে শরীর হইতে ভিন্ন—এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় ; তাহাতে মিথ্যা জ্ঞানের উচ্ছেদ ; ফলে, দুঃখ-নিবৃত্তি-রূপ অপবর্ণলাভ । বৈশেষিক মতে,—দ্রব্যাদি সপ্ত পদার্থের তত্ত্ব অবগত হইলে, তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় ; তত্ত্বজ্ঞানে অদৃষ্ট-নাশ ; অদৃষ্ট-নাশে কর্ম্মযোগে দুঃখনিবৃত্তি-রূপ যোক্তপ্রাপ্তি । পতঞ্জলি বলেন,—সুখ-দুঃখ চিন্তের ধর্ম্ম ; আত্মার সহিত তাহার কোনই সম্পর্ক নাই ; তত্ত্বজ্ঞানে চিন্তের শুদ্ধি সম্পন্ন হয় ; আত্মা মুক্তি লাভ করে । মীমাংসকের তত্ত্বজ্ঞান—কর্ম্মকাণ্ডের বিয়-দূরীকরণে ; বৈদিক কর্ম্ম সূচারূপে সম্পন্ন হইলে যে স্বর্ণলাভ হয়, তাহাই মুক্তি । বলিয়াছি তো, মূল বিষয়ে সকল দর্শনকারের মধ্যেই ঐক্য আছে । তবে পার্থক্য মাত্র—জ্ঞান-লাভের উপায়-পরম্পরা-নির্দেশে । কি প্রকারে কোন বিষয়ের জ্ঞান লাভ হয়, এবং সেই জ্ঞান লাভ হইলে কি প্রকারে মুক্তির অধিকারী হইতে পারা যায়,—ভিন্ন ভিন্ন দর্শনে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে তাহার আলোচনা দেখিতে পাই । কপিল বলেন,—প্রকৃতিাদি পঞ্চবিংশ পদার্থে জগতের সৃষ্টি ; সেই পঞ্চবিংশতি পদার্থের পার্থক্য-তত্ত্ব অবগত হইতে পারিলেই দুঃখনিবৃত্তি হয় । বাদরায়ণের বেদান্ত-মতও প্রায় ঐরূপ । তবে, কপিল যাহাকে প্রকৃতির বিকৃতি বলিয়াছেন, বাদরায়ণ তাহাকে ‘মায়া’ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন । পৌত্তম ষোড়শ পদার্থ স্বীকার করিয়া কপিলের পঞ্চবিংশ পদার্থকে তাহারই অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন । কণাদ সপ্ত পদার্থ মাত্রের উল্লেখ করিয়া আর যত কিছু তাহারই মধ্যে পর্য্যবসিত করিয়াছেন । ইহাতে বুঝা যায়,—কেহ সংক্ষেপে, কেহ বিস্তৃত-ভাবে, কেহ সূত্রাকারে, কেহ ব্যাখ্যায় ভাবে, আপন আপন মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন ; নতুন, মূল বিষয়ে পার্থক্য বিশেষ কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না । দৃষ্টান্তহলে ব্যাকরণের

সৃষ্টির বিষয় উল্লেখ করিতে পারি। পাণিনির তিনটী সূত্র কলাপের একটি সূত্রে গ্রথিত আছে ; যুদ্ধবোধেও ঐ সকল সূত্র অধিকতর সংক্ষিপ্তভাবে দেখিতে পাই। উহাও যেরূপ প্রকার-ভেদ মাত্র, দর্শনকারগণের পদার্থ-সংখ্যা-নিরূপণও সেইরূপ প্রণালীভেদ-বিশেষ। সংসারে আসিয়া জীবদেহ-ধারণে কর্মভোগ-সম্বন্ধে সকল দর্শনকারই অমৃষ্ট বা কর্মফল স্বীকার করিয়াছেন। কর্মফলভোগের জন্য জীব সংসারে গমনাগমন করে, তাহার সেই সংসরণ বা গমনাগমন কি প্রকারে রুদ্ধ হয়,—স্থূলভঃ দর্শনশাস্ত্রসমূহের তাহাই প্রতি-পাদ্য। সেই অবস্থাই—মুক্তির অবস্থা। সেই মুক্তির পথ দেখাইতে গিয়া, সকল দর্শনকারই ব্রহ্মতত্ত্ব, বিখ্যতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব এবং পরলোকতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন। স্থূলভঃ, এই তত্ত্বচর্চায় লইয়াই দর্শন-শাস্ত্র।

ভারতীয় দর্শন-সমূহের সহিত পাশ্চাত্য-দর্শনের বহু বিষয়ের ঐক্য আছে, আবার বহু বিষয়ের পার্থক্যও আছে। প্রথমতঃ সাংখ্যের বাহ্য প্রকৃতি, পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের

‘ম্যাটার’ (Matter), ‘এলিমেন্ট’ (Element), ‘ইথার’ (Ether),
প্রাণ ও
পাশ্চাত্য-দর্শন। ‘প্রোটাইল’ (Protyle) প্রকৃতি তাহারই নামান্তর মাত্র। সাংখ্য মতে,—

প্রকৃতির উৎপত্তি ও বিনাশ নাই; হার্বার্ট স্পেন্সার বলেন,—‘ম্যাটার’
কখনও উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয় না। অপিচ, প্রকৃতির বিকৃতিই যে সৃষ্টির কারণ, হার্বার্ট স্পেন্সার তাহাও স্বীকার করিয়া বলেন,—“ম্যাটারের অবস্থার পরিবর্তন হয়;—সেই পরিবর্তনই সৃষ্টি-বিশেষ।” এ হিসাবে, ডারউইনের বিবর্তবাদ (Evolution Theory) এবং সাংখ্যের প্রকৃতির বিকৃতি অভিন্ন বলিয়াও মনে হয়। ডারউইন বলেন,—‘নানা জাতীয় তরু-লতা এবং পশু-পক্ষী কখনই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সৃষ্ট হয় নাই; জাগতিক পদার্থের পুনঃপুনঃ অবস্থান্তর-বশতঃ তাহারা নানা রূপে প্রকটিত হইতেছে।’ পরিবর্তনের দ্ব্যতিপাতে বানর হইতে বনমানুষ এবং বনমানুষ হইতে মানুষের উৎপত্তি হয়,—ইহাই ডারউইনের মত বলিয়া প্রচারিত। সুতরাং সাংখ্যোক্ত প্রকৃতির বিকৃতি-রূপ ভিত্তির উপর ডারউইনের বিবর্তবাদ প্রতিষ্ঠিত, তাহা বলাই বাহুল্য। * সার উইলিয়াম ক্রুকস আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ। তিনি বলেন,—সকল পদার্থের উপর ‘প্রোটাইল’ অবস্থিত। তাহাই জগতের প্রধান উপাদান; অজ্ঞাত পদার্থের সহিত তাহার দ্ব্যতিপাতে সৃষ্টি-কার্য সম্পন্ন হয়। সে হিসাবে, ‘প্রোটাইল’ আদি-পদার্থ এবং প্রকৃতি ভিন্ন তাহাকে অল্প কিছু বলিয়া মনে করা যায় না। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ বহুদিন হইতে ‘এলিমেন্ট’ বা ভূত-সমষ্টির সম্বন্ধে পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের হিসাবে, সেই ভূত-সংখ্যা কখনও পঁয়ষট্টিটি, কখনও চৌষট্টিটি, কখনও ষাটটি; কখনও বা তাহার কমবেশী দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ মূল উপাদান চারিটি ;—বায়ু, জল, মৃত্তিকা, অনল ; অধিকন্তু, বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার যে সকল পার্থিব সামগ্রী প্রস্তুত হয় না, তাঁহাদের মতে, সেই সেই সামগ্রীও ‘এলিমেন্ট’। বলা বাহুল্য, বস্তুই বাহ্য দেখিতে পাই, সকলই

নাথের প্রভেদ মাত্র। নচেৎ, ভূত-সম্বন্ধে হিন্দু-দর্শনকারগণের মধ্যেও সংখ্যার যে ভারতম্য দৃষ্ট হয়, উহাও তদনুরূপ। ফলে, প্রকৃতির বিকৃতি-বশতঃ সৃষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়—এই সামান্য-মতের সহিত পাশ্চাত্য-মতের প্রায়ই অভিন্নতা দৃষ্ট হয়। মহর্ষি কণাদ যে পরমাণু-তত্ত্ব প্রচার করেন, পাশ্চাত্যের ‘য়াটম’ (Atom) ও ‘য়াটমিক থিওরি’ (Atomic Theory) অনেকাংশ তাহারই সহিত সাদৃশ্য-সম্পন্ন। উক্ত মতাবলম্বিগণ বলেন,—সৃষ্টি-কর্তার সাহায্য না লইয়া, পরমাণু-সমূহের ক্রিয়ায় সৃষ্টি-কার্য সম্পন্ন হয়। ইউরোপে প্রথমে গ্রীস-দেশীয় দার্শনিক ডেমক্রেটাস এই পরমাণুবাদ-তত্ত্ব প্রচার করেন; পরিশেষে এপিকিউরাস কর্তৃক সেই পরমাণুবাদ অধিকতর প্রতিষ্ঠা দ্রষ্ট হয়। সে হিসাবে, ৫১০ পূর্ব-খৃষ্টাব্দ হইতে ইউরোপে পরমাণুবাদ-তত্ত্বের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অবশেষে অষ্টাবিংশ শতাব্দীতে রসায়ন-বিজ্ঞানের আলোচনার জন ডাল্টন এই পরমাণু-তত্ত্বকে এক অভিনব বৈজ্ঞানিক অবয়ব প্রদান করিয়া ইংলণ্ডে আপন কীর্তিস্তম্ভ স্থাপন করেন।† দৈবের অস্তিত্বে প্রমাণাতাব এবং তাঁহার সৃষ্টি-কর্তৃত্বে মতান্তর,—কপিলাদির দর্শন-শাস্ত্রে যেরূপভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, পাশ্চাত্য দর্শনকারগণের মধ্যেও তাহারই প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাই। দৈবর আছেন; কিন্তু তাঁহার অস্তিত্বের প্রমাণাতাব,—জন ষ্টুয়ার্ট মিল ঠিক এইভাবেই দৈবকে স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে,—“সৃষ্টি-কার্য দেখিয়া দৈবের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় বটে; কিন্তু তাহাতে তাঁহার সর্বজ্ঞতা বা সর্বশক্তিমানতা সপ্রমাণ হয় না। তিনি যদি সর্বশক্তিমান হইতেন, তাহা হইলে সৃষ্টিকার্য্য-সম্বন্ধে সংসারের কোণেলের কখনই আবশ্যক হইত না। তিনি সর্বশক্তিমান হইলে, সংসারের কেহ সুখী, কেহ দুঃখী হইত না; তাহা হইলে, মহামারীতে বা প্রলয়ে জীবের ধ্বংস ঘটিত না; তাহা হইলে, কখনই পাপীর প্রাধান্ত ও পুণ্যবানের ক্লেশ দেখিতাম না। ইহাতে দৈবকে সর্বশক্তিমান বলিয়া তো মনেই হয় না; পরন্তু তিনি দয়াবানও নহেন। তিনি সর্বশক্তিমান হইলে, সর্বজ্ঞ হইলে, তাঁহার এত কোণেলের সৃষ্টি কখনও কণভঙ্গুর হইত কি?” হার্বার্ট স্পেন্সার বলেন,—“দৈবের ইচ্ছায় জগতের সৃষ্টি হইয়াছে কিনা, তাহা নির্ণয় করা যায় না; জগতের কারণ অজ্ঞাত, দৈবর জ্ঞানাভীত।” প্রমাণাদি সম্বন্ধে, পূর্বেই বলিয়াছি, পাশ্চাত্য-দর্শনকারগণ প্রায়ই প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই বিবিধ প্রমাণ মাত্র করেন। চার্লস্‌কাডি প্রত্যক্ষ-বাদীরা যেমন বলেন,—“অনুমান প্রমাণের মূল—প্রত্যক্ষ”; তাহার। যেমন দৃষ্টান্ত দ্বারা বুকাইয়া দেন,—“অন্ধকার গৃহে পুষ্পের দ্রাণ পাইলে, পুষ্প না দেখিয়াও লোকে তাহাকে পুষ্পের দ্রাণ বলিয়া যে অনুমান করে, তাহার কারণ,—পূর্বে সেইরূপ পুষ্পের দ্রাণ তাহার প্রত্যক্ষ হইয়াছিল; সুতরাং প্রত্যক্ষই সর্বমূল্যধার।”—মিল, বেইন, হিউম প্রভৃতির মত প্রায়ই এইরূপ। তবে এ বিষয় লইয়াও অনেক সময় ভর্ক বিভর্ক দেখিতে পাওয়া যায়। এক-পক্ষ বলেন,—“বাহ্য দেখিতে পাই, তাহাই যদি প্রমাণ হয়, তাহা হইলে কাল, আকাশ প্রভৃতির প্রমাণ কোথায়?” ইহার উত্তরে অপর পক্ষ সমান্তরাল রেখার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেন। তাহার। বলেন,—“সমান্তরাল রেখার মিল হয় না দেখিতে পাই; কিন্তু সকল

† John Dalton's Atomic Theory in the New System of Chemical Philosophy.

কালের সকল সমান্তরাল রেখাই কি মহুয়ের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে? সুতরাং বুঝিতে হয়,— দুই একটা দৃষ্টান্ত দেখিয়া যে জ্ঞান সকার হয়, তদ্বারা আমরা অপরাপর বিষয়ের সিদ্ধান্ত করিয়া লই। সে হিসাবে, প্রত্যক্ষ ভিন্ন অজ্ঞাপ্রাপ্ত জ্ঞান লাভ হয়।” বাহা হউক, এ সকল বিষয়ে হিন্দু দর্শনকারগণ বিচার-বিতণ্ডার ক্রটি করেন নাই, এবং শেষে তাঁহারা প্রত্যক্ষ ও অনুমান ভিন্ন অজ্ঞাপ্রাপ্ত প্রমাণের সার্থকতা উপলব্ধি করিয়াছেন। মিল কার্য-কারণের সম্বন্ধের বিষয় স্বীকার করেন। হার্কার্ট স্পেন্সার পুরুষাভুতক্রমিক সংস্কারের পক্ষপাতী। হিউম ও বার্কলের মতে,—‘বাহা ইন্দ্রিয়-জ্ঞান-সাপেক্ষ, তাহাই পদার্থ।’ কান্ট বলেন,—“বাহুবলু আত্মায় প্রতিভাত না হইলে, তৎসম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান জন্মে না। সেই জ্ঞানের ফলেই পদার্থ-তত্ত্ব উপলব্ধি হয়।” বলা বাহুল্য, এই দুই মতই কপিলের মানস-প্রত্যক্ষের অন্তর্ভুক্ত। বাচস্পতি মিশ্র সাংখ্যের চীকায় এই ভাবটী একটা সুন্দর দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন,—গ্রাম্য-পকায়ৎ কর-সংগ্রহ করিয়া, বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করেন; তাহার নিকট হইতে ক্রমশঃ উচ্চ উচ্চতর শাসন-কর্তার হস্তে তৎসমুদয় জ্ঞাত হয়; এবং পরিণেবে রাজা সেই কর গ্রাপ্ত হন। পদার্থ-বিষয়ক জ্ঞানও তদ্রূপ। প্রথমে বাহ্যেন্দ্রিয়ে, তৎপরে জ্ঞানেন্দ্রিয়ে এবং পরিণেবে আত্মায় ঐ জ্ঞান উপনীত হয়।” প্লেটো ও কান্টের ‘আইডিয়ালিজম্’ (Idealism) এবং বেদান্তের মায়াবাদে বিশেষ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ফরাসী দার্শনিক ডেকার্টে আত্মার অস্তিত্ব-সম্বন্ধে ‘কজিটো আর্গো সম’ (Cogito ergo sum) অর্থাৎ, ‘আমি চিন্তা করিতেছি, অতএব আমার সত্তা আছে’,—এই মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সাংখ্য বেদান্তাদি দর্শনে এই আত্মত্ব ঠিক এমনইভাবে বিশদীকৃত হইয়া আছে। সাংখ্যের দুঃখবাদ,—সোপেনহেরের ‘পেসিমিজম্’ (Pessimism); বৌদ্ধগণের নির্বাণ,—মায়ার মেশারের ‘র্যাব্জরসন’ (Absorption); জ্ঞানের অতোজ্ঞাত্রয় দোষ,—পাশ্চাত্য ‘লজিক’ বা জ্ঞানের ‘পেটিশিয়ো প্রিন্সিপিয়া’ (Petitio Principii); বেদান্তের ব্রহ্মবাদ,—পাশ্চাত্য-দর্শনের ‘পান্থিসম্’ (Pantheism); ইত্যাদি। প্রাচ্য-দর্শনের সহিত পাশ্চাত্য-দর্শনের এইরূপ বহু বিষয়ে সাদৃশ্য থাকিলেও, একটা বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হয়। সে বিষয়টী—অদৃষ্ট বা কর্মফল। এক হিন্দু ভিন্ন জগতের অস্ত্র কোনও জাতি এই কর্মফল-তত্ত্বের মহাত্ম্য প্রচার করেন নাই। সৃষ্টি যে কর্মফলমূলক, এ সিদ্ধান্তও অজ্ঞাত দৃষ্ট হয় না। বাহা হউক, ইউরোপের নানা ভাষায় ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্র-সমূহ এখন অনুবাদিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ঈশ্বরকৃষ্ণের “সাংখ্যাকারিকা”—লাসেন ল্যাটিন-ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন, উইণ্ডিস্ম্যান ও লরিন্সার কর্তৃক জর্মন ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে, প্যাণ্ডিয়ার ও সেণ্ট হিলিয়ার ফরাসী-ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন,—কোলক্রক, উইলসন ও ডেভিস কর্তৃক ইংরেজী ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। কেবল সাংখ্য-কারিকা বলিয়া নহে; অজ্ঞাত দর্শনও নানারূপে ভাষান্তরিত ও আলোচিত হইতেছে। ম্যাকমুলার, কোলক্রক, মনিয়র উইলিয়মস্, ডেভিস, ডাইসেন প্রভৃতির গ্রন্থে তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।*

* (1) Max Muller's *Six Systems of Indian Philosophy*, (2) Colebrooke's *The Philosophy of the Hindus*, (3) Monier Williams' *Indian Wisdom*, (4) Davies's *Hindu Philosophy*, প্রভৃতি।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ ।

স্মৃতি ।

[স্মৃতি বা ধর্মসংহিতা,—মহাদি বিংশতি সংহিতার পরিচয়,—সংহিতার সময়-নির্দেশে পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের মতালোচনা,—‘স্মেচ্ছ’ শব্দ ও ‘স্মেচ্ছ-দেশ’ প্রসঙ্গ,—মহুসংহিতা,—বিভিন্ন মহু,—মহুসংহিতার বিষয়-পরম্পরা,—মহুর শিষ্য কর্তৃক মহুসংহিতা প্রচার,—মহুসংহিতার দ্বাদশ অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ,—স্মৃতিতত্ত্ব,—ব্রাহ্ম-ধর্ম, রাজা-প্রজার সম্বন্ধ, রাজধর্ম,—দায়ভাগ ও দ্বাদশবিধ পুত্র,—বর্ণবিশেষের তপস্যা ও মোক্ষলাভ,—অত্রি-সংহিতা,—ইষ্ট-পূর্ত-কাণ্ডে মোক্ষলাভ,—বর্ণধর্ম-কখন,—সহমরণ-প্রসঙ্গ,—বিষ্ণুসংহিতা,—সংহিতার নামকরণ ও বিশেষত্ব,—চতুর্কর্ণের কর্মবিভাগ,—বিচার-বিবরণ,—লক্ষ্মীর বসতি-স্থান,—হারীত-সংহিতা,—স্মৃতি-প্রসঙ্গ,—নারসিংহ-পূজা,—যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা,—দায়ভাগ ও মিতাক্ষরার সার সামগ্রী,—উশনঃ-সংহিতা,—অশৌচ-বিধি, আত্মপদ্ধতি, ভক্ষ্যভক্ষ্য বিচার, প্রায়শ্চিত্ত,—ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বর ও ঐশ্বর্যের আধার্য কীর্তন,—সমুদ্র-যাত্রা নিবেদ,—অঙ্গিরঃ-সংহিতা,—প্রায়শ্চিত্ত ও ব্রাহ্মধর্মের প্রসঙ্গ,—যম-সংহিতা,—বিধি-নিষেধাদি,—আপত্তব্রহ্মসংহিতা,—প্রায়শ্চিত্ত বিধি,—সংবর্ত-সংহিতা,—খাদ্যাখাদ্যবিচার,—কাত্যায়ন-সংহিতা,—গণেশ-পূজা,—গৌরীপূজা প্রভৃতি,—বৃহস্পতি-সংহিতা,—দান-ধর্ম,—বাপীকৃতভাগ প্রতিষ্ঠার পুণ্যকথা,—পরশুর-সংহিতা,—কলিশাস্ত্র,—গৃহস্থালী ও সমাজ সম্পর্কীয় কথা,—বিধবার কর্তব্য-প্রসঙ্গ,—ব্যাস-সংহিতা,—গৃহস্থের নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া,—শঙ্খসংহিতা,—গরাক্ষেত্রাদি ভীতের মাহাত্ম্য,—বিবাহাদি প্রসঙ্গ,—লিখিত-সংহিতা,—কান্বী-গর্য-তীর্থ,—বৃষোৎসর্গ,—দক্ষসংহিতা,—সর্ববর্ণের কর্তব্য-নির্ধারণ,—গৌতম-সংহিতা,—রাজধর্ম,—শাতাতপ-সংহিতা,—রুদ্র, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, যম, বাহুদেব, সন্ন্যস্তী প্রভৃতির প্রসঙ্গ,—কর্মবিপাক,—বশিষ্ঠ-সংহিতা,—আচার-প্রসঙ্গ,—বিবাহ, আয়ুর্বিদ্যা,—সংহিতা-সমূহের সমালোচনার সামাজিক চিত্র,—কাল-বিচার,—রঘুনন্দনাদির স্মৃতিতত্ত্ব ।]

আর্য্য-হিন্দুগণের প্রতিষ্ঠার আর এক পরিচয়—স্মৃতি । স্মৃতি বা ধর্মসংহিতা হিন্দু-সমাজের মেরুদণ্ডস্বরূপ । স্মৃতি অনুসারে আজিও হিন্দু-সমাজ পরিচালিত হইয়া থাকে ।

স্মৃতি পণ্ডিতগণ বলেন,—দর্শন-শাস্ত্রের আলোচনায়, ভ্রান্ত-বুদ্ধি জনগণের চিত্ত যখন বিভিন্ন পথে প্রধাবিত হয়,—জ্ঞানকাণ্ডের বিভিন্নমুখী শাখা-ধর্ম-সংহিতা ।

পল্লবে আবার যখন কর্মকাণ্ড আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে,—জনহিত-পরায়ণ ঋষিগণ তখন শ্রুতান্ত্র ধর্মোপদেশসমূহ সংহিতাকারে প্রচার করেন । বহু পূর্বে ধর্মসূত্র-সমূহে অক্ষুর-রূপে যে উপদেশ-পরম্পরা নিহিত ছিল, স্মৃতিরূপে এইবার তাহা পল্লবিত মুকুলিত হয় । পূর্ব-বিষয়ের অমূল্যত্ব বলিয়া উহার নাম স্মৃতি (‘স্ম’=স্মরণ+ভাবে ‘ক্তি’) । এই স্মৃতির সহিত স্মৃতির সম্বন্ধ অভিন্ন বলিয়া শাস্ত্রকারগণ স্মৃতি ও স্মৃতিকে ব্রাহ্মণের দুই চক্ষুরূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন ।* এই স্মৃতি বা ধর্ম-সংহিতার সংখ্যা—বিংশতি । সেই বিংশতি সংহিতার নাম—(১) মহু, (২) অত্রি, (৩) বিষ্ণু, (৪) হারীত, (৫) যাজ্ঞবল্ক্য, (৬) উশনঃ, (৭) অঙ্গিরঃ, (৮) যম, (৯) আপত্তব্রহ্ম, (১০) সংবর্ত, (১১) কাত্যায়ন, (১২) বৃহস্পতি, (১৩) পরাশর, (১৪) ব্যাস, (১৫) শঙ্খ, (১৬) লিখিত, (১৭) দক্ষ, (১৮) গৌতম, (১৯) শাতাতপ, (২০) বশিষ্ঠ । প্রধানতঃ

* “স্মৃতিঃ স্মৃতিশ্চ বিজ্ঞানং ব্রহ্মণে ক্রম প্রকীর্ণিতে ।”—অত্রিসংহিতা ।

উল্লিখিত বিংশতি সংহিতা অধুনা প্রচলিত হইলেও, পরাশর-সংহিতায়, যম, রুহ্মপতি ও ব্যাস-সংহিতার পরিবর্তে, কল্পপ, গর্গ ও প্রচেতা সংহিতার নাম দৃষ্ট হয়। * যাহা হউক, স্মৃতি-সমূহে ধর্ম-কর্ম, আচার-ব্যবহার, রাজনীতি প্রভৃতির পরিচয় বিশদ-ভাবে বর্ণিত আছে। তাহাতে হিন্দু-সমাজের—আর্য্য-সভ্যতার—একটি বিশদ চিত্র প্রতিফলিত দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্মৃতি-শাস্ত্রসমূহ কোন্ সময়ে প্রবর্তিত হইয়াছিল, তাহার বিশেষ কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না; সুতরাং যাহার মনে যাহা উদয় হয়, তিনি সেই ভাবেই উহার সময়-নির্দেশ করিয়া থাকেন। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের মধ্যে স্মর উইলিয়ম জোন্সের মতে—খৃষ্ট-জন্মের ১২৮০ বৎসর পূর্বে মহাসংহিতা বিরচিত হইয়াছিল। কোনও কোনও আধুনিক পণ্ডিতের সিদ্ধান্তে—বৌদ্ধযুগে মহাসংহিতার প্রচলন হয়। কেহ কেহ আবার বলেন—সংহিতাসমূহের উৎপত্তি পূর্ববর্ত্তি-কালে হইলেও, ভারতে মুসলমান-শাসনের সময়ে উহার মধ্যে অনেকাংশ নূতন সংযোজিত হইয়াছে। পণ্ডিতগণের এইরূপ সিদ্ধান্তের হেতুবাদ,—সংহিতা-সমূহের নানা-স্থানে স্লেচ্ছ-শব্দের উল্লেখ আছে; কোথাও স্লেচ্ছদেশে গমনের ও স্লেচ্ছদেশে শ্রাক-কার্য্যের নিন্দাবাদ আছে; কোথাও বা স্লেচ্ছ-ভাষা শিক্ষায় নিষেধ করা হইয়াছে।† সংহিতাদির এইরূপ কাল-নির্ণয় সম্বন্ধে অবশ্য সাদ-প্রতিবাদ দেখিতে পাওয়া যায়। যাহারা ‘স্লেচ্ছ’ শব্দ দেখিয়া মুসলমান শাসন-সময়ে উহা রচিত হইয়াছিল বলিয়া স্থির করেন, তাহাদের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদচ্ছলে কয়েকটি আপত্তি উত্থাপিত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ, আপত্তিকারিগণ বলেন,—স্লেচ্ছ-শব্দে মুসলমানদিগকে বুঝায় না। ‘স্লেচ্ছ’-শব্দের অর্থ,—শিষ্টাচারহীন অসভ্য জাতি-বিশেষ। চাতুর্ধর্ষ্য-ব্যবস্থা-রহিত যে দেশ, সে হিসাবে, তাহাই স্লেচ্ছদেশ।‡ সুতরাং, আর্য্য-হিন্দুগণের প্রতিষ্ঠার দিনে যে দেশ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্য পালন করিত না, সেই দেশই তখন ‘স্লেচ্ছদেশ’ নামে অভিহিত ছিল। ৫৭০ খৃষ্টাব্দে মুসলমান-ধর্ম্য-প্রবর্ত্তক মহম্মদ জন্মগ্রহণ করেন; মহম্মদীয়-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তনা—তাহার পরবর্ত্তি-কালের ঘটনা। সে হিসাবে মুসলমান-গণের ভারতাবধিকার সেদিনের ঘটনা বলিলেও অত্যাুক্তি হয় না। কিন্তু তাহার কত পূর্ব্বের শাস্ত্রগ্রন্থাদিতে ‘স্লেচ্ছদেশ’ ও ‘স্লেচ্ছ’-শব্দের উল্লেখ আছে। সুতরাং, সংহিতায় ‘স্লেচ্ছ’ শব্দের ব্যবহার আছে বলিয়া কখনই উহা মুসলমান-শাসনাবধিকারের সময় রচিত হইয়াছিল বলা যায় না। যদি মুসলমান-শাসনাবধিকারে কোনও সংহিতা রচিত হইত, তাহা হইলে ‘মুসলমান’ ‘ইসলাম’ ‘মহম্মদ’ প্রভৃতি শব্দও উহাতে সন্নিবিষ্ট থাকার সম্ভাবনা ছিল। হরিবংশ, মহাভারত এবং কোনও কোনও পুরাণের পরবর্ত্তি-কালে

* পরাশর-সংহিতায় প্রথম অধ্যায়ের ১০শ হইতে ১৫শ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

† অত্রি-সংহিতার ১৮০ ও ১৮১ শ্লোকে স্লেচ্ছজাতির নিন্দা, বিষ্ণু-সংহিতার ৮৪শ অধ্যায়ে স্লেচ্ছ-দেশে গতিবিধি-গমনাগমন এবং স্লেচ্ছ-দেশে শ্রাক-কার্য্যে নিন্দাবাদ, ব্যাস-সংহিতার প্রথম অধ্যায়ে অখাদ্যাদ্যাদ-গণকে অত্যাজ নাম প্রদান এবং শঙ্খ-সংহিতার চতুর্দশ অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে স্লেচ্ছ দেশে গমন ও আশ্রম নিষেধ প্রভৃতিই ইহার হেতুবাদ। বশিষ্ঠ-সংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে, “ন স্লেচ্ছভাষাং শিক্ষেৎ”—এইরূপ উক্তি আছে।

‡ “চাতুর্ধর্ষ্যং ব্যবস্থানং যস্মিন দেশে ন বিদ্যতে।”

কোনও কোনও সংহিতা সঙ্কলিত হইয়াছিল, অনেকে তাহারও প্রমাণ দেখাইয়া থাকেন ; শাভাসপ সংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের একত্রিংশৎ এবং সপ্তত্রিংশৎ শ্লোকে ‘হরিবংশ ও মহাভারত পাঠ করিয়া শুদ্ধ হইবে’—এইরূপ উক্তি আছে, ইত্যাদিই তাঁহাদের তেতুবাদ ।

স্বৃতি বা ধর্ম-শাস্ত্রের মধ্যে মনুসংহিতা প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে । ‘মনু’-নামের সহিতই কত স্বৃতি বিজড়িত । ব্রহ্মার পুত্র মনু, মনুজাতির আদি-পুরুষ মনু, স্বায়ম্ভুবাди চতুর্দশ মনু, সূর্য্য-পুত্র মনু, পৃথিবীর প্রথম রাজা মনু, ধর্ম্মসূত্র-মনুসংহিতা । প্রাণেতা মনু,—মানব-জাতির সহিত মনুর সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন । সুতরাং

কোন মনু কর্তৃক কোন সময়ে মানব-ধর্ম্ম-সংহিতা প্রবর্তিত হইয়াছিল, কে তাহা নির্ণয় করিবে ? লিখিত আছে, সংসারীর জাতব্যা ও কর্তব্য সম্বন্ধে মহর্ষি মনু তাঁহার শিষ্যগণকে যে উপদেশ দিয়া গিয়াছিলেন, মনুসংহিতার পরবর্ত্তি-কালে তাঁহার শিষ্যগণ তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন । এই সংহিতায়, জগতের উৎপত্তি বিবরণ, জাতকর্ম্মাদি সংস্কার-বিধি, ব্রহ্মচর্য্যের বিবরণ, গুরুর প্রতি অভিবাदन ও স্নান-বিধি, দারাদিগমন, বিবাহ ও বিবাহের লক্ষণ, মহাযজ্ঞবিধান, সনাতন শ্রাদ্ধ-কল্প, ব্রাহ্মণাদি চতুর্ধর্নের জীবিকার লক্ষণ, গৃহস্থের কর্তব্য, ভক্ষ্যভক্ষ্য-বিচার, শৌচ, দ্রব্যাদি শুদ্ধির বিধি, স্ত্রী-ধর্ম্ম, যতি সন্ত্যাসী ও রাজগণের ধর্ম্ম, ঋণদানাদির বিচার-নির্ণয়, শাস্ত্রাদিগের প্রশ্ন-বিধান, স্ত্রী-পুরুষের ধর্ম্ম, দায়ভাগ, দ্যুতক্রীড়া, তত্ত্বাদির দণ্ডবিধান, বৈশ্ব-শূদ্রের কর্তব্য-বিধান, সন্ধার জাতি-সমূহের উৎপত্তি-বিবরণ, চতুর্ধর্নের আপদ্রর্ম্ম, প্রায়শ্চিত্ত-বিধি, কর্ম্ম-জনিত দেহান্তর-প্রাপ্তিরূপ উত্তম-মধ্যম-অধম প্রভৃতি ত্রিবিধ গতি, মোক্ষোপায়, কর্ম্মসমূহের দোষ-গুণ, দেশধর্ম্ম, জাতিধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম এবং বেদবিরোধী পায়গুণের ধর্ম্ম প্রভৃতির বিষয় আলোচিত হইয়াছে । মনুসংহিতা—মহর্ষি মনু প্রণয়ন করিয়া গিয়াছিলেন, অনেকেই এইরূপ বিশ্বাস করেন । কিন্তু বাস্তবপক্ষে তাহা নহে । মনুসংহিতা আলোচনা করিলে দেখা যায়,—মহর্ষি মনু আপন শিষ্যগণকে যে শাস্ত্র-তত্ত্ব উপদেশ দিয়াছিলেন, বহুকাল পর্য্যন্ত মুখে মুখে তাহা প্রচলিত ছিল ; পরিশেষে তাঁহার কোনও শিষ্য কর্তৃক তাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছিল । বর্ত্তমান মনুসংহিতা যে মনু কর্তৃক লিখিত সংহিতা নহে, মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে তাহা বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় । মহর্ষি মনুর কোনও শিষ্য পরবর্ত্তি-কালে ঐ সংহিতা-শাস্ত্র যে ভাবে বর্ণনা করিতেছেন, তাহা হইতেই প্রোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি । সংহিতার প্রথম অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে শিষ্য বলিতেছেন,—“যবেদমুক্তবান্ শাস্ত্রং পুরা পৃষ্টো মনুযয়া । তথৈব ব্রহ্মপাত্ত মৎসকাশানিবোধত ॥” অর্থাৎ,—“পুরাকালে ভগবান মনু আমার প্রশ্নের উত্তরে আমাকে যাহা বলিয়াছিলেন, আমি যথাযথভাবে সেই শাস্ত্র আপনাদিগের নিকট ব্যক্ত করিতেছি,—আপনারা শ্রবণ করুন ।” মনুসংহিতার শেষ শ্লোকেও দৃষ্ট হয়,—“ইতোতন্মানবং শাস্ত্রং ভৃগুপ্রোক্তং পঠনু দ্বিজঃ ।” অর্থাৎ, মহর্ষি মনুর শিষ্য ভৃগু কর্তৃক যে শাস্ত্র বিবৃত হইয়াছিল, তাহাই এই মনুসংহিতা আখ্যা প্রাপ্ত হয় । ইহাতে আরও বুঝা যায়,—এই ভাবে বহুকাল পর্য্যন্ত প্রতি-পরম্পরায় চলিয়া আসিয়া পরিশেষে ইহা বর্ত্তমান আকার প্রাপ্ত হইয়াছে । সে উপদেশ, প্রথমে সূত্রাকারে

‘মানব ধর্ম্মশূত্র’ নামে পরিচিত ছিল, শেষে সংহিতাকারে এইরূপে গ্রথিত হইয়া আসিয়াছে। পূর্বাপর সামঞ্জস্য রাখিতে হইলে, এতদতিরিক্ত অল্প কিছু বলিতে পারা যায় না। মনুসংহিতা বেদান্তগত ; উহাতে বেদ-বিহিত ধর্ম্মই পরিকীর্ণিত হইয়াছে ;

“বেদার্থোপনিবন্ধাচ্চ প্রাধান্যং হি মনোঃস্মৃতেঃ । মনুর্ধ্ববিপরীতা চ বা স্মৃতিঃ সা ন শততে ॥”

স্মৃতির মনু-স্মৃতির প্রাধান্য সর্বপ্রকারেই প্রতিপন্ন হয়। মনুসংহিতা দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। সেই দ্বাদশ অধ্যায়ে সর্বসমেত দুই সহস্র সাত শত চারিটি শ্লোক আছে। অধ্যায়-সমূহে সংক্ষেপে নিম্নলিখিত বিষয়-সমূহ আলোচিত হইয়াছে ;—প্রথম অধ্যায়ে—মুনিগণের ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা, তৎসম্বন্ধে মনুর প্রত্যুত্তর, সৃষ্টি-প্রকরণ, মনুর আদেশে ভৃগু-কর্তৃক মানব-ধর্ম্ম-কথন, দৈববাদি কাল-নির্ণয়, বর্ণ-ধর্ম্ম-কথন এবং গ্রহের অমুক্রমণিকা ; দ্বিতীয় অধ্যায়ে—ধর্ম্মের চতুর্বিধ প্রমাণ-প্রসঙ্গ, ব্রহ্মচর্য্য-বিধি, শিষ্যগণের কর্তব্য, গুরুজনাদির অতিবাদন-প্রক্রিয়া ; তৃতীয় অধ্যায়ে—চাতুর্ভুজের বিবাহ-প্রণালী, ব্রাহ্মদিগে অষ্টবিধ বিবাহের লক্ষণ, পঞ্চ মহাব্রত, আতিথি-সংকার, শ্রাদ্ধাদির নিত্যত্ব কথন ; চতুর্থ অধ্যায়ে—উৎসর্গের রীতি প্রভৃতি জীবিকা-সংস্থানোপায়, গার্হস্থ্য-নিয়ম ; পঞ্চম অধ্যায়ে—ভক্ষ্যভক্ষ্য-বিচার, অশোচ-নির্ণয়, দ্রব্য-গুণি এবং স্ত্রী-ধর্ম্ম-কথন ; ষষ্ঠ অধ্যায়ে,—আশ্রম-ধর্ম্মের বিধি-ব্যবস্থা ; সপ্তম অধ্যায়ে,—রাজধর্ম্ম এবং রাজ্যরক্ষার উপায়াদি বর্ণন ; অষ্টম অধ্যায়ে,—ব্যবহার-দর্শন-নিয়ম, অষ্টাদশ বিবাদ-পদাদি-কথন, সাক্ষি-বিবরণ, দণ্ড-নির্ণয়, রাজ-দণ্ডের পাপ-নাশকতা ; নবম অধ্যায়ে,—স্ত্রী-পুরুষের ধর্ম্ম-বিচার, দায়-বিভাগ, দাতৃকৃত্য, চৌর্য্যাদি নিরাকরণোপায় এবং বৈশ্ব-শূদ্রের কর্তব্য নির্ধারণ ; দশম অধ্যায়ে,—সম্বৎসর-বর্ণের উৎপত্তি, বর্ণ-চতুষ্টয়ের বৃত্তি-নিরূপণ ; একাদশ অধ্যায়ে,—প্রায়শ্চিত্ত-বিধি ; দ্বাদশ অধ্যায়ে,—কন্যাস্বামীর জন্মান্তর-গ্রহণ-বিবরণ, জ্ঞান ও মোক্ষের সাধকতা প্রভৃতি। সৃষ্টি-প্রক্রিয়া সম্বন্ধে মনুসংহিতায় দৃষ্ট হয়,—সৃষ্টির পূর্বে সকলই তমসাক্ষর অপ্রত্যক্ষ ও ধারণার অতীত ছিল ; তর্ক ও জ্ঞানের অভাব অবস্থায় সকলই যেন প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত ছিল। অতঃপর স্বয়ম্ অব্যক্ত ভগবান্, মহাভূতাদি চতুর্বিংশতি তত্ত্বের সৃষ্টি-প্রায় হইয়া, স্বয়ং প্রকাশমান হন। তিনিই প্রথম শরীরাকারে প্রাহুত হন ; তাঁহার প্রকাশে অন্ধকার দূরীভূত হয়। আপন শরীর হইতে বিবিধ প্রজা সৃষ্টির ইচ্ছা করিয়া, তিনি চিন্তা-মাত্রে প্রথমে জলের সৃষ্টি করেন, এবং তাহাতে আপন শক্তিবীজ অর্পণ করেন। তাহা হইতে এক অণুর উৎপত্তি হয় ; সেই অণু সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্ম জন্মগ্রহণ করেন। পরিশেষে তাঁহার ধ্যানবলে সেই অণু (ব্রহ্মাণ্ড) দ্বিধা বিভক্ত হয় ; তাহার একভাগে উর্দ্ধধণ্ডে স্বর্গাদি লোক এবং অপর ভাগে অধঃধণ্ডে পৃথিবীাদি নির্মিত হয়। মধ্যভাগে আকাশ, অষ্টদিকে ও ঋত-সলিল স্থান সমুদ্র অবস্থিতি করে। অতঃপর পরমাত্মারূপ মন, মনের পূর্বে অহং জ্ঞান এবং অহং-জ্ঞানের পূর্বে মহত্ত্বের স্মরণ হয়। তৎপরে ক্রমে ক্রমে ইন্দ্রিয়াদি এবং ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ-ভূতের সহিত যোজনায় দেব-মনুষ্য-তীর্থগাদি জীবের সৃষ্টি করেন। বায়ু, নক্ষত্র, গ্রহ, ঋতু, কাল প্রভৃতি সমস্তই তাঁহারই ইচ্ছায় সৃষ্ট হয়। তাহা হইতে সৃষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তিনি

হিরণ্যগর্ভ, ব্রহ্মা ইত্যাদি নামে অভিহিত হন। তাঁহারই দেহ হইতে স্ত্রী ও পুরুষের উৎপত্তি হয়। আপনার মুখ, বাহ, উরু ও পদ হইতে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র,— এই চারি বর্ণেরও তিনিই সৃষ্টি করেন; ইত্যাদি। মনুর মতে,—‘সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে বাহাদের প্রাণ আছে, তাহার শ্রেষ্ঠ; প্রাণিগণের মধ্যে বুদ্ধিজীবীগণ শ্রেষ্ঠ; বুদ্ধিজীবীগণের মধ্যে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ; এবং মনুষ্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণের মধ্যে যাহারা বিদ্বান, তাহার শ্রেষ্ঠ; বিদ্বানগণের মধ্যে যাহারা শাস্ত্রানুষ্ঠানে কর্তব্যবুদ্ধি, তাহার শ্রেষ্ঠ; আবার কর্তব্য-কর্মকারীর মধ্যে যাহারা ব্রহ্মবাদী, তাহার শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণের যে শরীরোৎপত্তি, তাহা ধর্মের সনাতন মূর্তিমান্ অবস্থা। ত্রিলোকের সমুদায় ধন ব্রাহ্মণের; ব্রাহ্মণ সর্ববর্ণের শ্রেষ্ঠ; ব্রাহ্মণই সমুদায় সম্পত্তির যোগ্যাধিকারী। ব্রাহ্মণ সর্বদাই আচারানুষ্ঠানে যত্নবান থাকিবেন। আচার ভ্রষ্ট হইলে, ব্রাহ্মণ বেদের ফলভাগী হইতে পারেন না।’ গার্হস্থ্য-ধর্ম-বিষয়ে মনুসংহিতায় যে সুন্দর সারগর্ভ উপদেশ আছে, তাহাতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র,—সকলেরই বৃত্তি নির্দিষ্ট হইয়াছে; স্বাস্থ্য-রক্ষাদির উপায় পরিবর্ণিত হইয়াছে; শিক্ষা, সদাচার প্রভৃতির বিধি-বিধান নির্দিষ্ট হইয়াছে; কিরূপ ভাবে কাহার সহিত সম্বন্ধ রাখা উচিত, তদ্বিষয়েও উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। গার্হস্থ্য-ধর্ম-কথন প্রসঙ্গে মনু বলিয়াছেন,—“শ্রদ্ধায়েষ্টক পৃষ্ঠক নিত্যং কুর্যাদতঃ। শ্রদ্ধাকৃতো হক্ষ্ময়ে তে ভবতঃ স্বাগতৈর্ধনৈঃ॥” অর্থাৎ,—নিরলসভাবে শ্রদ্ধার সহিত সর্বদা ইষ্ট ও পৃষ্ঠকার্য্য সম্পন্ন করিবে। ঐ দুই কার্য্য শ্রদ্ধা-সহকারে সম্পন্ন করিলে, অক্ষয় পুণ্য লাভ হয়। বলা বাহুল্য,—যজ্ঞকর্ম ইষ্ট নামে; এবং পুষ্করিণী-কূপাদি খনন—পৃষ্ঠকার্য্য বলিয়া অভিহিত হয়।* জলদান ও যজ্ঞকর্ম উভয়ই তখন সমভাবে স্বর্গলাভের উপায় বলিয়া গণ্য হইত,—ইহাতে তাহাই প্রতিপন্ন হয়। বিবাহাদি সম্বন্ধে হিন্দু-সমাজে এখনও যেরূপ জাতিকুলের প্রতি দৃষ্টি করা হয়, মনুসংহিতাও তদনুরূপ সম্বন্ধ-বিধানই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। মনু স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন,—“হীনকুল সকল পরিত্যাগ করিয়া উত্তমোত্তম কুলের সহিত ব্রাহ্মণগণ সম্বন্ধ রক্ষা করিবেন; সেই সম্বন্ধেই তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্ব; তাহার বিপরীতাচরণ করিলে, তাঁহাদের হীনত্ব ঘটিয়া থাকে।”† জ্ঞানধর্ম-কথন প্রসঙ্গে মহর্ষি মনু স্পষ্টতঃ নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন,—“কি বালিকা, কি যুবতী, কি বৃদ্ধা—কোনও স্ত্রীরই স্বামীন ও স্বতন্ত্র-ভাবে কার্য্য করা উচিত নহে। বাল্যকালে পিতার বশে, যৌবনে স্বামীর বশে, স্বামীর অভাবে পুত্রের বশে, স্ত্রীলোকদিগকে থাকিতে হইবে। তাহাদের স্বাধীনতা অবলম্বন কখনই কর্তব্য নহে। পিতা, ভর্তা বা পুত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্ত্রীলোক স্বতন্ত্রভাবে থাকিবার চেষ্টা করিলে, তাহাতে পিতৃকুল, ভর্তৃকুল উভয় কুল কলঙ্কিত হয়। স্বামী ভিন্ন স্ত্রীলোকের পৃথক যজ্ঞ নাই, ব্রত নাই, উপবাস নাই; পতি-সেবাই স্ত্রীলোকের স্বর্গ-লাভের উপায়। পতি মৃত হইলে, স্ত্রী বরং গুহ পুষ্কলমূলের দ্বারা জীবন ধারণ করিবেন;

* “ইষ্টমতঃকৈদি যজ্ঞাদিকর্ম, পৃষ্ঠং ততোহতঃ পুষ্করিণীকূপপ্রপারানাদি।”—মনুসংহিতা, চতুর্থ অধ্যায়, ২২৬শ স্লোক, কুলুক ভট্টের টীকা।

† মনুসংহিতা, চতুর্থ অধ্যায়, ২৪৪শ ও ২৪৫শ স্লোক।

কিন্তু কখনও পরপুরুষের নানোচ্চারণও করিবেন না। স্বামীর মৃত্যুর পর একমাত্র ব্রহ্মচর্য্য-বলেই স্ত্রীলোক স্বর্গলাভ করিতে পারেন।” * রাজধর্ম্ম-কখন-প্রসঙ্গে মহর্ষি মনু রাজ্য ও প্রজা উভয়েরই কর্তব্য অতি সুন্দরভাবে নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। প্রজা রাজাকে দেবতার জায় জ্ঞান করিবে; রাজা বালক হইলেও তিনি মহান্ দেবতা—বহুত্ব-রূপে অবস্থান করিতেছেন,—প্রজা তাঁহাকে সেই ভাবে দর্শন করিবে; রাজা বিনয়াদি গুণ-সম্পন্ন হইয়া ব্রাহ্মণগণের আদেশানুসারে রাজকাৰ্য্য সম্পন্ন করিবেন; বিনীত রাজা কখনও বিনাশ প্রাপ্ত হন না; গজাস্বাদি বহুবিভবশালী হইলেও বিনয়্যভাবে রাজার বিনাশ হইয়া থাকে; আবার চিরকালনচারী ব্যক্তিও বিনয়গুণে রাজত্ব লাভ করিয়া থাকে। নহম্, বেণ, সুদাস, সুযুধ ও নিমি প্রভৃতি প্রবলপরাক্রান্ত রাজচক্রবর্ত্তিগণ একমাত্র বিনয়্যভাবেই বিনষ্ট হইয়াছিলেন; আবার পৃথু, মনু প্রভৃতি বিনয়-বলে সাম্রাজ্যাধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। † যে রাজা বুদ্ধিদোষে, উগ্রতাবশে, প্রজার বিরুদ্ধাচরণ করেন, তিনি অবিলম্বে রাজ্যভ্রষ্ট ও সবংশে ধ্বংসপ্রাপ্ত হন। সর্বধর্ম্ম অপেক্ষা প্রজাপালনই রাজার শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম; শাস্ত্রোক্ত করাদি-ভোক্তা রাজা প্রজাপালনে সর্বতোভাবে বাধ্য। যে রাজ্যের প্রজাগণ, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণ, ক্ষুধায় অবসন্ন হন, সে রাজ্য হৃতিক্রমশঃ হইয়া উৎসন্ন-দশা প্রাপ্ত হয়। কুরুপভাবে রাজা অপরের সহিত ব্যবহার করিবেন, কুরুপ-ভাবে যুদ্ধ-যাত্রা করিবেন, কুরুপভাবে যুদ্ধ করিবেন, কুরুপভাবে সৈন্যবাহু রচনা করিবেন,—মহর্ষি মনু তাহাও নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তৎকালে কোন্ কোন্ দেশীয় কীদৃশ সৈন্য যুদ্ধকাৰ্য্যে নিযুক্ত হইত, মনুসংহিতায় তাহারও উল্লেখ আছে। দেখা যায়,—বিরাট, কান্ডকুজ, কুরুক্ষেত্র, মথুরা, প্রভৃতি দেশের সৈন্য তৎকালে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল।

“কুরুক্ষেত্রাংশং মৎপ্রাশংচ পাকালান্ শূরসেনজান্। দীর্ঘান্ লঘুশ্চৈব নাবানগ্রানীকেষু যোধ্যয়েৎ ॥” † সেই সকল সৈন্য গুরোভাগে রক্ষা করিয়া রাজা যুদ্ধ-কাৰ্য্যে ত্রুতী হইতেন,—এইরূপ উল্লেখ দেখিতে পাই। ‡ ব্যবহার-দর্শন-নিয়ম কখন-প্রসঙ্গে মহর্ষি মনু যাহা নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন, আজি পর্য্যন্ত তাহা সমাদৃত হইয়া থাকে। তৎপ্রসঙ্গে উত্তমর্গ-অধমর্গের ব্যবহার, রাজা-প্রজার সম্বন্ধ, বিচার ও দণ্ড-পদ্ধতি—কি সুন্দর পরিবর্ণিত! ঋণদান ও ঋণপরিশোধের বিষয়, বন্ধক ও সুদ-প্রসঙ্গ, সাক্ষী জাগিন ও প্রমাণ প্রভৃতির কথা—সকলই উহাতে আলোচিত হইয়াছে। অধুনা বে ‘হিন্দু-ল’-অনুসারে হিন্দু-সমাজের বিচার-নিষ্পত্তি হইয়া থাকে, তাহারও মূল-ভিত্তি—এই মনুসংহিতা। এখন যেমন ব্যবহার-গ্রন্থের অবতরণিকায় নানাক্রম সংজ্ঞার পরিচয় দেখিতে পাই, তাহাও মনে হয়—এই মনুসংহিতার অনুস্মৃতি। একটী দৃষ্টান্ত দিই,—“ত্বাৎ সাহসজ্জয়বৎ প্রসভং কর্ম্ম যৎ কৃতম্। নিরম্ময়ং ভবেৎ শুভং কৃপাক্রয়তে চ যৎ ॥” অর্থাৎ,—বলপূর্ব্বক অপহরণের নাম—‘সাহস’; গোপন-ভাবে অপহরণের নাম ‘চুরি’; কোনও দ্রব্য গ্রহণ করিয়া অস্বীকার করার নামও ‘চুরি’;

* বহুসংহিতা, পঞ্চম অধ্যায়, ১৪৭শ হইতে ১৪৯শ এবং ১৫৭শ ও ১৬৯শ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

† মনুসংহিতা, সপ্তম অধ্যায়, ১২৩শ শ্লোক।

‡ মনুসংহিতা, দশম অধ্যায়, ২৯শ—৪১শ শ্লোক।

ইত্যাদি। স্ত্রী-পুরুষের ধর্ম-বিচারে মহর্ষি মনু^{*} মত,—স্ত্রী বৈরূপ সর্ব-বিষয়ে পতির অনুগত হইয়া থাকিবে, ভাৰ্য্যারক্ষণ-ধর্মও পতির সেইরূপ শ্রেষ্ঠ-ধর্ম বলিয়া পরিগণিত হইবে। বিবাহের বয়স-নির্ধারণ, স্ত্রী-জাতির দ্বিতীয়বার বিবাহের অর্থাৎ বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধ মত; পতি ভিন্ন অপরের ঔরসোৎপন্ন সন্তানের নীচত্ব-প্রাপ্তি প্রভৃতির বিষয়; এবং কিরূপ-ভাবে সন্তান-সন্ততিগণ পিতৃ-মাতৃ-সম্পত্তির অধিকারী হইবে,—মনু তাহাও নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। * তিনি ষাট-বিধ পুত্রের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া, তাহাদের শ্রেষ্ঠত্ব-নিরূপণ বিচার করিয়াছেন। তাঁহার মতে,—বিবাহ-সংস্কারে সংকল্পিত সর্বা পত্নীতে স্বয়ং উৎপাদিত সন্তানকে ঔরস পুত্র বলে; ঔরস পুত্রই মুখ্য পুত্র।† কৈতব, দত্তক, কৃত্রিম, পুত্রোৎপন্ন, অপবিদ্ধ, কানীন, সাহোদ্র, কৃতক, পৌনর্ভব, স্বয়ং-দত্ত, পারশ্ব—এই একাদশ প্রকার পুত্র পর্যায়ক্রমে নিম্নশ্রেণীভুক্ত। জন্মান্তর ‡ ও বর্ণধর্ম-সম্বন্ধে মহর্ষি মনু বলিয়াছেন,—“পরলোকে কর্মের ফল ভোগ করিতে হয়, এই মনে করিয়া মনুষ্যের শুভকর্ম করা কর্তব্য। অজ্ঞান-কৃত হউক বা জ্ঞানকৃত হউক, যে কোনও পাপে মুক্তিলাভ করিতে হইলে, সে পাপ আর কখনও করিবে না; তপস্বীই সকল সুখ-সম্পত্তির মূল। ব্রাহ্মণের তপস্বী—জ্ঞানের উৎকর্ষ-সাধন; ক্ষত্রিয়ের তপস্বী—দেশের শান্তি-রক্ষা; বৈশ্যের তপস্বী—বাণিজ্য ও পশুপালন; শূদ্রের তপস্বী—বিজ্ঞসেবা। স্বর্গাদি লাভের মূল—এই তপস্বী।”‡ মনুসংহিতার উপসংহারে আমরা দেখিতে পাই,—

“এবং যঃ সর্বভূতেষু পশুত্যাগ্নানমাগ্নান্না।

স সর্ব সমতামেত্য ব্রহ্মভ্যেতি পরং পদম্॥”

যিনি সর্বভূতে আত্ম-দর্শন করেন, সর্ব-সমতা প্রাপ্ত হইয়া, তিনি পরমপদ ব্রহ্ম লাভ করেন। মূলে, এখানেও সেই আত্মজ্ঞান; জ্ঞানলাভই মোক্ষ।

দ্বিতীয়—অত্রিসংহিতা। মহর্ষি অত্রি এই সংহিতা প্রচার করেন। অত্রি নামে অনেক ঋষির পরিচয় পাওয়া যায়। মনু হইতে যে দশ জন প্রজাপতির উৎপত্তি হইয়াছিল, অত্রি তাঁহাদের অন্যতম। সপ্তর্ষিদিগের মধ্যেও অত্রির অত্রি-সংহিতা। প্রসঙ্গে দেখা যায়,—তিনি পাঁচটি প্রসিদ্ধ বংশের পৌরহিত্য করিতেন।§

এই সংহিতা ৩৯১টি শ্লোকে সম্পূর্ণ। অত্রি-সংহিতায় বর্ণাশ্রম-ধর্ম, শৌচাশৌচ-বিধি, ব্রাহ্মণ-বিভাগ, প্রায়শ্চিত্ত-বিধান প্রভৃতি বর্ণিত আছে। এই সংহিতার মতেও—ইষ্ট ও পূর্ত উভয় কার্য দ্বারা স্বর্গ মোক্ষ লাভ হয়। ইহাতে বিশদ-ভাবে লিখিত আছে,—অগ্নিহোত্র, তপস্বী, সত্য, বেদাজ্ঞা প্রতিপালন, অতিথি-সৎকার এবং বিশ্বদেব উপাসনা প্রভৃতি ‘ইষ্ট’-কার্য; আর, বাপি-কূপ-তড়াগ প্রভৃতি জলাশয় উৎসর্গ,

* মনুসংহিতার নবম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

† অথবা ঔরস ও দত্তক পুত্রই প্রচলিত। অশ্ববিধ পুত্র ‘জারজ’ পুত্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

‡ মনুসংহিতা, একাদশ অধ্যায়ের ২৩৩শ হইতে ২৩৮শ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

§ সপ্তর্ষি,—“সর্ষীচিরজ্যামিরমৌ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ। ব্রহ্মণোবানবসঃ পুত্রাঃ কশিষ্ঠশ্চেতি সন্ততে।” প্রজাপতিসম্বন্ধ,—“সর্ষীচিরজ্যামিরমৌ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ ওচেষৎসং বশিষ্ঠঃ তৃণনারদমবেচ।”

দেব-মন্দির প্রতিষ্ঠা, অন্নদান ও ব্রহ্ম-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি 'পূৰ্ণ'-কার্য্য। দ্বি-জাতি—ইষ্ট ও পূৰ্ণ উভয় কার্য্যেরই অধিকারী ; শূদ্র—পূৰ্ণ-কার্য্য করিবে ; কিন্তু তদন্তর্গত বৈদিক-ক্রিয়া করিবে না। এই সংহিতার মতে,—“ব্রাহ্মণের ছয়টি কার্য্য। তাহার মধ্যে যজ্ঞন, দান, অধ্যয়ন—এই তিনটি তপস্তা ; আর প্রতিগ্রহ, অধ্যাপন ও বাজ্ঞন—এই তিনটি জীবিকা। ক্ষত্রিয়ের পাঁচটি কার্য্য। যজ্ঞন, দান, অধ্যয়ন—এই তিনটি তপস্তা ; আর অস্ত্র-ব্যবহার ও প্রাণী-রক্ষা—এই দুইটি জীবিকা। বৈশ্যের চারিটি কার্য্য ; যজ্ঞন, দান, অধ্যয়ন—এই তিনটি তপস্তা ; আর, বার্তা (অর্থাৎ কৃষি, বাণিজ্য, গো-রক্ষা) তাহার জীবিকা। শূদ্রের বিজ্ঞ-সেবাই তপস্তা ; আর, শিল্প-কার্য্যই জীবিকা। অত্রি-সংহিতা-মতে গয়াধামে গমন করিয়া ফল্গু-নদীতে স্নান-পূর্ব্বক গদাধরকে দর্শন করিলে, ব্রহ্ম-হত্যার পাপ হইতেও মুক্ত হওয়া যায়। গঙ্গাস্নানে অশেষ পুণ্যের কথাও এই সংহিতাতে দৃষ্ট হয়। সহমরণে গিয়া চিত্তা হইতে পতিত হইলে, এই সংহিতায় তাহার প্রায়শ্চিত্ত-বিধি আছে। তদ্বারা বুঝা যায়,—ঐ সময় সহমরণ-প্রথা প্রচলিত ছিল। কন্যা-বিক্রয় অতি দোষাবহ বলিয়া অত্রি-সংহিতায় উল্লিখিত হইয়াছে। এমন কি, অত্রি-সংহিতার মতে,—ক্রীতা কন্যার গর্ভজাত সন্তান পিতৃ-পিণ্ডেরও অধিকারী নহে।

তৃতীয়—বিষ্ণু-সংহিতা। বিষ্ণুর প্রাধান্য কীর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়াই এই সংহিতার নাম বিষ্ণু-সংহিতা। মতান্তরে,—স্বয়ং বিষ্ণু এই সংহিতা প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া, ইহার নাম বিষ্ণু-সংহিতা ; অথবা, বিষ্ণু-নামক জনৈক ঋষি কর্তৃক এই বিষ্ণু-সংহিতা। সংহিতা প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়াই ইহার এইরূপ নামকরণ হইয়াছে।

অষ্টম সংহিতা হইতে এই সংহিতার একটু বিশেষত্ব দৃষ্ট হয় ; সেই বিশেষত্ব,—ইহার কতকাংশ কবিতাচ্ছন্দে লিখিত, কতকাংশ গদ্যে বিরচিত, কতকাংশ হ্রস্বাকারে প্রথিত। হ্রস্ব-সাহিত্যের যুগে ধর্ম্মহ্রস্ব-সমূহ যেভাবে প্রাণিত ছিল দেখিয়াছিলাম, এই সংহিতার অধিকাংশই সেইরূপ হ্রস্বাকারে অবস্থিত। যেমন,—“ভর্তৃঃসমানব্রতচারিষ্মহু”, “স্বশ্রমভরো গুরুদেবতাতিথিপূজনম্”, “সুসংস্কৃতোপোদ্বরতা”, ইত্যাদি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক শতটি অধ্যায়ে এই সংহিতা বিভক্ত। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, পাতকাদি, উত্তমর্গ-অধমর্গের লক্ষণ, লেখ্য অর্থাৎ দলীল, সাক্ষী, অসাক্ষী, শপথ, বিবাহ-বিধি, পুত্র-লক্ষণ, ত্রী-ধর্ম্ম, সংস্কার, প্রায়শ্চিত্ত, নরক, সদাচার প্রভৃতি বিবিধ বিষয় এই সংহিতায় আলোচিত হইয়াছে। এই সংহিতার প্রথম অধ্যায়ে কীরোদশায়ী লক্ষ্মী-নারায়ণের সমীপে বসুধতী আসিয়া বর্ণাশ্রম সনাতন ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিতেছেন। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের মতে,—এই অধ্যায়টি পরবর্ত্তি-কালে রচিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের কন্দবিভাগ, তৃতীয় অধ্যায়ে রাজধর্ম্ম-বর্ণন, চতুর্থ অধ্যায়ে মহাপাতকের দণ্ডকথা, ষষ্ঠ হইতে অষ্টম অধ্যায়ে উত্তমর্গ-অধমর্গ, দলীল ও সাক্ষী প্রভৃতির বিষয়, নবম হইতে চতুর্দশ অধ্যায়ে দোষী নির্দোষের পরীক্ষা, পঞ্চদশ অধ্যায়ে ষাটশবিধ পুত্রের উল্লেখ, ষোড়শ অধ্যায়ে নানা জাতি উৎপত্তির বিষয়, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিষয়-প্রাপ্তির কথা, ইত্যাদি বিষয় লিখিত আছে। পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে ত্রী-জাতির কর্তব্য-নির্ণয়-প্রসঙ্গে

ব্রহ্মচর্যের কথা সহগমনের উল্লেখ, পঞ্চাশতীতম প্রভৃতি অধ্যায়ে বিষ্ণুকে দেবতারূপে পূজার ব্যবস্থা, সপ্তমবতীতম অধ্যায়ে সাজ্য ও যোগ-শাস্ত্রের সহিত বৈষ্ণব-ধর্মের সামঞ্জস্য-বিধান, চতুর্দশীতম অধ্যায়ে স্নেহহৃদে গমনাদিতে ধর্মহানি-প্রসঙ্গ, পঞ্চাশীতীতম অধ্যায়ে নানা ভীষণ স্থানের মহিমা কীর্তিত হইয়াছে। মধ্যবর্তী অষ্টাশ্র অধ্যায়ে শ্রাদ্ধের কাল, শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা, কুপতড়াগাদি নির্মাণের এবং অষ্টাশ্র নানা প্রসঙ্গ আছে। নবমবতীতম অধ্যায়ে বশুমতীর প্রশ্নের উত্তরে লক্ষ্মী আপনায় অবস্থান-স্থান নির্দেশ করিয়া এই মর্মে বলিতেছেন,—“আমি ধর্মনিরতা, পরহিতব্রতা, সত্যবাদিনী, জিতেন্দ্রিয়া, উদারচেতা, দয়াম্বিতা, মুক্তহস্তা, প্রিয়বাদিনী রমণীগণের মধ্যে বাস করি। রম্য প্রদেশে শাদু ও ধর্ম পরায়ণ ব্যক্তির হৃদয়ে, অধ্যয়নসম্পন্ন ব্রাহ্মণে, নির্মল জলে, পূর্ণ-সরোবরে আমার অবস্থিতি।” ইত্যাদি।

চতুর্থ—হারীত-সংহিতা। প্রাচীনকালে মহর্ষি হারীত এই সংহিতার বিষয় বর্ণন করিয়াছিলেন। মার্কণ্ডেয় মুনি, ঋষিদিগের নিকট হারীতের সেই উপদেশ শ্রবণ করেন। তাঁহার নিকট হইতে অশ্বরাধ রাজা উহা শ্রবণ করিয়াছিলেন। প্রথমে হারীত-সংহিতা। মুখে মুখেই এই সংহিতার মর্ম প্রচারিত হইয়া আসিতেছিল; পরিশেষে ইহা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হয়। বোধায়ন, বাসিষ্ঠ, আপস্তম্ব প্রভৃতির গ্রন্থে সূত্রাকারে গ্রথিত হারীতের মত উদ্ধৃত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। স্মৃতরাং এই সংহিতাও প্রথমে সূত্রাকারে প্রচলিত ছিল; ক্রমশঃ ছন্দাকারে পরিবর্তিত হইয়া আসিয়াছে। এই সংহিতা সাত অধ্যায়ে বিভক্ত; ইহাতে এখন মাত্র এক শত চুরানবইটি শ্লোক আছে। এই সংহিতার প্রথম অধ্যায়ে সৃষ্টি-প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে,—সৃষ্টির প্রাকালে জগৎপ্রভা বিষ্ণু, লক্ষ্মীর সহিত নাগ-পর্য্যাক্ত শয়ান ছিলেন। সেই যোগনিদ্রাগত ভগবানের নাভিদেশ হইতে একটা মহৎ পদ্মের উৎপত্তি হয়, এবং সেই নাভিপদ্মে বেদ-বেদাঙ্গ-ভূষণ ব্রহ্ম আবির্ভূত হন। তখন তাঁহাকে বার বার জগৎ সৃষ্টি করিতে বলায়, তিনি ক্রমে ক্রমে সৃষ্টি-কার্য্য সম্পন্ন করেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে, বর্ণচতুষ্টয়ের কর্ম-নির্দেশ-পূর্ব্বক নরসিংহ দেবতার পূজার প্রাধিকার কীর্তিত হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মচর্য্যের বিষয়, চতুর্থ অধ্যায়ে গার্হস্থ্য-ধর্ম ও নরসিংহের প্রধিকার-কীর্তন, ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে আশ্রম-ধর্ম ও যোগশাস্ত্রের বিষয় বর্ণিত আছে। এই সংহিতার মতে,—স্বধর্ম্মাচারী বহুশ্রম নরসিংহের প্রসাদে নরসিংহ-পদ প্রাপ্ত হইতে পারেন।

পঞ্চম—যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা। যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য এই সংহিতার প্রবর্তক। তিনি সামশ্রবা প্রভৃতি মুনিগণের নিকট বর্ণাশ্রম-ধর্ম-বিষয়ে, ব্যবহার-শাস্ত্র-সম্বন্ধে এবং প্রায়শ্চিত্তাদি প্রসঙ্গে বাহা বলিয়াছিলেন, পরবর্ত্তি-কালে তাহাই এই যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা। সংহিতাকারে লিপিবদ্ধ হয়। রাজর্ষি জনকের রাজসভায় যে যাজ্ঞবল্ক্য পরিচয় পাই, যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা-প্রবর্ত্তক যাজ্ঞবল্ক্য এবং সেই যাজ্ঞবল্ক্য উভয়ে অভিন্ন ব্যক্তি কিনা, তাহা নিয়ে যতাত্তর আছে। কেহ বলেন,—জনকরাজ-সভায় যাজ্ঞবল্ক্য এই সংহিতার প্রবর্ত্তক; কেহ বলেন,—তাঁহার বংশধর অপর কোনও যাজ্ঞবল্ক্য

কর্তৃক ইহা প্রণীত হইয়াছিল। কিন্তু এই সংহিতার প্রারম্ভে যে দুইটা শ্লোক আছে, তাহাতে এই সংহিতাকার 'মিথিলাস্থ' এবং 'যোগীশ্বর রাজবল্লভ' বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। সুতরাং জনক-রাজসভার রাজবল্লভ-ঋষি এই সংহিতার প্রবর্তক বলিয়া মনে হইতে পারে। বিশেষতঃ এই সংহিতায় রাজধর্ম, ব্যবহার-বিধি, দায়ভাগ, মিতাক্ষরা প্রভৃতি বিষয়ে যে সকল সার-তত্ত্ব প্রকটিত আছে, তাহাতে এই গ্রন্থের বীজাঙ্কুর কোনও শ্রেষ্ঠ নৃপতির শাসন-সময়ে বিনির্গত হইয়াছিল—তাহাই মনে হওয়া সম্ভবপর। এই সংহিতা তিনটি অধ্যায়ে বাদশাধিক সহস্র শ্লোকে সম্পূর্ণ। ইহার প্রথম অধ্যায়ে,—গর্ভাধান, বিবাহ, যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ ও বর্ণসঙ্কর উৎপত্তির কথা আছে; ভক্ষ্যাভক্ষ্য প্রকরণ অর্থাৎ কৌনরূপ খাদ্য বা কৌনরূপ পাত্রেরে ভোজন করা কর্তব্য, শুদ্ধি-প্রকরণ ও নানাবিধ পূজা-পদ্ধতির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে,—ব্যবহার-শাস্ত্রের বিষয়, অর্থাৎ ঋণদান, ঋণ-গ্রহণ, প্রাতিভূ-প্রকরণ, সাক্ষি-প্রকরণ, লেখ্য-প্রকরণ, দিব্য-প্রকরণ, দায়ভাগ-প্রকরণ, দণ্ড-পারুष্য-প্রকরণ, সাহস-প্রকরণ, সন্ত্রয়-সমুখান-প্রকরণ, স্ত্রী-সংগ্রহ-প্রকরণ প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ আছে। তৃতীয় অধ্যায়ে,—অশৌচ-প্রকরণ, আপদ্রব্য প্রকরণ, যতি-প্রকরণ, অধ্যাত্ম-প্রকরণ, প্রায়শ্চিত্ত-প্রকরণ প্রভৃতি পরিবর্ণিত। এই রাজবল্লভ-সংহিতার অন্তর্গত দায়ভাগ-প্রকরণ আজি পর্য্যন্ত আইন মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। এই দায়ভাগের বচন-পরম্পরা উদ্ধার করিয়া বিজ্ঞানেশ্বর ভট্টাচার্য 'মিতাক্ষরা' এবং জীমূতবাহন 'দায়ভাগ' গ্রন্থ সকলন করেন। আজিও ভারতবর্ষে পিতৃ-পিতামহ-আত্মীয়-বন্ধন-পরিভ্যক্ত বিষয়-সম্পত্তি সেই মিতাক্ষরা ও দায়ভাগ অনুসারেই উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে বিভাগ হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে দায়ভাগ এবং বঙ্গদেশ ভিন্ন ভারতের অন্তর্গত মিতাক্ষরা প্রচলিত। পিতা জীবন-কালে পুত্রদিগকে কিরূপভাবে সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিতে পারেন, পিতার ইচ্ছায় পিতামহ-সম্পত্তি কেন অসম-ভাগে বিভাগ হইতে পারে না, এবং পিতা শাস্ত্রবিরুদ্ধ বিভাগ করিলে কিরূপে তাহা রহিত হইতে পারে, মাতৃ-ধন কিরূপে বিভাগ হইয়া থাকে, কোন সম্পত্তিতে কাহার কিরূপ অধিকার বর্তিতে পারে;—এই সকল বিষয় এই সংহিতার দায়ভাগ-প্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে। যজুঃসংহিতায় উক্তবর্ণ নিয়-বর্ণের কথা বিবাহ করিবার বিধি ছিল;—যদিও সে বিধি ইতর-বিধি বলিয়া উক্ত হইয়াছিল;—কিন্তু রাজবল্লভ তাহাও নিবেদন করিয়া যান। *

ষষ্ঠ—উশনঃ-সংহিতা। তৃণ-বংশীয় উশনঃ, ঋষি-মণ্ডলীর নিকট ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের হেতুভূত যে শাস্ত্রতত্ত্ব বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহার পুত্র উশনঃ, সৌনকাদি মুনিগণের নিকট তাহাই কীর্ত্তন করেন। এই সংহিতায় তাহাই পরিবর্ণিত। উশনঃ—
উশনঃ-সংহিতা। সুরগুরু শুক্রাচার্যের অপর নাম বলিয়া কথিত হয়। তিনি কবি এবং সাধাকার বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। এই সংহিতা নয়টি অধ্যায়ে এবং ছয় শত কুড়িটা শ্লোকে সম্পূর্ণ। এই সংহিতায় অশৌচ-বিধি, শ্রাদ্ধ-পদ্ধতি, ভক্ষ্যাভক্ষ্য-বিচার, এবং নানাবিধ প্রায়শ্চিত্তের কথা আছে। সন্ত্রয়-বাক্যাকারী পিতৃশ্রাদ্ধে অধিকারী নহে,—এই সংহিতায় উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ত্রি-মূর্ত্তির এবং ওকারের গুণ-

* রাজবল্লভ-সংহিতা, প্রথম অধ্যায়ের ৫৬শ শ্লোক। যজুঃসংহিতা, তৃতীয় অধ্যায়ের ৪১শ শ্লোক।

মাহাত্মা-কীর্তন,— এই সংহিতায় দেখিতে পাওয়া যায় । ব্রহ্মবাণী, সুরাপায়ী, চোর প্রভৃতি পঞ্চবিধ মহাপাতকীর উল্লেখ, তাহাদের সঙ্গে বসবাসেও পাপ হইয়া থাকে,—মহর্ষি উশনঃ তাহাই ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন । সতীদাহ এবং পাপীর আত্ম-নাশের প্রসঙ্গ, ইহাতে পরিবর্ণিত রহিয়াছে । এই সংহিতায় লিখিত আছে,—দশ সহস্র গায়ত্রী জপ করিলে, ব্রাহ্মণগণ সৰ্বপাপ হইতে মুক্ত হইতে পারেন ;—‘অমৃতেনৈব গায়ত্রীমুচ্যতে সৰ্বপাতকৈঃ ।’

সপ্তম—অগ্নিরঃ-সংহিতা । এই সংহিতা দ্বিসপ্ততি-সংখ্যক শ্লোকে সম্পূর্ণ । ইহাতে প্রায়শ্চিত্ত ও স্ত্রী-ধর্মের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে । অগ্নিরস (অগ্নিরঃ, অগ্নিরসৌ, অগ্নিরসঃ)

ব্রহ্মার দ্বিতীয় পুত্র নামে অভিহিত হন । মহাভারতের বনপর্বে অগ্নিরঃ-সংহিতা । অগ্নিরঃ ঋষির ওপস্থার প্রসঙ্গ আছে । তপোবলে তিনি অগ্নি-সদৃশ তেজস্বী হইয়াছিলেন । এই সংহিতায় নীলবর্ণ বস্ত্র-ব্যবহারের এবং নাপি-বপনের অন্তর্বিষয়ের বিধি লিখিত হইয়াছে । সেই জন্ত কেহ কেহ মনে করেন,— এই সংহিতা আধুনিক কাগে বিখ্যাত হইয়াছিল । এই সংহিতাকার বলেন,—‘যে কষ্টা অস্ত্রের উদ্দেশে বাগ্‌দস্তা হইয়াছে, অপরের সহিত তাহার বিবাহ হইলে সে কষ্টা ‘পুনভূ’ বলিয়া কীর্তিত হয় ; তাহার হস্তের অন্ন পর্য্যন্ত ভোজন করিতে নাই ।’

অষ্টম—যম-সংহিতা । এই সংহিতা মাত্র অষ্ট-সপ্ততি শ্লোকে সম্পূর্ণ । বিধি-নিষেধ ও প্রায়শ্চিত্তের কথাই এই সংহিতায় আলোচিত হইয়াছে । এই সংহিতায়, রজক, চর্ম্মকার,

নট, বরুড়, কৈবর্ত, মেদ এবং ভিন্ন—এই সপ্ত জাতিকে অন্ত্যাজ-জাতি যম-সংহিতা । বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে । এই সংহিতায়, সন্ধ্যাকালে আহার,

সন্ধ্যাকালে নিদ্রা, সন্ধ্যাকালে বেদপাঠ, প্রভৃতি পরিবর্জন করিবার আদেশ বিহিত আছে । যম—এই সংহিতার প্রবর্তক । কিন্তু তিনি যম-নামক ঋষি, অথবা ধর্ম্মরাজ যম, সে সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয় । পাশ্চাত্য-মতাবলম্বিগণ এই সংহিতাকে আধুনিক বলিয়া নির্দেশ করেন ।

নবম—আপস্তম্ব-সংহিতা । দুষিত বর্ণ-সমূহের হিতের জন্ত তাহাদের প্রায়শ্চিত্ত-নির্ণায়ক এই সংহিতা—আপস্তম্ব ঋষি-কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছিল । এই সংহিতা দশটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অধ্যায়ে

এবং একশত তির্য্যগীটি শ্লোকে সম্পূর্ণ । মহর্ষি আপস্তম্বের নাম যজু-আপস্তম্ব-সংহিতা । কোঁদে আছে, কল্প-সূত্রে আছে, সংহিতায় আছে । সুতরাং যিনি এই

সংহিতা-শাস্ত্রের প্রবর্তনা করেন, তিনি যে কোন্ আপস্তম্ব, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য । আপস্তম্ব-সংহিতা প্রধানতঃ প্রায়শ্চিত্ত-বিধির আলোচনায় বিনিযুক্ত । এই সংহিতার মতে,—কন্যা গুণই মনুষ্যের ইহ-পরকালের সুখদাতা, কন্যাগুণ থাকিলে কোনও ক্রোধ হয় না ; বলবান কিংবা শাস্ত্রাহসরনকারী ব্যক্তিরই যে মুক্তি হইবে, এরূপ নহে ; সুদয়্য গৃহ, উত্তম ভোজন, উত্তম বস্ত্র প্রভৃতির অধিকারী হইলেই যে মুক্তির অধিকারী হইবে, তাহা নহে ; কন্যা-গুণ থাকিলেই যাহারের যোক প্রাপ্তি হয় ।

‘নোকে ভবেৎ এতিনিবর্তকস্য অধ্যায়-বোপৈকরতস্য স্যাক ।’

‘নোকে ভবেতিত্যন্বিনেসকস্য অধ্যায়যোগপত্তনানস্য ॥’

দশম—সংবর্ত-সংহিতা । সংবর্ত মূনি এই সংহিতার বিষয় ঋষিগণের নিকট বর্ণনা করেন । দুই শত সাতাইশটি শ্লোকে এই সংহিতা সম্পূর্ণ । ইহাতে চতুর্দশের ধর্ম-কর্মের বিষয়, খাতাখাত-বিচার এবং প্রায়শ্চিত্ত-বিধান বর্ণিত আছে । এই সংবর্ত-সংহিতা । সংহিতার মধ্যে,—জলদান ও অন্নদান বিশেষ পুণ্য কর্ম । সংহিতাকার বলেন,—“যে ব্যক্তি জলদান করে, সকল বস্তুর তত্ত্বাশুভ হইয়া সে অল্প তৃপ্তি প্রাপ্ত হয় । আর, যে ব্যক্তি অন্নদান করে, সকল বস্তুর ভোগক্রান্ত তৃপ্তি তাহার অধিগত হয় । নিয়মিতরূপে একমাস কাল প্রত্যহ গায়ত্রী-মন্ত্র জপ করিলে, সর্পের খোলস-পরিচ্যায়ের জ্ঞান ব্রাহ্মণগণ সর্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্তিপাত করিতে পারেন ।”

“অহত্বহনি যোহনীতে গায়ত্রীং বৈ দ্বিজোত্তমঃ । নামেন বুধ্যতে পাপাহরণঃ কঙ্কাদৃশমা ।”

একাদশ—কাত্যায়ন-সংহিতা । এই সংহিতা উনত্রিংশ অধ্যায়ে পাঁচশতাধিক শ্লোকে গ্রথিত । ইহার মধ্যে কয়েকটি স্থান গড়ে লিপিত আছে ; দ্বাদশ ও চতুর্দশ অধ্যায়ের কিয়দংশ গড়ে লিখিত । গৃহস্থত্রকার গোভিল যে সমস্ত কর্মের বিষয় কাত্যায়ন-সংহিতা । ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহারই অস্পষ্টাংশ এই কাত্যায়ন-সংহিতায় বর্ণিত আছে । শ্রাদ্ধ ও সদাচার-বিষয়ক উপদেশে ইহার কয়েকটি অধ্যায় নিয়োজিত হইয়াছে । এই সংহিতায়, গৌরী, পদ্মা, শচী, মেধা, সাবিত্রী, বিজয়া, জয়া, দেবসেনা, স্বধা, স্বাহা, রুতি, পুষ্টি, তৃষ্টি ও আন্ন-দেবতা—এই চতুর্দশ মাতৃগণের এবং গণেশের পূজার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে । সকল কর্মের প্রথমে গণপতি ও মাতৃগণের পূজা করার বিধি, এই সংহিতায় দৃষ্ট হয় । চিত্র, প্রতিমা বা পটে পূজার কথা এই সংহিতায় উল্লিখিত আছে । তর্পণ, শ্রাদ্ধ, পিণ্ড ও অশৌচাদির বিষয় এই সংহিতায় উক্ত হইয়াছে । জ্যোতির্ বর্ডমানে কনিষ্ঠ কিরূপ অবস্থায় বিবাহ করিতে পারে, মহর্ষি কাত্যায়ন এই সংহিতায় বর্ণন করিয়া গিয়াছেন । এই সংহিতায় উষা এবং রাম-সীতার প্রসঙ্গ আছে । কাত্যায়ন নামে বহু ঋষির পরিচয় পাওয়া যায় । সংহিতাকার কাত্যায়ন—গোভিলের পুত্র বলিয়া কথিত হন । *

দ্বাদশ—বৃহস্পতি-সংহিতা । এই সংহিতা মাত্র অশীতি সংখ্যক শ্লোকে নিবদ্ধ । দেবরাজ ইন্দ্র, এক শত বজ্র সম্পন্ন করিয়া, বাগিপ্রার্থ বৃহস্পতিকে জিজ্ঞাসা করেন,—“হে ভগবন্ ! কোন্ কোন্ বস্ত্র দান করিলে সর্বদা সুখবুদ্ধি হয়, বৃহস্পতি-সংহিতা । তাহা আমাকে বলুন ।” তদনুসারে বৃহস্পতি যে দান-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন, এই সংহিতায় তাহাই লিপিবদ্ধ আছে । এ হিসাবে স্ত্ররওক্ত বৃহস্পতিই এই সংহিতার প্রবর্তক ।† কিন্তু এক্ষণে যে ভাবে এই সংহিতা প্রচারিত, তাহাতে পরবর্ত্তি-কালে ইহা লিপিবদ্ধ হইয়াছিল বলিয়াই অনেকে বিশ্বাস করেন । এই সংহিতার সার বর্ড—দান-ধর্ম । দীর্ঘিকা, কুশ, পুষ্করীণী, উদ্যান প্রভৃতি নিৰ্ম্মাণের পুণ্য-ফল, এই সংহিতায় বিশদ-ভাবে বর্ণিত আছে । এই সংহিতার মধ্যে—যে ব্যক্তি

* এই গ্রন্থের বর্ড পরিচ্ছেদে ৭৭ পৃষ্ঠায় কাত্যায়ন-দ্বাদশ ঋষিগণের পরিচয় দ্রষ্টব্য ।

† এই গ্রন্থের ১৪শ পরিচ্ছেদে ১০২ পৃষ্ঠায় বৃহস্পতির প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য ।

শুক্লিণী খনন করে, কিংবা শুর্যতন গুরুত্বীয় পঙ্কোদ্ধার করে, সে ব্যক্তি সকল কুল উদ্ধার করিয়া বর্গলোক প্রাপ্ত হয়। * ব্রাহ্মণকে দান-সম্বন্ধে মাহাত্ম্য-কথা এই সংহিতায় উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্ম-মহাতে কুলক্ষয় হয়,—সংহিতাকার তাহা স্পষ্টঃ বলিয়া গিয়াছেন।

ত্রয়োদশ—পরশর-সংহিতা। মহর্ষি বেদব্যাসের নিকট ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করেন,—“কলিযুগে কোন্ ধর্ম, কিরূপ শৌচাচার, মনুস্তম্ভের মঙ্গলজনক, আপনি তাহার বর্ণন করুন।”

ব্যাসদেব তাহার উত্তর দেন,—“আমি সর্বতত্ত্বজ্ঞ নহি। চলুন,

পরশর-সংহিতা। আমার পিতার নিকট গমন করিয়া এতদ্বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ করি।”

তদনুসারে ব্যাস-প্রমুখ ঋষিগণ বদরিকাশ্রমে গমন করিয়া, পরশরের নিকট যে শাস্ত্রতত্ত্ব অবগত হন, তদনুসরণে এই পরশর-সংহিতা বিরচিত হয়। এই সংহিতার প্রথমেই প্রশস্ত্রলে ব্যাসদেব পিতাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—“আপনার নিকট বশিষ্ঠ, মনু, কশ্যপ, গর্গ, গৌতম, উশনঃ, অত্রি, বিষ্ণু, সংবর্ত, দক্ষ, অশ্বিনী, শাতাতপ, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, কাত্যায়ন, প্রচেতস, আপস্তম্ব, শম্ব প্রভৃতি ঋষিগণ প্রণীত ধর্ম-শাস্ত্র শ্রবণ করিয়াছি; কিন্তু তত্তৎশাস্ত্রোক্ত ধর্মসমূহ, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগের জন্তই নির্দিষ্ট। এক্ষণে চারি বর্ণের কলিযুগ-ধর্ম এবং কিছু কিছু সাধারণ-ধর্ম অবগত করুন।” উত্তরে পরশর বলেন,—“সত্য যুগের ধর্ম—তপস্বী, ত্রেতার ধর্ম—জ্ঞান, দ্বাপরে—যজ্ঞ, কলি যুগের একমাত্র ধর্ম—দান। সত্যযুগে—মনু-প্রবর্তিত ধর্ম, ত্রেতাযুগে—গৌতম-ব্যবস্থাপিত ধর্ম, দ্বাপরযুগে—শম্বলিখিত ধর্ম, কলিযুগে পরশর-নিরূপিত ধর্ম নির্দিষ্ট।” এই বলিয়া মহর্ষি পরশর একে একে কলি-ধর্ম বর্ণনা করেন। তাহার এই পরশর-সংহিতা দ্বাদশ অধ্যায়ে এবং পঞ্চাশত নিরানব্বই শ্লোকে সম্পূর্ণ। প্রথম অধ্যায়ে মহর্ষি বলিয়াছেন,—আচারই চতুর্ধর্মের ধর্মপালক; আচারভ্রষ্ট ব্যক্তির প্রতি ধর্ম পরাধীন;—

“চতুর্ধর্মণি বর্ণনামাচারো ধর্মপালকঃ। আচারভ্রষ্টেদেহান্যং ভবেৎকর্মপরাদুখঃ।”

এই অধ্যায়ে প্রতি বর্ণের কর্ম নির্দিষ্ট আছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে চারি আশ্রম, চারি বর্ষ এবং গৃহস্থের অনার্যাস-সাধ্য সাধারণ ধর্মোচ্চারের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে দেখা যায়,—বটকর্মনিরত ব্রাহ্মণ কৃষিকর্ম করিতে পারেন; ক্ষত্রিয়ও কৃষিকর্মের দ্বারা জীবিকা-অর্জনে এবং ব্রাহ্মণ-সেবায় অধিকারী। বৈশ্য ও শূদ্রগণ কৃষি-বাণিজ্য-শিল্পাদি দ্বারা জীবন-যাত্রা নির্বাহ করিতে পারে। পরন্তু বিজ্ঞ-সেবায় বিবাজিত হইলে, শূদ্রগণ অন্নাদি নিরয়গামী হয়। তৃতীয় হইতে ষষ্ঠ পর্যন্ত অধ্যায়-চতুষ্টয়ে জন্মধরণাশৌচের কথা পরিবর্ণিত হইয়াছে। এতদনুসারে চতুর্থ অধ্যায়ের বড়বিংশ শ্লোকে ‘বিধবা-বিবাহের ব্যবস্থা আছে’—এই বিবাসে, ভবিষ্যের বিবন বাদান্তবাদ চলিয়া থাকে। সেই শ্লোকটি এই;—

“নষ্টে কুতে প্রক্লিষ্টে ক্রীবেঃ পতিতে পতৌ। পক্ষবাগবৎ নারীনাং পতিবরণো বিধীয়তে।”

বিধবা-বিবাহের পক্ষগণ ইহার অর্থ এইরূপ নির্দেশ করেন,—“আমি নিরুদ্ধেপ হইলে, মরিলে, সংসার-ধর্ম পরিত্যাগ করিলে, ক্রীব হিঁস হইলে, অথবা পতিত হইলে, ক্রী-দিগের পুনর্যার বিবাহ শাস্ত্র-বিধিত।” কিন্তু বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধবাদিগণ এই শ্লোকের অর্থ

“পক্ষবাক্যং নবং কুর্বাৎ পুমানং বাপি ধারয়েৎ। স সর্বং কুলমৃত্যু নর্থে লোকে নরীকতে।”

করেন,—“যে পাত্রের সহিত বিবাহের কথাবার্তা হির হইয়া আছে,—সেই ভাবী পতি যদি নিরুদ্দেশ হয়, মরিয়া যায়, প্রেতজ্যা অবলম্বন করে, ক্রীত বলিয়া হির হয় বা পতিত হয়, তবে এই পঞ্চপ্রকার আপদে ঐ কত্তার পাত্রান্তরে প্রদান বিহিত।” এক পক্ষ বলেন,—শ্লোকটা বিবাহিত কত্তার সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে ; অন্য পক্ষ বলেন,—শ্লোকটা বাগদত্তা কত্তার সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে । যাহাই হউক, মহর্ষি পরাশর বিধবার ব্রহ্মচর্যের প্রাধিকারই যে কীর্তন করিয়া গিয়াছেন, পরবর্তী শ্লোকদ্বয়ে তাহা স্পষ্টতঃ উপলব্ধি হয় ;—

“মৃত্যু ভর্তারি বা নারী ব্রহ্মচর্যে ব্যবহিতা । সা মৃত্যু লভতে স্বর্গং বধা তে ব্রহ্মচারিণঃ ॥

তিপ্রঃ কোট্যর্ধ কোটী চ যানি রোমাণি যানবে । তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গং ভর্তারং প্রহৃৎস্বতী ॥

ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং বিলাহুচ্ছরতে বলাৎ । এবমুচ্ছৃত্য ভর্তারং তেনৈব সহযোজতে ॥”

অর্থাৎ, ‘স্বামী মরণান্তে যে নারী ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করেন, তিনি মৃত্যুর পর ব্রহ্মচারীর জায় স্বর্গলাভ করেন । আর স্বামীর মরণে যিনি সহমৃত্যু হন, তিনি শার্ক ত্রিকোটি কাল স্বর্গভোগ করেন । ব্যালগ্রাহী যেমন গর্ভ হইতে সর্পকে বল-পূর্বক বাহির করিয়া আনে, সহমৃত্যু নারী তেমনি মৃত পতিকে উদ্ধার করিয়া আনন্দ উপভোগ করে ।’ ফলে, পতির মৃত্যুর পর, জীলোকের পক্ষে ব্রহ্মচর্য অথবা সহমরণের ব্যবস্থাই প্রকৃষ্ট বলিয়া বুঝা যাইতেছে । সহমরণ এখন বিধি-নিষিদ্ধ ; সুতরাং বর্তমান কালে বিধবার পক্ষে ব্রহ্মচর্যই শ্রেয়ঃ ;—ইহাই এখন হিন্দুসমাজের অভিমত । পরাশর-সংহিতার সপ্তম অধ্যায়ে দ্রব্যশুদ্ধির বিষয়, অষ্টম হইতে দশম অধ্যায়দ্বয়ে নানাবিধ প্রায়শ্চিত্ত-সংস্কারের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হইয়াছে । পরাশর এই সংহিতার নানা স্থানে মহাসংহিতার মতই প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন । তীর্থযাত্রা ও তীর্থস্থান-দর্শন প্রসঙ্গে এই সংহিতায় সেতুবন্ধ-দর্শনের পূণ্য-কথা লিখিত আছে । পাপচারীর সহিত একত্র বসবাসে, শরীরে যে কিরূপ-ভাবে পাপ সংক্রমিত হয়,—পরাশর একটা সুন্দর উপমায়া তাহা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন ;—

“আসনাদয়নাদ্যনানং সন্তাযাং সহভোজনানং । সংক্রামন্তি হি পাপানি তৈলবিন্দুরিষাভসি ॥”

অর্থাৎ,—জলের উপর তৈলবিন্দু পতিত হইলে তাহা যেমন সর্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে, পানীর সহিত বসিলে, শয়ন করিলে, গমন করিলে, আলাপ করিলে, ভোজন করিলে শরীরে সেইরূপ পাপ-সংক্রমণ হইয়া থাকে ।

চতুর্দশ—ব্যাস-সংহিতা । মহর্ষি বেদব্যাস এই সংহিতার প্রবর্তক । চারিটি সূত্র অধ্যায়ে ছই শত একচল্লিশটি শ্লোকে সম্পূর্ণ । বারাণসী ধামে অবস্থানকালে, মহর্ষি বেদব্যাস

মুনিগণের নিকট চারি বর্ষের কর্তব্য-বিষয়ে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, ব্যাস-সংহিতা । ইহাতে তাহাই উল্লিখিত আছে । স্নেহ-শব্দের ব্যবহার আছে দেখিয়া,

এই সংহিতা মুসলমান-শাসন-সময়ে রচিত হইয়াছে বলিয়া অনেকের ভ্রম ধারণা । এই সংহিতার মানবের নিত্য কর্তব্য-কর্মের ও সংস্কার-বিধির আলোচনা আছে, দানধর্মের ও দানের কলাফলের বিষয় পরিকীর্ণিত হইয়াছে । এই সংহিতার মতে,—বিধবা নারীদিগের ব্রহ্মচর্য অথবা সহমরণ শ্রেয়ঃ । এই সংহিতার কোনও কোনও অংশ প্রকৃষ্ট বলিয়া অনেকে অমূল্য করেন ।

পঞ্চদশ—শম্ম-সংহিতা। এই সংহিতা শম্ম ঋষি প্রণয়ন করেন। ক্ষুদ্র রূপে অষ্টাশ্লোক অধ্যায়ে তিন শত চৌদ্দটি শ্লোকে ইহা সম্পূর্ণ। এই সংহিতার একাদশ এবং ষাটশ অধ্যায়ের ক্রিয়দংশ গড়ে বিরচিত। তাহাতে এবং এই সংহিতার শম্ম-সংহিতা। বর্ণিত বিষয়-পরম্পরা দৃষ্টে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহাকে একখানি প্রাচীন সংহিতা বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের মতে,—শুক্র-সাহিত্যের আভাস এই সংহিতায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহর্ষি শম্ম বলেন,—যজ্ঞ, যাজ্ঞ, দান, অধ্যাপনা, প্রতিগ্রহ এবং অধ্যয়ন,—বিপ্রগণ এই ছয়টি মাত্র কার্যের অধিকারী; দান, অধ্যয়ন ও যজ্ঞ,—এই তিনটি কার্যে ক্ষত্রিয়ের ও বৈশ্যের অধিকার; এতদতিরিক্ত, ক্ষত্রিয় প্রজাপালনে এবং বৈশ্য কৃষি-বাণিজ্যে অধিকারী; শূদ্র দ্বিজ-সেবায় এবং শিল্প-কার্যে জীবন-যাত্রা নির্বাহ করিবে। ক্ষমা, সত্য-বাক্য, ইন্দ্রিয়-দমন ও শৌচ,—এই চারিটি কার্যে সকল বর্ণেরই সমান অধিকার এবং সকলেরই উহা কর্তব্য-কর্ম মধ্যে গণ্য। এই সংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রাহ্মণের উপাধি ‘শর্মা,’ ক্ষত্রিয়ের উপাধি ‘বর্মা,’ বৈশ্যের উপাধি ‘ধন’ এবং শূদ্রের উপাধি ‘দাস’ নির্দিষ্ট আছে। দ্বি-জাতি কি প্রকারে ত্রাত্যত্র প্রাপ্ত হন, এই সংহিতায় তাহার আভাস পাওয়া যায়। উচ্চবর্ণ শূদ্রের কন্যা বিবাহ করিলে পাতকগ্রস্ত হইবে, স্নেহদেবে শ্রদ্ধা করিলে বা স্নেহদেবে গমন করিলে পণ্ডিত হইতে হইবে,—এই সংহিতায় উক্ত হইয়াছে। চতুর্দশ অধ্যায়ে গয়া, প্রভাস, পুন্ড্র, প্রয়াগ, নৈমিষারণ্য, গঙ্গা, যমুনা, অমরকটক, নর্মদা বারাগঙ্গা, বুরুক্ষেত্র প্রভৃতি তীর্থের মাহাত্ম্য পরিবর্ণিত। এতদ্ব্যতীত, এই সংহিতার অশৌচ, প্রায়শ্চিত্ত, ভক্ষ্যভক্ষ্য-বিচার প্রভৃতি নানা প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়।

যোড়শ ও সপ্তদশ—লিখিত ও দক্ষ-সংহিতা। লিখিত-সংহিতা বিরানব্বইটি শ্লোকে এবং দক্ষ-সংহিতা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাতটি অধ্যায়ে দুই শত এগারটি শ্লোকে সম্পূর্ণ। লিখিত-লিখিত-সংহিতা সংহিতা—লিখিত-ঋষি-প্রণীত, এবং দক্ষ-সংহিতা—প্রজাপতি দক্ষ ও কর্তৃক পরিবর্ণিত হয়। লিখিত-সংহিতার মতে,—পুরুষিণ্যাদি ধনন দক্ষ-সংহিতা। এবং ব্রাহ্মণের পক্ষে অগ্নিহোত্র যজ্ঞ পুণ্যজনক কর্ম। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য যে কেহ জলদান করিবে, তাহারই মুক্তিলাভ হইবে,—এই সংহিতা পুনঃপুনঃ তাহা নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। ৬কাণ্ডদানে বাস, গয়াধামে পিণ্ডদান—সংহিতাকারের মতে শ্রেয়ঃ-কার্য। লিখিত-ঋষি বলেন,—যে বে কার্যে আপনাকে অমঙ্গল-যুক্ত বিবেচনা করিবেন, একশত আট বার গায়ত্রী জপ করিলে, ব্রাহ্মণের তাহাতে মঙ্গল হইবে। দক্ষ-সংহিতায় গৃহস্থের নিত্য-কর্ম অতি সুন্দর-রূপে পরিবর্ণিত আছে। শৌচাশৌচ ও যোগ-প্রসঙ্গ এই সংহিতায় দেখিতে পাওয়া যায়। প্রজাপতি দক্ষের মতে ধর্মই সকল সুখের আকর; বাঁহার যে ধর্ম নির্দিষ্ট আছে, তিনি সেই ধর্ম পালন করিলেই মুক্তিলাভের অধিকারী হন। জীবলোকের সহযরণ-সম্বন্ধে পরাশর-সংহিতার শ্লোকটি (‘ব্যাগপ্রাণী’ ইত্যাদি) এই সংহিতায় অবিকল দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ এক এক সংহিতার অনেক শ্লোকের সহিত অতীত সংহিতার অনেক শ্লোকের অন্তর্যাস দৃষ্ট হয়।

অষ্টাদশ—গৌতম-সংহিতা । এই সংহিতা ঊনত্রিশটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অধ্যায়ে বিভক্ত, এবং গুণ্ডে লিখিত । গৌতম ঋষির হৃদ্র অবলম্বন করিয়া এই সংহিতা বিরচিত ; ইহার স্থানে স্থানে হৃদ্রের ভাষা পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে । এই সংহিতায় উপনয়ন, গৌতম-সংহিতা । বেদাধ্যায়ন, গৃহধর্ম ও সন্তানোৎপাদন প্রভৃতির উপদেশ নিবদ্ধ আছে ; রাজার কার্য্য, বিচার-পদ্ধতি, শৌচাশৌচ, শ্রাদ্ধ, প্রায়শ্চিত্ত, টৈপত্রিক ধন-বন্টন প্রভৃতির প্রসঙ্গও ইহাতে পরিবর্ণিত । বিশেষ বিশেষ বিষয়ের মীমাংসায় মত-বৈধ ঘটিলে, এই সংহিতার মতে, পরিষদের দ্বারা তাহার মীমাংসা করাওয়া লইতে হইবে । চারিজন বেদজ্ঞ, ত্র্যঙ্গচর্যা গার্হস্থ্য ও বাণপ্রস্থ—এই তিন আশ্রমের তিন জন সচ্চরিত্র ব্যক্তি, এবং তিন তিন ধর্মমতাবলম্বী তিন জন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি লইয়া, এইরূপ পরিষৎ গঠিত হওয়া আবশ্যক । পরিষদের অভাবে বেদজ্ঞ শিষ্ট ব্রাহ্মণে মীমাংসা করিয়া দিবেন । এই সংহিতার মতে,—জ্ঞান অতিনিবেশ দ্বারাই ধর্ম হয়, স্ব স্ব ধর্ম পালন করিলেই ধাত্মিক ব্যক্তিগণ স্বর্গলাভ করেন ।

ঊনবিংশ—শাতাতপ-সংহিতা । শিষ্য শরতঙ্গ ঋষির নিকট শাতাতপ ঋষি কক্ষফল-তত্ত্ব-বিষয়ে যে উপদেশ দেন, এই সংহিতায় তাহাই নিপিবদ্ধ হয় । এই সংহিতা ছয়টি অধ্যায়ে দুই শত একত্রিশটি শ্লোকে সম্পূর্ণ । এই সংহিতার মতে,— শাতাতপ-সংহিতা । মানুষের যত কিছু ক্রেশভোগ, সমস্তই জন্মান্তরীণ পাপকর্ম-বশতঃ ঘটয়া থাকে ; প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সেই পাপ মুক্তির সম্ভাবনা নাই । সংহিতাকার তাই বিভিন্ন প্রকার পাপ-নাশের জন্য বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্ত্তি নিম্নাণ করিয়া তাহাদিগের পূজার উপদেশ দিয়াছেন । এই সংহিতার প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে চতুশ্লোপ একা, ত্রিনেত্র বিষ্ণু, মহিষবাহন যম, বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ, অশ্বিনা, কুবের, ইন্দ্র, প্রচেতস্ এবং সরস্বতী-পূজার বিধান দেখিতে পাওয়া যায় । তাহাতে সুবর্ণ-রক্তাদির দ্বারা দেব-দেবীর মূর্ত্তি প্রস্তুত করাওয়া, পূজা সমাপনাতে সেই মূর্ত্তি-সমূহ ব্রাহ্মণকে দান করিবে,—এইরূপ উপদেশ আছে ।

বিংশ—বশিষ্ঠ-সংহিতা । এই সংহিতা একবিংশ অধ্যায়ে বিভক্ত, এবং পদ্য ও গদ্য দ্বিবিধ ভাবে লিখিত । বশিষ্ঠ কর্তৃক এই সংহিতার প্রবর্ত্তনা হইয়াছিল বলিয়াই ইহার নাম বশিষ্ঠ-সংহিতা । এই সংহিতার মধ্যেও হৃদ্র-সাহিত্যের বশিষ্ঠ-সংহিতা । প্রভাব বিশেষরূপে বিদ্যমান । এই সংহিতার মতে,—“ধর্ম্মই মুক্তির নিদান ; বেদবিহিত-কার্য্যই ধর্ম্ম ; বেদ-বিধি না জানিতে পারিলে শিষ্টাচারকেই ধর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করিবে ।” বশিষ্ঠ-সংহিতার অনেকাংশে মহুসংহিতারই অন্তর্গত দৃষ্ট হয় ; ইহাতে মহুসংহিতার অনেক শ্লোক দৃষ্টান্ত-স্বরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে । প্রসঙ্গতঃ এই সংহিতায় গৌতমাদি অন্যান্য সংহিতার মতান্তরেও দেখিতে পাওয়া যায় । এই সংহিতায়, প্রায়শ্চিত্ত, ভক্ষ্যভক্ষ্য-বিচার, ব্যবহার-বিধি, পুত্রাদির প্রসঙ্গ, রাজধর্ম্ম প্রভৃতি বিবিধ বিষয় আলোচিত হইয়াছে । আচার-রক্ষাই, এই সংহিতার মতে, প্রথম ধর্ম্ম । সংহিতাকার বলেন,—“আচারো পরমো ধর্ম্মঃ সর্ব্বোপাধিঃ নিশ্চয়ঃ ।” এই সংহিতার

মতে,—বাগ্‌দত্তা কস্তার বিবাহ অস্ত্র পাতে হইতে পারে । এই সংহিতাকারই স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ করিয়াছেন,—“ন য়েচ্ছভাষাং শিক্কেৎ ।”

বিশাশত সংহিতার আলোচনার, আমরা হিন্দু-সমাজের একটা প্রস্তুট-চিত্র দেখিতে পাই । একটি জাতি কতদূর উন্নত হইলে, তাহার দৈনন্দিন কার্য্যাবলী ঐরূপভাবে লিপিবদ্ধ হইতে

সংহিতা-সমূহে
সামাজিক
চিত্র ।

পারে, সে চিত্র তাহারই প্রকৃষ্ট পরিচয় । সমাজের সুশৃঙ্খলা রক্ষা করিতে হইলে, মনুষ্যের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সুখ সাধন করিতে হইলে, সমাজ-মধ্যে কিরূপ আচার-ব্যবহার ও বিধি-ব্যবস্থার

প্রচলন আবশ্যক,—সংহিতা-সমূহে আমরা তাহার পরিচয় পাই । বাদৃশ কর্ম্মানুষ্ঠান-পরম্পরায় সমাজ উন্নতি লাভ করিতে পারে, এবং বাদৃশ কর্ম্ম পরিবর্ত্তন করা মনুষ্যের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন,—তাহারই বিধি-নিষেধ, সংহিতা-সমূহে বিশদরূপে পরিবর্ণিত আছে । প্রাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া পরদিন শয্যা-ত্যাগ পর্য্যন্ত, কোন্‌ শ্রেণীর লোকের কিরূপ কার্য্য কর্তব্য,—কিরূপভাবে মুখ-প্রক্ষালন, স্নান-ভোজন, পূজা-ব্রত প্রভৃতি বিষয়ে,—সংহিতা-সমূহে তাহার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে । ব্রাহ্মণাদি চতুর্ভুজের, স্ত্রী-পুরুষ সকলের, নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম-পদ্ধতি-বিধানই, সংহিতা-সমূহের উদ্দেশ্য । স্বধর্ম্ম-পালনে এবং সত্য ও সদাচার-রক্ষায়, সকল সংহিতাই সমভাবে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন । ঐহাদের বিশ্বাস, আপনাদিগের প্রাধান্য-রক্ষার জগ্‌ই ব্রাহ্মণগণ সংহিতাদি শাস্ত্রগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন । সংহিতা-সমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিলে, ঐহাদের সে ভ্রম বিদূরিত হইতে পারে ; পরন্তু, সংহিতা-সমূহে ঐহারা সংহিতাকারগণের মহান সাম্যভাবের—ভায়-নিষ্ঠার পরিচয় পাইতে পারেন । সকল সংহিতাই ব্রাহ্মণকে সর্ব-বর্ণের শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু সেই ব্রাহ্মণও যদি তপস্তা-বিহীন মুর্থ ও লোভী হন, ঐহাকে নরকস্থ হইতে হইবে, সংহিতা-সমূহের ইহাই মত । ব্রাহ্মণকে অস্ত্রাশ্রয় বর্ণ সম্মান করিবে, আরাধনা করিবে,—সংহিতায় এরূপ আদেশ আছে বটে ; কিন্তু ব্রাহ্মণও অস্ত্রাশ্রয় বর্ণকে স্নেহের চক্ষে দেখিবেন, কদাচ তাহাদের অনাদর করিবেন না, অভদ্র হইলেও ভদ্রবাক্য প্রয়োগ করিবেন,—ইহাও কথিত হইয়াছে । অগম্য-গমন, সুরাপান, অভক্ষ্য-ভক্ষণ,—সকল বর্ণের পক্ষেই পাপমূলক ; অধিকন্তু, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের পক্ষে ঐরূপ পাপে গুরু-দণ্ডের ব্যবস্থা বিহিত আছে । সে ক্ষেত্রে উচ্চ-নীচ-গুরু-লঘু ভেদ নাই ; সকলের পক্ষেই সমান দণ্ড, বরং ব্রাহ্মণাদির পক্ষে বিশেষ দণ্ডের ব্যবস্থা । সুরাপানে কোন্‌ বর্ণের কি দণ্ড বিহিত আছে, মনুসংহিতার একাদশ অধ্যায়ের একনবতিতম শ্লোকে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়,—

“সুরায় পীতা বিজামোহাদিগবর্ণায় সুরায় পিবেৎ । ভয়া স্বকায়ৈ নিদং ক্লেম্যত্যন্তে কিম্বিহাততঃ ॥”

বিজাতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য, যদি মোহ-বশতঃ কখনও সুরাপান করে, পাপ-ক্ষমার্থ তাহাকে অগ্নিবর্ণ বলন্ত সুরাপান করিয়া, দগ্ধীভূত হইতে হইবে ; সেইরূপভাবে আত্ম-নাশ ভিন্ন তাহার পাপক্ষয় হয় না । প্রায়শ্চিত্ত, দায়ভাগ এবং দণ্ডবিধি-সমূহ আলোচনা করিলে, সকল বর্ণের পক্ষেই সমান বিধি দৃষ্ট হয় । চৌর্য্যাপরাধে অপরাধী বি-জাতিকে বাদশ-বর্ষ বনবাসী অথবা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে ; সেখানেও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,

বৈশ্বের কোনই পার্থক্য নাই। পরদার-গমন-পাপযুক্ত ব্রাহ্মণের কি ভীষণ ওরুদণ্ডের ব্যবস্থাই বিহিত আছে! মন্বাদি-সংহিতা-সমূহে দৃষ্ট হয়,—উচ্চবর্ণ নীচ-বর্ণের কন্যা বিবাহ করিতে পারিতেন; কিন্তু তাহা হইলেও সেই অসবর্ণ-বিবাহের সন্তান কখনই শ্রেষ্ঠ-পদ-বাচ্য হয় নাই। মনু বলেন,—“স্ব-পরিণীতা ব্রাহ্মণীতে ব্রাহ্মণ কর্তৃক সমুৎপাদিত সন্তান ব্রাহ্মণ; ক্ষত্রিয় কর্তৃক স্ব-পরিণীতা ক্ষত্রিয়ার গর্ভে সমুৎপাদিত সন্তান ক্ষত্রিয়; বৈশ্য-কর্তৃক স্ব-পরিণীতা বৈশ্যার গর্ভে সমুৎপাদিত সন্তান বৈশ্য; আর, শূদ্র কর্তৃক স্ব-পরিণীতা শূদ্রার গর্ভে সমুৎপাদিত সন্তান শূদ্র। এতদ্বির, অসবর্ণা পত্নীতে সমুৎপাদিত সন্তান বর্ণসঙ্কর হয়, অর্থাৎ পিতার সহিত তাহার সর্বণ হয় না। অধষ্ঠ, নিষাদ, পারশব, মাগধ, চণ্ডাল, উগ্র, দাশ, বেণ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতি এই সঙ্করবর্ণের মধ্যে গণ্য।” আচার-ভেদে সর্বর্ণের মধ্যে বিবাহে যে জাতির উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহারা ‘ব্রাতা’ নামে অভিহিত হইত। ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় উভয়ের মধ্যেই ‘ব্রাতা’-জাতির উল্লেখ, মনুসংহিতায় দেখিতে পাওয়া যায়। সংস্কারভাবে এবং যজন-যাজনাদির অভাবে অনেক জাতি শূদ্রত্ব লাভ করিয়াছিল। মনুসংহিতার মতে,—“পৌণ্ড্রক, ওড়্র দ্রাবিড়, কষোজ, জবন, শক, পারদ, পহব, চীন, কিরাত, দরদ এবং খশ—এই কয়েক দেশোদ্ভব ক্ষত্রিয়েরা কন্দদোষে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল।” * মনুর এই উক্তিতে বেশ বুঝিতে পারা যায়,—এক সময়ে চীন, পারস্ত, কাষোডিয়া, আরব, তিব্বত প্রভৃতি দেশ ভারতবর্ষের অধীন ছিল, এবং সেই সকল দেশে ভারতীয় আর্য-হিন্দুগণের প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু সেই সকল দেশের লোক ক্রমশঃ আচার-রীতি হইয়া শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। কি প্রকারে প্রজাপালন এবং রাজ্যের সুরক্ষণ-দিখান হইতে পারে; মন্বাদি-সংহিতায় তাহার বিশিষ্ট নিয়মাবলী দেখিতে পাওয়া যায়। মনু বলেন,—“বিস্তৃতি-অনুসারে দুই, তিন, পাঁচ অথবা শত গ্রামের উপযুক্ত এক এক জন গ্রামনাথকের অধীনে এক এক দল সৈন্য রক্ষা করিয়া, এক একটা ‘গুপ্তা’ গঠন করিবে। প্রত্যেক গ্রামে এক এক জন গ্রামাধিপতি, এবং সেইরূপ দশ গ্রামের, বিংশতি গ্রামের ও সহস্র গ্রামের এক একজন অধিপতি নির্দিষ্ট হইবে। রাজা সকলের উপর বিরাজমান থাকিবেন। গ্রামাধিপতি স্ব-গ্রামে শান্তি-রক্ষায় সমর্থ না হইলে, তিনি তাঁহার উপরিস্থিত দশগ্রামাধিপতির নিকট সাহায্য গ্রহণ করিবেন। তিনিও যদি তৎপ্রতিকারে অসমর্থ হন, তাহা হইলে বিংশতিগ্রামাধিপতির নিকট তাহা জানাইবেন। তিনিও যদি অসমর্থ হন, তাহা হইলে বিংশতিগ্রামাধিপতি শতগ্রামাধিপতির নিকট, শতগ্রামাধিপতি সহস্র-গ্রামাধিপতির নিকট এবং সহস্রগ্রামাধিপতি রাজার নিকট সাহায্য গ্রহণ করিবেন। প্রত্যেক অধিপতি আপনাপন কার্যের গুরুত্ব-অনুসারে ভূমি-রাজি ভোগ করিবার অধিকারী হইবেন। রাজ-ভৃত্যগণ অধিকাংশ স্থলেই পরস্বাপহারী ও প্রবঞ্চক হয়; অতএব রাজা তাহাদিগের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবেন; উচ্চবংশ-সজ্জত তেজস্বী ব্যক্তিকে নগরের তত্ত্বাবধানের নিমিত্ত অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবেন। যে সকল রাজ-কর্মচারী প্রজার প্রতি পীড়ন করিবে বা প্রজার অর্থ শোষণ করিবে, রাজা তাহাদের সর্বস্ব গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে নির্বাসন-দণ্ডে

* মনুসংহিতা, ৮শম অধ্যায়, ৪৪শ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

দণ্ডিত করিবেন।” * জনসাধারণের অপরাধের জন্ত, অপরাধের ভারতম্যাহুসারে নানাবিধ দণ্ডের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অপরাধ-বিশেষে অঙ্গচ্ছেদ এবং প্রাণদণ্ড পর্য্যন্তের ব্যবস্থা ছিল। শূদ্র যদি জঘন্য ভাষায় দ্বি-জাতিকে গালি দেয়, তাহার পক্ষে জিহ্বাচ্ছেদ ; শূদ্র যদি কোনও অঙ্গের দ্বারা দ্বি-জাতিকে প্রহার করে, তাহার দণ্ড—সেই অঙ্গচ্ছেদ ; চোর যে অঙ্গ দ্বারা পরধন হরণ করিবে, পুনর্বার তেমন কার্য্য না করে, তজ্জন্ত রাজা তাহার সেই অঙ্গ ছেদন করিয়া দিতেন। কেবল শূদ্র বলিয়া নহে ;—এ বিষয়ে দ্বি-জাতির দণ্ড আরও গুরুতর। সে ক্ষেত্রে জ্ঞানের ভারতম্যাহুসারে দণ্ডের ভারতম্য হইত। চুরি করা পাপ-কার্য্য বুঝিয়াও কোনও শূদ্র যদি চুরি করে, সাধারণ চোরের অপেক্ষা তাহার দণ্ড—আট গুণ অধিক : তদ্রূপ বৈশ্ব-চোর ষোড়শ গুণ দণ্ডনীয়, ক্ষত্রিয়-চোরের বত্রিশ গুণ, ব্রাহ্মণ-চোরের চৌষষ্টি গুণ, এবং গুণবান ব্রাহ্মণ চোরের এক শত আটাইশ গুণ দণ্ড হইত। পরস্ত্রী-গমন সম্বন্ধেও অঙ্গচ্ছেদ-রূপ গুরু-দণ্ডের বিধান আছে। এইরূপ নানা অপরাধের কঠিন-কঠোর দণ্ড সংহিতা-শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। রাজ-কর গ্রহণ-সম্বন্ধে মহর্ষি মনু নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন,—“যাহাতে প্রজাবর্গের অগুমাত্র কষ্ট না হয়, সেই ভাবে বিশেষ বিবেচনা-পূর্ব্বক আপন রাজ্যমধ্যে রাজা রাজ-কর নির্ধারণ করিবেন ;—

যথাল্লাভমদন্ত্যাদং বাধ্যোকোবৎসবট্পদাঃ ।

তথাল্লাভো এহীতব্যো রাষ্ট্রাদ্রাজ্যিকঃ করঃ ॥

জলৌকার শোণিতপানের স্থায়, বস্ত্রের ছুদ্রপানের স্থায় এবং ভ্রমরের গধুপানের স্থায় অল্পে অল্পে প্রকার নিকট রাজার কর গ্রহণ করা কর্তব্য। ধাত্বাদি শস্ত্রের ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশাংশ এবং অধিকাংশ পণ্য-দ্রব্যের ষষ্ঠাংশ রাজার প্রাপ্য।” দাসদাসীগণের রুত্তি তখন এইরূপভাবে নির্দিষ্ট হইত ;—সাধারণতঃ তাহাদের দৈনিক বেতন—একপণ কাড়ি, ছয় মাস অন্তর বস্ত্র এবং মাসিক এক দ্রোণ (প্রায় দুই মণ) ধাত্ব প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। যোগ্যতাহুসারে বিশেষ বিশেষ ভূতাগণ ছয়গুণ পর্য্যন্ত বেতন প্রাপ্ত হইত। মনুর মতে,—বিবাদের মূল—অষ্টাদশবিধ। সেই অষ্টাদশ স্থানেই লোকে প্রধানতঃ বিবাদে প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং তদহুসারেই তিনি বিবাদ-নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। সেই অষ্টাদশ বিবাদ-স্থান-মধ্যে ঋণদান, সন্ত্রয়-সমুত্থান, বেতন-দান, ক্রয়-বিক্রয়ানুশয়, সীমা-বিবাদ, স্ত্রী-সংগ্রহণ, দ্যুতক্রীড়া প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। বিচার-পদ্ধতি-বিষয়ে দেখিতে পাওয়া যায়,—রাজা বা মন্ত্রী সকল কার্য্য পরিদর্শন করিতেন ; সময়ে সময়ে রাজার প্রতিনিধি-রূপে একজন বিদ্বান ব্রাহ্মণ, তিন জন সদস্তের সহিত ধর্ম্মাধিকরণে রাজ-কার্য্য নির্বাহ করিতেন। দুই এক স্থলে বিষয়-বিশেষে সংহিতা-সমূহের মধ্যে মতান্তর দৃষ্ট হইলেও, সকল সংহিতারই মূল প্রতিপত্ত,—আচার-রক্ষা, ধর্ম্ম-রক্ষা, সমাজ-শৃঙ্খলা-রক্ষা। সে পক্ষে, সকল সংহিতাই প্রধানতঃ প্রায় মনুসংহিতার মতাহুসারী ; সকলেই প্রায় এক পথের পথিক। তবে যে তাহাদের মধ্যে বিষয়-বিশেষে মতান্তর দৃষ্ট হয়, সে কেবল দেশ-কাল-পাত্রের সামঞ্জস্য-বিধানে প্রণালী-ভেদ মাত্র।

কোন সংহিতা কোন সময়ে সঙ্কলিত হইয়াছিল, তাহার নির্দিষ্ট কাল-নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কেহ কেহ অনুমান করেন,—‘সংহিতা-সমূহ একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের জনগণের জীবন-গতি নির্ণয় জন্য সঙ্কলিত হইয়াছিল। সে হিসাবে, স্বতি-সংহিতার অঙ্ক-সাহিত্যের যেমন এক যুগ আসিয়াছিল, স্বতি-সংহিতারও সেইরূপ এক যুগ উপস্থিত হইয়াছিল। তখন যে প্রদেশে যিনি প্রধান শাস্ত্র-বেত্তা ছিলেন, সেই প্রদেশের অন্য তিনি সেইভাবে স্বতি-সংহিতা-সমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন।’ দ্বিতীয়-পক্ষ বলেন,—‘সংহিতা-নিবন্ধ ভাব-পরম্পরা বহু পূর্ব হইতেই এদেশে প্রচলিত ছিল; কিন্তু উহা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছে,—সে অতি অল্প দিন মাত্র। এমন কি, কোনও কোনও সংহিতা মুসলমান-শাসন-সময়ে বিরচিত হওয়াও সম্ভবপর।’ তৃতীয় পক্ষের মত,—‘কোনও কোনও সংহিতা বহু পূর্ব কাল হইতে প্রচলিত থাকিলেও, উহার মধ্যের অনেক বিষয় পরবর্ত্তি-কালে সংযোজিত হইয়াছে।’ চতুর্থ পক্ষ বলেন,—‘স্বতি-সংহিতার মত-পরম্পরা অনাদিকাল হইতেই প্রচলিত। কেবল ভাষার পরিবর্ত্তনে, সময়ে সময়ে উহা রূপান্তরে অবস্থিতি করে মাত্র।’ সংহিতা-সমূহের এই সময়-নির্ণয়-বিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মস্তিষ্ক সমধিক আন্দোলিত। তাঁহাদের প্রায় সকলেই মনুসংহিতাকে আদি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন বটে; কিন্তু খৃষ্ট-জন্মের বার শত আশী বৎসরের পূর্বে যেউহা বিরচিত হইয়াছিল,—কেহই তাহা স্বীকার করিতে সাহস করেন নাই। সেও কেবল—স্মার উইলিয়ম জোন্স্। এলফিনষ্টোন ও কাউয়েলের মতে,—৯শ শত পূর্ব-খৃষ্টাব্দে মনুসংহিতা রচিত হয়। ঐতিহাসিক হাণ্টার বলেন,—পাঁচ শত পূর্ব খৃষ্টাব্দে। অধ্যাপক উইলসনের মতে,—‘খৃষ্ট-জন্মের আট শত বৎসর পূর্বে মনু-সংহিতার কোনও কোনও অংশ বিদ্যমান ছিল; বৌদ্ধ-যুগের সম-সময়ে বা তাহার পরবর্ত্তি-কালে তাহাতে কোনও কোনও অংশ সংযোজিত হয়। পরিশেষে, খৃষ্ট-জন্মের দুই শত বৎসর পূর্ব হইতে উহা বর্ত্তমান আকার প্রাপ্ত হইয়াছে।’ যাহা হউক, ইউরোপের নানা ভাষায় এখন মনুসংহিতার অনুবাদ হইয়াছে। স্মার উইলিয়ম জোন্স্, হাটন, ডি’ল্যাণ্ড, বুলার, ল্যাসেলিয়া প্রভৃতির অনুবাদ—অধুনা ইউরোপের অনেক স্থলেই প্রচলিত। মনুসংহিতা প্রধান ও আদি বলিয়া, তদালাচনারই বাহুলা; অত্যাশ্চর্য সংহিতা সে হিসাবে অত্যন্ত আধুনিক বলিয়া, পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের নিকট উপেক্ষিত। যাহা হউক, স্মৃতাভাবে সংহিতা-সমূহের যদি আলোচনা করা যায়, তাহা হইলে উহার সঙ্কলন-কাল-নির্ণয়-সম্বন্ধে আমরাই বা কি অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারি? আমরা দেখিতে পাই,—মনুসংহিতার আভাস অত্যাশ্চর্য সংহিতায় আছে। এমন কি, কোনও কোনও সংহিতাকার মনুসংহিতার নামোল্লেখও আপন মত-প্রতিষ্ঠার ক্রটি করেন নাই। অথচ মনুসংহিতায় অন্য কোনও সংহিতার নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। বাজবল্ক্য-সংহিতার প্রথম অধ্যায়ে, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোকে, পরাশর-সংহিতার প্রথম অধ্যায়ে, ত্রয়োদশ চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শ্লোকে এবং অত্যাশ্চর্য নানা স্থানে মনুর প্রথম ও মনুর মত উল্লিখিত হইয়াছে। বিষ্ণু-সংহিতার এবং বশিষ্ঠ-সংহিতায়, উদাহরণরূপে মনুসংহিতার অনেক মত উদ্ধৃত হইয়াছে। মনুসংহিতায়

বদিও অত্রি, গৌতম, শৌনক ও ভৃগুর মতের উল্লেখ আছে, কিন্তু সে মত যে অত্রি বা গৌতম সংহিতার পরবর্ত্তি-কালে মনুসংহিতার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল, তাহা কোনক্রমেই বুঝা যায় না ; যেহেতু, মনুসংহিতায় 'সংহিতা' বলিয়া অত্র কোনও স্থতির নামোল্লেখ দৃষ্ট হয় না । পূর্বেই বলিয়াছি,—অত্রি প্রভৃতি ঋষিগণ অতি প্রাচীন-কালে বিद्यমান ছিলেন ; তাঁহাদের মত পরম্পরাও তখন প্রচারিত হইয়াছিল ; কিন্তু তখন তাহা বর্ত্তমান স্থতির আকার গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় না । তার পর, মনু-সংহিতার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আর এক কথা বলা যাইতে পারে ;—ঐ সংহিতায় রামায়ণের না মহাভারতের অর্থাৎ ত্রেতার বা কলির প্রারম্ভের কোনও পরিচয় নাই । পরন্তু, রামায়ণ ও মহাভারতে মনুসংহিতার বহু শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে । যাহারা বৌদ্ধ-যুগে মনুসংহিতা সঙ্কলিত হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করেন, তাঁহারাও ভ্রান্ত-বুদ্ধি-প্রণোদিত ; যেহেতু, বৌদ্ধ-ধর্মের বা বৌদ্ধদিগের কোনই নাম-গন্ধ মনুসংহিতায় দৃষ্ট হয় না । মনুসংহিতায় 'মাগধ' শব্দের উল্লেখ আছে দেখিয়া, বৌদ্ধ-যুগে মগধ-রাজ্যের উন্নতির স্থতি স্মরণ করিয়া, মনুসংহিতা বৌদ্ধ-যুগের পরিবর্ত্তি-কালে সঙ্কলিত হইয়াছিল বিবেচনা করাও সমীচীন নহে । মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ের একাদশ ও সপ্তদশ শ্লোকে যে 'মাগধ' শব্দদ্বয় দৃষ্ট হয়, তাহার অর্থ,—বৈশ্ব-কর্ত্ত্বক কত্রিয়া-গর্ভ-সম্ভূত সন্তান । 'শ্রেষ্ঠ'-শব্দের উল্লেখ আছে বলিয়া, উহা মুসলমান শাসনের সময়ে বিরচিত হইয়াছিল বলিয়া যাহারা মনে করেন তাঁহাদের যুক্তির অসারত্বও পূর্বেই (এই গ্রন্থের ১৪৫ পৃষ্ঠায়) প্রতিপন্ন করিয়াছি । যাজ্ঞবল্ক্য এবং পরাশর-সংহিতায় অন্যান্য সংহিতার নামোল্লেখ আছে দেখিয়া, ঐ দুই সংহিতা অন্যান্য সংহিতার পরবর্ত্তি-কালে সঙ্কলিত হইয়াছিল,—অনেকে এইরূপ অনুমান করিয়া থাকেন । তাঁহাদের মতে,—'বিক্রমাদিত্যের পূর্বে এবং বৌদ্ধ-ধর্মোৎপত্তির পরবর্ত্তি-কালে, খৃষ্ট-জন্মের চারি পঁচ শত বৎসর পরে, যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা বিরচিত হইয়াছিল ; এবং পরাশর সংহিতা আরও পরবর্ত্তি-কালের রচনা ।' কিন্তু এ সিদ্ধান্তও সমীচীন নহে । কাভ্যায়ন-সংহিতায় রাম-সীতার কথা আছে ; * শাতাতপ-সংহিতায় হরিবংশ ও মহাভারত-পাঠের সার্থকতা কীৰ্ত্তিত হইয়াছে ; † অবচ, ঐ দুই সংহিতার নাম পরাশর ও যাজ্ঞবল্ক্যও দেখিতে পাওয়া যায় । ইহাতে তর্কচ্ছলে পরাশর ও যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতাব্যকে, কাভ্যায়ন ও শাতাতপ সংহিতার, অতএব রামায়ণ ও মহাভারতের, পরবর্ত্তি-সময়ের সঙ্কলিত গ্রন্থ বলা যাইতে পারে । কিন্তু ভাণ্ড হইলেও খৃষ্ট-জন্মের বহু পূর্বে ঐ দুই সংহিতা যে সঙ্কলিত হইয়াছিল, সর্ব্ব প্রকারেই তাহা প্রমাণিত হয় । বাপরাষ্ট্রে কলির প্রারম্ভে যে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ হয়, সে তো প্রায় পঁচ-সহস্রাব্দিক বৎসর অতীত হইতে চলিল ! ‡ স্মৃত্যায় খৃষ্ট-জন্মের পরবর্ত্তি-কালে স্থতি-সংহিতা প্রণীত হইয়াছিল,—এরূপ মনে করা কোনক্রমেই সম্ভব হইতে পারে না । বিংশতি-সংহিতা আলোচনা করিলে, আমরা কতকগুলি নৃশতির নাম দেখিতে পাই ; মনু, পৃথু, নহষ, বেণ,

* কাভ্যায়ন-সংহিতা, বিংশ অধ্যায়, ১০ম শ্লোক ।

† শাতাতপ-সংহিতা, দ্বিতীয় অধ্যায়, ৩১শ ও ৩৭শ শ্লোক ।

‡ এই গ্রন্থের পরিচ্ছেদসমূহে—'মহাভারত' প্রসঙ্গে এতদালোচনা জটীল ।

সুদাস, সুঘুৰ, নিমি, দক্ষ, দিলীপ, রাম প্রভৃতি । সংহিতা-সমূহ যদি একান্ত পরবর্ত্তি-কালের রচনা হইত, তাহা হইলে তৎকালবর্ত্তী অত্যাগত রাজগণের নামও কোনও-না-কোনও আকারে এতন্মধ্যে স্থান পাওয়া সম্ভবপর ছিল । বৌদ্ধ-যুগে বা মুসলমান-শাসনের সময়ে হিন্দু-সমাজ যেরূপ বিচঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে, তৎকালে সংহিতা-সমূহ রচিত হইলে নিশ্চয়ই তাহার কোনও-না-কোনও উল্লেখ দেখিতে পাইতাম । সংহিতা-সমূহের প্রতি দৃষ্টপাত করিলেও, উহা আধুনিক বলিয়া প্রতীত হয় না । ফলে, হিন্দুর বিশ্বাস,— সংহিতা-সমূহ আবহমানকাল প্রচলিত আছে । যুগে যুগে ভাবার তারতম্যে যদিচ উহার কোনও কোনও অংশ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্ত্তিত হওয়া অসম্ভব নহে ; কিন্তু ভাবপরম্পরায় যে পূর্বাপর সমভাবেই বিद्यমান রহিয়াছে, তাহা মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করা যায় ।

স্মৃতি-সংহিতার প্রসঙ্গ আলোচনা করিতে করিতে স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের স্মৃতি আপনাপনিই মনোমধ্যে জাগিয়া উঠে । যদিও রঘুনন্দন তুলনায় সে দিনের লোক—সেদিন মাত্র বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মতামুসারে বঙ্গদেশের হিন্দু-সমাজ এখনও পরিচালিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ । স্মৃত্তরাং স্মৃতির কথা কহিতে হইলে, এখন তাঁহার কথা কহিবার প্রয়োজন হয় । বৌদ্ধ-ধর্ম্মের

স্মার্ত্ত
রঘুনন্দন ।

উদ্যম-ভরস্বাভিঘাতে বঙ্গ-সমাজ যখন বিভঙ্গ-প্রায়, মুসলমান-শাসনের সংসর্গাধীনে পড়িয়া হিন্দু-সমাজ যখন বিমলিন-প্রায়, ঘোর বিধর্ম্ম-কুজ্জটিকায় যখন বঙ্গের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত সমাচ্ছন্ন, সেই সময়ে নবদ্বীপে রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন । খৃষ্টীয় গোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, খ্রীষ্টচতুস্তরের আবির্ভাবের মাত্র কুড়ি পঁচিশ বৎসর পূর্বে, রঘুনন্দনের জন্ম হয় । তাঁহার পিতা হরিদেব (বন্দোপাধ্যায়) ভট্টাচার্য্যও নবদ্বীপের মধ্যে স্মার্ত্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন । কিন্তু রঘুনন্দন সেই পিতার স্মৃতি অধিকতর উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিলেন । সুলভান সৈয়দ হোসেন তখন বাঙ্গালার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ; চারি শত বৎসর অবাধ হ-ভাবে মুসলমান-সংসর্গে থাকিয়া, বাঙ্গালী তখন আপন রীতি-নীতি-আচার-ব্যবহারে ভ্রষ্ট হইতে বসিয়াছে । রঘুনন্দনের হৃদয়-দর্পণে যখন সেই চিত্র প্রতিভাত হইল, তখন তিনি সমাজ-সংস্কারের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিলেন । তিনি যতই সমাজের বিশৃঙ্খলার বিষয় ভাবিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার প্রাণ অধীর হইয়া উঠিল । তিনি দেখিলেন,— পণ্ডিতগণ তখন স্মৃতির মত লইয়া বিতণ্ডা আরম্ভ করিয়াছেন । তিনি বুঝিলেন,— ভিন্ন ভিন্ন স্মৃতিতে ভিন্ন ভিন্ন মত ব্যক্ত হইয়াছে দেখিয়া, জন-সাধারণ অধিকতর বিভ্রান্ত হইয়া পড়িতেছে ; অধিকন্তু, সেই মত-বৈষম্যের সুযোগ পাইয়া, ভিন্ন-ধর্ম্মীগণ আপন স্বার্থ-সিক্তির সুবিধা পাইতেছে ; তাহাতে মোহ-ঘোরে, কেহ বা ধর্ম্মাভ্যাসের আশ্রয় লইতেছে, কেহ বা নাস্তিকা-মতের অনুসরণ করিতেছে । এই দেখিয়া, সমাজের দারুণ দুর্দশার দিন বুঝিতে পারিয়া, রঘুনন্দন শ্রুতি-স্মৃতির সামঞ্জস্য বিধান—প্রকৃষ্ট মত স্থাপনে—প্রাণ-মন সমর্পণ করিলেন । পঁচিশ বৎসর কাল ঐকান্তিক সাধনার ফলে, ‘অষ্টাধিংশতি স্মৃতি-তত্ত্ব’ সঙ্কলিত হইল । তাহাতে শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-তত্ত্বাদি নানা শাস্ত্রের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া রঘুনন্দন পরস্পর-বিরোধী মত-সমূহের এক-বাক্যতা নিরূপণ করিলেন । অষ্টাধিংশতি

স্বতি-তষের সহিত রঘুনন্দনের বশঃ-প্রভা দিগ্দিগন্তে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। তাঁহার সেই অষ্টাবিংশতি স্বতি-তষের পরিচয়, তাঁহারই গ্রন্থে এইরূপ পরিবর্ণিত আছে ;—

“মলিন্যুচে দায়ভাগে সংস্কারে শুদ্ধি-নির্ণয়ে ।

প্রায়শ্চিত্তে বিবাহে চ তিথৌ জন্মাষ্টমী-ব্রতে ॥

দুর্গোৎসবে ব্যবহৃতাবেকাদশাদিনির্ণয়ে ।

তড়াগভবনোৎসর্গে বৃষোৎসর্গ-ক্রয়ে ব্রতে ॥

প্রতিষ্ঠায়াং পরীক্ষায়াং জ্যোতিষে বাস্তুযজ্ঞকে ।

দীক্ষারামাহিকৈ কৃত্যে ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমে ॥

সামশ্রাদ্ধে যজুঃশ্রাদ্ধে শূদ্রকৃত্য বিচারণে ।

ইত্যষ্টাবিংশতি স্থানে তস্য বক্ষ্যামি যত্নতঃ ॥”

‘মলমাস, দায়ভাগ, সংস্কার, শুদ্ধি, প্রায়শ্চিত্ত, বিবাহ, তিথি, জন্মাষ্টমী, দুর্গোৎসব, ব্যবহার, একাদশী, জলাগ্ন ও ভবন-উৎসর্গ, ঋগ্বেদীয় বৃষোৎসর্গ, সামবেদীয় বৃষোৎসর্গ, বজ্রুর্বেদীয় বৃষোৎসর্গ, ব্রত, দেব-প্রতিষ্ঠা, দিব্য, জ্যোতিষ, বাস্তুযাগ, দীক্ষা, আহিক, কৃত্য, পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র, সামবেদীয় শ্রাদ্ধ, যজুর্বেদীয় শ্রাদ্ধ, শূদ্রকৃত্য-বিচার,—এই অষ্টাবিংশতি-তস্য যত্ন-সহকারে আমি বর্ণন করিতেছি।’ বলা বাহুল্য, এই অষ্টাবিংশতি স্বতি-তস্য অমুসারেই বঙ্গদেশের প্রায় সমস্ত ক্রিয়া-কর্ম (একমাত্র উপনয়ন ভিন্ন) নির্বাহিত হইয়া থাকে। উপনয়ন-সম্বন্ধে পূর্ব-স্বতি পূর্ব-পদ্ধতি এখনও চলিয়াছে বটে ; কিন্তু অন্যান্য সকল কর্মে রঘুনন্দনের মতই অব্যাহত। অষ্টাবিংশতি স্বতি-তস্য প্রণয়ন করিয়া, কানী, মিথিলা প্রভৃতি স্থানে গমন-পূর্বক, তত্ত্বদেশের পণ্ডিতগণের সহিত রঘুনন্দন বিচার-বিতর্কে প্রবৃত্ত হন। তখন কেহই তাঁহার মতের প্রতিবাদ করিতে সমর্থ হন না। ফলে, রঘুনন্দনের মতই প্রতিষ্ঠা লাভ করে। রঘুনন্দন কিরূপভাবে এক এক বিষয়ের মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিলে বিশ্বাসবিষ্ট হইতে হয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, রঘুনন্দনের ‘তিথি-তষোক্ত’ একাদশী-প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেছি। যদি কাহারও মনে সংশয় উপস্থিত হয়,—একাদশী যদি ঋজ্বিত হইয়া দুই দিন স্থায়ী হয়, এবং দুই দিনই কর্মযোগ্য কাল প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে একাদশীতে বিহিত ধর্মকার্য্য কোন্ দিনে করিবে? রঘুনন্দন তাহার বিচার করিতেছেন,—“স চ পরযুতা গ্রাহ্য যুগ্মাৎ।” অর্থাৎ, একাদশী যে দিন পরষুতী তিথির সহিত সংযুক্ত হইবে এবং অবশ্য কর্মযোগ্য কাল প্রাপ্ত হইবে, একাদশী-বিহিত ধর্ম-কার্য্য সেই দিনই করিবে ; কেন-না, যুগ্মাদি-বিষয়ক বচনে এইরূপ নিয়মই করা হইয়াছে। ইহার পর, রঘুনন্দন অগ্নি-পুরাণ ব্রহ্ম-পুরাণ, ব্রহ্ম-বৈবর্ত-পুরাণ, নারদ-পুরাণ, তস্ম-সাগর, কৈমিনি-বচন, বরাহ-পুরাণ, ভবিষ্য-পুরাণ, কুর্শ-পুরাণ, মৎস্য-পুরাণ, বায়ু-পুরাণ, পদ্ম-পুরাণ, বামন-পুরাণ, মহাভারত এবং স্বতি-সমূহ হইতে একাদশী-সংক্রান্ত বচন-পরস্পরা উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেই বচন-সমূহের সামঞ্জস্য-বিধানে, কোন্ দিন, কোন্ সময়, কিরূপভাবে, একাদশী-তিথির সংযোগ থাকিলে, একাদশী-কৃত্য এবং উপবাসাদি ভ্রেষ্ট, রঘুনন্দন তাহা নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। প্রায় সকল শাস্ত্রের

সকল মত উদ্ধৃত করিয়া তিনি সংক্ষেপে আপন সিদ্ধান্ত মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন ।
দৃষ্টান্ত-স্বরূপ তাঁহার তিথিতত্ত্ব হইতে একাদশীর বিচার-সংক্রান্ত মত উদ্ধৃত করিতেছি ;—

“তদয়ং সংক্ষেপঃ । গৃহস্থাদীনামুভয়পক্ষে একাদশ্যমুপবাসেহধিকারঃ । হরিশয়নাত্তন্তরে তস্তাপ্য-
ধিকারঃ । বৈষ্ণব-পুত্রবদ্গৃহস্থ সৰ্ব্বকৃত্যামপ্যধিকারঃ । শুক্রবাররবিবারাদাব্যোেকাদশ্যমুপবাসে
ফলাধিকার্য । বিধবায়ান্ত সৰ্ব্বত্রাধিকারঃ । তত্রাষ্টাদাদধিকা পূর্ণাণীভিবর্ধমানবো নিত্যাদধিকারী । একাদশী-
ত্রত্যং নিত্যং । পারণ-দিনে দ্বাদশীলাভে সৰ্ব্বত্র পূর্ণাযেকাদশীং ত্যজ্য । ষণ্মামুপবসেৎ । তদলাভে গৃহী
পূৰ্ব্বাং, তদন্ত পরাং । বিধবাপি যদা তু পূৰ্ব্বদিনে দশম্যা পরদিনে দ্বাদশ্যা যুতৈকাদশী তদোত্তরামুপোষ্য
দ্বাদশ্যাং পারণং কুর্য্যাৎ । পারণ-দিনে দ্বাদশ্যনির্গমে তু ত্রয়োদশ্যামপি । যদা সূর্য্যোদয়ানন্তরং দশমী-
যুতৈকাদশী পরদিনে ন নিঃসরতি তদা তাং বিহায় পরদিনে দ্বাদশীমুপবসেৎ । যদা তু সূর্য্যোদয়-পূৰ্ব্বকালীন-
দশমীবিষ্টেকাদশী পরদিনে ন নিঃসরতি তদা তামুপবসেৎ । যদা তু তথা বিধা সতী পরদিনেহপি নিঃসরতি
তৎপরদিনে চ দ্বাদশী তদা তাং বিহায় ষণ্মামুপোষ্য দ্বাদশ্যাং পারয়েৎ । যদা তু ত্রয়োদশ্যে ভষ্মৈকাদশী
তৎপরদিনে চ ন দ্বাদশী তদা বষ্টিদণ্ডায়াকং বিজ্ঞামুপোষ্য পরদিনে দ্বাদশ্যাদ্যাপ্যদমুভীৰ্য্য পারয়েৎ ।
বৈষ্ণবস্ত তত্রাপি শুক্রপক্ষে পরামুপোষ্য ত্রয়োদশ্যাং পারয়েদতি । একাদশ্যমুপবাসঃ স্মৃতকাদাবপি কার্য্যঃ ।”

সংক্ষেপতঃ,— শুক্র কৃষ্ণ উভয় পক্ষের একাদশীতেই গৃহস্থাদির উপবাসে অধিকার ।
“হরিশয়নাত্তন্তরবর্তী একাদশীতেও তাঁহাদিগের অধিকার আছে । বৈষ্ণব এবং পুত্রবান্
গৃহস্থের সমুদয় ক্রষ্টেকাদশীতেই উপবাসে অধিকার । শুক্রবার এবং রবিবারাদিতে
একাদশী হইলে, তাহাতে উপবাসে অধিক ফল হয় । বিধবাদিগের কিন্তু সকল
একাদশীতেই উপবাসের অধিকার । আট বৎসর বয়স উত্তীর্ণ হইবার পর, উনাদশী বৎসর
বয়স পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রমী মহাত্মমাজেরই একাদশীর উপবাসে নিত্য অধিকার । এই
একাদশীতে উপবাস-রূপ ত্রত্যং নিত্য—অৰ্থাৎ সমর্থ হইয়া না করিলে, পাপভোগী হইতে হয় ।
যদি একাদশী প্রথম দিন পূর্ণা হইয়া অৰ্ধাৎ সূর্য্যোদয় কাল হইতে আরম্ভ হইয়া তৎপরদিন
সূর্য্যোদয়ের পরও কিছুক্ষণ স্থায়ী হয়, এবং তৃতীয় দিন দ্বাদশীও সূর্য্যোদয়ের পর কিছুক্ষণ
অবস্থিত হয় ; একরূপস্থলে, সকল ব্যক্তিরই, প্রথম দিনের পূর্ণ একাদশী ত্যাগ করিয়া, দ্বিতীয়
দিনের ষষ্ঠেকাদশীতেই উপবাস করিবে । যদি তৃতীয় দিন সূর্য্যোদয়ের পর দ্বাদশীর
স্থিতি না ঘটে, তাহা হইলে পুত্রবান্ ব্যক্তি প্রথম দিনের পূর্ণাতে উপবাস করিবে ; তন্নিম্ন
অপর সকলেই এবং বিধবাগণ দ্বিতীয় দিনের ষষ্ঠেকাদশীতে উপবাস করিবে । যদি
প্রথম দিন একাদশী সূর্য্যোদয়ের পরও দশমীযুক্ত, এবং দ্বিতীয় দিন সূর্য্যোদয়ের পরও
দ্বাদশীযুক্ত হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয় দিনের দ্বাদশীযুক্ত একাদশীতে উপবাস করিয়া, তৃতীয়
দিন দ্বাদশীর মধ্যেই পারণ করিবে । যদি তৃতীয় দিন সূর্য্যোদয়ের পর দ্বাদশীর অপ্রাপ্তি
ঘটে, তথাপি দ্বিতীয় দিনের ষষ্ঠেকাদশীর উপবাস, এবং তৃতীয় দিনের ত্রয়োদশীতেও
নির্দেশন পারণ করিবে । যে স্থলে প্রথম দিন সূর্য্যোদয়ের পর কিছুক্ষণ দশমী থাকিয়া
পরে একাদশী হইবে, কিন্তু ঐ একাদশী পরদিন অৰ্ধাৎ দ্বিতীয় দিন আর সূর্য্যোদয়ের
পর অবধি থাকিবে না, পূৰ্বেই নিঃশেষিত হইবে, একরূপস্থলে পূৰ্ব্ব বা প্রথম দিনের
দশমী-বিজ্ঞা একাদশীকেও ত্যাগ করিয়া পরদিনের নিছক দ্বাদশীতেই উপবাস করিবে ।
কিন্তু যে স্থলে প্রথম দিন সূর্য্যোদয়ের পূৰ্বে দশমী-বিজ্ঞা হইয়া একাদশী, পরদিন সূর্য্যো-

দয়ের পর আর অবস্থিত না হয়, সে স্থলে সেই হর্যোদয়ের পূর্বকালীন দশমী-বিদ্যা একাদশীতেই উপবাস করিবে। যে স্থলে একাদশী প্রথম দিন, হর্যোদয়ের পূর্বে দশমী-বিদ্যা হইয়া, দ্বিতীয় দিনেও হর্যোদয়ের পর কিছুক্ষণ অবস্থান করে, এবং তৃতীয় দিন দ্বাদশীও হর্যোদয়ের পর কিছুকাল অবস্থিত হয়, সে স্থলে প্রথম দিনের হর্যোদয়ের পূর্বকালীন দশমী-বিদ্যা একাদশীকে পরিত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় দিনের ঋগ্বেদকাদশীতেই উপবাস করিবে, এবং তৃতীয় দিনের দ্বাদশীর মধ্যেই পারণ করিবে। অত্ৰ্যদিকে যে স্থলে প্রথম দিন একাদশী হর্যোদয়ের পূর্বে দশমী-বিদ্যা হইয়া দ্বিতীয় দিন হর্যোদয়ের পর কিছুক্ষণ স্থায়ী হইবে, কিন্তু তৃতীয় দিন দ্বাদশী আর হর্যোদয়ের পরবর্ত্তিনী হইবে না, এরূপ স্থলে প্রথম দিনের ষাট-দণ্ড-ব্যাপিনী একাদশীতে উপবাস করিয়া দ্বিতীয় দিন দ্বাদশীর প্রথম পাদ উত্তীর্ণ হইবার পর পারণ করিবে। বৈষ্ণবগণ কিন্তু এরূপ স্থলে, শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয় দিনে ঋগ্বেদকাদশীতে উপবাস করিয়া তৃতীয় দিন ত্রয়োদশীতেই পারণ করিবে। এই একাদশীর উপবাস অশৌচাদিতেও কর্তব্য।” * এইরূপে আপন মত প্রতিষ্ঠা করিয়া, পরিশেষে কোন্ কোন্ স্থলে, কোন্ কোন্ শাস্ত্রের মতে একাদশী তিথিতেও কিরূপভাবে আহারাদির ব্যবস্থা হইতে পারে, রঘুনন্দন তৎসম্পর্কীয় মতসমূহ উদ্ধৃত করিয়াছেন। ফলতঃ, অগাধ হিন্দু-শাস্ত্র-সমুদ্র মন্বন করিয়া, যেখানে যে মত সমীচীন বুঝিয়াছিলেন, রঘুনন্দন আপন গ্রন্থনিচয়ে তাহাই সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। তিথিতত্ত্বাস্তর্গত একমাত্র একাদশী প্রসঙ্গেই এতাদৃশ পাণ্ডিত্য-প্রকাশ। সুতরাং বুঝা যায়, অষ্টাবিংশতি স্মৃতি-তত্ত্বের অসংখ্য বিষয়ের আলোচনায়, রঘুনন্দনের গবেষণা কীদৃশী ক্ষুর্দ্ভিলাভ করিয়াছিল। স্মৃতি-তত্ত্ব ভিন্ন রঘুনন্দন আরও বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তদ্বিগ্ৰহিত রাসবাহু-পদ্ধতি, প্রমাণ-তত্ত্ব, দায়ভাগের টীকা—বিশেষ প্রসিদ্ধ। কালীরাম বাচস্পতি এবং রাধামোহন গোস্বামী, রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি স্মৃতি-তত্ত্বের যে টীকা প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন; এখনও তাহা প্রচলিত। রঘুনন্দন—এখন স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য বা স্মার্ত্ত রঘুনন্দন নামে পরিচিত। সপ্ততি বর্ষ বয়সে, খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে, রঘুনন্দন লোকান্তরে গমন করেন। সে আজ প্রায় তিন শত বৎসরের অধিক কাল অতীত হইতে চলিল; কিন্তু আজিও তাঁহার অনুশাসনে বঙ্গদেশীয় হিন্দুসমাজ পরিচালিত।

বাস্তবায় যেমন রঘুনন্দন, ভারতের উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশে সেইরূপ শূলপাণি। বঙ্গদেশে যেমন রঘুনন্দনের মত প্রচলিত, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে তদ্রূপ স্মার্ত্ত-শিরোমণি শূলপাণি। শূলপাণির মত অব্যাহত। শূলপাণি অযোধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। কথিত হয়, প্রায় সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে তিনি বিদ্যমান ছিলেন; এবং দ্বিবিজয়ে বহির্গত হইয়া পণ্ডিত-সমাজে আপনার মত প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন যেরূপ-ভাবে স্মৃতি-স্মৃতির সামঞ্জস্য-বিধান পূর্বক সমাজের কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারণ করেন, স্মার্ত্ত শূলপাণিও সেই পদ্ধতিতেই আপন স্মৃতি-গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। কিংবদন্তী এই,—শূলপাণি বিধবা-বিবাহ প্রচলনের চেষ্টা করিতে গিয়া,

* তিথিতত্ত্ব—স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রণীতম। বঙ্গবাণী-কাগ্যালেয় হইতে প্রকাশিত।

আপনার কন্ঠার নিকট বিচারে পরাজিত হইয়াছিলেন। প্রথমে শূলপাণি স্থির করিয়াছিলেন, আপনার বিধবা কন্ঠার বিবাহ দিয়া, হিন্দু-সমাজে বিধবা-বিবাহের দৃষ্টান্ত স্থাপন করিবেন। কিন্তু তাঁহার সেই কন্ঠা বিহ্বলী ও ধর্মপ্রাণা ছিলেন; পিতার প্রস্তাব শাস্ত্র-বিরুদ্ধ অবৈধ মনে করিয়া, তিনি তাহার প্রতিবাদ আরম্ভ করেন। তদুপায়ে পিতা ও কন্ঠায় অনেক দিন ধরিয়া বিচার-বিতর্ক চলিতে থাকে। সেই সময় শূলপাণি একবার দেশান্তরে গমন করেন। বিদেশ-যাত্রার পূর্বে দেব-পূজার জন্ত তাঁহার গৃহে বজ্রাদি বহু সামগ্রী সঞ্চিত রাখিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু কিছু দিন পরে বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন,—তাঁহার কন্ঠা সেই সকল পুঞ্জোপকরণ লইয়া শিশু বালিকার ছায় ধূলাখেলা খেলিতেছে। শূলপাণি কন্ঠার এতাদৃশ ভাবান্তর-দৃষ্টে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কন্ঠাকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন,—“তুমি এ কি করিতেছ? পূজার সামগ্রী একরূপ-ভাবে ব্যবহার করিয়া অপবিত্র করা কি তোমার উচিত হইয়াছে?” কন্ঠা উত্তর দিলেন,—“আমার খেলা-ঘরের দেবতাকে আমি এই সমুদায় দান করিয়াছি; ইহাতে কি দোষ হইতে পারে? আপনার দেবতাকে ইহাই আবার দান করিবেন।” পিতা উত্তর করিলেন,—“একবার যাহা দান করিয়াছ, সেই উচ্ছিষ্ট সামগ্রী কি প্রকারে অত্র দেবতাকে পুনর্দান করিতে পারি?” কন্ঠা অমনি কহিলেন,—“তবে পুনরায় আমার বিবাহ দিতে কি প্রকারে প্রস্তুত হইয়াছেন? একবার দান করিয়া, আবার আমার কি প্রকারে সম্প্রদান করিতে পারিবেন?” এতদিন বিচার-বিতর্কে শূলপাণি যে মীমাংসায় উপনীত হইতে পারেন নাই, কন্ঠার ঈদৃশ বাক্যে তদ্বিয়ে তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল। আবার তিনি শাস্ত্র-সমুদ্র মন্বনে প্রবৃত্ত হইলেন। কলে, বিধবা-বিবাহ-প্রচলন-সম্বন্ধে তাঁহার পূর্ব-সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত বলিয়া প্রতীতি জন্মিল। তাঁহা বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধে শাস্ত্র-যুক্তি প্রদর্শনে বদ্ধপরিকর হইলেন। সেই হইতেই শূলপাণির স্মৃতি ভারত-বিখ্যাত। দাক্ষিণাত্যে অবশ্য শূলপাণি বা রঘুনন্দনের মত প্রচলিত নহে। প্রধানতঃ যম ও যজ্ঞবল্ক্যের মতই “নির্ণয়-সিদ্ধ” গ্রন্থে নিবদ্ধ হইয়া দাক্ষিণাত্যের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রচারিত আছে। সমগ্র স্মৃতি-শাস্ত্রের সার-সংগ্রহ-পূর্বক সমাজ-বিধি প্রবর্তনার জন্ত, এক দিকে রঘুনন্দন এবং অন্য দিকে শূলপাণি—দুই দিকে দুই দিক্‌পাল-রূপে যেরূপ প্রতিষ্ঠিত হন; সেইরূপ ‘মিতাক্ষরা’ সঙ্কলন-পূর্বক বিজ্ঞানেশ্বর ভট্টারক এবং ‘দায়ভাগ’ সঙ্কলন করিয়া জীমূতবাহন যশোসম্মান লাভ করেন। প্রধানতঃ তাঁহাদের অবলম্বন—যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা; কিন্তু স্মৃতি-পুরাণাদির সামঞ্জস্য-বিধানে তাঁহারা যে ভাবে মিতাক্ষরা ও দায়ভাগ সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন, পাশ্চাত্য-রীতিনীতি-নিয়ম-পদ্ধতি-প্রচলিত দেশেও অধুনা তাহা সমাদৃত হইতেছে। কোন্ অরণ্যভীত-কালে যে সংহিতা-তত্ত্ব ভারতে উদ্ভাসিত হইয়াছিল, আজিও তাহার প্রভাব অক্ষুণ্ণ,—ইহার অধিক সংহিতা-সমূহের নিত্য ও মৌলিকত্বের প্রমাণ আর কি হইতে পারে? হিন্দু-সমাজ কতকাল হইতে কিরূপ-ভাবে উন্নত-অবস্থায় অবস্থিত, ইহা তাহারই প্রকট নিদর্শন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ।

পুরাণ ।

[পুরাণ-প্রসঙ্গ,—পুরাণের লক্ষণ,—মহাপুরাণ ও উপপুরাণ,—পুরাণের শ্লোক-সংখ্যা,—পুরাণ-সম্বন্ধে নানা মত ;—অষ্টাদশ মহাপুরাণের সংক্ষিপ্ত তত্ত্ব,—বিষ্ণু-পুরাণে প্রাচীন ও ভবিষ্য রাজ-বংশ ;—শ্রীমদ্ভাগবতে কবিকের ক্ষুদ্রী ও শ্রীকৃষ্ণের লীলা-প্রসঙ্গ ;—অগ্নি-পুরাণে যুদ্ধাশ্রয়, যুদ্ধ-পদ্ধতি ;—ভবিষ্য-পুরাণে প্রাক্কিণ্ডের একটি চিত্র ;—মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবী-মাহাত্ম্য চণ্ডী ;—স্কন্দ পুরাণে ভীষ্ম-মাহাত্ম্য-প্রাধাত্ম ;—সর্ব পুরাণের সারসংক্ষেপ ও সমন্বয়-বিধান,—পুরাণে ইতিহাস ;—পুরাণ-রচনার কাল নির্দেশে বাদান্তবাদ ;—পুরাণে সামাজিক, রাজ-নৈতিক ও ধর্ম-বিষয়ক বিবিধ চিত্র ;—পুরাণ-সম্বন্ধে পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের মতালোচনা ।]

মহাদি-রচিত বিংশতি সংহিতার পরই—ভারতবর্ষে পুরাণের প্রাধাত্ম । পুরাণ—অনন্ত রস ভাণ্ডার । পুরাণে আৰ্য্য-হিন্দুগণের দৈনন্দিন ধর্ম্মানুষ্ঠান-পদ্ধতি পরিবর্ণিত আছে ;

পুরাণে প্রাচীন ইতিহাসের সার-তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে ; পুরাণে হিন্দু-

পুরাণ-প্রসঙ্গ । জাতির প্রতিষ্ঠার, গৌরবের, মহত্বের, বীরত্বের, সাহসের, জায়-নিষ্ঠার,

দয়া-দাক্ষিণ্যের—কি মনোমদ চিত্রই প্রতিফলিত । কর্ম্ম ও অকর্ম্ম, ধর্ম্ম

ও অধর্ম্ম, পাপ ও পুণ্য,—মহুষ্যের জীবন-গতি নির্ণয়ের মূল-মন্ত্র—দৃষ্টান্ত, উদাহরণ

প্রভৃতির দ্বারা পুরাণে কি সুন্দরভাবেই পরিবর্ণিত রহিয়াছে । পুরাণের সংখ্যা, পুরাণের

আকৃতি, পুরাণের বিষয়-পরম্পরা, পুরাণের ধর্ম্মতত্ত্ব, পুরাণের কবিতা ও লিপি-কৌশল

প্রভৃতির বিষয় আলোচনা করিলে, বিস্ময়-বিহ্বল হইতে হয় । মনে হয়,—বুঝি বা পৃথিবীর

কোনও দেশে কোনও ভাষায় পুরাণের জায় বিরূপ বিপুল গ্রন্থ কখনও রচিত হয় নাই ।

‘পুরাণ’-শব্দের অর্থ—প্রাচীন, পুরাতন ; অর্থাৎ, যাহাতে পুরাকালের রাজ-নৈতিক,

সামাজিক ও প্রাকৃতিক অবস্থা বর্ণনা করিয়া, মানুষের মন ধর্ম্মের পথে আকৃষ্ট করিতে

পারে, তাহাই ‘পুরাণ’ নামে অভিহিত । কোনও মতে, পুরাণ পঞ্চলক্ষণাক্রান্ত ; আবার

কোনও মতে, পুরাণ দশ-লক্ষণ-যুক্ত । যাহারা পুরাণকে পঞ্চলক্ষণাক্রান্ত বলিয়া নির্দেশ

করেন, তাহাদের মধ্যে আবার দ্বিবিধ মত দৃষ্ট হয় । বরাহপুরাণে লিখিত আছে,—“সর্গশ্চ

প্রতিসর্গশ্চ বংশোন্ময়স্তরানি চ । বংশানুচরিতকৈব পুরাণম্ পঞ্চলক্ষণং ॥” অর্থাৎ, সর্গ,

প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর এবং বংশানুচরিত,—এই পঞ্চলক্ষণ-যুক্ত ব্যাসাদি-মুনি-প্রণীত

গ্রন্থই ‘পুরাণ’ নামে অভিহিত । কিন্তু অমরসিংহের ‘কোষ’-গ্রন্থে পুরাণের যে পঞ্চ-লক্ষণ বর্ণিত

আছে, তাহাতে দেখিতে পাই,—যাহাতে সৃষ্টির বিষয়, প্রলয়ের বিষয়, দেব-তত্ত্ব, অবতার-

তত্ত্ব, মনু ও মন্বন্তরের বিবরণ এবং চন্দ্র-সূর্য্য-বংশের প্রাচীন ও আধুনিক যুদ্ধাশ্রয় লিপিবদ্ধ

আছে, তাহাই ‘পুরাণ’ । শ্রীমদ্ভাগবতে পুরাণের দশ-বিধ লক্ষণের উল্লেখ আছে ; যথা,—

(১) সর্গ, অর্থাৎ প্রকৃতির গুণত্রয়-হইতে ক্রমে ক্রমে কিরূপে স্থল পদার্থ সকল ও ততৎ-পদার্থের অধিষ্ঠাতা দেবগণের উৎপত্তি হয় ; (২) বিসর্গ, অর্থাৎ কর্ম্ম-ফল-বশে

বোজোৎপত্তির জ্ঞান কিরূপে চরাচরের সৃষ্টি হয় ; (৩) বৃষ্টি, অর্থাৎ বিবিধে কিরূপে মনুষ্যের জীবনোপায় নির্দিষ্ট হয় ; (৪) রক্ষা, অর্থাৎ বেদ-বিদ্যেবী দৈত্যাদিগের উপদ্রব হইতে মনুষ্য ও ঋষিগণকে রক্ষার জন্য কিরূপে নারায়ণ অবতার-রূপ গ্রহণ করেন ; (৫) অন্তর, অর্থাৎ মনু, দেবতাগণ, মনুপুত্রগণ, সুরেশ্বরগণ, ঋষিগণ এবং নারায়ণের অবতারগণ কিরূপে আপনাপন অধিকারে বিভ্রমান থাকেন ; (৬) বংশ, অর্থাৎ ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন বিষ্ণু রাজ-বংশের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান চিত্র ; (৭) বংশানুচরিত, অর্থাৎ রাজ-বংশীয়গণের চরিত্র ; (৮) সংস্থা, অর্থাৎ নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক, আত্যন্তিক—বিষের চারিপ্রকার বিকার বা লয় ; (৯) হেতু, অর্থাৎ অজ্ঞানতা-নিবন্ধন কর্মবশে জীব কিরূপে বিষের হেতুভূত হয় ; (১০) অপাশ্রয়, অর্থাৎ সর্বাবস্থায় ব্রহ্মের সহিত জীবের সম্বন্ধ । * কালক্রমে অনেক পুরাণ এখন আর অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া যায় না । সুতরাং পুরাণের সকল লক্ষণ মিলাইয়া পাওয়াও এখন দুর্বৃত ।

পুরাণ-সমূহ প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত ;—মহাপুরাণ ও উপপুরাণ । মহর্ষি ব্যাস-প্রণীত দশ-সহস্রাধিক শ্লোক-যুক্ত যে পুরাণ, তাহাই মহাপুরাণ নামে অভিহিত হয় ;

মহাপুরাণ আর, ব্যাস ভিন্ন অন্য ঋষির প্রণীত ক্ষুদ্র পুরাণগুলিকে উপপুরাণ কহে ।
ও মহাপুরাণের সংখ্যাও অষ্টাদশ, উপপুরাণের সংখ্যাও অষ্টাদশ । অষ্টাদশ
উপপুরাণ । মহাপুরাণের নাম,—(১) ব্রহ্মপুরাণ, (২) পদ্মপুরাণ, (৩) বিষ্ণু-

পুরাণ, (৪) শিবপুরাণ (৫) লিঙ্গপুরাণ, (৬) গুরুভূপুরাণ, (৭) নারদীয় পুরাণ, (৮) শ্রীমদ্ভাগবত, (৯) অগ্নিপুরাণ, (১০) স্কন্দপুরাণ, (১১) ভবিষ্যপুরাণ, (১২) ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, (১৩) মার্কণ্ডেয় পুরাণ, (১৪) বামনপুরাণ, (১৫) বরাহপুরাণ, (১৬) মৎস্য-পুরাণ, (১৭) কুর্মপুরাণ, (১৮) ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ । † শ্রীমদ্ভাগবত-কার পুরাণের দশবিধ লক্ষণ নির্দেশ করিয়া উল্লিখিত অষ্টাদশ পুরাণকে মহাপুরাণ নামে অভিহিত করিয়াছেন । এই সম্বন্ধে পুরাণান্তরে অবশ্য মতভেদ দৃষ্ট হয় । নারদীয় পুরাণের মতে, শিবপুরাণের পরিবর্তে বায়ুপুরাণ অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্ভুক্ত । আবার কুর্মপুরাণের মতে,—স্কন্দ, নারদীয় ও বামন পুরাণ—উভয়-পর্যায়ভুক্ত । সে হিসাবে উপপুরাণ এই আঠারখানি,—(১) সনৎ-কুমারোক্ত ‘আত্ম’, (২) নারসিংহ, (৩) কুমারোক্ত ‘স্কন্দ’, (৪) নান্দীশভাষিত ‘শিবধর্ম’, (৫) তুর্কাসাং, (৬) নারদীয়, (৭) কাপিল, (৮) বামন, (৯) উশনাঃ, (১০) ব্রহ্মাণ্ড, (১১) বাক্রণ, (১২) কালিকা, (১৩) মাহেশ্বর, (১৪) শাঙ্খ, (১৫) সৌর, (১৬) পরাশর, (১৭) মারীচ, (১৮) ভার্গব । অন্ততঃ আবার দেখিতে পাওয়া যায়,—বায়বীয়, নান্দিকেশ্বর, পাদ্ম, দেবী ও ভাস্কর—এই পুরাণপঞ্চক উপপুরাণ-মধ্যে গণ্য । যাহা হউক, প্রধানতঃ বায়ুপুরাণ লইয়াই মতবৈধ দেখিতে পাওয়া যায় । পণ্ডিতগণ বলেন,—কল্পভেদে কখনও বায়ু-পুরাণ, কখনও বা শিবপুরাণ মহাপুরাণ-মধ্যে গণ্য হয় । শ্রীমদ্ভাগবত ভিন্ন আর দুইখানি

* শ্রীমদ্ভাগবত, দ্বাদশ স্কন্ধ, সপ্তম অধ্যায়, ২৪ হইতে ২০শ শ্লোক ব্রহ্মবা ।

† শ্রীমদ্ভাগবত, দ্বাদশ স্কন্ধ, সপ্তম অধ্যায়, ২০শ ও ২৪শ শ্লোকে এই অষ্টাদশ মহাপুরাণের নাম এইরূপ-ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে । ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের শেষ অধ্যায়োল্লিখিত মন্তের সহিত ইহার একা দেখা যায় ।

ভাগবত আছে ; দেবীভাগবত ও বিষ্ণু-ভাগবত । কেহ কেহ সে দুইখানিকেও মহাপুরাণের অন্তর্ভুক্ত করেন । মতান্তরে আবার, মহাভারত—মহাপুরাণের অন্তর্ভুক্ত । ফলতঃ, কোন্ খানি মহাপুরাণ, কোন্ খানি উপপুরাণ, যে সম্বন্ধে এখন নানা মত দৃষ্ট হয় । সে হিসাবে, উপপুরাণের সংখ্যা অষ্টাদশাতিরিক্ত বলিয়াই বুঝিতে পারা যায় । উল্লিখিত অষ্টাদশ মহাপুরাণকে শাস্ত্রকারগণ প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করেন ;—সাম্বিক, তামসিক ও রাজসিক ; অথবা বৈষ্ণব, শৈব, ব্রাহ্ম । সাম্বিক মহাপুরাণ ছয়খানি,—বিষ্ণু, নারদীয়, ভাগবত, গরুড়, পদ্ম, বরাহ ; প্রধানতঃ বিষ্ণুর মাহাত্ম্য কীৰ্ত্তিত হইয়াছে বলিয়াই এই ছয়খানি পুরাণ ‘বৈষ্ণব পুরাণ’ বলিয়া অভিহিত হয় । তামসিক মহাপুরাণ ছয়খানি,—মৎস্য, কুর্ম, লিঙ্গ, শিব, ঈশ্বর ও অগ্নি । এই কয়খানি পুরাণ তমোগুণ-প্রধান ; এবং এই সকল পুরাণে প্রধানতঃ শিব-মাহাত্ম্য কীৰ্ত্তিত হইয়াছে ; তজ্জগৎ এই ষট্-মহাপুরাণ তামসিক ও ‘শৈব পুরাণ’ নামে অভিহিত হইয়া থাকে । রাজসিক মহাপুরাণের সংখ্যাও ছয় খানি,—ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য, বামন, ব্রহ্ম । এই সকল পুরাণে রাজসিক ভাব প্রকটিত ; সুতরাং পুরাণ কয়েকখানি রাজসিক পুরাণ সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে । প্রধানতঃ ব্রহ্মের মাহাত্ম্য কীৰ্ত্তনেই এই পুরাণ-ষষ্ঠ ‘ব্রাহ্ম-পুরাণ’ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে । এই বিভাগ-সম্বন্ধেও আবার মতান্তর আছে । কাহারও মতে,—বরাহপুরাণ তামসিক পুরাণের, এবং ব্রহ্মবৈবর্ত ও মার্কণ্ডেয় সাম্বিক পুরাণের অন্তর্ভুক্ত । কথিত হয়,—সমগ্র অষ্টাদশ মহাপুরাণে সাধারণতঃ চারি লক্ষ শ্লোক এবং ষোল লক্ষ পংক্তি সরিষিষ্ট আছে ; কিন্তু মতান্তরে, এ গণনা সংক্ষিপ্ত বলিয়া উল্লিখিত হয় । তদনুসারে, অষ্টাদশ মহাপুরাণে দশ কোটি হইতে এক শত কোটি শ্লোক থাকা সম্ভব ; কিন্তু গণনায় তাহা এখন আর পাওয়া যায় না । কোনও কোনও পুরাণে (বিষ্ণুপুরাণাদিতে) আলোচ্য বিষয়ের কতক কতক গণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়াও শ্লোকাদির সংখ্যা গণনায় বিঘ্ন ঘটয়া থাকে । যাহা হউক, শ্রীমদ্ভাগবত-কার মহাপুরাণ-সমূহের শ্লোকসংখ্যা বৈষ্ণব-ভাবে নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন, নিয়োক্ত শ্লোক-ষষ্ঠিকেই তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে ;—

“ব্রাহ্মণ দশ-সহস্রাণি পাশ্চাত্ত্য পঞ্চাশতি চ । শ্রীবৈষ্ণবং ত্রয়োবিংশতীকং তু শৈবকম্ ॥

দশাষ্টৌ শ্রীভাগবতং নারদং পঞ্চবিংশতি । মার্কণ্ডেয়ং নববাক্যকং দশপঞ্চচতুঃশতম্ ॥

চতুর্দশ ভবিষ্যৎ জ্ঞানং তথা পঞ্চাশতানি চ । দশাষ্টৌ ব্রহ্মবৈবর্তং লৈঙ্গমেকাদশৈব তু ॥

চতুর্বিংশতি বারাহমেকাংশীতিসহস্রকম্ । ঈশ্বরং শতং তথাতৈকং বামনং দশবীৰ্জিতম্ ॥

কৌশলং সপ্তদশাধ্যাতং মাৎস্যং ততু চতুর্দশ । একোদবিংশৎ দৌপর্ণং ব্রহ্মাণ্ডং দ্বাদশৈব তু ॥

এবং পুরাণসম্বোধনশ্লোক উদাহৃতঃ । তত্রাষ্টাদশমাহত্ৰং শ্রীভাগবতমিষ্যতে ॥”

এ হিসাবে,—ব্রহ্মপুরাণে দশ-সহস্র, পদ্মপুরাণে পঞ্চপঞ্চাশৎ সহস্র, বিষ্ণুপুরাণে ত্রয়োবিংশতি সহস্র, শিবপুরাণে চতুর্বিংশতি সহস্র, শ্রীমদ্ভাগবতে অষ্টাদশ সহস্র, নারদীয় পুরাণে পঞ্চবিংশতি সহস্র, মার্কণ্ডেয় পুরাণে নয় সহস্র, অগ্নিপুরাণে চতুঃশতাধিক পঞ্চদশ সহস্র, ভবিষ্যপুরাণে পঞ্চাশতাবধিক চতুর্দশ সহস্র, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে অষ্টাদশ সহস্র, লিঙ্গপুরাণে একাদশ সহস্র, বরাহপুরাণে চতুর্বিংশতি সহস্র, ঈশ্বরপুরাণে একশতাবধিক একাংশীতি সহস্র, বামনপুরাণে দশ সহস্র, কুর্মপুরাণে সপ্তদশ সহস্র, মৎস্যপুরাণে চতুর্দশ সহস্র, গরুড়পুরাণে উদবিংশতি

সহস্র ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ষাটশ সহস্র,—সর্ব-সাক্ষ্যে পুরাণ-সমূহে প্রায় চারি লক্ষ শ্লোক নিরূপিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন অত্যাশ্চর্য উপপুরাণে আরও কত শ্লোক নিবদ্ধ আছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? যাহা হউক, এই পুরাণ-উপপুরাণ-সমূহে কি ধর্ম-তত্ত্ব, কি সমাজ-তত্ত্ব, কি প্রকৃ-তত্ত্ব, কি ইতিহাস, কি যুদ্ধ-বিগ্রহ-পদ্ধতি, কি রাজ-নীতি, কি দর্শন, কি বিজ্ঞান, কি শিল্প, কি সাহিত্য,—সকল বিষয়েরই বিশদ চিত্র প্রতিফলিত দেখিতে পাই। পুরাণ-সমূহ পূর্বে যে ভাবে বিরচিত হইয়াছিল, এখন যে তাহা অব্যাহত আছে, সে বিষয়ে সংশয় হয়। প্রথমতঃ, যে পুরাণের যেরূপ শ্লোকসংখ্যা স্থতীপত্রে নির্দেশ আছে, গণনায় প্রায়ই তাহার ত্রাস-বৃদ্ধি দেখা যায়। দ্বিতীয়তঃ, এক এক পুরাণে যে যে বিষয় বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া পূর্নাভাষে পরিচয় পাই, পুজ্যানুপুজ্য মিলাইতে গিয়া, তাহার কোনও কোনও বিষয়ে অসামঞ্জস্য লক্ষিত হয়। তৃতীয়তঃ, একই বিষয়ের বর্ণনায় ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে ভিন্ন ভিন্ন মত দেখিতে পাওয়া যায়। অধিকন্তু, কোনও কোনও পুরাণের বিশেষ বিশেষ বিষয়-পরম্পরার মধ্যে ভাবের, ভাষার ও ঘটনার অনৈক্য দেখিয়া, তৎ-সমুদায় প্রক্লিপ্ত বা পরবর্ত্তি-কালে সংযোজিত বলিয়া বিশ্বাস হইতে পারে। মহাপুরাণ-সমূহ প্রধানতঃ মহর্ষি বেদব্যাস-প্রণীত বলিয়াই প্রচারিত। কিন্তু সকল পুরাণ যথার্থরূপে আলোচনা করিলে, তদ্বিষয়েও মতভেদ ঘটিবার সম্ভাবনা। অনেক মনে করেন,—পরবর্ত্তি-কালে লিপিকারগণের লিপি-চাতুর্য্য-বশতঃ বিষয়-পরম্পরার সংযোগ-বিয়েগ-হেতু এরূপ গণ্ডগোল বাধিয়াছে। যাহা হউক, যে অবস্থায়, যে আকৃতিতে, পুরাণ-সমূহ এখন বিদ্যমান, আমরা তাহারই পরিচয় দিবার প্রয়াস পাইতেছি।

প্রথম—ব্রহ্ম-পুরাণ। স্থত ও শৌনক ঋষির কথোপকথন-প্রসঙ্গে এই পুরাণ বিরচিত। পূর্ব ও উত্তর—এই দুই ভাগে এই পুরাণ বিভক্ত। পূর্বভাগে সৃষ্টি-প্রসঙ্গ, দেবতা ও অশুরগণের জন্ম-বিবরণ এবং চন্দ্রবংশ ও সূর্য্যবংশের বর্ণনা আছে। ব্রহ্ম-পুরাণ। সূর্য্যবংশ বর্ণনাকালে এই গ্রন্থে শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্র পরিবর্ণিত হইয়াছে; এবং চন্দ্রবংশ বর্ণনা-কালে ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র বর্ণিত আছে।

প্রিয়ত্রয়, উত্তানপাদ, বেণ, পৃথু, পুরুববা প্রভৃতি রাজত্ববর্ণেরও পরিচয় ইহাতে দৃষ্ট হয়। প্রজাপতি দক্ষের জন্মবৃত্তান্ত, পার্শ্বতীর জন্ম ও বিবাহ,—ব্রহ্ম-পুরাণের অত্যন্তম বর্ণনার বিষয়। স্বীপ, বর্ষ, স্বর্গ, নরক ও পাতালের বর্ণনা এবং সূর্য্য প্রভৃতি দেবগণের স্তুতিবাদ, এই খণ্ডে দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তর খণ্ডে,—পুরুষোত্তম তীর্থের বিস্তৃত বর্ণনা, শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র ও গুণানুবাদ এবং ধর্ম-তত্ত্ব ও দর্শন-তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। পুরুষোত্তম বর্ণনা-প্রসঙ্গে,—উড়িষ্ঠা ও জগন্নাথ-দেবের মন্দিরের পুরাতত্ত্ব এবং মন্দির ও নিকুঞ্জসমূহ বিরূপ-ভাবে সূর্য্য শিব ও জগন্নাথ-দেবের নামে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল, তদ্বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। ব্রহ্ম-পুরাণের উত্তর খণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের যে চরিত্র-চিত্র আছে, বিষ্ণুপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র বর্ণনার সহিত বর্ণে বর্ণে তাহার মিল দৃষ্ট হয়। এই পুরাণের উপসংহার-ভাগে,—যোগ-প্রসঙ্গ উত্থাপিত ও আলোচিত হইয়াছে। যুগ-ধর্ম, তীর্থ-প্রসঙ্গ, গঙ্গার উৎপত্তি, বর্ণাশ্রম-ধর্ম, মৃত্যু এবং পিতৃ শ্রাদ্ধ পদ্ধতির কথাও এই পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়।

দ্বিতীয়,—পদ্ম-পুরাণ । একমাত্র স্বন্দ-পুরাণ ভিন্ন এত বড় রহৎ পুরাণ আর দৃষ্টিগোচর হয় না । এই মহাপুরাণ পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত ;—(১) সৃষ্টি-খণ্ড, (২) ভূমিখণ্ড, (৩) স্বর্গ-খণ্ড, (৪) পাতাল-খণ্ড (৫) উত্তর-খণ্ড । সৃষ্টি-খণ্ডে ভীষ্মের পদ্ম-পুরাণ । প্রেমের উত্তরে পুলস্ত্য ঋষি যে ধর্ম-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন, তাহাই বর্ণিত

আছে । পুষ্কর-তীর্থের (আজমীঢ়ে) মাহাত্ম্য-বর্ণনা, ব্রহ্মযজ্ঞ, বেদপাঠ-

বিধি, দান-তত্ত্ব, বিবিধ ব্রত-কথা, শৈল-জায়ার বিবাহ, গো-মাহাত্ম্য, তাড়কার উপাখ্যান, কালকেয় প্রভৃতি দৈত্য-বিনাশ-প্রসঙ্গ এবং গ্রহগণের পূজা-পদ্ধতি,—সৃষ্টি-খণ্ডের প্রধান আলোচ্য বিষয় । ভূমি-খণ্ডে,—পৃথিবীর বর্ণনা আছে । পৃথু, নহন, যযাতি প্রভৃতি রাজগণের উপাখ্যান ; শিবশ্রদ্ধা, সূত্রত, চ্যবন প্রভৃতির প্রসঙ্গ ; পিতৃ-মাতৃ-পূজা, ধর্মের আলোচনা, হুণ্ড প্রভৃতি দৈত্যবধ-বিবরণ,—ভূমিখণ্ডে আলোচিত হইয়াছে । এই ভূমি-খণ্ডে ভূ-তত্ত্ব ও পুরা-তত্ত্ব সংমিশ্রিত । সূত্রাং, এই খণ্ডকে এক সময়ের ইতিহাস ও ভূগোল বলিয়াও অনেকে বর্ণনা করিয়া থাকেন । সূত ৩ সৌনক ঋষির কথাবার্তা অনুসরণে এই খণ্ডে বিবর্তিত । এই ভূমি-খণ্ড এক শত সাতাইশটি অধ্যায়ে বিভক্ত । সৌনকাদি ঋষির প্রণে বাস-শিষ্য রোমহর্ষণ সূত স্বর্গ-বিবরণ বর্ণন করেন । স্বর্গখণ্ডে তাহাই লিপিবদ্ধ আছে । উনপঞ্চাশটি অধ্যায়ে এই খণ্ডে বিভক্ত । স্বর্গখণ্ডের প্রথমে সৃষ্টি-তত্ত্ব পরিবর্ণিত । তৎপরে বহুবিধ তীর্থের মাহাত্ম্য, ধর্মের আলোচনা, বর্ণাশ্রম-ধর্ম, যোগ-ধর্ম, ব্রতাদির আলোচনা এবং বিবিধ স্তোত্রে এই খণ্ডে পরিপূর্ণ । এই খণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে,—ভারতবর্ষের পরিমাণ, নদ-নদী, পর্বত এবং অধিবাসীদিগের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে । চতুর্থ অধ্যায়ে,—সমগ্র ভূমণ্ডলের একটা আভাস পাওয়া যায় । এই খণ্ডে,—দিলীপ পৃথু, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি রাজগণের প্রসঙ্গ আছে ; অধিকন্তু নিঃসন্তান হওয়ার হেতু এবং সন্তান-লাভের উপায়-প্রসঙ্গে শ্রীধর রাজার উপাখ্যান, লক্ষ্মীব্রত প্রসঙ্গে ভদ্রশ্রবা রাজার উপাখ্যান, ব্রাহ্মণের প্রাণরক্ষা করার ফল-কীর্তন-প্রসঙ্গে দীননাথ রাজার নরমেধ-যজ্ঞ-বৃত্তান্ত, শ্রীকৃষ্ণ-জন্মষ্টমী ব্রত-প্রসঙ্গে চিত্রসেন রাজার উপাখ্যান পরিবর্ণিত । পাতাল-খণ্ডে দ্বি-সপ্ততি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ । এই খণ্ডে ঋষিগণের নিকট মহাভাগ সূত শ্রীরাম চরিত বর্ণনা করিতেছেন । রামের রাজ্যাভিষেক এবং অযোধ্যাযজ্ঞ হইতে এই খণ্ডের আরম্ভ । মধ্যে বহু তীর্থের এবং শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রের বর্ণনা আছে । ভরদ্বাজ-আশ্রমে আতিথ্য-গ্রহণান্তে শ্রীরামচন্দ্রের অযোধ্যাগমন এবং কোণল্যার নাসিক শ্রাদ্ধকৃত্যাদিতে এই খণ্ডের পরিসমাপ্তি । পাতাল-খণ্ডে ‘শেষ নাগ’ যে রামচরিত বর্ণনা করিয়াছিলেন, এই খণ্ডে তাহাই বর্ণিত আছে । সে হিসাবে এই খণ্ডকে রামায়ণের একটা অংশ বলা বাইতে পারে । উত্তর খণ্ডে,—শিব ও পার্শ্বতীর কথোপকথন-প্রসঙ্গে বহু ধর্ম-তত্ত্ব বিবৃত । সগর রাজার উপাখ্যান, দেবশর্ম্মার উপাখ্যান জালন্ধর উপাখ্যান, নানা তীর্থ-মাহাত্ম্য, শ্রীভাগবত-মাহাত্ম্য, গীতা-মাহাত্ম্য, ভক্তি-মাহাত্ম্য, বিষ্ণুর সহস্র নাম, শ্রীরামের শতনাম, নৃসিংহ ও মৎস্য প্রভৃতি অবতারের বর্ণনা,—এই খণ্ডে দেখিতে পাওয়া যায় ।

তৃতীয়,—বিষ্ণু-পুরাণ । অষ্টাদশ মহাপুরাণের মধ্যে এই পুরাণ সর্কশিষ্ট-সম্মত ও বসন্ধাদশুত । বিষ্ণুপুরাণ ছয় অংশে বিভক্ত । পরমেশ্বরের প্রতি মৈত্রেয়ের প্রশ্ন ও তাহার উত্তরে ধর্ম-তত্ত্ব-ব্যাখ্যায় এই পুরাণ বিরচিত । বিষ্ণু-পুরাণের প্রথম অংশে,—
বিষ্ণু-পুরাণ । সৃষ্টি-বিবরণ, প্রবোধপাখ্যান, বেণ ও পৃথু-রাজার প্রসঙ্গ, প্রচেতস্ ও কঙ্কু
মুনির চরিত্র, প্রহ্লাদ-চরিত্র এবং বিষ্ণুর চারি প্রকার বিভূতির বর্ণনা
দাছে । দ্বিতীয় অংশে,—রাজা প্রিয়ব্রতের পুত্রগণের এবং ভরতবংশের বিবরণ পরিবর্ণিত ।
ব্রহ্ম-দ্বীপ, ভারতবর্ষ, সপ্তপাতাল, স্বর্গাদি গ্রহ ও সপ্তলোকের সংস্থান-তত্ত্ব, জড়ভরত
উপাখ্যান, সৌবার রাজার প্রসঙ্গ,—দ্বিতীয় অংশের অন্তর্ভুক্ত । তৃতীয় অংশে,—মহাস্তর,
বেদবাস-মাহাত্ম্য, ধর্ম্মাচার-প্রসঙ্গে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের উৎপত্তি এবং শতধর্ম্ম রাজার উপাখ্যান
লিখিত হইয়াছে । চতুর্থ অংশে,—বংশ-বিস্তার-কথনে ব্রহ্মা ও দক্ষাদির উৎপত্তি ; পুরুষা ও
ইক্ষ্বাকুর জন্ম, কুরুবংশ-বংশ, কুশধ্বজ-বংশ, চন্দ্র-বংশ, পুরুষা ও জহ্নুর বংশ, আয়ু ও
মহাস্তরির বংশ, ক্ষত্র-বংশের বংশ, নহব-বংশ, যজ্ঞ-বংশ, তুলসুর-বংশ, জহ্নুর-বংশ, অহু-বংশ,
জন্মোজয়-বংশ পরিবর্ণিত আছে । এই অংশে,—ভবিষ্য রাজবংশ-বর্ণন-প্রসঙ্গে পরিক্রি-
বংশীয়গণের, ইক্ষ্বাকু-বংশীয় ভবিষ্য রাজ-বংশের, ব্রহ্মবংশ-বংশীয় ভাবী রাজগণের,
প্রমোৎবংশীয় ভাবী রাজগণের এবং নন্দ-বংশীয় ভাবী নৃপতিদিগের বংশ-বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া
যায় । এই অধ্যায়ে বিশেষ বিশেষ সময়ের রাজগণের পরিচয় পাইতে পারি । ভবিষ্য-
রাজ বংশের বিবরণ এই অধ্যায়ে লিখিত আছে দেখিয়া, অনেকে বিষ্ণু-পুরাণকে বৌদ্ধযুগের
পরবর্ত্তি-কালের রচিত গ্রন্থ বলিয়া নির্দেশ করিতে ক্রটি করেন না । পঞ্চম অংশে,—
বসুদেব-দেবকীর বিবাহ হইতে ত্রীকৃষ্ণের জন্ম ও দেহত্যাগ পর্য্যন্ত জীবন-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ
আছে । কলিযুগারম্ভে অর্জুনের প্রতি ব্যাসের উপদেশ এবং পরীক্ষিতের অভিষেক প্রভৃতির
বর্ণনায় এই অংশের পরিসমাপ্তি । ষষ্ঠ অংশে,—কলিস্বরূপ এবং কলি-ধর্ম্ম বর্ণন, ত্রিবিধ
দুঃখ-নাশের উপায়-পরম্পরা, বিষ্ণু-নাম-স্মরণ-মাহাত্ম্য প্রভৃতির উল্লেখ আছে । বিরাট
বিষ্ণুরূপে ভগবানের অবস্থিতি,—উপনিষদের সেই যে বীজ-তত্ত্ব,—এই বিষ্ণু-পুরাণে
প্রহ্লাদের বিষ্ণু-স্তোত্রে কি সুন্দর পরিস্ফুট ! প্রহ্লাদ বিষ্ণুর স্তব করিতেছেন ;—

নমস্তে পুওরীকাক নমস্তে পুরুষোত্তম । নমস্তে সর্কলোকায়ন নমস্তে তিষ্ণচক্রিণে ॥
নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোত্রাক্ষগহিতায় চ । জগদ্ধিতায় কৃকায় পোবিন্দায় নমোনমঃ ॥
ব্রহ্মহে স্বজতে বিশ্বং হিভে পালয়তে পুনঃ । ব্রহ্মরূপায় কল্পান্তে নমোস্তুভ্যং ত্রিসূর্তয়ে ॥
দেবা যক্ষা সুরাঃ সিদ্ধা নাগা গন্ধর্ব্ব কিন্নরাঃ । পিশাচা রাক্ষসাস্টেচ মনুষ্যাঃ পশবন্তথা ॥
পক্ষিণঃ স্থাবরাস্টেচ পিপীলিকা সন্ন্যাস্থাঃ । তুমিরাগো নভো বায়ুঃ শব্দস্পর্শস্বাশ্বাসঃ ॥
রূপাং গন্ধো মনোবুদ্ধিরাত্মা কালত্থা গুণাঃ । এভেবাং পরমার্থক সর্কমেতৎ তমহ্যাত ॥
বিদ্যাবিদ্যো ভবান্ সভ্যসত্যং স্বং বিশ্বাত্মতে । প্রবৃত্তক নিবৃত্তক কর্ম বেদোদিতং ভবান্ ॥
সমস্তকর্ম্মভোক্তা চ কর্ম্মোপকরণানি চ । তমেব বিকো সর্কশি সর্ককর্ম্মকলকং যৎ ॥
নযান্যত্র তথা শেবভূক্তেহু ভুবনেহু চ । ভবৈব ব্যাত্তিরেষা গুণসংসৃটিকা এভো ॥
ভাং যোগিনশ্চিগ্নয়ন্তি ভাং যজন্তি চ যজিনঃ । হব্যাকব্যাক্তগেকস্তং পিতৃদেবব্রহ্মপয়ক্ ॥
নমোহস্ত বিষ্ণবে তস্মৈ নমস্তস্ত পুনঃপুনঃ । যত্র সর্কং যতঃ সর্কং যঃ সর্কং সর্কসংপ্রয়ঃ ॥

সর্বগহাদনন্তু স এবাহমবস্থিতঃ । নন্তঃ সর্বমহং সর্বং ময়ি সর্বং সনাতনৈ ॥

অহমেবাকুরো নিত্যঃ পরমাত্মাসংগ্রহঃ । ব্রহ্ম সংজ্ঞাহমেবাগ্রে তথাস্তে চ পরঃ পুমান্ ॥”

প্রথমে প্রহ্লাদ, তাঁহাকে বিশ্বের সৃষ্টি-কর্তা বলিয়া নমস্কার করিলেন; তাঁহাকে পালন-কর্তা বলিয়া নমস্কার করিলেন; তাঁহাকে সংহার-কর্তা বলিয়া নমস্কার করিলেন। কিন্তু তার পর, ক্রমে ক্রমে তাঁহাকে আত্ম-রূপে দর্শন করিলেন। বলিলেন,—‘তিনিই আমি, আমি। হইতেই সমস্ত উৎপন্ন; আমিই সর্বরূপে বর্তমান; সনাতন-রূপ আমাতেই সমস্ত লয়প্রাপ্ত হইবে।’ বেদান্তের সেই “অহংজ্ঞান”—উপনিষদের সেই ‘সোহং’ চিন্তা,—প্রহ্লাদের প্রাণে, প্রহ্লাদের স্তোত্রে, কি সুন্দর পরিচ্ছিন্ন! বিষ্ণুপুরাণ গৃহধর্মের উপদেশ প্রদান করিতে করিতে, এই ‘অহং-তত্ত্ব’ ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

চতুর্থ—শিবপুরাণ। শিবপুরাণ প্রকাণ্ড গ্রন্থ। এই মহাপুরাণের এক স্থলে লিখিত আছে,—‘ইহা লক্ষ শ্লোকযুক্ত এবং দ্বাদশ সংহিতায় বিভক্ত।’ এই পুরাণে আরও দেখিতে

পাওয়া যায়,—মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রথমতঃ শতকোটি শ্লোকে পুরাণ-সমূহ

শিব-পুরাণ। রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষে মহাজগৎকে অন্নায় ও অন্নবৃদ্ধি

হইতে দেখিয়া তদন্তর্গত চারি লক্ষ মাত্র শ্লোক ইহ-সংসারে প্রচার

করেন। তদনুসারে লক্ষ শ্লোকগ্রন্থক শিবপুরাণের চতুর্বিংশতি সহস্র মাত্র শ্লোক জন-

সমাজে প্রচারিত হয়। শিবপুরাণ—জুই খানি। তন্মধ্যে ব্রহ্মবৈবর্তের নির্দেশানুসারে

“চতুর্বিংশতি সহস্রং শৈবমত্র নিরূপিতং” চতুর্বিংশতি সহস্র শ্লোকে নিবদ্ধ শিবপুরাণই

মহাপুরাণ বলিয়া পরিচিত। শিবপুরাণ অধুনা ছয় সংহিতায় বিভক্ত; জ্ঞান-সংহিতা,

বিশ্বেশ্বর-সংহিতা, কৈলাশ-সংহিতা, সনৎকুমার-সংহিতা, বায়বীয়-সংহিতা (পূর্ব ভাগ ও

উত্তর ভাগ) এবং ধর্ম-সংহিতা। প্রধানতঃ, শিবতত্ত্ব ও শিব-মাহাত্ম্য পরিবর্ণনই এই

পুরাণের উদ্দেশ্য। কিন্তু তদুপলক্ষে পুরাণের আলোচ্য অন্যান্য সকল কথাই ইহাতে

পরিবর্তিত। নৈমিষারণ্য-বাসী মুনিগণের প্রশ্নের উত্তরে ব্যাস-শিষ্য হৃত এই পুরাণের

বিষয় ব্যক্ত করেন। ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি ও ঋষি-আদির সৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়া

পার্বত্যের তপস্তা, শিবের বিবাহ, কার্তিকেয়ের জন্ম, গণেশের চরিত্র ও শিব কর্তৃক গণেশের

শিরচ্ছেদন প্রসঙ্গ, কাশী-মাহাত্ম্য, শিবপূজাবিধি, শিবরাত্রি-ব্রত-মাহাত্ম্য, লিঙ্গপূজা,

শিবনাম-কীর্তন-ফল প্রভৃতি বিবিধ-তত্ত্বের আলোচনায় শিব-মাহাত্ম্য কীর্তনেই এই পুরাণ

পরিপূর্ণ। এই পুরাণের শেষ অংশে বিবিধ পাপ-ফল-কথন, ধর্ম-প্রসঙ্গ, অন্নদান-জলদান-

পুরাণ-পাঠ প্রভৃতির মাহাত্ম্য এবং প্রজাপতি-কৃত সৃষ্টি-প্রক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে

পৃথু-চরিত্র, অঙ্গ-বংশের বিবরণ, হর্য্য-বংশের বিবরণ, সত্যব্রত ও সগর রাজার উপাখ্যান

দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের জ্ঞান-সংহিতায় শিবের সহস্র নাম এবং ধর্ম-সংহিতায়

শিবের অষ্টোত্তর সহস্র নাম-পরিবর্তিত হইয়াছে। জুই স্থলে বিবিধ-ভাবে নাম-কীর্তনে

কোণাও বর্ণে বর্ণে মিল আছে, আবার কোণাও আদৌ মিল নাই। গণেশের শিরচ্ছেদন

এবং গলাস্ত-যোজনায় কারণ এই শিবপুরাণের জ্ঞান-সংহিতায় ত্রয়োত্রিংশ-চতুর্বিংশ অধ্যায়ে

এবং ব্রহ্মবৈবর্ত জ্ঞানান্তর্গত গণেশ-খণ্ডে অষ্টাদশ ও বিংশ অধ্যায়ে রূপান্তরে বৃত্ত হয়।

পঞ্চম—লিঙ্গ-পুরাণ । শিব-মাহাত্ম্য-কীর্তন এবং লিঙ্গ-পূজা-পদ্ধতি-প্রচার,—এই পুরাণের সারভূত । এই পুরাণ—উত্তর ও পূর্ব দুই ভাগে বিভক্ত । প্রথম ভাগে,—সৃষ্টি-বিবরণ, লিঙ্গের উদ্ভব ও পূজা প্রসঙ্গ, দক্ষযজ্ঞ, মদনভয় ও শিবের বিবাহ, বরাহ-লিঙ্গ-পুরাণ । চরিত্র, নৃসিংহ-চরিত্র এবং সূর্য্য ও সোম বংশের বর্ণনা আছে । উত্তর ভাগে,—বিষ্ণু-মাহাত্ম্য, শিব-মাহাত্ম্য, স্নান-দানাদি-মাহাত্ম্য এবং গায়ত্রী-মাহাত্ম্য প্রভৃতি বিষয় কীর্তিত হইয়াছে । এই পুরাণে অষ্টাবিংশতি অবতারের কথা এবং ঈশ্বরের আবির্ভাব পর্য্যন্ত হিন্দু-রাজগণের বংশ-বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে । এই পুরাণের মতে,—প্রলয়ের পরে অগ্নিময় লিঙ্গের উৎপত্তি হয়, এবং তাহা হইতে বেদাদি শাস্ত্র-গ্রন্থ উদ্ভূত হইয়াছিল ; ব্রহ্মা ও বিষ্ণু পর্য্যন্ত সেই লিঙ্গের জ্যোতিঃতেই জ্যোতির্ময় হইয়া ছিলেন । অনেকের বিশ্বাস, এই লিঙ্গ-পুরাণের অমূল্যরূপেই এদেশে শিব-লিঙ্গ-নিষ্ঠায়ে লিঙ্গ-মূর্তি-পূজা-পদ্ধতির প্রবর্তনা হইয়াছে ।

ষষ্ঠ—গুরুড় পুরাণ । পূর্ব-খণ্ড ও উত্তর-খণ্ড—এই দুই ভাগে গুরুড়-পুরাণ বিভক্ত । সৃষ্টি-কথা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রজাপতির উৎপত্তি, সূর্য্য-পূজা, বিষ্ণু-পূজা, লক্ষ্মীপূজা, শিব-পূজা, পাত্ৰকা-পূজা, গোপাল-পূজা, হরগ্রীব-পূজা, দুর্গা-পূজা প্রভৃতি পূজা-গুরুড়-পুরাণ । পদ্ধতি ; দীক্ষা-বিধি, প্রায়শ্চিত্ত-বিধি, তর্পণ-বিধি, সন্ধ্যা-বিধি, শ্রাদ্ধ-বিধি, স্নান-বিধি ও নানাবিধ ব্রত-মাহাত্ম্য ; রত্নোৎপত্তি-কথন ও রত্ন-পরীক্ষা ; গৃহধর্ম, যতিধর্ম, গয়াকৃত্য ; সূর্য্য-বংশ, চন্দ্র-বংশ, জন্মেজয়-বংশ ; রামায়ণ-কথন, হরিবংশ-কথন ও ভরত-কথন এবং আয়ুর্বেদ-কথনে সর্করোগ-নিদান ; বিষ্ণুদ্যান, নারায়ণ-দ্যান ; নৃসিংহ-স্তব ; ব্যাকরণ-নিয়ম, ছন্দ-শাস্ত্র ; এমন কি,—স্ত্রী-বশীকরণ ও মশকবারণাদি কথন পর্য্যন্ত,—গুরুড় পুরাণে বর্ণিত রহিয়াছে । নরক-বর্ণন, প্রেত-বিবরণ, সপিণ্ডকরণের বিধি-ব্যবস্থা প্রভৃতিও ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায় । গুরুড় পুরাণের মতে—অবতার-সংখ্যা একবিংশতি । ভাগবতে দেখিতে পাই, এই পুরাণের শ্লোক-সংখ্যা ঊনবিংশতি সহস্র । কিন্তু ইহার প্রথম অধ্যায়ে লিখিত আছে,—“এই পুরাণ অষ্টশতাধিক অষ্টসহস্র শ্লোকে পরিপূর্ণ ।

“অষ্টো শ্লোক-সহস্রানি তথা চাষ্টৌ শতানি চ । পুরাণং গুরুড়ং ব্যাসঃ পুরাসৌ মোহব্রবীদিদম্ ॥”

সুতরাং কি ভাবে, কি অবস্থায় এই পুরাণ অবস্থিত, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায় । এই পুরাণে তন্ত্রের বহু মন্ত্র এবং আয়ুর্বেদের বহু ঔষধ-প্রকরণ দৃষ্ট হয় । রত্ন-পরীক্ষা প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে,—“হিমালয়, মাতঙ্গ পর্বত, সুরাষ্ট্র, পুণ্ড্র, কলিঙ্গ, কোশল, বেণাতট ও সৌবার দেশ—এই অষ্টস্থান হীরকের আকর । হিমগিরি-জাত হীরক দ্বৈব তাম্রবর্ণ, সৌবার-দেশজ হীরক নীলপদ্ম ও মেঘের স্তায় আভা-সম্পন্ন, সুরাষ্ট্র-দেশোৎপন্ন হীরক তাম্রবর্ণ, কলিঙ্গ-দেশজ হীরক স্তব্ধবর্ণ মনোহর কান্তিবিশিষ্ট, কোশল-দেশীয় হীরক পীতবর্ণ, পুণ্ড্র-দেশজ হীরক শ্রামবর্ণ, মতঙ্গ-দেশজ হীরক দ্বৈব পীতপ্রভ ।..... কার-দ্বারা উল্লেখন করিয়া হীরকের পরীক্ষা করিতে হয় । পৃথিবীতে যত প্রকার রত্ন ও লৌহ প্রভৃতি ধাতু আছে, হীরক সেই সমস্তকেই বিলেখন করিতে পারে ; কিন্তু অন্য কোনও রত্ন বা ধাতু হীরককে বিলেখন করিতে পারে না । সর্ব-প্রকার রত্নের গুরুতাই গৌরবের

কারণ। কিন্তু হীরক যতই লঘু হইবে, ততই তাহার প্রাধান্য জ্ঞান যাইবে।" এইরূপ মুক্তা-প্রসঙ্গে, মুক্তার উৎপত্তি ও মূল্য প্রভৃতির পরিচয় এই পুরাণে পাওয়া যায়। স্বর্গাদি প্রমাণ-সংস্থান কীর্তন, জ্যোতিঃসার কীর্তন, লঘ-মান-কথন, প্রস্রগণনা এবং নানা নীতিসার,—এই গুরুত্ব পুরাণে পরিবর্ণিত রহিয়াছে। চাণক্যের বহু নীতি-কথা এই পুরাণের পূর্ববর্ত্তে অষ্টাধিকশততম অধ্যায় হইতে পঞ্চদশাধিকশততম অধ্যায়ে দৃষ্ট হয়। বিষ্ণুশর্ম্মার হিতোপদেশ গ্রন্থেও সেই সকল নীতি-কথা দোখিতে পাওয়া যায়। যেমন,—

“যো ক্রবাসি পরিত্যজ্য অক্রবাসি নিমেষতে । ক্রবাসি তন্ত নশ্বন্তি অক্রবং নষ্টমেব চ ॥”

“মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রিবৎ । আশ্রবৎ সর্বভূতেষু যঃ পশ্বতি স পণ্ডিতঃ ॥”

রাজ-ধর্ম্ম-পালন সম্বন্ধে এই পুরাণের নীতিসার-প্রসঙ্গে কি সুন্দর দৃষ্টান্তই উক্ত হইয়াছে!

“পুষ্পাং পুষ্পং বিচিহ্নয়াম্ লচ্ছেদং ন কারয়েৎ । মালাকার ইবারণ্যে ন যথাকারকারকঃ ॥

দোম্বারঃ ক্ষীর-ভুঞ্জানা বিকৃতং ভিন্ন ভুঞ্জতে । পররাষ্ট্রং মহীপালৈর্ভোক্তব্যং ন চ দূষয়েৎ ॥

নোদ্বিশিষ্টমাস্ত যো ধোষাঃ ক্ষীরানী লভতে পয়ঃ । এবং রাষ্ট্রং প্রয়োগেণ পীড়্যমানং ন বর্জয়েৎ ॥”

মালাকার পুষ্প-বৃক্ষ হইতে পুষ্প গ্রহণ করে; কিন্তু অঙ্গারকারীর স্থায় বৃক্ষের মূলোচ্ছেদ করে না। রাজাও তদ্রূপ প্রজার অনিষ্ট না করিয়া, তাহার নিকট যথাসম্ভব কর-গ্রহণ করিবেন। দোম্বা যেমন দুগ্ধ পান করে, কিন্তু তাহা বিকৃত করে না; রাজা তেমনি কর-গ্রহণ করিবেন; কিন্তু অত্যাচারাদি-দোষে রাজ্য দূষিত করিবেন না। দুগ্ধার্থী যেমন দুগ্ধ দোহন করে, কিন্তু গাতীর স্তনঃচ্ছেদন করে না; রাজাও সেইরূপ পর-রাজ্যকে শাসনে রাখিবেন, কিন্তু তাহার উচ্ছেদ-সাধন করিবেন না।

সপ্তম—নারদীয়-পুরাণ। এই পুরাণ চারি পাদে বিভক্ত। প্রথম-পাদ,—মোক্ষ-ধর্ম্ম, মোক্ষোপায়, দীক্ষা-গ্রহণ, বিষ্ণু-শিব-শক্তির বিবরণ, বিবিধ স্তোত্র মন্ত্র প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ।

দ্বিতীয় পাদে,—গাণপত্য, সৌর, বৈষ্ণব ও শৈব—চারি সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম-নারদ-পুরাণ। কথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তৃতীয় পাদে,—নারদ ও সনৎকুমারের

কথোপকথনচ্ছলে পুরাণ-প্রসঙ্গ, দান-ধর্ম্ম ও ব্রত-বিবরণ লিখিত আছে।

চতুর্থ ভাগে,—কালী, গুরুষোভম, প্রয়াগ, হরিদ্বার, কামাখ্যা প্রভৃতি বহু তীর্থের মাহাত্ম্য-কথা এবং বশিষ্ঠ, মার্কাতা, গোতম ও মোহিনীর উপাখ্যান প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। বিষ্ণুর প্রাধান্য-কীর্তনই—এই পুরাণের মুখ্য লক্ষ্য। শ্রীহরির উপাসনায় অতীষ্ট-সিদ্ধির বিষয়ে বিবিধ উপাখ্যানের অবতারণায় সেই উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে। অধুনা দুই খানি নারদীয় পুরাণ প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে একখানি নারদীয়-পুরাণ এবং অপর-খানি বৃহদ্রাধীয়-পুরাণ নামে অভিহিত হয়। মূলতঃ উভয় পুরাণেরই উদ্দেশ্য অভিন্ন।

অষ্টম—শ্রীমদ্ভাগবত। অনেকের মতে, শ্রীমদ্ভাগবত শ্রেষ্ঠ পুরাণ। বৈষ্ণব-সম্প্রদায় শ্রীমদ্ভাগবতকে পরম ভক্তি-সহকারে পূজা করিয়া থাকেন। এই মহাপুরাণের রচনা এতই

সুন্দর ও এতই মধুর যে, সাহিত্য-জগতে ইহা শ্রেষ্ঠ-স্থান অধিকার

শ্রীমদ্ভাগবত। করিয়া আছে। শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য-প্রচার এবং হৃদয়ে ধর্ম্ম-ভাবের

উদ্বেগ,—শ্রীমদ্ভাগবতের প্রধান উদ্দেশ্য। এই শ্রীমদ্ভাগবতের দশম-

স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের লীলা-মাপুরী বড়ই মনোমুগ্ধকর। বৈষ্ণব-মাত্রেই সে মাহাত্ম্য-রসে আত্মহারা

হইয়া আছেন । শ্রীমদ্ভাগবত দ্বাদশ স্কন্ধে বিভক্ত । প্রথম স্কন্ধে,—ঋষিগণের প্রেরণ উদ্দেশে
সোমহর্ষণ-নন্দন উগ্রশ্রবা হুত ভগদুত্তম-বর্ণন-পূর্বক ভগবানের অবতার-গ্রহণ-প্রসঙ্গ উপাধন
করেন । নারদের পুত্র-জন্ম, যুধিষ্টির রাজ্যলাভ, শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা-গমন, যুধিষ্টির
স্বর্গারোহণ এবং পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ প্রভৃতি এই প্রথম স্কন্ধে বর্ণিত হইয়াছে । দ্বিতীয়
স্কন্ধে,—সৃষ্টি-বর্ণন, ভাগবত-বিষয়ে পরীক্ষিতের প্রশ্নে শুকদেব ভাগবদারম্ভ করিয়াছেন ।
তৃতীয় স্কন্ধে,—শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-চরিত্র-বর্ণন, সৃষ্টি-তত্ত্ব, বরাহ-রূপে ভগবান কর্তৃক জলমগ্ন
ধরিত্রীর উদ্ধার, কপিলের জন্ম ও সাত্ব্য-যোগ-কথন প্রভৃতি বিবিধ বিষয় পরিবর্ণিত ।
চতুর্থ স্কন্ধে,—ময়ূ-কল্যাণের বংশ-বর্ণন, সতীর দেহত্যাগ, দ্রব-চরিত্র, বেণু, পৃথু, পুরুজ্ঞান
ও প্রচেতা-দিগের চরিত্র-বর্ণন প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্রিবিষ্ট রহিয়াছে । এই অংশ হইতেই
উপাখ্যানের আরম্ভ । পঞ্চম স্কন্ধে,—প্রিয়ব্রত, অগ্নি, জড়ভরত, এবং ভরত-বংশীয়
নরপতিগণের বৃত্তান্ত লিখিত আছে । ষষ্ঠ-বর্ণন ও ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠত্ব, জ্যোতিষ-তত্ত্ব ও
পাতালের বিবরণ—এই স্কন্ধের অন্তর্ভুক্ত । সপ্তম স্কন্ধে,—অজামিলের জন্ম ও চরিত্র, দক্ষ-
কাহিনী, ব্রহ্মাসুরের বিবরণ এবং সবিতা প্রভৃতি দেবগণের বংশ-কীর্ত্তন হইয়াছে ।
অষ্টম স্কন্ধে,—হিরণ্যকশিপু ও প্রহ্লাদের প্রসঙ্গে দেশকালাদিভেদে বিশেষ বিশেষ
ধর্ম্ম-মাহাত্ম্য পরিবর্ণিত আছে । নবম স্কন্ধে,—মহাস্তর-বর্ণন, বামন কর্তৃক বলির নিকট
ত্রিপাদ-ভূমি-প্রার্থনা, বলির পাতাল-প্রবেশ ও মৎস্য-চরিত্র-বর্ণন পরিদৃষ্ট হয় । দশম
স্কন্ধে,—ময়ূ-পুত্রের বংশ-বৃত্তান্ত, অম্বরীয়-বংশ, সগর-বংশ, শ্রীরাম-তনয় কুশের বংশ, সোম-
বংশ, বিশ্বামিত্র-বংশ, পুরু-বংশ, যদুবংশ প্রভৃতির বিবরণ লিখিত আছে । ভগীরথের
গঙ্গা-আনয়ন, শ্রীরামচন্দ্রের যজ্ঞাহুতান, পরশুরামের কাণ্ডবীর্ষ্যার্জুন-বধ প্রভৃতি এই স্কন্ধের
অন্তর্ভুক্ত । দশম স্কন্ধে,—শ্রীকৃষ্ণের লীলা-প্রসঙ্গে পরিপূর্ণ । কংস-কারাগারে দেবকীর
গর্ভে ভগবানের আবির্ভাব এবং বাল্য-ক্রীড়া হইতে আরম্ভ করিয়া কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের
পূর্ব পর্যন্ত ব্রজলীলা-সংক্রান্ত সমস্ত তত্ত্ব এই স্কন্ধেই পরিবর্ণিত রহিয়াছে । গোপীগণের
বদ্ব্যহরণ, রাসলীলা, মথুরা-বাস, রুক্মিণী-হরণ, প্রভৃতি এই স্কন্ধের অন্তর্গত । একাদশ
স্কন্ধে,—ধর্ম্মালোচনা, যুক্তির প্রসঙ্গ, যদুবংশ-ধ্বংস ; দ্বাদশ স্কন্ধে,—ভবিষ্য-রাজবংশ-বর্ণন
ও কলি-ধর্ম্ম-কথন । এই দ্বাদশ স্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়ে শ্রীমদ্ভাগবদালোচ্য সমস্ত বিষয়ের
সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে । শ্রীমদ্ভাগবতের কোনও কোনও অংশ পড়ে বিরচিত
এবং টীকার ভাষা অপেক্ষাকৃত দুর্বোধ্য । শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবানের ষোড়শ অবতারের
বর্ণনা আছে । ভাগবত—ভক্তি-প্রধান গ্রন্থ । মহর্ষি নারদের অনুরোধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের
গুণাত্মকীর্ত্তন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছিল । মহর্ষি বেদব্যাস পুরাণাদি
বহু শাস্ত্র গ্রন্থ এবং মহাভারতাদি মহাকাব্য-গ্রন্থ প্রণয়ন করিলে, দেবর্ষি নারদ তাঁহাকে
বলিলেন,—“ভূমি ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সকল বিষয়েরই বর্ণনা করিয়াছ ; ভূমি বহু পুরাণ ও কাব্য-
গ্রন্থ রচনা করিয়াছ ; কিন্তু ভগবানের যশোবর্ণন ভিন্ন তাঁহার পরিতোষ হয় না ; যেহেতু,—

“ন যদ্বচশ্চিহ্নপদং হরের্বশো জগৎপবিত্রং প্রতীকিতং ।

তদ্ব্যসং তীর্থমুশান্তি মানসা ন মত্র হংসা নীরসশ্চিকিৎসাঃ ॥

তথ্যসিঙ্গের জনভাবিগ্ৰহে যমিন্ প্রতিমৌকমবন্ধব্যাপি ।

নামান্তনন্তত্ব যশোহিকিতানি যৎ শৃণুস্তি শ্রায়স্তি শৃণুস্তি সাধবঃ ॥

‘মনোহর পদাবলী-সম্বলিত বাক্য-রচনা রুথা, যদি তাহাতে শ্রীহরির গুণাহুকীর্তন না হয় ।’ রাজহংসগণ বায়স-সেবিত অপরিহৃত জলাশয় পরিত্যাগ করিয়া নির্মল স্বচ্ছ সরোবরে বিহার করে ; ভগবন্তক পরমহংসগণ সেইরূপ বাক্যচ্ছটাপূর্ণ রচনায় বিভূষণ প্রদর্শন পূর্বক ‘হরিগুণাহুবাসপূর্ণ রচনার প্রতি আকৃষ্ট হন । যে গ্রন্থের প্রতি শ্লোকে ভগবানের গুণাহুকীর্তন আছে, সেই গ্রন্থই জনসাধারণের পাপ-নাশ করিতে সমর্থ ; যেহেতু, সেই গ্রন্থ পাঠে সাধুগণ ভগবানের নাম শ্রবণ, উচ্চারণ ও কীর্তন করিবার অবসর প্রাপ্ত হন ।’ শ্রীমদ্ভাগবতের মতে,—ভক্তিই প্রধান, ভক্তি হইতেই জ্ঞান উৎপন্ন হয় । ভাগবতকার তাই ভগবৎ-কার্য্যকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন ।

‘যদত্র ক্রিয়তে কৰ্ম ভগবৎ পরিতোষণম্ । জ্ঞানং যন্তদধীনমহি ভক্তিযোগ সমাযতম্ ॥’

ব্রহ্মা কর্তৃক ত্রীকৃষ্ণের স্তব-প্রসঙ্গে কৃষ্ণের রূপ কি সুন্দর পরিবর্ণিত ! কবির ও ভক্তির মধুর স্রোতে—ভাবের ও ভাষার তরতর প্রবাহে—তাহা পরিপ্লুত । ব্রহ্মা বলিতেছেন,—

“নোনীড্য তেহ ব্রবপুষে তড়িদম্বরায় গুণাবতংসপরিপিচ্ছলসম্মুখায় ।

বহুশ্রেণে কবলবেজবিষাগবেমূলম্মগ্নিয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায় ॥

অস্যাপি দেববপুষো মদন্তগ্রহত্য খেচ্ছান্নময়ত্ব ন তু ভূতময়ত্ব কোহপি ।

নেশেমহি ভবনিত্বং যনসাস্তুরেণ সাক্ষাৎ তটৈব কিমুভান্নাহুখ্যাহুতঃ ॥

... ..

শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদয় তে বিভো ক্রিষ্ণন্তি বে কেবল বোধলকয়ে ।

তেষামসৌ ক্লেণল এব শিখাতে নাশ্রয়ণা স্থলভূনাবধাতিনাম্ ॥”

‘হে পূজ্য ! তোমাকে আমি নমস্কার করি । তোমার নবনীরদ-সদৃশ শ্রাম-কলেবরে পীতবসন বিদ্যাদ্বং শোভা পাইতেছে । গুণাবৃত কর্ণভূষণ এবং ময়ূরপুচ্ছ তোমার মুখমণ্ডলের শোভা সম্পাদন করিয়াছে । তোমার গলদেশে বনমালা কি সুন্দর দেখাইতেছে ! ইত্যাদি । হে বিভো ! তোমার ভক্তি-পথে সঙ্গল-স্রোত প্রবাহিত । তৎপথ-পরিভ্রমণে যাহারা কেবল জ্ঞানমার্গাহুসারী, তাহারা কষ্টই পাইয়া থাকে । যাহারা ক্ষুদ্রপ্রমাণ ধাত্ত পরিত্যাগ করিয়া, বৃহত্তর দর্শনে তুষের প্রতি অবঘাত করে, তাহারা কেবল রুথাই ক্লেণ পায় ।’ এইরূপ, কবিত্বের মধ্যে ভক্তির পাশা কীর্তনেই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রেষ্ঠস্থানীয় ।

নবম—অগ্নি-পুরাণ । সৌনকাদি ঋষির প্রমোত্তরে হৃত এই পুরাণ বর্ণন করিতেছেন । তিনি বলেন,—‘কৃষ্ণঐশ্যায়ন বেদব্যাস এই পুরাণের বিষয় বশিষ্ঠের নিকট শ্রবণ করিয়াছিলেন, এবং বশিষ্ঠ অগ্নির নিকট হইতে ইহা শ্রবণ করেন ।’

অগ্নি-পুরাণ । অগ্নি-কর্তৃক ইহা সর্বপ্রথম পরিবর্ণিত হইয়াছিল বলিয়াই এই পুরাণ

অগ্নি-পুরাণ নামে অভিহিত হয় । অজ্ঞাত পুরাণের জ্ঞায়, এই পুরাণে,—

মংস্ত, কুর্শ, বরাহাদি অবতারের বিবরণ ; রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ প্রভৃতির স্থল স্থল আখ্যায়িকা ; নানাবিধ পূজা ও ব্রত-পদ্ধতি ; এবং তীর্থ-মাহাত্ম্য ও ব্রহ্ম-মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে । অধিকন্তু, বুদ্ধ বিজ্ঞা, ধর্ম্মজিহ্ম, ও অ্যার্ম্মজিহ্ম, সাহিত্য-বিজ্ঞা, পঞ্চাদির চিকিৎসা-বিজ্ঞা,

ব্যাকরণ, ছন্দ-প্রকরণ, রাজ-ধর্ম, রত্ন-নিরূপণ প্রভৃতি নানা বিষয়, এই অগ্নি-পুরাণে পরিবিষ্ট রহিয়াছে। অগ্নি-পুরাণের ব্যাকরণ-অংশে শব্দরূপ ধাতুরূপ পর্য্যন্ত পরিবর্ণিত আছে। এই পুরাণের কিয়দংশ গড়ে রচিত। ইহাতে তত্ত্বের বহু বীজ-মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। যুদ্ধের অস্ত্রাদি নির্মাণ-প্রণালী এবং কুরুপ-ভাবে যুদ্ধ করিবে, এই পুরাণে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। নগর, গ্রাম ও দুর্গাদি নির্মাণ বিষয়ে এই পুরাণে যে উপদেশ আছে, তাহাতে তাৎকালিক বিশেষ সমৃদ্ধিশালী রাজ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। অধুনা যেক্রপভাবে দশ অবতারের মূর্তি প্রস্তুত হইয়া থাকে, এই পুরাণান্তর্গত দশ অবতার বর্ণনার সহিত তাহার বিশেষ সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়। অত্যান্য দেবদেবীর আকৃতিও এই পুরাণে বিশদভাবে পরিবর্ণিত। অগ্নি-পুরাণের সহিত অমরকোষ অভিধানের বহু অংশের সাদৃশ্য দেখিয়া, অনেকে মনে করেন,—অগ্নি-পুরাণ হইতে অমরকোষের তত্তৎ অংশ সঙ্কলিত হইয়াছে।

দশম—স্কন্দ-পুরাণ। এই পুরাণ সর্বাঙ্গোৎকৃষ্ট। এ পর্য্যন্ত এই পুরাণ একত্র সংগৃহীত হইয়াছে কিনা, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখি। স্কন্দ-পুরাণ প্রধানতঃ ছয়টি খণ্ডে বিভক্ত,—কাশী-খণ্ড, উৎকল-খণ্ড, প্রভাস-খণ্ড, মহেশ্বর-খণ্ড, বৈষ্ণব-খণ্ড এবং স্কন্দ-পুরাণ। ব্রহ্ম-খণ্ড। এই ছয় খণ্ডকে ছয় ধানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ বলিলেও বলা যাইতে পারে। সেই স্বাভাবিক-নিবন্ধন ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা এই পুরাণ বিরচিত হইয়াছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। স্কন্দ-পুরাণান্তর্গত কাশী-খণ্ডে,—কাশী-ধামের সমস্ত তীর্থের মাহাত্ম্য যেক্রপ-ভাবে পরিবর্ণিত আছে, সেক্রপ আর কোথাপি দৃষ্ট হয় না। কাশী-বর্ণন উপলক্ষে গঙ্গা-মহিমা, গঙ্গার সহস্র নাম, সদাচার, দ্বা-লক্ষণ এবং কাশীর পৌরাণিক ইতিহাস ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। দিবোদাস নৃপতির প্রণয়-বর্ণন, পতিব্রতের আখ্যান, শিবশর্ম্মার নির্মাণ-প্রাপ্তি প্রভৃতি এই খণ্ডে বিশেষ কোহুল-প্রদ। উৎকল-খণ্ডে,—ত্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মাহাত্ম্য ও পূজা-পদ্ধতি পরিকীর্তিত হইয়াছে। উৎকল দেশের বিবরণ, পুরী-প্রতিষ্ঠা, পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রের পরিমাণ-নির্দেশ, পুত্ররীক ও অম্বরীষের জগন্নাথ-দর্শন, ইন্দ্রদ্রায় রাজার যজ্ঞস্থান ও স্বপ্নে ভগবদর্শন-লাভ, পরিশেষে রাজা কর্তৃক মূর্তি-নির্মাণোদ্ভোগ, দারুণ মূর্তিতে জগন্নাথ-দেবের আবির্ভাব, ইন্দ্রদ্রায়ের বরলাভ, দানযাত্রা, রথযাত্রা প্রভৃতি পুরুষোত্তম-সংক্রান্ত যাবতীয় জ্ঞাতব্য-তত্ত্ব উৎকল-খণ্ডে স্থানলাভ করিয়াছে। কাশীখণ্ড এবং উৎকল-খণ্ড পাঠ করিলে, স্বভাবতঃই লোকের মন তীর্থ-দর্শনে আকৃষ্ট হয়। প্রভাসখণ্ডে,—প্রভাস-তীর্থের মাহাত্ম্য পরিকীর্তিত আছে। মহেশ্বর-খণ্ডে,—শিবের মাহাত্ম্য-বর্ণন উপলক্ষে দক্ষ-যজ্ঞ, লিঙ্গ-পূজা-মাহাত্ম্য, ইন্দ্রদ্রায় ও দমনক প্রভৃতির উপাখ্যান এবং হর-গৌরী-লীলা বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে। বায়ুদেবের মহিমা এবং পাণ্ডবদিগের উপাখ্যান এই খণ্ডে দেখিতে পাওয়া যায়। বৈষ্ণব-খণ্ডে,—প্রধানতঃ বিষ্ণুর মাহাত্ম্য পরিকীর্তিত। মার্কণ্ডেয়, অম্বরীষ, ইন্দ্রদ্রায়, জৈমিনি, নীলকণ্ঠ, নৃসিংহ প্রভৃতির নানা উপাখ্যানে, তীর্থ-মাহাত্ম্য, ব্রত-মাহাত্ম্য প্রভৃতি নানা মাহাত্ম্য-তত্ত্ব, এই বৈষ্ণব-খণ্ডে পরিপূর্ণ। ফুল, ফল, ভুলসীদল ও নৈবেদ্য প্রভৃতির দ্বারা দেব-পূজায় সুফল-প্রাপ্তির বিষয় এই পুরাণে বিশদভাবে পরিবর্ণিত আছে। ব্রহ্ম-খণ্ডে,—

দাক্ষিণাত্যের সেতুবন্ধ-রামেশ্বর প্রভৃতি বহু ভাষ্যের পরিচয় পাওয়া যায় । শ্রীরাম-চরিত্র, বিষ্ণু-পূজা-মাহাত্ম্য, শালগ্রাম নিরূপণ, উমা-মহেশ্বর-ব্রত, এবং নানাবিধ দান-ধর্ম-ব্রতের বিষয় ইহাতে উল্লিখিত আছে । স্বন্দ-পুরাণের বিশেষত্ব,—এই পুরাণে একাদিকে শিবের মাহাত্ম্য, অত্মদিকে বিষ্ণুর মাহাত্ম্য পরিকল্পিত ; একাদিকে কাশী-খণ্ডে বিবেশ্বর অন্ন-পূর্ণার প্রভাব, অত্মদিকে উৎকল-খণ্ডে জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রার মহিমা কীৰ্ত্তন । একই পুরাণে ভিন্ন ভিন্ন ভাষ্যের উল্লেখ দেখিয়া, অনেকে ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ের রচনা বলিয়া মনে করেন । মতান্তরে আবার দেখিতে পাওয়া যায়,—স্বন্দ-পুরাণে ‘অবস্তা-খণ্ড’ নামে আর একখানি খণ্ড আছে । তাহাতে বহু ভাষ্যের এবং বহুতরু-বিচার প্রাধান্য কীৰ্ত্তিত হইয়াছে । আধক সংখ্যক ভীষ্মের মহিমা বাণত আছে বলিয়া, স্বন্দ-পুরাণকে কেহ কেহ ভাষ্যের পুরাণ নামেও অভিহিত করেন ।

একাদশ—ভাব্য-পুরাণ । ইহা পাঁচটী পর্বে বিভক্ত । প্রথম পর্বে,—হৃষ্টি-প্রক্রিয়া, তিথি-মাহাত্ম্য এবং বিষ্ণু, শিব ও সূর্য্য পূজার প্রসঙ্গ আছে । দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ পর্বে,—যথাক্রমে শিব-মাহাত্ম্য, বিষ্ণু-মাহাত্ম্য, সূর্য্য-মাহাত্ম্য বিশদভাবে পরিবর্ণিত ।

ভবিষ্য-পুরাণ । পঞ্চম পর্বে, স্বর্গের বর্ণনা । এই পুরাণে সকল-ধর্মের সামঞ্জস্য-বিধানের চেষ্টা হইয়াছে বলিয়া, অনেকের বিশ্বাস,—ইহাতে সকল দেবতা অপেক্ষা ব্রহ্মের প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠার জগৎ পুরাণ-কার প্রয়াস পাইয়াছেন । এই পুরাণে শাকদ্বীপ-বাসী সূর্য্যোপাসক ‘মগ’ জাতির উল্লেখ দেখিয়া, পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ মনে করেন,—“ইরাণ (পারস্ত) দেশীয় অগ্নি-উপাসকদিগের সম্বন্ধে উহা প্রযুক্ত হইয়াছিল ।” * স্মৃত্যন্ত পুরাণের জায়, এই পুরাণে প্রাচীন-রাজগণের এবং চন্দ্র-সূর্য্যাদি বংশের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায় । পরন্তু, আজিকালি যে ভবিষ্য-পুরাণ বোম্বাই-প্রদেশ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে আবার যোগল-বাদসাহ আকবরের কথা, কলিকাতা রাজধানীর বর্ণনা এবং ব্রাহ্ম-ধর্ম-প্রচারক সুপ্রসিদ্ধ কেশবচন্দ্র সেনের নামোল্লেখ আছে । ভবিষ্য-পুরাণে এই সকল আধুনিক বিষয়ের সমাবেশ দেখিয়া, অনেকে এই পুরাণকে, অন্ততঃ এতদন্তর্গত বিশেষ বিশেষ বিষয়কে, আধুনিক বা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করেন ।

ষাদশ—ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ । ব্রহ্ম-খণ্ড, প্রকৃতি-খণ্ড, গণেশ-খণ্ড, শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-খণ্ড,—এই চারিখণ্ডে ইহা সম্পূর্ণ । নৈমিষারণ্য ভীষ্মে মৌনকাদি ঋষিগণের নিকট প্রথম-

পৌরাণিক সৌতি এই ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ বর্ণনা করেন । এই পুরাণে ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ । শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকার লীলা-প্রসঙ্গ বিশদ-ভাবে বর্ণিত রহিয়াছে ।

অনেকের বিশ্বাস,—শ্রীরাধা সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যে-কোনও গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে, তাহার সকলেরই মূল,—এই ব্রহ্ম-বৈবর্ত । পুরাণের মধ্যে এক ব্রহ্ম-বৈবর্ত ভিন্ন শ্রীরাধিকার প্রসঙ্গ অতঃ কোনও পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায় না । এই পুরাণের ব্রহ্ম-খণ্ডে হৃষ্টি-নিরূপণ-প্রসঙ্গে দেখিতে পাই,—শ্রীকৃষ্ণের শরীর হইতে নারায়ণাদির আবির্ভাব, রাসমণ্ডলে রাধার উৎপত্তি, রাধা-কৃষ্ণের দেহ হইতে গো-গোপী ও গোপদিগের

আবির্ভাব, তৎপরে বিশ্ব-চরাচরের সৃষ্টি । প্রকৃতি-খণ্ডে,—সৃষ্টি-কাণ্ডে, দুর্গা, রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, সাবিত্রী—এই পঞ্চ-প্রকৃতির মাহাত্ম্য কীৰ্ত্তিত হইয়াছে । প্রসঙ্গতঃ, সাবিত্রী-সত্যবান, সুরভি, স্বাহা-ও স্বধার উপাখ্যান, দেবী-মাহাত্ম্যে সুরথ-বংশ-বর্ণন, গন্ধার উপাখ্যান, রামায়ণ প্রভৃতির কথা, ইত্যের প্রতি দৃষ্টিসাধার অভিধাণ এবং লক্ষ্মী-পূজার প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয় । গণেশ-খণ্ডে,—প্রধানতঃ গণেশের মাহাত্ম্য পরিকীৰ্ত্তিত ; প্রসঙ্গতঃ, জমদগ্নি, কার্ত্তবীৰ্য্য, পরশুরাম প্রভৃতির উপাখ্যান উত্থাপিত । শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ডে—কৃষ্ণলীলা আত্মপূর্ব্বক পরিবৰ্ণিত । ব্রজলীলা, মাথুর, রাধাকৃষ্ণের পুনর্দর্শন, গোবলবাসীদের গোলোকে গমন প্রভৃতিও এই জন্মখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত । ব্রহ্মবৈবৰ্ত্তের শেষ অধ্যায়ে, মহাপুরাণ ও উপপুরাণের লক্ষণ, মহাপুরাণ সকলের শ্লোক-সংখ্যা, উপপুরাণ সকলের নাম-কীৰ্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায় । অনেকাংশে শ্রীমদ্ভাগবতের মতের সহিত তাহার ঐক্য আছে । ঐ শেষ অধ্যায়ের পূর্ব্ববর্তী অধ্যায়ে, ব্রহ্মবৈবৰ্ত্ত-পুরাণে কি কি বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ সরিষিষ্ট । ব্রহ্মবৈবৰ্ত্ত-পুরাণের মতে,—মহাপুরাণ-সমূহের দশটি লক্ষণ । যথা,—সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, পালন, কৰ্ম্ম, বাসনা-বর্ণন, চতুদশ মন্ত্রের প্রত্যেকের নামাবলি কীৰ্ত্তন, মোক্ষ-নিরূপণ, শ্রীহরির গুণানুকীৰ্ত্তন এবং পৃথক পৃথক দেবগণের মহিমা-বর্ণন । এই দশটি বিশেষ লক্ষণ ; কিন্তু প্রধানতঃ পাঁচটি লক্ষণ পুরাণোপপুরাণ উভয়ত্রই থাকিবে । সে পাঁচটি লক্ষণ,—সৃষ্টি, প্রলয়, চন্দ্র ও সূর্যাদির বংশ-ক্রম্বয়ে চতুদশ মন্ত্রের অধিকার-কীৰ্ত্তন এবং চন্দ্র-সূর্য্য-বংশীয় নৃপতিগণের বংশ-বর্ণন ।

ত্রয়োদশ—মার্কণ্ডেয়-পুরাণ । এই পুরাণের অন্তর্গত দেবী-মাহাত্ম্য চণ্ডী, হিন্দু-মাত্রেয়ই পূজার সামগ্রী । হিন্দুর বিশ্বাস,—যে গৃহে যথানিয়মে চণ্ডীপাঠ হয়, আধি-ব্যাধি-শোক-তাপ সে গৃহে প্রবেশ করিতে পারে না ; চণ্ডীপাঠে মার্কণ্ডেয়-পুরাণ । সকল বিপদ দূর হয় । চণ্ডীকে দুর্গাস্তব বলে,—চণ্ডীকে দেবী-মাহাত্ম্য বলে । পুরাকালে হিন্দুর গৃহে চণ্ডী নিত্য পঠিত হইত বলিয়া, চণ্ডী-গৃহের নাম—চণ্ডীমণ্ডপ । মার্কণ্ডেয়-পুরাণে অগাধ কতই মনোহর উপাখ্যান আছে ; কিন্তু একমাত্র দেবী-মাহাত্ম্য-চণ্ডীর উজ্জ্বল্য সকলের উজ্জ্বল্য আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে । মার্কণ্ডেয়-পুরাণে হরিষ্চন্দ্রের উপাখ্যান আছে ; দত্তাত্রেয়ের উপাখ্যান আছে ; ক্রপদের, মহেশ্বর, যমাতির, পুরুষোত্তর, ইক্ষ্বাকুর, রামচন্দ্রের,—সকলের কথাই, সকলের চরিত্র-কাহিনীই আলোচিত হইয়াছে । দর্শন-তত্ত্ব, সৃষ্টি-রহস্য, তীর্থ-মাহাত্ম্য, দ্বীপ ও বর্ষের প্রসঙ্গ, পাপ-পুণ্যের চিত্র,—এই পুরাণের অন্তর্নিবিষ্ট । অথচ, সর্বোপরি প্রতিষ্ঠা,—দেবী-মাহাত্ম্য চণ্ডীর । মার্কণ্ডেয় ঋষি প্রসঙ্গতঃ এই চণ্ডী-মাহাত্ম্য কীৰ্ত্তন করেন । এই দেবী-মাহাত্ম্য চণ্ডীর উপাখ্যান-ভাগ এইরূপ,—“চৈত্র-বংশ-সম্ভূত রাজা সুরথ, রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া, মেধস-মুনির শরণাগত হন । মেধস-মুনি তাঁহাকে উপদেশ দেন,—বহামার্য্য রূপা ভিন্ন কোনই সফল লাতের আশা নাই । তখন সুরথ রাজা মহামার্য্য রূপ-তত্ত্ব অবগত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন । অতঃপর, মেধস ঋষি, ভগবতীর উৎপত্তি-বিবরণ বর্ণন করিয়া, সূর্য্য-পুত্র সাবর্ণি কি

প্রকারে মহামায়ার অমুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হন। তৎপ্রসঙ্গ পরিলম্ব্য হইলে, মেঘস কহিলেন,—‘কশ্যপ-তনয় শুভ্র-নিশুভ অমুরদ্বয় দর্পভরে দেবরাজের ত্রৈলোক্যাধিপত্য ও দেবতাদিগের যজ্ঞভাগ হরণ করিয়াছিল। হত্যাধিকার দেবগণ রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া মহামায়াকে আরাধনা করেন।’ দেবগণ যেভাবে মহামায়ার স্তব করিয়াছিলেন, চণ্ডী-মাহাত্ম্যের তাহা মেরুদণ্ড-স্বরূপ। দেবগণের সে স্তব এই,—

“নমো দেবৈ মহাদেবৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ । নমঃ প্রকৃতৌ ভদ্রায়ৈ নিয়তঃ প্রণতঃ স্য তাম্ ॥
রৌদ্রায়ৈ নমো মিত্যায়ৈ গোপোধ্যাত্র্যৈ নমোনমঃ । জ্যোৎস্নায়ৈ চেন্দ্রকৃপিত্যৈ স্থথায়ৈ সততং নমঃ ।
কল্যাণ্যৈ প্রণতা বৃদ্ধ্যৈ দৈক্যৈ কুক্ষ্যৈ নমোনমঃ । নৈশ্চ তৈত্ব ভূত্বাং লজ্জ্যৈ সর্বাণ্যৈ তে নমোনমঃ ॥
দুর্গায়ৈ দুর্গপারায়ৈ সারায়ৈ সর্বকারিণ্যৈ । খ্যাত্যৈ তথৈব কৃপায়ৈ ধূম্রায়ৈ সততং নমঃ ।
অতি সৌম্যাতি রৌদ্রায়ৈ নভাত্তৈ নমোনমঃ । নমো জগৎপ্রতিষ্ঠায়ৈ দেবৈ কৃত্যৈ নমোনমঃ ।

যা দেবী সর্বভূতেষু বিষ্ণুরূপেণ সংস্থিতা । নমস্ত্যৈ নমস্ত্যৈ নমস্ত্যৈ নমোনমঃ ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু চেতনোভাবীয়তে । নমস্ত্যৈ নমস্ত্যৈ নমস্ত্যৈ নমোনমঃ ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা । নমস্ত্যৈ নমস্ত্যৈ নমস্ত্যৈ নমোনমঃ ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু নিদ্রারূপেণ সংস্থিতা । নমস্ত্যৈ নমস্ত্যৈ নমস্ত্যৈ নমোনমঃ ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু ক্ష্মারূপেণ সংস্থিতা । নমস্ত্যৈ নমস্ত্যৈ নমস্ত্যৈ নমোনমঃ ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু ছায়ারূপেণ সংস্থিতা । নমস্ত্যৈ নমস্ত্যৈ নমস্ত্যৈ নমোনমঃ ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা । নমস্ত্যৈ নমস্ত্যৈ নমস্ত্যৈ নমোনমঃ ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু তৃষ্ণারূপেণ সংস্থিতা । নমস্ত্যৈ নমস্ত্যৈ নমস্ত্যৈ নমোনমঃ ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু কান্তিরূপেণ সংস্থিতা । নমস্ত্যৈ নমস্ত্যৈ নমস্ত্যৈ নমোনমঃ ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু জাতিরূপেণ সংস্থিতা । নমস্ত্যৈ নমস্ত্যৈ নমস্ত্যৈ নমোনমঃ ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু লজ্জারূপেণ সংস্থিতা । নমস্ত্যৈ নমস্ত্যৈ নমস্ত্যৈ নমোনমঃ ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা । নমস্ত্যৈ নমস্ত্যৈ নমস্ত্যৈ নমোনমঃ ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু প্রকারেণ সংস্থিতা । নমস্ত্যৈ নমস্ত্যৈ নমস্ত্যৈ নমোনমঃ ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু কান্তিরূপেণ সংস্থিতা । নমস্ত্যৈ নমস্ত্যৈ নমস্ত্যৈ নমোনমঃ ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু লজ্জারূপেণ সংস্থিতা । নমস্ত্যৈ নমস্ত্যৈ নমস্ত্যৈ নমোনমঃ ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা । নমস্ত্যৈ নমস্ত্যৈ নমস্ত্যৈ নমোনমঃ ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু স্মৃতিরূপেণ সংস্থিতা । নমস্ত্যৈ নমস্ত্যৈ নমস্ত্যৈ নমোনমঃ ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা । নমস্ত্যৈ নমস্ত্যৈ নমস্ত্যৈ নমোনমঃ ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু তুষ্টিরূপেণ সংস্থিতা । নমস্ত্যৈ নমস্ত্যৈ নমস্ত্যৈ নমোনমঃ ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু যাতুরূপেণ সংস্থিতা । নমস্ত্যৈ নমস্ত্যৈ নমস্ত্যৈ নমোনমঃ ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু ভাস্তিরূপেণ সংস্থিতা । নমস্ত্যৈ নমস্ত্যৈ নমস্ত্যৈ নমোনমঃ ॥
ইন্দ্রিয়ানামধিকারী স্ত্রীহান্যধিকারী য়া । স্ত্রীভূতৈ সততং তস্যৈ ব্যাপ্তি দেবো নমোনমঃ ।
তিষ্ঠিরূপেণ য়া কুৎসিতম্যাপ্যস্থিতা জগৎ । নমস্ত্যৈ নমস্ত্যৈ নমস্ত্যৈ নমোনমঃ ॥

স্ত্রী হরৈঃ পূৰ্ণমভীষ্ট সংপ্রাপ্তা হরৈঃ স্নেহেণ দিনেব সেবিতা ॥

করোতু সা নঃ শুভহেতুরীক্ষরী শুভানি ভদ্রাণ্যভিহন্ত চাপদ ॥

যা সশ্রুতং সৌক্যমৈত্যাতিশয়ৈরভিহরীশা চ হরৈঃ নস্য তে ॥

যা চ স্ত্রীভা তৎকণ্ঠেবহন্তি নঃ সর্বা পদো ভক্তিবিব্রম্যস্থিতিঃ ॥”

দেবগণের এই স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া, মহামায়া কুরঙ্গ শুভ্র-নিশুভের সংহার-সাধন-পূর্বক

দেবগণকে স্বর্গ-রাজ্য পুনঃ-প্রদান করেন । মেঘস্বর নিকট মহামায়ার মাহাত্ম্য-কথা শ্রবণ করিয়া, রাজা সুরধ তপস্কার প্রবৃত্ত হন । তাহার ফলে, দেবীর নিকট বর প্রাপ্ত হইয়া তিনি সাকল্য লাভ করেন । রাজা সুরধ কিরূপ বৃত্তি নিৰ্ম্মাণ করিয়া কোন ঋতুতে মহামায়ার পূজা করিয়াছিলেন, মার্কণ্ডেয়-পুরাণে তাহার কোনও উল্লেখ নাই । তবে কিংবদন্তী এই,— তিনি বসন্ত-কালে এবং শ্রীরামচন্দ্র শরৎ-কালে দেবীর আরাধনা করিয়াছিলেন । আর, তদনুসরণেই বাসন্তী এবং শারদীয় পূজার প্রবর্ত্তনা । দেবী-মাহাত্ম্য পাঠ করিবার পূর্বে, প্রথমে ‘নারায়ণ-নমস্কৃত্যে’ ইত্যাদি বন্দনা পাঠ ; পরে অর্গলা-স্তোত্র, কীলক-স্তব, কবচ, দেবীমুক্ত, ঋত্বাদি পাঠ আবশ্যক । অবশেষে চণ্ডীপাঠ করিতে হয় ।

চতুর্দশ—বামন-পুরাণ । প্রধানতঃ বামন অবতারে বলি-রাজের দান-মাহাত্ম্য-কীৰ্ত্তনই এই পুরাণের উদ্দেশ্য । তৎপ্রসঙ্গে ইহাতে বিষ্ণুর প্রাধান্ত পরিকীৰ্ত্তিত । এই পুরাণে দেখিতে পাই,—প্রহ্লাদের পৌত্র বলি, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কটুবাক্য বামন-পুরাণ । প্রয়োগ করায়, প্রহ্লাদের নিকট শাপ-গুণ্ত হইয়াছিলেন । বলিরাজ দানধর্ম্মে অদ্বিতীয় লাভ করিলেও, পিতামহের শাপে তাঁহাকে রাজ্যভ্রষ্ট হইতে হয় ; ভগবান বামনরূপে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া, ত্রিপাদ-ভূমি ভিক্ষা-প্রার্থনা করেন । মহাবাহু বলি যে সময়ে বামন-দেবকে ত্রিপাদ-ভূমি দান করিতে প্রস্তুত হন, সেই সময়ে ভগবান বিরাট-রূপ ধারণ করেন ; সকলে দেখিতে পান,—চন্দ্র-সূর্য্য নয়ন, স্বর্ণ মস্তক, পৃথিবী চরণ ইত্যাদি বিরাট-রূপে তিনি প্রকটিত হইয়াছেন । ফলে, সর্ব্বত্র দানে বলিকে পাতালে গমন করিতে হয় । ব্রহ্মার শিরশ্ছেদ-বিবরণ, কপাল-যোচনের উপাখ্যান, দক্ষ-যজ্ঞ, দেব-দামব-যুদ্ধ, মহিষাসুর বধ, বলি-বংশ বর্ণন, প্রহ্লাদ কর্তৃক বলিকে শাপ প্রদান, চণ্ড-মুণ্ড বধ, শুভ্র-নিশুভ্র বধ প্রভৃতি বিষয়ের বর্ণনা, এই পুরাণে দৃষ্ট হয় । দেবর্ষি নারদের প্রশ্নের উত্তরে পুলস্ত্য ঋষি এই পুরাণের বিষয় বর্ণন করেন । ভগবানের বামন অবতারের কথা ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে বলিয়াই এই পুরাণের নাম—বামন-পুরাণ ।

পঞ্চদশ—বরাহ-পুরাণ । বরাহ অবতারের লীলা-প্রসঙ্গ এই গ্রন্থে পরিবর্ণিত । প্রলয়-জলোখিতা বসুন্ধার প্রস্ত্রে বরাহ-অবতার কর্তৃক এই পুরাণ ব্যক্ত হয় ;—এই ব্রহ্মই ইহার নাম—বরাহ-পুরাণ । পুরাণের লক্ষণ, সৃষ্টি-প্রকরণ, প্রিয়ত্রয়ের উপাখ্যান,

বরাহ-পুরাণ । দশাবতার-তত্ত্ব, বিবিধ ব্রত-কথা, বহুতর তীর্থ-মাহাত্ম্য, জম্বু-দ্বীপ-প্রমাণাদি, দেশ-নদী প্রভৃতির বর্ণনা, দেব-দেবীর প্রতিমা-নিৰ্ম্মাণ-বিধি,—

এই পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায় । বরাহ-পুরাণের শেষ অধ্যায়ে ইহার বিষয়াক্রমশি লিখিত আছে ।

অমরদান, জলদান, ধেনুদান প্রভৃতি দান-মাহাত্ম্য এই গ্রন্থে কীৰ্ত্তিত হইয়াছে । বরাহ-পুরাণের ষাটশাধিক শততম-অধ্যায়ে পুরাণ-সকলের নাম ও সংখ্যা লিখিত আছে ।

পুরাণের লক্ষণ সম্বন্ধে এই গ্রন্থের মত,—‘পুরাণ পঞ্চলক্ষণাক্রান্ত । সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশান্তকীৰ্ত্তন—এই পাঁচটী পুরাণের লক্ষণ ।’ এই পুরাণের মতে,— অবতার দশটী মাত্র ;—মৎস্য, কুর্মা, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কল্কি । এই গ্রন্থে বুদ্ধ-বাদশী ব্রত-প্রসঙ্গে কাকনয়ন বুদ্ধ-মূর্ত্তি নিৰ্ম্মাণ করিয়া

পূজা করিতে বলা হইয়াছে। কিন্তু এই বুদ্ধকে এবং কপিলাবস্তুর বুদ্ধকে অতিশয় বলিয়া মনে হয় না। এই বুদ্ধকে হব্যাকেশ, দামোদর, চক্রপাণি প্রভৃতি নামে সম্বোধন করা হইয়াছে; এবং সত্যযুগেও যে বুদ্ধ-বাদশী-ব্রত প্রচলিত ছিল, তাহার উল্লেখ আছে। কলে, বুদ্ধ-অবতার-সম্বন্ধে নানা মতভেদ দাঁড়াইয়াছে; সুতরাং কোন বুদ্ধ অবতার-রূপে শাস্ত্র-গ্রন্থাদিতে সম্পূর্ণ, তাহা নির্ণয় করা দুঃকর।

ষোড়শ—মৎস্ত-পুরাণ। মহা-প্রলয়ে ভগবান বিষ্ণু মৎস্ত-রূপ ধারণ করিয়া মনুকে এবং সংসারের সমস্ত সামগ্রীর বীজ রক্ষা করিয়াছিলেন;—এই পুরাণে প্রধানতঃ তাহাই পরিবর্ণিত। সৃষ্টি-রক্ষার জন্ত ভগবানের এই অবতার-গ্রহণ—মৎস্তাবতার মৎস্ত-পুরাণ। নামে অভিহিত হয়। মনু ও মৎস্তের যে বিবরণ শতপথ-ব্রাহ্মণে সংক্ষেপে দেখিতে পাই, এই গ্রন্থে তাহাই পল্লবিত ও শাখা-প্রশাখা-সম্বিত।

মৎস্ত পুরাণে প্রসঙ্গতঃ নিম্ন-লিখিত বিষয়-পরম্পরা সন্নিবিষ্ট আছে;—নরসিংহ-মহাশ্ময়, বিষ্ণুর দশ অবতার প্রসঙ্গে অনন্ত তৃতীয়া প্রভৃতি ব্রতের এবং প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থের মাহাত্ম্য; চন্দ্র-বংশ, সূর্য্য-বংশ, কুরু-বংশ, হতাশন-বংশ এবং যযাতি ও কার্ত্তবীৰ্য্য প্রভৃতির উপাখ্যান; কল্ল ও যুগ-বিবরণ, প্রতিমা-লক্ষণ, দেব-মণ্ডপ-লক্ষণ, সাবিত্রী-চরিত, গ্রন্থাদির শুভাশুভ-যাজ্ঞ-কল; পার্শ্বতীর জন্ম, মর্দন-ভয়, শিবের বিবাহ, কার্ত্তিকেয়ের জন্ম; রাজ-ধর্ম্ম, ভবিষ্য-রাজগণের বিবরণ, ইত্যাদি। এই পুরাণ-প্রসঙ্গে মৎস্তাবতার বিষ্ণু-কর্ত্তৃক পূর্ববর্তী সপ্ত-কল্পের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। ষ্ট্যানদিগের বাইবেলোক্ত (‘ওল্ড টেস্টামেন্ট’) নোয়া এবং জল-প্লাবনের ঘটনা, অনেকে মনে করেন, মৎস্ত-পুরাণের উপাখ্যানের অনুরূপ। জল-প্লাবনের সময় মনু যখন পর্তুতোগারি আপন পোত রক্ষা করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় মৎস্ত-রূপী ভগবান মনুর নিকট এই পুরাণ-প্রসঙ্গ বর্ণন করেন।

সপ্তদশ—কুর্খ-পুরাণ। কুর্খরূপ ধারণ করিয়া ভগবান দেবগণের মঙ্গল-বিধান করিয়াছিলেন, তৎপরেই ভগবানের কুর্খাবতার সম্পূর্ণ হইয়া থাকে। কুর্খ-রূপী ভগবান এই পুরাণ-প্রসঙ্গ প্রথমে বর্ণনা করিয়াছিলেন। নারদের নিকট তিনি কুর্খ-পুরাণ। যাহা বর্ণনা করেন, ঋষিগণকে যত তাহারই মর্ম্ম প্রবণ করান। ব্রাহ্মী, ভাগবতী, দৌরী ও বৈষ্ণবী,—এই চারি সংহিতায় পূর্বে ইহা বিভক্ত ছিল। কিন্তু এখন তদন্তর্গত ব্রহ্ম-সংহিতা ভিন্ন অত্র কোনও সংহিতা পাওয়া যায় না। সুতরাং ব্রহ্ম-সংহিতাই এখন কুর্খ-পুরাণ নামে পরিচিত। সৃষ্টি ও বংশানুকীর্ণন ইহাতে আশ্রয় করিয়া, দক্ষ-বক্ষ, বায়নাবতার, কুরু-চরিত্র, যুগ-ধর্ম্ম প্রভৃতির বিষয় এই পুরাণে বর্ণিত আছে। দান-ধর্ম্ম, তীর্থ-মাহাত্ম্য, নিত্য-কর্ম্ম, অশৌচ বিচার প্রভৃতিও ইহার অন্তর্নিবিষ্ট। এই পুরাণে দৈব-গীতা এবং ব্যাস-গীতা অধ্যায়-দ্বয়ে যথাক্রমে জ্ঞানযোগ এবং ব্রহ্মচারি-ধর্ম্ম বর্ণিত হইয়াছে। পশুভগ্ন মনে করেন,—এতদন্তর্গত ক্রীমদীপ-গীতা মহাভারতের ক্রীমদগবদীতার সহিত তুল্য-মূল্য। দৈব-গীতার মর্দন-ভবের আলোচনার সুখ-যোগ, জ্ঞান-যোগ, ভক্তিযোগ প্রভৃতি অতি সুকলমে পরিবর্ণিত।

এই ঈশ্বর-গীতা একাদশ অধ্যায়ে চারি শত আটাত্তরটি শ্লোকে সম্পূর্ণ। শিব-দুর্গার মাহাত্ম্য-কীর্তন, কুর্শ্ব-পুরাণে প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই পুরাণের মতে,—বায়ু-পুরাণ ও শিব-পুরাণ উভয়ই মহাপুরাণের অন্তর্গত। সে হিসাবে, উহাতে অষ্টাদশ মহা-পুরাণের উল্লেখ থাকিলেও, গণনার মহাপুরাণ-সংখ্যা উনবিংশ হইয়া দাঁড়ায়। কুর্শ্ব-পুরাণে দেবীর সহস্র-নাম-পূর্ণ স্তব দৃষ্ট হয়।

অষ্টাদশ—ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ। স্বন্দ-পুরাণের জায়, এই পুরাণের বহু অংশ বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিত। সুতরাং সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ এখন সম্ভান করিয়া পাওয়া হ্রলভ। অধ্যাত্ম-রামায়ণ—

এই ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণের অন্তর্গত। অথচ, এখন যেভাবে ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ প্রকাশিত ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ। হয়, তাহার মধ্যে অধ্যাত্ম-রামায়ণ সন্নিবিষ্ট নহে। পুরাণ-পরম্পরার বর্ণনানুসারে দেখিতে পাই,—ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ চারিপাদে বিভক্ত;—প্রক্রিয়া-

পাদ, অল্পবঙ্গ-পাদ, উপোদ্ভাব-পাদ এবং উপসংহার-পাদ। তন্মধ্যে এখন যে ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ পাওয়া যায়, তাহাতে প্রক্রিয়া-পাদ এবং অল্পবঙ্গ-পাদের কিয়দংশ মাত্র দেখিতে পাই।

অধ্যাত্ম-রামায়ণ—সে তো স্বতন্ত্র-ভাবেই প্রকাশিত হইয়া থাকে। মহামুভব হৃত দ্বন্দ্বতী-তীরে যজ্ঞক্ষেত্রে এই পুরাণ বর্ণন করিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণনায় প্রকাশ,—তিনি বেদ-

ব্যাসের নিকট এই পুরাণ শুনিয়াছিলেন; এবং তৎপূর্বে বায়ু কর্তৃক এই পুরাণ পরিবর্ণিত হইয়াছিল। ইহাতে কি কি বিষয় সন্নিবিষ্ট আছে, প্রথম অধ্যায়ের ষট্চত্বারিংশ শ্লোক

হইতে ষট্চত্বারিংশ শ্লোক পর্যন্ত সংক্ষেপে নিবন্ধ রহিয়াছে। যাহা হউক, এখন প্রধানতঃ নিম্ন-লিখিত বিষয়গুলি ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়;—সৃষ্টি-

প্রকরণ, কল্প নিরূপণ, যুগভেদ ও মহন্তর-ক্রম-কথন, জম্বু-দ্বীপ-বর্ণন, ভারতবর্ষ-বর্ণন; কিস্পুরুষ, অম্বুদ্বীপ, কেতুমাল্যাবর্ষ প্রভৃতির বিবরণ; ভরত-বংশ, পৃথু-বংশ, দেব-বংশ,

ঋষি-বংশ, অগ্নি-বংশ এবং সংহিতাকারগণের বংশানুকীর্ণন। এই পুরাণান্তর্গত অধ্যাত্ম-রামায়ণ সপ্ত-কাণ্ডে বিভক্ত। আদি-কাণ্ডে,—শ্রীরামের ব্রহ্ম-স্বরূপ কথনে রাক্ষস-পীড়িতা

পৃথিবীর উদ্ধারার্থ তাঁহার অবতার-গহণ, বালা লীলা, অহল্যা-উদ্ধার, ভার্গব-দর্প-চূর্ণ প্রভৃতি বর্ণিত আছে। অযোধ্যাকাণ্ডে,—শ্রীরামচন্দ্রের বন-গমন, দশরথের প্রাণত্যাগ; অরণ্য-

কাণ্ডে,—মারামুগ-বধ, সীতাহরণ; কিকিদ্ধাকাণ্ডে,—বালা-বধ, সীতার অন্বেষণ; সুন্দর-কাণ্ডে,—শুশুমানেত্র লঙ্কা-প্রবেশ এবং রাম-সমীপে সংবাদ আনয়ন; লঙ্কাকাণ্ডে,—রাবণ-

বধ, শ্রীরামের রাজ্যাভিষেক; উত্তরকাণ্ডে,—রাবণাদির জন্ম-বিবরণ, সীতার বনবাস, লঙ্কণ-বর্জন, লব-প্ৰশাদির রাজ্যাভিষেক, শ্রীরাম-চন্দ্রের বৈকুণ্ঠে গমন;—প্রভৃতি বিষয় পরিবর্ণিত

রহিয়াছে। অধ্যাত্ম-রামায়ণে বহু দার্শনিক-তত্ত্ব বিবৃত আছে। এতদন্তর্গত রাম-গীতার দর্শন-সময় দেখিতে পাওয়া যায়। দর্শন-তত্ত্বালোচনায় উপদেশ পাইয়াছিলাম,—

‘যেমন স্ফটিক স্নিগ্ধবাদি-কুশুম-সংসর্গে তত্ত্ববস্তুর সমবর্ণ বলিয়া প্রতীত হয়; অন্তর্য

প্রভৃতি কোষের সংসর্গে জীবও সেইরূপ পৃথক বলিয়া অদৃশ্য হন। কিন্তু ‘তদ্ব্যসি’ বাক্য বিচার করিলে জীব যে সংসর্গ-শূন্য, অজ ও অবিভীত,—ভালা বৃত্তিতে পারা যায়।’ অধ্যাত্ম-রামায়ণেও সেই একই উপদেশ, একই উপায়, পরিণীত রহিয়াছে।

“কোবেষণং তেবু তু ভক্তদাকৃতিবিক্রান্তি সঙ্গাং কটিকোপলো বধা ।

অঙ্গলগণোহসনকো বভোহুধরো বিজ্ঞায়তেহুধিন্ পরিভো বিচারিতে ॥”

মুক্তি-বিষয়ে রাম-গীতার বেদান্তের আভাস বিশদ পরিদৃষ্টমান্ । ব্রহ্মে আত্মলীন হওয়া সম্বন্ধে রাম-গীতার ভগবান বলিতেছেন,— ‘জীব নিজ-স্বরূপকে আমার সহিত অভিন্ন ভাবনা করিতে করিতে, সমুদ্রে জল-বিশুষ্ণ জ্ঞান, দুহ্মরাশিতে দুহ্ম-বিশুষ্ণ জ্ঞান, মহাকাশে মহাকাশের জ্ঞান, প্রবল বায়ুতে তাল-রক্ত পবনের জ্ঞান, আমাতে মিশ্রিত হইয়া যায় ।’

“আত্মভূতেদেন বিভাবয়দ্বিদং ভবভূতেদেন মায়াম্বনা তদা ।

বধা জলং বারিনিধৌ বধা পয়ঃ কীরে বিয়ম্বোদ্যানলে বধানিলঃ ॥”

উপপুরাণ প্রাধানতঃ অষ্টাদশ-সংখ্যক বলিয়া কীর্তিত হইলেও, উপপুরাণ অসংখ্য । মহর্ষি বেদব্যাস-প্রণীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুরাণগুলি উপপুরাণ বলিয়া অভিহিত হয় । আবার,—উপনঃ,

সনৎকুমার, ছর্কাসা, কপিল, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষি-প্রণীত বহু পুরাণ—

উপপুরাণ-প্রসঙ্গ । উপপুরাণ নামে অভিহিত । পূর্বে যে অষ্টাদশ উপপুরাণের নাম উল্লিখিত

হইয়াছে, তদ্ব্যতীত আদি-পুরাণ, আদিত্য-পুরাণ, বৃহন্নারদীয় পুরাণ, বৃহদ্ধর্ম-

পুরাণ, বৃহন্নীকেয়র-পুরাণ, বশিষ্ঠ-পুরাণ, মানব-পুরাণ প্রভৃতিও উপপুরাণের মধ্যে সন্নিবেশ

প্রসিদ্ধ । * কালিকা-পুরাণে দেবী-মাহাত্ম্য পরিবার্ণিত এবং উহা দেবী-ভাগবতের অন্তর্ভুক্ত ।

দেবী-ভাগবত প্রকাণ্ড গ্রন্থ ; মতান্তরে এই গ্রন্থ মহাপুরাণ বলিয়া কথিত হয় । দেবী-ভাগবত

ষাটশ-স্কন্ধে সম্পূর্ণ । তাহারই প্রথম-স্কন্ধে কালিকা-পুরাণ পরিবার্ণিত । মহিষাসুর ও তন্তু-নিতন্তু-

বধ, সুরধ-সমাদির বৃত্তান্ত,—কালিকা-পুরাণের অন্তর্গত । দেবী-ভাগবতে মহাপুরাণের লক্ষণ

বিশেষ-ভাবে বিস্তারিত । রাম-চরিত, প্রজ্ঞানন্দ চরিত, ব্রহ্মাসুর-বধ, হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান,

বর্ষ-বিবরণ, বিবিধ-পুজা-বিধি প্রভৃতি অসংখ্য বিষয়-পরম্পরা এবং দেবী-মাহাত্ম্য—দেবী-

ভাগবতের আলোচ্য । দেবী-ভাগবত—বেদব্যাস-বিরচিত সূতোক্ত পুরাণ । দেবী-ভাগবতের

মতে,—বায়ু-পুরাণ অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত ; শ্রীমদ্ভাগবত—উপপুরাণ-বিশেষ ।

এতদ্ব্যসারে বৃহন্নারদীয়-পুরাণ—মহাপুরাণান্তর্গত, এবং নারদীয়-পুরাণ—উপপুরাণ-পদ-

বাচ্য । † বৃহন্নারদীয়-পুরাণের এবং আদিত্য-পুরাণের মত, বর্তমানহিন্দু সমাজে অনেকাংশে

পরিগৃহীত হইয়া থাকে । উদাহ-তবে স্মার্ত রঘুনন্দন আদিত্য-পুরাণ এবং বৃহন্নারদীয় পুরাণ

হইতে স্নোক-পরম্পরা উদ্ধার করিয়া কলি-যুগের নিবিদ্ধ-ধর্ম্ম বিশদ-ভাবে বর্ণন করিয়াছেন ।

বৃহন্নারদীয় পুরাণে সেই নিবিদ্ধ-ধর্ম্ম-কর্ম্ম-সমূহের বিস্তৃত বিবরণ এইরূপে লিখিত আছে :—

“সমুদ্রবাত্মাধীকারঃ কমণ্ডলুবিধারণম্ । বিজ্ঞানামসবর্ণীকৃত্যস্থপযমস্তথা ॥

সেবয়েণ হুতোংগতির্ধর্ম্মধূপকৈ পণোবধঃ । সাংসারস্য তথা প্রাভে বানপ্রস্থজীবন্তথা ॥

সত্যায়ৈবৈকভ্যায় পুনর্দানং পরমং চ । দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং নরমোহাশ্রমমতী ॥

মহাশ্রমনিপনয়ঃ গোমেষধর্ম্ম তথামবধুঃ । ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্যানাহর্ম্মবীৰিণঃ ॥”

সমুদ্রবাত্মা, কমণ্ডলুধারণ, দ্বিজাতির পক্ষে ভিন্নজাতীয় জীব পাণি-গ্রহণ, বেতর খাওয়া

* বৃহদ্ধর্ম্ম-পুরাণ, পুণ্ড্রিক, শঙ্করাচার্য্যের অধ্যায়ে, আদি-পুরাণ আদিত্য-পুরাণ প্রভৃতির প্রসঙ্গ উল্লিখিত ।

† দেবীভাগবতে, প্রথম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে, পুরাণ-উপপুরাণ আলোচনা হইয়াছে ।

পুত্রোৎপাদন, মধুপর্কে পণ্ডব, শ্রাদ্ধে যাদ্বে ভোজন, বানপ্রস্থ ধর্মের অবলম্বন, দত্তা কন্যার পুনর্দান, দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য, নরমেধ-অশ্বমেধ-গোমেধ-যজ্ঞ, মহাপ্রস্থান সমন প্রভৃতি ধর্ম পণ্ডিতগণ-কর্তৃক কলিযুগে নিষিদ্ধ হইয়াছে ।” কলিযুগের নিষিদ্ধ-ধর্ম-কর্ম-সম্বন্ধে আদিভ্য-পুরাণেও এই মর্ম্মেরই নিবেদক বচন পরম্পরা লিপিবদ্ধ আছে ;—

“দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং ধারয়ন্ত কামঙলোঃ । দেবরঞ্জে সুতোৎপত্তিদত্তকন্যা প্রদীয়তে ॥

কন্যানামসম্বর্ণনাং বিবাহস্ত দ্বিজাতিভিঃ । আতভারিষিভ্যাশ্রাণং ধর্ম্মাবুজেন হিংসনম্ ॥

বানপ্রস্থাজ্ঞমস্তাপি প্রবেশো বিধিদেদিতঃ । বৃত্তাধাধ্যায়সাপেক্ষমথসঙ্কোচনং তথা ॥

প্রায়শ্চিত্তবিধামকং বিশ্রাণাং মরণান্তিকম্ । সংসর্গদোষঃ পাপেন্দু মধুপর্কে পশোঋধঃ ॥

দন্তোরসেত্তরেবাস্ত পুত্রধেন পরিগমঃ । শূদ্রেবু দাসগোপালকুলমিত্রাক্ষীরিণাম্ ॥

ভোজ্যায়ত্তা গৃহস্থস্ত তীর্থসেবাতি দূরতঃ । ব্রাহ্মণাদিবু শূদ্রস্ত পকতাদিক্রিয়াপি চ ॥

এতানি লোকগুস্তার্থং কলেরাদৌ মহাপ্রতিভিঃ । নিবর্ত্তিতানি কল্মাণি ব্যবহ্যাপুরুষকং বুধৈঃ ॥”

অর্থাৎ,—‘কলির আদিতে লোক-রক্ষার নিমিত্ত মহাঋগণ নিম্ন-লিখিত কর্ম্ম-সমূহ ব্যবহ্য-পূর্ব্বক রহিত করিয়া গিয়াছেন ;—দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য, কামঙলু-ধারণ, দেবর-স্বারা সুতোৎপত্তি, দত্তা-কন্যার পুনর্দান, দ্বি-জাতির অসবর্ণা কন্যা বিবাহ, ধর্ম্ম-বুদ্ধে আতভারী ব্রাহ্মণের প্রতি হিংসা, বানপ্রস্থাপ্রম অবলম্বন, চরিত্র ও বেদাধ্যয়ন-অনুসারে অশৌচ-সঙ্কোচ, ব্রাহ্মণের মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত, সংসর্গদোষ, মধুপর্কে পণ্ডব, দত্তক ও ঔরস ভিন্ন পুত্র গ্রহণ, শূদ্রের অন্নভোজন, শূন্য-কর্তৃক পাকক্রিয়া, দূরতীর্থে গমন, ইত্যাদি ।’ আদি-পুরাণেও এইরূপ নিবেদ-বিধি দৃষ্ট হয়,—পরশুর-ভাষ্যে তাহা উদ্ধৃত আছে । অপরাপর উপপুরাণের মধ্যে—কলি-পুরাণ এবং বৃহদ্রত্ন-পুরাণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এতদ্ব্যতীত পুরাণ বেদব্যাস-বিরচিত বলিয়াই উক্ত হয় । কলি-পুরাণে,—কলি-ধর্ম্ম-কথন, কলি-অবতারের আবির্ভাব এবং স্বেচ্ছ-নিধন-বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে । এই পুরাণের মতে,—কলির শেষ-ভাগে, সন্তল-নগরে, ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ বিষ্ণুধনার গৃহে, কলিক্রমে ভগবান জন্মগ্রহণ করিবেন এবং তাঁহারই প্রভাবে পুনরায় সত্য-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইবে । পুরাণ-পরম্পরায় ভূত-ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান-কাহিনী পরিবর্ণিত হইয়াছে দেখিয়া যাঁহারা পুরাণ-রচনার কাল-নির্ণয়-সম্বন্ধে সংশয়ান্বিত হন, কলি-পুরাণ-বর্ণিত কলি-অবতারের আবির্ভাব হইলে ঋষিগণের ত্রিকালজ্ঞতা-সম্বন্ধে তাঁহাদের সকল সংশয় দূর হইবে,—ইহাই অনেকে বিশ্বাস করেন । যেমন নারদীয়-পুরাণ ছই খানি, ধর্ম্ম-পুরাণ ও বৃহদ্রত্ন-পুরাণ-তেদে, ধর্ম্ম-পুরাণও ছই খানি । ধর্ম্ম-পুরাণে নান্দীশোক্ত শিব-ধর্ম্ম পরিবর্ণিত । কিন্তু এই বৃহদ্রত্ন-পুরাণের মধ্য-খণ্ডে শিব-চরিত্র পরিবর্ণিত হইয়াছে । তথাকথিত ইহার পূর্ব্ব ও উত্তরখণ্ডে,—সৃষ্টি-তত্ত্ব, শ্রীরাম-চরিত্র, কৃষ্ণ-চরিত্র, বিবিধ ধর্ম্মোপদেশ ও ব্রত-বিধান দেখিতে পাওয়া যায় । মধ্য-খণ্ডে,—সতী-বরষর, দক্ষ-যজ্ঞ, গঙ্গার উৎপত্তি, গঙ্গা-শিব-মাহাত্ম্য এবং গঙ্গার সহস্র নাম-কীর্ণিত আছে । কালী-খণ্ডে গঙ্গার সহস্র নাম অকারাদিক্রমে সুসম্বদ্ধ ; বৃহদ্রত্ন-পুরাণে ভৎসনকার রূপান্তরে কবিতাক্রমে প্রথিত । প্রক্তি পুরাণ ও উপপুরাণে সেই সেই পুরাণ ও উপপুরাণ পাঠের ও প্রবণের কল-মাহাত্ম্য পরিবর্ণিত আছে ।

প্রত্যেক পুরাণ-উপপুরাণের বিষয় পরস্পরা ভিন্ন ভিন্ন রূপে পরিবর্ণিত হইলেও, লোক-শিক্ষা, ধর্ম-শিক্ষা, আচার-প্রতিষ্ঠা, সমাজ-শুশ্রূষা-রক্ষা—সকলেরই মুখ্য উদ্দেশ্য ।

সার-স্বার্থ সেই উদ্দেশ্য-সাধন জন্ত, বিবিধ দৃষ্টান্তের উল্লেখ ব্যপদেশে—ইতিহাস,
ও পুরাতত্ত্ব, ভূ-তত্ত্ব, দর্শন-তত্ত্ব, জ্যোতিষ-তত্ত্ব এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের
সম্বন্ধ-বিধান । আলোচনা উহাতে দেখিতে পাওয়া যায় । পুরাণ-সমূহের লক্ষণ যখন

অভিন্ন বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে, তখন তাবের অভিন্নতাই উহার মেরুদণ্ড ; তাই মূলে প্রায়ই অনাম্যজ্ঞতা দেখা যায় না । জ্ঞান-ভক্তি শিক্ষা দেওয়াই পুরাণ-পরম্পরার লক্ষীভূত ;—প্রতি-স্থিতি-বিহিত ধর্ম-তত্ত্ব সহজবোধ্য করিবার জন্তই পুরাণ-সমূহের অবতারণা । তবে যে কোনও পুরাণে সন্দের, কোনও পুরাণে রঞ্জন, কোনও পুরাণে তমের,—কোনও পুরাণে বিষ্ণুর, কোনও পুরাণে শিবের, কোনও পুরাণে ব্রহ্মের, কোনও পুরাণে পুরুষের, কোনও পুরাণে প্রকৃতির, প্রাণজ কীর্তিত হইয়াছে, সে কেবল—অধিকারিভেদে কর্তব্য-তত্ত্ব বুঝাইবার জন্ত । সকলের ধারণা-শক্তি সমান নহে,—প্রকৃতিও বিভিন্ন ; সুতরাং, সকল শক্তির, সকল প্রকৃতির উপযোগী করিয়াই পুরাণ-সমূহ রচিত হইয়াছিল । সৃষ্টি-তত্ত্ব-সম্বন্ধে দর্শন-শাস্ত্রালোচনায় যে মত প্রতিষ্ঠিত ছিল, সৃষ্টি-সমূহেও যাহার সমর্থন দেখিয়া আসিয়াছি, পুরাণেও সেই মত অবিকৃত-ভাবে পরিবর্ণিত । কোনও কোনও স্থলে রূপকের আশ্রয় গৃহীত হইলেও, মূলে সেই একই তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে । দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, প্রথমে বিষ্ণু-পুরাণ হইতে সৃষ্টি-তত্ত্বের মর্ম উদ্ধৃত করিতেছি । পরাশর বলিতেছেন,—
“হে মৈত্রেয় ! প্রলয়-কালে গুণসাম্য (সদ্ব, রজঃ, তমঃ-গুণের নিষ্ক্রিয় অবস্থা) এবং প্রকৃতি হইতে পুরুষ পৃথক-ভাবে অবস্থিত হন । সৃষ্টিকাল উপস্থিত হইলে, পরমেশ্বর আপন ইচ্ছানুসারে প্রকৃতি ও পুরুষে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে ক্ষোভিত অর্থাৎ সৃষ্টি-করণে উদ্বুদ্ধ করিয়া দেন । কিন্তু তাহাতে পরমেশ্বরের কোনও ক্রিয়াবত্তা নাই । যেমন গন্ধ নিকটবর্তী হইবা-মাত্র মনের চাকলা জন্মে, সৃষ্টি-কার্যে পরমেশ্বরের ক্ষোভ-জনকতাও তজ্জপ । পরে, সৃষ্টি-কালে, পুরুষাবিষ্টিত সেই গুণসাম্য হইতে গুণবাজন অর্থাৎ মহত্ত্ব উৎপন্ন হয় । মহত্ত্ব হইতে বৈকারিক অর্থাৎ সাত্বিক, তৈজস অর্থাৎ রাজস ও ভূতাদি অর্থাৎ তামস,—এই ত্রিবিধ অহঙ্কার-তত্ত্বের উৎপত্তি । অহঙ্কার ত্রিগুণাত্মক বলিয়া ভূতৈশ্রিয় দেবতার উদ্ভবের হেতু । যেমন প্রধান তত্ত্ব-দ্বারা মহত্ত্ব আবৃত, মহত্ত্ব দ্বারা অহঙ্কার-তত্ত্বও সেইরূপ আবৃত । তামস অহঙ্কার ক্রুড়িত অর্থাৎ কার্যোদ্ভূত হইয়া শব্দ-তন্মাত্র ও রস-তন্মাত্র হইতে শব্দ-গুণ-বিশিষ্ট আকাশের সৃষ্টি । তখন উভয়ে উভয়কে আবৃত করিলে, আকাশ ক্রুড়িত হইয়া স্পর্শ-তন্মাত্রের এবং তাহা হইতে স্পর্শ-গুণ-বিশিষ্ট বলবান বায়ুর উৎপত্তি হয় । এইরূপে আবার আকাশ বায়ুকে আবৃত করিলে, রূপ-তন্মাত্র ও জ্যোতিঃ উৎপন্ন হয় । অন্তঃপর, জ্যোতিঃ বায়ু-দ্বারা আবৃত হইলে, জ্যোতিঃ ক্রুড়িত হওয়ায়, রস-তন্মাত্র এবং তাহা হইতে রসগুণবিশিষ্ট জলের উৎপত্তি । ঐ জল আবার জ্যোতিঃ-দ্বারা আবৃত হইলে, জল ক্রুড়িত হইয়া গন্ধ-তন্মাত্রের সৃষ্টি এবং তাহা হইতেই পৃথিবীর উৎপত্তি । ফলে, তামস অহঙ্কার হইতে এইরূপে ভূত-তন্মাত্রের সৃষ্টি হয় । দশ ইন্দ্রিয়, তৈজস অর্থাৎ রাজস

অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন ; এবং দশ ইন্দ্রিয়ের দশ অবিদ্যাত্ত-দেবতা, বৈকারিক অর্থাৎ সাত্বিক অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন । এইরূপে মহত্ত্ব হইতে মহাভূত পর্য্যন্ত মিলিত হইয়া একটা অণু (ব্রহ্মাণ্ড) উৎপাদন করে । তাহা হইতেই স-পাক্ত-দ্বীপ-সমুদ্র, স-দেবানুর-মাধুব, স-জ্যোতিঃ-লোকসংগ্রহ উৎপন্ন হয় । * শ্রীমদ্ভাগবতে বিহুরের নিকট মৈত্রেয় যে সৃষ্টি-তত্ত্ব বর্ণনা করেন, তাহারও মূল এইরূপ । মৈত্রেয় বলিতেছেন,—“সদ্বরজন্তমঃ এই গুণত্রয়ের স্বরূপ প্রধান বা প্রকৃতি নির্বিকার হইয়া ছিল । জীবের অদৃষ্ট, প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা মহাপুরুষ এবং কাল এই তিন কারণে তাহা সংক্ষেপিত হওয়ায়, মহত্ত্ব উৎপন্ন হয় । মহত্ত্ব হইতে অহঙ্কার-তত্ত্ব, তাহা হইতে পঞ্চ-তন্মাত্র, পঞ্চ-মহাভূত, জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং তাহার প্রত্যেকের পাঁচ পাচটা অধিষ্ঠাত্ত-দেবতা উৎপন্ন হন । তৎপরে ভগবানের শক্তিবোণে মিলিত হইয়া জ্যোতিষ্ক হৈমাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছিল । অনন্তর ভগবান সেই অণু মধ্যে অধিষ্ঠিত হইলে, তাঁহার নাভি-দেশ হইতে একটা পদ্মের উৎপত্তি হয় এবং তাহা হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়া ভগবানের ইচ্ছাক্রমে সৃষ্টি-কার্য্যে প্রবৃত্ত হন । † শিব-পুরাণের মতেও—প্রকৃতি হইতে মহত্ত্ব, মহত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চ-তন্মাত্র, পঞ্চ-তন্মাত্র হইতে পঞ্চভূত, এবং পঞ্চভূত হইতে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয় । প্রকৃতি ও পুরুষ ব্যতীত সকল তত্ত্বই অচেতন ; প্রকৃতি ও পুরুষের সহিত যোগ করিলে সর্বসত্ত্ব চতুর্দশতি তত্ত্ব হয় ।” এখানে সাংখ্যের মতের সহিত অনেক অংশেই একতা দেখা যায় । বরাহ-পুরাণ, প্রকৃতির পরিবর্তে মায়া-নাম নির্দেশ করিয়াছেন । পুরাণ-বক্তা বলেন,—মূল শক্তি মায়া ; মায়া হইতে মহত্ত্ব, মহত্ত্ব হইতে অহঙ্কার ; এইরূপে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি-ক্রিয়া সাধিত হইয়া থাকে । ‡ অগ্নি-পুরাণের মতে,—সৃষ্টির পূর্বে কেবল অব্যক্ত ব্রহ্ম বিद्यমান ছিলেন ; দিন, রাত্রি, আকাশ—কিছুই অস্তিত্ব ছিল না । অনন্তর পরম পুরুষ বিষ্ণু প্রকৃতিতে প্রবেশ করিয়া ক্ষোভিত করিলেন । তখন প্রকৃতি হইতে মহত্ত্ব, মহত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চ-তন্মাত্র, পঞ্চ-তন্মাত্র হইতে পঞ্চমহাভূত এবং পঞ্চমহাভূত হইতে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় প্রভৃতির উৎপত্তি হইল । সকল পুরাণ পুণ্যাহুপুণ্য উল্লেখের আবশ্যক নাই । ফলে, মূলে পুরাণ-সমূহের মতের যে অভিন্নতা নাই, তাহা বলাই বাহুল্য । § যদি কোথাও কিছু মতান্তর দৃষ্ট হয়, সে কেবল প্রকার-ভেদ মাত্র । পুরাণ-সমূহে প্রায়-সর্বত্রই বিশেষ মতানৈক্য দৃষ্ট হয় না । সৃষ্টি-পদার্থ-সমূহের সংহার হইলে, সর্ব আত্মার (ঈশ্বরের) লীন হয় ; প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েই সমধর্ম্ম হইয়া অবস্থান করেন । তিলে তৈল ও ছকে স্বত অবস্থানের স্থায় ; তমঃ ও সত্ত্ব-গুণে অব্যক্তাপ্রিত রজোগুণ অবস্থিত হয় । সৃষ্টির সৃষ্টি-তত্ত্ব এইরূপে পরিবর্ণিত হইলেও, স্বয়ং ব্রহ্মার উৎপত্তি বানিয়া গইয়া, তাহার

* এতৎসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা বিষ্ণু-পুরাণের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য ।

† শ্রীমদ্ভাগবত, তৃতীয় স্কন্ধ, বিশেষ অধ্যায় দ্রষ্টব্য ।

‡ শিবপুরাণের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এবং বরাহ-পুরাণের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই সৃষ্টি-তত্ত্ব পরিবর্ণিত ।

§ অগ্নিপুরাণের সপ্তদশ অধ্যায়, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের চতুর্থ অধ্যায়, দেবী-ভাগবত সপ্তদশ স্কন্ধের দ্বাদশোপাধ্যায়, শঙ্কর-পুরাণের পূর্বখণ্ড চতুর্থ অধ্যায় (সাদৃশ্য প্রকার ভেদে), ইত্যাদি ।

যারা হুঁটিকাঁথী সাধিত হওয়া সম্বন্ধে সকল পুরাণেরই একমত দেখিতে পাই। হুঁটিপ্রবাহ
অনন্ত; এসরে তাহা স্তম্ভ অবস্থায় অবস্থিত থাকে; এলয়াত্তে ভগবানের ইচ্ছায় ত্রাক্ষা
হুঁটিকাঁথী প্রণোদিত হন। প্রথম হুঁটি স্বরূপ বা আপনামুগ্ধনিই সংসাধিত না হইলে, এবং
ভগ্নপরবর্তী হুঁটি সেই স্বরূপ কর্তৃক সন্যাসিত না হইলে, পরবর্তী হুঁটি-তত্ত্বের সামঞ্জস্য-
সাধন হুঁত হইয়া পড়ে। তদন্তীত স্মৃত্তত্ব অল্পাধু অল্পবুদ্ধি মনুষ্যের ধ্যান-ধারণার অনবিশয়া
হয়;—বোধ হয়, সেই জন্তই আদি-হুঁটি এইরূপেই নির্দিষ্ট হইয়াছে। একই বিষয়ের বর্ণনার
পুরাণ-সমূহে যে অসামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়, শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিতগণ বলেন, তাহার কারণ—কল্প-
বিবর্তন। পুরাণ মতে,—ত্রাক্ষার এক অহোরাত্রে এক কল্প বলে। তদনুসারে, চারি শত বর্জিত
কোটি লৌকিক বৎসরে ত্রাক্ষার এক দিন এবং ঐ পরিমাণ লৌকিক বৎসরে ত্রাক্ষার এক
রাত্রি হয়। দিব্যভাণ্ডে ত্রাক্ষাও হুঁটি হয় ও বিজ্ঞমান থাকে; রাজিকালে তাহার দয়-প্রাপ্তি
ঘটে। বলা বাহুল্য, মহন্তর ও যুগাদি এক এক কল্পের অন্তর্ভুক্ত। * এইরূপ ত্রিশ কল্পে
ত্রাক্ষার এক মাস, এবং বার মাসে তাঁহার এক বৎসর। লৌকিক ত্রিশ দিনের বা মাসের মধ্যে
যেদ্রুপ অমাবস্তা-পূর্ণিমা দেখিতে পাই, ত্রাক্ষার ত্রিশটি কল্প বা মাসের মধ্যেও সেইরূপ
অমাবস্তা-পূর্ণিমা আছে। ত্রাক্ষার ত্রিশটি কল্প বা দিবা-রাত্রির নাম,—যেতবারাহ, নীল-
লোহিত, বামদেব, গাথাস্তর, রোরব, প্রাণ, বৃহৎ, কন্দর্প, সত্য, দ্বেবাণ, ধ্যান, সারস্বত, উদান,
গন্ধর্ভ, কোশ, নারসিংহ, সমাধি, আগ্নেয়, বিষ্ণুজ, সৌর, সোম, ভাবন, স্তম্ভমালী, বৈকুণ্ঠ,
আর্জিষ, বজ্রা, বৈরাজ, গৌরী, মাহেশ্বর, পিতৃ। এতন্মধ্যে প্রথমোক্ত পঞ্চদশ কল্প
ত্রাক্ষার শুক্লপক্ষ এবং শেষোক্ত পঞ্চদশ কল্প ত্রাক্ষার কৃষ্ণপক্ষ বলিয়া কথিত হয়। ত্রাক্ষার
আয়ু—শত বৎসর। তন্মধ্যে পঞ্চাশ বৎসর অর্থাৎ অষ্টাদশ সহস্র কল্প অতীত হইয়া গিয়াছে;
একশে একপঞ্চাশ বৎসরের প্রথম যেতবারাহ কল্প পুনরায় চলিতেছে। পুরাণ-সমূহের
আলোচনার বৃত্তিতে পারা যায়,—এক এক কল্পে, এক এক মহন্তরে, এক এক চতুর্যুগে,
—চক্রবর্তীর পরিবর্তনের জায় হুঁটি-প্রবাহ ঘুরিয়া ফিরিয়া পুনরায় আসিয়া উপস্থিত হয়।
যে অধতার, যে শাক্ত, যে হুঁটি, যে বীজ,—পূর্ব-কল্পে, পূর্ব-মহন্তরে, বিদ্যমান ছিল; পর-
কল্পে, পর মহন্তরে, তাহাই আবার রূপান্তরে প্রকাশমান হয়। সে হিসাবে, ক্রতি-স্মৃতি-
পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থ, প্রথম কল্পেও প্রচারিত ছিল, মধ্য কল্প-সমূহেও প্রচারিত হইয়াছিল,
এখনও প্রচারিত আছে। সে হিসাবে, বরাহ-মংস্ত-কুর্মা-দি অবতার, দেব-দানব-গন্ধর্ব-কিন্নর,
পিতৃ-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ, স্থাবর-জঙ্গম-চরাচর, সকলই ছিল, সকলই উদ্ভূত হইয়াছিল, সকলই
আছে। তবে, কল্পভেদে, কালভেদে, তৎসমুদায়ের সামান্য রূপান্তর হয়,—এই মাত্র পার্থক্য।
আজি যে বৃক্ষ শাখা-প্রশাখা-পত্র-কল-পুষ্পে পরিণোদিত, অল্পদিন পরে সেই বৃক্ষের
শেষরূপ অস্তিত্ব লোপ পাইতে পারে। কিন্তু, তাই বলিয়া, সেই বৃক্ষের যে ধর্ম হইল,
তাঁহা কেনিভাবেই বলা যায় না। দৃষ্টান্তঃ সেই বৃক্ষ ধ্বংস হইল ঘটে; কিন্তু বীজরূপে
তাঁহার যে অস্তিত্ব বিরাজমান রহিল, কালে তাহাতেই আবার সেইরূপ বৃক্ষের উৎপত্তি
হইতে পারে। হয় তো, দেশ-কাল-পাত্র-প্রভাবে, বিকৃতি-বশতঃ, নবজাত বৃক্ষের সহিত

পূর্ব-রক্ষের কোনও কোনও অংশের সাদৃশ্য না থাকিতে পারে, যে রক্ষের যে বীজ, তাহাতে সেইরূপ বৃক্ষই বঁ উৎপন্ন হইবে,—তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। বৃক্ষ ধ্বংস হইলে, তাহার বীজে আশ্র-বৃক্ষই উৎপন্ন হয়; নারিকেল-বৃক্ষের দ্বিতীয় নারিকেল-বৃক্ষেরই উৎপত্তি ঘটে। শাস্ত্রাদি-সম্বন্ধেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। কল্পে, যে বিষয় যে শাস্ত্রে যে ভাবে পরিবর্ণিত হইয়াছিল, পর-কল্পেও স্থূলতঃ সেই ভাবেই সেই বিষয় উদ্ভাসিত হয়। তবে, সামান্য যে পার্থক্য দৃষ্ট হয়; সে পার্থক্য—কল্প-প্রভাব মাত্র। হয় তো, কোনও কল্পের কোনও কার্যের সহিত পর-কল্পের কোনও কার্যের সামান্য শৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছিল; সুতরাং, তাহার বর্ণনায়ও শাস্ত্রাদিতে সেইরূপ বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। যাহারা শাস্ত্রাভ্যাসন মাাত্র করেন, প্রধানতঃ তাহারা এইরূপেই শাস্ত্রবাক্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া থাকেন। সে হিসাবে শাস্ত্র-কথিত ঋতু-বিবর্তন-দৃষ্টান্তই মনোমধ্যে উদয় হয়,—

“যথার্থবুলিঙ্গানি নানারূপাণি পথ্যৈঃ। দৃষ্টান্তে তানি তাত্ত্বৈব তথা ভাবা যুগাদিবুঃ।”

পর্যায়ক্রমে ঋতুর পুনরাবৃত্তি ঘটিলে, যেমন পূর্ববৎ ঋতু-চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, যুগাদিতেও তদ্রূপ পূর্ব-ভাব-পরম্পরার উৎপত্তি যথার্থ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পুরাণের মধ্যেই পুরাতত্ত্ব ও ইতিবৃত্ত সম্মিষিষ্ট। ভারতের অতীত-গৌরবের অতীত-ইতিহাস যদি অম্লসন্ধান করিবার আবশ্যক হয়; প্রাচীন আর্য্য-হিন্দুর শৌর্য্য-বীর্য্য-বৈভবের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত যদি চাক্ষুব-প্রত্যক্ষ করিতে চাও, পুরাণের অনন্ত-রত্ন-ভাণ্ডারে পুরাণে ইতিহাস। অম্লসন্ধান কর;—দেখিবে,—স্তরে স্তরে সে রত্নরাজি সজ্জিত রহিয়াছে।

কোন সময়ে কোন নৃপতি পৃথিবীতে একছত্র প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন; কোন সময়ে, তাহার রাজত্ব-কালে, ভারতবর্ষ কিরূপভাবে উন্নতির উচ্চতম সোপ-শিখরে সমারূঢ় হইয়াছিল; পুরাণে, মনুষ্য-জাতির কর্তব্য-নির্ণয়-ব্যাপদেশে, ধর্ম্মোপদেশ প্রসঙ্গে, তাহা পরিবর্ণিত আছে। পুরাণে দেখিতে পাই,—প্রজাপালমার্থ ব্রহ্মা আপনিহ আশ্র-সজ্জত স্বায়ম্ভুব মনুরূপে আবির্ভূত হইলেন। সেই মনুর পুত্র প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ বিশেষ প্রসিদ্ধ। প্রিয়ব্রত পৃথিবীর অধীশ্বর ছিলেন। তিনি পৃথিবীকে সম্ভাগে বিভক্ত করিয়া, আপন সাত পুত্রকে প্রদান করেন। এই বংশ বহু দিন পর্য্যন্ত পৃথিবীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই বংশের রাজা ভরত হইতেই ভারতবর্ষ নামের উৎপত্তি হয়। মনুর দ্বিতীয় পুত্র উত্তানপাদের বংশে মহামতি ধ্রুব জন্মগ্রহণ করেন। ধ্রুব-চরিত্র কে না অবগত আছেন? এই ধ্রুবের বংশে অঙ্গের ঔরসে বেণু-রাজার উৎপত্তি। বেণুর অত্যাচারে তাহার পিতা পুরত্যাগ করিতে বাধ্য হন; প্রজাবর্গ উত্তেজিত হইয়া বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হয়। বেণুর পুত্র পুশু সদৃগুণসম্পন্ন ছিলেন। সুশাসন-সুপালনের গুণে তিনি সমাগরা ধরিত্রীর আধিপত্য লাভ করেন। এই পুশু-বংশেই প্রাচীন-বর্হি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনিও পৃথিবীর একছত্র রাজ-চক্রবর্তী ছিলেন। এইরূপে পর্য্যায়ক্রমে যে সকল রাজবংশ পৃথিবীতে এবং ভারতবর্ষে বহুকাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন, পুরাণ-সমুদ্র মনন করিলে, তাহাদের স্থূল স্থূল ইতিবৃত্ত সংগৃহীত হইতে পারে। পৃথিবী-বিখ্যাত চন্দ্র-বংশের এবং সূর্য্য-বংশের বৃত্তান্ত পুরাণের নানা স্থলে পরিবর্ণিত। সূর্য্য-বংশে ইক্ষাকু, পুরঞ্জয়, পুশু-

মাক্কাভা, দিলীপ, রঘু, কালিঙ্গ, রামচন্দ্র প্রভৃতি যে সকল নৃপতি জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের যশঃ-প্রভা ~~কালিঙ্গ~~ দিগন্তে বিচ্ছুরিত হইতেছে। চন্দ্র-বংশে পুরুবংশ, মহাবংশ, যযাতি, যজ্ঞ, পুরু, ~~যযাতি~~ দিগন্তে, দিগন্তে, মুদাস প্রভৃতির যশোভীর্ণি কোথায় না পরিকীর্ণিত ? এই চন্দ্রবংশেই পুরুবংশ, কুরুবংশ ও পাণ্ডব-বংশের উৎপত্তি। এই চন্দ্রবংশেরই যজ্ঞ হইতে যজ্ঞবংশের উদ্ভব। এই চন্দ্র-বংশান্তর্গত যজ্ঞবংশেই ভগবান বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হয়। এই চন্দ্রবংশেই যুধিষ্ঠিরাদি রাজগণ জন্মগ্রহণ করেন। সত্য-ত্রৈতা-দ্বাপরের দূর অতীতের ইতিবৃত্ত পুরাণে যেরূপভাবে দেখিতে পাই ; আবার কলির প্রথম-ভাগের ইতিবৃত্তও উহাতে সেইভাবে লিপিবদ্ধ আছে। জন্মের বংশ হইতে নন্দ-রাজবংশ প্রভৃতির বর্ণনাও পুরাণে দৃষ্ট হয়। কোথায় কখন কোন্ রাজ-বংশের সহিত কোন্ রাজ-বংশের মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল ; কোথায় কখন কিরূপ যুদ্ধ-বিগ্রহ উপস্থিত হইয়াছিল ; কোথায় কখন কিরূপভাবে সৈন্ত-সমাবেশ ও জয়-পরাজয় হয় ;—তাহার বহুল বিবরণ পুরাণে পরিবর্ণিত রহিয়াছে। কোন্ সময়ে সমাজের কিরূপ অবস্থা ছিল, কোন্ সময়ে কিরূপভাবে রাজকার্য্য পরিচালিত হইত, কোন্ সময়ে ধর্ম-বিষয়ে কিরূপ বিচার-বিতণ্ডা উপস্থিত হইয়াছিল,—পুরাণে তাহারও উজ্জ্বল চিত্র প্রকটিত। এবিধ বিবিধ বিষয়ের আলোচনায় যখন দেখিতে পাই,—ইতিহাসের উপাদানভূত সমাজ-তত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, রাজনীতি-তত্ত্ব প্রভৃতি সকল তত্ত্বই পুরাণের অন্তর্নিবিষ্ট রহিয়াছে ; তখন পুরাণই যে প্রাচীন ইতিহাস, তাহাতে আর সংশয় আছে কি ? *

পুরাণ-সমূহ কোন সময়ে রচিত হইয়াছিল, এবং তৎসমুদায়ের রচয়িতাই বা কে ছিলেন,—তদ্বিষয়ে অধুনা বিশেষ বাদাম্ববাদ চলিয়া থাকে। পুরাণ-সমূহ আলোড়ন করিগে,

বেদবাস

আমরা দেখিতে পাই,—কল্প-কল্পান্তর হইতে এই পুরাণ-সমূহ প্রচলিত

ও

আছে। এক এক কল্পের এক এক দ্বাপর যুগে, এক এক মহাপুরুষ

পুরাণ-রচনা।

বেদবাস্য-রূপে অবিভূত হইয়া, পুরাণ-সমূহ প্রচার করিয়াছিলেন। ধর্ম-

রক্ষার জ্ঞাত প্রতি মন্বন্তরেরই দ্বাপর-যুগে স্বয়ং বিষ্ণু বেদবাস্যরূপে আবির্ভূত হন, এবং জগতের হিতাভিলাষে পুরাণ-সংহিতা প্রচার করেন। প্রথম দ্বাপরে ভগবান স্বয়ম্ভু, দ্বিতীয় দ্বাপরে প্রজাপতি মনু, তৃতীয় দ্বাপরে উশনঃ (শুক্র), চতুর্থ দ্বাপরে বৃহস্পতি, পঞ্চমে সবিতা (সূর্য্য), ষষ্ঠে বৃহা (ব্রহ্ম), সপ্তমে ইন্দ্র, অষ্টমে বসিষ্ঠ, নবমে সারস্বত, দশমে ত্রিধামা, একাদশে ত্রিব্রহ্মা (ত্রিব্রতা), দ্বাদশে ভরদ্বাজ, ত্রয়োদশে অঙ্গরীক্ষ, চতুর্দশে বশী (মতান্তরে ধর্ম বা সুরক্ষণ), পঞ্চদশে ত্রটাক্ষ (আকর্ণি), ষোড়শে ধনঞ্জয় (যোদ্য), সপ্তদশে কৃতঞ্জয় (মেধাতিথি), অষ্টাদশে ঋণজ্য (ঋতজয় বা ব্রতা), উনবিংশে ভরদ্বাজ (অত্রি), বিংশে গৌতম (বাচঃশ্রবা), একবিংশে হর্য্যাস্মা (বাচস্পতি), দ্বাবিংশে বাচঃশ্রবা বেণ (শুক্লায়ণ), ত্রয়োবিংশে ভৃগুবিষ্ণু (সোম), চতুর্বিংশে ঋক বাজিকী (ভৃগুবিষ্ণু), পঞ্চবিংশে শক্রি (ভার্গব), ষড়বিংশে পরাশর (মতান্তরে শক্রি), সপ্তবিংশে জাতুকর্ণ, এবং অষ্টাবিংশে কৃষ্ণদৈপায়ন ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হন। ইহার পরবর্তী দ্বাপর যুগে, দূর

* পুরাণ-বর্ণিত রাজবংশ-সমূহের আলোচনা, পরবর্তী পরিচ্ছেদান্তরে হইবে।

ভবিষ্যতে, যোগপুত্র অশ্বখামা ব্যাসরূপে জন্ম পরিগ্রহ করিবেন । * বর্তমান বরাহ-কল্পের অষ্টাবিংশতিতম দ্বাপর-যুগে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বর্তমান পুরাণ-সমূহ রচনা করিয়াছিলেন,—তদনুসারে ইহাই প্রতিপন্ন হয় । বেদব্যাস যে পুরাণ-সমূহ রচনা করিয়াছিলেন, সকল পুরাণে বিশেষ-ভাবে তাহার উল্লেখ নাই বটে ; কিন্তু বিষ্ণু-পুরাণে দেখিতে পাই,—

“আখ্যানৈশ্চাপ্যাপ্যামৈর্গাথাভিঃ কল্পসিদ্ধিভিঃ । পুরাণ-সংহিতাং চক্রে পুরাণার্থবিশারদঃ ॥

প্রখ্যাতো ব্যাসশিষ্যোহুচ্যুতঃ স্তো বৈ রোমহর্ষণঃ । পুরাণ-সংহিতাং তস্মৈ দদৌ ব্যাসো মহামুনিঃ ॥”

অর্থাৎ, পুরাণার্থ-বিশারদ বেদব্যাস, আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা ও কল্পতন্ত্রের সহিত পুরাণ-সংহিতা রচনা করেন ; রোমহর্ষণ স্তত নামে তাঁহার যে বিখ্যাত শিষ্য ছিলেন, মহামুনি ব্যাস সেই শিষ্যকে পুরাণ-সমূহ অধ্যয়ন করান । দেবী-ভাগবতে স্পষ্টতঃ লিখিত আছে,—সত্যাবতী-নন্দন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস অষ্টাদশ পুরাণ রচনা করিয়া, পুরাণ-পরিশিষ্টে অভুলনীয় মহাভারত প্রণয়ন করেন । বরাহ-পুরাণেও “অষ্টাদশ পুরাণানি বেদ দ্বৈপায়নো গুরুঃ”, অর্থাৎ দ্বৈপায়ন অষ্টাদশ পুরাণে অভিজ্ঞ—এবম্বিধ উক্তি দেখিতে পাওয়া যায় । শ্রীমদ্ভাগবতে স্তত বলিতেছেন,—“যাবতীয় পুরাণ ও ইতিহাসের সার-সংগ্রহ-পূর্বক নিখিল-বেদ-তুল্য শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ বেদব্যাস রচনা করেন, এবং আপন পুত্র ধীমান্ শুকদেবকে তাহা অধ্যয়ন করান ।” ঐ গ্রন্থেরই আবার অন্তর্ভুক্ত দেখিতে পাই, বেদব্যাসকে নারদ বলিতেছেন,—‘আপনি সর্ব-ধর্ম-পূরিত মহাভারত প্রণয়ন করিয়াছেন ; এখন বাসুদেব-চরিত্র বর্ণনা করুন ।’ কথিত হয়, নারদের সেই উক্তির ফলেই বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিয়াছিলেন । পদ্ম-পুরাণের পাতাল-খণ্ডে আছে,—“ব্যাসাদয়ো মুনিবরা যং প্রোচুত্তদ্বদারয়েৎ”, ব্যাসাদি মুনিগণ যে পুরাণ বলিয়া গিয়াছেন, তাহাই পাঠ করিবে ! ঐ পুরাণেরই স্বর্ণ-খণ্ডে স্তত বলিতেছেন,—‘আমি প্রসঙ্গক্রমে শুকুর নিকট ইহা শুনিয়াছিলাম ।’ কঙ্কি-পুরাণেও স্ততের বাক্যে প্রতিপন্ন হয়,—ঐয় পুত্র ব্রহ্মরাতের নিকট কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কঙ্কি-পুবাণ-কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন । † এইরূপে পুরাণ-সমূহ আলোচনা করিলে, সর্বত্রই বেদব্যাসের প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায় । কোথাও তিনি রচয়িতা, কোথাও তিনি বক্তা, কোথাও তিনি উপদেষ্টা, আবার কোথাও তিনি শিক্ষাদাতা । যে কারণেই হউক, সাধারণতঃ অষ্টাদশ-মহাপুরাণ এবং অধিকাংশ উপপুরাণ ব্যাস-বিরচিত বলিয়াই প্রচারিত । ব্যাস-বিরচিত,—স্তুরাং দ্বাপরের শেষভাগে, কলির প্রারম্ভে, পঞ্চ-সহস্রাব্দিক বৎসর পূর্বে, পুরাণ-সমূহ রচিত হইয়াছিল,—ইহাই হিন্দু-মাত্রেয় সাধারণ মত । পূর্ব-পূর্ব-কল্পে কোন্ সময়ে কিরূপ-ভাবে পুরাণ-সমূহ প্রচারিত ছিল, তাহার কাল-নির্ণয়ে কল্পনাও পরাভূত হয় । যাহা হউক, সাধারণতঃ এতদ্বশে পুরাণাদি

* বিষ্ণুপুরাণ, তৃতীয় অংশের তৃতীয় অধ্যায় ; ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ, ত্রয়োবিংশ অধ্যায় ; দেবী-ভাগবত, প্রথম স্কন্ধ, তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য ।

† বিষ্ণু-পুরাণ, তৃতীয় অংশ, বর্ষ অধ্যায়, ১৬শ স্লোক ; দেবীভাগবত, প্রথম স্কন্ধ, তৃতীয় অধ্যায়, ১৭শ স্লোক ; বরাহ-পুরাণ, ষাটশাধিক শততম অধ্যায়, ৬৯শ স্লোক ; শ্রীমদ্ভাগবত, প্রথম স্কন্ধ, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় ; পদ্মপুরাণ, পাতালখণ্ড, সপ্ততিতম অধ্যায়, ৬২শ স্লোক ; ঐ স্বর্ণখণ্ড, চতুঃসিংশৎ অধ্যায়, ৩১শ স্লোক ; কঙ্কিপুবাণ, প্রথম অধ্যায়, ২ম স্লোক ।

সম্বন্ধে এই মত প্রচলিত হইলেও, বর্তমান-কালোচিত পরিমাপ-দণ্ডে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের গবেষণায় ফলে, পুরাণাদির রচয়িতা ও রচনা-কাল বিষয়ে, পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে নানা মতান্তর দেখিতে পাই। তাঁহাদের মতে,—‘পুরাণ-সমূহ বেদব্যাস-নামধেয় কোনও নির্দিষ্ট এক ব্যক্তির রচনা হওয়া সম্ভবপর নহে। তিনি সংগ্রহকার হইতে পারেন ; কিন্তু তিনি যে রচনাকার, তাহা কোনক্রমেই বুঝা যায় না। হয় তো, পূর্ব-পূর্ব কালে ভিন্ন ভিন্ন ঋষিগণ পুরাণ-সমূহ রচনা করিয়া গিয়াছিলেন, এবং বেদব্যাস তাহা সংগ্রহ করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। বেদ-সংগ্রহ করিয়া, বেদ-বিভাগ জ্ঞাত, তিনি যেমন বেদব্যাস নামে পরিচিত হন ; পুরাণ-সমূহ সংগ্রহ করিয়াও সেইরূপ পুরাণ-প্রণেতা বলিয়া তাঁহার প্রসিদ্ধি লাভ অসম্ভব নহে। ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে, শাক্ত-শৈব-বৈষ্ণব-গাণপত্য প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইয়াছে, সুতরাং পুরাণ-পরম্পরা এক জনের রচিত বলিয়া মনে করিতে পারা যায় না। বেদব্যাসের স্থায় পণ্ডিত ব্যক্তির মতি স্থির থাকিবে না, তিনি নানা সময়ে নানা মত প্রচার করিবেন,—ইহা কোনক্রমেই বিশ্বাস হয় না। অধিকন্তু, বেদব্যাস কর্তৃক পুরাণ-সমূহ সংগৃহীত হওয়ার পরও উহাতে নানা বিষয় নূতন সংযোজিত হইয়াছে। যখনই ভারতবর্ষে যে সম্প্রদায় প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদেরই প্রতিষ্ঠা-স্থাপনের জ্ঞাত—হয় কোনও নূতন পুরাণ রচিত হইয়াছে—নচেৎ কোনও প্রাচীন পুরাণে তাঁহাদের মত-পরম্পরা তাঁহারা সন্নিবিষ্ট করিয়া গিয়াছেন।’—এইরূপ নানা যুক্তি-তর্কের পর, পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ প্রধানতঃ স্থির করিয়াছেন,—‘খৃষ্ট-জন্মের বহু পরবর্ত্তি-কালে পুরাণ-সমূহ রচিত হইয়াছে।’ তাঁহাদের কেহ-বলেন,—পাঁচ শত হইতে হাজার খৃষ্টাব্দের মধ্যে ; কেহ বলেন,—এয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ; কেহ বলেন,—মুসলমান-শাসনের পরবর্ত্তি-কালে ; কেহ বলেন,—পঞ্চদশ-শতাব্দীর শেষভাগে। এইরূপ নানা-জনের নানা-মত দেখিতে পাওয়া যায়। কাহারও মতে,—‘পুরাণ-মাত্রেই বুদ্ধ-দেবের রাস্তা লিখিত আছে ; সুতরাং বুদ্ধ-জন্মের পরবর্ত্তি-কালে পুরাণ-সমূহ রচিত হওয়া সম্ভবপর।’ কেহ বলেন,—‘খৃষ্টীয় পঞ্চদশ-শতাব্দীর মধ্যভাগে বল্লাভাচার্য্য বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তনা করেন ; শ্রীমদ্ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে বৈষ্ণব-বর্ণের—রাধা-কৃষ্ণের—প্রাধান্য কীর্ণিত হইয়াছে ; সুতরাং, ঐ দুই গ্রন্থ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত হইয়াছিল।’ ভাগবতে স্নেহ-রাজার অধিকার ও স্নেহদেশ প্রভৃতির উল্লেখ দৃষ্টে এবং স্বল্প-পুরাণে জগন্নাথ-দেবের মন্দির প্রভৃতির বর্ণনা দেখিয়া, (জগন্নাথের মন্দির খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্মিত হইয়াছে, এই অনুমান), ঐ দুই পুরাণকে তাঁহারা আধুনিক বলিয়া মনে করেন। কিন্তু বাঁহারা একটু অভিনিবেশ-সহকারে পুরাণ-সমূহ আলোচনা করিয়াছেন ; বাঁহারা একটু ধৈর্য্য-সহকারে পুরাণ-সমূহের গভীরতার মধ্যে অবগাহন করিতে পারিয়াছেন ; কি প্রাচ্য, কি পাশ্চাত্য—যিনিই হউন না কেন, তাঁহাকে নিশ্চয়ই পুরাণের প্রাচীনত্বে বিশ্বস্ত হইতে হইয়াছে। অনেকেই জানেন, পাশ্চাত্য-পণ্ডিত-গণের মধ্যে অধ্যাপক এইচ্-এইচ্ উইলসন পুরাণ-সম্বন্ধে বিশেষরূপ আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার অনুবাদিত বিষ্ণু-পুরাণ পাশ্চাত্য-জগতে বিশেষ সমাদৃত হইয়াছে। তিনি কিন্তু পুরাণ-সমূহের কাল-নির্ণয় সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—‘খৃষ্ট-জন্মের তিন শত বৎসর পূর্বে পুরাণ-

সমূহের বিজ্ঞমানতা প্রতিপন্ন হইয়াছে ; অধিকন্তু, তৎসম্বন্ধে যে প্রমাণ-পরম্পরা দৃষ্ট হয়, তাহাতে অতীতের অধিকতর দূরে—এমন কি, প্রাচীন পৃথিবীর কোনও জাতির কল্পনাও যাহা আসিতে পারে না, তত দূরে—পুরাণ-সমূহের অস্তিত্ব নির্দিষ্ট হইতে পারে।* উইল্‌সনের সিদ্ধান্তের প্রধান কারণ এই বলিয়া মনে হয়,—তিনি বিষ্ণু-পুরাণে ভবিষ্য-রাজবংশ-বর্ণনায় বুদ্ধদেবের এবং নন্দ-বংশের বিবরণ দেখিতে পাইয়াছেন। তিনি দেখিয়াছেন,—নয় জন নন্দ-বংশীয়ের উচ্ছেদের পর, চাণক্যের কৌশলে চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন।† তিনি আরও দেখিয়াছেন,—তৎপরবর্তী কতকগুলি রাজার বিবরণ—এমন কি, কাশ্মীর প্রভৃতি কয়েকটি দেশে স্লেচ্ছাধিকারের উল্লেখ আছে। তাই তাঁহার মনে ঐ সময়ের ছায়া আসিয়া পতিত হইয়াছে। খৃষ্ট-জন্মের তিন শত সত্তর বৎসর পূর্বে নন্দ রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পরবর্তী বিষ্ণু-পুরাণোন্নিষিত রাজগণের শাসনকাল শত-বৎসরের মধ্যে পরিসমাপ্তি হইয়াছে মনে করিয়া, উইল্‌সন ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকিবেন। কিন্তু পূর্বে আমরা বলিয়াছি,—ছাপরের শেষ ভাগে, কলির প্রারম্ভে, প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে, কৃষ্ণবৈপায়ন বেদবাস বিদ্যমান ছিলেন, এবং তিনিই পুরাণ-সমূহের প্রবর্তক ;—সাধারণ হিন্দুসমাজের তাহাই বিশ্বাস। পুরুষ-পরম্পরায় কিংবদন্তী-রূপে যুগে যুগে সেই মতই চলিয়া আসিতেছে। গণনায় বিশ-পঞ্চাশ বৎসর বা শতাব্দীর পার্থক্য ঘটিতে পারে ; কিন্তু তাই বলিয়া একেবারে সাড়ে-চারি-হাজার পাঁচ-হাজার বৎসরের বাবধান কোনক্রমেই সম্ভবপর নহে। সে হিসাবে, পুরাণ-পরম্পরার কাল-নির্দেশে কোন মত সমীচীন বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে ? যদি পুরাণ-পরম্পরা পাঁচ-সহস্রাধিক বৎসর পূর্বেই প্রচলিত হওয়া সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে পরবর্তী-কালের ঘটনাবলি-উহাতে বর্ণিত রহিবে কেন ? তাহা হইলে, উহাতে জন্মেজয়-বংশের কথা, নন্দ-বংশের কথা, চাণক্য-চন্দ্রগুপ্ত-অশোকের কথাই বা সন্নিবিষ্ট দেখিব কেন ? তাহা হইলে, বেদাচার-শূদ্র স্লেচ্ছেরা, সিদ্ধতীর, চন্দ্রভাগা, কোস্তায় ও কাশ্মীর-মণ্ডল পালন করিবে,—এ কথাই বা লিখিত থাকিবে কেন ? তাহা হইলেই বা, ষোড়শ কল্পের পর, আট জন যবন, চৌদ্দ জন তুরস্ক, দশ জন সুরস্ক, এগার জন মোল, রাজা হইবে,—এ কথাই বা উল্লেখ দেখিব কেন ? ‡ আপত্তি প্রধানতঃ এইরূপই উঠিতে পারে ; উঠাও অস্বাভাবিক নহে। তবে, এবাধিক কতকগুলি বিষয় বিশেষ বিশেষ পুরাণে সন্নিবিষ্ট আছে বলিয়াই যে সেই সেই সময়ে বা তাহার পরবর্তী-কালে পুরাণ-সমূহ বিরচিত হইয়াছিল, তাহাও মনে করা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। ভবিষ্যতে অমুক-বংশ রাজত্ব করিবে বা অমুক-ঘটনা সম্ভব হইবে,—এই দেখিয়া যদি কাল-নির্ণয় করিতে হয়, তাহা হইলে কাল-নির্ণয়ের সময় এখনও আসিয়াছে বলিয়া মনে হয় না ; তাহা হইলে, কাল-

* “And the testimony that establishes their (Purans') existence three centuries before Christianity, carries it back to a much more remote antiquity—to an antiquity that is probably not surpassed by any of the prevailing fictitious institutions or beliefs of the ancient world”—Professor H. H. Wilson.

† ক্রীমন্তাগবত, দ্বাদশ স্কন্ধ, প্রথম অধ্যায়ের অষ্টাবিংশতি এবং সপ্তত্রিংশৎ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

‡ বিষ্ণু পুরাণ, চতুর্থাংশ, চতুর্বিংশ অধ্যায়, ভবিষ্য-রাজবংশ-বর্ণন এসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

নির্ণয়ের ক্ষমতা এখনও প্রায় চারি লক্ষ সাতাইশ হাজার বৎসর অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে ; যেহেতু, এখনও ঐ পরিমাণ বৎসর অতীত হইলে, সত্য-সন্ধি-সময়ে, কহি-অবতার লক্ষ্যগ্রহণ করিবেন,—সে কথা পুরাণে লিখিত আছে । তাহা হইলে, সেই সময়ের পরবর্ত্তি-কালের লোকেও এই সকল পুরাণ সেই সময়ে রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে করিবেন না কি ? ঋষিগণ ত্রিকালজ্ঞ ছিলেন ; তাহার। ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান—সর্বকালের সমাচার ধ্যানযোগে জ্ঞান-প্রভাবে অবগত হইতে পারিতেন । সুতরাং ভবিষ্যৎ-বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া প্রচার করায়, ভবিষ্যৎ-কালে তাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া মানিয়া লইতে পারা যায় না । আজি-কালি বিজ্ঞানোন্নতির দিনে, জ্যোতির্গণনাক্রমে আমরা স্থির করিতে পারি—কোন বর্ষের কোন সময়ে কোন প্রদেশে কিরূপভাবে চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্য্যগ্রহণ হইবে ; পঞ্জিকাदिতেও বহুতর ভবিষ্যৎ-ঘটনা লিপিবদ্ধ থাকে, এবং তাহা স্বার্থ মিলায় যায় । অথচ, আমরা কখনই বলি না,—সেই জ্যোতির্গণনা বা পঞ্জিকার বিষয়-পরম্পরা, তত্ত্বৎ ঘটনা সংঘটিত হইবার পরবর্ত্তি-কালে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । তাহা যদি না হয়, আমাদের পঞ্জিকাদির জ্যোতির্গণনায় যদি ভবিষ্যৎ-বিষয় নির্দেশ করিতে পারি, তাহা হইলে, পরম-যোগী ঋষিগণের ভবিষ্যৎ-সিদ্ধান্তকেই বা কেন বিশ্বাস না করিব ? হইতে পারে, যে পদ্ধতি-ক্রমে, যে যোগ-সাধনার গুণে, তাহার। ত্রিকালের সমাচার অবগত হইতে পারিতেন ; সে পদ্ধতি, সে সাধনা, এখন বিলুপ্ত-প্রায় ;—অধুনা আমরা তাহার ধ্যান-ধারণা করিতেও সমর্থ নহি । কিন্তু তাই বলিয়া পুরুষ-পরম্পরা-প্রচলিত মতের একেবারে বিলোপ-সাধন সহসা কর্তব্য কি ? বরং বিচার করিয়া দেখা উচিত,—প্রচলিত মতের সহিত কেনই বা এরূপ অসামঞ্জস্য ঘটিতেছে । ইহারও প্রধান কারণ,—কল্প-মহন্তর-যুগাদির ক্রম-বিবর্ত্তন এবং তদ্বিষয়ে ধ্যান-ধারণা-অভিজ্ঞতার অভাব । পুরাণের নির্দেশ অনুসারে বুঝিতে পারি,—কল্প এক নহে, মহু এক নহেন, মহন্তর এক নহে, বেদব্যাসও এক নহেন, রাম-কৃষ্ণাদি অবতারও এক নহেন । আবশ্যক অনুসারে কল্পে কল্পে তাহাদের আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়া থাকে । সে হিসাবে, আমরা দেখিতে পাই,—অগ্নি-পুরাণ ঈশান-কল্পে, ভাগবত-পুরাণ সারস্বত-কল্পে, এবং মৎস্য-পুরাণ বরাহ-কল্পে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল । ঐ সকল পুরাণে তত্ত্বৎ-কল্পের ঘটনা-পরম্পরা লিপিবদ্ধ আছে । অতীত পুরাণেও ঐরূপ এক এক কল্প-মহন্তরের পরিচয় পাওয়া যায় । তাহার। বলেন,—ভারতবর্ষে শৈব-মতের প্রাধান্ত-কালে, অর্থাৎ বৌদ্ধ-ধর্মের বিলোপ-সাধনে শৈব-ধর্মের প্রাবল্য হইলে, শৈব-পুরাণ-সমূহ এবং বৈষ্ণব-মতের প্রাধান্ত-কালে, বিষ্ণু-সাহস্র্য প্রচারের সময়, বৈষ্ণব-পুরাণ-সমূহ প্রচারিত হইয়াছিল ; তাহাদের বিশ্বাস,—খ্রীষ্ট দ্বাদশ শতাব্দী হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে ঐ সকল পুরাণ রচিত হয় । কিন্তু পৌরাণিকগণের মতে,—‘সেইরূপ শৈব-প্রাধান্ত বা বৈষ্ণব-প্রাধান্ত, সৌর-প্রাধান্ত বা গাণপত্য-প্রাধান্ত, কল্পে কল্পে যুগে যুগে প্রতি মহন্তরে হইয়া থাকে । শীতের পর যেমন শীত আসে, বর্ষার পর যেমন আবার বর্ষা আসে, গ্রীষ্মের পর যেমন আবার গ্রীষ্ম ফিরিয়া আসে ; সেইরূপ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের, সত্ত্বরজস্তমের, প্রাধান্ত-প্রতিষ্ঠার দিনও পর্যায়ক্রমে সংসারে আসিয়া উপস্থিত হয় । পুরাণ-সমূহ তত্ত্বৎ ভাবের উন্মেষ করিয়া

দেয় মাত্র । বীজরূপে পুরাণের অস্তিত্ব আছে বলিয়াই সেই ভাব জাগিয়া উঠে । আরও এক কথা,—পুরাণ-সমূহে যে সকল আধুনিক ঘটনা পরিবর্ণিত আছে, অর্থাৎ যে সকল ঘটনা ভবিষ্য-কালে ঘটবে বলিয়া উক্ত হইয়াছে ; একটু সাধারণভাবে আলোচনা করিয়া দেখিলেও, তদ্বিষয়ে নানা কথা মনে আসিতে পারে । নন্দ-বংশের বা অশোক-চন্দ্রগুপ্তের নাম যে ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে ; বুদ্ধাবতারের বিষয় যে ভাবে বর্ণিত আছে ; স্কেচ্ছ বা যবন-রাজগণের যেরূপ পরিচয় দেখা যাইতেছে ;—তাহাতে তদ্বিষয়ের কোনরূপ প্রামাণ্য বৃদ্ধিতে পারা যায় না । সেই সমুদায় ব্যাপার যদি গ্রন্থকারের দৃষ্ট-সামগ্রী বা নিকটস্থিত অতীত ঘটনা হইত, তাহা হইলে, তৎ-সমুদায়ের বর্ণনায় উপেক্ষা করিয়া, অদৃষ্ট-বিষয়ের—দূর অতীতের ঘটনা-পরম্পরার—বর্ণনায় এতাদিক বাহুল্য দৃষ্ট হইত না । ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য বৌদ্ধগণের সহিত ত্রীমংশকরাচার্য্যের কি বিষয় সংঘর্ষই চলিয়াছিল । যদি পুরাণ-রচনার পূর্ববর্ত্তি-কালের ঘটনা হইত, পুরাণে তাহা স্থান পাইত না কি ? শঙ্করাচার্য্য, ভগবানের অবতার বলিয়া কীর্ত্তিত হন ; অথচ, তাহার নাম পুরাণ-সমূহে স্থান পাইল না,—ইহারই বা কারণ কি ? তার পর, ভবিষ্য-পুরাণাদিতে আকবর প্রভৃতির নাম ও কলিকাতা রাজধানীর বর্ণনা দেখিতে পাই ; কিন্তু অমুক্রমণির সহিত তাহার কোনই সামঞ্জস্য নাই । দৃষ্টান্তস্বলে, বিষ্ণু-পুরাণের প্রারম্ভে ঋষিগণের প্রশ্ন উল্লেখ করিতেছি । যৈত্রেয় পরাশরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“হে ব্রহ্মণ ! জগতের বাহা উপাদান, চরাচরের বাহা উৎপত্তি-স্থান, আকাশাদির পরিমাণ, দেবাদির উৎপত্তি, সমুদ্র-পঙ্কত-পৃথিবীর স্থিতি, সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহের সংস্থান ও পরিমাণ, দেবতাদিগের বংশ, কল্প-কল্পান্তরের বিবরণ, দেবর্ষি ও রাজাদিগের চরিত্র, ব্রাহ্মণাদি বর্ণের আশ্রম-ধর্ম, আমার নিকট বর্ণনা করুন ।” এই প্রশ্নের উত্তরে, বিষ্ণু-পুরাণের প্রথম হইতে তৃতীয় অংশ, পঞ্চম অংশ ও ষষ্ঠ অংশ পরিপূর্ণ । চতুর্থ অংশেও, বংশ-বিস্তার বর্ণন-প্রসঙ্গে, বিংশ অধ্যায় পর্য্যন্ত বিশেষ কোনই অসামঞ্জস্য নাই ; কেবল-মাত্র ত্রয়োবিংশ ও চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদে দুই-চারিজন ভবিষ্য-নৃপতির নামোল্লেখ আছে । কিন্তু তাহারও অধিকাংশ নাম-সম্বন্ধে সংশয়াসিত হইতে হয় । ভবিষ্য-রাজ-বংশ-বর্ণন সম্বন্ধে যৈত্রেয় কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন নাই । অথচ, উত্তরের সময় পরাশর কেন সে প্রশ্নের উত্থাপন করিলেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না । অপিচ, “সিদ্ধতট, দাক্ষী, কব্বী, চন্দ্রভাগা ও কাশ্মীর প্রভৃতিকে স্কেচ্ছ ও ব্রাত্য শূদ্রগণ ভোগ করিবে”,—এতদুক্তিতেও মুসলমানের ভারতাবিকারের কোনও তথ্যেরই সন্ধান পাওয়া যায় না । আমরা পূর্বেই বলিয়াছি,—পুরাণ-সমূহ এখন যথার্থ বিন্যস্ত নাই ।

অধুনা বাহা পুরাণ বলিয়া জন-সমাজে সমাদৃত, তাহার মধ্যে অসম্পূর্ণতা ও প্রতিকট-ভাব বর্ত্তমান । পুরাণের মধ্যে বেদব্যাসের রচিত, কথিত বা সংগৃহীত অংশ অনেক আছে সত্য ; কিন্তু উহার সকল অংশ যে তাহার প্রবর্ত্তিত নহে,—নানা প্রকারে তাহা প্রতীত হয় । হইতে পারে,—বেদব্যাস পুরাণ-সমূহ শিষ্য-মণ্ডলীর নিকট বিবৃত করিয়াছিলেন ; হইতে পারে,—বর্ত্তমান-প্রচলিত পুরাণ-সমূহের কোনও কোনও অংশ তিনি রচনাও করিয়া গিয়াছিলেন ; কিন্তু সকল অংশ বর্ত্তমান আকারে যে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল,

তাহার প্রমাণাভাব; পরন্তু, তৎসম্বন্ধে বিরুদ্ধ-বারণই মনোমধ্যে উদয় হইতে পারে। প্রথমতঃ, পুরাণ-সমূহের বহু স্থলে বেদব্যাসের গুণাহুর্কীর্জন আছে। বেদব্যাসের জ্ঞান অপরিত মহাপুরুষ আপন মূখে আপন গ্রন্থে আপন গুণ-কীর্জন করিতেছেন—কোনক্রমেই তাহা বিগাশ হয় না। সেই সকল বশোদ্বোধনা অপরের মুখ দিয়া উক্ত হইয়াছে সত্য; তথাপি বেদব্যাস যদি স্বয়ং ঐ সকল গ্রন্থ রচনা করিতেন, তাহা হইলে সেরূপ প্রশংসা তিনি আপনায় গ্রন্থ মধ্যে সরিষিষ্ট রাখিতে পারিতেন না;—অন্ততঃ বর্তমানকালোচিত জ্ঞান-বুদ্ধিতে তাহাই মনে হইতে পারে। বিষ্ণু-পুরাণে লিখিত আছে,—“কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসকে সাক্ষাৎ প্রভু নারায়ণ বলিয়া বিবেচনা করিবে;—“কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-ব্যাং বিদ্ধি নারায়ণং প্রভুम्।” যদিও পিতা পরাশর কর্তৃক এই কথা উক্ত হইয়াছে, কিন্তু বেদব্যাস স্বয়ং ঐ গ্রন্থ রচনা করিলে, আপনায় মাহাত্ম্য-কথা একপভাবে লিপিবদ্ধ করিতে পারিতেন কি? শিবপুরাণেও এইরূপ “ব্যাণপূজনম্” নামে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় আছে। সে অধ্যায়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের গুণকীর্জন-সম্বন্ধে নিম্ন-লিখিত উক্তি দেখিতে পাই,—

“আচার্য্য বং মহাবিষ্ণুব্যাসরূপ নমোহস্ত তে। প্রসন্নো হ্যসি বিপ্রেন্দ্র প্রসন্নো মে সঙ্গাশিবঃ ॥”

‘হে আচার্য্য! তুমি মহাবিষ্ণু। হে ব্যাসরূপ! তোমাকে প্রণাম। হে বিপ্রেন্দ্র! তুমি প্রসন্ন হইলেহ, আমার প্রতি শিব প্রসন্ন হইবেন।’ শ্রীমদ্ভাগবতেও বেদব্যাসের ভূয়সী প্রশংসা আছে। কল্পি-পুরাণে আবার দেখিতে পাই,—পুরাণকার বেদব্যাসের প্রণামচ্ছলে বলিতেছেন,—

“লোমহর্ষণজং সৰ্গপুরাণজং সংযতব্রতম্। ব্যাসশিষ্য মুনিবরং তং সূতং প্রণমাগ্যহম্ ॥”

সৰ্গপুরাণজ সংযত-ব্রত ব্যাস-শিষ্য লোমহর্ষণ-পুত্র সূতকে প্রণাম করি। বেদবাস যদি এই পুরাণের রচয়িতা হইতেন, তাহা হইলে শিষ্য সূতকে কি জন্ত প্রণাম করিবেন? কল্পি-পুরাণের পূর্ব-ভাগে পঞ্চাশৎ অধ্যায়ে বেদব্যাস বিষ্ণুর অবতার-রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। তাহাতে লিখিত আছে,—‘বিষ্ণু নারায়ণ স্বয়ং শ্রীহরির স্বেচ্ছাক্রমে বিগুহ্যগুহ্যাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস-রূপে জগৎগ্রহণ করেন।’ বেদব্যাস স্বয়ং যদি পুরাণ-রচয়িতা হইতেন,—জানি না, তাহা হইলে আপনাকে ভগবানের অবতার বলিয়া কীর্জন করিতে পারিতেন কি না! দ্বিতীয়তঃ, শ্রীমদ্ভাগবতে সূত বলিতেছেন,—নদীর মধ্যে যেমন গঙ্গা, দেবতার মধ্যে যেমন বিষ্ণু, ভক্তের মধ্যে যেমন মহাদেব, পুরাণের মধ্যেও তেমনি ভাগবত শ্রেষ্ঠ।

“নিম্নগানং যথা গঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথা। বৈষ্ণবানং যথা শত্ৰুঃ পুরাণানামিদং তথা ॥”

ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণে আবার দেখিতে পাই,—‘নদী-নিকর মধ্যে গঙ্গা যেমন সর্গ-মুক্তি-প্রদায়িনী, বর্ষ-সমূহের মধ্যে ভারতবর্ষ যেমন মঙ্গলময় ও সদ্যঃ-মুক্তি-প্রদ, পুষ্প মধ্যে যেমন পারিজাত, বৃক্ষ মধ্যে যেমন কল্ল, সুরগণের মধ্যে যেমন সুরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, রাজগণ মধ্যে যেমন শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসীগণের মধ্যে শ্রীরাধিকা যেমন প্রাণাধিকা, নরকোৎকৃষ্ট সেইরূপ সৰ্গ-পুরাণ মধ্যে ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণই সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ।’ একই বেদব্যাসের পুরাণ, একই বেদব্যাসের লেখনী হইতে এরূপ বিশেষণে কেন বিশেষিত হইল? এই সকল স্থলে, তাহার জ্ঞান মহাপুরুষের সত্যের এরূপ অসামঞ্জস্য ঘটবার কারণ কি? তৃতীয়তঃ, পুরাণ-সমূহে দেখিতে পাই, কোথাও সূত পুরাণ-বর্ণন করিতেছেন; কোথাও শুকদেব পুরাণ-বর্ণন করিতেছেন;

কোথাও পরীক্ষার পুরাণ বর্ণনা করিতেছেন ; কোথাও বেদবাস আপনিই বর্ণনা করিতেছেন । প্রায় সকল পুরাণের আরম্ভেই দেখিতে পাই,—তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ঋষিগণ, কখনও বা পরাশরকে, কখনও বা হৃতকে, কখনও বা সৌতিককে, নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন ; আর তাহারাই সেই সেই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন । শ্রীমদ্ভাগবতে সৌনকাদি ঋষিগণ হৃতের নিকট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন । ব্যাসদেব হৃতকে বাহা উপদেশ দিয়াছিলেন, হৃত তাহাই বর্ণনা করিতে প্রস্তুত হন । পরীক্ষিতের নিকট শুকদেব আবার সেই বিষয় বর্ণন করিয়াছিলেন । পুনশ্চ, শুকদেবের কথায় প্রকাশ,—মহর্ষি ব্যাসদেব যখন স্বরস্বতী-তীরে পরব্রহ্ম ধ্যান করিতেছিলেন, মহর্ষি নারদ সেই সময় তাহাকে ঐ ভাগবত বলিয়াছিলেন । অতএব সহজেই বুঝিতে পারা যায়,—কিরূপ ভাবে কাহার নিকট হইতে আসিয়া, পুরাণ-সমূহ কি আকার ধারণ করিয়া আছে । বেদব্যাসের নিকটে যে সকল পুরাণ-কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তি-কালে হৃত তাহাই বর্ণন করেন ; পরিশেষে কিছুকাল মুখে মুখে প্রচারিত থাকিয়া, তৎসমুদায় লিপিবদ্ধ হইয়াছিল । মূল বেদব্যাসের প্রবর্ত্তনা, তাহাতে সংশয় নাই ; বেহেতু, তৎশিষ্য হৃতই অধিকাংশ স্থলে বক্তা এবং ঋষিগণ শ্রোতা । অধিকন্তু, হৃত-কথিত পুরাণ-সমূহই যে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, পুরাণের আলোচনায় অনেক স্থলে তাহাই প্রতিপন্ন হয় । পুরাণের লক্ষণ ও অনুক্রমণি মিলাইয়া বেদব্যাস-সদৃশ কোনও জ্ঞানবান্ ব্যক্তি আবার যদি কখনও উহার পুনরুদ্ধারের চেষ্টা পান, হয় তো সাগভূত পুরাণ-তত্ত্বের উদ্ধার হইতে পারে । তাহা হইলে, কোন পুরাণের কতটুকু ব্যাসের উক্তি, কতটুকু তাহার শিষ্য-পরম্পরার উক্তি, আর কতটুকুই বা লিপিকারগণের সংযোজনের ফল,—তদ্বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে ।

পুরাণ-সমূহ প্রধানতঃ ঐতি-স্মৃতি-দর্শনের অনুসারী । পুরাণ-বর্ণিত সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্ম-বিষয়ক আচার-ব্যবহার তাই অনেকাংশে ঐতি-স্মৃতি-দর্শনের মতানুসারী । দর্শন-তত্ত্ব

সকল পুরাণে বিশদ-ভাবে আলোচিত । স্মৃতির অনুশাসনে প্রায় সকল পুরাণে
পুরাণে
বিবিধ-চিত্র ।

পুরাণই পারচালিত । পুরাণের মধ্যে সামান্য-বেদান্তের নিগূঢ় নিঃশ্রেয়স-তত্ত্ব আছে ; আবার, পুরাণের মধ্যে স্মৃতি-নির্দিষ্ট দেব-দেবীর পূজা-পদ্ধতিরও প্রাধান্য পরিকল্পিত হইয়াছে । ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, দুর্গা-কালী-লক্ষ্মী-সরস্বতী, নরসিংহ-শ্রীকৃষ্ণ-গণপতি,—প্রভৃতি বহু দেব-দেবীর পূজা-পদ্ধতি পুরাণ-সমূহে দৃষ্ট হয় । নানাবিধ ঐতিহ্য-পূজা, ত্রুত, দান, তীর্থ-দর্শন প্রভৃতির মাহাত্ম্য—পুরাণে কি সুন্দর-ভাবেই পরিবর্ণিত আছে ! ভূমিদান, অগ্নিদান, জলদান—প্রভৃতি বিষয়েও মহাদি স্মৃতির আদেশ-পরম্পরা পুরাণে প্রকৃষ্টরূপে প্রতিপালিত । পুরাণের চিত্র-পরম্পরা দর্শন করিলে, স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়,—ধর্মের দিকে, সদহৃষ্ঠানের দিকে, লোকের মন তখন অল্পক্ষণ প্রধাবিত ছিল ; যাহারা ধর্ম-পথে অগ্রসর, তাহারাই জয়যুক্ত ; আর যাহারা অধার্মিক ধর্মবিরোধী, পদে পদে তাহারাই অধঃপতিত । অধার্মিক অত্যাচারী রাজা বেণ রাজ্যভ্রষ্ট-নিরয়গামী হইতেছেন ; কিন্তু তাহার পুত্র পুথু ধর্ম-রক্ষায় একাশ্রয় হইয়া, সমাগরা ধরিত্রীর আধিপত্য লাভ করিতেছেন ; অপিত, পিতার উদ্ধার-সাধন করিয়া আপনি স্বর্গগামী হইতেছেন ।

হিরণ্যকশিপু, রাবণের, হর্ষণধনের অধঃপতনে, প্রজ্ঞাদের, ত্রীমচক্রে ও বৃষ্টিরাশির জয়-শ্রীলাভে—প্রতিনিয়ত চক্রে উপর ধর্মধর্মের ফলাফল প্রকটিত । ব্রত-কথায়, কখন-ধর্ম-বর্ণনায়, জনসাধারণের চিত্ত পরহিত-ব্রতে উৎসাহিত হইতেছে; তীর্থাদির মাহাত্ম্য-কীর্তনে দেব-দর্শনে পুণ্যাহুতানে লোকের প্রাণে ধর্মভাব জাগাইয়া তুলিতেছে । স্মৃতি-সংহিতায় যে ধর্ম সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে, পুরাণে তাহাই দৃষ্টান্ত-উদাহরণাদি দ্বারা বিশদীকৃত । সেই ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-চতুষ্টয়ের কর্ম-বিভাগ, সেই রাজধর্ম-বর্ণন, সেই বিবাহ ও লোকাচার-পদ্ধতি, সেই শ্রদ্ধ-প্রারশ্চিত্ত-বিধি,—পুরাণের অস্থি-মজ্জায় সংগ্ৰহিত । এমন কি, পুরাণের অনেক স্থলে, ঋতি-স্মৃতির বাক্য-পরম্পরা পর্য্যন্ত অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে—দেখিতে পাই । দর্শন-ভবের তো কথাই নাই; কোথাও দেখি মম্ব হইতে, কোথাও দেখি যাজ্ঞবল্ক্য হইতে, কোথাও দেখি পরাশর হইতে, চতুরাশ্রমের বিধি-নিষেধ-সমূহ সমুদ্ভূত হইয়াছে । স্মৃতি-সমূহে দেখিয়াছিলাম,—দান-ধর্ম শ্রেষ্ঠ-ধর্ম । পুরাণেও তাহার পুনরুচ্চার দেখিতে পাই,—

“দানমেব পরো ধর্মো দানাৎ সর্বমবাধ্যতে । দানান্মুক্তিঞ্চ রাজ্যঞ্চ দদ্যাদানং ভতো নরঃ ॥”

‘দানই পরম ধর্ম; দান হইতেই পুরুষের সর্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয়; দানেই স্বর্গ, দানেই রাজ্য-লাভ, দানেই মুক্তি । অতএব, মনুষ্যগণ অবশু দানধর্ম্যাচরণ করিবে ।’ স্মৃতি-সংহিতায় দেখিয়া-ছিলাম,—কূপ-পুষ্করিণী-দৌর্ধিকা-ধননে মহাপুণ্য সঞ্চিত হয়; পুরাণেও তাহাই দেখি;—

“কূপবাণীতড়াগাদি আরামাণি চ কারয়েৎ । ত্রিসপ্তকুলমুদ্রত্য বিম্বলোকে মহীয়তে ॥”

‘কূপ-পুষ্করিণী-দৌর্ধিকা-ধনন এবং বৃক্ষাদির প্রতিষ্ঠা করিলে, ত্রি-সপ্ত কুল উদ্ধার হয়; মাহুয বিম্বলোকে বাস করিতে পারেন ।’ বর্ণাশ্রম-ধর্মের প্রাধান্য সকল পুরাণেই সমভাবে কীর্তিত হইয়াছে । ব্রাহ্মণের ধর্ম, ব্রাহ্মণের প্রকৃতি; ক্ষত্রিয়ের ধর্ম, ক্ষত্রিয়ের প্রকৃতি; বৈশ্যের ধর্ম, বৈশ্যের প্রকৃতি; শূদ্রের ধর্ম, শূদ্রের প্রকৃতি;—সকল পুরাণেই সমভাবে বর্ণিত আছে । শম, দম, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষমা, সরলতা, দয়া, সত্য, শাস্ত্রালোচনা ও ভগবদ্ভক্তিই ব্রাহ্মণের প্রকৃতি; প্রভাব, বল, ধৈর্য্য, ঔদার্য্য, ঐশ্বর্য্য, ব্রাহ্মণের হিত-সাধন,—ক্ষত্রিয়ের প্রকৃতি; আন্তিকতা, দামনিষ্ঠা, দস্তহীনতা, ব্রাহ্মণ-সেবা ও অর্থ-বৃদ্ধির চেষ্টা,—বৈশ্যের প্রকৃতি; আর, অকপট-ভাবে ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের সেবা ও তদ্বারা জীবিকার্জন,—শূদ্রের প্রকৃতি । আবার সাধারণ-ভাবে, অহিংসা এবং কাম-ক্রোধ-লোভ-ত্যাগ, সত্যনিষ্ঠা এবং প্রাণিগণের হিতসাধন,—সর্ববর্ণেরই প্রতিপাল্য । অধিক বলিবি কি, বর্ণাশ্রম-ধর্ম-বিষয়ে সংহিতা-সমূহের মত-পরম্পরা পুরাণাদিতে অনেকস্থলে বর্ণে বর্ণে উদ্ধৃত হইয়াছে । দৃষ্টান্ত,—যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতার প্রথম অধ্যায়ের এক-পঞ্চাশ শ্লোক হইতে পরবর্তী পতাধিক শ্লোকের সহিত গুরুভূ-পুরাণের পঞ্চনবাত্তম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক হইতে বড়ধিক শততম অধ্যায় পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত শ্লোকের অভিন্নতা দৃষ্ট হয় । নিম্নে যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা ও গুরুভূ-পুরাণ হইতে যথাক্রমে চারিটা করিয়া শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি । তাহাতে বিবাহাদি সম্বন্ধে সমাজ-বিধি তৎকালে কিরূপ প্রচলিত ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে ।

“অবিমুক্তৈরঙ্গচর্যো লক্ষণ্যঃ ত্রিবিম্বহঃ । জনস্তপূর্জিকাং কান্তানসপিণ্ডং যবীরসীং ।

অরোগিণীং ভ্রাতৃমতীং সমানার্বগোজ্ঞানাম্ । গন্ধমাং সপ্তমাদুর্দ্ধং মাতৃতঃ পিতৃতত্ত্বম্ ॥

লক্ষপুরুষ বিখ্যাতোজ্জ্বলিত্রিয়াণাং মহাহুলাং । স্বরীতাদপি ন সকারিরোগদোষ সমন্বিতাং ॥
যদুচ্যতে দ্বিজাতীনাং শূদ্রাদারোপসংগ্রহঃ । ন তন্ময় মতং বস্মাৎ তজ্জায়া জায়তে স্বয়ম্ ॥

—যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা, প্রথম অধ্যায়—৫২শ, ৫৩শ ৫৪শ, ও ৫৬শ শ্লোক ।

“অবিদ্রুতব্রহ্মচর্য্যো লক্ষণ্যং ত্রিয়ম্বহেৎ । অনগ্রপুংসিকাং কান্তামসপিণ্ডাং স্বরীয়সীম্ ॥
অরোগিণীং জাতুমতীমসমানাবিগোত্রজান্ । পঞ্চমাৎ সপ্তমাদৃদ্ধং মাতৃতঃ পিতৃতত্ত্বা ॥
দ্বিপঞ্চনববিখ্যাতাং শ্রোত্রিয়ানাং মহাহুলাং । সর্বণঃ শ্রোত্রিয়ো বিদ্বান্ বরো দোষাবহিতো ন চ ॥
যদুচ্যতে দ্বিজাতীনাং শূদ্রাদারোপসংগ্রহঃ । ন তন্ময় মতং বস্মাৎ তজ্জায়া জায়তে স্বয়ম্ ॥”

—গরুড়-পুরাণ, ১৫শ অধ্যায়, ২য়—৫য় শ্লোক । *

উপরি-উদ্ধৃত শ্লোক-চতুষ্টির অর্থ-সম্বন্ধে কোনই পার্থক্য নাই । উভয়েরই অর্থ,—ব্রহ্মচর্য্য
সমাপনান্তে সুলক্ষণা অনগ্রপুংসী (যে কন্ডার সহিত পূর্বে অগ্র কাহারও বিবাহ অবধারণ হয়
নাই) কান্তিমতী, অসপিণ্ডা (পিতৃ-বন্ধু-হইতে অধস্তন সপ্তম এবং মাতৃ-বন্ধু হইতে অধস্তন
পঞ্চম পুরুষ পর্য্যন্ত সপিণ্ড, স্মৃতরাং তৎপরবর্তী) কন্ডাকে দ্বিজাতিগণ বিবাহ করিবেন । বয়ঃ-
কনিষ্ঠা, অরোগিণী, জাতুমতী, অসমান-পোত্রা, মাতৃপক্ষ হইতে পঞ্চম এবং পিতৃপক্ষ হইতে
সপ্তম পুরুষ বর্জন করিয়া, সুলক্ষণা কন্ডা বিবাহ করিবে । শ্রোত্রিয়-কুলোদ্ভব, সমানবর্ণ,
বিদ্বান ও দোষরহিত (কুষ্ঠাদি সঞ্চারী-রোগ-মুক্ত) বরকেই বিবাহ-কার্য্যে মনোনীত করিবে ।
দ্বি-জাতিগণ শূদ্র-কন্ডাকে বিবাহ করিতে পারেন বলিয়া, কোনও কোনও মূনি যে মত
দিয়াছিলেন, তাহা আমার সম্মত নহে । কারণ, ভাষ্য্যতে আত্মাই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন।
এই বলিয়া পরবর্ত্তি-শ্লোক-সমুচ্চয়ে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের কন্ডা, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়ের কন্ডা, বৈশ্য
বৈশ্য-কন্ডা, শূদ্র শূদ্র-কন্ডা, বিবাহ করিবেন,—স্পষ্টতঃ তাহা লিখিত হইয়াছে । অসবর্ণ-
বিবাহ যে দোষাবহ, সংহিতা ও পুরাণ—উভয়েই তাহা সমভাবে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন ।
ফলতঃ, পুরাকালে কোনও কোনও ঋষির মতে, কোনও কোনও প্রদেশে অসবর্ণ-বিবাহ
প্রচলিত থাকিলেও, কখনও যে তাহা শ্রেষ্ঠ-বিবাহ বলিয়া গণ্য হয় নাই,—পরন্তু সর্বদাই
যে তাহা নিকৃষ্ট-বিবাহ মধ্যে গণ্য হইয়াছে,—শাস্ত্রাদির আলোচনায় তাহা বেশ বুঝিতে
পারা যায় । এক দিকে অসবর্ণ-বিবাহের নিষেধ-বিধি, অন্য দিকে দত্তা-কন্ডার পুনর্দান
সম্বন্ধে কঠোর দণ্ড-ব্যবস্থা, পুরাণাদিতেও দৃষ্ট হয় । অগ্নি-পুরাণে পরাশরের “নষ্টে মূতে” বচন
উদ্ধৃত হইয়াছে বটে; কিন্তু তাহারই সঙ্গে সঙ্গে পুরাণকার বলিয়াছেন,—“সকুৎকন্যা প্রদা-
তব্যা হরন্তাং চোরদণ্ডভাক্ ।” অর্থাৎ, একবার-মাত্রই কন্যাদান করা যায় ; দত্তা কন্যা
পুনরায় দান করিলে, দাতাকে চোরের ন্যায় দণ্ড দেওয়া বিধেয় । বিবাহের মধ্যে ব্রাহ্ম-বিবাহ
অর্থাৎ স্ব-বর্ণস্থ সং-পাত্রকে কন্যাদান শ্রেষ্ঠ বলিয়া আবহমান-কাল পরিকীৰ্ত্তিত । বিবাহে
বাদ্যোদয় (“বাদ্যোদয়ঃ ক্রীং গৃহং নয়ৎ”) সমারোহ প্রভৃতিও বহুকাল হইতে প্রচলিত ছিল ।
বিবাহ, গর্ত্তাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ষ, নামকরণ, নিষ্ক্রামণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ,
উপনয়ন প্রভৃতি অষ্ট-চত্বারিংশ সংস্কার† দ্বারা ব্রহ্মলোকে গমন করিতে পারা যায়,—
এইরূপ উক্তি দ্বারা, সংস্কার-কার্য্যে পুনঃপুনঃ উদ্বোধিত করা হইয়াছে । তৎকালে, যথাবিধি
সংস্কার-কার্য্য বিহিত হইত,—তাহার নানা প্রমাণ বিদ্যমান আছে । সমাজ-ধর্ম্মের বিবরণ,

* লক্ষ্য করিবেন,—যাজ্ঞবল্ক্যের ৫৪শ এবং গরুড়-পুরাণের ৪র্থ শ্লোকে পাঠান্তর থাকিলেও অর্থান্তর নাই ।

† অধুনা প্রধানতঃ উল্লিখিত দশবিধ সংস্কার প্রচলিত ।

পুরাণাদিতে যেরূপ দৃষ্ট হয়, রাজ-ধর্মও উহাতে সেইরূপ-ভাবে পরিবর্ণিত। মহুসংহিতায় যেরূপ গ্রামাধিপতির উপর দশগ্রামাধিপতির, দশগ্রামাধিপতির উপর শতগ্রামাধিপতির নিয়োগ দেখিতে পাই; মহুসংহিতায় যেরূপ কর-গ্রহণের বিধি-ব্যবস্থা বিহিত আছে; সংহিতাশাস্ত্রে যেরূপ চৌর্যাদির দণ্ড-বিধি বিহিত হইয়া থাকে;—পুরাণেও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, সেই সকল বিষয়ের পুনরাবৃত্তি লক্ষিত হয়। * করসংগ্রহ, ব্যবহার-বিধি, রাজ্য-রক্ষা, প্রজা-পালন প্রভৃতি বিষয়ে পুরাণ-সমূহে সংহিতা-শাস্ত্রের পূর্ণ-প্রভাব বিদ্যমান। অগ্নি-পুরাণে হিন্দুদিগের যুদ্ধ-বিদ্যার প্রসঙ্গে যে যজুর্বিদ্যার পরিচয় পাওয়া যায়, সে বিদ্যা এখন বিলুপ্তপ্রায়। দেবী-পুরাণে ব্রহ্মাশ্বের উল্লেখে আয়ুর্জ্ঞানের যে পরিচয় পাওয়া যায়, সে পরিচয় এখন স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান। পদ্ম-পুরাণে, ভারতবর্ষের যে ভৌগোলিক-ভূতত্ত্ব পরি-বর্ণিত, কালের পরিবর্তনে এখন তাহার অনেক চিহ্নই সন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। गरुड़-পুরাণে—ল্যোতির্বিদ্যা, সামুদ্রিক-বিদ্যা; অগ্নিপুরাণে আয়ুর্বিদ্যা, চিকিৎসা-প্রকরণ; এবং ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে প্রাচীন ভারতের চিত্র-বিদ্যা শিল্পকলার কি চারু-চিত্রই অঙ্কিত রহিয়াছে। সে হিসাবে, পুরাণাদিতে একটি সমুন্নত সমাজের প্রতিকৃতি প্রতি-ফলিত। কিরূপ সমাজ-বন্ধন ছিল, কিরূপ রাজ-নীতি ছিল, কিরূপভাবে গৃহ-ধর্ম নিরূপিত হইত, কিরূপ পদ্ধতিতে যুদ্ধ-বিগ্রহ চলিত, কি উপায়ে রোগ-প্রতিকারের—ব্যাধি-শাস্তির—চিকিৎসার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল; শিল্পে, সাহিত্যে, কাব্যে, ব্যাকরণে, অলঙ্কারে, হিন্দুগণ কিরূপ উন্নতি-লাভ করিয়াছিলেন;—পুরাণাদিতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

পুরাণ-সম্বন্ধে অধুনা প্রধানতঃ চতুর্বিধ সংশয়-সন্দেহ উত্থাপিত হইয়া থাকে। প্রথম সংশয়,—পুরাণ-সমূহ অতি আধুনিক-কালে বিরচিত হইয়াছে। দ্বিতীয় সংশয়,—উহার অধিকাংশই উপকথায় পরিপূর্ণ। তৃতীয় সংশয়,—পুরাণ-সমূহ বেদ-পাশ্চাত্য মতালোচনা। ব্যাসের বা এক ব্যক্তির রচনা হওয়া সম্ভবপর নহে। চতুর্থ সংশয়,—ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রবর্তক বা অমুসারিগণ আপনাপন মত-প্রতিষ্ঠার জন্য ভিন্ন ভিন্ন পুরাণ রচনা করিয়া গিয়াছেন। পুরাণ-পরম্পরার উল্লেখ-প্রসঙ্গে আমরা প্রায় সকল সংশয়-প্রশ্নেরই আলোচনা করিয়াছি। প্রাচ্যের চক্ষে ও পাশ্চাত্যের চক্ষে কি ভাবে ঐ সমুদায় প্রতিফলিত আছে;—তাঁহাও বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছি। সাধারণ বুদ্ধিতে তদ্বিষয়ে যেরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সমীচীন, তাহারও আভাস দিয়াছি। দূরধিগম্য অতীত-ইতিহাস-সম্বন্ধে মনে একরূপ সংশয়-সন্দেহ উদয় হওয়া বিচিত্র নহে। পুরাণ-পরম্পরায় অতি দূর-অতীতের চিত্র অঙ্কিত আছে বলিয়াই, তত দূরে দৃষ্টি-সংকলন করিতে অসমর্থ হইয়াই, উহার সম্বন্ধে চিত্ত সাধারণতঃ সংশয়ান্বিত হয়। যাহা হউক, পূর্ব-পূর্ব-কল্পের কথা বিস্তৃতির অতল-তলে নিষ্ক্ষেপ করিয়া, পুরাণ-সমূহ যদি আলোচনা করি, তাহা হইলেই বা আমরা কি দেখিতে পাই? বলিয়াছি ভো,—সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর এবং কলির প্রথমার্ধের ঘটনাবলী পুরাণ-পরম্পরায় অস্থি-মজ্জা-মেরুদণ্ড-স্বরূপ। যদি কোথাও আধুনিক ঘটনা-নিবহের ছায়া-সম্পাত দেখিতে পাওয়া যায়, স্বতঃই তাহা

* দৃষ্টান্ত-রূপে, অগ্নি-পুরাণ, ২২০শ অধ্যায়; गरुड़-পুরাণ ৪৪শ অধ্যায় হইতে ১১০শ অধ্যায় পর্যন্ত।

প্রকৃষ্ট বা লিপি-চাতুর্য বলিয়া অল্পমিত হয়। অতীত ইতিহাসের অভ্যাক্ত ঘটনা—
কবে না উপকথার দ্বারা প্রতীয়মান হইয়া থাকে! প্রাচীন গ্রীসের, প্রাচীন রোমের,
প্রাচীন মিশরের, ইতিহাস—এখন উপকথার মধ্যে পরিগণিত। ফিনিসীয়, কার্থেজীয়,
বাইবলান্টাইন প্রভৃতির অতীত-স্মৃতি দিন-দিন বিলুপ্ত হইতেছে বলিলেও অত্যাঙ্গ হয়
না। সে দিনের মহারাষ্ট্র ও শিখগণের শৌর্য্য-বার্য্য এখনই স্বপ্নের দ্বারা প্রতীত হইতেছে।
এ সকলের তুলনায়, কত দূর অতীতের ঘটনাবলী উপকথার মধ্যে পর্য্যবসিত হইবে,—
তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? সে দিন চক্ষের উপর বাহা ঘটতে দেখিয়াছি। তাহাই যখন
আজ বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না; তখন আর অস্ত্রে পরে কা কথা! ফলতঃ, যত দূরে
চলিয়া যায়, সত্যকে ততই উপকথা বলিয়া ভ্রম হয়। পুরাণ-সমূহ যে ভাবে প্রচলিত
আছে, তাহাতে সকল পুরাণের রচয়িতা বলিয়া বেদব্যাসকে নির্দেশ করিতে না পারিলেও
পুরাণ-সমূহের যে তিনিই—এক ব্যক্তিই প্রবর্তক, অনায়াসে তাহা বুঝিতে পারা যায়। *
আমরা পূর্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি,—বেদব্যাস পুরাণ-সমূহের মর্ম্ম অর্থাৎ অতীত
ঘটনা-পরম্পরা শিষ্টগণের নিকট বিবৃত করিয়াছিলেন; কিছুকাল পর্য্যন্ত মুখে-মুখেই তাহা
প্রচলিত ছিল; পরিশেষে পুস্তকাকারে তৎ-সমুদায় লিপিবদ্ধ হয়। ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে
ভিন্ন ভিন্ন ভাবে, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের, ভিন্ন ভিন্ন মতের, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের, প্রাধান্য
পরিকীর্ষিত হইয়াছে; তাহার কারণ,—মোক-লাভের দিকে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের
জনগণের চিত্তকর্ষণ; তাহার কারণ,—মনুষ্য-সমাজের রীতি-প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন
পথ দিয়া তাঁহাদিগকে ভগবৎ-সমীপে উপনীত করণ। যিনি শাস্ত্রিক-ভাবাপন্ন, তাঁহার
জ্ঞান শাস্ত্রিক ভাবে; যিনি রাজসিক-ভাবাপন্ন, তাঁহার জ্ঞান রাজসিক ভাবে; যিনি
তামসিক-ভাবাপন্ন, তাঁহার জ্ঞান তামসিক ভাবে;—ভিন্ন ভিন্ন ভাবাপন্ন ব্যক্তির জন্য ভিন্ন
ভিন্ন পথ নির্দেশই পুরাণ-সমূহের লক্ষ্য বলিয়া মনে হয়। ফলতঃ, ভিন্ন ভিন্ন সমাজের,
ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিগণের মনোরঞ্জন পরিচালনার জন্ত, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে, একই
ব্যক্তি কতক, পুরাণ-সমূহ প্রবর্তিত হইয়াছিল। যদি একই ব্যক্তির প্রবর্তনা না হইবে,
তাহা হইলে লক্ষণ-পরম্পরা, ঘটনা-পরম্পরা, ভাব-পরম্পরা এত সাদৃশ্য-বাজক হইবে কেন?
সূচনা, বর্ণনা, মত-প্রতিষ্ঠা, উপসংহার—সর্বত্রই সৌসাদৃশ্য আছে। সকল পুরাণের আরম্ভেই
মঙ্গলাচরণ, সকল পুরাণের পরিসমাপ্তিতেই ফলশ্রুতি, সকল পুরাণের লক্ষ্যই মুক্তিলাভ।
যাঁহার শৈব, তাঁহাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা হইয়াছে,—শিবই সেই পরব্রহ্ম; যাঁহার
বৈষ্ণব, তাঁহাদিগকে বুঝান হইয়াছে,—বিষ্ণুই সেই পরব্রহ্ম; যাঁহার শাক্ত, তাঁহাদিগকে
বুঝান হইয়াছে,—শক্তিই পরব্রহ্মরূপিণী। পরিশেষে আবার স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া
হইয়াছে,—শিব-শক্তি-বিষ্ণু সবই এক;—কেবল নাম-রূপের ভেদ মাত্র। মূল বিষয়ে
এতাদৃশ সামঞ্জস্য সত্ত্বেও পুরাণ-সমূহ ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি কতক প্রবর্তিত
হইয়াছিল,—কি প্রকারে বিশ্বাস করিতে পারি? তার পর, কোন্ পুরাণ কোন্ সময়ে রচিত

* কবি-পুরাণের বর্ণনায় বৌদ্ধদিগের পরাজয়ে, ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের ভাব-পরম্পরা পরিদৃষ্টমান
আছে,—অনেকে এইরূপ মনে করেন। তাঁহাদের মতে, কবি পুরাণ এই সময়ে রচিত হইয়াছিল।

হয়, পুরাণের মধ্যেই তাহার উল্লেখ আছে । ব্রহ্ম-পুরাণ প্রথমে রচিত হইয়াছিল ; তৎপরে পদ্ম-পুরাণ রচিত হয় ; এবং পদ্ম-পুরাণের পর বেদব্যাস বিষ্ণু-পুরাণ রচনা করেন ।

“আদ্যং সৰ্বপুরাণানাং পুরাণং ব্রাহ্মযুগোত্তমং ।.....এতদ্বৈকবসংজ্ঞং বৈ পাণ্ডুস্ত সমনন্তরম্ ।”

—বিষ্ণু-পুরাণ, তৃতীয় অংশ, বর্ত্ত অধ্যায় ।

কুর্ক-পুরাণের প্রারম্ভেও দেখিতে পাই,—প্রথমে ব্রহ্মপুরাণ, অনন্তর পদ্মপুরাণ, বিষ্ণু-পুরাণ প্রকৃতি অষ্টাদশ মহাপুরাণ কথিত হইয়াছিল । বিশেষতঃ, সূত * সেখানে বলিতেছেন,—
“ব্যাণ কৰ্ত্তৃক পূৰ্ণ-কালে বে পুরাণ পরিবৰ্ণিত হইয়াছিল, আমি তাহারই বর্ণনা করিব ।”
দেবী-ভাগবতে দেখিতে পাই,—মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস ভাগবত-পুরাণের অধ্যায় এবং ব্রহ্ম পর্য্যন্ত নির্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন । তবে তাঁহার মুখে বৈষ্ণব গুনিয়াছিলেন, সূত তাহাই বর্ণনা করেন ;—এই কথাই দেবী-ভাগবতে উল্লিখিত আছে । মহাভারত বেদব্যাস বিরচিত । মহাভারত রচনার পর, শ্রীমদ্ভাগবত বিরচিত হইয়াছিল,—এ কথা শ্রীমদ্ভাগবতে স্পষ্টতঃ লিখিত আছে । পদ্ম-পুরাণ পাতাল-খণ্ডেও সেই পরিচয় পাওয়া যায় । সাহিত্য-হিসাবেও পৌরাণিক-সাহিত্যের একটি যুগ আসিয়াছিল,—বলা বাইতে পারে । বৈদিক-সাহিত্যের যুগে শ্রুতি, স্মৃতি-সাহিত্যের যুগে দর্শন এবং পৌরাণিক-সাহিত্যের যুগে পুরাণ-পরম্পরা । সূতের পর যে আকারে স্মৃতির প্রাধান্য হয়,—তাহার পরিচয় পূৰ্বেই স্মৃতি-সংহিতার আলোচনায় প্রদান করিয়াছি । ফলতঃ, শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ উপকথার পূর্ণ নহে ; অথবা কোনও সম্প্রদায়-বিশেষের কোনও নিগূঢ় উদ্দেশ্য সাধন জন্যও পুরাণ-সমূহ বিরচিত হয় নাই । পরন্তু, জীবের মোক্ষ-লাভের উপায়-পরিবৰ্ণন ব্যাপদেশে দৃষ্টান্ত-রূপ পুরাতত্ত্বের অবতারণায়, পুরাণ-সমূহ প্রচারিত হইয়াছিল । পক্ষান্তরে, পুরাণ-সমূহই হিন্দু-জাতির প্রাচীন-কালের ইতিহাস ।

* অধিকাংশ পুরাণই সূতের মুখে ব্যক্ত হইয়াছে—দেখিতে পাই । সূত, বেদব্যাসের শিষ্য ছিলেন ; তাঁহার জাতীয় ধর্ম্মই—পুরাণ ব্যাখ্যা করা । বর্ত্তমান-কালে কথকথা-ব্যবসায়ী কথক যেরূপ ভাগবত-পুরাণাদির বর্ণন করিয়া থাকেন ; সূত সম্বন্ধেও সেইরূপ ভাব মনে আসিতে পারে । তাঁহার অপর নাম—রোমহর্ষণ (লোমহর্ষণ) ; তাঁহার বাক্য-পরম্পরায় শ্রোতৃবর্গের দেহ রোমাঙ্কিত হইত, সেই জন্যই তিনি রোমহর্ষণ নামে বিখ্যাত হন । তাঁহাদের বংশাবলী পুরাণ ব্যাখ্যা করিতেন,—তাঁহার পরিচয়ে স্পষ্টই উক্ত আছে । ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণের প্রথম অধ্যায়ে সূত আপনায় আত্ম-পরিচয় প্রদানক্ষেত্রে বলিতেছেন,—পুরাণ-পাঠই আমাদের জাতীয় ধর্ম্ম ; ‘সূত’ তাঁহার জাতীয় নাম । সূত-জাতীয় রমণীর গর্ভে সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়াই তিনি ঐ নামে অভিহিত হন । এ হিসাবে সূত অসংখ্য । ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন সূতের বিদ্যমানতা অসম্ভব নহে ।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ।

তন্ত্র ।

[তন্ত্র-শাস্ত্র,—তন্ত্রের সংজ্ঞা,—বিবিধ তন্ত্রের পরিচয়,—তাত্ত্বিক-সম্প্রদায়-মধ্যে উচ্চ-খলা-বুদ্ধি-হেতু তন্ত্রে-
‘পাণ্ড-শাস্ত্র’-সংজ্ঞা দান,—তন্ত্রের মূল-তত্ত্ব,—পঞ্চ-মকারের প্রকৃত অর্থ,—তন্ত্রই প্রকৃষ্ট যোগ-শাস্ত্র,—তন্ত্রে
ব্যক্তিদ্বারাদির বিরুদ্ধ-বাদ,—পঞ্চ-মকারের ত্রিবিধ সাধনা,—বিবিধ তাত্ত্বিক সম্প্রদায়ের পরিচয়,—
অষ্টবিধ তাত্ত্বিক আচার,—ভাবতন্ত্র,—তন্ত্রে তন্ত্রের লক্ষণ,—বেদ পুরাণাদির সহিত ঐক্যভাব,—আগম ও
নিগম শাস্ত্র,—তন্ত্র সম্বন্ধে বিবিধ বক্তব্য,—সৃষ্টি-তত্ত্ব,—মন্ত্রের স্বরূপ ও অর্থ,—গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ ।]

তন্ত্র—কলিশাস্ত্র । শিব ও শক্তির প্রাধান্ত-কীৰ্ত্তনই তন্ত্রের উদ্দেশ্য । প্রধানতঃ,
পার্বতীর প্রেমের উত্তরে সদাশিবের মুখে এই শাস্ত্র বিবৃত হইতেছে । ‘কলিকালে ব্রাহ্মণাদি
বর্ণ আচার-শূন্য হইবে ; বেদোক্ত কৰ্ম্মের দ্বারা শুদ্ধি-লাভ করিতে
তন্ত্র-শাস্ত্র পারিবে না ; পুরাণ-সংহিতা এবং স্মৃতি-সমূহেও মহত্ত্বের ইষ্ট-সিদ্ধ
হইবে না ; তখন একমাত্র তন্ত্র-শাস্ত্রই জীবের ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষের
হেতুভূত হইবে ।’ এইরূপ ভূমিকার পর, সদাশিব তন্ত্র-শাস্ত্র বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হন ।
প্রদত্তঃ তিনি বলেন,—“সত্যাদি যুগে সে সকল মন্ত্র ফলদানে সমর্থ ছিলেন, কলিতে তৎ-
সমুদায় মৃতপ্রায় নিফল । তন্ত্রোক্ত মন্ত্র ভিন্ন অল্প মন্ত্র দ্বারা কৰ্ম্মাশুষ্টি হইলে এখন আর
ফলপ্রাপ্ত হয় না । তন্ত্র-নির্দিষ্ট পথই এখন সুখ ও মোক্ষের হেতু ।” ফলতঃ, প্রতি-
স্মৃতি-পুরাণ প্রভৃতিতে যে ভাবে জীবের জুঃখ-নিবৃত্তির উপায়-পন্থার নির্দিষ্ট হইয়াছে, তন্ত্র-
সমূহেও প্রকার-ভেদে সেই আলোচনাই দেখিতে পাই । এক এক পুরাণের আলোচনার
সেই সেই পুরাণের যেমন প্রাধান্য পরিকীৰ্ত্তিত হইয়াছে ; তন্ত্র-সম্বন্ধেও সেই একই
ভাব বিস্তারিত রহিয়াছে । সাধারণতঃ, তন্ত্র-শাস্ত্রের সজ্ঞাতেই সেই ভাব পরিষ্কৃত হইয়াছে,—

“দেবীনাং যথা দুর্গা বর্ণনং ব্রাহ্মণে যথা । তথা সমস্ত শাস্ত্রাণাং তন্ত্রশাস্ত্রমহত্তমम् ।”

পুরাণে যেমন দেখিয়াছি, প্রায় প্রত্যেক পুরাণের মাহাত্ম্য-কীৰ্ত্তন-প্রসঙ্গে পুরাণকার বলিয়া-
ছেন,—নদীর মধ্যে যেমন গঙ্গা, বর্ণের মধ্যে যেমন ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ ; পুরাণের মধ্যেও
তেমনি এই পুরাণ শ্রেষ্ঠ । তন্ত্রের মধ্যেও সেইরূপ দেখিতে পাই, এক এক তন্ত্রের মাহাত্ম্য
ঐ ভাবেই কীৰ্ত্তিত হইয়াছে । ‘মহানির্কাণ-তন্ত্রে একাধিক দৃষ্টান্তে তাহাই উক্ত আছে,—

“যথা নরেষু তন্ত্রজ্ঞাঃ সৱিতাঃ জাহ্নবী যথা । যথাহং ত্রিদিবেশানাং বাগমাত্মনামিদং তথা ॥”

“যথা নরেষু হিমবান্ তারকান্ যথা শবী । ভাষ্যং যন্তঃসু তন্ত্রেবু তন্ত্ররাজমিদং তথা ॥”

‘যেমন মহত্ত্বের মধ্যে তন্ত্রজ্ঞানী শ্রেষ্ঠ, যেমন নদী-সকলের মধ্যে গঙ্গা শ্রেষ্ঠা, যেমন দেব-
গণের মধ্যে আমি শ্রেষ্ঠ, তেমনিই সমুদায় আগম-শাস্ত্রের মধ্যে এই মহানির্কাণ-তন্ত্রই
শ্রেষ্ঠ । পার্বতীর মধ্যে যেমন হিমালয়, লক্ষ্যত্রয়গণের মধ্যে যেমন চন্দ্র, তেজ-সমূহের মধ্যে
যেমন সূর্য্য, সমুদায় তন্ত্রের মধ্যে সেইরূপ এই তন্ত্ররাজ শ্রেষ্ঠ ।’ শক্তি-উপাসনা—তন্ত্রের মূল
লক্ষ্য । পুরাণ-উপপুরাণে ঐহাকে ভগবান, নারায়ণ, বিষ্ণু, কৃষ্ণ প্রভৃতি নাম-বিশেষণে

বিশেষিত করা হইয়াছে ; তন্মধ্যে তিনি পরমা-প্রকৃতি, আত্মাশক্তি, কালী, তারা, মহাবিন্ধ্য প্রভৃতি নাম-বিশেষণে বিশেষিত হইয়া আছেন। পার্থক্য - এই মাত্র ; নচেৎ, মূল বিষয়ে কোনই অমিল নাই। তন্মধ্যে মূলও—বেদ ; তন্ত্র—বেদের শাখা-বিশেষ। অথর্ব-বেদে যে মন্ত্রাদি বীজরূপে পরিলক্ষ্যমান ছিল, তন্মধ্যে তাহাই মুকুলিত ও পল্লবিত। হুষ্টি, প্রায়, দেব-পূজা, মন্ত্র-নির্ণয়, আশ্রম-ধর্ম, তীর্থ-মাহাত্ম্য প্রভৃতি—তন্মধ্যে আলোচ্য। তন্মধ্যে সংখ্যা—অসংখ্য। আগমতত্ত্ব-বিলাসে নাল, যোগিনী, ভৈরবী, কুমারী, তারিণী প্রভৃতি চতুরধিক ষষ্টিতম-সংখ্যক তন্মধ্যে নাম লিখিত আছে। বারাহী-তন্মধ্যে মধ্যে যোগডামর, শিবডামর, দুর্গাডামর, ব্রহ্মডামর ; আদি-যামল, ব্রহ্ম-যামল, বিষ্ণু-যামল, কৃষ্ণ-যামল ; গৌতমী, আত্মা, সরস্বতী, যোগিনী প্রভৃতি চতুরধিক পঞ্চাশৎ-সংখ্যক তন্মধ্যে নাম ও সেই সেই তন্মধ্যে মোক-সংখ্যা উক্ত হইয়াছে। তন্ত্র-গ্রন্থের মধ্যে, আগমসার, আগমচক্রিকা, জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র, শাক্তানন্দতরঙ্গিনী, জ্ঞানানন্দতরঙ্গিনী, স্বরোদয়যামল প্রভৃতি তন্ত্র প্রসিদ্ধ। নির্বাণ নামধেয় তন্মধ্যে নির্বাণ-তন্ত্র, মহানির্বাণ-তন্ত্র, বৃহৎনির্বাণ-তন্ত্র,—প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। তন্ত্রসার, তন্ত্রার্ণব, তন্ত্রকৌমুদী, উজ্জীশ, ডামর, তারারহস্ত, শ্রামারহস্ত, কামাখ্যা-তন্ত্র, কুলার্ণব-তন্ত্র প্রভৃতি নামেও ভিন্ন ভিন্ন তন্ত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত, বৌদ্ধদিগেরও প্রায় শত-সংখ্যক তন্ত্রের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে,—বুদ্ধকপাল, নাগার্জুন, মারাজাল, তত্ত্বজ্ঞান-সিদ্ধি, সাধক-সংগ্রহ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে প্রাতঃকৃত্য, ভূতভক্তি, জ্ঞানবিধি, প্রাণায়াম, সন্ধ্যা, জপ, নিত্যপূজা, করাস ও পঞ্চাঙ্গ-ভাস, বিবিধ মুদ্রা প্রভৃতির বিষয় বিবৃত আছে। গুরুগ্রহণ, দীক্ষা, আচার, প্রায়শ্চিত্ত, মন্ত্র প্রভৃতি তন্ত্রের অঙ্গস্থানীয়। তন্ত্র-মতে,—প্রথমে গুরুগ্রহণ করিতে হইবে। গুরু যে বীজ-মন্ত্র প্রদান করিবেন, সেই মন্ত্র দ্বারা ভগবানের অর্চনা করা বিধেয়। নানা তন্ত্র অনুসারে নানা সম্প্রদায়ের হুষ্টি হইয়াছে। তন্ত্র-শাস্ত্র চিরকাল গুহ্য-শাস্ত্র বলিয়া প্রচারিত ছিল ; সুতরাং উহার প্রকৃত অর্থ অনেকেরই অনধিগম্য। এখন যে ভাবে তন্ত্র-শাস্ত্রের ব্যাখ্যা হইয়া থাকে, তাহা বাঁতল ও অশিক্ষার অন্তরায়-সাধক। এমন কি, সেই সকল ব্যাখ্যায়, সময় সময় মনে হয়,—এরূপ শাস্ত্র কখনই মোক্ষ-সাধনের উপায়-বলিয়া নির্দিষ্ট হইতে পারে না। ব্যাভিচার, মগ্ধপান প্রভৃতির প্রাধান্য-কীৰ্ত্তন যদি শাস্ত্রের লক্ষণ হয়, তাহা হইলে মনুষ্যকে অধঃপতনের পথে লইয়া যাইবার জন্ত যে এই শাস্ত্র রচিত হইয়াছিল, তাহাই বুঝা যায়। চার্লস-দর্শনের হুচনায় আমরা যেমন দেখিয়াছি,—দৈত্যগণকে ভ্রান্তিপথে পরিচালিত করিবার-জন্ত, তাহাদের উচ্ছেদ-সাধন-কল্পে, দর্শন বিরচিত হয় ; তন্ত্র-শাস্ত্রেরও কোনও কোনও স্থানের ব্যাখ্যা-দর্শনে আমাদের সেই কথা মনে হয়। পদ্ম-পুরাণে এবং শ্রীমদ্ভাগবতে প্রকারান্তরে লিখিত আছে,—শিব-শক্তির নাম করিয়া যাহারা সং-শাস্ত্রের প্রতিকূলাচারী হইবে, তাহারা পাবণ। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে তন্ত্র-শাস্ত্রকে মোক্ষলাভের অন্তরায়-সাধক শাস্ত্র বলিতে হইবে। কিন্তু তন্ত্র-শাস্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য সেরূপ বলিয়া মনে হয় না। কেবল উহার অর্থ-বিক্রতির জন্তই যত কিছু অনর্থের উৎপত্তি হইয়াছে। নচেৎ, তন্ত্র-শাস্ত্র কখনই ব্যাভিচারের ও মগ্ধপানের প্রশংসা দেন নাই।

তত্ত্ব-শাস্ত্রের যে মূল-তত্ত্ব পঞ্চ-মকার, যে পঞ্চ-মকারের দোহাই দিয়া লোকে নানা
 অপকর্ষ করিতে প্রবৃত্ত হয়; তৎসংক্রান্তে দেখিলে, সেই পঞ্চ-মকারেরই বা কি অর্থ বুঝিয়া
 থাকি? পঞ্চ-মকার কি সত্য-সত্যই জীবকে বিপুলস্বামী করিবার মন্ত্র-শাস্ত্র-
 পঞ্চ-মকার-
 তত্ত্ব।
 বাক্য-রূপে উক্ত হইয়াছে?—তাহা কখনই নহে। পরন্তু, পঞ্চ-মকারে
 সাধকের প্রাণে অহংময় আত্ম-তত্ত্ব উদ্ভাসিত করিয়া দেয়। সে হিসাবে, তত্ত্ব-
 শাস্ত্র—কহোঁক যোগ-শাস্ত্র; তত্ত্ব-সাধনা—যোগসাধনা। তত্ত্বের যে প্রধান অঙ্গ পঞ্চ-মকার—
 “মন্ত্রং মাংসঞ্চ মৎস্তঞ্চ মূত্রাং মৈথুনম্বেব চ;”—মন্ত্র, মাংস, মৎস্ত, মূত্রা ও মৈথুন, তাহার প্রকৃত
 তাৎপর্য্য কি?—কুলাদ্বৈত-তত্ত্বে এই পঞ্চ-মকার-সম্বন্ধে কি উপদেশ-মূলক কথাই লিখিত আছে।
 “মদ্যপানেন মনুষ্যো যদি সিদ্ধিঃ লভতে বৈ। মদ্যপানমভ্যাঃ সর্গে সিদ্ধিঃ পঞ্চম পামবাঃ।
 মাংসভক্ষণমাজেয়ং যদি পুণ্যাপতির্ভবেৎ। লোকে মাংসাশিনঃ সর্গে পুণ্যভাভো ভবতি হি।
 স্ত্রীসন্তোগেন দেবেশ যদি যোক্ষ্যে ভবতি বৈ। সর্গেহপি সন্তোবো লোকে মুখাঃ স্ত্রাঃ স্ত্রীনিবেশনাৎ।”
 ‘মদ্যপান করিলেই মানুষ যদি সিদ্ধি-লাভ করিত, তাহা হইলে মদ্যপান-মন্ত্র পাষাণগণ
 সকলেই তো সিদ্ধি-লাভ করিয়াছে। মাংসভক্ষণ-মাজেই যদি সপগতি লাভ হইত, তাহা হইলে
 মাংসাশী ব্যক্তি-মাজেই তো পুণ্যভাগী হইতে পারিত। স্ত্রী-সন্তোগই যদি যোক্ষ্যলাভ হইত,
 তাহা হইলে অগস্ত্যের সকল জীব-জন্তুই তো স্ত্রী-সন্তোগ দ্বারা মুক্তি-লাভ করিতে পারিত।’
 সত্যই তাই! তত্ত্বের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করিতে পারে না বলিয়াই মানুষ ভ্রান্ত-পথে
 প্রধাবিত হয়। নচেৎ, তত্ত্বের মধ্যে যে গভীর যোগ-তত্ত্ব নিহিত আছে, তাহার গূঢ় রহস্য
 উন্মোচন করিতে পারিলেই ইষ্ট-লাভে রূতকার্য্য হওয়া যায়। * যে পঞ্চ-মকারের দোহাই
 দিয়া তাত্ত্বিক-গণ বথেক্ষাচারী ব্যক্তিচার-পরায়ণ হয়, সেই পঞ্চ-মকারের প্রকৃত অর্থ সাধক-
 গণ কিরূপ নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন,—নিম্নে তাহার আভাস প্রদান করিতেছি। পঞ্চ-
 মকারের প্রথম তত্ত্ব—মদ্যপান। কিন্তু সে মদ্যপান অর্থ—সাধারণ মদ্যপান নহে। সে মদ্য,—
 ব্রহ্মানন্দ। ব্রহ্মরূপস্থিত সহস্র-কমল-দল-বিনির্গত সুধা-ধারা-পানে সাধকের যে মত্ততা,
 সে মদ্যপানে সেই মত্ততাই বুঝাইয়া থাকে। ‘আগমসারে’ স্পষ্টতঃই লিখিত আছে,—
 “সোমধারা করেৎ বাতু ব্রহ্মরূপাদ বরাননে। পীত্বানন্দময়ীং তাতঃ বঃ স এব মদ্যসাধকঃ।”
 পঞ্চ-মকারের দ্বিতীয় তত্ত্ব—মাংসভোজনও সাধারণ মাংস-ভোজন নহে। তাহার গূঢ় অর্থ,—
 মা—রসনা + অংশ; অর্থাৎ, রসনার অংশ—বাক্য; মাংসভক্ষণ—বাক্যরোধ বা মৌনাবলম্বন।
 “বা শব্দাহরণা জ্ঞেয়া তৎসংস্কৃত রসনা প্রিয়ে। সদা চ ভক্ষয়েদেব স এব মাংসসাধকঃ।”
 সে হিসাবে, রসনা-ভক্ষণ বা জিহ্বা-সঙ্কোচনাদি দ্বারা সাধকের যে কুথা-তুকা দূরীভূত হয়,—
 মাংস-ভক্ষণ অর্থে তাহাই বুঝাইয়া থাকে। পঞ্চ-মকারের তৃতীয় তত্ত্ব—মৎস্ত। সাধকের
 মৎস্ত-ভক্ষণ অর্থ—ভুক্তক-রোধ—নিবাস-প্রবাস-রোধ। পঞ্চ-মকারের চতুর্থ তত্ত্ব—মূত্রা।
 মূত্রা-ভক্ষণ অর্থ—জ্ঞান, তুকা, জ্ঞানি, ভদ্র, বৃণা, মান, লজ্জা, ক্রোধ—এই অষ্ট-মূত্রাকে
 আয়ত্ত করা;—ব্রহ্ম-জ্ঞানাদি দ্বারা তৎসমুদায়কে সুস্থিতি করিয়া ভক্ষণ করা। মূত্রা,—
 “শাশ্বতভুক্তভোগবিপদমুগমালম্ভাভিঘ্নাঃ। ব্রহ্মদ্রব্যমুখ্যঃ পরমুত্তমঃ চ জগদ্ভাবনঃ সন্দর্ভঃ।”
 পঞ্চ-মকারের পঞ্চম-তত্ত্ব—মৈথুন। এই মৈথুন অর্থ—কুখ্যা-সুখ্যা নৈকোপাধিচার নহে,

* জ্ঞান-সফলত্বী, কল্প-বাবল প্রভৃতি তত্ত্বে পঞ্চ-মকারের ব্যাখ্যা পরিকল্পিত আছে।

উচ্ছ্বাস নহে, সাধারণ জী-পুরুষের পরস্পর মিলন নহে। ইহার গূঢ় অর্থ—জ্ঞানের সহিত তত্ত্বের সংমিশ্রণ;—ব্রহ্মরূপিত সহস্রায়ের বিস্তার সহিত কুণ্ডলিনী-শক্তির মিলন।

“সহস্রারোগরি বিন্দো হওলাং মিললাং শিবে। বৈধুনং পরমং দিব্যং যতীনং পরিবর্তিতং।”

ইহার অধিক প্রগাঢ় যোগাভ্যাস,—ইহার অধিক প্রকটতর চিত্ত-বৃত্তি-নিরোধ—আর কি হইতে পারে? একটু অভিনিবেশ-সহকারে তত্ত্ব-শাস্ত্র আলোচনা করিলে, তত্ত্ব-শাস্ত্রের আরও এক গূঢ় লক্ষ্য আছে বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। সে লক্ষ্য—পরীক্ষার তুহানল। সে লক্ষ্য—সংসারের মধ্যে প্রলোভন-পরিবৃত্ত হইয়াও নিলিপ্ত-ভাব শিক্ষাদান। কলিকালে পঞ্চ-মকারের প্রাধান্য-প্রাবল্য হইবে, সুতরাং সেই সময়ে তৎসমুদায়ের সাধচর্য্যে থাকিবার ও তৎপ্রতি আসক্তিশূন্য হইতে হইবে;—তত্ত্বের ইহাও সার-সঙ্কল্প নহে কি? কাল-বশে বুদ্ধি-ভ্রংশ-হেতু তত্ত্বের সে নিগূঢ় তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, তত্ত্ব-মতের অহুসরণে তাত্ত্বিক হইতে গিয়া, মানুষ যদি মত্তপায়ী, মাংসানী ও ব্যভিচারী হয়—সে ক্রেটি তত্ত্বের নহে; সে ক্রেটি—অহুষ্ঠাতার বুদ্ধিভ্রংশের ও শিক্ষা-দীক্ষার বিষয়ময় ফল। তত্ত্বের স্পষ্টতাই লিখিত আছে,—“যাহারা সত্য দ্বারা পবিত্র-চিত্ত এবং জিতেল্লির হইয়া কুলাচার পালন করিবেন; যিনি দয়াশীল হইবেন; যিনি স্ব-পরীতে অহুসরুজ থাকিবেন;—কলি উাহাকে পীড়া দিতে পারিবে না।.....যে সকল কল্যাণ ব্রাহ্ম-বিবাহ দ্বারা বা শৈব-বিবাহ দ্বারা পরিশীলিত হইয়াছে, তাহারাই ভাৰ্য্যা; তত্ত্বের সমুদায়ই পর-স্ত্রী। সেরূপ স্ত্রীর প্রতি সকাম দর্শনে, সেরূপ স্ত্রীর সহিত নির্জনালাপে, সেরূপ স্ত্রীর সহিত সংসর্গে নানাবিধ প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যক এবং তত্ত্বজ্ঞ গুরুদণ্ড প্রাপ্ত। বিকৃত বা অঙ্গহীন করিয়া, রাজা ঐরূপ ব্যভিচারী ব্যক্তিদিগকে দোষ হইতে বহিষ্কৃত করিবেন। যেখানে গমন করিতে বা যাহার সহিত কথা কহিতে নিষেধ, কোনও কুলকামিনী সেইরূপ স্থানে গমন বা সেইরূপ ব্যক্তির সহিত কথাবার্তা কহিলেও, তাহার ভর্তা তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন।” * যে তত্ত্বের পর-স্ত্রী ও পর-কল্যাণের প্রতি সকাম দর্শনও প্রায়শ্চিত্তই ও দণ্ডই বলিয়া উক্ত হইয়াছে, সেই তত্ত্ব-শাস্ত্র পঞ্চ-মকারে মানুষকে উন্নত হইতে উপদেশ দিয়াছেন,—ইহা কখনই মনে করিতে পারা যায় না। কাল-বশে অর্থ-বিপর্য্যয় ঘটাইয়া, লোকে বিপ্লবগামী হইয়া পড়িয়াছে;—তাত্ত্বিকমতের ব্যভিচার ঘটাইয়াছে। ফলতঃ, প্রকারান্তরে যোগ-শিক্ষা দানই তত্ত্বের আদর্শ লক্ষ্য। নানা প্রলোভনের মধ্যে থাকিয়াও নিলিপ্ত অবস্থায় কিরূপে অবস্থিতি করিতে পারা যায়,—তাহা শিক্ষা দেওয়াই তত্ত্বের প্রধান উদ্দেশ্য। সাংখ্যিক, বৈশিষ্ট্যিক ও তামসিক—পঞ্চ-মকারের এই ত্রিবিধ সাধনার বিষয় তত্ত্ব উল্লিখিত আছে:—সাংখ্যিক-সাধনায় ব্রহ্মে আত্মলীন বা ব্রহ্মভাবে বিভোর; বৈশিষ্ট্যিক সাধনায় নৈবেদ্যাদি দ্বারা পূজার প্রাধান্য; এবং তামসিক সাধনায় উচ্ছ্বাসের ভাব। সবুজের রূপা প্রাপ্ত হইলে, তামসিক সাধনা হইতে ক্রমে ক্রমে সাংখ্যিক সাধনার পথে মানুষ পৌঁছিতে পারে। কিন্তু এক্ষণে প্রকৃত সাধকের অভাব, প্রকৃত শিক্ষার অভাব, যথাযোগ্য শাস্ত্র-জ্ঞানেরও অভাব, সুতরাং তত্ত্বের নামে প্রায়শঃই ব্যভিচার চালাইয়া থাকে।

* মহাবিশিষ্ট-তত্ত্বের অর্থ ও একাদশ উদ্ভাস হইয়া।

কর্ম্মানুষ্ঠান অমুসারে তাত্ত্বিকগণ ভিন্ন ভিন্ন আচারে বিভক্ত । সেই আচারের সংখ্যা কুলার্ণব-তন্ত্রের মতে—নয়টি ;—বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার, দক্ষিণাচার, সিদ্ধান্তাচার, বামাচার, অঘোরাচার, যোগাচার এবং কোলাচার । এতদ্ব্যতীত তাত্ত্বিক আচার । বেদাচার হইতে বৈষ্ণবাচার, বৈষ্ণবাচার হইতে শৈবাচার ইত্যাদি পর্যায়ক্রমে শ্রেষ্ঠ বলিয়া উক্ত হয় । সে হিসাবে, কোলাচারই সর্বশ্রেষ্ঠ ।

বেদাচার—প্রথম সোপান । নিয়মাত্মবস্তিতাই ইহার প্রধান অঙ্গ । নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া সম্পাদন পূর্বক গুরুপদেশ অমুসারে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে সাধন-পথে অগ্রসর হওয়াই—বেদাচারীর লক্ষ্য । বৈষ্ণবাচার—দ্বিতীয় সোপান । বেদাচার অমুসারে নিয়ম-তৎপর হইয়া, ভগবৎ-প্রেমে মগ্ন হওয়াই বৈষ্ণবাচারীর লক্ষ্যস্থানীয় । এই অবস্থায়, মৎস্ত-মাংসাদি পঞ্চ-মকার পরিবর্জনই প্রধান উদ্দেশ্য । শৈবাচার—তৃতীয় সোপান । এই অবস্থায়, বৈষ্ণবাচারের কমনীয়তার পরিবর্তে রাজসিক ভাবের উদ্ভব হয় । এই তিন আচার—শূদ্র, বৈশ্য এবং ক্ষত্রিয়ের আচার বলিয়া কথিত হয় । সাধনার চতুর্থ সোপান—দক্ষিণাচার । এই অবস্থায়, সাধক আদ্যাশক্তির পূজা করিবে ;—গায়ত্রী উপাসনায় রত হইবে । কলাকাজ্ঞা-বর্জনে নিলিপ্ত-ভাবে উপাসনাই এই সাধনার লক্ষ্য । সিদ্ধান্তাচার—পঞ্চম সোপান । এই অবস্থায়, সাধক জ্ঞান-মার্গে উপনীত হন,—ক্রমে তাঁহার ভেদ-জ্ঞান দূরীভূত হইতে থাকে । ষষ্ঠ সোপান—বামাচার । এই অবস্থায়, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি লোপ ; এই অবস্থায়, কুল, শীল, লজ্জা, ভয় প্রভৃতি অষ্ট-পাশ বন্ধন মোচন ; এই অবস্থায়, বামা হইয়া পরাশক্তির পূজা করিতে হয় ;—“বামাচারো ভবেত্তত্র বামাত্মা যজ্ঞেৎপরায় ।” অঘোরাচার—সপ্তম সোপান । ইহাকে কেহ কেহ ‘চীনাচার’ নামেও অভিহিত করিয়া থাকেন । এই অবস্থায়, সংসারের ঘোর কাটিয়া যায় ; সাম্প্রদায়িক ভেদ দূর হয় ; ঘৃণা, লজ্জা, কুল, শীল—সকল অস্তিত্বই লোপ পায় । সাধনার অষ্টম সোপান—যোগাচার । যোগ-সাধনই এই অবস্থায় প্রধান লক্ষ্য । এই অবস্থায়, ক্ষানবাসী হইয়া, মহাযোগী মহেশ্বরের স্তায় জীব যোগমগ্ন হয় । কোলাচার—নবম সোপান । এই অবস্থায়, সোহং ভাব । এখানে—দিক্-কাল নাই, নিয়ম নাই, নিষ্ठाশিষ্ট নাই, মান-অপমান নাই ; এখানে সকলই অভিন্ন,—সকলই এক ।

“নিকালনিয়মো নাস্তি তিথ্যাদিনিয়মো ন চ । নিয়মো নাস্তি দেবেশি মহামন্ত্রস্য সাধনে ।

কচিং শিষ্টঃ কচিং ভট্টঃ কচিং ভূতপিশাচবৎ । নানাবেশধরা কোলাঃ বিচরন্তি মহীতলে ।

কর্দমে চন্দনেহভিন্নং যিচ্ছে শত্রৌ তথা প্রিয়ে । আশানে ভবনে দেবি ভীষকাকনে তুণে ॥”

কদম-চন্দন নাই, শত্রু-মিত্র নাই, আশান-গৃহ নাই, স্বর্ণ-তুণ নাই, কোনও ভেদই নাই । এই নবমাচারের মধ্যে বঙ্গদেশে বামাচারের প্রাধান্যই লক্ষিত হয় । তন্ত্রের মতে,—কর্ম্মবোরে ঘুরিয়া ফিরিয়া সাধক যখন কোলাচারের পথে উপনীত হন, তখনই তাঁহার মোক্ষ-লাভ হইয়া থাকে । আচার নয় প্রকার হইলেও, তাত্ত্বিকগণের মধ্যে তিনটি ভাবের প্রাধান্য ;—পতুতাব, বীরতাব ও দিব্যতাব । ভাবত্রয়—হাসনিক বর্ষ । মোক্ষ বর্ষ পর্য্যন্ত মাজুকের পতুতাব, পঞ্চাশ বর্ষ পর্য্যন্ত বীরতাব, তৎপরে দিব্যতাব । দিব্য-ভাবই সর্বশ্রেষ্ঠ । সেই ভাবে কলাচার স্থাপন, সেই ভাবে মোক্ষপথে অগ্রসর । দিব্যতাব—

কৌশাচারীর অঙ্গ-বিশেষ । তাবের মধ্যে আবার অভিধেয় আছে । অভিধেয় অষ্টবিধ ;—
পূর্ণাভিধেয়ক হইলেই মানুষ শিবসামুজ্জা প্রাপ্ত হয় । * পক্ষান্তরে আবার, তন্ত্রে ঐত্যাঐত উভয়
তাবই প্রকটিত । শিব-শক্তি সংজ্ঞা—সেই উভয় তাবের দ্যোতক । তাই তন্ত্রে দেখিতে
পাই,—কখনও শক্তির উপাসনার, কখনও শিবের উপাসনার, কখনও শক্তিরূপিনী দেবীর
উপাসনার, কখনও শিবরূপী দেবদেব মহাদেবের উপাসনার, মাহাত্ম্য পরিকীর্তিত হইয়াছে ;
কখনও বা তন্ত্র নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন,—তিনি এক, তিনি অষ্টতীয়, তিনি সত্য, তিনি
সজ্জপ, তিনি পরাংপর, তিনি স্ব-প্রকাশ তিনি সর্বদা পূর্ণ ও সচ্চিদানন্দস্বরূপ । †

“স এক এব সজ্জপঃ সত্যোঽষ্টতৈঃ পরাংপরঃ । স্বপ্রকাশঃ সদাপূর্ণঃ সচ্চিদানন্দস্বরূপঃ ॥”

তবেই বুঝা যায়,—সেই বেদ, সেই উপনিষৎ, সেই দর্শন, সেই পুরাণ,—তন্ত্রের মধ্যে
কেমন ওতঃপ্রোতঃ-ভাবে অবস্থিত ! আগম ও নিগম-ভেদে তন্ত্র-শাস্ত্র দ্বিবিধ । দেবাদিদেব
মহাদেব যে তন্ত্রের বক্তা, তাহাই আগম-শাস্ত্র নামে অভিহিত ; আর, মহাদেবী ভগবতী
যে তন্ত্র বিবৃত করিতেছেন, তাহাই নিগম-শাস্ত্র ।

সৃষ্টি-তত্ত্ব সম্বন্ধেও দর্শনে, পুরাণে বা তন্ত্রে বিশেষ কোনই পার্থক্য দেখিতে পাই না ।

তন্ত্রেও সেই মহত্ত্ব, তন্ত্রেও সেই পরমাণু-তত্ত্ব, তন্ত্রেও সেই পঞ্চ-মহাত্ম-কথা ; তন্ত্রেও

সেই কর্মানুসারে স্বর্গ নরক-লাভ-প্রসঙ্গ । তন্ত্রেও লিখিত আছে,—

তন্ত্র-সম্বন্ধে

বিবিধ বক্তব্য ।

আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে সূর্য্য, সূর্য্য হইতে জল, জল হইতে

পৃথিবী,—এইরূপে পঞ্চভূতাত্মক ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছিল । তন্ত্রেও

লিখিত আছে,—যে যেরূপ পাপ-পুণ্যের অমুর্গান করে, তাহার সেইরূপ স্বর্গ-নরক ভোগ
হয় । তন্ত্রেও লিখিত আছে,—জলৌকা যেমন তৃণ হইতে তৃণান্তরে গমন করে, জীবও

সেইরূপ দেহ হইতে দেহান্তরে আশ্রয় লয় ; সে যেমন একটী আশ্রয় প্রাপ্ত না হইলে,

পূর্বাশ্রয় ত্যাগ করে না, জীবও সেইরূপ দেহান্তরের আশ্রয় না পাইলে, দেহ পরিত্যাগ

করে না । জন্ম-মৃত্যু-তত্ত্ব-প্রসঙ্গে দেবী চণ্ডীকার নিকট মহাদেব তাহাই বলিতেছেন ;—

“ইহ যৎ ক্রিয়তে কর্ণ তৎপরজোপভূজাতে । জীবন্তুজলৌকেব দেহদেহান্তরং ব্রজেৎ ॥

সংপ্রাপ্য চোত্তমং দেহং দেহং তাল্লভি পূর্নকর্ম্ম ॥ ইতি ক্রমো চ সা চণ্ডী পপ্রচ্ছ পরমেশ্বরম্ ॥”

প্রকৃতি হইতেই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, আবার প্রকৃতিতেই তাহার লয়,—নির্বাণ-তন্ত্রে

সুন্দর উপমায় তাহা এইরূপ-ভাবে তন্ত্রকার পরিবর্ণন করিয়া গিয়াছেন,—

“প্রকৃত্যায়তে সর্বং প্রকৃত্যায়তে জগৎ । তোয়াত্তু বুদ্ধবুদ্ধং দেবী যথা তোরে বিলীয়তে ॥” -

জল হইতে যেমন বুদ্ধবুদ্ধ উৎপন্ন হয়, আবার জলেই তাহা বিলীন হইয়া যায়, প্রকৃতি

হইতে তদ্রূপ সংসারের উৎপত্তি, আবার প্রকৃতিতেই তাহার লয় । তন্ত্র-সম্বন্ধে বলিতে

গেলে, আরও অনেক কথা বলিতে হয় । চক্রগুহ্য, সাধক-সাধিকা, গুরু, বীক্ষা, যন্ত্র,

বীজ-সংকেত,—তন্ত্রের কত অঙ্গ, কত প্রক্রিয়া । এই তন্ত্র অনুসারেই অমূল্য দেব-দেবীর পূজা

হইয়া থাকে ; এই তন্ত্র অনুসারেই হিন্দুর গৃহ-ধর্ম্ম নির্দিষ্ট হইয়াছে ; এই তন্ত্র শাস্ত্র

করিয়াই বাঙ্গালার ব্রাহ্মণমাজ্রেই আজি পর্য্যন্ত শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া থাকেন । সংকার

* পূর্ণাভিধেয়ক বিবরণ মহানির্বাণ-তন্ত্র, দশম উল্লাস শ্লোক ।

† মহানির্বাণ-তন্ত্র, নিত্যাতন্ত্র, প্রাশস্তোত্রবিলী-তন্ত্র, কুলার্ণব-তন্ত্র প্রভৃতিতে একবিধের আলোচনা আছে ।

প্রকৃতি নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়া-পরম্পরাও অনেক স্থলে এখনও তত্ত্ব অনুসারে নিক্ষেপিত হয়। দীক্ষার তত্ত্বের বীজ-মন্ত্র (ক্রীং, হ্রীং, হ্রাং ইত্যাদি), গ্রহ-শাস্তিতে বীজ-মন্ত্র (শাং, ঙ্গং, ত্রীং ইত্যাদি), পকামৃত ভক্ষণেও বীজ-মন্ত্র (ক্রীং, ত্রীং প্রভৃতি)। প্রতি দেবতার আরাধনারও গুহ্য-ভাবে অন্তরে অন্তরে ঐরূপ বীজমন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়;—

“শাং শীং শূং শৈং ততঃ শৌংশঃ শুক্রমন্ত্রঃ সনীরিতঃ। হ্রাং হ্রাং হ্রীং হ্রীং সর্গপত্নীং বিজ্ঞাবয় পদধরম্।

মার্ত্তওম্নবে গম্ভীরাং নমো মন্ত্রঃ শট্টৈশ্চরে।

রাং হ্রৌং জৈং হ্রীং সোমশক্তো শক্তনু বিধংসধরম্। রাহবে নম ইত্যেব রাহোর্ধ্বকুন্দাততঃ।”

শুক্রমন্ত্র,—শাং শীং শূং শৈং এবং শৌং শঃ ; শট্টৈশ্চরের মন্ত্র,—‘হ্রাং হ্রাং হ্রীং হ্রীং সর্গপত্নীং বিজ্ঞাবয় বিজ্ঞাবয় মার্ত্তওম্নবে’ পরে ‘নমঃ’ ইত্যাদি। এই বীজ-মন্ত্রের এক একটি শব্দের মন্ত্র-সম্বন্ধ বা নিগূঢ় অর্থ আছে। ‘হ্রীং’ শব্দ ভুবনেশ্বরী-মন্ত্রের বীজ। কিন্তু ঐ বীজ-মন্ত্রের অন্তর্গত ‘হ’ বর্ণে নকুলীশ মহাদেব, ‘র’ বর্ণে অগ্নি, ঙ্গ বর্ণে বামনেন্দ্র, ৬ বর্ণে অর্দ্ধচন্দ্র। ফলতঃ, হ্রীং শব্দে চতুর্বিধ শক্তির সমাবেশ বুঝায়। তত্ত্ব-মতে, বিগুহ্যভাবে বিধিপূর্বক মন্ত্রোচ্চারণ করিলে, সর্ব আপদ দূরীভূত হয়। তত্ত্ব-শাস্ত্র বলেন—ওকৃতর যে ব্রহ্মশাপ, ‘ওঁ বাং বাঁ বूं বৈ বৌ বঃ ব্রহ্মশাপবিমোচিতায়ৈ স্থধা দেবৈা নমঃ’—এই মন্ত্রটী তিনবার উচ্চারণ করিলে, সেই ব্রহ্মশাপ হইতেও মুক্তিলাভ করা যায়। অথর্ব-সংহিতায় এবং অগ্নিপুরাণ প্রভৃতিতে ঐরূপ মন্ত্র-মাহাত্ম্যের কথা লিখিত আছে। ঐ সকল মন্ত্রে প্রত্যেক ফল এখন যে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তাহার কারণ, অনেকে বিশ্বাস করেন,—মন্ত্রোচ্চারণে দোষ হয়, এবং আত্মবঙ্গিক প্রক্রিয়ায় বিঘ্ন ঘটে। তত্ত্ব-শাস্ত্র-সমূহের রচনার কাল-সম্বন্ধে এখন সময় সময় নানা বিতণ্ডা উপস্থিত হয়। তত্ত্ব-শাস্ত্র-সমূহকে অনেকে নিতান্ত আধুনিক—এমন কি, ঐ সমুদায় ভারতে মুসলমান-অধিকারের সমসময়ে প্রণীত হইয়াছিল—বলিয়া উল্লেখ করেন। কিন্তু বস্ততে তাহা নহে। হইতে পারে,—তত্ত্ব-সম্বন্ধে কোনও কোনও গ্রন্থ আধুনিক রচনা; কিন্তু উহার মূল-তত্ত্ব বহু দিন হইতেই অব্যাহত আছে। যদিও সকল ‘তত্ত্ব’-শব্দটির উল্লেখ সকল প্রাচীন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু তত্ত্বান্তর্গত মন্ত্র যে প্রাচীন, তাহা বলাই বাহুল্য। পূর্বেই বলিয়াছি, অথর্ববেদে ঐ মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। উপনিষদের মধ্যে নৃসিংহতাপস্ব্যাপনিষদে তাত্ত্বিক মন্ত্র-সমূহ রূপান্তরে উল্লিখিত হইয়াছে। বৌদ্ধদিগের কতকগুলি তত্ত্ব, খ্রীষ্টীয় নবম ও একাদশ শতাব্দীর মধ্যে তিব্বতীকৃত ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। সে সকল তত্ত্ব যে হিন্দু-তত্ত্ব-শাস্ত্র-সমূহের অন্তর্ভুক্ত রচিত হয়, তাহাতে কোনই সংশয় নাই। ভৈরব-ভৈরবী, যোগিনী-ডাকিনী, চণ্ডী-তারার প্রভৃতির উপাসনা বৌদ্ধ-তত্ত্বেও দৃষ্ট হয়। সাধনার অস্ত্রান্ত্র প্রণালীও, অধিক কি ওম-বিষয় অনধিকারীর নিকট প্রকাশ করিতে নাই—এই তত্ত্বটা পর্য্যন্ত, বৌদ্ধ-তত্ত্বে সমিধিষ্ট আছে। বশিষ্ঠ, জৈমিনি, যাজ্ঞবল্ক্য, শুক্ল, বৃহস্পতি, নারদ, ভার্গব প্রভৃতি ঋষিগণের রচিত কতকগুলি উপতত্ত্ব ছিল, তাহারও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মহাসংহিতার রীকার বুদ্ধ কতট লিখিয়া গিয়াছেন,—‘বৌদ্ধের মন্ত্র-সমূহ প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত; বৈদিক ও তাত্ত্বিক।’ সুতরাং বুঝা যায়,—তত্ত্ব-মত আবহমান-কাল হইতেই প্রচলিত ছিল।

পরবর্ত্তি-কালে ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতগণ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উহা গ্রহণকারে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। পুরাণাদিতে যেরূপ কালবশে নানা বিপর্যয় ঘটিয়াছে, তদ্বৎ সেইরূপ আধুনিক বিষয়-পরম্পরা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ভাষান্তরে রচিত হওয়ায়, সেইরূপ আধুনিক বিষয়-পরম্পরার সন্নিবেশ সম্ভাবনা। তদ্বৎ কদর্য বা পঙ্ক-মকারে ব্যাভিচারিত্বের প্রশ্রয়—বুদ্ধি-বিপর্যয়ের ফল ভিন্ন অথ আর কি হইতে পারে? নিঃশ্রেয়স মুক্তিলাভ যে শাস্ত্রের উদ্দেশ্য, সে শাস্ত্রে কখনই ব্যাভিচার বা উচ্ছৃঙ্খলার প্রশ্রয় দেওয়া সম্ভবপদ নহে। তন্ত্র-শাস্ত্র তাই পুনঃপুনঃ উপদেশ দিয়াছেন,—উপর্যুক্ত গুরু ভিন্ন কাহারও নিকট তন্ত্র-দীক্ষা গ্রহণ করিও না। সে গুরু আবার কেমন হইবেন, তন্ত্র তাহাও বলিয়া দিয়াছেন;—

“শাস্ত্রোদান্তঃ কুলীনশচ শুদ্ধান্তঃকরণঃ সদা । পঞ্চভুজার্জকো যন্ত সঙ্গুরু স প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥

পরমার্থে সদা দৃষ্টিঃ পরমার্থে প্রকীৰ্ত্তিতম্ । গুরুপাদাধুজে ভক্তির্দীপ্তব সৎসংকঃ স্মৃতঃ ॥”

শিষ্টও আবার সেইরূপ হওয়া আবশ্যক। গুরু যেমন শান্ত, দান্ত, কুলীন ও শুদ্ধান্তঃকরণ হইবেন, শিষ্যকেও সেইরূপ শুদ্ধাত্মা, সংকুলোদ্ভব, বেদপাঠরত ও পিতৃ-মাতৃ-হিতপরায়ণ হইতে হইবে। কি শান্ত, কি শৈব, কি বৈষ্ণব,—গুরুকরণ-সম্বন্ধে সকলেরই সেই একই মত। আপনাপন উপদেষ্টা গুরুর ‘প্রণাম-মন্ত্র’ সকলেই সমস্তরে উচ্চারণ করিয়া থাকেন,—

“অণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং বেন চরাচরম্ । তৎপদং দর্শিতং যেন তন্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

অজ্ঞানতিমিরাক্তস্ত জ্ঞানাগ্নিশলাকর্য । চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তন্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥”

তাত্ত্বিক পূজা-পদ্ধতি (কালী-পূজা, জগদ্ধাত্রী, পূজা প্রভৃতি), অনেকের বিশ্বাস, অতি আধুনিক-কালে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যখন কৃষ্ণনগরের রাজ-সিংহাসনে অধিরূ, তখন নবদ্বীপে তাত্ত্বিক-মতাবলম্বী আগম-বাগীশ

তাত্ত্বিক

পূজা-পদ্ধতি।

পণ্ডিতের বিশেষ প্রাচুর্য্য। তিনি রাজ-বাটীর সভা-পণ্ডিত ছিলেন। তাহারই প্রভাবে গৌরঙ্গ-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-পরিপ্লাবিত নবদ্বীপে

শক্তি-পূজা প্রতিষ্ঠিত হয়। বীপারিতা শ্রামা-পূজার এবং জগদ্ধাত্রী-পূজার তিনিই প্রবর্ত্তনা করিয়াছিলেন বলিয়া কিংবদন্তী আছে। কিন্তু, বাস্তবপক্ষে বহু-পূর্ব হইতেই এদেশে শক্তি-পূজা প্রচলিত ছিল। শুভ-নিশুভ-বন্দের সময় কালীমূর্ত্তির প্রাধাত্য পরিকীৰ্ত্তিত আছে; বিধামিত্র-ঋষি ব্রাহ্মণ-লাভের জন্ত দক্ষিণা-কালিকার বীজ-মন্ত্র জপ করিয়া ছিলেন; বসিষ্ঠ-দেবের নিকট তারা-মূর্ত্তির আবির্ভাব হইয়াছিল;—শাস্ত্রে অবশিষ্ট উল্লেখ আছে। দক্ষিণা-কালী, সিদ্ধ-কালী, উগ্র-কালী, গুহা-কালী, ভদ্র-কালী, শ্রাশান-কালী, মহাকালী, চামুণ্ডা-কালী—এই অষ্টবিধা কালীমূর্ত্তির ধ্যান ও বর্ণনা, তন্ত্র ও পুরাণাদিতে দৃষ্ট হয়। সুতরাং শক্তি-পূজা-পদ্ধতি বহুদিন হইতেই প্রচলিত ছিল বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। তবে যে আগম-বাগীশ বা কৃষ্ণচন্দ্রকে শ্রামা-পূজা ও জগদ্ধাত্রী-পূজার প্রবর্ত্তক বলিয়া লোকে সাধারণতঃ বিশ্বাস করিয়া থাকে; তাহার কারণ,—বৈষ্ণব-প্রাধাত্যের মধ্যেও গৌরঙ্গের জন্মভূমি নবদ্বীপে সেই সময় শক্তি-পূজা পুনঃ-প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। নাটোরের রাজ-বংশ এবং কৃষ্ণনগরের রাজ-বংশ বহুদিন হইতেই তাত্ত্বিক-মতাবলম্বী ছিলেন। উত্তর-বঙ্গ ও পূর্ব-বঙ্গ, নাটোর-রাজবংশের আদর্শানুসারে পরিচালিত হইত; এবং দক্ষিণ-বঙ্গ ও পশ্চিম-বঙ্গ, কৃষ্ণনগরের অনুশাসন মাত্র করিয়া চলিত। যে সময়ে আগম-বাগীশ কর্তৃক শক্তি-পূজা-প্রতিষ্ঠার কথা উল্লিখিত হয়, তৎকালে নাটোর-রাজ-ভরনেও শক্তি-পূজার প্রাধাত্য ছিল। ঐ পূজা-পদ্ধতি পূর্বকাল হইতেই প্রচলিত না থাকিলে, নাটোর যে কৃষ্ণনগরের অনুসরণ করিয়া ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিবেন,—তাহা কখনই মনে হয় না। ফলতঃ, সংসারে এক এক সময়ে যে এক এক ভাব-প্রবাহ প্রবাহিত হয়, তাহারই কালে, মুসলমান-শাসনের সর্ব্বত্র, বঙ্গদেশে একবার তাত্ত্বিক-ধর্ম্ম জাগিয়া উঠিয়াছিল। পূর্ব-যুতি বিস্তৃত হওয়ায়, লোকে তাহাকেই আদি জাগরণ বলিয়া মনে করে মাত্র।

উ নব্বিশ পরিচ্ছেদ ।

রামায়ণ ।

[রামায়ণ,—নারদ-বাক্যিক সংবাদে রামায়ণের সার-মর্ম্ম;—প্রসঙ্গতঃ বহু বংশের ও বিবিধ আচার-পদ্ধতির পরিচয়,—অযোধ্যা-রাজ্যের উন্নতির চিত্র;—রামায়ণ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থের আলোচনা;—যোগবাশিষ্ঠ, পদ্ম-পুরাণ, অধ্যাত্ম-রামায়ণ, দেবী-ভাগবত প্রভৃতিতে রামায়ণ-প্রসঙ্গ;—কৃষ্ণবাস প্রভৃতির কারণে রামায়ণের প্রাপ্তির;—রামায়ণের শিক্ষা—পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃভক্তি, সন্তা-পরায়ণতা প্রভৃতির আদর্শ-চরিত্র;—রামায়ণের প্রাচীনত্ব, রামায়ণে অক্ষিপ্ত,—রামায়ণের সময়ে মহাভারতের অন্তিম বিধরে আলোচনা, —রামায়ণ-সম্বন্ধে পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের মত বক্তব্য ।]

রামায়ণ—ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের প্রধান অঙ্গ । রামায়ণে ভারতবর্ষের এক সময়ের ইতিহাস ওতঃপ্রোতঃ বিজড়িত রহিয়াছে । অযোধ্যার অধিপতি শ্রীরামচন্দ্র

যৎকালে রাজ্যভার প্রাপ্ত হন, রামায়ণ সেই সময়ে রচিত হইয়াছিল ।

রামায়ণের
সার-মর্ম্ম :

সুতরাং, রামায়ণে রাম-রাজত্বের এবং তাৎকালীন ভারতবর্ষের প্রকৃষ্ট

চিত্র প্রকটিত রহিয়াছে । তপোনিষ্ঠ বায়ীকি, স্বাধ্যায়নিরত মুনিশ্রেষ্ঠ

বাণিপ্ৰবর নারদকে জিজ্ঞাসা করেন,—“ভূমণ্ডলে এমন রাজা কে আছেন, যিনি শূণ্যবান্, জ্ঞানবান্, বীৰ্য্যবান্, সত্যনিষ্ঠ, দূতব্রত, জিতেন্দ্রিয়, শক্রমর্দ্দন ?” মহর্ষি নারদ তদুত্তরে রাম-চরিত্র কীর্তন করেন । ইহাই রামায়ণের মূল ভিত্তি । সেই ভিত্তি অবলম্বন করিয়াই ব্রহ্মার বরে বায়ীকি রামায়ণ-রচনায় প্ররম্ব হন । কথিত হয়, তাঁহার বাক্যই প্রথম-শ্লোক ; এবং তাহাই সংস্কৃত-ভাষার আদি-কবিতা । সাধারণতঃ প্রচার,—রাম-জন্মের ষষ্টিসহস্র বৎসর পূর্বে রামায়ণ রচিত হইয়াছিল । কিন্তু রামায়ণে তাহার কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় না ; পরন্তু, রামায়ণের আদিকাণ্ডে বায়ীকির উক্তিতে আমরা দেখিতে পাই,—

“প্রাপ্তরাজ্যস্ত রামস্ত বায়ীকির্ভগবানুবিঃ । চকার চরিতং কৃৎস্নং বিচিত্রগদমর্থবৎ ॥”

রামচন্দ্র রাজ্যলাভ করিলে পর, মহর্ষি বায়ীকি বিজিহ্ম-পদসমন্বিত রাম-চরিত্র বর্ণন করেন । ঐ স্থলে আরও দেখিতে পাই,—প্রথমতঃ তাঁহার রামায়ণ আদি, অযোধ্যা, অরণ্য, কিস্কিন্ধ্যা, সুন্দর ও লঙ্কা—এই ছয় কাণ্ডে পঞ্চমত সর্গে বিভক্ত ছিল ; এবং চতুর্বিংশতি সহস্র শ্লোকে সম্পূর্ণ হইয়াছিল ; পরিশেষে তিনি উত্তর-কাণ্ড লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন । এই উত্তর-কাণ্ডের আলোচ্য বিষয় ধ্যানযোগে অবগত হইয়া ঘটনার পূর্বেই মহর্ষি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন,—একপণ্ড প্রচার আছে । কুশী ও লবকে বায়ীকি স্ব-রচিত রামায়ণ-গ্রন্থ শিক্ষা দিয়াছিলেন । গালক-বয় মধুর স্বরে, ষড়্ভুজ মধ্যম প্রভৃতি সঙ্গসম্মুখে, বীণালয়ে বীভৎস-শৃঙ্গার-করুণ-হাস্ত-রৌদ্র-ভয়ানক-বীর প্রভৃতি রস-সংযোগে, তাহা গান করিতেন । শ্রীরামচন্দ্রের অধমেষ বজ্জ

কুশীলব বামায়ণ গান করিয়াছিলেন ; সেই হইতেই বামায়ণ গৃহে গৃহে প্রচারিত হয় ।
প্রথমে মহর্ষি নারদ বায়্যাকির নিকট সংক্ষেপে যে বামায়ণী-কথা কহিয়াছিলেন, বামায়ণের
সার-মর্ম্ম কি সুন্দর-ভাবেই তাহাতে বিবৃত আছে । মহর্ষি নারদ বায়্যাকিকে বলিতেছেন,—

“জ্যোতিঃ প্রোক্তং যৈতু ভুং প্রিয়ং দশরথঃ সূতম্ । একতীর্নং হিতৈযু ভুং প্রকৃতি প্রিয়কাষ্যায় ॥
যৌবরাজ্যেন সংযোক্তু মৈচ্ছং প্রীত্যা মহীপতিঃ । তজ্জাতিবেকসম্ভারান্ দৃষ্টা ভাৰ্য্যাং কৈকেয়ী ॥
পূৰ্ণ দত্তবরা দেবী বরমেনমযাচত । বিবাসনঞ্চ রামস্ত ভরতজাতিষেচনম্ ॥
স সত্যবচনাজ্জা বধ্মপাশেন সংযতঃ । বিবাসন্যাস সূতং রামং দশরথঃ প্রিয়ম্ ॥
স জগাম বনং বীরঃ প্রতিজ্ঞায়ুপালয়ন্ । পিতৃকৃতনির্দেশাৎ কৈকেয়্যাঃ প্রিয়কারণাৎ ॥
তং ব্রজন্তং প্রিয়ো জাতা লক্ষণোহুজগাম হ । স্নেহাধিনয়সম্পন্নঃ সুমিত্রানন্দবর্দ্ধনঃ ॥
জাতরং দয়িতো জাতুঃ সৌজ্ঞায়নত্পদশয়ন্ । রামস্ত দয়িতা ভাৰ্য্যা নিভ্যাং প্রাণসমা হিতা ॥
জনকস্ত কুলে জাতা দেবমায়ৈব নির্দ্দিতা । সৎলক্ষণসম্পন্নানী গায়ুতবা বধুঃ ॥
সীতাপ্যত্মসুতা রামং শশিনং রোহিণী যথা । পৌত্রৈরহুগতো দূরং গিজা দশরথেন চ ॥
শূক্বেবপুৰে সূতং গন্ধাকুলে বাসজ্জয়ৎ । গুহনাসাদ্য বধ্মাজ্জা নিবাদাদিপিতিং প্রিয়ম্ ॥
গুহেন সাহতো রামো লক্ষণেন চ নীতয়া । তে বনেন বনংগতা নদীতীৰ্থা বহুদকাঃ ॥
চৈত্রকূটমুপ্রাপ্য ভরতাজস্ত শাসনাৎ । রম্যমাবসথং কৃৎস্না রমমাণা বনে জয়ঃ ॥
দেবগন্ধারসক্কাণ্ডজ্ঞেভে স্তবসন্ সূখম্ । চৈত্রকূটং গতে রামে পুত্রশোকাতুরস্তথা ॥
রাজা দশরথঃ স্বৰ্গং জগাম বিলপন্ সূতম্ । গতে তু তস্মিন্ ভরতো বসিতপ্রযুৎস্বিহিতৈঃ ॥
নিযুক্ত্যবানো রাজ্যায় বৈচ্ছদ্রাজ্যং মহাবলঃ । স জগাম বনং বীরো রামপাদপ্রসাদকঃ ॥
গতা তু স মহাত্মানং রামং সত্যপরাক্রমম্ । অযাচ্ছদ্রাতরং রামনাথ্যভাবপূরঙ্কৃতঃ ॥
অম্বেব রাজা বধ্মজ ইতি রামং বচোহব্রবীৎ । রামোহপি পরবোদারঃ সুবুধঃ সুমহাবশাঃ ॥
ন চৈচ্ছৎ পিতৃবাদেশাজ্জাং রামো মহাবলঃ । পাদুকে চান্ত রাজ্যায় স্তাত্ৰং দত্তা পুনঃপুনঃ ॥
নিবর্ত্তয়ামাস ততো ভরতং ভরতাগ্রজঃ । স কাময়নবাণ্যেব রামপাদবুৎপূশন্ ॥
নন্দিত্র্যামেহকরোজ্জাং রামাগমনকাজ্জয়া । গতে তু ভরতে প্রীমান্ সত্যসকো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥
রামস্ত পুনরালক্ষ্য নাগরস্ত জনস্ত চ । তজ্জাগমনমেকাগ্রো দণ্ডকান্ এবিবেশ হ ॥
এবিস্ত তু মহারণ্যং রামো রাজীবলোচনঃ । বিরোধং রাক্ষসং হতা শরভজং দদর্শ হ ॥
সুতীক্ষ্ণকাপ্যগত্যক অগন্ত্যজাতরং তথ । অগন্ত্যবচন্যঃ স্তেব জয়াহৈচ্ছৎ শরাসনম্ ॥
বধ্মনঃ পরমং প্রীতস্তু গী চাক্ষয়সায়কো । বসতন্তু রামস্ত বনে বনচরৈঃ সহ ॥
কবরোহিত্যাগনন্ সৰ্কে বধায়াসুররক্ষসান্ । স তেবাং প্রতিশ্রাব রাক্ষসানাং তদা বনে ॥
প্রতিজ্ঞাতস্ত রামেন বধঃ সংঘতি রক্ষসাম্ । শ্বিণবার্ময়িকল্পানং দণ্ডকারণ্যবাসিনাম্ ॥
তেন তঃপ্রব বসতা জনস্থাননিবাসিনী । বিরূপিতা শূৰ্পণখা রাক্ষসী কামরূপিনী ॥
ততঃ শূৰ্পণখা ক্যাহুৎসুকান্ সৰ্করাক্ষসান্ । ধরং ত্রিশিরসকৈব দুৰ্গণ্ডৈব রাক্ষসম্ ॥
নিজস্থান রণে রামস্তেবাকৈব পদাশ্রয়ান্ । বনে তদ্বিগ্নিবসতা জনস্থাননিবাসিনাম্ ॥
রক্ষসং নিহতাজ্জানন্ সহস্রাণি চতুর্দশ । ততো জাতিবধং কৃৎস্না রাবণঃ ক্রোধবদুজ্জিতঃ ॥
নহায়ং বরদামাস যারীচং নাম রাক্ষসম্ । বাৰ্য্যমাণঃ সুবহুশো যারীচেন স রাবণঃ ॥
ন বিরোধো বলবতা কন্যো রাবণ তেন তে । অদ্যাতু তু ততাক্যং রাবণঃ কালচৌবিতঃ ॥
অগাম সহযারীচন্তজ্ঞানপদং তদা । তেন যার্য্যাবিনা দুৰ্ঘমপরাহ ব্রূণাত্তজো ॥
অহাং তাক্যং রামস্ত গুহং হতা জটায়ুসম্ । গৃহক নিহতঃ দৃষ্টা স্ততাং কৃৎস্না চ বৈদীৰ্য্য ॥

রামঃ শোকসন্তপ্তো বিললাপাকুলেন্দ্রিয়ঃ । ততন্তেনৈব শোকেন গুহ্যং দক্ষা জটীহুবম্ ॥
 মার্গমাণো বনে সীতাং রাক্ষসং সন্দর্শয় ॥ কবন্ধং নাম রূপেণ বিকৃতং যোরদর্শনম্ ॥
 তং নিহত্য মহাবীৰ্জদাহ স্বর্গভ্রষ্ট সঃ ॥ স চাস্য কথয়ামান শবরীং ধর্মচ্যবিনীম্ ॥
 শ্রমণীং ধর্মনিপুণামাভিগচ্ছতি রাঘব ॥ সোহভ্যাগচ্ছগৃহাতেজাঃ শবরীং শক্রমুদনঃ ॥
 শুবধ্যা পূজিতঃ সম্যক্ রাঘো দশরথায়াজঃ ॥ পশ্পাভীরে হুমুতা সঙ্গতো বানরেণ হ ॥
 হনুমদ্বচনাক্ষেব সুগ্রীবেণ সমাগতঃ ॥ সুগ্রীবায় চ তৎ সর্বং শংসদ্রামো মহাবলঃ ॥
 আদিতস্তৎ বথাব্রুতং সীতায়ান্ত বিশেষতঃ ॥ সুগ্রীবশ্চাপি তৎ সর্বং ক্রভা রামস্ত বানরঃ ॥
 চকার সখ্যং রামেণ প্রীতশ্চৈবাগ্নিসাক্ষিকম্ ॥ ততো বানরাজেন বৈরাগু কথনং প্রতি ॥
 রামায়্যাবেসিতং সর্বং অণয়াদুখিতেন চ ॥ প্রতিজ্ঞাতঞ্চ রামেণ তদা বালিবধং প্রতি ॥
 বালিনশ্চ বলং তত্র কথয়ামাস বানরঃ ॥ সুগ্রীবঃ শক্তিশচাসীন্নিত্যং বীর্যেণ রাঘবে ॥
 রাঘবপ্রত্যয়ার্থস্ত দ্বন্দ্বভেদে কায়মুক্তমম্ ॥ দশরামাস সুগ্রীবো মহাপরীতসন্নিভম্ ॥
 উৎসরিয়া মহাবাহুঃ প্রেক্ষ্য চাহ্নি মহাবলঃ ॥ পাদানুষ্ঠেন চিক্কেপ সম্পূর্ণং দশযোজনমম্ ॥
 বিভেদ চ পুনস্তালান্ সৈণ্ডকেন মহেযুগা ॥ গিরিং রসাতললৈব জনয়ন্ প্রত্যয়ং তদা ॥
 ততঃ প্রীতমনান্তেন বিশ্রুতঃ স মহাকপিঃ ॥ কিস্কিন্ধ্যাং রামসহিতো জগাম চ গুহ্যং তদা ॥
 ততোহগর্জজ্বরবরঃ সুগ্রীবো হেমপিঙ্গলঃ ॥ তেন নাদেন মহতা নিরুজ্জগাম হরীশ্বরঃ ॥
 অনুরাগ্য তদা তারং সুগ্রীবেণ সমাগতঃ ॥ নিজঘান চ তত্ৰৈব শরৈর্গণেকেন রাঘবঃ ॥
 ততঃ সুগ্রীববচনাক্রভা বালিনমাক্ৰবে ॥ সুগ্রীবমেব তদ্রাজ্যে রাঘবঃ প্রত্যাগাদয়ৎ ॥
 স চ সপ্তানু সমানীয বানরান্ বানরর্ষভঃ ॥ দিশঃ প্রস্থাপয়ামাস দিদ্ভুজ্জেনকাশ্রয়াম্ ॥
 ততো গৃহস্ত বচনাং সম্প্রদেহ্নমান্ বলী ॥ শতযোজন বিস্তীর্ণং পুঙ্গুবে লবণার্ণবম্ ॥
 তত্র লঙ্কাং সমাসাদ্য পুরীং দ্রাবণপালিতাম্ ॥ দদর্শ সীতাং ধ্যায়ন্তীমশকোবনিকাগতাম্ ॥
 নিবেদয়িত্বাভিজ্ঞানং অনুত্তিঃ শিন্বেদ্য চ ॥ সমাশ্রিত্য চ বৈদেহীং মর্দয়ামাস তোরণম্ ॥
 গচ্ছ সেনাশ্রণান্ হস্তা সপ্ত মস্ত্রহুতানপি ॥ শ্রমক্ষঞ্চ নিশ্চিন্ত্য গ্রহণং সমুপাগমৎ ॥
 অগ্নেগোমুক্তমায়ানং জ্ঞান্না পৈতামহাদ্বরাৎ ॥ মর্দয়ন রাক্ষসান্ বীরো যন্ত্রিগন্তান যদুজ্জয়া ॥
 ততো দক্ষা পুরীং লঙ্কামুতে সীতাঞ্চ নৈখিলীম্ ॥ রামায় প্রিয়মাখ্যাভূৎ পুনরায়্যাহকপিঃ ॥
 সোহভিগম্য মহান্নানং কৃদা রামং প্রদক্ষিণম্ ॥ শ্রবেদয়নমেয়ান্না দৃষ্টা সীতেতি তত্ত্বতঃ ॥
 ততঃ সুগ্রীবসহিতো গচ্ছা ভীরুং মহোদধেঃ ॥ সমুৎস্র্য কোভয়ামাস শরৈরাদিত্যসন্নিভৈঃ ॥
 দর্শয়ামাস চাগ্রানং সমুদ্রঃ সন্নিভাং পতিঃ ॥ সমুদ্রবচনাক্ষেব নলং সেতুমকারয়ৎ ॥
 তেন গচ্ছা পুরীং লঙ্কাং হস্তা দ্রাবণমাহবে ॥ রামঃ সীতামনুপ্রাপ্য পরাং ক্রীড়ামুপাগমৎ ॥
 তামুবাচ ততো রামঃ পুরুষং জনসংসদি ॥ অমৃষ্যামান সা সীতা বিবেশ অলনং সতী ॥
 ততোহগ্নিবচনাং সীতাং জ্ঞান্না বিগতকল্মষাম্ ॥ বভৌ রামঃ সম্প্রহৃষ্টঃ পূজিতঃ সর্বদেবভৈতঃ ॥
 কর্মণ্য তেন মহতা জৈলোকাং সচরাচরম্ ॥ সদেবর্ষিগণং তুইং দ্রাবণস্ত মহায়নঃ ॥
 অভিশিচ্য চ লঙ্কায়ং রাক্ষসেন্দ্রং বিভীষণম্ ॥ ক্রতুকৃত্যতদা রাঘো বিশ্বরঃ প্রমুনোদ হ ॥
 দেবতাভ্যো বরং প্রাপ্য সমুখ্যাপ্য চ বানরান্ ॥ অযোধ্যাং প্রস্থিতো রামঃ পুষ্পকেন সুতদ্ব্রতঃ ॥
 তদ্রাজ্যাক্রমং গচ্ছা রামঃ সত্যপরাক্রমঃ ॥ তন্নতজ্ঞাস্তিকে রাঘো হনুমন্তং বাসজ্জয়ৎ ॥
 পুনরাখ্যায়িকাং জগন্ সুগ্রীবসহিতস্তদা ॥ পুষ্পকং তৎ সমাক্রহ নলিগ্রামং যযৌ তদা ॥
 নলিগ্রামে জটায়ু হিষ্টা জাতুতিঃ সহিতোহনঘঃ ॥ রামঃ সীতামনুপ্রাপ্য রাজ্যং পুনরবাগুবান্ ॥
 পালয়ামাস চৈবেমাঃ পিতৃবন্ধুদিভাঃ প্রজাঃ ॥ অযোধ্যাদিপতিঃ ক্রীদান্ রাঘো দশরথায়াজঃ ॥

* রামায়ণ, আদিকাণ্ড, অধ্যায় ২০শ হইতে ২০শ শ্লোক ।

ইক্ষাকু-বংশে সকল-গুণবিশিষ্ট রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন । তাঁহার গুণের তুলনা নাই । তিনি সৰ্বগুণভলক্ষণাধিত, প্রজাহিতৈষী, পবিত্রাত্মা, সৰ্বশাস্ত্রাভিজ্ঞ, সৰ্বলোকপ্রিয়, সাধু-স্বভাব, সুবিচক্ষণ ও প্রিয়দর্শন । তিনি মহীপতি দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র ; কৌশল্যা-দেবীর গর্ভে তিনি জন্মগ্রহণ করেন । সেই সত্যত্রত পরাক্রমশালী প্রজাবর্গের হিতৈষী রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে রাজা দশরথ ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন । ইতিপূর্বে তিনি মধ্যমা মহিষী কৈকেয়ীকে দুইটা বর দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন । রামের যৌবরাজ্য-ভিক্ষকের উত্তোগ হইতেছে দেখিয়া, অবসর বুঝিয়া, কৈকেয়ী সেই দুইটা বর চাহিয়া বসিলেন । তিনি প্রার্থনা করিলেন,—এক বরে রামের বনগমন, অল্প বরে ভরতের রাজ্যাভিক্ষেক । দশরথ ধর্ম-পাশে আবদ্ধ ছিলেন ; সুতরাং প্রিয়তম রামচন্দ্রকে বনবাসে প্রেরণ করিলেন । বীরবর রামচন্দ্র, দ্বিক্রান্তি না করিয়া, পিতার আদেশে, কৈকেয়ীর প্রীতির নিমিত্ত, পিতৃসত্য-পালনার্থ, বনগমনে প্রস্তুত হইলেন । দশরথের কনিষ্ঠা মহিষীর জ্যেষ্ঠপুত্র রামাশ্রমপ্রাণ লক্ষণ, ভ্রাতৃস্নেহ-প্রযুক্ত রামের সহগামী হইয়া, বনবাস-যাত্রা করিলেন । রামের প্রাণ-প্রিয়া পত্নী সীতাদেবীও, চন্দ্রের অমুগামিনী রোহিনীর জায়, রামের অমুগামিনী হইলেন । সীতা ও লক্ষণ সমভিব্যাহারে, রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া, ধর্ম্মাশ্রম রাম প্রথমেই গঙ্গাতীরবর্তী শৃঙ্গবের-পুরে নিবাসাধিপ গুহের সাক্ষাৎ পাইলেন । সেই স্থান হইতে সারথি অমর বিদায় গ্রহণ করিলেন ; গুহ প্রতিনিবৃত্ত হইলেন । তখন দেবগন্ধর্ব্বতুল্য সেই তিন জন, বহু নদ-নদী-বন-উপবন অতিক্রম করিয়া, চিত্রকূট পর্ব্বতে গমন করিলেন । সেখানে ভরদ্বাজ-মুনির আশ্রম ছিল ; মুনির উপদেশে পর্ণকুটীর নিৰ্ম্মাণ করিয়া, তিন জনে বাস করিতে লাগিলেন । সেই সময় পুত্রশোকে কাতর হইয়া রাজা দশরথ প্রাণত্যাগ করিলেন ; বসিষ্ঠ প্রভৃতি বিজগণ ভরতকে রাজকাৰ্য্যে নিযুক্ত করিতে উত্তোগী হইলেন ; কিন্তু অহাবীৰ্য্যবান্ ভরত তাহাতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া রামের অমুসরণ করিলেন । অতঃপর, রামের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, ভরত কহিলেন,—‘আপনি জ্যেষ্ঠ ধর্ম্মজ্ঞ ; সুতরাং আপনিই রাজ্যালাভে অধিকারী ।’ কিন্তু রামচন্দ্র পিতৃ-প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ-ভয়ে রাজ্যগ্রহণে অনিচ্ছুক হইলেন । ভরত পুনঃপুনঃ তাঁহাকে রাজ্যভারগ্রহণে অমুরোধ করায়, তিনি আপন পাছুকাষয় জ্ঞান-স্বরূপ রক্ষা করিয়া ভরতকে রাজ্য-শাসনের নিমিত্ত অমুরোধ করিলেন । ‘সকলকাম না হইয়া, রামচরণে প্রণতিপূর্ব্বক নন্দিগ্রামে গিয়া, রামের আগমন প্রতীক্ষায়, অগত্যা ভরত রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইলেন । ভরত প্রস্থান করিলে, আশ্রয়-স্বজনের পুনরাগমনের আশঙ্কায়, চিত্রকূট পর্ব্বত পরিত্যাগ করিয়া, ত্রীরামচন্দ্র রমণ্যকারণে পমন করিলেন । সেখানে বিরাধ-রাক্ষসকে হনন করিলে, শরভঙ্গ, সূতীক্ষ, অগস্ত্য ও অগস্ত্য-ভ্রাতার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল । অগস্ত্য ঋষি, রামচন্দ্রকে ঐশ্বর্য্য, অক্ষয়-পর্যুক্ত ভূমধ্য এবং উৎকৃষ্ট খড়্গ প্রদান করিলেন । তখন কিছুকাল সেই বনে মুনিগণের সহিত ত্রীরামচন্দ্র বসবাস করিতে লাগিলেন । এই সময়ে রাক্ষস-ভরদ্বীত ঋষিগণ, রামের নিকট আসিয়া, রাক্ষস-নিধনের প্রার্থনা জানাইলেন । রামও রাক্ষসগণকে বিনাশ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন । ইহার পর লক্ষণ, কামরূপিনী শূর্ণপদ্মা-রাক্ষসীর নাসাকর্ণ

ছেদন-পূর্বক তাহাকে বিকীর্ণ করিলেন। শূর্ণধার অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য, বর, দুষণ ও ত্রিশিরা নামক রাক্ষসত্রয় সসজ্জ হইয়া যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইলে, রাম তাহাদিগকে যুদ্ধে নিহত করিলেন। সেই যুদ্ধে চতুর্দশ-সহস্র রাক্ষস নিধন-প্রাপ্ত হইয়াছিল। শূর্ণধার জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা লঙ্কাধিপতি রাবণ তাহাতে উত্তেজিত হইয়া, মারীচ নামক রাক্ষসকে আপনার সহায়-স্বরূপ গ্রহণ করিয়া, রামচন্দ্রের অনিষ্ট-সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। মারীচ প্রথমে রাবণকে বুঝাইবার প্রয়াস পাইল; কিন্তু রাবণ মারীচের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। অতঃপর, মারীচ মায়া-মূগরূপ ধারণে রাম-লঙ্কাকে কুটীর হইতে অপসারিত করিলে, জটায়ু-নামক গৃধ্রকে আহত করিয়া, রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গেলেন। সীতা-হরণের পর,—রামের বিলাপ, জটায়ুর সংকার, কবন্ধ বধ, শবরীর নিকট পূজা-প্রাপ্তি, হনুমানের সহিত সাক্ষাৎ, সূগ্রীবের সহিত মিত্রতা, বালী বধ, সূগ্রীবের রাজ্যাভিষেক এবং সূগ্রীবের সাহায্যে সীতার উদ্দেশ্যে বানরগণকে চতুর্দিকে প্রেরণ। তৎপরে, সম্প্রতি-নামক গৃধ্রের বাক্যে লবণ-সমুদ্র লঙ্ঘন-পূর্বক লঙ্কাপুরীতে গমন করিয়া, হনুমান সীতার সাক্ষাৎ পাইল। সীতা অশোকবনে ধ্যান-পরায়ণা ছিলেন। রামের অঙ্গুরীয়-রূপ অভিজ্ঞান-প্রদানে, সমস্ত রক্তাস্ত বর্ণনা-পূর্বক, হনুমান তাঁহাকে আশ্বস্ত করিল। ইহার পর, অশোক-বন বিধ্বস্ত ও লঙ্কাপুরী অগ্নি-দগ্ধ করিয়া, হনুমান রামসমীপে সীতার সমাচার ব্যক্ত করিল। তখন সূগ্রীবের সহিত সমুদ্র-তীরে গিয়া, সেতুবন্ধন-পূর্বক, তাঁহারা সাগর অতিক্রম করিলেন। লঙ্কার উপনীত হইলে, রাবণের সহিত নর-বানরের ঘোর যুদ্ধ চলিল। যুদ্ধে পুত্রমিত্র সহ রাবণ সবংশে নিহত হইলে, সীতার উদ্ধার সাধন হইল। অনন্তর অগ্নি-পরীক্ষায় সীতা নিষ্পাপ প্রতিপন্ন হইলে, দেবগণ, মুনিগণ সকলেই তাঁহাদের যশোগান করিতে লাগিলেন। তখন বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, সূহৃদগণসহ পুস্ক-রথে আরোহণ পূর্বক, ত্রীণামচন্দ্র প্রভৃতি অযোধ্যা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে, ভরদ্বাজ-মুনির আশ্রম হইতে, রামের আদেশে, হনুমান ভরতের নিকট নন্দিগ্রামে যাত্রা করিল। পরিশেষে, তাঁহারা সকলেই নন্দিগ্রামে উপনীত হইলেন। সেখানে রামের রাজ্যাভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। রাজ্যাভিষেক করিয়া অযোধ্যাপতি রামচন্দ্র অপত্য-নির্কিংশেবে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। এইরূপে লোক-রঞ্জন-পূর্বক, একাদশ সহস্র বৎসর রাজ্য-ভোগ করিয়া, ত্রীণামচন্দ্র বৈকুণ্ঠ-লোকে গমন করেন।

নারদ-বাক্যীকি-সংবাদে রামায়ণের সার-মর্ম সংক্ষেপে বিবৃত হইলেও, প্রকাণ্ড রামায়ণ-গ্রন্থে আরও কত তত্ত্বই আলোচিত হইয়াছে। যে গ্রন্থে অনূন ত্রিংশতি সহস্র শ্লোক

অযোধ্যার
বিবিধ চিত্র।

আছে, তদন্তর্গত সপ্ততি-সংখ্যক শ্লোকে তাহার আর কি পরিচয় সম্ভব-
পর ? রামায়ণে একটী যুগের ইতিবৃত্ত লিখিত আছে বলিলেও অত্যুক্তি
হয় না। অযোধ্যার বর্ণনা, রাজা দশরথের রাজ্যাশালন-প্রণালী, পুত্রার্থ

যজ্ঞ, রাম-লঙ্কাদির বিবাহ, তাঁহাদের বনগমন, রাজ্যপ্রাপ্তি, লব-কুশের জন্ম, কুশী-লবের
অভিষেক ও বংশ-পরম্পরা—রামায়ণের মেরুদণ্ড-স্বরূপ। এই সকল বিষয়ের বর্ণনা-প্রসঙ্গে
তারতম্যের প্রাচীন ইতিহাস নানারূপে উৎখাপিত ও পরিকীর্ণিত হইয়াছে। সগর রাজার

বিবরণ, অমর্য্য রাজার বিবরণ, পরভ্রমার বিবরণ, যযাতির বিবরণ, যাদ্যতার বিবরণ, —কন্ত বিবরণই এই রামায়ণ-গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট আছে। কোন শ্রেণীর লোকের কিরূপ আচার-ব্যবহার ছিল, যুদ্ধক্ষেত্রে কিরূপ ভাবের কোন অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহৃত হইত, কোন প্রদেশে কোন রাজার শাসনাধীন ছিল, প্রজাপালনের নিমিত্ত রাজা কিরূপ আশ্র-ভ্যাগের পরাকর্ষ্য প্রদর্শন করিতেন, কিরূপে ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের অধঃপতন সাধিত হইত, —রামায়ণে তাহার প্রস্তুত চিত্র দেখিতে পাই। রামায়ণ-বর্ণিত অযোধ্যা-নগরীর শোভা-সমৃদ্ধির বিষয় আলোচনা করিলে, এই বিংশ-শতাব্দীর উন্নতির দিনেও, বিশ্বয়াবিষ্ট হইতে হয়। অযোধ্যা-নগরী সুবিস্তৃত রাজপথে সুশোভিত ছিল; সেই রাজপথগুলি সর্বদা সলিল-সিক্ত হইত এবং প্রস্তুত পুষ্পে বিকীরণ থাকিত। সেই নগরী গভীর জলদ্রব-পরিধা-পরিবেষ্টিত ছিল বলিয়া, শত্রুগণ সহসা তাহার নিকটেই বাইতে পারিত না। নগরীর স্থানে স্থানে তোরণ-দ্বার বিস্তৃত ছিল; স্বজশালী উচ্চ উচ্চ অট্টালিকা, শত শত অনাগার, শত শত উদ্যান ও আশ্রকানন সেই নগরীর শোভা-বর্দ্ধন করিতেছিল। নগরের চতুর্দিকে সারি সারি শাল-বৃক্ষ বিস্তৃত থাকায়, তৎসমুদায় মেখলার দ্বারা শোভা পাইতেছিল। নগরে সর্বশ্রেণীর শিল্পবিজ্ঞাবিশারদ ব্যক্তিগণ, স্ত্রী এবং মাগধগণ, বাস করিত। স্থানে স্থানে নীলমণ্ডিনীগণের নাট্যশালা ছিল। নানাदिगदेशাপত বণিকগণ সেই নগরে বাণিজ্য করিতে আসিত; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করদ-রাজগণ প্রায়ই নগরীতে উপস্থিত থাকিতেন। নগরে বহু সংখ্যক গো, অশ্ব, হস্তী, উষ্ট্র ও গর্দভ প্রভৃতি গৃহ-পালিত পশু, সর্বদা নগরবাসীর আবশ্যক-কার্য সম্পাদন করিত। নগরে ধাতু ও তত্ত্ব প্রভৃতির কখনই অভাব ছিল না। নগরী ইক্ষু-রসতুল্য সুবাহু জলশালিনী ছিল। সেই সর্বসুখময়ী অযোধ্যা-পুরীতে কোনও ব্যক্তি অন্নসঞ্চয়ী, প্রয়োজনসাধনাসমর্থ অথবা গবাক্ষ-ধন-ধাতু-বিহীন ছিল না। সকলেই ধর্ম্মশীল ও ক্ষিত্তিক্রিয়, সকলেই দীর্ঘায়ু ও অতিথি-সেবা-নিরত, সকলেই সত্য-পরায়ণ ও ক্রীসম্পন্ন ছিল। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চতুর্ধর্ম্ম আপনাপন ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেন। ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের অমৃত্যবহ, বৈশ্যগণ ক্ষত্রিয়ের আভ্যাবহ এবং শূদ্রগণ ক্রি-বর্ণ-সেবা-রূপ স্বকর্মে নিরত ছিল। সেই ষাটশ যোজনায়তন নগরীর চতুর্দিকে দুই যোজন পর্য্যন্ত, শত্রুগণ অযোধ্যা বলিয়া মনে করিত; অযোধ্যার সীমানায় কাহারও পদার্পণ করিবার সামর্থ্য ছিল না। এই সমৃদ্ধিশালী অযোধ্যা, রাজা দশরথের সুশাসনে, সর্বদা স্বর্গসুখ উপভোগ করিত। * নক্ষত্রনিকর যেরূপ চন্দ্রের শাসনে গৌরবান্বিত হয়, প্রজাগণও দশরথের শাসনে সেইরূপ গৌরবান্বিত ছিল। ক্রীয়াসচন্দ্রের রাজত্বকালে সে গৌরব যেন অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছিল। রামায়ণের প্রারম্ভে দেবর্ষি নারদ বাণীকিকে বলিয়াছেন, —“রামের রাজত্বে প্রজাপুত্র তুষ্ট-পুষ্ট-প্রসুপ্ত ও সুখাশ্রিত হইবে। সকলেই আধি-ব্যাদি-হৃদ্বিক-ভয়-বিবর্জিত ও নিরাশ্রয় থাকিবে; কোনও ব্যক্তিকেই কখনও পুত্রের মরণ দেখিতে হইবে না; কোনও রমণীকেই কখনও বৈধবা-বরণা সহ্য করিতে হইবে না; সকল রমণীই পতিব্রতা হইবে; অগ্নি, বায়ু, জ্বালা, তপস্বী, কি অর-হেতু

কাহারও কোন ভয় থাকিবে না ; রাষ্ট্র-নগরসকল ধন-ধাক্কে পূর্ণ হইবে ; তিনি বহু সহস্র কোটি গো-দান ও সংখ্যাতীত ধেনু-দান করিবেন ; ব্রহ্মণ্যাদি বর্ষ-চতুষ্টয়কে স্বদেশে নিয়োগ করিয়া, শতশ্রেণী প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিবেন ;” ইত্যাদি। বস্তুতঃ, মহর্ষি যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছিলেন, রাম-রাজ্যে তাহাই সংঘটিত হইয়াছিল। ‘রামরাজ্য’ প্রবাদ-বাক্যে আজিও সে গৌরব দেশে দেশে দিকে দিকে বিঘোষিত। তাঁহার রাজত্ব-কালে প্রজাবর্গের সুখ-সৌভাগ্যের পরিসীমা ছিল না। শ্রীরামচন্দ্রের জায় সত্যনিষ্ঠ, স্ববর্ণপ্রিয়, জায়-পরায়ণ নৃপতি, পৃথিবীতে আর বিতীয় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা,—সংসার এখনও তদ্বিবয়ে সংশয়বিত। শ্রীরামচন্দ্র যে সময়ে রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন, তৎকালের সমারোহ ব্যাপার স্মরণ করিলে, ভারতবর্ষ সেই সময় সভ্যতার কিরূপ উচ্চ-শিখরে সমাক্ষ ছিল এবং পৃথিবীতে তিনি কিরূপ একছত্র প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন,—তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। রাজ্যাভিমেক-উৎসবের সময় নানা দেশ হইতে নিমন্ত্রিত রাজকুলপূর্ণ অঘোষায় আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সকলেরই জ্ঞান যথাযোগ্য বাসস্থান নির্মিত হইয়াছিল ; সকলেরই পদোচ্চিত সম্মানের ও সেবার বিশেষ বন্দোবস্ত বিহিত হইয়াছিল। প্রাতঃকালে সৌম্যমুষ্টি বন্দিগণ স্তুতিগানে তাঁহাদের নিদ্রাভঙ্গ করিত। সম্রাট-স্বরে জাগরিত হইয়া রাজকুলবর্গ নিত্যকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন। অভিষেকের দিন বন্দিগণের স্তুতিগানে রামচন্দ্রের নিদ্রাভঙ্গ হইলে, প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে, অগ্নিতে আহুতি দান করিয়া, দেবগণের, পিতৃগণের এবং বিপ্রগণের যথাবিধি পূজা করিয়া, তিনি সভাস্থলে উপনীত হইলেন। বসিষ্ঠ প্রভৃতি পুরোহিতগণ এবং যদ্বিবর্গ—সকলেই পূর্ণ হইতে সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন ; নানাদেশের রাজা ও মহাত্মা ক্ষত্রিয়গণ সভার শোভা-সম্বর্দ্ধন করিতে-ছিলেন। ঋষিগণ, মহাঋষীর্ষ্যবান রাজগণ, বানরগণ এবং রাজকুলগণ, সভায় সমবেত হইয়া, শ্রীরামচন্দ্রের অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন। বিদেশাগত নরপতিগণ সহস্র সহস্র হস্তী ও অশ্ব দ্বারা পৃথিবী কম্পিত করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন। সেই সকল রাজকুলবর্গ ভরতের আদেশক্রমে সেনা-বান-সমগিত হইয়া, বহু অশ্বোহিণী সেনার সহিত শ্রীরামচন্দ্রের সাহায্যার্থ রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন ; এবং রামের কল্যাণ-কামনায় বিবিধ রত্ন-অশ্ব-বান-মণি-মুক্তা-প্রবালাদি দিব্য আভরণ, রূপবতী দাসী এবং বিবিধ রথ-সমূহ, ভরত, লক্ষণ ও শত্রুঘ্নকে উপহার দিয়াছিলেন। অভিষেক-সমাপনান্তে, বিদায়-দান কালে, মিথিলেশ্বর জনককে, কেকয়রাজ-পুত্র মাতুল যুধাঞ্জিতকে, বয়স্ক কাশীরাজ প্রতোদনকে এবং অপরায়ণ রাজগণকে, শ্রীরামচন্দ্র যে তাবে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারা যেরূপ প্রতিসম্বর্দ্ধনা জানাইয়াছিলেন,—তদ্বিবরণ উত্তর-কাণ্ডে পরিবর্ণিত আছে। তদন্তে দেশপতি সম্রাটের অভিষেক-উৎসবেরই পরিচয় পাওয়া যায়।* প্রজারঞ্জনর জ্ঞান শ্রীরামচন্দ্র আত্মত্যাগের যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, জগতের ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। তিনি গুপ্তচর নিয়োগ করিয়া আপন শূশাসন-শুপালন-সম্বন্ধে প্রজার মনোভাব অবগত হইতেন। প্রসঙ্গক্রমে এক দিন তিনি গুপ্তচরকে জিজ্ঞাসা

* উত্তর-কাণ্ড, সপ্তচত্বারিংশ, অষ্টচত্বারিংশ এবং একোশচত্বারিংশ সর্গ।

করেন,—‘রাজ্যের লোকে আমার সম্বন্ধে কোনও কথা লইয়া আন্দোলন করে কিমা?’ তত্ৰ তাহাতে উত্তর দেয়,—‘সৰ্ব বিষয়েই লোকে আপনার গুণগান কীর্ত্তন করিয়া থাকে । কিন্তু একটি বিষয়ে কেহ কেহ আপনার প্রতি সংশয়ান্বিত । রাবণ বঙ্গ-পূর্বক সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল, অথচ আপনি কি প্রকারে সীতাকে লইয়া সুখসন্তোষ করিতেছেন ;—কেহ কেহ এই কথা লইয়াই ‘কাণায়ুধ’ করিয়া থাকে । তাহারা বলে,—রাজা যাহা করেন, প্রজারা তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকে ; সুতরাং, আত্মাদিগকেও স্ত্রী-দিগের দোষ সহ্য করিতে হইবে ।’ বলা বাহুল্য, শ্রীরামচন্দ্র ভদ্রের সেই কথায় সমস্তই বুঝিতে পারেন ; এবং তাহারই ফলে, প্রজার সন্তোষ বিধানার্থ, শ্রীরামচন্দ্র প্রিয়তমা জ্ঞানকীকে বর্জন করেন । এরূপ মহান্ আত্ম-ত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, কোনও দেশের কোনও ইতিহাসে আছে কি ? রাজা দশরথের রাজ্য যেরূপ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের প্রাধান্য ছিল, রাম-রাজত্বেও সেই প্রাধান্য দৃষ্ট হয় । শূদ্র শব্দক তপস্তু করিতে গিয়াছিল বলিয়া, রামচন্দ্র তাহার মস্তকচ্ছেদ করেন, এবং তাহাতে তাঁহার অজস্র প্রশংসাবাদ কীর্ত্তিত হয় । * তখন, ব্রাহ্মণের জন্ত স্বতন্ত্র আসন ও যান-বাহন নিদিষ্ট ছিল ; ব্রাহ্মণগণ শূদ্রকে মস্তকদান করিলেও পতিত হইতেন । তৎকালে স্ত্রী-শাস্ত্রের অনুশাসন সর্বত্র মান্য হইত । † রামায়ণে রাজগণের বহু-বিবাহের কথা আছে ; স্বয়ম্বরাদি বিবাহ-প্রথা প্রচলিত থাকিলেও, ব্রাহ্ম-বিবাহই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তিত হইত । দ্বি-জাতিগণ নিম্ন-বর্ণের কন্যা-বিবাহে অধিকারী হইলেও, সেরূপ বিবাহ কখনই শ্রেষ্ঠ-বিবাহ মধ্যে পরিগণিত হইত না । হরণমু ভঙ্গ করিয়া রামচন্দ্র বদিও সীতাকে লাভ করিবার অধিকারী হইয়াছিলেন ; কিন্তু, পরিশেষে দশরথ আসিয়া যথারীতি বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন করাইয়া বর-বধূ গৃহে লইয়া গিয়াছিলেন । বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজের ভায়ে তৎকালে সভ্য-সমাজে অবরোধ-প্রথা প্রচলিত ছিল । অবোধ্যার রাজ-অন্তঃপুরের বর্ণনায়, বনগমনোচ্ছতা সীতাকে পদব্রজে রাজপথে অগ্রসর হইতে দেখিয়া নগরবাসীদের উজ্জিত, রাবণের মৃত্যুর পর মন্দোদরীর বিলাপে, রাবণ-বধের পর রাম-সমীপে সীতার উপস্থিতি-কালে,—এই অবরোধ-প্রথার পরিচয় পাওয়া যায় । রামায়ণে দেখিতে পাই, রাজ-পুরোহিতগণের এবং একমাত্র সুমন্ত্র ভিন্ন অন্ত কাহারও, রাজ্য-অন্তঃপুরে প্রবেশাধিকার ছিল না । রাম ও লক্ষ্মণের সহিত সীতাকে পদব্রজে যাইতে দেখিয়া, নগরবাসীরা বলিয়াছিল,—

“যান শূক্য পুরা ভট্টং ভূতৈরাকাশংগরিণি । ভাষদ্য সীতাং পশ্যন্তি রাজমার্গগতা জনাঃ ॥”

হায়, পূর্বে আকাশগামী প্রাণীরাও যে সীতাদেবীকে দেখিতে সমর্থ হইত না, অত রাজপথের পথিকেরাও তাঁহাকে দেখিতে পাইল ! মৃত্যুশয্যায় শায়িত রাবণকে দেখিয়া, আশানে উপস্থিত হইয়া, মন্দোদরী বিলাপ করিতে করিতে কহিতেছেন,—

“দৃষ্টা ন বদসি ক্রুদ্ধো মানিহানবস্ত্রীতাম । নির্গতাং নগরদ্বারাং পত্ন্যাদেবগতাং প্রভো ॥

পত্নীদেবী দারাবতে ভ্রষ্টলজ্জাবগুষ্ঠিতান্ । বহিনিপতিতান্ সর্কান্ কথং দৃষ্টা ন কুণ্যসি ॥”

‘হে স্বামিন্ ! এই দেখ, অবগুষ্ঠিত পরিত্যাগ-পূর্বক তোমার মহিষী আজি পদব্রজে নগর-

* উত্তর-কাণ্ড, একোন-মবতি অধ্যায় ।

† সুন্দরাকাণ্ড, অষ্টাবিংশ অধ্যায়ের ৫ম শ্লোক ; আদিকাণ্ড, বর্ত্ত মর্গ, ১১শ শ্লোক ; আদিকাণ্ডে ঊনসপ্ততি মর্গের, ৪৭তম ৫৫ শ্লোক ।

দ্বার হইতে বহির্গত হইয়াছে ; ইহা দেখিয়াও কি তোমার ক্রোধের স্ফূর্তি হইতেছে না ? এই দেখ, তোমার স্ত্রী লক্ষ্মী ও অবগুষ্ঠন পরিত্যাগ করিয়া বহির্দেশে আগমন করিয়াছে । ইহা দেখিয়াও তোমার ক্রোধোদয় হইতেছে না কেন ?' লক্ষ্মী-সমর-বিজয়ের পর, বিভীষণ যখন সীতাকে রাম-সমীপে লইয়া আসিতেছিলেন, তখন বেত্রহস্ত উষ্ণীষ-ধারী কঙ্ককিণ বেত্রাঘাতে পুরুষগণকে অপসারিত করিতেছিল । রাক্ষস তাহাতে মর্শাহত হইয়া কহিয়াছিলেন,—

“বসনেবু ন কৃচ্ছ্বে বু ন যুদ্ধেবু স্বয়ংবরে । ন ক্রতো ন বিবাহে বা দর্শনং দৃব্যতে দ্বিঃ ॥”

বাসন, পীড়ন, যুদ্ধ, স্বয়ংবর, যজ্ঞ এবং বিবাহকালে স্ত্রী-গণের জনসমাজের সম্মুখীন হওয়া দৃশ্যীয় নহে । সুতরাং, এক্ষণে লোক অপসরণ করিবার কোনই প্রয়োজন নাই ; কেন-না,—

“সৈবা বিপদতা টেব কৃচ্ছ্বে বহতি চ স্থিতা । দর্শনে নাস্তি দোষোহস্তা মৎসমীপে বিশেষতঃ ॥”

‘জ্ঞানকী এখন বিপদা ; এমন সময়ে, বিশেষতঃ আমার সমক্ষে, তাহার দর্শন দোষাবহ নহে ।’ সভ্য-সমাজে অন্তঃপুর-প্রথা পূর্ণ-মাত্রায় বিদ্যমান ছিল ;—এই সকল দৃষ্টান্তে তাহাই প্রতিপন্ন হয় । অধিক কি, কিস্কিন্দ্যাপুরীতে প্রবেশ-কালে লক্ষ্মণ অন্তঃপুরের যে সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন, তদ্বারা অনার্য্য-সমাজেও অন্তঃপুর-প্রথার পরিচয় পাওয়া যায় । * পূত্রবৎ স্বশ্র-সেবা-পরায়ণা থাকিতেন, সীতাদেবীর নিত্যকর্মে তাহার নিদর্শন আছে । বিধবাগণের পক্ষে ব্রহ্মচর্যের ও সহমরণের ব্যবস্থা থাকিলেও, ব্রহ্মচর্যই অধিকাংশ স্থলে পরিগৃহীত হইত । লক্ষ্মণ স্ত্রীরামচন্দ্রের ছিন্ন মায়ামুণ্ড-দর্শনে সীতাদেবীর বিলাপে এবং পতিপুত্র-শোকাতুরা কৌশল্যার শোকোজ্বলিতে—সহমরণ-প্রথা প্রচলিত ছিল, বুঝিতে পারা যায় । মৃতের অগ্নি-সংকার আর্য্য-অনার্য্য উভয় সমাজেই প্রচলিত ছিল ; দশরথ, রাবণ, বালী প্রকৃতির সংকার-পদ্ধতিতে তাহা বিরত আছে । রাক্ষসগণের মধ্যে ব্যভিচার ও পরজ্ঞা-হরণ ভাদৃশ দোষাবহ বলিয়া পরিগণিত না হইলেও, আর্য্য-সমাজে উহা গুরুতর পাপ বলিয়া গণ্য হইত । অগ্নি ঐদক্ষিণ করিয়া পত্নী-লাভ, বিবাহে বাস্তোদ্রম এবং কন্যাদিগকে দৌতুক দান,—তাৎকালীন সামাজিক-পদ্ধতির মধ্যে পরিগণিত ছিল । এই সকল ভিন্ন, রামায়ণে দার্শনিক-তত্ত্ব বীজ-রূপে অবস্থিত । যোগবিশিষ্ট রামায়ণে সেই বীজ-তত্ত্ব আবার মহান মহীৰুহে পরিণত ।

বাল্মীকির রামায়ণ আলোচনা করিতে হইলে, তদীয় সপ্তকাণ্ড রামায়ণ আলোচনার সঙ্গে সঙ্গেই যোগবিশিষ্ট রামায়ণ আলোচনা করিবার প্রয়োজন হয় । যোগবিশিষ্ট

রামায়ণ প্রকাণ্ড গ্রন্থ । সপ্তকাণ্ড রামায়ণের শ্লোক-সংখ্যা অপেক্ষাও যোগবিশিষ্ট রামায়ণের যোগবিশিষ্টের শ্লোক-সংখ্যা অধিক । অপিচ, সপ্তকাণ্ড রামায়ণের

শ্লোক-সংখ্যা গণনায় মিলাইয়া পাওয়া যায় না ; কিন্তু যোগবিশিষ্টের শ্লোক-সংখ্যা প্রায়ই মিলাইয়া যাওয়া যায় । হিসাবে দেখিতে পাই,—সমগ্র রামায়ণে (সপ্তকাণ্ড ও যোগবিশিষ্ট উভয় রামায়ণে) ষট্-পঞ্চাশ সহস্র শ্লোক আছে । তাহার মধ্যে চতুর্বিংশতি সহস্র শ্লোক রামায়ণের (উত্তর-কাণ্ড ব্যতীত) এবং দ্বাত্রিংশ সহস্র শ্লোক

* আদিকাণ্ড, চতুর্দশ ও পঞ্চদশ সর্গ ; অযোধ্যাকাণ্ড, ত্রয়োবিংশ অধ্যায়, ৮ম শ্লোক ; লঙ্কাকাণ্ড, ত্রয়োদশাধিক শততম সর্গ, ৬০শ ও ৬২শ শ্লোক ; লঙ্কাকাণ্ডের যোড়শাধিক শততম সর্গ, ২৮শ হইতে ২৯শ শ্লোক ; কিস্কিন্দ্যাকাণ্ড, ত্রয়োবিংশ সর্গ, ২৭শ শ্লোক ।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের অন্তর্ভুক্ত। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ—সপ্তকান্ড রামায়ণেরই অংশ-
 বিশেষ। যোগবাশিষ্ঠ-পাঠ ভিন্ন রামায়ণ-পাঠ সম্পূর্ণ হয় না,—ইহাই শাস্ত্রের মত।
 রামায়ণে প্রধানতঃ রামের জন্ম হইতে স্বর্গারোহণ পর্য্যন্ত রামচরিত পরিবর্ণিত। কিন্তু
 যোগবাশিষ্ঠে রাম-লীলার সঙ্গে সঙ্গে নিগূঢ় দর্শন-তত্ত্ব উদ্ঘাটিত হইয়াছে। বৈরাগ্য-প্রকরণ,
 যুগ্ম-প্রকরণ, উৎপত্তি-প্রকরণ, স্থিতি-প্রকরণ, উপশম-প্রকরণ এবং নির্বাণ-প্রকরণ (পূর্ব
 ও উত্তর ভাগ) প্রভৃতি অংশে এই রামায়ণ বিভক্ত। মুক্তির স্বরূপ-কর্তন, মুক্তির উপায়
 নির্দেশ, যুগ্মের প্রতি উপদেশ এবং অবতার-তত্ত্ব,—যোগবাশিষ্ঠে বিশদভাবে বিবৃত;
 বেদান্তের গভীর-তত্ত্ব, ললিত মধুর পদবিজ্ঞাসে অল্পপম উপমা দ্বারা, যোগবাশিষ্ঠে বুঝাইয়া
 দেওয়া হইয়াছে। যোগবাশিষ্ঠের প্রধান বক্তা—বশিষ্ঠ। শ্রীরামচন্দ্র প্রশ্ন করিতেছেন,
 আর বশিষ্ঠ সংসার-তত্ত্ব বুঝাইয়া দিতেছেন। এই রামায়ণের অন্তর্গত শ্রীরামের উক্তিও যেরূপ
 উপদেশ-পূর্ণ; বশিষ্ঠের উক্তিও সেইরূপ তত্ত্ব-জ্ঞান-প্রদ। বৈরাগ্য-প্রকরণে শ্রীরামচন্দ্র, ধর্মেতদ্বা,
 আয়ু, অহঙ্কার প্রভৃতির অসারত্ব বিষয়ে উল্লেখ করিতেছেন। লক্ষ্মী (ধনই) ইহসংসারে
 সর্বমুখ প্রদান করেন, এই বিশ্বাসে সধ্বন্ধে শ্রীরাম বলিতেছেন,—“বাস্তবিকপক্ষে, লক্ষ্মী
 (ধনই) লোকের মোহ ও অনিষ্টের হেতু। যেমন দীপলেখা অঙ্গ-স্পর্শনাত্রেই অত্যন্ত
 তাপ সম্পাদন করতঃ, মধ্য হইতে কজ্জলপাতের হেতু হয়; তদ্রূপ লক্ষ্মীও কিয়দংশ স্পর্শ-
 নাত্রেই অত্যন্ত তাপ সম্পাদন করতঃ, মধ্য-দশাতেই সর্বনাশের হেতু হইয়া থাকে।...লহরী
 যেমন (ভঙ্গশীলতা-প্রযুক্ত) ক্ষণকালের জন্ত কোথাও একরূপে অবস্থান করে না, তদ্রূপ
 লক্ষ্মীও ক্ষণকালের জন্ত কোথাও একরূপে থাকেন না। অসিদ্ধারায় তায় শীতলা হইলেও
 ইনি তীক্ষ্ণ।” আয়ু-সধ্বন্ধে শ্রীরামচন্দ্র বলিতেছেন,—“আয়ু—পল্লবাগ্রগ্রামে লম্বমান সলিল
 কণার ন্যায় অস্থির। তরঙ্গ, বিদ্যাপুঞ্জ, চন্দ্রের প্রতিবিম্ব এবং আকাশ-কমলকে গ্রহণ
 করিতে আস্থা স্থাপন করিতে পারি, কিন্তু অস্থির জীবনে আস্থা স্থাপন করিতে পারি না।”
 এইরূপে ধন, আয়ু, স্ত্রী—সর্ববিষয়ের অসারত্ব উপলব্ধি করিয়া, চিন্তাকুলিতচিত্তে শ্রীরামচন্দ্র
 বলিতেছেন,—“আয়ু—উচ্চপাদপের কম্পিত-পত্রবিলম্বিত জলবিন্দুর ন্যায় পতনোন্মুখ;
 শরীর—হরচূড়ামণি শশিকলার ন্যায় দেখিতেই পাওয়া যায় না; এবং শালিক্বেত্রবিহারী
 শঙ্করামানু ভেককুলের ক্ষাত গলনালী চন্দ্রের ন্যায় অস্থির; জীবের সুদৃঢ়-স্বজন-সমাগম
 বাগুরাবেগন-সদৃশ; বাসনারূপ সমীরণে পরিবেষ্টিত, দূরাশারূপিনী-সৌদামিনী-বিজড়িত,
 মোহরূপী ঘোর কুজটিকাময় জলদাবলী নিরন্তর অশনিপাত এবং গর্জন করিতেছে;
 লোভরূপী প্রচণ্ড উন্মত্ত ময়ূর তাণ্ডব-নৃত্য করিতেছে; অনর্থরূপী কুটজ-কুসুম-পাদপ
 আক্ষেপ (স্পর্শ এবং কলিকাতোদ) সহকারে সুবিকশিত হইতেছে; ক্রুর কৃতান্ত-
 মার্জার সুরভূতরূপী মুষিককুল ভক্ষণে ব্যগ্র; কোথা হইতে নিরন্তর জলজ্যোতঃসম
 প্রাণিলকার হইতেছে, পতনের (অধঃপতনের ও ব্রষ্টির) প্রাচুর্য্য আছে;—এমন অবস্থায়
 আমার উপায় কি? গতি কি? আশ্রয় কি?” শ্রীরামচন্দ্রের এইসকল প্রশ্নের
 উত্তরে মহর্ষি বশিষ্ঠ যুগ্ম-প্রকরণ বুঝাইতে আরম্ভ করেন। মানারূপ চূড়ান্ত-উপমার
 অবতারণা করিয়া, গভীর দর্শন-তত্ত্ব—কর্ম, প্রাক্তন ও ব্রহ্ম প্রভৃতি বুঝাইয়া, তিনি

কহিলেন,—“যেমন নব-জন্মের বৃষ্টি-সলিলে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, ক্রমে কল-সম্পাদে প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ শমদমাদি সদাচার, জ্ঞান-প্রভাবে বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়া, আন্তরিক কল-আত্মসুখ উৎপাদন করতঃ, শ্রাদ্ধ হইয়া থাকে ।...যেমন পদ্ম হইতে সরোবরের ত্রী-বৃদ্ধি এবং সরোবর হইতে পদ্মের ত্রী-বৃদ্ধি হয়, তদ্রূপ জ্ঞান হইতে শম-দমাদির বৃদ্ধি ; এবং শম-দমাদি হইতে জ্ঞানের বৃদ্ধি হয় । আবার সদাচার হইতে জ্ঞান বৃদ্ধি হয় এবং জ্ঞান হইতে সদাচারের বৃদ্ধি হয় । যে পর্য্যন্ত জ্ঞান ও সদাচার যুগপৎ অভ্যস্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত তত্ত্বতয়ের কোনটাই সম্পূর্ণ আয়ত্ত হয় না । যেমন কলম-ধাতু-রক্ষিকা কৃষক-কামিনী উচ্চ করতালি দিয়া গান করায়, কলমধাতু-ভক্ষণার্থ বিহঙ্গম-কুলের নিরাকরণ এবং সঙ্গীত-প্রমোদ উভয়ই প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; তদ্রূপ যুযুক্ষ পুরুষ কর্তৃদ্বাভিমান পরিত্যাগ ও বিষয়-কামনা বর্জন দ্বারা জ্ঞান এবং সদাচার পদ যুগপৎ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।...কার্য্যমাত্রই ভোগ্য এবং ভোগ্য-বিষয়-মাত্রই মরীচিকা সলিলের ছায় মিথ্যা । যেরূপ ভ্রমসলিলের আশ্রয় মরীচিকা, সেইরূপ ভোগ্য-বস্তুর আশ্রয় ব্রহ্ম । কিন্তু দৃষ্টি-শক্তির দোষে মরীচিকায় যেমন জলভ্রম হয়, অজ্ঞান-দোষে ব্রহ্মেও সেইরূপ জগদ্ভ্রম হয় । আশ্রয় প্রত্যক্ষ হইলে, ভ্রম অপনীত হয় ; মরীচিকা প্রত্যক্ষ হইলে, তাহাতে আর জলভ্রম থাকে না ; তদ্রূপ ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ হইলে, তাহাতে আর জগদ্ভ্রম থাকে না ।” এইরূপে জগতের উৎপত্তি-প্রকরণ, স্থিতি-প্রকরণ এবং উপশম-প্রকরণ বর্ণনা করিয়া, মহর্ষি বশিষ্ঠ পরিশেষে নির্দোষ-মোক্ষের উপায় বর্ণন করিয়াছেন । তাহাতেও সেই গভীর দর্শন-তত্ত্ব প্রকটিত । জগৎ ও ব্রহ্মের অভিন্নতা প্রতিপাদন-ব্যপদেশে মহর্ষি বশিষ্ঠ বলিতেছেন,—“দ্বিত্ব ভাবনা ছাড় ; দেখিতে পাইবে,—শুধু দেই এক । দুইটা বিভিন্ন বস্তু ভাবি বলিয়াই, জল ও জলতরঙ্গ পৃথক নামে অভিহিত হইয়া থাকে । কিন্তু বাস্তবিক কি উহার স্বতন্ত্র ? মনোনিবেশ-সহকারে দেখ ; দেখিতে পাইবে, যেমন জল ও জলতরঙ্গ প্রকৃত একই বস্তু ; তদ্বৎ জানিবে,—সংসারে জ্ঞান বলিয়াও কিছু নাই ; অজ্ঞান বলিয়াও কোনও বস্তু নাই । শুধু তাহাই আছে,—যাহা জ্ঞান-অজ্ঞান পরিহার করিয়া এক অপূর্ব অবস্থায় অবস্থিত থাকে ।...যেমন এই মহাকাশ ঘটের অভ্যন্তরে থাকিয়া, ঘটাকাশ-রূপে পরিণত হইয়াও, বস্তুতঃ সেই মহাকাশ বলিয়া সর্বদাই অবিদ্যমান ভাব ; তদ্রূপ এই ব্রহ্মাণ্ডরূপে পরিণত ব্রহ্মও সেই একমাত্র তিনি বলিয়াই নিত্য ।...যেমন অয়্যকান্ত মণির সন্নিধি-মাত্রেরই জড় লৌহপিণ্ড আপনাপনিই চেতনের ছায় স্পন্দিত হয়, সেইরূপ এই অচৈতন্য শরীর-দেহ তাঁহারই সন্মুখের সচেতন হয় । পরিশেষে মহর্ষি বলিতেছেন,—“জ্ঞানের জ্যেষ্ঠতাব প্রাপ্তির নাম—বন্ধন ; আর, সেই জ্যেষ্ঠতাবের নিবৃত্তির নাম—মুক্তি । সম্যগ্জ্ঞানরূপ প্রাপ্ত হইলেই, জ্ঞানের জ্যেষ্ঠতাব প্রাপ্তিরূপ ভ্রান্তি নিবৃত্ত হইয়া যায় । তখনই নিরাকার শাস্ত্র-মুক্তি আসিয়া উপস্থিত হয় ।...স্বয়ং-প্রকাশ চৈতন্য সৃষ্টি-সময়ে নিজেই প্রকাশ (রূপ) ও প্রকাশ উভয় রূপে প্রকাশ হন । এই যে জগৎ প্রতিষ্ঠাত হইতেছে, ইহা আর কিছুই নহে ; আকাশ-রূপী চিৎ আকাশেই প্রকাশ পাইতেছেন । সেই চিতির সৃষ্টিক্রমে বিকাশই সৃষ্টি ; তাঁহার সৃষ্টিক্রমে বিকাশের আদিও নাই, অন্তও নাই,—চিরকালই হইয়া আসিতেছে ।”

এখানেও দেখিতেছি,—সেই ‘জ্ঞানানুজ্ঞিঃ’। যোগবশিষ্ঠ-রামায়ণ জ্ঞানের দ্বার উন্মোচন করিয়া, যুক্তি-তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন।

রামায়ণ বা রামচরিত লব্ধক্রে এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। বাম্বীকির রামায়ণ রচনায় যে কল্প-বৃক্ষের সৃষ্টি হয়, তাহার পত্র-পুষ্পফলে এখন জগৎ পরিব্যাপ্ত। বাম্বীকির নামেই একাধিক রামায়ণ প্রচলিত।

বিবিধ রামায়ণ-গ্রন্থ। রামায়ণ ও যোগ-বশিষ্ঠ রামায়ণের পরিচয় পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে।

তত্ত্বিম, অদ্ভুত-রামায়ণ—বাম্বীকির বিরচিত বলিয়া কথিত হয়।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসও নানারূপে রামচরিত বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অষ্টাদশ মহাপুরাণের প্রায় প্রত্যেক পুরাণেই রামচরিত পরিবর্তিত আছে। পদ্ম-পুরাণের পাতাল-খণ্ড, পূর্বেই বলিয়াছি, একখানি স্বতন্ত্র রামায়ণ-বিশেষ। ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণের অন্তর্গত অধ্যাক্ষ-রামায়ণ—এখন তো স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপেই প্রচারিত হইতে চলিয়াছে। মহাভারতেও রামচরিত পরিকীর্ণিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন—কাব্যে, নাটকে, ইতিহাসে, যাত্রায়, পাঁচালীতে, কবির গানে,—কতরূপে রামায়ণী-কথা প্রচারিত আছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে! মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশ—রামায়ণেরই অঙ্গবিশেষ। তর্জুহরি-বিরচিত ভট্টিকাব্য—রাবায়ণেরই অমুসৃতি। হিন্দি-ভাষায় তুলসীদাসী রামায়ণের বিশেষ প্রচলন। ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায়ও যে রামায়ণ নানারূপে অনূদিত ও প্রচারিত,—তাহা বলাই বাহুল্য। বাঙ্গালা-ভাষায় কৃত্তিবাসী-রামায়ণ, রঘুনন্দন-কৃত রামরসায়ন এবং রামমোহনের রামায়ণ,—রামায়ণ কত আকারেই প্রচারিত। নানারূপে নানাভাবে রামায়ণী-কথা আলোচিত হওয়ায়, ভিন্ন ভিন্ন রামায়ণের মধ্যে অনেক স্থলে এখন অনেক রূপ পার্থক্য দেখিতে পাই। সে পার্থক্য কেন হইল বা কিরূপে হইল,—সকলগুলির আলোচনা করিলে, কতকটা বুঝা যাইতে পারে। বাম্বীকির রামায়ণে আমরা কতকগুলি বিষয় দেখিতে পাই না; অথচ, অল্প রামায়ণে সেই সকল বিষয় সন্নিবিষ্ট আছে,—লোকমুখেও তত্ত্বদ্বিধরণ বিশেষ-ভাবে প্রচারিত হইতেছে। সকল রামায়ণের বা রামচরিতের সকল পরিচয়-প্রদান—কখনই সম্ভবপর নহে। তথাপি, সংক্ষেপে দুই একখানির বিষয় আলোচনার আবশ্যক অনুভূত হয়।

বাম্বীকির পরই বেদব্যাস-বিরচিত রাম-চরিতের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যাইতে পারে। সে হিসাবে, পদ্ম-পুরাণ পাতাল-খণ্ডের বিষয়ই প্রথমে উল্লেখ করিতেছি।

পদ্ম-পুরাণে রামচরিত। পাতাল-খণ্ডে যে রামচরিত দেখিতে পাই, তাহার আরম্ভ—রাবণ-বধান্তর ক্রীরামের লঙ্কা হইতে প্রত্যাবর্তনে। নন্দিগ্রামে গমন,

রাজ্যাভিষেক, সীতা-বর্জন, অশ্বমেধ-যজ্ঞ এবং তত্পলক্ষে নানা যুদ্ধ-বৃত্তান্ত

তাহাতে বর্ণিত হইয়াছে। মধ্যে লোমশ মুনি-কথিত রামের জীবন-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে।

সে বৃত্তান্ত—দৈনন্দিন ঘটনাবলী দিনলিপির (Diary) স্থায় বিস্তৃত। লোমশ বলিতেছেন,—‘পঞ্চদশ-বর্ষ বয়ঃক্রম-কালে জনক-রাজ-গৃহে হরথহু ভঙ্গ করিয়া রামচন্দ্র সীতাকে প্রাপ্ত হন; তৎপরে ষোড়শ বৎসর-কাল পরম সুখে বাস করিয়া, সপ্তবিংশ-বর্ষ বয়ঃক্রম

কালে, চতুর্দশ বৎসরের জন্ত, পিতৃসত্যপালনার্থ, নির্বাসিত হন ; বনমধ্যে ত্রয়োদশ বর্ষ অতীত হইলে, পঞ্চবটী-বনে লক্ষ্মণ কর্তৃক শূর্ণধার নাসা-কর্ণ-ছেদ হয় । মাঘ মাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে, বিষ্ণু নামক মুহূর্ত্তে, রাম-লক্ষ্মণের অল্পপস্থিতিকালে, বনানন সীতাকে হরণ করে । দশম মাসে, অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা নবমীতে, জটায়ুর জ্যেষ্ঠ সম্প্রতি, বানরগণকে সীতার সন্ধান প্রদান করেন । একাদশীর রাত্রিতে হনুমান লক্ষ্য উপনীত হয় ; সেই দিন শেষ রাত্রে সীতার সহিত হনুমানের সাক্ষাৎ,—সপ্তমীতে রামের নিকট সীতার সংবাদ আনয়ন । পর দিবস, উত্তরফাল্গুনী নক্ষত্র-যুক্ত অষ্টমী তিথিতে, সূর্য্যদেব মধ্যাকাশে উপস্থিত হইলে, বিজয় মুহূর্ত্তে ত্রীরামচন্দ্র যুদ্ধ-যাত্রা করেন । যাত্রার অব্যবহিত পরেই সুরগীবের সহিত তাঁহার সখ্য হয় । অষ্টমী হইতে অমাবস্তা পর্য্যন্ত অষ্ট-দিবস শিদির-সরিবেশে নিষ্কৃতিরে অবস্থান ; পৌষমাসের গুরুপক্ষীয় প্রতিপদ হইতে তৃতীয়া পর্য্যন্ত অবস্থিতির পর, বিভীষণের সহিত রামচন্দ্রের সন্মিলন হয় । কয়েক দিন সমুদ্র-তীরে অবস্থানের পর, দশমীতে সেতু আরম্ভ এবং ত্রয়োদশীতে পরিসমাপ্তি ; পৌর্ণমাসী হইতে দ্বিতীয়া পর্য্যন্ত তিন দিবসে সৈন্যগণের সাগর অতিক্রমণ । অনন্তর, মাঘমাসের গুরু-প্রতিপদে, ত্রীরাম-দূত অঙ্গদ রাবণ সরিষানে উপস্থিত হন । উক্ত মাঘ মাসের ত্রিতীয়াদি অষ্টমী পর্য্যন্ত সপ্ত দিবস রাক্ষস ও বানরগণের শঙ্কল যুদ্ধ হয় । ফাল্গুন মাস ও চৈত্র মাস ঘোর যুদ্ধ চলে । চৈত্র মাসের গুরু-দ্বাদশী হইতে কৃষ্ণ-চতুর্দশী পর্য্যন্ত অষ্টাদশ দিবসের বিষম সমরে, রামচন্দ্র জয়লাভ করেন । মাঘ মাসের গুরুপক্ষের দ্বিতীয়াতে ঐ যুদ্ধের আরম্ভ ; আর, চৈত্র-মাসের কৃষ্ণাচতুর্দশীতে—সপ্তাশীতি দিবসে—উহার পরিসমাপ্তি । মধ্যে পঞ্চদশ দিবস যাত্রা যুদ্ধ স্থগিত ছিল ; তন্নিম্ন অপর দ্বি-সপ্ততি দিবস যুদ্ধ হইয়াছিল । ঐ কৃষ্ণা-চতুর্দশীতেই রাবণ নিহত হন ; অমাবস্তার দিন তাঁহার সংকার হয় । ইহার পর, বিভীষণের রাজ্যভির্ষেক হইতে রামের অষোধ্যা-প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত দৈনন্দিন ঘটনাবলীও সংক্ষেপে বর্ণিত আছে । তাহাতে আরও দেখা যায়,—‘মৈথিলী রামবিযুক্তা হইয়া, রাবণ-গৃহে একাদশ মাস ও চতুর্দশ দিবস বাস করিয়াছিলেন ।’ এইরূপে ত্রীরামচন্দ্র যখন রাজ্য-ভার গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম দ্বি-চত্বারিংশৎ বৎসর । তৎকালে সীতার বয়ঃক্রম ত্রয়ত্রিংশৎ বৎসর । রামচন্দ্র যে সময় রাজ্য-শাসন করিতেছেন, লোমশ মুনি সেই সময় আরণ্যক ঋষির নিকট এই সকল কথা বর্ণন করিয়াছিলেন । পদ্ম-পুরাণের পাতাল-খণ্ডে রামচন্দ্রের অশ্বমেধ-যজ্ঞ সমাপ্তি পর্য্যন্ত সমস্ত বিবরণ লিখিত আছে । কিন্তু কত বয়সে, কিরূপ ভাবে, তাঁহার দেহান্তর ঘটে,—তাহার কোনই উল্লেখ নাই । লক্ষ্মণ-বর্জন, সীতার অগ্নি-পরীক্ষা, সীতার পাতাল-প্রবেশ, রাবণ-বধের নিমিত্ত রামের অকাল-বোধন প্রভৃতির কোনও উল্লেখও ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায় না । ইহার প্রধান বর্ণনীয় বিষয়—অশ্বমেধ-যজ্ঞ । সেই যজ্ঞের ষোটক কুশী-লব কর্তৃক আবদ্ধ হইলে, বালকদ্বয়ের সহিত শত্রুর প্রভৃতির যুদ্ধ ও পরাজয় হয়,—তৎ-বৃত্তান্ত তাহাতে বর্ণিত আছে । সেই পরাজয়-বৃত্তান্ত প্রবণ করিয়া, ত্রীরামচন্দ্র বায়ীকির ভাপোবনে গমন করেন । তৎপরে রাম-সীতার মিলন হয় । রামরাজ্যই কিরূপ সুখ-সমৃদ্ধিশালী ছিল, পদ্ম-পুরাণে তাহার প্রাপ্ত চিত্র দেখিতে পাই ।

তখন শত্রু-কেন্দ্র সর্বদাই প্রচুর শস্ত্রে পূর্ণ থাকিত; গবাদির স্বাস্থ্য-দ্রব্য প্রচুর উৎপন্ন হইত; দেশের স্বাস্থ্য সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল; গ্রাম-সকল বহুতর দেবালয়, উত্তম পুষ্পোদ্ভাবন ও সুবাহু-কলযুক্ত বৃক্ষ-শ্রেণীতে সুশোভিত ছিল; কাহারও কোনরূপ অভাব ছিল না; ধর্ম্মাভিগত লোক-সকল স্ত্রী-পুত্রাদি পরিজন লইয়া সুখে জীবন-যাপন করিত;—

“স পদ্মিনীকাসারা যত্র রাজস্তি ধুময়ঃ । সদন্তা নিরুগা যত্র ন যত্র জনতা কচিৎ ॥

কুলান্যেব কুলীনানি বর্ণানাং ন ধনানি চ । বিভ্রমো যত্র নারীবু ন বিহংস চ কচিৎ ॥

নদ্যাঃ কুটিলগামিষ্ঠো ন যত্র বিহরে প্রজাঃ । তমোযুক্তাঃ ক্ষপা যত্র বহুলেবু ন মানবাঃ ॥

রজোযুক্তাঃ স্ত্রীমো যত্র ন ধর্ম্মবহলা নরাঃ । ধেনৱনকো যত্রান্তি জনো নৈব চ ভোজনম্ ॥”

‘বহুতর সরোবর এবং প্রত্যেক সরোবরেই পদ্মিনী শোভা পাইত। তৎকালে নদীই উচ্ছত-বেগে চলিত; কিন্তু কোনও লোক উচ্ছত-ভাবে চলিত না। লোক-সকল কুলীন (স্বয়ংশ্রুত) ছিল; কাহারও অর্থ কুলীন (চোরভয়ে-ভূগর্ভে নিহিত) ছিল না। রমণীগণেই বিভ্রম (বিলাস) ছিল; পণ্ডিতবর্গে কখনই বিভ্রম (ভ্রান্তি) দেখা যাইত না। নদী-সকল বক্রগামী ছিল; প্রজাবর্গের মধ্যে কেহই বক্রগামী ছিল না। ক্লকপক্ষের ত্রিবিধই তমো-যুক্ত (অন্ধকারময়) হইত; কিন্তু মহুগণ তমোযুক্ত ছিল না। রমণীরাই কেবল রজো-যুক্ত (রক্তাশ্রিত) হইত; কিন্তু ধার্মিক মানব কেহই তখন রজোযুক্ত (রাজসিক ভাবাপন্ন) ছিল না। মহুগৃহে কেবল ধন-সম্ভেদ অনন্ধ (অমত্ত) ছিল; কিন্তু ভোজন-অনন্ধ (অন্ন-শূন্য) ছিল না।’ এবং বিধি সুখ-সম্পৎ-পূর্ণ রাজ্য ত্রিরাশচক্র ধর্ম্মানুসারে একাদশ সহস্র-বৎসর পালন করিয়াছিলেন।

বেদব্যাস-বিরচিত অন্ত্যস্ত পুরাণের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণান্তর্গত অধ্যায়-রামায়ণে বিশেষ-ভাবে রামচরিত বর্ণিত হইয়াছে। বাম্বীকির রামায়ণের আদিকাণ্ডে পঞ্চদশ সর্গে লিখিত

আছে,—‘পৃথিবীর ভার লাঘব করিবার জন্ত, পদ্মপলাশলোচন ভগবান, চারি অংশে বিভক্ত হইয়া, দশদিকের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন।’ উক্ত

পুরাণান্তরে
রামচরিত।

রামায়ণে এই মাত্র উল্লিখিত হইলেও, বাম্বীকি ত্রিরাশচক্রকে আদর্শ

মহুগুরুপেই চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু অধ্যায়-রামায়ণ ত্রিরাশচক্রকে প্রধানতঃ পূর্ব-ব্রহ্মরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থের স্থল ঘটনাবলী বাম্বীকির সহিত অভিন্ন বটে; কিন্তু পার্থক্য,—প্রধানতঃ পূর্বোক্ত বিষয়ে। এই অধ্যায়-রামায়ণে ত্রিরাশের রাজ্যাত্তিবেক উপলক্ষে মহেশ্বর ও ইন্দ্র প্রমুখ দেবগণ, পিতৃগণ এবং বক্ষ-গন্ধর্ব্বগণ ত্রিরাশ-চক্রের স্বরূপ করিতেছেন,—দেখিতে পাই। অধিক কি, ‘তুমি ঈশ্বর, তুমি চন্দ্র-সূর্য্যাদির অন্তর্গত তেজ, তুমি নিখিল-শরীরগণের চৈতন্য এবং প্রাণিগণের শৌর্য্য-বৈর্য্য-আহু’ ইত্যাদি বিশেষণেও ত্রিরাশচক্রকে বিশেষিত করা হইয়াছে। ত্রিরাশচক্র স্বরূপে আপনাকে ঈশ্বর বজ্রিয়া পরিচয় দিতে ক্রটি করেন নাই। তিনি তাঁহার জননীকে পর্য্যাপ্ত বুকাইতেছেন,—‘যাযং আমাকে সর্কভূতে এবং আপনাতে অবস্থিত বলিয়া জানিতে না পারিবে, তাবৎ দেবরূপী আমাকে নিজ-কর্ম্মাহুতান দ্বারা পূজা করিবে। তজ্জিহবে আমাকে সর্কাত-দ্যামিরূপে বা গুজরূপে নিত্য স্মরণ করিলে শান্তি লাভ করিবে।’ এই স্থলে আরও দেখিতে পাই,—জননী কৌশল্যা ত্রিরাশচক্রকে ঈশ্বর-জ্ঞানে ভক্তি-সহকারে সাদায়ে প্রণাম

করিতেছেন । * বলা বাহুল্য, বায়ীকিতে এ ভাব কোথাও পরিলক্ষিত নাই । অধ্যায়-রামায়ণের মতেও, শ্রীরামচন্দ্র ‘দশসহস্র দশ শত’ বৎসর মর্ত্যভূমে বিরাজমান ছিলেন । শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের পর, পৃথিবী শস্যশালিনী হয়, বৃক্ষ-সকল ফলবান হয়, পুষ্প-সকল সুগন্ধপূর্ণ হয় ; এবং রাজা হইয়া তিনি ত্রিংশৎ কোটি সুবর্ণ-মুদ্রা, অশ্ব, ধেনু, ভূষণ, রত্ন, বসন প্রভৃতি দান করেন । অধ্যায়-রামায়ণে রাম-চরিতের যে বর্ণনা দেখা যায়, দেবীভাগবতের বর্ণনা তাহা হইতে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র । দেবীভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে, অষ্টাবিংশ, একোনত্রিংশ ও ত্রিংশ—মাত্র তিনটি অধ্যায়ে রামচরিত বর্ণিত আছে । রামের জন্ম হইতে রাবণের সহিত যুদ্ধারম্ভ পর্যন্ত ঘটনাবলী শতাধিক শ্লোকে বর্ণনা করিয়া, পুরাণকার তাহাতে রাবণ-বধ-ব্যাপার বিবৃত করিয়াছেন । রাবণ-বধ-চিন্তায় রাম যখন মুহমান, সেই সময় দেবর্ষি নারদ তাঁহার নিকট আগমন করিয়া, তাঁহাকে রাবণ-বধের উপায় বলিয়া দিতেছেন । এই-খানেই প্রথম দেখিতে পাই, মহর্ষি বলিতেছেন, —“আপনি সংপ্রতি এই আশ্বিন মাসে, পরম শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া, সর্বসিদ্ধিকর নবরাত্রি ব্রত করুন । ঐ ব্রতে নবরাত্রি উপবাসী থাকিয়া, যথাবিধানে জগহোমাদি-সমবিত ভগবতীর অর্চনা করিতে হইবে । দেবীর প্রীত্যর্থে প্রশস্ত পবিত্র পুষ্পবলি-সমূহ প্রদান-পূর্বক জপের দশাংশ হোম করিলে, আপনি রাবণ-বিনাশে সক্ষম হইবেন ।” নারদের এবং বিধ উপদেশে রামচন্দ্র ব্রতানুষ্ঠানে উদ্যুক্ত হন । আশ্বিন মাস সমাগত হইলে, সর্বকল্যাণকারিণী জগদম্বিকার প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া, রামচন্দ্র ব্রত আরম্ভ করেন । মহাষ্টমীর নিশীথকালে, সিংহবাহনে অবস্থান করতঃ, দেবী ভগবতী শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন দিয়া বলেন,—‘তুমি লক্ষ্য বসন্ত-কালে পরম শ্রদ্ধা-সহকারে আমার আরাধনা করিও ; তাহাতে পাপমতী দশাননকে সংহার করিতে পারিবে ।’ দেবী-ভগবতের মতেও, শ্রীরামচন্দ্র একাদশ সহস্র বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন । ইহা হইতেও আভাস পাওয়া যায়, বাসন্তী-পূজার পর রাবণ-বধ সমাপিত হইয়াছিল । শ্রীমদ্ভাগবতের নবম-স্কন্ধের দশম ও একাদশ অধ্যায়ের মাত্র একাশীতি-সংখ্যক শ্লোকে রামচরিত বর্ণিত হইয়াছে । তাহাতেও দেখিতে পাই,—রামচন্দ্র সিংহাসনাধিরোহণ করিলে, ত্রেতাযুগও সত্যযুগের স্তায় সর্বসুখাবহ হইয়াছিল ; রামরাজত্বে আশি-ব্যাধি-জরা-শোক-অনশন-ভয়-গ্রামি দূরে গিয়াছিল ; নদ-নদী-সমুদ্র-গিরি সকলেই অভিলষিত ফল প্রদান করিতেছিল । বিষ্ণু-পুরাণের চতুর্গাংশের চতুর্থ অধ্যায়ে কয়েকটি ছন্দে, অতি সংক্ষেপে, রামচরিত বর্ণিত আছে । কুর্শ-পুরাণের পূর্বভাগে একবিংশ অধ্যায়ে সংক্ষিপ্ত রামচরিত-প্রসঙ্গে দৃষ্ট হয়,—লঙ্কার সেতুমধ্যে শ্রীরামচন্দ্র দৈশান-লিপ্ত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । কচ্ছি-পুরাণের তৃতীয়াংশে, তৃতীয় অধ্যায়ে, সংক্ষেপে রামচরিত বর্ণিত হইয়াছে । তাহাতে দেখা যায়,—শূনাগনে পৃথিবী আনন্দপূর্ণা হইয়াছিলেন, এবং রামচন্দ্র দশ সহস্র বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন । বৃহদ্বক্ষ-পুরাণের পূর্ব-খণ্ডে, অষ্টাদশ হইতে ষাণ্ঠিশ অধ্যায়ে, রামায়ণী-কথা আছে । বায়ীকির রামায়ণের অম্বুসরণে বেদব্যাস যে রামচরিত বর্ণন করেন, এমন কি সেই আদর্শেই বে তাঁহার মহাভারত পর্যন্ত প্রণীত হয়,—এই গ্রন্থে

তাহা স্মৃতিঃ উল্লিখিত হইয়াছে। * শ্রীরামচন্দ্র-কর্তৃক ভগবতীর পূজার বিষয় এই পুরাণে যেরূপ বিশদভাবে বর্ণিত আছে, অন্য পুরাণে তাহা কচিৎ দৃষ্ট হয়। কিরূপ ভাবে বোধন আরম্ভ হইবে; কিরূপ ভাবে সপ্তমী-অষ্টমী-নবমী পূজা সমাহিত হইবে; কিরূপ ভাবে দশমীকৃত্য সম্পন্ন করিতে হইবে,—ইহাতে তাহার আভাস পাওয়া যায়। আশ্বিন মাসে আর্দ্রা-নক্ষত্র-যুক্ত কৃষ্ণ-নবমী তিথিতে বোধনারম্ভ হইতে রাবণ-বধ পর্যন্ত ভগবতীর পূজা চলিয়াছিল। নবমীতে রাবণ নিহত হয়; বিজয়া দশমীতে রামচন্দ্র জয়-যুক্ত হন। এই বৃহদ্বর্ষ-পুরাণের মতে—শ্রাবণ মাসের শুক্ল-দশমী-তিথিতে রামচন্দ্র সেনাসম-ভিষ্যাহারে যুদ্ধ-যাত্রা করেন। অহোরাত্র ষোড়শ প্রহর চলিয়া, ছাদশীর অপরাহ্নে, তাঁহার সমুদ্র দেখিতে পান। ত্রয়োদশীতে বিভীষণের সহিত তাঁহাদের সন্মিলন হয়; শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণা-চতুর্দশীর পুষ্টা নক্ষত্রে শ্রীরামচন্দ্র সমুদ্রের দক্ষিণ পারে গিয়া উপনীত হন। বলা বাহুল্য, পদ্ম-পুরাণ পাতাল-বন্তের বর্ণনার সহিত এই বর্ণনার তিথি-নক্ষত্র-মাস প্রভৃতি লক্ষ্যে অসামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়। † উভয় পুরাণেই দৈনন্দিন দিনলিপি হিসাবে যুদ্ধযাত্রা বর্ণিত হইয়াছে বটে; কিন্তু সময়ের অসামঞ্জস্য কেন ঘটিল,—তাহাই তর্কের বিষয়। এইরূপ অপরাপর পুরাণেও ঘটনার কিছু তারতম্য দৃষ্ট হয়। প্রধানতঃ সকল পুরাণেই রামচন্দ্রের আখ্যান আছে; এবং তাঁহার রাজত্ব যে আদর্শ-রাজত্ব ছিল,—পুরাণ-সমূহের বর্ণনা হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়। দেবী-পুরাণে দুর্গোৎসবের বিবরণ আছে। কিন্তু তাহাতে শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গোৎসবের উল্লেখ দেখিতে পাই না।

রামায়ণ-বর্ণিত একই রাম-চরিত ক্রমশঃ কতদূর পরিবর্তিত হইয়াছে, অস্বদেশ-প্রচলিত কুস্তিবাস-বিরচিত রামায়ণ-প্রসঙ্গ আলোচনা করিলে, তাহা বিশদ-রূপে বুঝা

বাস্তবিক যাইতে পারে। দৃষ্টান্ত-স্থলে, কয়েকটি প্রধান প্রধান ঘটনার উল্লেখ

ও করিতেছি। প্রথম,—রাবণ-বধে শ্রীরামচন্দ্রের অকাল-বোধন;

কুস্তিবাস। দ্বিতীয়,—লব-কুশের সহিত শ্রীরামচন্দ্রের যুদ্ধ; তৃতীয়,—রাম-লক্ষ্মণকে যজ্ঞ-রক্ষার্থ বিশ্বামিত্রের সহিত প্রেরণ উপলক্ষে দশরথের ছলনা; চতুর্থ—তরগীসেন, মহীরাবণ, অহিরাবণ প্রভৃতির বধ-প্রসঙ্গ। যে যে গ্রন্থে যে যে ভাবে রাম-চরিত বর্ণিত হইয়াছে, মোটামুটি আমরা তাহার আভাস দিয়াছি। এক্ষণে কুস্তিবাসী রামায়ণের সহিত বাস্তবিক রামায়ণের কি কি পার্থক্য আছে, সংক্ষেপে তাহাও আলোচনা করিতেছি। সে আলোচনায় পাঠকগণ নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন, ক্রমশঃ কি ভাবে মূল-তত্ত্ব পল্লবিত হইয়া পড়িয়াছে। বাস্তবিক ও কুস্তিবাসের দুইখানি রামায়ণ প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত মিলাইয়া দেখিলে, প্রধানতঃ দেখা যায়, বাস্তবিক রামায়ণের এক দুই বা ততোধিক অধ্যায়ের মর্ম্ম লইয়া, এক একটা 'শিরোনামায়', কুস্তিবাস তাহা পক্ষে নিবদ্ধ করিয়াছেন। মোটা-মুটি, অনেক বিষয়ে, কুস্তিবাসের রামায়ণকে বাস্তবিক রামায়ণের

* বৃহদ্বর্ষ-পুরাণ, পূর্ব-বও, পঞ্চবিংশতি অধ্যায়ের ২৩শ হইতে ৩০শ শ্লোক।

† পদ্ম-পুরাণ, পাতালবও, একত্রিংশ অধ্যায় এবং বৃহদ্বর্ষ-পুরাণ পূর্ববও একবিংশ অধ্যায় মিলাইয়া পাঠ করিলে, এই অসামঞ্জস্য বুঝিতে পারা যাইবে।

সংক্ষিপ্তস্বর বলিলেও বলা যাইতে পারে। কৃষ্ণবাস স্থানে স্থানে বাম্বীকির রামায়ণকে সংকোচ করিয়াছেন বটে ; কিন্তু অনেক স্থানে আবার তদতিরিক্ত শাখা-প্রশাখার অবতারণায় স্বয়ং কল্পনা-লীলায় গ্রন্থ-কলেবর পল্লবিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার বর্ণিত অনেক কাহিনী বাম্বীকির রামায়ণে আদৌ নাই। কতকগুলি বিষয়-সম্পর্কে তিনি পুরাণান্তরের আশ্রয় লইয়াছেন বলিয়া জানা যায় ; কিন্তু অত্র কতকগুলির অস্তিত্বের প্রমাণ কোনও প্রধান পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায় না। জানি না,—সে সমুদায় তাঁহার স্বকপোল-কল্পিত কি না ? প্রথমতঃ, রাম ও সীতার চরিত্র-চিত্রণেই বাম্বীকি ও কৃষ্ণবাসে অনৈক্য। শ্রীরামচন্দ্রের দেবত্ব এবং তাঁহার উপাসনা প্রভৃতির যে ভাব কৃষ্ণবাসে পরিস্ফুট, বাম্বীকিতে তাহা নাই। বাম্বীকি, রামচন্দ্রকে আদর্শ মনুষ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তাঁহার ক্রিয়া-কলাপ প্রচার করিয়াছেন। আর, কৃষ্ণবাস তাঁহাতে ভগবদ্ভাবের বিকাশ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কৃষ্ণবাসের রাক্ষসেরা যুদ্ধক্ষেত্রেই দেবতা-জ্ঞানে শ্রীরামের স্তব আরম্ভ করিয়া দিয়াছে ; এবং স্বয়ং কৃষ্ণবাসও অবসর পাইলেই রাম-মহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। কৃষ্ণবাসের রামায়ণের বহু স্থানে কৃষ্ণবাসের নিজের উক্তিভেদেই দেখিতে পাই,—

“শমন-দমন রাবণ রাজ্য রাবণ-দমন রাব । শমন-ভবন না হয় গমন বে লয় রামের নাম ।”

কিন্তু বাম্বীকিতে এ ভাবের কোনই বিকাশ নাই। বাম্বীকির সীতা এবং কৃষ্ণবাসের সীতা—এ দুই চিত্রেও অনেক স্থলে বিলক্ষণ বৈপরীত্য দৃষ্ট হয়। সীতাহরণের সময় বাম্বীকির সীতা রোষান্বিতা ফণিনীর ত্রায় গজ্জন করিতেছেন ; আর, কৃষ্ণবাসের “জানকী কাপেন যেন কলার বাগুড়ি।” কৃষ্ণবাসের সীতা—লজ্জাবতী লতা বঙ্গ-কুলাদিনা ; আর বাম্বীকির সীতা—বলদর্পিতা বীর-রমণী। বাম্বীকির সীতা রাবণকে ভৎসনা করিয়া বলিতেছেন,—“রে নীচকর্ম্মা রাবণ ! রাম-লক্ষণ-বিহীন। আমাকে তব্বরের ত্রায় অপহরণ করিয়া তুই লজ্জিত হইতেছিস্ না ! মৃত্যুকালে মনুষ্য যেমন বিপরীত কার্য্যে রত হয়, তুইও সেইরূপ বিপরীত কার্য্যে রত হইয়াছিস্। আমার মহাত্ম্য স্বামীর অহিতাচরণ করিয়া, কোথায় সুখলাভ করিবি ? তুই নিশ্চয় জানিস্—তোর কখনই নিস্তার নাই।”

“মুমুর্নাস্ত সর্পেবাং নং পথাং তন্নরোচতে । পশ্যামীহিকঠে দ্বাং কালশাশবপীশিতং ।”

মুমুর্নাস্ত-বাস্তি-মাত্রেয়ই হিতকর পথ্য ক্রটিকর হয় না, তোরও সেই অবস্থা হইয়াছে। তোয় কণ্ঠদেশ কালপাশে আবদ্ধ হইল—জানিবি।” রাবণের সমক্ষে এববিধ গর্কোক্তিকে কি কখনও ‘কদলীপত্রের ত্রায় কম্পন বলা যায় ?’ দ্বিতীয়তঃ,—প্রতি-কাণ্ডেই কিছু-না-কিছু পার্বক্য। আদিকাণ্ডে দেখিতে পাই ;—গ্রহাৱন্তেই, দুই গ্রহে দুই স্বতন্ত্র পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে। বাম্বীকির রামায়ণে গ্রহাৱন্তে আছে,—বাম্বীকি নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এই ভূমণ্ডলে গুণবান্ বীৰ্য্যবান্ দীপ্তিমান্ ইত্যাদি গুণসম্পন্ন এমন কে আছেন, তাঁহার চরিত্র বর্ণনা করুন ; এবং মহর্ষি নারদ শুদ্ধতরে শ্রীরাম-চরিত্র কহিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু কৃষ্ণবাসের রামায়ণের প্রথমই গোলাকের বর্ণনা এবং নারায়ণের চারি অংশে প্রকাশ-বিবরণ। ব্রহ্মার নিকট উপদেশ পাইয়া ‘মরা মরা’ বলিতে বলিতে ‘রাম’ নাম বলিয়া বাম্বীকি পাণ্ডে পরিত্রাণ পান,—এ কথা কৃষ্ণবাসে আছে ; কিন্তু বাম্বীকির রামায়ণে

তাহা নাই। চন্দ্রবংশ ও সূর্য্যবংশের বর্ণনার * আড়ম্বর—অধিক কি ‘রাজা হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান’ পর্য্যন্ত—বান্দীকির রামায়ণে নাই; কিন্তু কৃতিবাসী রামায়ণে আছে। কাণ্ডার মূর্নির বৈকুণ্ঠে গমন, সৌদাস রাজার গঙ্গাস্পর্শে মুক্তি,—এ সকল কাহিনীও বান্দীকির রামায়ণে নাই। আর একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা—বান্দালার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার যুখে যুখে যাহা প্রচারিত আছে—রাজা দশরথ ভাড়া-সংহার-কালে মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে ছলনা করিয়া রাম-লক্ষ্মণের পরিবর্তে প্রথমে ভরত-শক্রককে পাঠাইয়াছিলেন, এবং পরীক্ষার বিশ্বামিত্র তাহা বুঝিতে পারিয়া কোপান্বিত হইয়াছিলেন;—ইহাও বান্দীকির রামায়ণে নাই। কৃতিবাসী রামায়ণে ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন ব্যাপারে মেড়াতলা, নবদ্বীপ, আকনা, মাহেশ প্রভৃতি যে সকল গ্রামের নাম উল্লেখ আছে,—তাহাও কৃতিবাসের সংযোজন মাত্র। এই সকল তো নূতন সংযোজন দেখা গেল। এদিকে আবার—বান্দীকির রামায়ণের বর্ণিত কাণ্ডিকের জন্ম-বিবরণ, শবলা লইয়া বশিষ্ঠের সহিত বিশ্বামিত্রের বিরোধ, বিশ্বামিত্রের তপস্তা, বিশ্বামিত্রের তেজে ত্রিশঙ্কর স্বর্গারোহণ, অশ্বরৌষের যজ্ঞ, বিশ্বামিত্রের রূপায় শুনশেফের উদ্ধার প্রভৃতি-বিষয় বান্দীকির রামায়ণে বর্ণিত আছে; কিন্তু কৃতিবাসে নাই। তৃতীয়তঃ,—অযোধ্যা, অরণ্য এবং কিঙ্কিয়া কাণ্ডের মধ্যে তাদৃশ অসামঞ্জস্য না থাকিলেও, সুন্দরাকাণ্ডে কয়েকটি গুরুতর অসামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়। হনুমানের নিকট রাক্ষসী-রূপধারিণী লঙ্কার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর পদ্মাজয়ের কাহিনী বান্দীকির রামায়ণে বর্ণিত আছে; কিন্তু কৃতিবাসে তাহা নাই। এদিকে আবার, হনুমানের প্রার্থনায় উগ্রচণ্ডা-দেবীর লঙ্কাত্যাগের কাহিনী এবং জয়ন্ত-কাক সীতাকে আক্রমণ করায় শ্রীরাম কর্তৃক তাহার চক্ষু-বিদ্ধকরণ-বিবরণ—কৃতিবাসে আছে, কিন্তু বান্দীকিতে নাই। বানরগণের সাগরপার-মন্ত্রণা এবং হনুমানের সাগর-পারোত্তোগ প্রভৃতি অংশ—বান্দীকির রামায়ণে কিঙ্কিয়াকাণ্ডে আছে, কিন্তু তাহা কৃতিবাসের সুন্দরাকাণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে। অনেক স্থানের কথাবার্তায়, কৃতিবাসের ও বান্দীকির রামায়ণে পার্থক্য দৃষ্ট হয়। ‘অশোকবনে সীতাদেবীর নিকট গমন’ সময়ে কৃতিবাসে আছে—“গালাগালি পাড়ে সীতা রাবণ তা শুনে।” কিন্তু বান্দীকির রামায়ণে আছে, ঐ সময় সীতার উক্তি শোক-তাপব্যঞ্জক; রাবণের প্রতি বিশেষ কোনও কর্কশ কথা তখন তিনি উচ্চারণ করেন নাই। রামের সহিত বিভীষণের যোগদান—বান্দীকির রামায়ণে লঙ্কা-কাণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু কৃতিবাসী রামায়ণে উহা সুন্দর-কাণ্ডের অন্তর্নিবিষ্ট। “বিভীষণকে রাবণের পদাঘাত” কাহিনী বান্দালার নরনারী সকলেই কৃতিবাসের রূপায় অবগত আছেন; কিন্তু বান্দীকির রামায়ণে ‘পদাঘাতের’ কথা কোথাও নাই; তাহাতে রাবণের ভৎসনার অভিমানে বিভীষণ চলিয়া যান—এই মাত্র উল্লেখ আছে। চতুর্থতঃ,—লঙ্কা-কাণ্ডে কৃতিবাসের কল্পনা অনেক স্থলে বান্দীকিকেও পরাভূত করিয়াছে। এক ‘তরঙ্গীসেন-বধের’ দৃষ্টান্তই চরম বলিয়া মনে হয়। “তরঙ্গীর কাটাখুণ্ড বলে রাম রাম”—পঞ্চম-বর্ষীয় শিশুর যুখেও এ যুগান্ত শুনিতে পাইবেন; কিন্তু ‘তরঙ্গীসেন-বধ’ কোথা হইতে আসিল—

* সূর্য্যবংশ ও চন্দ্রবংশ বর্ণনার বান্দীকির ও কৃতিবাসের রামায়ণ মিলাইয়া দেখিলে, বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হইবে।

কেহ বলিতে পারেন কি ? কেবল বায়ীকির রামায়ণ কেন, প্রচলিত কোনও পুরাণে তরুণীসেনের অস্তিত্ব সন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না । এইরূপ, মহীরাবণ, অহিরাবণ, বীরবাহু প্রভৃতির যুদ্ধ-কাহিনীও বায়ীকির রামায়ণে নাই । * হনুমানের বিশাল্যকরণী আনিতে যাওয়ার সময়, কালেনমীর বাধা দেওয়া, সূর্য্যকে হনুমানের বগলে লওয়া, ভরতের বাটুলে হনুমানের পতন,—এ সকল কথাও বায়ীকিতে নাই । শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গোৎসব, অকাল-বোধন প্রভৃতি লোক-প্রসিদ্ধ কাহিনী এবং রাবণ-বধে ভগবতীর পূজার নীলপদ্ম আনয়ন ও একটি নীলপদ্ম কম পড়ায় শ্রীরামের চক্ষুরূপাটন করিতে যাওয়া,—এবংবিধ প্রসঙ্গও বায়ীকির রামায়ণে দেখা যায় না । রাবণ-বধের পূর্বে, বায়ীকির রামায়ণে আছে—অগস্ত্য কেবল রামচন্দ্রকে আদিত্য-হৃদয়-নামক স্তব পাঠ করিতে বলেন, এবং রামচন্দ্র তদনুযায়ী সূর্য্যের স্তব ও পূজা করেন । হনুমান কর্তৃক মন্দোদরীর নিকট হইতে গণকবেশে কৌশলে রাবণের মৃত্যুবাণ আনয়ন, হনুমান কর্তৃক রাবণের চণ্ডীপাঠ অন্তর্দ্বি-করণ, এবং মৃত্যুকালে রাবণ কর্তৃক রামকে রাজনীতি শিক্ষাদান (স্বর্গের সিঁড়ি নির্মাণ প্রভৃতি) ইত্যাদি—বায়ীকি-রামায়ণের অন্তর্ভুক্ত নহে । লঙ্কাকাণ্ডের আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক কথা, কুন্তিবাসের রামায়ণে পরিবর্তিত । ব্রহ্মার তপস্তা করিয়া কুন্তকর্ণ ছয় মাস নিদ্রা ও এক দিন জাগরণের বর পাইয়াছিলেন বলিয়া কুন্তিবাসে প্রকাশ ; কিন্তু বায়ীকির রামায়ণে আছে,—কুন্তকর্ণের জন্মের পরই তাঁহার দৌরাচ্যে ত্রিলোক অস্থির, ইন্দ্র পরাস্ত এবং ব্রহ্মা ত্রস্ত হন ; আর সেই হেতু ব্রহ্মা তাঁহাকে উত্তরুপ নিদ্রা ও জাগরণের অভিশাপ প্রদান করেন । পঞ্চমতঃ—উত্তর-কাণ্ড । লক্ষ্মণের চতুর্দশ বর্ষের ফলানয়ন-কাহিনী, গুরুড়-পবনের যুদ্ধ-কথা, স্বর্গ জিনিতে রাবণের গমন-কালে কুন্তকর্ণের গমন, চৌষটি যোগিনী-সহ ঘোর যুদ্ধ,—এ সকল বৃত্তান্তও বায়ীকির রামায়ণে নাই । অধিক বলিব কি, এমন যে লব-কুশের যুদ্ধ-বৃত্তান্ত—তাহাও বায়ীকির রামায়ণে বর্ণিত নাই । পদ্ম-পুরাণের পাতাল-খণ্ডে ঐ বিষয়ের উল্লেখ আছে বটে ; কিন্তু রামের সহিত লব-কুশের সাক্ষাৎ-সম্মুখি যে কোনও যুদ্ধ হইয়াছিল, সে উল্লেখ সেখানেও নাই । এবংবিধ ঘটনা-পরম্পরা দেখিয়া মনে হয়, বায়ীকির রামায়ণের অনুসরণে রচিত হইলেও, কুন্তিবাসের রামায়ণের উপকরণ অপরাপর পুরাণ-উপপুরাণ এবং জনশ্রুতি হইতেও সংগৃহীত হইয়াছিল । রামায়ণ রচনায় কুন্তিবাস যে সকল পুরাণের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়, তন্মধ্যে—অধ্যাত্ম-রামায়ণ, অকৃত রামায়ণ, দেবী-পুরাণ, দেবী-ভাগবত, কালিকাপুরাণ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । কুন্তিবাসে প্রকাশ,—হরধর্ম্মজের পর পথিমধ্যে যখন পরশুরামের সহিত শ্রীরাম প্রভৃতির সাক্ষাৎ হয়, তখন পরশুরাম দশরথকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন,—

“মম সম করিয়া রাখিয়াছ পুত্র নাম ।...জীর্ণ ধনু ভাঙ্গিয়া যে দেখাইলা গুণ ॥”

* ‘বায়ীকির রামায়ণের সহিত কুন্তিবাসের এবংবিধ পার্থক্যের কথা অনেকেই অশ্রিত্যভ্যাস । এমন কি, ‘মেঘনাদবধ’-কাব্য-রচনা-কালে মাইকেল মধুসূদনও এ সকল কথা জ্ঞাত ছিলেন বলিয়া মনে হয় না । কারণ, তাহা হইলে “বীরচূড়ামণি বীরবাহুর” শোকে তিনি রাবণকে বিলাপ করিতে দেখিতেন না । প্রমীলার চিতারোহণ—মাইকেলের কল্পনা । প্রমীলার চিতারোহণ-কাহিনী—বায়ীকির রামায়ণে নাই ।

এই ভাষা-ভাষের সহিত অধ্যাত্ম-রামায়ণের ভাষা-ভাষের মিল দেখা যায়; যথা—

“হং রাম ইতি নাম্না যে চরসি কত্রিয়াধম । পুরাণং জর্জরং চাপং ভক্ত্য বৎ কথসে যুবা ॥”

কিন্তু বাঙ্গালিকির রামায়ণে এ স্থলের কথাবার্তা অল্পরূপে দেখা যায়। বাঙ্গালিকির পরশুরাম, শ্রীরামচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া স্পর্ধা করিয়াছিলেন; দশরথকে সম্বোধন করেন নাই। অধ্যাত্ম-রামায়ণেই শ্রীরামচন্দ্রের পূর্ণ-ব্রহ্মত্ব কীৰ্ত্তিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে কৃত্তিবাস, অধ্যাত্ম-রামায়ণেরই অনুশরণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। অধ্যাত্ম-রামায়ণের রাবণ, শ্রীরামের পরম ভক্ত। এইরূপ, অদ্ভুত-রামায়ণেরও অনেক তত্ত্ব কৃত্তিবাসের সহিত মিশিয়া আছে।
 দুর্গোৎসব-তত্ত্ব—কালিকা-পুরাণের অন্তর্গত। যাহা হউক, যে গ্রন্থ হইতেই কৃত্তিবাস যে ভাব সংগ্রহ করুন না কেন, কৃত্তিবাসের প্রতিষ্ঠা,—তাহার কবিত্ব ও কল্পনায়,—ইহাকে অস্বীকার করিতে পারেন? হইতে পারে,—কালিকা-পুরাণ, দেবী-পুরাণ এবং দেবী-ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থোক্ত দুর্গোৎসবের বিবরণ, কৃত্তিবাস স্বীয় রামায়ণ-মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন; কিন্তু দেবী-কর্তৃক নীল-পদ্ম-হরণ-ব্যপদেশে আপনার নয়ন-পদ্ম বিচ্ছিন্ন করিতে যাওয়ার দৃষ্টান্ত—বুঝি বা আর কোথাও নাই। যদি তাহাই হয়, এখানে কৃত্তিবাসের কল্পনা-কুসুম পূর্ণ-প্রস্ফুটিত নহে কি? বীর বলিয়া বাঙ্গালীর স্পর্ধা করিবার পরিচয় না থাকিতে পারে, বাঙ্গালীর শৌর্য্য-বীর্য্যের কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠায় খুঁজিয়া পাইতে না পার; কিন্তু ভক্তির নিকর বাঙ্গালা-দেশে যাহা ফুটিয়াছিল, তাহারই পূত-প্রবাহে পরিম্নাত হইয়া সমগ্র সংসার আজি পবিত্র হইতে চলিয়াছে,—এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। ভগবতীর পূজায় এই যে শ্রীরামচন্দ্রের নয়ন-পদ্ম উৎপাটনের চিত্র কবি অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, ভক্তির এখন মর্ম্মস্পর্শী চিত্র—আত্ম-সমর্পণের এমন মহানু ছবি—আর কোথাও কেহ দেখিয়াছে কি? অল্পত্র আবার দেখুন—তরণীর চিত্র। রাক্ষস হউক, বিপক্ষ-সৈন্য হউক, কিন্তু তরণীর ভক্তিতে পাবাণ বিগলিত হয়; রণ-ক্ষেত্রে তরণীর চিত্রে—কিবা কঠোরে কোমলে, কিবা রোদ্রে শান্তে—শক্তি ও ভক্তি সংমিশ্রণে—কবি কি অভিনব তুলিকায় চিত্র-চমৎকারী রঙ-সমাবেশ করিয়াছেন! ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে ইহা মূল্যবান না হইলেও, ভাব-রাজ্যে ইহার সমাদর নিশ্চয়ই আছে। *

রামায়ণে শিকার বিষয় অসংখ্য। হিন্দুমাতেই তদ্বিষয় অবগত আছেন। রামায়ণে যে উন্নতিশীল আদর্শ রাজ্যের পরিচয় পাই, আধুনিক সভ্য-জগতেও তাহা উপকণ্ঠায় ত্রায় আশ্চর্য্যজনক। রাজা দশরথের রাজ্যে মন্ত্রি-সভা ছিল। গৃহি, রামায়ণে
 শিকার। অয়ত্ত, বিজয়, সুরাষ্ট্র, রাষ্ট্রবর্জন, অকোপ, বর্ম্মপাল ও সূমন্ত্র নামক আট জন আমাত্য বিভিন্ন বিভাগের রাজ-কার্য্য পরিদর্শন করিতেন। বশিষ্ঠ, বায়দেব, জাবালি, কাশ্যপ, গৌতম, যার্কণ্ডেয় ও কাভ্যায়ন প্রভৃতি ঋষিগণ মন্ত্রিপদে নিযুক্ত ছিলেন। ইহাদের মধ্যে আবার দুই জনকে রাজা মনোনীত করিতেন। ফলতঃ, বর্ত্তমানকালোচিত নীকীচর্চ ও মনোনয়ন-ক্রমে তৎকালে মন্ত্রিসভা গঠিত হইত,†—আত্মসে

* এই অংশ, বল্লিখিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের ভূমিকা হইতে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে গৃহীত হইল।

† বাঙ্গালিকির রামায়ণ, আদিকাণ্ড, সপ্তম সর্গ।

তাহা বুঝিতে পারা যায়। তখন এমনই ভীষণ-বিচারের ব্যবস্থা ছিল যে, অপরাধী হইলে, পুত্রদিগের প্রতিও অপরাধ অমূল্যারে গুরু-লঘু দণ্ডের আদেশ প্রদান করিতে রাজা কুণ্ঠিত হইতেন না;—“প্রাপ্তকালং যথা দণ্ডঃ ধারয়েহুঃ সূতেশপি”। ‘চার’ দ্বারা স্বদেশের ও বিদেশের বিবরণ সংগ্রহ করা হইত। প্রজাগণের অবস্থা-বিষয়ে সম্বন্ধে বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, এক্যমতাবলম্বনে, সুপবিভ্র চরিত্র যন্ত্রিগণ রাজ্যশাসন করিতেন। রাজনীতি ও সমাজনীতি বিষয়ে রাজ্য যেরূপ উন্নত ছিল; আত্ম-কর্তব্যপালনের ব্যক্তিগত দৃষ্টান্তেও, রাজ্যের পৌরষ তদনুরূপ বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়াছিল। শ্রীরামচন্দ্রের বনগমনে পিতৃভক্তি এবং সত্য-পালনের যে দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই, কোনও দেশের কোনও ইতিহাসে সে উচ্চ আদর্শ কেহ দেখিয়াছেন কি? ভ্রাতৃত্বেরেহেরও তাহা এক অমূল্য আদর্শ! কৈকেয়ীর সেই অগ্রিম বাণী—নির্দাসন-বার্তা শ্রবণ করিয়া, কিছুমাত্র ব্যথিত না হইয়া, শ্রীরামচন্দ্র বলিতেছেন,—

“হিতেন গুরুণা পিত্রা কৃতজ্ঞেন নৃপেন চ। নিযুক্ত্যমানো বিপ্রকঃ কিং ন কুর্ধ্যামহং শ্রিয়দৃঃ”

‘আমার পিতা গুরু রাজা দশরথ আমার আদেশ করিলে, এমন কোনও কার্য নাই, বাহা আমি প্রীতমনে না করিতে পারি।’ তিনি আমার বলিতে সঙ্কুচিত হইতেছেন বলিয়াই বরং হুঃখ হইতেছে। বিশেষতঃ, ভরত আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা; আমি তাহার জন্ত সানন্দে রাজ্য-ধন সমস্তই, এমন কি—প্রাণ পর্য্যন্ত, পরিত্যাগ করিতে পারি। তার পর, লক্ষণ যে ভাবে আমার অনুগমন করিয়াছিলেন; এবং ভরত যে ভাবে চিত্রকূটে গিয়া শ্রীরামচন্দ্রকে ফিরাইতে চেষ্টা করিত হইয়াছিলেন; অপিচ, বিফল মনোরথ হইয়া, শ্রীরামের পাহকা আশ্রয়রূপ রক্ষা করিয়া, যে ভাবে তিনি রাজ্যশাসন করিতেছিলেন;—সৌভ্রাতৃত্বের ও ভ্রাতৃ-ভক্তির সেরূপ দৃষ্টান্তই বা কোথায় আছে? সীতার পতিভক্তি, হনুমন্তের কর্তব্য-নিষ্ঠা, বিভীষণের স্ফারামুগত্য,—কত দৃষ্টান্তই, কত শিক্ষার সামগ্রীই, রামায়ণে দেদীপমান রহিয়াছে। জানকীর অগ্নি-পরীক্ষা, শ্রীরামচন্দ্রের লক্ষণ-বর্জন,—সত্যপালন ও কর্তব্য-নিষ্ঠার চরম চিত্র। বুদ্ধ-ক্ষেত্রে শত্রু-সৈন্যের আত্ম-সমর্পণে তাহাদের প্রতি সত্যবহারের দৃষ্টান্ত—রামায়ণে ভূয়সী বিজ্ঞমান। ধর্মের জয় এবং অধর্মের পরাজয়—রামায়ণে কি বিশদ-ভাবেই পরিবর্ণিত আছে! ফলতঃ, যে চক্ষে যে দিক দিয়াই দেখি না কেন, রামায়ণের রাম-রাজত্বের তুলনা পাই না।

এক দিকে অযোধ্যার চারু-চিত্র; অজ্ঞ দিকে লঙ্কার ভীষণ মূর্তি! অযোধ্যা—পুণ্যভূমি; লঙ্কা—পাপের প্রীধাজ, ব্যভিচারের প্রবল শ্রোত! অযোধ্যা—আর্য্য-অযোধ্যা সত্যতার মৌরবিরণ-মালায় উদ্ভাসিত; লঙ্কা—অনার্য্য-তমসাপ্রিত। অযোধ্যা—মেঘগুরু চান্দ্রবসী রজনী; লঙ্কা—কোলাহলময় অন্ধকারাচ্ছন্ন অমানিশা। অযোধ্যা—সঙ্গীত-সুর-তান-যুক্ত আনন্দ-মুগ্ধরিত দেবতার লীলা-নিকেতন; লঙ্কা—ঘূর্ণিত-লোচন বিভ্রান্ত-দৃষ্টি বিলাসিনীগণের নাট্যশালা,—মদোন্মত্ত উদ্ভাস্ত রাক্ষস-রাজের ক্রীড়া-ক্ষেত্র। অযোধ্যা—সাম্বিক-রাজনিক-ভাবে মধুর মিশ্রণ; লঙ্কা—রাজনিক ও তামসিক-ভাবে প্রবল প্রবাহ। অযোধ্যার সহিত লঙ্কার আরও পার্থক্য,—অযোধ্যার কল-শব্দ-ধন-ধাত্তের এবং ধাপ-বজাদির ওচুর্বা; লঙ্কার দুগ-মর্দ

বরাহ প্রভৃতির মাংস এবং অক্ষফাড়া মন্ত্রপানাদির প্রাবল্য। অযোধ্যার মরনারী শ্রীসম্পন্ন; লক্ষার ব্যক্তি-মাত্রেই বিকলাঙ্গ বিকটাকার। তবে, বাহু-ঐর্ষ্যে লক্ষা যে অযোধ্যার অপেক্ষা হীনপ্রভ, তাহা বলিতে পারি না। অযোধ্যার জ্ঞান রাজধানী লক্ষারও 'চতুর্দিকে মীন-সেবিত ভীষণ নক্র-সমাকুল বহুল শীতল-জল-পরিপূর্ণ অগাধ পরিখা বিস্তারমান।' সেই পরিখা পার হইবার জন্য নগরীর চারি ধারে চারিটা প্রশস্ত সেতুপথ। সেই সেতুপথ-সমূহ আবার প্রাকারোপরিহিত যন্ত্রাদি দ্বারা সুরক্ষিত। শতগ্রী এবং বহু প্রকার যন্ত্র সেই লক্ষা-পুরীকে রক্ষা করিতেছিল। পূর্ব-দ্বারে দশ সহস্র, দক্ষিণ-দ্বারে এক লক্ষ, পশ্চিম-দ্বারে দশ লক্ষ, আর উত্তর দ্বারে এক কোটি সৈন্য অবস্থিত থাকিয়া লক্ষাপুরী রক্ষা করিত। যুদ্ধান্তের ব্যবহার-সম্বন্ধে উভয়ত্রই সমবিধ অস্ত্রাদি প্রচলিত থাকিলেও, অযোধ্যায় তাহার কিছু উৎকর্ষ দৃষ্ট হয়। পরিষ, পট্টিশ, শূল, পাশ, শক্তি, কুঠার, ধনু, খড়্গ প্রভৃতি যুদ্ধান্তই তৎকালে প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইত। শতগ্রী, ব্রহ্মাস্ত্র প্রভৃতির পরিচয়ে আগ্নেয়াস্ত্রাদি ব্যবহারের বিষয়ও জানিতে পারা যায়। সেই সকল অস্ত্রের বর্ণনা দেখিয়া, বিশেষতঃ লক্ষাপুরীর চতুর্দিক শতগ্রী-যন্ত্র দ্বারা সুরক্ষিত থাকার পরিচয়ে, আধুনিক-কালোচিত বৈজ্ঞানিক আগ্নেয়াস্ত্রাদির প্রচলন ছিল বলিয়া মনে হয়। লক্ষাকাণ্ডের ত্রয়োদশ সর্গে দেখিতে পাই, রাবণ ক্রোধাবিত হইয়া বলিতেছেন,—“উদ্ধা-সমূহ দ্বারা কুঞ্জর বেষ্রপ ভস্মীভূত হয়, আমার কার্ম্মুক-নির্ম্মুক্ত বজ্রতুল্য শরজালে রামকেও আমি সেইরূপ ভস্মীভূত করিষ।” মূলে, “উদ্ধাভিরিব আদীপরিষ্ঠামি”—এইরূপ উক্তি আছে। যে অস্ত্রে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিবে,—আগ্নেয়াস্ত্র তিন তাহা আর কি হইতে পারে? লক্ষার ঐর্ষ্য-সম্বন্ধে আরও দেখিতে পাওয়া যায়,—উহার সিংহদ্বার, কণকময়; বেদিকা-সকল, ক্ষটিক-মণিমুক্তা-বৈদূর্য্যমণি প্রভৃতি রত্ন-সমূহে নির্ম্মিত; কুট্টিমসকল, মণিময়। রাবণের অন্তঃপুর আবার ততোধিক ঐর্ষ্য-সম্পন্ন ছিল, এবং তৎসমূহই বোধ হয় তাঁহার রাজধানী স্বর্ণ-লক্ষাপুরী বলিয়া অভিহিত হইত। কিঙ্কিঙ্কায় এইরূপ আর এক নব-ভাবের বিকাশ দেখিতে পাই। লক্ষা ও কিঙ্কিঙ্কায়—দুই-ই অনার্থ্যভাবাপন্ন। অথচ, কিঙ্কিঙ্কায় কিয়ৎ-পরিমাণে ধর্ম্মতাব পরিস্কট। তিন দিকে তিন চিত্র,—কি সুন্দর-ভাবেই রামায়ণে প্রতি-ফলিত রহিয়াছে।

রামায়ণ বা রামায়ণ-বর্ণিত রাম-রাজত্ব কতকাল পূর্বে প্রতিষ্ঠিত ছিল, বাস্তবিকই বা কোন্ সময়ে বিস্তারমান ছিলেন, আর শ্রীরামচন্দ্রই বা কোন্ সময়ে আবির্ভূত হইয়া-

রামায়ণের
প্রাচীনত্ব।

ছিলেন?—সীমাবদ্ধ মহত্ম-কল্পনায় এখন তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। রামায়ণে দেখিতে পাই,—মহর্ষি বাস্তবিকই সংসারে কবিতাচ্ছন্দের প্রবর্তক। ব্যাধ-নিহত ক্রৌঞ্চকে বিলুপ্তি হইতে দেখিয়া,

ক্রৌঞ্চী বধন করুণ-বরে বিলাপ করিতেছিল, সেই সময়ে বাস্তবিকের মুখ হইতে যে প্রথম বাণী বহির্গত হয়, তাহাই কবিতাচ্ছন্দের আদি। রামায়ণে স্পষ্টতই লিখিত আছে,—‘মহর্ষি বাস্তবিক উৎকট শোকের সময় সমাক্রম চতুশ্চাদ-যুক্ত বে বিপুল শোক-বাক্য গান করিয়া-ছেন, তাহাই শ্লোক হইয়াছে।’ ব্যাকরণ-শাস্ত্রের অনুযায়িত, প্রতিপাদে সমান অক্ষর

ও মাদুর্য্য-গুণ-যুক্ত, করিতার ইহাই প্রবর্তনা । * তাহা হইলেই বুঝিতে পারা যায় না কি,—রামায়ণ কতকাল পূর্বে বিরচিত হইয়াছে ? সেই কল্পনাতীত কাল—শাস্ত্রে ত্রেতাযুগ বলিয়া অভিহিত । ত্রেতাযুগে রাম-রাজত্ব—ত্রেতাযুগে রামায়ণ-রচনা । শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি শাস্ত্রের সহিত তুলনার আলোচনা করিলেও দেখিতে পাই,—রামায়ণের প্রতিষ্ঠা—কত পূর্ব্বের ! আর এতোক পুরাণেই, দেখাইয়াছি, রাম-চরিত পরি-বর্ণিত আছে ;—বাস্তবিকর রামায়ণ-রচনার বিষয়ও উল্লিখিত হইয়াছে । মহাভারতে রামায়ণের ঘটনাবলী এবং বাস্তবিকর রামায়ণ-রচনার প্রসঙ্গ দেখিতে পাই । অথচ, রামায়ণে কুরুঐষায়ন পেন্দব্যাস অথবা তাঁহার পুরাণ-সমূহের নামোল্লেখ নাই ; মহাভারতের বর্ণিত কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ-রক্তাশ্রুও রামায়ণে দৃষ্ট হয় না । সুতরাং, স্থল-দৃষ্টিতেই বুঝিতে পারি,—রামায়ণ বেদব্যাঙ্গের বা হৃদীয় গ্রন্থাবলীর বহু পূর্বে রচিত হইয়াছিল । বেদ-বিভাগ করিয়াছিলেন বলিয়া, কুরুঐষায়ন ‘বেদব্যাস’-নামে পরিচিত । তাঁহার মহাভারত এবং পুরাণাদিতে তাই চতুর্বেদের পরিচয় পাই । কিন্তু সমগ্র রামায়ণ-গ্রন্থ আলোড়ন করিলেও, বেদ-বিভাগের বা চতুর্বেদের কোনই প্রসঙ্গ দেখিতে পাই না । রাম-রাজত্বের সময়ে ‘ত্রয়ো’ অর্থাৎ ত্রিবেদ প্রচলিত ছিল,—ইহার অবশ্য প্রমাণ পাওয়া যায় ;—

“নানুবেদবিনীতস্ত নায়জুর্বেদধারিণঃ । নাসামবেদবিহ্নঃ শক্যমেবং বিভাসিতম্ ॥”

‘ঋগ্বেদজ্ঞ, যজুর্বেদজ্ঞ বা সামবেদজ্ঞ পুরুষ ভিন্ন অজ্ঞ কেহ ঐদৃশ-বাক্য প্রয়োগ করিতে পারে না ।’ তৎকালে ব্যাকরণাদি যড়বেদঙ্গ প্রচলিত ছিল, শ্রুতি-স্মৃতির অনুশাসন মাত্র হইত,—এ সকল কথা পুনঃপুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে । অথচ, চতুর্বেদের প্রসঙ্গ-মাত্র উত্থাপিত হয় নাই । এ দিকে মহাভারতে, একাধিক স্থলে, চতুর্বেদের উল্লেখ আছে ; ইতিহাস, বেদাঙ্গ, কাব্য, নাটক, আখ্যায়িকা পর্য্যন্তেরও প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে ; জ্ঞায়, দর্শন, উপনিষৎ—কুরুঐষায়ন বেদব্যাসের বিরচিত মহাভারতে কিছুই অসম্ভাব দেখিতে পাই না ;—

“চতুর্বেদা কলাস্তথা ।” ... “ঋগ্বেদঃ সামবেদশ্চ যজুর্বেদশ্চ পাণ্ডব । অথর্ববেদশ্চ তথা সর্বশাস্ত্রাণি চৈব হি ॥ ইতিহাসোপবেদশ্চ বেদাঙ্গানি চ সর্বশঃ ।” ... “নাটক্য বিবিধা কাব্যোঃ কথাখ্যায়িক-কারিকাঃ ।” ... “সান্দোগনিষদান্ বেদান্ চতুর্ভাষ্যান পঞ্চমান্ ।” ... “বেদোপনিষদাং বেত্তা কবিঃ সুরপার্জিতঃ । ইতিহাসপুরাণজঃ পুরাকল্পবিশেষবিৎ ॥ জ্ঞায়বিৎ যজ্ঞ-তত্ত্বজ্ঞ বড়দ্বিদ্মুত্তমঃ ।”

অতঃপক্ষে, সাংখ্য-দর্শন, জ্ঞায়-দর্শন প্রভৃতিরও ভূয়সী আলোচনা—মহাভারতেও পুরাণাদিতে দেখিতে পাই ; কিন্তু রামায়ণে তাহার অসম্ভাব । সে হিসাবে, কেহ কেহ এমনও বলেন,—সাংখ্যাদি দর্শন রচিত হইবার পূর্বে রামায়ণ বিরচিত হইয়াছিল । শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিতগণ পাশ্চাত্য-দৃষ্টিতে দর্শন করিয়াও, পাশ্চাত্যের পরিমাণ-দণ্ডের সাহায্য লইয়াও, রামায়ণকে মহাভারত-পুরাণাদির পূর্ব্ববর্তী গ্রন্থ বলিয়া প্রতিপন্ন করেন । তাঁহার বলেন,—‘শাস্ত্র চতুর্বিধ ; কর্ম্ম-শাস্ত্র, যোগ-শাস্ত্র, জ্ঞান-শাস্ত্র ও ভক্তি-শাস্ত্র । বৈদিক-কালে প্রথমে কর্ম্ম-শাস্ত্র, তৎপরে যোগ-শাস্ত্র, তৎপরে জ্ঞান-শাস্ত্রের প্রচলন হয় । ভক্তি-শাস্ত্র—তাহারও পরবর্ত্তি-কালের । যজ্ঞ-পূজাদি—কর্ম্ম-শাস্ত্রের লক্ষণ ; চিত্ত-বৃত্তি আয়ত্তাধীন করা—মনের উপর প্রভুত্ব-স্থাপন—যোগ-শাস্ত্রের পরিচায়ক ; জ্ঞান-লাভেই যে বুদ্ধিলাভ—

* আদিপর্ব্ব, দ্বিতীয় অধ্যায়, ৪০ শ্লোক ।

* মহাভারত, সভাপর্ব্ব, একাদশ ও পঞ্চম অধ্যায় ।

কর্ম বা যোগ কেহই যে মুক্তিদানে সমর্থ নহে,—জ্ঞান-শাস্ত্রের তাহাই উপদেশ। ভক্তি-ভিন্ন মুক্তি নাই;—ভক্তির কাছে সকলই তুচ্ছ;—ভক্তি-শাস্ত্রের তাহাই প্রতিপাদ। এই চতুর্বিধ শাস্ত্র পর্যায়-ক্রমে পর-পর রচিত হইয়াছে,—পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে তাহাই প্রতিপন্ন হয়। যদি তাহাই হয়, তাহাতেও দেখিতে পাই,—পুরাণাদির পূর্বে রামায়ণ বিরচিত; অর্থাৎ, রামায়ণ—আদি কাব্য-গ্রন্থ। রামায়ণে কর্ম ও যোগের প্রাধান্য আছে; কিন্তু জ্ঞান বা ভক্তির প্রাধান্য কীর্তিত হয় নাই। সুতরাং বুঝিতে পারা যায়,—ভক্তি-শাস্ত্র-রচনার পূর্ববর্ত্তি-কালে বাম্প্রাচীনিক রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন। এ ক্ষেত্রে, আপত্তি-স্থলে, যোগবিশিষ্ট রামায়ণের প্রসঙ্গ উঠিতে পারে। যেহেতু, যোগবিশিষ্ট—জ্ঞান-শাস্ত্র-বিশেষ। তাহাতে জ্ঞান-কাণ্ডের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত,—তাহাতে সাম্য-বেদান্তাদি দর্শনের জটিল-তত্ত্ব-সমূহ উল্লেখ্য। এ সম্বন্ধে অবশ্য নানা মতান্তর আছে। কেহ কেহ বলেন,—রাম-রাজত্ব দীর্ঘ-কাল স্থায়ী হইয়াছিল: বাম্প্রাচীনিক রামায়ণের প্রথম ছয় কাণ্ডে প্রধানতঃ তাঁহার রাজ্য-লাভের পূর্ববর্ত্তী ঘটনাবলী বিবৃত আছে। হয়তো, তখন জ্ঞান-শাস্ত্র তাদৃশ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই; তাঁহার রাজত্বের শেষ-ভাগে জ্ঞান-শাস্ত্র আপন আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। জ্ঞান-শাস্ত্রের পরে যে ভক্তি-শাস্ত্র, ইহাতে তাহাও প্রতিপন্ন হয়; যেহেতু, বাম্প্রাচীনিক রামায়ণে কর্মের ও যোগের প্রাধান্য পরি-কীর্তিত আছে; কিন্তু জ্ঞানের প্রাধান্য কীর্তিত হয় নাই। পরন্তু, রামের রাজ্য-শাসনের শেষ-সময়ে যোগবিশিষ্ট রামায়ণে সেই জ্ঞান-তত্ত্ব প্রস্তুত হইতেছে। তবে, যোগবিশিষ্ট রামায়ণে যে বেদব্যাসের নামোল্লেখ আছে, পণ্ডিতগণের মতে, তাহা পরবর্ত্তি-কালের সংযোজন; অথবা পূর্ব পূর্ব কল্পের স্মৃতির আবর্ত্তি,মাত্র। তার পর, রামায়ণের ও মহাভারতের ঋষি-মণ্ডলী! রামায়ণের সমসাময়িক ঋষিগণের গুণগাথা প্রায়ই মহাভারতে স্থান পাইয়াছে; কিন্তু মহাভারতের সমসাময়িক ঋষিগণের নাম রামায়ণে নাই। ত্রিপুরার রাজত্ব-কালে রামায়ণ রচনা হয়,—ইহা স্পষ্টতঃ লিখিত আছে; অথচ, মহাভারত পাণ্ডবগণের মহা-প্রস্থানের পরে, জম্বোদ্বীপের যজ্ঞারম্ভের পূর্বে, বিরচিত হইয়াছিল,—বুঝিতে পারা যায়; কেননা, জম্বোদ্বীপের যজ্ঞারম্ভের পূর্ববর্ত্তী ঘটনাবলী মহাভারতে অতীত ঘটনা-রূপে পরিবর্তিত হইয়াছে। যুধিষ্ঠিরাদি রাজগণ যে ত্রিপুরারাজের জয়গ্রহণের বহু পরে জয়গ্রহণ করিয়াছিলেন, বংশ-তালিকার আলোচনা করিলেও, তাহা প্রতিপন্ন হয়।* রামায়ণের আদর্শে বেদব্যাস-পুরাণ রচনা করিয়াছিলেন,—তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। অতএব, মহাভারত ও পুরাণাদির পূর্বে রামায়ণ রচিত হইয়াছিল,—এ বিষয়ে কোনই সংশয় থাকিতেছে না। সুতরাং, মহাভারতের সময় নির্দেশ করিতে পারিলেই, রামায়ণের প্রাচীনত্ব কতকংশে উপলব্ধি হইতে পারিবে।† শাস্ত্রানুসারে, ত্রেতাযুগে, ত্রেয়োদশ লক্ষ এক সহস্র দশ বৎসর (দ্বাপর যুগের বার লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার বৎসর + কলিযুগের গুণ্ড পঁচ সহস্র দশ বৎসর) পূর্বে, রাম-রাজত্বের রামায়ণ বিরচিত হইয়াছিল।

* পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদান্তরে বংশ-তালিকার চন্দ্র ও সূর্য-বংশের বংশক্রম দ্রষ্টব্য।

† এই গ্রন্থের বিংশ পরিচ্ছেদের শেষ ভাগে সেই আলোচনা দ্রষ্টব্য।

তথাপি, রামায়ণ পূর্বে, কি মহাভারত পূর্বে,—এই এক সংশয়-প্রশ্নে অনেকের মন আন্দোলিত । রামায়ণ ও মহাভারতের বিষয় পূর্বোক্তরূপে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচিত হওয়ার পরও, ঐরূপ সংশয় কি কারণে উপস্থিত হয়, অনুসন্ধান করিয়া দেখা বাউক । রামায়ণের সময়ে, বিগ্ধ নীতি, বিগ্ধ চরিত্র, বিগ্ধ সমাজ, বিগ্ধ ধর্ম-পদ্ধতি বিদ্যমান ছিল ; কিন্তু মহাভারতের সময় সে বিগ্ধতা দৃষ্ট হয় না । মহাভারতের বাহারা প্রধান আয়ক, তাঁহাদেরই পূর্ব-বিবরণ নানা কলুষ-কল্পনায় কলুষিত । কিন্তু রামায়ণে সেরূপ চিত্র বিরল বলিলেও অত্যাক্তি হয় না । মহাভারতের সময়ে বিবাহের ও পুত্রোৎপাদনের যে সকল পদ্ধতি বর্ণিত আছে, ‘আদিম’ অর্ধ-সভ্য সমাজের পদ্ধতি বলিয়া তাহা মনে হয় । দিন দিন সংসার যেরূপ আবশ্রোতে ভাসমান, মহন্ত বেরূপ নীতি-পরম্পরার অনুবর্তী হইতে চলিয়াছে, তাহাতে মহাভারতের পরে রামায়ণ রচিত হওয়াই সম্ভবপর । ইহাই পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের মত । অপিচ, রামায়ণের উত্তর-কাণ্ডে নির্ঝাং-প্রসঙ্গ এবং মহাভারতের সম-সাময়িক দুর্দাসা প্রভৃতি ঋগিগণের নামোল্লেখ আছে । তাহাতেও রামায়ণকে মহাভারতের পরিবর্তী বলিয়া বিশ্বাস হইতে পারে । এ বিষয়ে পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের মত যাহাই হউক না কেন, শাস্ত্রানুশাসন-পরায়ণ পণ্ডিতগণের মত কিন্তু স্বতন্ত্র । শাস্ত্র-মতে,—পৃথিবীতে দিন দিনই পাপের অঙ্গ বৃদ্ধি পাইতেছে । সত্য-দ্রোতা-দ্বাপর-কলি যুগ-চতুর্থেই পর্যায়ক্রমে সংসার উন্নতি হইতে অবনতির পথে প্রধাবিত হয় । সত্যযুগে যে বিগ্ধ-ধর্ম ও বিগ্ধ-সমাজ-পদ্ধতি ছিল, দিন-দিনই তাহার বিকৃতি ঘটিতেছে । সুতরাং, রামায়ণের পরবর্ত্তি-কালে, মহাভারতের সম-সাময়িক সমাজে, সামাজিক অবস্থার বিকৃতি ঘটিয়াছিল । স্বর্ভ্র শিকার কলে, দৃষ্টি-শক্তির স্বাতন্ত্র্য-হেতু, মানুষ একই জিনিষ এইরূপ বিভিন্ন-ভাবে দেখিয়া থাকে । কিন্তু তাহা হইলেও, বাহারা পুরুষ-পরম্পরা-ক্রমে দেখিয়া আসিতেছে, তাহাদের দৃষ্টি অভ্রান্ত ;—কিংবা, বাহারা ঠঠাং আসিয়া দেখিল, তাহাদের দৃষ্টি অভ্রান্ত ? স্থূল দৃষ্টিতেও প্রতিপন্ন হয়,—সংসারের আধি-ব্যাধি-শোক-তাপ দিন-দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে ; পাপের ভারও দিন দিন ওরু হইয়া ঠাড়াইয়াছে । দুই দশ বৎসরের বা দুই এক শতাব্দীর বা দুই এক সপ্তাহের ইতিহাস আলোচনা করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায় । বিশেষতঃ, যে যে বিষয় আধুনিক, বাহার লজ্জা রামায়ণকে পরবর্ত্তি-কালের রচনা বলিয়া মনে হয়, স্থূল বিষয়ের সহিত তাহার বিশেষ অসামঞ্জস্য দেখিতে পাই । প্রধানতঃ উত্তরকাণ্ডেই সে অসামঞ্জস্য বিশেষ পরিস্ফুট এবং সেই লজ্জা উত্তরকাণ্ডকে অনেকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করেন । সমগ্র উত্তরকাণ্ড প্রক্ষিপ্ত না হউক, উহার মধ্যে যে কতক কতক বিষয় পরবর্ত্তি-কালের সংযোজনা,—তাহাতে সন্দেহ নাই । দুর্দাসা প্রভৃতি ঋষির নাম—যে সকল ঋষি মহাভারতের ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট—উত্তর-কাণ্ডেই আছে ; অথচ, তাঁহাদের সহিত রামায়ণের স্থূল বিষয়ের বিশেষ কোনও সংশ্লিষ্ট নাই । এইরূপে, যে দিক দিয়াই দেখি, রামায়ণের প্রাচীনত্ব অবিসংবাদিত ; শাস্ত্রদর্শী হিন্দুর মনে তদ্বিষয়ে কোনও প্রকারের বিধা থাকিতে পারে না । স্বল্প-দৃষ্টিতে দেখিলে, সকলেই তাহা বুঝিতে পারেন ।

রামায়ণের প্রাচীনত্ব-সম্বন্ধে পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের সংশয়-পরম্পরা, কেবল যে ভাষ্যকারী হিন্দু-পণ্ডিতগণ কর্তৃক খণ্ডিত হইয়াছে, তাহা নহে ; যে সকল পাশ্চাত্য-পণ্ডিত বীর-হির্য্য ভাবে রামায়ণের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাও রামায়ণের প্রাচীনত্ব অস্বীকার করিতে পারেন নাই । ইউরোপের আদি মহাকাব্য —হোমারের ‘ইলিয়ড’ । কিন্তু সেই ‘ইলিয়ড’-কাব্যের ভাব-পরম্পরা, রামায়ণ হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে,—অধ্যাপক হীরেণ-প্রমুখ পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের আলোচনাতেই তাহা প্রতিপন্ন হয় । তাঁহাদের মতে,—রামায়ণের আদর্শ অবলম্বনে, গ্রীস-দেশের স্থানীয় অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া, হোমারের ‘ইলিয়ড’ গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছিল । রামায়ণ-বর্ণিত লঙ্কা-সমরের সহিত ‘ইলিয়ড’-বর্ণিত ‘ট্রয়’-যুদ্ধের বিশেষ সাদৃশ্য আছে । মূল ঘটনা—উভয় গ্রন্থেরই একরূপ । লঙ্কার পরিবর্তে ‘ট্রয়’, অযোধ্যার পরিবর্তে ‘স্পার্টা’, রামের পরিবর্তে ‘মেনেলাস’, রাবণের পরিবর্তে ‘পারিস’, ইন্দ্রজিতের পরিবর্তে ‘হেক্টর’, সীতার পরিবর্তে ‘হেলেন’, স্নগ্রীবের পরিবর্তে ‘আগামেম্মন’, লক্ষ্মণের পরিবর্তে ‘পেট্রোক্লাস’, জাম্বুমানের পরিবর্তে ‘নেষ্টর’,—রামায়ণের সহিত ‘ইলিয়ডের’ এতই সামঞ্জস্য আছে ! ইলিয়ডের ‘একিলিসেও’ লক্ষ্মণের আভাস পাওয়া যায় ; পরন্তু, উহাতে ভীমার্জুনেরও ছায়াপাত দেখা যায় । ফলে, রামায়ণ ও মহাভারত রচনার বহু পরে, হোমারের ‘ইলিয়ড’-গ্রন্থ বিরচিত হয়,—তাহাতে আর কোনই সংশয় নাই । ‘কাউন্ট জোরনস্‌জারগা’ বলেন,—“রাবণ-কর্তৃক স্বর্গরাজ্য অধিকার—‘টিটান’ কর্তৃক স্বর্গরাজ্য বিধ্বংসের মূল ।” করাসী-ভাষায় রামায়ণের অনুবাদ করিয়া, রামায়ণের আলোচনা উপলক্ষে করাসী-গ্রন্থকার ‘মুসে হিপোলাইট কাসে’ লিখিয়া গিয়াছেন,—“হোমারের কাব্যের অনেক পূর্বে রামায়ণ রচিত হইয়াছিল, এবং রামায়ণ হইতেই হোমার আপন কাব্যের ভাব-পরম্পরা গ্রহণ করিয়াছিলেন ।” অধ্যাপক ‘মনিয়র উইলিয়মস্’ আবার বলেন,—“হোমারে রামায়ণের ভাব-পরম্পরা গৃহীত হইয়াছিল ; অথচ, হোমারের স্পার্টা এবং ট্রয়, লঙ্কাতার ও ঐশ্বর্ঘ্যে কখনই অযোধ্যা ও লঙ্কার সমকক্ষতা লাভ করিতে পারে নাই ।” যাহা হউক, হোমারের পূর্বে গ্রীক-ভাষার অস্তিত্বই ছিল না, আবার গ্রীক-ভাষাই ইউরোপীয় ভাষার আদিভূত । সেই গ্রীকভাষার সেই আদি-গ্রন্থ—রামায়ণের অনুসরণে রচিত হইয়াছিল,—ইহাতে সেই সময়ে ইউরোপে পর্য্যাপ্ত রামায়ণের প্রভাব বিস্তৃত ছিল বুঝা যায় না কি ? পাশ্চাত্য-জাতির চক্ষেও রামায়ণ যে দূর অতীতের স্মৃতি বন্ধে ধারণ করিয়া আছে, রামায়ণ ভারতের যে দূর অতীতের ইতিহাস নয়নপটে প্রতিফলিত করিতেছে,—কোন জাতির কোন গ্রন্থ তাহার সহিত সমকক্ষতা প্রদর্শন করিতে পারে ? অমর বাজ্যিকর, অমর রামায়ণ-মহাকাব্যে, অমর রাম-রাজত্বের, যে অমর চিত্র অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে ; যুগ-যুগান্তর ধরিয়া জগতের নয়নারী তাহাতে ভারতের দূর-অতীতের ইতিবৃত্ত প্রত্যক্ষ করিবে ; আর দিন দিনই অধিকতর বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিবে,—‘এই হিন্দুই কি সেই হিন্দু !’

বিংশ পরিচ্ছেদ ।

মহাভারত ।

[মহাভারত-পরিচয় ;—কুরু-পাণ্ডবের বিবরণ,—মহাভারতের সার-সংক্ষেপ ;—কুরুক্ষেত্রের মহা-সমর,—সংক্ষেপে যুদ্ধ-বর্ণনা ;—দ্রুপদাষ্ট্রের ভবিষ্য-দর্শন,—চতুঃশষ্টি শ্লোকে মহাভারত-তত্ত্ব ;—ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে মহাভারতের আলোচনা ;—পুরাণাদি শাস্ত্রে কুরু-পাণ্ডবের উপাখ্যান ;—মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ-বিচার,—অবেশ্যকায়ুৰূপ মহাভারত সৃষ্টি ;—মহাভারতে শিক্ষা,—মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র ;—শ্রীমদ্ভাগবতকীৰ্ত্তা,—জ্ঞান ও কর্ম ;—মহাভারতের ঐতিহাসিকতা,—সম-সাময়িক চিত্র ;—মহাভারতের প্রাচীনত্ব,—কাল-নির্ণয় ;—মহাভারত-পরিণতি হরিনবংশ ;—মহাভারত-সম্বন্ধে বিবিধ মত,—উপসংহার ।]

ভারতবর্ষের আর এক ইতিহাস—মহাভারত মহাকাব্য । কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধের পর, পরাশর-নন্দন মহর্ষি বেদবাস এই মহাভারত মহাকাব্য রচনা করেন । প্রধানতঃ প্রচার,—মহাভারত লক্ষ-শ্লোকাত্মক । আদিপর্কের প্রথম অধ্যায়ে মহাভারত । এই বিষয় এই ভাবে লিখিত আছে,—‘প্রথমতঃ উপাখ্যান-ভাগ পরিত্যাগ করিয়া চতুর্বিংশতি সহস্র শ্লোকে বেদবাস ভারত-সংহিতা রচনা করিয়াছিলেন । পণ্ডিতেরা সেই চতুর্বিংশতি সহস্র শ্লোকেই ভারত বলিয়া থাকেন । অতঃপর, সমুদায় পর্ক-বৃত্তান্তের সার-সংগ্রহ-পূর্বক সার্বশত শ্লোকে তিনি অল্পক্রমণিকা অধ্যায় রচনা করেন । প্রথমতঃ আপন পুত্র শুকদেবকে এবং পরিশেষে উপযুক্ত শিষ্যগণকে বেদবাস সেই ভারত-সংহিতা প্রদান করিয়াছিলেন । সেই সংহিতা-রচনার পর, তিনি ষষ্টি-লক্ষ-শ্লোকময়ী অপর এক সংহিতা প্রণয়ন করেন ; তাহার ত্রিংশৎ লক্ষ শ্লোক দেবলোকে, পঞ্চদশ লক্ষ শ্লোক পিতৃলোকে, চতুর্দশ লক্ষ শ্লোক গন্ধর্বলোকে এবং এক লক্ষ মর্ত্যলোকে প্রতিষ্ঠিত হয় । ব্যাস-শিষ্য বৈশম্পায়ন জন্মেজয়ের সর্প-সত্রে সেই লক্ষ-শ্লোকাত্মক ভারত-সংহিতা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন । তাহাই এখন মহাভারত নামে প্রসিদ্ধ ।’ এই মহাভারত অষ্টাদশ পর্কে বিভক্ত ;—আদি, সভা, বন, বিরাট, উত্তোগ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, সৌপ্তিক, দ্রৌপী, শান্তি, অহুশাসন, আগ্নেয়িক, আশ্রম-বাসিক, মৌসল, মহাপ্রস্থানিক, স্বর্গারোহণ । এই পর্ক-সমূহ আবার এক শত উপপর্কে বিভক্ত । আদিপর্কের দ্বিতীয় অধ্যায়ে, পর্কসংগ্রহ পর্কে, পর্ক-উপপর্ক-সমূহের বিবরণ এবং কোন পর্কে কি বিষয় লিখিত আছে,—তাহা সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে । প্রতি পর্কের শ্লোক-সংখ্যা এবং সংক্ষিপ্ত-সার, সেই পর্কসংগ্রহ-পর্কোধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায় । কয়েকখানি মহাপুরাণের পূর্বে এবং কয়েকখানি মহাপুরাণের পরে যে মহাভারত বিরচিত হইয়াছিল, পুরাণাদির সহিত মহাভারতের আলোচনার তাহা বোধ-গম্য হয় । শ্রীমদ্ভাগবতে (প্রথম ও তৃতীয় অধ্যায়ে) স্পষ্টই লিখিত আছে, মহাভারত রচনার পর বেদ-বাস শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেন । পদ্ম-পুরাণ পাতাল-খণ্ডে (সপ্ততম অধ্যায়ে) দেখিতে

পাই,—“পুরা ব্যাসেন যুনিনা ত্রিষদ্বিৎ কৃতং শুভম্!” অর্থাৎ, পুরাকালে যুনির ব্যাসদেব তিন বৎসরে শুভ মহাতারত রচনা করিয়াছিলেন। ইহাতে পদ্ম-পুরাণদির পূর্বে এবং তিন বৎসরে মহাতারত রচিত হইয়াছিল,—বুঝা যায় না কি? * বাহ্য হউক, কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ এবং তদানুসঙ্গিক ঘটনা-পরম্পরাই—এই মহাতারতের প্রাণ-স্বরূপ। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-রূপে ইহাতে সমাজ-তত্ত্ব, ধর্ম-তত্ত্ব, দর্শন-তত্ত্ব, রাজনীতি, ইতিহাস, সাহিত্য, এবং বিবিধ রাজবংশের পরিচয় বিবৃত আছে। এক কথায়, মহাতারত কল্প-বৃক্ষ-স্বরূপ। যে বিষয়ের যে তত্ত্ব অবগত হইবার প্রয়োজন, মহাতারতে তাহা সকলই আছে; তাই প্রবাদ বাক্য,—“যা নাই ভারতে, তা নাই ভূ-ভারতে!”

বিরাট মহাতারত মহাকাব্যের একটু পরিচয় এই ক্ষুদ্র প্রসঙ্গে কোনক্রমেই সম্ভবপর নহে। তথাপি বর্ণিতব্য বিষয়ের সঙ্গতি-রক্ষা-হেতু স্থূলভাবে মহাতারতের মূল বিবরণ,

এস্থলে প্রকাশ করা, বোধ হয়, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সে বিবরণ,—
কুরু-পাণ্ডবের
বিবরণ।

‘চন্দ্রবংশ-সমুৎ কুরুর বংশে মহারাজ শান্তনু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার দুই পুত্র—ভীষ্ম এবং বিচিত্রবীর্ষ্য ইতিহাসে বিশেষ প্রসিদ্ধ। ভীষ্ম, চিরকোমার্য্য অবলম্বন করিয়া, রাজ্যলাভে বীতস্পৃহ ছিলেন। সুতরাং কনিষ্ঠ বিচিত্রবীর্ষ্য, পিতা শান্তনুর মৃত্যুর পর, রাজ্য প্রাপ্ত হন। বিচিত্রবীর্ষ্যের তিন পুত্র,—বৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিহুর। কনিষ্ঠ বিহুর, হরিপরায়ণ হইয়া, রাজ্যলিপ্সা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ বৃতরাষ্ট্র অন্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া রাজ্যলাভে অশক্ত হন। সুতরাং প্রথমে পাণ্ডুই রাজ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু পাণ্ডু অধিক দিন রাজ্যভোগ করিতে পারেন নাই। অকালে তাঁহার মৃত্যু হইলে, তাঁহার পুত্রগণের অভিভাবক-রূপে বৃতরাষ্ট্রই রাজকার্য্য নির্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হন। সেই সময় ভীষ্ম প্রধান পরামর্শদাতার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পাণ্ডুর পাঁচ পুত্র,—যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব; পাণ্ডব নামে ইঁহারা পরিচিত হন। বৃতরাষ্ট্রের এক শত পুত্র;—দুর্যোধন, দুঃশাসন প্রকৃতি; তাঁহার কৌরব নামে অভিহিত। আচার্য্য দ্রোণ—ব্রাহ্মণ হইয়াও যুদ্ধ-বিজ্ঞা-বিশারদ ছিলেন; তিনি রাজকুমারগণের শিক্ষক-পদে ব্রতী হন। জ্যেষ্ঠ-পাণ্ডব যুধিষ্ঠির যুদ্ধ-বিজ্ঞায় তাত্পর্য্য পারদর্শী হইতে পারেন নাই; তিনি ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়নে ধর্ম্মপ্রাণতা লাভ করিয়াছিলেন। দেহারতনে এবং পরাক্রমে ভীষ্মের প্রসিদ্ধি; তিনি গদাযুদ্ধে অধিতীর্থ ছিলেন। সকল রাজকুমারগণ অপেক্ষা অর্জুন রণকুশল হইয়াছিলেন। তজ্জন্ত বৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ বালক-বয়স হইতেই তাঁহার প্রতি ঈর্ষ্যাবিত্ত হন। নকুল অশ্বপালনে এবং সহদেব জ্যোতির্বিজ্ঞায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। বৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠ-পুত্র দুর্যোধন, গদাযুদ্ধে পারদর্শিতা লাভ করিয়া, ভীষ্মের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। কুমারগণের যুদ্ধ-বিজ্ঞা শিক্ষার পর, এক দিন এক প্রসক্ত প্রাণে, তাঁহাদের বিজ্ঞার পরীক্ষা গৃহীত হয়। অন্ধরাজ বৃতরাষ্ট্র এবং তাঁহার পত্নী রাণী গান্ধারী

* এ বিষয়ে যে যত্নসহ নাই,—তাহা নহে। দেবী-ভাষ্যবতে (প্রথম অঙ্কে, তৃতীয় অধ্যায়ে, ১৭৭ শ্লোকে) লিখিত আছে,—অষ্টাদশ পুরুষ রচনা করিয়া, বেদব্যাখ্য পুরাণ-পরিমিত মহাতারত রচনা করিয়াছিলেন।

সেই পরীক্ষা-ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন ; পাণ্ডু-মহিষী (যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুনের জননী) কুন্তী-দেবীও সেই ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া, পুত্রগণের রণকৌশল দর্শন করিতেছিলেন । ভীম, তরবারি, গদা ও বর্ষা প্রভৃতি লইয়া পরীক্ষা চলিতেছিল । প্রথমতঃ, ভীমের সহিত দুৰ্য্যোধনের গদাযুদ্ধ উপস্থিত হয় । সেই যুদ্ধে, ভীমের কৃতিত্ব-কৌশলে দুৰ্য্যোধনের ক্রোধ-সঞ্চারে, রক্ত-পাতের সম্ভাবনা হইয়াছিল ; সুতরাং ভবিষ্য-কল আশঙ্কাপ্রদ মনে করিয়া, আচার্য্য দ্রোণ উভয়কেই প্রতিনিবৃত্ত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন । ইহার পর, অর্জুন লক্ষ্য-ভেদে এবং তরবারি-ক্রীড়ায় বিশেষ যশোভাজন হন ; তাঁহার জয়ধ্বনিতে দিগ্বাঙল মুগ্ধিত হইয়া উঠে । এই পরীক্ষার পরিণামে কুমারগণের মধ্যে মনোমালিঙ্গ উপস্থিত হয় । দুৰ্য্যোধন-প্রমুখ ধাত্তরাষ্ট্রগণ, পাণ্ডবগণের প্রতিদ্বন্দ্বিতাচরণে প্ররুষ্ট হন । কুরু-পাণ্ডবের যৌব সমরের বিষ-বীজ রোপিত হয় । অতঃপর, সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নির্বাচনের সময় আসিল । যুধিষ্ঠির—পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠপুত্র ; তিনিই রাজ্যের স্থায়ী উত্তরাধিকারী ; সুতরাং ধাত্তরাষ্ট্র তাঁহাকেই যৌবরাজ্যে মনোনীত করিলেন । অভিমানী দুৰ্য্যোধনের হৃদয় ক্রোধানলে জ্বলিয়া উঠিল । তিনি পিতার ব্যবহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন । দুৰ্য্যোধনকে প্রতিনিবৃত্ত করা অসম্ভব বুঝিয়া, দুৰ্য্যোধনের মন্ত্রণায়, ধাত্তরাষ্ট্র, পাণ্ডুপুত্রগণকে বারণাবতে প্রেরণ করিলেন । দুৰ্য্যোধনের ঈর্ষ্যানল তাহাতেও কিস্ত নিবৃত্ত হইল না । সেখানে যত্নগৃহ দাহ করিয়া, পাণ্ডবগণকে ভস্মীভূত করিবার জন্ত, তিনি চেষ্টা পাইলেন । যাহা হউক, দৈবের কৃপায় সে যাত্রা পাণ্ডবগণ এবং তাঁহাদের জননী সুরম-পথে পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিলেন । সেই হইতে বহুকাল পর্য্যন্ত ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের বেশে তাঁহাদিগকে একচক্রা নগরীতে অজ্ঞাত-বাসে অবস্থিত করিতে হইয়াছিল । এই সময়ে দ্রুপদ-রাজনন্দিনীর স্বয়ংবর-বার্তা বিবোধিত হইল । ব্রাহ্মণ-প্রমুখাং দ্রৌপদীর স্বয়ংবর-শ্রবণে কোতূহলাক্রান্ত হইয়া, ব্যাসের আদেশ-অনুসারে পাণ্ডবগণ দ্রৌপদী-প্রার্থনায় স্বয়ংবর দর্শনার্থ পাকাল-দেশাভিমুখে গমন করিলেন । তথায় সমস্ত রাজগণ সমক্ষে লক্ষ্য ভেদ করিয়া, অর্জুন দ্রৌপদী-লাভে সমর্থ হইলেন । তাহাতে অজ্ঞাত ভূপতিগণের সহিত তাঁহাদের যুদ্ধ উপস্থিত হইল । সে যুদ্ধে সকলেই পরাজিত হইলে, পাণ্ডবদিগের পরিচয় ক্রমশঃ প্রকাশ হইয়া পড়িল । অতঃপর, মাতৃ আদেশে, পঞ্চ-ভ্রাতা দ্রৌপদীকে বিবাহ করিলেন । এই সময় পাণ্ডবগণ পাকাল-রাজের সহায়তা পাওয়ার, ধাত্তরাষ্ট্র তাঁহাদিগকে অর্দ্রেক রাজ্য প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন । অর্দ্রেক রাজ্য কৌরবগণের এবং অর্দ্রেক রাজ্য পাণ্ডবগণের মধ্যে ভাগ হইবার বন্দোবস্ত হইল । সমভাগে রাজ্য বিভক্ত হইবে—স্থির হইল বটে ; কিন্তু তাহাতেও স্থায়ের বর্যাদা রক্ষিত হইল না । গঙ্গা এবং যমুনার মধ্যবর্তী উর্বর প্রদেশ, ধাত্তরাষ্ট্র আপন পুত্র-গণের জন্ত নির্দেশ করিয়া দিলেন ; এবং খাণ্ডবপ্রস্থের বস্ত্র-প্রদেয় মাত্র পাণ্ডবগণ গ্রাপ্ত হইলেন । যাহা হউক, পাণ্ডবেরা তাহাতেও দ্বিধা করিলেন না ; অগ্নি-সংযোগে বন ভস্মী-ভূত করিয়া, তাঁহারা সুরমোহর ইন্দ্রপ্রস্থ নগর প্রতিষ্ঠিত করিলেন । এই সময়ে বাহুবলেও বহু রাজ্য পাণ্ডবগণ আপনাদের অধিকারে জানিতে সমর্থ হইয়াছিলেন । অতঃপর, এখন রাজস্ব যজ্ঞে যুধিষ্ঠিরের অতিথৈক-উৎসব সম্পূর্ণ হইবার আয়োজন হইল, কৌরব-পাণ্ডব

বিবাদ-বহি আবার জলিয়া উঠিল। অভিষেক-উপলক্ষে নানা স্থানের রাজস্ববর্গ নিমন্ত্রিত হইলেন; হস্তিনাপুর হইতে দুর্যোধনাদিও নিমন্ত্রিত হইয়া আসিলেন। যত্নবশতঃশ্রীকৃষ্ণ সেই রাজ্যভিষেক-সভায় প্রধান সন্মান প্রাপ্ত হইলেন। সেই ক্ষেত্রে বাদ্যযুবাদ উপস্থিত হওয়ার, চেদিরাজ শিশুপালের সহিত শ্রীকৃষ্ণের স্বন্দ উপস্থিত হইল; ফলে, শ্রীকৃষ্ণের হস্তে শিশুপাল নিহত হইলেন। মহা-সমারোহে অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। কিন্তু রাজস্ব-যজ্ঞের ঐশ্বর্য-দর্শনে দুর্যোধন অহুয়ায় জলিয়া উঠিলেন। অল্প দিন পরেই দ্যুত-ক্রীড়ার আয়োজন হইল; ধৃত্ব শকুনির কৌশলে যুধিষ্ঠির পরাজিত হইলেন। পাণ্ডবগণের রাষ্ট্রকোষের পুনরায় দুর্যোধনের অধিকার-ভুক্ত হইল। কেবল রাজৈশ্বর্য বলিয়া নহে; এই দ্যুত-ক্রীড়ার পরিণামে পাণ্ডবগণ দুর্যোধনের ক্রীতদাস-রূপে পরিণত এবং তাঁহাদের পত্নী দ্রৌপদী পর্যন্ত দুর্যোধনের নিকট বিক্রীত হইলেন। কিন্তু দ্রৌপদী দুর্যোধনের বশতা-স্বীকারে অসম্মত হওয়ায়, দৃশ্যশাসন দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ-পূর্বক, রাজ-সভায় লইয়া গেলেন। ইহার পর, দ্রৌপদীর বস্ত্র-হরণে দৃশ্যশাসনের উদ্যোগ, দ্রৌপদীর খেদ, দ্রৌপদীর প্রতি দুর্যোধনের উরু-প্রদর্শন এবং দৃশ্যশাসনের রক্তপানে ও দুর্যোধনের উরু ভঙ্গে ভীমের প্রতিজ্ঞা। বিবাদ-বহি যখন এইরূপ-ভাবে জলিয়া উঠিয়াছে, সহসা ধৃতরাষ্ট্র সভাস্থলে আগমন করিলেন; দুর্যোধনাদি পুত্রগণকে বুঝাইয়া, পাণ্ডবগণের সহিত বিবাদ-ভঞ্জন করিয়া দিলেন। স্থির হইল,—পাণ্ডবগণ দ্বাদশ বৎসর বনে বাস করিবেন এবং তৎপরে এক বৎসর অজ্ঞাত-বাসে তাঁহাদিগকে কালাতিপাত করিতে হইবে। সেই অজ্ঞাত বাসের সময় ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ যদি কোনরূপে তাঁহাদের সন্ধান পান, তাহা হইলে, পাণ্ডবগণের নির্কাসন-দণ্ড আরও বৃদ্ধি পাইবে। দ্যুত-ক্রীড়ার ফলে, এইরূপ সর্ভে, পাণ্ডবগণ আবার নির্কাসিত হইলেন। দ্বাদশ বৎসর কাল দেশে দেশে বনে বনে পরিভ্রমণ করিয়া, ত্রয়োদশ বর্ষের সময়, তাঁহারা ছদ্মবেশে বিরাট-রাজ-গৃহে কার্য গ্রহণ করিলেন। এ সময়, তাঁহাদের নাম পরিবর্তিত; পরিচয় লুকায়িত। যুধিষ্ঠির, বিরাট-রাজকে দ্যুত-ক্রীড়া শিক্ষাদানে নিযুক্ত হইলেন; ভীম, রজন-শালার প্রধান স্থপকারের কার্যে নিযুক্ত হইলেন; অর্জুন, বিরাট-রাজের কন্যাকে নৃত্যগীত শিক্ষা দিতে লাগিলেন; নকুল, ঘোটক-পরিচর্যায় অশ্বশালার এবং সহদেব গো-পরিচর্যায় গো-শালার কর্ম করিতে লাগিলেন। দ্রৌপদী, বিরাট-রাজ-মহিষীর পরিচারিকার কার্যে বস্তী রহিলেন। দ্রৌপদী তখন সৌরিন্দ্রী নামে পরিচিতা হন। এইরূপে বিরাট-রাজ-গৃহে অবস্থিতি-কালে, রাজ-শ্রালক কীচক, দ্রৌপদীর রূপে মুগ্ধ হইয়া, দ্রৌপদীর প্রতি অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হয়; আতঙ্কে রাজ-সভায় পলায়ন করিলে, কীচক দ্রৌপদীকে পদাঘাত করে। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া, ভীম গুপ্তভাবে কীচকের সংহার-সাধন করেন। কীচক-বধের পর, হস্তিনাপুরে পাণ্ডবগণের সম্বন্ধে সন্দেহ-আন্দোলন উপস্থিত হয়। পাণ্ডবদেবগণে বহির্গত হইয়া, দুর্যোধন প্রভৃতি বিরাট-রাজ্যে গমন করেন। সুশ্রী কর্তৃক বিরাটের গো-হরণ হইলে, গোপগণ-মুখে সেই সংবাদ অবগত হইয়া, বিরাট-রাজ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হন। সেই যুদ্ধে ছদ্মবেশী অর্জুন বিরাট-রাজের সারথির কার্য করেন। বিরাট-পক্ষে অর্জুন

অন্ন-চালনা করায়, কৌরবগণ পরাজিত হয় । ইহার পর, বিরাট-রাজ, অর্জুনের নিকট পাণ্ডবগণের পরিচয় প্রাপ্ত হন ; সঙ্গে সঙ্গে বিরাট-রাজ-সভার রাজগণ-সমীপে যুধিষ্ঠিরের রাজ্য-প্রাপ্তি বিষয়ে বাসুদেব প্রস্তাব উত্থাপন করেন । তখন, পাণ্ডবগণ আপনাদের রাজ্য পুনঃ-প্রাপ্ত হইবার জন্ত হস্তিনাপুরে দূত প্রেরণ করিলেন । কিন্তু দুর্যোধনের তাহাতে আপত্তি হইল ; দুর্যোধন বলিলেন,—‘অক্সাত-বাস পূর্ণ হইয়াছে কি না, তাহা প্রমাণ হয় নাই ; সুতরাং আমি এক বিন্দু রাজ্য প্রদান করিব না ।’ শ্রীকৃষ্ণ এবং পিতামহ ভীষ্ম মধ্যস্থ হইয়া, বিবাদ মীমাংসার জন্ত চেষ্টা পাইলেন ; পাণ্ডবগণের পরাক্রম উল্লেখ পূর্বক ভীষ্ম ও দ্রোণ উভয়েই দুর্যোধনকে সন্ধি-বিষয়ক উপদেশ দিলেন । কিন্তু দুর্যোধন কাহারও কথায় কর্ণপাত করিলেন না । মাতা গান্ধারী এবং পিতা দ্বতরাষ্ট্রের উপদেশ পরাভূতও দুর্যোধন অগ্রাহ করিলেন । এই গৃহ-বিবাদই কুরু-পাণ্ডব-যুদ্ধের সূত্রপাত । এই গৃহ-বিবাদই—ভারতের অধঃপতনের মূল ।

অতঃপর যুদ্ধের আয়োজন চলিল । ভারতবর্ষের রাজ্যবর্গ, কেহ বা দুর্যোধনের পক্ষে, কেহ বা যুধিষ্ঠিরের পক্ষে, রণ-সজ্জায় সজ্জিত হইলেন । শ্রীকৃষ্ণ—পাণ্ডবগণের পক্ষে যোগদান করিলেন । ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, শল্য, জয়দ্রথ প্রভৃতি প্রধান প্রধান যোদ্ধাবর্গ দুর্যোধনের পক্ষ-ভুক্ত হইলেন । বিপুল উৎসাহে যুদ্ধায়োজন চলিতে লাগিল । কুরুক্ষেত্রের বিস্তৃত সমতল-ক্ষেত্রে এই যুদ্ধ আরম্ভ হইল । কৌরব-পক্ষে অদ্বিতীয় বীর ভীষ্ম সেনাপতির পদ গ্রহণ করিলেন । প্রথম দিনের যুদ্ধ-প্রারম্ভেই—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সৃষ্টি । ঐ দিন, আত্মীয়-স্বজনের নিধন-আশঙ্কায় শোকে মুহমান হইয়া, অর্জুন যুদ্ধে প্রতি নিয়ত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন ; আর, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নিগূঢ় সংসার-তত্ত্ব বুঝাইয়া উৎসাহিত করিতে লাগিলেন । এদিকে, দ্বতরাষ্ট্র সর্দদর্শী সঞ্জয়ের নিকট যুদ্ধক্ষেত্রের ঘটনাবলী অবগত হইতে চাহিলেন ; আর সঞ্জয়, সাধনার ফলে, যুদ্ধ-ক্ষেত্রের সমস্ত ঘটনা মানস-চক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া, একে একে দ্বতরাষ্ট্রকে শুনাইতে লাগিলেন । দ্বতরাষ্ট্রের প্রশ্ন এবং সঞ্জয়ের উত্তর—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার আরম্ভ ; অর্জুনের বৈরাগ্যা এবং শ্রীকৃষ্ণের উদ্বীর্ণতা,—উহার মেঘ-মজ্জা-অস্থি ; আত্মার অবিনশ্বরত্ব এবং নিকাম-কর্মের শ্রেষ্ঠত্ব—উহার প্রাণ-স্থানীয় । অষ্টাদশ দিবস এই যুদ্ধ চলিয়াছিল । দশম দিবসের যুদ্ধে মহানতি ভীষ্ম, অর্জুনের হস্তে প্রাণদান করেন । রণক্ষেত্রে বহুল প্রাণী নিহত করিয়া, দেহ-রক্ষণে নির্বেদ উপস্থিত হওয়ার, ভীষ্ম আপন মৃত্যুর উপায় যুধিষ্ঠিরকে বলিয়া দেন । তদনুসারে শিখণ্ডীকে অগ্রবর্তী করিয়া, চেদি ও পাঞ্চালগণ সমভিব্যাহারে, অর্জুন ভীষ্মের অতিমুখে ধাবমান হন । তাহার পর, ভীষ্মের প্রতি শিখণ্ডীর প্রহার, অর্জুন কর্তৃক ভীষ্মের ধনুঃকর্তন, অর্জুনের প্রতি ভীষ্মের অপ্রহার, রথ হইতে ভীষ্মের পতন । ভীষ্মের শর-শয্যায় শয়ন, তাহার ইচ্ছা-মৃত্যু,—ইতিহাসে অপূর্ব ঘটনা । ভীষ্মের মৃত্যুর পর, কুরু-পক্ষে দ্রোণাচার্য্য সেনাপতি-পদে অভিষিক্ত হন । তিনি যুধিষ্ঠিরকে ধরিয়া আনিয়া দিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন । তাহারই সেনাপতিত্ব-কালে, জয়দ্রথের চক্রাঙ্কে, সপ্তরথী পরিবেষ্টিত হইয়া, অর্জুন-পুত্র অস্তিমহা নিহত হন । পুত্র

কুরুক্ষেত্রের
মহা-সমর ।

অভিমত নিহত হইলে, জ্যোতিষদ্বিত অর্জুন, প্রতিজ্ঞা করিয়া, সূর্য্যোত্তের মধ্যে সপ্ত-
 অক্ষৌহিণী সৈন্ত বধ পূর্ব্বক, যজ্ঞরাজ অয়জ্ঞের সংহার-সাধন করেন। এই যুদ্ধ-ক্ষেত্রে দ্রোণ-
 হস্তে রূপদ-রাজ নিহত হইলে, রূপদ-পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণ-বধে তাহার প্রতিশোধ লন। এই
 দ্রোণ-বধও এক বিচিত্র ব্যাপার। দ্রোণের প্রতিজ্ঞা ছিল,—পুত্র অশ্বখামা নিহত হইলে,
 তিনি অস্ত্রত্যাগ করিবেন। তিনি অস্ত্র-ত্যাগ না করিলে, তাঁহাকে পরাজিত করা,—কাহারও
 সাধ্যায়ত্ত ছিল না। দ্রোণ-বধ অনায়াস-সাধ্য নহে—মনে করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ যে কৌশল অবলম্বন
 করেন,—তাহাতে চির-সত্য-নিষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে প্রকারান্তরে মিথ্যা কথা কহিতে হয়।
 অশ্বখামা নামক একটি হস্তী নিহত হইলে, ‘অশ্বখামা হত হইয়াছে’—পাণ্ডব-পক্ষ হইতে এই রব
 উত্থিত হয়। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের মুখে সে কথা না শুনিলে, দ্রোণাচার্য্য প্রত্যয় করিতে চাহেন
 না। শ্রীকৃষ্ণের প্ররোচনায়, ‘অশ্বখামা নিহত হইয়াছে,’—যুধিষ্ঠির এই কথা বলিয়াই অম্পট
 স্বরে ‘কুঞ্জর’ শব্দ উচ্চারণ করেন। ফলে, যুধিষ্ঠিরের সত্য-নিষ্ঠায় বিশ্বাস করিয়া, দ্রোণ অস্ত্র-
 ত্যাগ করিলে, ধৃষ্টদ্যুম্ন খড়্গাঘাতে তাঁহার শিরশ্ছেদন করেন। দ্রোণের মৃত্যুর পর, কর্ণ
 সেনাপতি-পদে বসিত হন। সেই সময় ভীম-হস্তে দুঃশাসন নিহত হয়; দুঃশাসনের
 রক্তপান করিয়া, ভীম দ্রোণদীর অপমান-জনিত ক্ষোভের নিবৃত্তি করেন। অবশেষে কর্ণের
 সহিত অর্জুনের ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হয়। দুই জনেই সমান যোদ্ধা; দুই জনেই সমান বীর।
 লঙ্কল যুদ্ধের সময় কর্ণের রথচক্র যুধিষ্ঠির-প্রোথিত হইলে, কর্ণ মুহূর্ত্ত কাল অবসর প্রার্থনা
 করেন; কিন্তু কৃষ্ণের উপদেশে অর্জুন সে প্রার্থনায় কর্ণপাত করেন না। বিপাকে
 পড়িয়া, অর্জুনের হস্তে কর্ণ প্রাণদান করেন। কর্ণ-বধ হইলে, যজ্ঞেশ্বর শল্য সেনাপতি
 পদ প্রাপ্ত হন। যুধিষ্ঠির কর্তৃক শল্য বধ সমাহিত হইলে, দুর্য্যোধন পলায়ন করেন।
 তিনি যখন ব্রহ্ম-প্রদেশে জলন্তস্ত নির্মাণ করিয়া, লুক্কায়িত-ভাবে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই
 সময়ে ব্যাধগণ ভীমের নিকট দুর্য্যোধনের সংবাদ প্রদান করে। তখন, ধর্ম্মরাজের তীব্র
 তিরস্কার-বাক্যে ব্রহ্ম-মধ্য হইতে দুর্য্যোধন উঠিয়া আসেন। ভীমের সহিত দুর্য্যোধনের
 তুমুল পদাঘাত আরম্ভ হয়। সেই সময়, দ্রোণদীর অপমান-জনিত আপন প্রতিজ্ঞা-রক্ষার্থ,
 শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছিতে, ভ্রাতৃ-যুদ্ধের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া, ভীম অস্ত্রায়ুধে দুর্য্যোধনের উরুদ্বয় ভঙ্গ
 করিয়া দেন। সেই ভাবে কিছুকাল অবস্থিতি করিয়া, দুর্য্যোধন ইহলীলা সংবরণ করেন।
 এইরূপে যে অষ্টাদশ দিবস যুদ্ধ চলিয়াছিল, তাহার প্রথম দশ দিবস পরম শান্তবৈভব্যে ভীম
 যুদ্ধ চালাইয়াছিলেন; তৎপরে পঞ্চ দিবস দ্রোণাচার্য্য কুরু-সৈন্ত রক্ষা করিয়াছিলেন; শত্রু-
 সৈন্ত-বিনাশক কর্ণ দুই দিন; শল্য অর্দ্ধ দিবস; আর, শেষ অর্দ্ধ দিবস ভীম ও দুর্য্যোধনে
 পদাঘাত চলিয়াছিল। শেষ দিবস রজনীতে অশ্বখামা, কৃতবর্মা ও কৃপাচার্য্য—তিন
 জনে মিলিত হইয়া, যুধিষ্ঠিরের বিখ্যাত মিজিত সৈন্ত-সকলকে আক্রমণ করেন। তাঁহার
 বরন রাজা দুর্য্যোধনকে ভয়োক্রম এবং সর্কাসে ক্রুরোক্তিতে রণভূমিতে নিপতিত দেখেন,
 কোণে তাঁহাদের হৃদয় জলিয়া উঠে। অশ্বখামা প্রতিজ্ঞা করেন,—ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রহতি
 পাকালগণকে এবং অবাত্যসরেত পাণ্ডবগণকে বিনাশ না করিয়া তদুত্তরণ বিমোচন
 করিবেন না। ইহার পর, অশ্বখামা হস্তে পাকালগণ নিহত হন; এবং পক্ষ-পাণ্ডব-ব্রহ্ম

দ্রৌপদীর পক্ষ-পুত্রকে অবখায়া সংহার করেন। দ্রৌপদী পুত্রশোকাক্রান্ত ও শিশুবেধে কাড়রা হইয়া, অনশনে প্রাণত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইলে, ক্রীকক বুঝাইয়া তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করেন। অবশেষে, হস্তিনা-রাজ্য অধিকার করিয়া, যুধিষ্ঠির একছত্র-প্রভাব-বিস্তারে রাজ্য-শাসন করিতে প্রস্তুত হন। অবশেষ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়। অবশেষ-যজ্ঞের পর, আশ্রমবাস-পর্বে হুতরাষ্ট্র-বিহ্বর প্রভৃতির অরণ্যে গমন; মৌবল-পর্বে বহুবংশ-স্বংসের বিবরণ; মহাপ্রস্থানিক পর্বে—পাণ্ডবগণের মহা-প্রস্থান-গমন; এবং স্বর্গারোহণ-পর্বে—যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ-প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। যুধিষ্ঠিরের স্বর্গলাভ-বিবরণ—বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। জীবনে একবার মিথ্যা কথা কহিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহাকে নরক-দর্শন করিতে হইয়াছিল। তদ্বিবর এবং তাঁহার আত্মীয়-স্বজনদের কন্দারুণ্যের ফলভোগ,—এই, স্বর্গারোহণ পর্বে পরিদৃশ্যমান। গৃহ-বিবাদে, অন্তর্বিপ্লবের পরিণামে, দেশ বে কিস্কপ অধঃপতনের পথে অগ্রসর হয়, কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধে, মহাভারতে, তাহা বিশদীকৃত হইয়াছে। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ অবসানের পর, পাণ্ডবেরা রাজ্যলাভ করিয়াছেন শুনিয়া, হুতরাষ্ট্র তাই আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন,—‘হায়, কি কষ্ট! যখন শুনিলাম,—কুরু-পাণ্ডবের এই যুদ্ধের পর, অশ্বদ-পক্ষের তিন জন, পাণ্ডব পক্ষের সাত জন,—সমুদয়ে এই দশ জন মাত্র জীবিত আছে; আর, এই ভয়ানক সংগ্রামে ক্ষত্রিয়গণের অষ্টাদশ অকৌহিলী * বিনষ্ট হইয়াছে, তখন হইতেই আমি চতুর্দিক অন্ধকার দেখিতেছি, মোহে অভিভূত হইয়াছি, আমার চৈতন্য লোপ পাইয়াছে, মন অতিশয় বিকল হইয়াছে।’

এই কুরু-পাণ্ডব যুদ্ধের পরিণাম,—কি দাঁড়াইবে, দূরদর্শী হুতরাষ্ট্র পূর্বে হইতেই তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। যদিও পুত্র-স্নেহ-বশতঃ, বাধ্য হইয়া, সময় সময় তিনি পাণ্ডব-দিগের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সঙ্করের নিকট তাঁহার উজ্জ্বল হৃদয়-দর্শন।
যে ক্ষোভ, যে পরিণাম-চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়, মহাভারতে তাহা উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত আছে। হুতরাষ্ট্র সঙ্করকে বলিতেছেন,—‘সঙ্কর!

তুমি শাস্ত্রজ্ঞ মেধাবী; বুদ্ধিমান ও মহামায়া; অতএব আমার উপর মিথ্যা দোষারোপ করিও না। দেব, বিগ্রহে আমার মত ছিল না; এবং কুলক্ষয় হইলে আমি যে সঙ্কট হই,—এমন নহে। আমার পুত্র এবং পাণ্ডু-পুত্র কিছুমাত্র বিশেষ নাই। জীব্যাপরবশ পুত্রেরা আমাকে বুদ্ধ বলিয়া অগ্রাহ করে। আমি নেত্রহীন ও দীন; হুতরাঃ পুত্রস্নেহে আমি সমুদায় সঙ্ক করি। রাজস্বয়-যজ্ঞে যুধিষ্ঠিরের অভুল ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া, হৃর্ব্যোধান সঙ্ক করিতে পারে নাই। সংগ্রামে পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিতে অসমর্থ, রাজলক্ষ্মী-প্রাপ্তি বিষয়ে নিরুৎসাহ, দ্যুতক্রীড়ায় মত্তগা,—হৃর্ব্যোধানের এবং বিধি কার্য্য-পরম্পরা দেখিয়াই আমি হতাশ হইয়াছিলাম।’ এই বলিয়া হুতরাষ্ট্র একে একে বুদ্ধ-পরাজয়ের কারণ সমূহ বিবৃত করেন। তাঁহার সেই উজ্জ্বল মনো অল্প কথায়

* ১ লক্ষ ১ হাজার ৩৫০ পদাতি, ৬৫ হাজার ৬১০ অশ্বরোহী, ২১ হাজার ৮১০ গজারোহী, এবং ২১ হাজার ৮১০ রথারোহী,—সমুদয়ে ২ লক্ষ ১৮ হাজার ১০০ শত সৈন্য এক অকৌহিলী হয়। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে এইরূপ আঠার অকৌহিলী অর্থাৎ ৩২ লক্ষ ৩৬ হাজার ৪০০ শত সৈন্য নিহত হইয়াছিল।

মহাভারতের শত্রু-মর্ষ কি সুন্দর পরিষ্কৃত হইয়াছে। মহাভারত পাঠ করিতে হইলে, সঞ্জয়ের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের সেই উক্তি প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে বলিতেছেন,—

বদাশ্রোযং ধনুর্দ্রাঘ্যং চিত্রং বিক্কে লক্ষ্যং পাতিতং বৈ পৃথিব্যাম্ ।

কুরুঃ কৃত্যং প্রেক্ষতাং সর্বরাজ্যং তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥

যখন শুনিলাম,—অর্জুন বিচিত্র শরাসন আকর্ষণ-পূর্বক লক্ষ্য-ভেদ করিয়া ভূতলে পাতিত করিয়াছে; আর, সমুদায় ক্ষত্রিয় রাজগণের সমক্ষে অর্জুন সদন্তে দ্রৌপদীকে হরণ করিয়া আনিয়াছে; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

বদাশ্রোযং দ্বারকায়াং স্তম্ভভাং প্রসহোঢ়াং মাধবীমর্জুনেন ।

ইন্দ্রপ্রস্থং বৃষ্ণিবীরৌ চ যাতৌ তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥

যখন শুনিলাম,—অর্জুন দ্বারকায় গমন করিয়া, মাধবানুজা স্তম্ভটাকে বলপূর্বক বিবাহ করিয়াছে; অথচ, বৃষ্ণিবংশাবতংস কুরু-বলরাম তাহাতে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া পরম সখ্য-ভাবে ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন করিয়াছেন; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

যদাশ্রোযং দেবরাজং প্রবৃষ্টং শত্রুদিব্যবর্গিতকাক্ষনেন ।

অগ্নিঃ তথা তপিতং খাণ্ডবে চ তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥

যখন শুনিলাম,—খাণ্ডবদাহে দেবরাজ ইন্দ্র মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেও, অর্জুন তাহাতে কিছুমাত্র শঙ্কিত না হইয়া, দিব্য শরজাল বিস্তার করিয়া, বৃষ্টি নিবারণ পূর্বক, অগ্নিকে পরিতৃপ্ত করিয়াছে; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

বদাশ্রোযং জাতুবাধেঅনন্তান মুক্তান্ পার্থান্ শক কৃত্যান্ সমেতান্ ।

মুক্তকৈবাং বিহরং স্বার্বসিকৌ তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥

যখন শুনিলাম,—কুন্তীর সহিত পাণ্ডবগণ জতুগৃহ-দাহ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে, এবং বিদুর তাহাদিগের মঙ্গল-চেষ্টা করিতেছে; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

বদাশ্রোযং দ্রৌপদীং রত্নমধ্যে লক্ষ্যং ভিষা নির্জিতামর্জুনেন ।

শূরান্ পাকালান্ পাণ্ডবেয়াশ্চ মুক্তাংস্তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥

যখন শুনিলাম,—অর্জুন রত্নমধ্যে লক্ষ্য-ভেদ করিয়া দ্রৌপদীকে লাভ করায়, মহাবল পাকাল ও পাণ্ডবে মিলন হইয়াছে; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

বদাশ্রোযং মাপধানাং বরিস্তং জরাসন্ধং ক্ষত্রমধ্যে বলন্তম্ ।

দৌর্য্যং হতং ভীমসেনেন গদা তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥

যখন শুনিলাম,—ভীমসেন, ক্ষত্রিয়-মধ্যে তেজস্বী বগধামিপতি জরাসন্ধকে আপনার বাহুবলে বিনাশ করিয়াছে; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

বদাশ্রোযং দিগ্জয়ে পাণ্ডুপুত্রৈব শীকৃতান্ ভূমিপালান্ প্রমহ ।

মহাকুরু রাজকুরু কৃতক তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥

যখন শুনিলাম,—পাণ্ডুপুত্রেরা দিগ্জয়ে সমুদায় ভূপালকে বলপূর্বক বশীকৃত করিয়া, রাজকুরু মহা-বকের অধীন করিয়াছে; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

বদাশ্রোযং দ্রৌপদীমক্রকতীং লভ্যং নীতাং হৃষিকেশকবদ্যাম্ ।

রত্নমলাং নাগবতীমনাথবৎ তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥

যখন শুনিলাম,—রোহিণী, একবসনা, দুঃখিতা, রক্তবলা, সনাখা দ্রৌপদী, অনাধার
তার সভামধ্যে আনীতা হইয়াছে ; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই ।

যদ্যত্রৌষং বাসনাং তত্র রাশিং সমাক্ষিপৎ কিতবো বন্দরুদ্ধিঃ ।

দুঃশাসনো গতবান্নৈব চান্তং তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ।

যখন শুনিলাম,—দুৰ্দ্ধ্ব দ্বি দুৰ্দ্ধ্ব দুঃশাসন, সেই সভামধ্যে দ্রৌপদীর অঙ্গ হইতে তাঁহার পরি-
ধেয় বস্ত্র আকর্ষণ করিতেছে ; অথচ, দ্রৌপদীর পরিধেয় বস্ত্রের শেষ করিতে পারে নাই,
দুঃশাসনও বিনষ্ট হয় নাই ; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই ।

যদ্যত্রৌষং হৃতরাজ্যং যুধিষ্ঠিরং পরাজিতং সৌবলেনাক্ষবত্যাম্ ।

অধাগতং ভ্রাতৃভিরগ্নমেয়ৈস্তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥

যখন শুনিলাম,—শকুনি অক্ষ-ক্রৌড়াতে যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করিয়া রাজ্য হরণ করিলেও,
মহাপ্রভাবশালী সহোদরেরা যুধিষ্ঠিরের অনুগত হইয়া আছে ; অপিচ, কেহই তাহার
বিক্রান্তচরণ করে নাই ; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই ।

যদ্যত্রৌষং বিবিধাস্তত্র চেষ্টা ধৰ্ম্মান্নানং প্রস্থিতানং বনায় ।

জ্যেষ্ঠপ্ৰীত্যা ক্লিষ্টতাং পাণ্ডবানাং তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥

যখন শুনিলাম,—ধৰ্ম্মায়া পাণ্ডবগণ বনঃ-প্রস্থান করিয়া, জ্যেষ্ঠের সন্তোষার্থ বিবিধ ক্রেশে
বিবিধ চেষ্টা করিতেছে ; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই ।

যদ্যত্রৌষং স্নাতকানাং সহস্রৈরদ্যাগতং ধৰ্ম্মরাজং বনস্থং ।

ভিক্ষাতৃজ্ঞাং ব্রাহ্মণানাং মহাত্মনাং তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥

যখন শুনিলাম,—সহস্র সহস্র মহাত্মন্য স্নাতক ও ভিক্ষুক ব্রাহ্মণগণ, বনবাসী ধৰ্ম্মরাজ
যুধিষ্ঠিরের অনুগত হইয়াছেন ; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই ।

যদ্যত্রৌষমৰ্জ্জুনং দেবদেবং কিরাতরূপং ত্র্যম্বকং তোষা যুদ্ধে ।

অবাস্তবস্তং পাণ্ডপতং মহাপুং তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥

যখন শুনিলাম,—অৰ্জুন কিরাতরূপী দেবদেব মহাদেবকে সংগ্রামে পরিতুষ্ট করিয়া
পাণ্ডপত মহাপুং লাভ করিয়াছে ; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই ।

যদ্যত্রৌষং ত্রিদিবস্থং ধনঞ্জয়ং শক্রাৎ সাক্ষাদ্ধিব্যমস্তং যথাবৎ ।

অদীয়ানং শংসিতং সত্যসঙ্কং তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥

যখন শুনিলাম,—সত্যসঙ্ক ধনঞ্জয় দেবলোকে গমন করিয়া, স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট যথা-
বিধানে দিব্যাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছে ; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই ।

যদ্যত্রৌষং কালকেয়ান্ততস্তে পৌলোমানো বরদানাচ্চ যুগ্মাঃ ।

দেবৈরজয়ো নির্জিতান্তাঙ্কনেন তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥

যখন শুনিলাম,—বরদানগর্ভিত, কেবতাদিগেরও অজের, পুমানন্দন কালকেয় নামক অশুর-
দিগকে অৰ্জুন পরাজয় করিয়াছে ; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই ।

যদ্যত্রৌষমহুরাণাং বধার্থে কীরীটিনং যান্ত্রমিত্রকর্ণনম্ ।

কৃতার্থকাপ্যাগতং শক্রলোকাং তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥

যখন শুনিলাম,—শক্রনাশক কীরীট অশুরবধার্থ ইন্দ্র-লোকে গমন করিয়া, কৃতকার্য
হইয়া প্রত্যাগত হইয়াছে ; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই ।

যদ্যত্রোৎপাদ্যৈবৈশ্বক্যেন সাক্ষ্যং সমাগত্য ভীষ্মক্যাক্ষং পার্শ্বান্ ।

তদ্বিন্ দেশে মাতৃবাণীমগম্য তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়ঃ ।

যখন শুনিলাম,—ভীম ও পাণ্ডবেয়া মহুস্তের অগম্য দেশে গমন করিয়া, বৈশ্বক্য কুন্তের সহিত সাক্ষ্যং করিয়াছে ; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

যদ্যত্রোৎপাদ্যৈবৈশ্বক্যেন সাক্ষ্যং গন্ধর্বক্যে বীক্ষণকাক্ষ্যেনৈব ।

ষেবাং সূতানাং কর্ণবুদ্ধৌ রতানাং তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়ঃ ।

যখন শুনিলাম,—কর্ণমাতুল্যয়ারী মৎপুত্রেরা, যোষবাত্রায় গমন করতঃ গন্ধর্বগণ কর্তৃক বদ্ধ হইয়াও, অর্জুন কর্তৃক মুক্ত হইয়াছে ; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

যদ্যত্রোৎপাদ্যৈবৈশ্বক্যেন সাক্ষ্যং ধর্ম্মরাজেন সূত ।

প্রম্মান্ কাশ্চিৎকিঞ্চবাগক সন্মাক্ তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়ঃ ।

যখন শুনিলাম,—ধর্ম্ম, যক্ষরূপে যুধিষ্ঠিরের সম্মুখানে আসিয়া কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, যুধিষ্ঠির যথাযথ উত্তর দিয়াছে ; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

যদ্যত্রোৎপাদ্যৈবৈশ্বক্যেন সাক্ষ্যং প্রচ্ছন্নরূপান্ বসতঃ পাণ্ডবেয়ান্ ।

বিরাটরাষ্ট্রে সহ কৃষ্ণা চ তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়ঃ ।

যখন শুনিলাম,—পাণ্ডবগণ পাকাল-দুহিতা দ্রৌপদীর সহিত বিরাট-রাজ্যে প্রচ্ছন্ন-ভাবে অবস্থিতি করিতেছে ; অথচ, আমাদের পক্ষীয় অহুসন্ধানকারী কোনও লোক কোনক্রমেই তাহাদের সন্ধান পায় নাই ; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

যদ্যত্রোৎপাদ্যৈবৈশ্বক্যেন সাক্ষ্যং ধনঞ্জয়েনৈকরথেন ভগ্নান্ ।

বিরাটরাষ্ট্রে বসতা মহাত্মনা তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়ঃ ।

যখন শুনিলাম,—পাণ্ডবগণের বিরাট নগরে বাস কালে একরথ ধনঞ্জয়, অশ্বংপক্ষীয় শ্রেষ্ঠ যোদ্ধগণকে পরাস্ত করিয়াছে ; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

যদ্যত্রোৎপাদ্যৈবৈশ্বক্যেন সাক্ষ্যং মৎস্তরাজা সূতাং দস্তায়ুত্তরামর্জুনায় ।

ভাক্ষ্যর্জুনঃ প্রত্যাহুত্বাং সূতার্থে তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়ঃ ।

যখন শুনিলাম,—মৎস্তরাজ আপন কস্তা উত্তরাকে প্রদান করিলে, অর্জুন নিজ পুত্র অভি-মহুয় কস্তা এই কস্তা গ্রহণ করিয়াছে ; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

যদ্যত্রোৎপাদ্যৈবৈশ্বক্যেন সাক্ষ্যং প্রব্রাজিতস্ত স্বজনং প্রচ্যুতস্ত ।

অকৌহিলীঃ সপ্ত যুধিষ্ঠিরস্ত তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়ঃ ।

যখন শুনিলাম,—নির্জিত, নির্জন, নির্বাসিত ও স্বজন-রহিত হইয়াও, যুধিষ্ঠির সপ্ত অকৌহিলী সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছে ; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

যদ্যত্রোৎপাদ্যৈবৈশ্বক্যেন সাক্ষ্যং বান্ধবং সর্কাস্তরা পাণ্ডবার্থে নিবিষ্টম্ ।

যন্তেমাং গাং বিক্রম্যেকমাহুতদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়ঃ ।

যখন শুনিলাম,—ভুলোক যাহার একপদ পরিমিত হইয়াছিল, সেই বান্ধবের সর্কাস্তরা পাণ্ডবগণের হিতসাধন করিতেছেন ; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

যদ্যত্রোৎপাদ্যৈবৈশ্বক্যেন সাক্ষ্যং তৌ কৃষ্ণাৰ্জুনৌ বসতো নারদস্ত ।

অহং ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকে চ সন্মাক্ তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়ঃ ।

যখন শুনিলাম,—নারদ বলিলেন, কৃষ্ণ ও অর্জুন নর-নারায়ণের অবতার, তাহাদিগকে তিনি ব্রহ্মলোকে দেখিয়াছেন ; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

যদ্যত্রোষং লোকহিতায় কৃষ্ণং শমাদিন্দ্রশয্যাস্তং হুরণাব্ ।

শমং কুর্য্যবকৃত্যৰ্কং যাতং তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥

যখন গুণিলাম,—কৃষ্ণ, লোকহিতার্থ সন্ধি-স্থাপন জন্ত হুর্য্যোধনের নিকট আসিয়া, কৃতকার্য্য না হইয়া, প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন ; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই ।

যদ্যত্রোষং কর্ণহুর্য্যোধনাত্যাং যুদ্ধিং কৃত্যং নিগ্রহে কেশবস্ত ।

তদ্যত্রোষং বহুধা দর্শয়ানং তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥

যখন গুণিলাম,—কর্ণ ও হুর্য্যোধন কৃষ্ণের নিগ্রহ চেষ্টা করাতো, তিনি তাহাদিগকে আপনায় বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়াছেন ; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই ।

যদ্যত্রোষং বাসুদেবে অর্য্যতে রথশ্চকামগ্রতন্তিষ্ঠমানাম্ ।

অর্থাং পৃথং সান্ত্বিত্যং কেশবেন তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥

যখন গুণিলাম,—বাসুদেবের গমন-কালে কাতরা কুন্তী একাকিনী তাঁহার রথের সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিলে, কৃষ্ণ তাহাকে অশেষ প্রকারে সান্ত্বনা করিয়া প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছেন ; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই ।

যদ্যত্রোষং মজ্জিগং বাসুদেবং তথা ভীষ্মং শান্তনবঞ্চ তেবাম্ ।

ভারত্বাজকাশিষোহুক্রবাণং তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥

যখন গুণিলাম,—বাসুদেব ও ভীষ্ম উভয়ে পাণ্ডবদিগের মজ্জী হইয়াছেন ; এবং ভারত্বাজ ভ্রোণ তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিতেছেন ; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই ।

যদ্যত্রোষং কর্ণ উবাচ বাক্যং নাহং যোৎসে যুধ্যমানে দয়ীতি ।

হিবা সেনামপচক্রাম চাপি তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥

যখন গুণিলাম —‘ভূমি যুদ্ধ করিলে আমি যুদ্ধ করিব না’—ভীষ্মকে এই কথা বলিয়া কর্ণ সৈন্তদল পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে ; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই ।

যদ্যত্রোষং বাসুদেবার্জুনৌ তৌ তথা ধনুর্গাভীবনপ্রমেয়ম্ ।

জীমুগ্রবীৰ্য্যাপি সমাগতানি তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥

যখন গুণিলাম,—বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন ও অপ্রমেয় গাভীব যত্ন,—এই তিন উগ্রবীৰ্য্য পদার্থ একত্র মিলিত হইয়াছে ; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই ।

যদ্যত্রোষং কশ্মলেনাতিগমে দ্রবোণেষু সীদমানেহর্জুনে বৈ ।

কৃষ্ণং লোকান্ দর্শয়ানং শরীরে তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥

যখন গুণিলাম,—রথস্থ অর্জুন যোহাতিভূত অবসর হইলে, কৃষ্ণ তাহাকে স্ব-শরীরে চতুর্দশ ভূবন দর্শন করাইয়াছেন ; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই ।

যদ্যত্রোষং ভীষ্মমিত্তকর্ণনং নিরস্তমাজাবযুতং রথানাম্ ।

নৈবাং কশ্চিদয্যতে ব্যাতরুণতদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥

যখন গুণিলাম,—অমিত্ত-নাশক ধার্মিক-প্রবর ভীষ্ম, রণস্থলে প্রতিদিন অযুত রথী বিনাশ করিতেছেন ; অথচ, তিনি সেই দুর্ভব পাণ্ডবগণের কোনও এক বিখ্যাত ব্যক্তির বিনাশ সাধন করিতে সমর্থ হন নাই ; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই ।

যদ্যত্রোষকাপগেরেদ সংখো ধ্বংসং বৃদ্ধ্যং বিহিতং ধার্মিকেন ।

তচ্চাকার্য্যং পাণ্ডবেষাঃ প্রকটাতদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥

যখন তুলিলাম,—ধার্মিক-প্রবর ভীষ্ম যুদ্ধস্থলে বিবর্তিতভাবে আপনার মৃত্যুর উপায় আপনিই পাণ্ডবগণকে বলিয়া দিলেন, এবং পাণ্ডবগণ হৃষ্টান্তঃকরণে ভীষ্ম-বধে সেই উপায় অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত হইল; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

যদ্যত্রৌষং ভীষ্মমত্যস্তপূরং হতং পার্বেদাহবেষপ্রধ্বনাম্ ।

শিখণ্ডিনং পুরতঃ স্থাপয়িত্বা তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥

যখন তুলিলাম,—অৰ্জুন, শিখণ্ডীকে সম্মুখে স্থাপন করিয়া, রণ-হৃদ্বর্ষ মহাবীর ভীষ্মকে নিস্তেজ ও আহত করিয়াছে; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

যদ্যত্রৌষং শরতস্তে শয়ানং বৃদ্ধং বীরং সাদিতং চিত্রপুথৈঃ ।

ভীষ্মং কৃত্বা সোমকাননশেষবাস্তবদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥

যখন তুলিলাম,—সোমক সৈন্ত অগ্নাবশিষ্ট করিয়া, শয়ং শিলীমূষ-সমূহে ক্রান্তবিকৃত হইয়া, ভীষ্মদেব শর-শয্যায় শয়ন করিয়াছেন; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

যদ্যত্রৌষং শাস্তনবে শয়ানে পানীয়ার্থে চোদিতেনাৰ্জুনেন ।

ভূমিং তিস্থা তর্পিতং তত্র ভীষ্মং তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥

যখন তুলিলাম,—মহাবীর ভীষ্ম, শর-তলে শয়ন করিয়া, পিপাসা-নিবারণার্থ অৰ্জুনকে জল আনয়নের জন্য আজ্ঞা করিলেন; এবং অৰ্জুন ভূমিতল ভেদ করিয়া, জলা ধারা তাঁহার পরিভূক্তি-সাধন করিল; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

যদা বায়ুশূলহুৰ্য্যো চ যুক্তৌ কোন্তেয়ানামমূলোবা জয়ায় ।

নিত্যাকাশান স্থাপদা ভীষ্মস্থিতি তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥

যখন তুলিলাম,—বায়ু, ইন্দ্র ও সূর্য্য পাণ্ডবদিগের জয়ের নিমিত্ত অমুকুল এবং স্থাপদগণ নিত্য আকাশদিগকে বিভীষিকা দেখাইতেছে; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

যদা জ্যোগো বিবিধানস্তমার্গান্ নিদর্শয়ন্ সমরে চিত্রবোধী ।

ন পাণ্ডবান্ শ্রেষ্ঠভরানিহন্তি তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥

যখন তুলিলাম,—বিচিত্রবীৰ্য্য রণ-বিশারদ জ্যোগাচার্য্য, সমর-ভূমিতে নামাধিব অস্ত্র-প্রয়োগ-কৌশল প্রদর্শন করিয়াও, পাণ্ডবপক্ষীয় শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তিদিগকে আদৌ বিনাশ করিতে সমর্থ হন নাই; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

যদ্যত্রৌষং চামদীয়ান্নহারধান্ ব্যবহিতানৰ্জুনভাস্তকায় ।

সংশপ্তকান্নিহতানৰ্জুনেন তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥

যখন তুলিলাম,—অশ্বৎ-পক্ষীয় সংশপ্তক নামক সৈন্তগণ অৰ্জুন-বধের নিমিত্ত ব্যাহরচনা করিয়া, আপনারাই নিহত হইয়াছে; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

যদ্যত্রৌষং বৃহৎভেদ্যমঃশ্রুতীরাধাজেনাতপশ্চৈব শুশ্রুৎ ।

জিত্বা সৌভদ্রং বীরবেকং প্রব্রিষ্টং তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥

যখন তুলিলাম,—অধিতীর বীর অতিমহু, জ্যোগাচার্য্য-পরিরক্ষিত এবং অস্ত্রের অত্যন্ত চক্রবাহ কৈবর্ত করিয়া, সৌভদ্র প্রব্রিষ্ট হইয়াছে; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

যদাভিমমুঃ পরিবার্য্য বালং সর্বে দৃষ্ট্বা কটকপা যতুঃ ।

মহারথঃ পার্বেদশরু বহুতদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥

যখন শুনিলাম,—মহারথ বোদ্ধগণ, অৰ্জুনকে বধ করিতে না পারিয়া, বালক অভিমত্মাকে বধ করিয়া, প্রফুল্ল-হৃদয় হইয়াছে ; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই ।

যদাশ্রৌষ্যমভিমত্ম্যং নিহতা বর্ধন্যুচান্ ক্রোধাতো দার্টরাষ্টান ।

ক্রোধাতুঙ্কং সৈন্ধবে চার্জুনেন তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥

যখন শুনিলাম,—অভিমত্মাকে বধ করিয়া বীরগণ হর্ষ-বিমূঢ় হইলে, অৰ্জুন ক্রোধাভিভূত হইয়া, জয়দ্রথ-বধে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে ; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই ।

যদাশ্রৌষ্যং সৈন্ধবার্থে প্রতিজ্ঞাং প্রতিজাতাং তদ্বধাযার্জুনেন ।

সতাং তীর্ণাং শক্রমধ্যে চ তেন তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥

যখন শুনিলাম,—অৰ্জুন, জয়দ্রথ-বধের নিমিত্ত প্রতিজ্ঞা করিয়া, শক্রমধ্যে সেই সতা-প্রতিজ্ঞা হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছে ; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই ।

যদাশ্রৌষ্যং শ্রান্তহয়ে ধনঞ্জয়ে যুক্তা হরান্ পারয়িরোপবৃন্দান ।

পুনর্যুক্তা বাহুদেবঃ প্রযাতঃ তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥

যখন শুনিলাম,—ধনঞ্জয়ের অশ্বগণ শ্রান্ত হইলে, কৃষ্ণ তাহাদিগের বন্ধন-মুক্ত করিয়া, জল পান করাইয়া, পুনর্বার রথোৎকর্ষনা করেন ; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই ।

যদাশ্রৌষ্যং বাহনেষু ক্রমেণ রথোপতে তিষ্ঠতা পাতবেন ।

সর্বান যোধান্ বারিতানার্জুনেন তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥

যখন শুনিলাম,—অশ্বগণ অক্ষম হইলে, অৰ্জুন একাকী রথোপরি থাকিয়া, অশ্ব-পক্ষীয় সমুদায় বীরগণকে পরাভূত করিয়াছে ; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই ।

যদাশ্রৌষ্যং নাগবলৈঃ হুঙ্কঃসং ক্রোধানীকং যুধামন্যুং প্রমথ্য ।

যাতঃ বাক্যে যঃ যত্র তৌ কৃম্যপার্থৌ তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥

যখন শুনিলাম,—যুধি বংশোদ্ভব সাত্যকি, হস্ত্যাক্রত সৈন্ত দ্বারা দ্রোণ-সৈন্ত ভেদ করিয়া, কৃষ্ণ ও অৰ্জুনের নিকট গিয়াছে ; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই ।

যদাশ্রৌষ্যং কর্ণমাসাদ্য মৃত্যং বধান্তৌ যঃ কুৎসয়িত্য বচোভিঃ ।

বহুকোট্যাভূদ্য কর্ণে বীরঃ তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥

যখন শুনিলাম,—কর্ণ, ভীমকে বধ না করিয়া ধনুঃ-কোটি দ্বারা পীড়িত করতঃ, ‘মূৰ্খ ও ঔদরিক’ ইত্যাদি বাক্যে তিরস্কার পূর্বক ছাড়িয়া দিয়াছে, এবং ভীম অশেষ ক্রোধ স্বীকার করিয়া আপনার প্রাণ-রক্ষা করিয়াছে ; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই ।

যদা দ্রোণঃ কৃতবর্ষাঃ কৃপশ্চ কর্ণৌ হ্রৌণিন্দ্ররাজশ্চ শূরঃ ।

অমর্ঘয়ন্ সৈকবঃ বধ্যমানঃ তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥

যখন শুনিলাম,—দ্রোণ, কৃতবর্ষা, কৃপ, কর্ণ, অশ্বখামা ও বীরবর মদ্ররাজ প্রতিকার করিতে না পারিয়া, জয়দ্রথ-বধ সঙ্কল্প করিয়াছেন ; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই ।

যদাশ্রৌষ্যং দেবরাজেন দত্তং দিবাং শক্তিঃ ব্যাবিতাং মাংসবেন ।

যটৌৎকচে যাক্ষসে যোরুপে তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥

যখন শুনিলাম,—মাধব, ইন্দ্রদত্ত দিব্যশক্তি, যোরুপী যটৌৎকচ যাক্ষসের বধ-নিমিত্ত প্রবৃত্ত করাইয়া ব্যর্থ করিয়াছেন ; হে সঞ্জয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই ।

যদ্যত্রোষঃ কর্ণঘটোৎকচাভ্যাং যুদ্ধে যুক্তাঃ স্ততপুত্রোণ শক্তিঃ ।

যদ্যত্রোষঃ সমরে সব্যাসাচী নাশংসে বিজয়ায় সজয় ॥

বধন তনুলাম,—কর্ণ, অর্জুন-বধের নিমিত্ত সংগৃহীত সেই সংহারক দিব্য-শক্তি যদ্যত্রোৎকচের যুদ্ধে প্রয়োগ করিয়াছে ; হে সজয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই ।

যদ্যত্রোষঃ দ্রোণাচার্য্যামেকং ধৃষ্টদ্যুমনোভ্যতিক্রিয়া ধর্ম্মং ।

রথোপহে প্রায়ত্তং বিশ্বস্তং তদা নাশংসে বিজয়ায় সজয় ॥

বধন তনুলাম,—দ্রোণ, রথোপরি অস্ত্রত্যাগে প্রায়োপবিষ্ট হইলে, ধৃষ্টদ্যুয়, ধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া, তাঁহাকে বিনষ্ট করিয়াছে ; হে সজয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই ।

যদ্যত্রোষঃ দ্রোণিনা যৈরথং যাদ্রীহুতং নকুলং লোকনরো ।

সং যুদ্ধে মণ্ডলেভ্যন্তরন্তং তদা নাশংসে বিজয়ায় সজয় ॥

বধন তনুলাম,—যাদ্রী-তনয় নকুল, যুদ্ধ-মণ্ডলে ভ্রমণ করতঃ, অশ্বখামার সহিত সমানরূপে বৈরথ যুদ্ধ করিয়াছে ; হে সজয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই ।

যদ্যত্রোণে নিহতে দ্রোণপুত্রো নারায়ণং দিব্যমস্তং বিকূর্ণন্ ।

নৈবামন্তং গতবান্ পাণ্ডবানাং তদা নাশংসে বিজয়ায় সজয় ॥

বধন তনুলাম,—দ্রোণাচার্য্য হত হইলে, অশ্বখামা নারায়ণী অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াও, পাণ্ডব-দিগকে বিনাশ করিতে পারে নাই ; হে সজয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই ।

যদ্যত্রোষঃ ভীমসেনেন পীতং রক্তং ভ্রাতুরুষি হুঃশাসনস্ত ।

নিবারিতং নাশ্রুতমেন ভীমং তদা নাশংসে বিজয়ায় সজয় ॥

বধন তনুলাম,—রণস্থলে ভীমসেন, হুঃশাসনের শোণিত পান করিয়াছে, এবং তাহাকে অস্ত্র কেহই নিবারণ করিতে পারেন নাই ; হে সজয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই ।

যদ্যত্রোষঃ কর্ণমত্যস্তপুং হতং পার্শ্বনাহবেষপ্রবৃষ্যন্ ।

ভগ্নন্ ভ্রাতৃগাং বিগ্রহে দেবগুচ্ছে তদা নাশংসে বিজয়ায় সজয় ॥

বধন তনুলাম,—সেই দৈব-নিরোজিত ভ্রাতৃ-যুদ্ধে, অর্জুন অস্ত্র-পক্ষীর রণ-ধূর্ত্ত্ব মহাবীর কর্ণের বিনাশ-সাধন করিয়াছে ; হে সজয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই ।

যদ্যত্রোষঃ দ্রোণপুত্রক পুং হুঃশাসনং কৃতবর্ধ্মাণমুগ্রম্ ।

যুধিষ্ঠিরং ধর্ম্মরাজং জয়ন্তং তদা নাশংসে বিজয়ায় সজয় ॥

বধন তনুলাম,—ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, বীরবর দ্রোণপুত্র ও হুঃশাসন এবং উগ্রমূর্ত্তাব কৃতবর্ধ্মাকে জয় করিয়াছেন ; হে সজয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই ।

যদ্যত্রোষঃ নিহতং মদ্ররাজং রণে পুং ধর্ম্মরাজেন স্তত ।

সদা সংগ্রামে স্পর্ধিতে বস্ত্র ককং তদা নাশংসে বিজয়ায় সজয় ॥

বধন তনুলাম,—যে মদ্ররাজ, কৃষ্ণের সহিত সংগ্রাম করিতে স্পর্ধা করিতেন, সেই রণবীর মদ্ররাজ যুধিষ্ঠির কর্তৃক নিহত হইয়াছেন ; হে সজয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই ।

যদ্যত্রোষঃ কলহম্ভক্তুলং নারায়ণং সৌবলং পাণ্ডবেন ।

হস্তং সংগ্রামে সহবেবেন পাণং তদা নাশংসে বিজয়ায় সজয় ॥

বধন তনুলাম,—পাণ্ডু-পুত্র সহবেব, অকলীড়া ও কলহের প্রধান কারণ পাণ্ডির নারায়ণ শত্রুকে সংগ্রামে সংহার করিয়াছে ; হে সজয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই ।

যদ্যত্রোষঃ প্রাক্তনেকঃ শয়ানঃ হুতং গন্ধা তত্তয়িষ্য তদন্তঃ ।

হৃষ্যোধনঃ বিরথঃ ভয়শক্তিঃ তদা নাশংসে বিজয়ায় সঙ্গয়ঃ ।

যখন গুনিলাম,—হুতশৈল্য সহায়-শূভ হইয়া, হীনবল বিরথ শ্রুতি হৃষ্যোধন হুদে গিয়া জলকল করিয়া একাকী রহিয়াছে ; হে সঙ্গয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই ।

যদ্যত্রোষঃ পাণ্ডবাংশিত্তমানান্ গন্ধা হুদে বাহুদেবেন সাক্ষঃ ।

অমর্ষণঃ ধ্বংসতঃ হুতং মে তদা নাশংসে বিজয়ায় সঙ্গয়ঃ ।

যখন গুনিলাম,—কৃষ্ণের সহিত হুদ-সমীপে গমন পূর্বক দণ্ডায়মান হইয়া, পাণ্ডবগণ মৎপুত্র হৃষ্যোধনকে তিরস্কার করিতেছে ; হে সঙ্গয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই ।

যদ্যত্রোষঃ বিবিধাংশিত্তমার্গান্ গদাযুদ্ধে মণ্ডলশস্ত্রম্ ।

বিধায়াহতং বাহুদেবস্ত বুধ্য তদা নাশংসে বিজয়ায় সঙ্গয়ঃ ।

যখন গুনিলাম,—গদাযুদ্ধে সূকৌশলী হৃষ্যোধন, মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতে করিতে, বাহুদেবের পরামর্শে অন্ত্যায়রূপে আহত হইয়াছে ; হে সঙ্গয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই ।

যদ্যত্রোষঃ দ্রোণপুত্রাদিত্তৈর্হিতান্ গন্ধালান্ দ্রোণদেয়াংস্ত হুতান্ ।

কৃতং বীভৎসমযশস্তকং কৰ্ম তদা নাশংসে বিজয়ায় সঙ্গয়ঃ ।

যখন গুনিলাম,—অশ্বখামা প্রভৃতি কতিপয় বীরপুরুষেরা সমবেত হইয়া, রজনীতে নিম্নিত গাঞ্চালগণকে ও দ্রোণদ্রৌপদী প্রমুখ পুত্রদিগকে বিনাশ করিয়া, অতি যুগিত ও অযশস্কর বীভৎস কৰ্ম করিয়াছে ; হে সঙ্গয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই ।

যদ্যত্রোষঃ ভীমসেনাচুযাতেনাশথাত্রা পরমাত্ম প্রযুক্তম্ ।

কুঙ্কেনবীকমবদীদেধেন গর্ভং তদা নাশংসে বিজয়ায় সঙ্গয়ঃ ।

যখন গুনিলাম,—মহাপরাক্রম ভীম, পুত্রবধে ক্রোধাক্ত হইয়া, দ্রোণপুত্র অশ্বখামার অন্তঃসরণ করিয়াছে, এবং অশ্বখামা মস্তঃপুত ঐবীক নামক পরমাত্ম পরিত্যাগ করিয়া উত্তরার গর্ভ বিনাশ করিয়াছে ; হে সঙ্গয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই ।

যদ্যত্রোষঃ ব্রহ্মশিরোহর্জুনেন স্বস্তীতুজাত্রমস্ত্রেণ শান্তম্ ।

অশ্বখামা মণিরত্নকং দত্তং তদা নাশংসে বিজয়ায় সঙ্গয়ঃ ।

যখন গুনিলাম,—অশ্বখামা, অর্জুন-বধার্থ ব্রহ্মশিরো নামক অব্যর্থ অস্ত্র প্রয়োগ করিলে, অর্জুন 'স্বস্তি' এই বলিয়া আপনার অস্ত্র ছাড়া সেই অস্ত্র নিবারণ করিয়াছে, এবং অশ্বখামা মনি-রত্ন দান করিয়াছে ; হে সঙ্গয়, আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই ।

রামায়ণের ভ্রায়, মহাভারতের প্রসঙ্গও ভিন্ন ভিন্ন পুরাণোপপুরাণে দৃষ্ট হয় ; অপিচ, মহাভারত অবলম্বনেও যে অসংখ্য গ্রন্থ—কাব্য, নাটক, উপাখ্যান প্রভৃতি—রচিত হইয়াছে,

তাহা বলাই বাহুল্য । তবে, সর্বত্র যে ঐক্যবাহিক-রূপে মহাভারতের কথা পরিবর্ণিত হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না । ত্রীমভাগবতে

ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে
মহাভারত ।

যুধিষ্ঠিরের রাজ্যলাভ-প্রসঙ্গে একটী মাত্র অধ্যায় দেখিতে পাই ; এবং

অশ্বখামার দণ্ড-কথা ও কুন্তী-জন্ম অধ্যায়-দ্বয়ে সংক্ষেপে মহাভারতের কথা উল্লিখিত হইয়াছে ।

দেবী-ভাগবতের চারিটা অধ্যায় মহাভারত-প্রসঙ্গে নিয়োজিত । তাহাতে ভীম, কর্ণ,

। ও পরীক্ষিতের উৎপত্তি এবং পাণ্ডবগণের বনবাস-কালে জরত্মক কর্তৃক দ্রোণদ্রৌপদী-

হরণ প্রসঙ্গ লিখিত আছে। অগ্নি-পুরাণের তিনটী মাত্র অধ্যায়ে, একোনশত্ৰিংশ শ্লোকে, আদিপর্ব হইতে স্বর্গারোহণ পর্ব পর্যন্ত অষ্টাদশ পর্ব বিবৃত। শিব-পুরাণের চারিটী অধ্যায়ে মহাভারত-কথা আছে; কিন্তু মূল মহাভারতের সহিত তাহার ঘটনাবলীর ব্যা-
বাহিক সম্বন্ধ নাই। দুর্বাসার পাষণ্ড, ইন্দ্রকিল পর্বতে অর্জুনের তপস্যা ও ইন্দ্র-সমাগম, ভিল্লকপী শিবের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ ও শিবের বরদান,—শিব-পুরাণে মহাভারত-সংক্রান্ত এই কয়েকটী মাত্র প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয়। মহাভারত-বর্ণিত কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধের মূল ঘটনা—
পুরাণাদিতে অস্ত্র আণ বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে, মহাভারতে প্রসঙ্গতঃ যে সকল উপাখ্যান উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা প্রায় সকল পুরাণেই দেখিতে পাই। সাবিত্রী-
শতাবানের, নল-দময়ন্তীর, হরিশ্চন্দ্রের, শ্রীবৎস্যের এবং শকুন্তলার উপাখ্যান—মহাভারতে এবং অষ্টাঙ্গপুরাণে কতকটা অভিন্ন-ভাবেই প্রকটিত আছে। ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণে কুরু-
শান্তবের মূল ঘটনা বর্ণিত নাই বটে; কিন্তু মহাভারতের আদি পর্বে জন্মেজয়ের নৃপ-যজ্ঞ ও
জরৎকারুর উপাখ্যান যাহা দেখিতে পাই, তাহাই পল্লবিত হইয়া সেখানে বিরাজ করিতেছে।
বামন-পুরাণে চিত্রাঙ্গদা নাম্না এক গন্ধর্ব্ব কন্তার বিবাহ-বিবরণ বর্ণিত আছে বটে; কিন্তু
সে বিবরণের সহিত মহাভারতের চিত্রাঙ্গদার কোনই সাদৃশ্য দেখা যায় না। মহাভারতের
চিত্রাঙ্গদা—মণিপুর-রাজকন্তা; অর্জুনের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। কিন্তু বামন-পুরাণের
চিত্রাঙ্গদা আপনাকে বিশ্বকর্ম্মার কন্তা বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, এবং হিরণ্যের সহিত তাঁহার
বিবাহ হইয়াছিল। এইরূপ নামের মিল আছে, অথচ ঘটনার মিল নাই;—এমন অনেক
বিষয় দেখিতে পাওয়া যায়। মহাকবি কালিদাসের অধিকাংশ কাব্যের মূল—মহাভারত।
শ্রীহর্ষ, ভারবী, মাঘ প্রভৃতি ভারতের বরেণ্য কোবিদগণ—কে না মহাভারতের আশ্রয় গ্রহণ
করিয়াছেন? মহাভারতের অমূল্যরণে, ভারত-সংহিতা নামে, মহর্ষি জৈমিনি এক
মহাভারত প্রণয়ন করিয়াছিলেন। জৈমিনি-ভারত নামে তাহা প্রসিদ্ধ। সেই মহাভারতের
সকল অংশ এখন পাওয়া যায় না; জৈমিনি-ভারত বলিয়া এখন যাহা প্রচারিত, তাহাতে
মহাভারতের অখণ্ড-পর্ব সমধিক বিস্তৃত ভাবে, নূতন নূতন ঘটনাবলীর সমাবেশে, লিখিত
হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় এখন অংশ গদ্যে পদ্যে নানা আকারেই মহাভারত প্রচারিত;
কিন্তু অনধিক তিন শতাব্দী পূর্ব হইতে যাহা মহাভারত নামে বঙ্গদেশে প্রচারিত আছে,
এবং পূর্বে যাহা বহু গৃহে সমাদরে সম্পূজিত হইত, সে মহাভারত—কাশীরাম দাসের
মহাভারত। এক দিকে যেমন কৃষ্ণবাসের রামায়ণ, অল্প দিকে তেমনি কাশীরাম দাসের
মহাভারত,—বাঙ্গালা-ভাষার এই দুই অতুল অক্ষয় সম্পদ। কাশীরাম দাসের মহাভারত
বেদব্যাস-প্রণীত অষ্টাদশ-পর্বাব্যক মহাভারতেরই অমূল্যরণে লিখিত হয়। বাঙ্গালীর
স্বাধীনতার সহিত কৃষ্ণবাসের রামায়ণের যতটা অসামঞ্জস্য দেখিয়াছিলাম, বেদব্যাসের
মহাভারতের সহিত কাশীরাম দাসের মহাভারতের তাদৃশ অসামঞ্জস্য দেখা যায় না; পরন্তু,
অনেক স্থলে মূল সংস্কৃতের সহিত কাশীরামের পয়ারাদির ভাব ও ভাষার অভিন্নতাই দৃষ্ট হয়।
তবে, কাশীরামের মহাভারত, বেদব্যাসের মহাভারত হইতে যে সংকীর্ণ, তাহা বলাই
বাছল্য। উক্ত গ্রন্থের অসামঞ্জস্য—প্রধানতঃ পর্ব-বিভাগে। এখন নব পর্বের নাম—

বেদব্যাংসে ও কাশীরামে একই দৃষ্ট হয়। বেদব্যাংসের দশম পর্বের নাম—সৌপ্তিক ; কাশীরামের দশম পর্ব—গদা, একাদশ—সৌপ্তিক। বেদব্যাংসের একাদশ পর্বের নাম—ত্রী ; কাশীরামের ত্রয়োদশ—নারী। বেদব্যাংসের ষাটশে শাস্তি, ত্রয়োদশে অশ্বশাসন, চতুর্দশে অশ্বমেধ, পঞ্চদশে আশ্রমবাসিক, ষোড়শে মৌবল, সপ্তদশে মহাপ্রস্থানিক, অষ্টাদশে স্বর্গা-রোহণ। কাশীরামের ষাটশে ঐবীক, চতুর্দশে শাস্তি, পঞ্চদশে অশ্বমেধ, ষোড়শে আশ্রমিক, সপ্তদশে মূষল এবং অষ্টাদশে স্বর্গারোহণ। বেদব্যাংসের অশ্বশাসন এবং মহাপ্রস্থানিক পর্বের নাম—কাশীরাম-দাসের মহাভারতে নাই ; অথচ গদা ও ঐবীক পর্ব, বাহা বেদব্যাংসে নাই, কাশীরাম দাসে আছে। মোটের উপর কাশীরামের মহাভারত—বেদব্যাংসের মহাভারতের সংক্ষিপ্তসার, তাহাতে সন্দেহ নাই ; অথচ, অনেক বিষয় বেদব্যাংসে নাই, কিন্তু কাশীরাম দেখিতে পাই ; আবার অনেক বিষয় বেদব্যাংসে আছে, কিন্তু কাশীরামে নাই। ত্রীম-পর্কাস্তর্গত শ্রীমন্তগবদগীতা পর্কাদ্যায় প্রায় দেড় শত ছত্রের মধ্যে (প্রায় ৭৫টী পয়ারে) কাশীরাম শেষ করিয়াছেন ; অথচ, বিরাট গৃহে গোধন-রক্ষার্থ অর্জুন ও দ্রুপদ্যোধনের যুদ্ধের সময়, কাশীরাম রণভূমে চামুণ্ডার আবির্ভাব করাইয়াছেন, কিন্তু বেদব্যাংসে তাহার নাম-গন্ধও নাই। কাশীরাম লিখিয়াছেন,—“রণ দেবি কৌতুকে কালীর আগুসার।

...আইল চামুণ্ডা, করে ধর পাণ্ডা, গলে দোলে মৃত্যুমালা।

লহ-লহ জিহ্বা, বিচাতের প্রভা, ঘন করাল বদনা।

...ধ্বংস ভরিয়া, উদর পুরিয়া, করিয়া শোণিত পান।

অর্জুনে কল্যাণ, করি নিজস্থান, কালী করিল গয়ন।”

এইরূপ, আরম্ভে, মধ্যে এবং শেষে—যেখানেই মিলাইয়া দেখিবেন, অনেক স্থলেই অমিল দেখিতে পাওয়া যাইবে। কোন কোনও স্থলে আবার বেদব্যাংসের মহাভারতের সহিত কাশীরামের মহাভারতের অপূর্ণ সামঞ্জস্যও দৃষ্ট হয়। এমন কি, তত্তৎ স্থলে মূল মহাভারত সম্মুখে রাখিয়া কাশীরাম তাহার অনুবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। বেদব্যাংসের আদি-পর্বের অন্তর্গত সম্ভব-পর্কাদ্যায় পুত্ররাষ্ট্রকে বিচুর বলিতেছেন,—

“তাজেদকং কুলস্যার্থে গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ। গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ।

স তথা বিদ্বান্নোক্তৈশ্চ সর্কধিজন্তুভিঃ। ন চকার তথা রাজা পুত্রেন্নেহসমধিতঃ।”

কাশীরাম দাসের মহাভারতে এই শ্লোক দুইটী পয়ার-ছন্দে এইরূপে লিখিত হইয়াছে,—

কুলের কারণ রাজা ত্যজি একজন। কুলত্যাগ করি রাজা গ্রামের কারণ।

গ্রাম ত্যজি শুন রাজা জনপদ হিতে। পৃথিবীকে ত্যজি রাজা আপনা রাখিতে।

হেন নীতি আছে রাজা কহে পূর্কাপর। জ্যেষ্ঠ পুত্র মারি বংশ রাখ নৃপবর।

এতক বচন যদি বিচুর বলিল। পুত্রস্নেহে হৃদরাত্তি গুণি না গুনিল।

উক্ত পয়ারের “হেন নীতি” হইতে “নৃপবর” পর্য্যন্ত অংশ মূল নাই। তত্ত্বিন্ন অপর্যাংশে মিল দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ, অন্যান্য স্থানেও অনেক সামঞ্জস্য আছে। কাশীরাম ত্রিংশ, বঙ্গদেশে বঙ্গভাষায় আরও বহু কবি মহাভারত অনুবাদের চেষ্টা পাইয়াছিলেন। বিজয় পণ্ডিত, সঞ্জয়, কাবচন্দ্র, পুরিগোবে কবি রাজকৃষ্ণ রায়, মহাভারতের পঞ্চানুবাদ করিয়াছিলেন। মুসলমান লেখকগণের মধ্যেও মহাভারতের অনুবাদ-কর্তার নাম দৃষ্ট হয়।

বাগালা বেশ ভিন্ন, ভারতের অন্তর্ভুক্ত স্থানেও মহাভারত নানা আকারে নানা ভাষায় পড়ে পড়ে প্রচারিত আছে ।

মহাভারতের এবং পুরাণ-সমূহের এক এক অংশের বর্ণিত বিষয়ের সহিত অনেক সময় অপর অংশের অসামঞ্জস্য দৃষ্ট হয় । প্রধানতঃ, সেই কারণে প্রকিপ্ত-প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়া থাকে । প্রতি পুরাণোপুরাণের প্রকিপ্ত-তত্ত্ব আলোচনা করা এতদূরে প্রকিপ্ত-প্রসঙ্গ । সম্ভবপর নহে ; মহাভারতের ভাষাবিরাট্ গ্রন্থের প্রকিপ্ত-তত্ত্ব আলোচনাও

এই ক্ষুদ্র প্রসঙ্গের আরম্ভাবধীন নহে । তথাপি, কি কারণে প্রকিপ্ত-প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়, এবং সাধারণতঃ মহাভারতের কোন্ কোন্ অংশকে পণ্ডিতগণ প্রকিপ্ত বলিয়া নির্দেশ করেন,—এতদূরে তাহারই একটু আভাস প্রদান করিব । মহাভারতের প্রকিপ্ত-সম্বন্ধে প্রধানতঃ চারিটি কারণ নির্দিষ্ট হইয়া থাকে । প্রথম,—মহাভারতের আদিপর্বে পর্যাখ্যায়-পর্ব-সংগ্রহে মহাভারতের বর্ণিতব্য বিষয়-সমূহের যে অমুক্রমণি বা হুচীপত্র আছে, তাহার সহিত কোনও কোনও স্থলের বর্ণিত বিষয়ের মিল নাই । পর্যাখ্যায়-সংগ্রহে অমুক্রমণি ও ত্র্যক্ষণ-গীতার নাম নাই; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে দুই গীতার ছত্রিশটি অধ্যায় অবিকার করিয়া আছে । এতদূর স্ববৃহৎ দুইটি বিষয় অমুক্রমণিকায় উল্লিখিত হইল না কেন,—তাহার কি কারণ নির্দেশ করিতে পারি ? দ্বিতীয়,—শ্লোক-সংখ্যা । লিখিত আছে,—ভগ্নেজয়ের সর্বলক্ষ্যে পঠিত মহাভারত লক্ষ-শ্লোকাত্মক এবং সেই মহাভারতই এখন প্রচলিত । বলা বাহুল্য, কোন্ পর্বে কত শ্লোক আছে, পর্যাখ্যায়-সংগ্রহে তাহা উক্ত হইয়াছে । কিন্তু তদনুসারে গণনায় লক্ষ শ্লোক পাওয়া যায় না ; তাহাতে শ্লোক-সংখ্যা দাঁড়ায়,—৮৪ হাজার ৮ শত ৩৬টি মাত্র । ইহাতে লক্ষ শ্লোক পূরিল না বটে ; কিন্তু ইতার পর, হরিবংশের নামোক্তে দৃষ্ট হয় । পর্যাখ্যায়-সংগ্রহেই একারান্তরে লিখিত আছে,—হরিবংশের দ্বাদশ-সহস্র শ্লোক মহাভারতেরই অন্তর্ভুক্ত । যাহা হউক, তাহাতেও শ্লোক-সংখ্যা পূর্ণ হয় না । অতঃ, অধুনা-প্রচলিত মহাভারতের শ্লোক-সংখ্যা গণনা করিয়া, পণ্ডিতগণ নির্দেশ করেন,—হরিবংশ সহ মহাভারতের শ্লোক-সংখ্যা এখন ১ লক্ষ ৭ হাজার ৩ শত ৯০টি । এইরূপ অমুক্রমণিকা অধ্যায় দেড় শত শ্লোকে সম্পূর্ণ হইয়াছিল বলিয়া মহাভারতে উক্ত আছে ; অতঃ, গণনায় দুই শত বায়ান্তর শ্লোক বিদ্যমান । তাহা হইলেই বুঝা যায় না কি,—পরবর্ত্তী-কালে কিছু-না-কিছু নূতন সংযোগ-বিয়োগ ঘটিয়াছে ? তৃতীয়,—মহাভারতের সকল অংশ যে বেদব্যাঙ্গের রচনা নহে, আদিপর্বের প্রথম কয়েকটি অধ্যায় হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যায় । নৈমিষারণ্যে সৌনকাদি ঋষিগণের প্রেরণ উক্তরে লোকসংস্কার-পুত্র পুত্র-কুল-মন্ডন উগ্রস্রবা মহাভারত বর্ণন করিতেছেন,—এইরূপ লিখিত আছে । সে স্থলে আরও দৃষ্ট হয়, প্রব্রজী মহর্ষিগণ বলিতেছেন,—“মহর্ষি বৈশম্পায়ন যে পুরাণ রচনা করিয়াছিলেন, সর্বলক্ষ্য-কালে মহাব্রাজ ভগ্নেজয়ের নিকট বৈশম্পায়ন হুনি যে মহাভারত কীর্ত্তন করেন,—বেদব্যাঙ্গ-প্রণীত সেই ভারত-সংহিতা আমরা প্রবণ করিতে বাসিনা করি ।” এইরূপে মহাভারতের নানা স্থানে হত, সৌমক, উগ্রস্রবা, ভগ্নেজয় প্রভৃতির যে প্রমোদিত দৃষ্ট হয়, তদ্বিষয় বেদব্যাঙ্গের রচনা বলিয়া মনে হইতে পারে না । চতুর্থ,—চরিত্রগত

দসঙ্গতি। বেদব্যাসের ন্যায় সুকবি আপন গ্রন্থবর্ণিত চরিত্র-সমূহের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারিবেন না—ইহা কেমন করিয়া বিশ্বাস করিতে পারি? যুধিষ্ঠিরকে তিনি সত্যনিষ্ঠার আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তাহার মুখ দিয়া গুরুত্বা-মূলক মিথ্যা-বাক্য উচ্চারণ করাইয়াছেন। ইহাতে চরিত্রের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই। এইরূপে মহাভারতের মধ্যে অনেক অংশ পরিবর্তি-কালে সংযোজিত হইয়াছে, এবং তাহাতে মহাভারতের বর্ণিতব্য মূল বিষয়—কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ-কাহিনী—নানারূপে পল্লবিত হইয়া পড়িয়াছে। আধুনিক পণ্ডিতগণের ইহাই সিদ্ধান্ত। মহাভারত বা পুরাণাদিতে, প্রকৃষ্ট বা বেদব্যাসের পরবর্ত্তি-কালের রচনা যে নাই—এমন কথা আমরাও অবশ্য বলি না। তবে, প্রকৃষ্ট-বিচারে সচরাচর যেভাবে চতুর্বিধ যুক্তির অবতারণা হয়, তদ্বিষয়ে আমাদের মতান্তর আছে। দ্রোণ-বধে মিথ্যা কথা বলায়, যুধিষ্ঠিরের চরিত্রে দোষ বর্ত্তিয়াছে; সুতরাং উহা প্রকৃষ্ট,—এবংবিধ উক্তির সহিত আমরা কখনই একমত হইতে পারি না। এ বিষয়ে বিবিধ উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। প্রথমতঃ, মহাভারতের ঐতিহাসিকত্ব যদি স্বীকার করি, তাহা হইলে, যাহা ঘটয়াছিল—মহাভারতকার তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন মানিয়া লওয়া কর্তব্য। সেরূপ ক্ষেত্রে, ঐ অংশ বাদ দিলে ইতিহাসে ভুল থাকিয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, ঐ অংশে কবি-প্রতিভার খরস্ হওয়া দূরে থাক, বরং ঔজ্জ্বল্যই বৃদ্ধি পাইয়াছে। ‘যুধিষ্ঠির চির-সত্যবাদী, তিনি কখনও মিথ্যা কথা কহেন নাই’—কেবল এই মাত্র দেখাটয়া গেলে, তাহার সে সত্যবাদিত্ব যতটা প্রাণশ্পর্শী হইত; দ্রোণ-বধ-প্রসঙ্গে জীবনে একবার মাত্র মিথ্যা বলাইয়া, তাহার পরিণাম-চিত্র অঙ্কিত করায়, সত্যের জ্যোতিঃ অধিকতর ঔজ্জ্বল্যসম্পন্ন হইয়াছে। যে অবস্থায়, যে ঘটনা-স্রোতে ফেলিয়া, যুধিষ্ঠিরের মুখ দিয়া কবি অস্বাভাব্য-বধ-বার্ত্তা প্রচার করাইয়াছেন, যদি কল্পনা বলিতে চাও, তাহাও উচ্চ কবি-কল্পনারই পরিচায়ক। এই ঘটনায় যুধিষ্ঠিরের চিত্রও বেরূপ প্রফুল্ল হইয়াছে, লোক-শিক্ষার পক্ষেও উহা তদনুরূপ সহায়তা করিতেছে। তার পর, যুধিষ্ঠির মনুষ্য; কবি সেই মনুষ্য-চিত্রই অঙ্কিত করিয়াছেন! মনুষ্য-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন বলিয়াও তিনি দেখাইয়াছেন, যুধিষ্ঠিরের ন্যায় জিতেন্দ্রিয় সত্যনিষ্ঠ মনুষ্যকেও কুরুপ-ভাবে অবস্থার দাস হইতে হয়। তাহা দেখিয়া, অপরে সাবধান হইতে পারিবে—ইহাও হয় তো কবির লক্ষ্য। তার পর, ঐ অংশের সহিত মহাভারতের সম্বন্ধ ওতঃপ্রোত বিচ্ছিন্ন। উহাকে বাদ দিতে হইলে, মহাভারতের সারভূত অনেক অংশ বাদ দিতে হয়। সুতরাং

“তম তথা ভয়ে যয়ো জয়ে শক্যো যুধিষ্ঠিরঃ। অধ্যাক্ষমব্রবীত্বাশ্বনু হতঃ কুরুম ইতুতঃ।”

এ অংশ কখনই মিথ্যা বা প্রকৃষ্ট হইতে পারে না। অবশেষে, শ্লোক-সংখ্যা বিষয়ক সন্দেহ। এ বিষয়েও নানা কথা আছে। প্রথমতঃ শ্লোক-গণনার নানা পদ্ধতি অবলম্বিত হয়। কেহ “জয়েজয় উবাচ” এই বাক্যটিকেও একটী শ্লোক বলিয়া গণনা করেন; কেহ বা হুই ছত্র কবিতা তির অন্ত কথাকে শ্লোক বলিয়া মানিতে সম্মত হন না। সুতরাং মহাভারতের শ্লোকসংখ্যা প্রথম গণনার সময় কোন মতে উহা গণনা করা হইয়াছিল, কে বলিতে পারিবেন? মহাভারতের আদি-পর্বে লিখিত আছে,—“কেহ নারায়ণ নমস্কৃত্য

—এই বস্তু হইতে, কেহ বা আঙ্গিক পূর্ণ হইতে, কেহ বা উপরিচর রাজার উপাখ্যান হইতে মহাভারতের আরম্ভ মনে করিয়া অধ্যয়ন করেন ।” যদি তাহাই হয়, এখন আর মন-গড়া হিসাব করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র । তার পর, শ্লোক-সংখ্যা কম বলিয়া বাঁহারা নির্দেশ করেন, তাঁহারা কোন প্রদেশ প্রচলিত মহাভারতের শ্লোক-সংখ্যা গণনা করিয়াছেন, বলিতে পারি না । গৌড়ীয় মহাভারত, বোম্বাই প্রদেশীয় মহাভারত এবং পশ্চিমাঞ্চলে প্রচলিত মহাভারত,—এই ত্রিবিধ মহাভারত যদি আমরা মিলাইয়া দেখি তাহাতে অনেক শ্লোকের কমিবেশী দেখিতে পাই । দৃষ্টান্ত কত উল্লেখ করিব ? ভীষ্ম-পর্বে যেখানে শ্রীমত্তগবদগীতার পরিসমাপ্তি হইয়াছে, তাহার পরবর্তী বৈষ্ণবায়নোক্ত সার্ক পঞ্চ শ্লোক গৌড়ীয় মহাভারতে নাই । বর্ধমান রাজবাটীর অনুবাদিত মহাভারতে এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতে সেই শ্লোক-কয়েকটির অনুবাদও দেখিতে পাওয়া যায় না । কিন্তু নীলকণ্ঠ-কৃত টীকায় দেখিতে পাই,—“গীতা স্মৃগীতা কর্তব্য ইত্যাদয়ঃ সার্কঃ পঞ্চশ্লোকাঃ গোড়ৈন পঠ্যন্তে ।” এইরূপ গোড়দেশে কণ-পর্বের স্তম্ভিতম অধ্যায়ের যে পাঠ প্রচলিত আছে, বোম্বাই প্রদেশে তদপেক্ষা দুইটা শ্লোক বেশী দেখিতে পাওয়া যায় ; পশ্চিমাঞ্চলে তদধিক আরও দুইটা শ্লোক প্রচলিত আছে । দ্রোণ-পর্বাস্তম্য জয়দ্রথ-বধ পর্বাদ্বায়ে এক-নবতিতম অধ্যায়ের একটা শ্লোক, পঞ্চত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়ে পাঁচটা শ্লোক, সপ্তত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়ে দশটা শ্লোক,—বোম্বাই প্রদেশের পুস্তকে অতিরিক্ত দেখিতে পাওয়া যায় । এইরূপ, আরও অনেক পর্বের অনেক শ্লোক, অন্য দেশে প্রচলিত আছে ; কিন্তু এতদেশে প্রচলিত নাই । পুঁথি নকল করিবার সময় ঐ সকল শ্লোক বাদ পড়িয়া যাওয়াও অসম্ভব নহে । এদেশেও বর্ধমান রাজবাটীর মহাভারতের এবং কালী-প্রসন্ন সিংহের মহাভারতের অনুবাদে যে কমিবেশী দেখা যায়, তাহারও কারণ—পুঁথির গোলযোগ । বাঁহারা যেরূপ পুঁথি পাইয়াছিলেন, সেইরূপ পুঁথিই মিলাইয়া অনুবাদ করাইয়া গিয়াছিলেন ; কাজেই সামান্য সামান্য তারতম্য ঘটিয়াছে । যাহা হউক, অন্য প্রদেশে প্রচলিত মহাভারতের অতিরিক্ত শ্লোক-গুলি গণনা করিয়াও, বর্ধমান গণনা-প্রণালী অনুসারে, লক্ষ শ্লোক গণিয়া পাওয়া যায় না । তাহাতে মনে হয়,—যে সময় শ্লোক-সংখ্যা গণনা করা হইয়াছিল, তাহার পরবর্ত্তি-কালে লিপিকারগণের ক্রটিতে কিছু কিছু শ্লোক বাদ পড়িয়া গিয়াছে । আরও, ‘লক্ষ-শ্লোকান্বক মহাভারত’—এই পরিচয়ে, গণিয়া ঠিক লক্ষটি শ্লোকই হইবে, দুই একটা কমিবেশী হইবে না,—ইহাও মনে করা যুক্তি-যুক্ত নহে । তবে যে প্রক্ষিপ্ত বা সংযোজন্যের কথা স্বীকার করিতে হয়, তাহার কারণ অল্পরূপ ; সে কারণ আমরা পুরাণ-প্রসঙ্গে নির্দেশ করিয়াছি । * কিন্তু তাই বলিয়া, পরিবর্ত্তন করিয়া, আশঙ্ক্যাক্রমণ মহাভারত স্তম্ভি করিবার কোনই প্রয়োজন দেখা যায় না । মহাভারতের মূল ঘটনা, মহাভারত পাঠ করিলেই প্রতীত হইতে পারে । আনুবাদিক যে সকল প্রসঙ্গ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা যে স্থানিক ও সূত্রপদেশের উদ্দেশ্যে অবতারণিত হইয়াছিল,—সবকেই বুঝিতে পারা যায় ।

মহাভারতে সকল সমুদায়ের সকল অবস্থার চিত্র প্রতিফলিত। সুতরাং সকল অবস্থায় সকলেরই উহা শিক্ষাপ্রদ। ধর্ম ও অধর্ম, পাপ ও পুণ্য, আলোক ও অন্ধার,—

মহাভারতে
শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র।

মহাভারতে সংসারের দুই দিক—দুই চিত্র দেদীপ্যমান। এক দিকে, ভ্রাতৃবান্ধব, মাতৃভক্তি, সত্যনিষ্ঠা; অল্প দিকে, ঘেব, হিংসা, অহুয়া-
গুরুবাক্য লঙ্ঘন। এক দিকে, সত্য-রক্ষার জন্য যুধিষ্ঠিরাদি বনবাসী

হইতেছেন; অল্প দিকে, দুর্ব্যোধন, পিতা যুতরাষ্ট্রের উপদেশ অবহেলা করিয়া, বনবাসী পঞ্চ-পাণ্ডবের নির্যাতনের জন্য প্রয়াস পাইতেছেন। পুণ্ড্রপুত্র কত বলিব? ভীষ্মের জ্ঞান মহান্ চরিত্র, যুতরাষ্ট্রের জ্ঞান প্রজ্ঞা-বুদ্ধি,—কোন দেশের কোন ইতিহাসে দেখিতে পাই? দ্রোণ, ভীষ্ম, অর্জুন, যুধিষ্ঠির, দুর্ব্যোধন, শকুনি, অশ্বখামা,—এক এক চরিত্রে এক এক ভাবের পূর্ণ বিকাশ। আবার, সকল শিক্ষার পূর্ণ বিকাশ—মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রে। মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ—দেবতা-রূপে চিত্রিত নহেন; তিনি আদর্শ মনুষ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত। মনুষ্য কতদূর উন্নত হইতে পারে,—বল-বুদ্ধি-জ্ঞান সর্ববিষয়ে কিরূপ উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে, মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রে তাহাই প্রদর্শিত হইরাছে। শ্রীকৃষ্ণ—যেন সকল বৃত্তির সৃষ্টি! শ্রীকৃষ্ণ—পূর্ণ মনুষ্য। পূর্ণ লাভ, করিতে হইলে, মনুষ্যের কোন আদর্শ অনুসরণ করা কর্তব্য, মহাকবি বেদব্যাস, শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রে তাহা পরিষ্কৃত করিয়াছেন। মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ—জ্ঞানের অবতার; মহাভারতে—ঐহার প্রবীণত্বের পরিচয়। শ্রীমদ্ভাগবতে ও ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণে—ঐহার বালা ও যৌবনের চিত্র দেখিতে পাই। তাহাতে ঐহার শারীরিক বলের ও রণ-নৈপুণ্যের বিকাশ। ঐহার বলবতা ও দৃঢ়তার পরিচয়,—গোকুলে, বৃন্দাবনে, যথুরায় পূর্ণ প্রকটিত। আর মহাভারতেও তাহা আছে বটে; কিন্তু ঐহার জ্ঞানের চরম সৃষ্টি—এই মহাভারতে। আমাদের মনে হয়,—শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রের প্রধান প্রতিষ্ঠা—তৎ-প্রচারিত ধর্ম-তত্ত্বে। সেই ধর্ম-তত্ত্বের মূল আধার—ধর্ম-মৌমাংস। সে মৌমাংসা—বিশেষ অতিনব্ব-ব্যঞ্জক। ঐহার নিকট—অহিংসাও ধর্ম, আবার হিংসাও ধর্ম; সত্যও ধর্ম, আবার অসত্যও ধর্ম; কামনাও ধর্ম, আবার নিকামতাও ধর্ম। কর্তব্য-নির্ধারণ এবং সমস্তার মৌমাংসা—শ্রীকৃষ্ণের নীতির বেন প্রধান অঙ্গ। মহাভারতের কর্ণ-পর্কে, কর্ণ জীবিত আছেন ওনিয়া, অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া, যুধিষ্ঠির অর্জুনের প্রতি তৎসমা করেন;—অন্য-কোনও সমর্থ ব্যক্তির হস্তে পাণ্ডব প্রধান করিতে বলেন। অর্জুনের প্রতিজ্ঞা ছিল, ঐহাকে কেহ পাণ্ডব পরিভ্যাগ করিতে বলিলে, তিনি যিনিই হউন, অর্জুন ঐহার সংহার-সাধন করিবেন। সুতরাং, যুধিষ্ঠিরের বাক্য ওনিয়া উত্তেজিত হইয়া, অর্জুন ঐহার বদার্থ ষড়ঙ্গ উত্তোলন করেন। সেই সময়ে অর্জুনকে সাধন্য করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ যে নীতি-তত্ত্ব বিবৃত করিয়াছিলেন,—শ্রীকৃষ্ণ-কথিত ধর্মতত্ত্ব তাহাতে বিশেষরূপে বুঝিতে পারা যায়। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—“তুমি কার্য্যাকার্য্য বিনিময়ে নিমৃত হইতেছ। কর্তব্যাকর্তব্য অবধারণ করা কোনক্রমেই অনায়াস-সাধ্য নহে। শত্রু-জ্ঞান দ্বারা তৎ-সমুদায় জানা বাইতে পারে। কিন্তু তুমি তাহা হরণ করিতে সমর্থ হইতেছ না। তুমি যে ধর্ম-বৈরা হইয়া ধর্ম রক্ষা করিতেছ, তাহা অবিজ্ঞান-প্রযুক্তই

করিতেছে। কেন-না, ধার্মিক হইয়া প্রাণিগণের বধে কত অধর্ম হয়, তাহা নিভেছ না। আমার মতে,—প্রাণিগণের বধ না করাই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বরং মিথ্যা কথা কহিবে, তথাপি কোনপ্রকারে কাহারও হিংসা করিবে না। ধর্মের স্বাক্ষ-তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা কর।

প্রাণিনামবধস্তাত সর্বকায়াদ্ভ্যন্তো যম। অনুতাং বা বদেদ্যচ্চ নতু হিংস্যাৎ কথঞ্চন।

সত্যের কখনই সাধু; সত্য হইতে আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নাই; পরন্তু সত্যই বাহার অমুষ্ঠানের বিষয় হয়, সত্যের বার্থ-তত্ত্ব তাহার স্বহৃদেই হইয়া থাকে। যে স্থলে মিথ্যা সত্যস্বরূপ এবং সত্য মিথ্যাস্বরূপ হয়, সে স্থলে সত্য বক্তব্য না হইয়া মিথ্যাই বক্তব্য হইবে। প্রাণবিনাশে ও বিবাহে মিথ্যা বক্তব্য হইবে; এবং সর্বস্বের অপহরণেও মিথ্যা বক্তব্য হইতে পারিবে। বিবাহ-কালে, রত্নক্রীড়া সময়ে, প্রাণবিনাশ-স্থলে, সর্ক-ধনাপহরণে এবং ভ্রাতৃগণের নিমিত্ত মিথ্যা কহিবে; এই পঞ্চবিধ মিথ্যাকে পণ্ডিতেরা পাতকশূন্য কহিয়াছেন। সেই সেই স্থলে মিথ্যাও সত্য হইবে এবং সত্যও মিথ্যা-স্বরূপ হইবে। যে নিরবচ্ছিন্ন সত্যের অমুষ্ঠানে কৃত-সম্বল হয়, সেই অনভিজ্ঞ ব্যক্তি কেবল সত্যকেই সত্য মনে করে। ফলতঃ, ধর্মজ্ঞানী হওয়া সহজ নহে; সত্য ও মিথ্যার স্বরূপ যথার্থ অবধারণ করিয়া, পরে ধর্মজ্ঞ হও।

তদানন্তং ভবেৎ সত্যং সত্যাকাপ্যনৃতং ভবেৎ।...সত্যানৃতং বিনিশ্চিত্য ততো ভবতি ধর্মবিৎ॥”

সত্য-মিথ্যার মীমাংসা-সম্বন্ধে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ দৃষ্টান্তস্থলে বলাক ব্যাধের এবং কৌশিক মূনির উপাখ্যান বর্ণন করেন। ঐ দুই উপাখ্যানে হিংসা ও অহিংসার এবং সত্য ও মিথ্যার বিচার হইয়াছে। ‘ব্যাধ বলাক জী-পুত্রাদি পরিবার প্রতিপালনের নিমিত্ত মৃগ-হনন করিত। স্বধর্মের নিরত সত্যবাদী অশ্বয়া-শূন্য হইয়া, বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে এবং অগ্র্যাত্ম আশ্রিত-জনগণকে প্রতিপালন করিবার জন্য মৃগাহ-সন্ধান গমন করিয়া, এক দিন সেই ব্যাধ কোথাও মৃগের সন্ধান পাইল না। পরিশেষে দেখিল,—একটা অন্ধ ঝাপদ জল পান করিতেছে। সে যদিও তাদৃশ জাবকে পূর্বে কখনও দেখে নাই; তথাপি তাহাকে নিহত করিল। প্রাণী-হিংসা হইলেও, হিংস্র জন্তু বধ করিয়াছিল বলিয়া, এই ঝাপদ-সংহারে ব্যাধের স্বর্গলাভ হইয়াছিল।’ হিংস্র জন্তু-বধ—লোক-হিতকর। সুতরাং এই উপাখ্যানের অবতারণার শ্রীকৃষ্ণ বুঝাইলেন,—যুধিষ্ঠিরের অবধ-রূপ অহিংসাই যেমন ধর্ম; লোক-হিতার্থে হিংস্র-জন্তুর প্রতি হিংসাও সেইরূপ ধর্ম। ফলে, মীমাংসাই ধর্ম; ধর্মার্থ—হিংসা ও অহিংসা, দুই-ই মীমাংসার উপর নির্ভর করে। এইরূপ, কৌশিকের গল্পে তিনি বলিতেছেন,—“কৌশিক নামে এক তপস্বী ব্রাহ্মণ ছিলেন। ‘আমি সর্বদা সত্য কথা কহিব’—ইহাই তাহার প্রতিজ্ঞা ছিল। কিন্তু শাস্ত্রে তাঁহার অধিক জ্ঞান ছিল না। এক দিন, দম্ভাতরে ভীত হইয়া, কতিপয় লোক তাঁহার অরণ্যে প্রবেশ করে। দম্ভাগণ সেই লোকদিগের অনুসরণ করিয়া, কৌশিকের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করে,—‘কয়েকটা লোক এই পথ দিয়া গিয়াছে কি? যদি দেখিয়া থাকেন, সত্য করিয়া বলুন।’ কৌশিক বুঝিলেন,—দম্ভাগণ সেই পলায়িত ব্যক্তিদের সন্ধান লইতেছে; তাহাদিগকে ধরিতে পারিলে, নিশ্চয়ই বিনষ্ট করিবে। তথাপি সত্য-রক্ষার জন্য কৌশিক বলিলেন,—‘তাহারা ঐ গুরু-গুহ্য-সমাক্রম অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছে।’

কৌশিকের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া লোকদিগকে আক্রমণ করিয়া বিনষ্ট করিয়াছিল । আর, সত্যবাদী হইয়াও, স্বল্প-ধর্ম নির্ণয় করিতে সমর্থ না হওয়ায়, কৌশিক নিরয়গামী হইয়াছিলেন ।” এই দৃষ্টান্তে, শ্রীকৃষ্ণ বুঝাইসেন,—সত্যও বৈরাগ্য ধর্ম, অসত্যও সেইরূপ ধর্ম । বুঝাইলেন,—মামাংসার উপরেই ধর্ম-তত্ত্ব নির্ভর করিতেছে । তিনি বলিলেন—“দেব, প্রাণিবর্গের মঙ্গল উদ্দেশ্যেই ধর্মের লক্ষণ করা হইয়াছে ;—যাহাতে প্রাণিগণের হিংসা না হয়, তন্নিমিত্তই ধর্মের লক্ষণ নির্দিষ্ট আছে ; অতএব সিদ্ধান্ত এই, যাহা অহিংসা-যুক্ত, তাহাই ধর্ম । ধর্ম, প্রজা সকলকে ধারণ অর্থাৎ রক্ষা করেন ; এই ধারণা-প্রযুক্তই পণ্ডিতেরা ধর্ম বলিয়া নির্দেশ করেন । অতএব,—যাহা ধারণ-সংযুক্ত, তাহাই ধর্ম ।

যৎ শ্রাদ্ধহিংসাসংযুক্তং স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ । অহিংসার্যায় তূতানং ধর্মপ্রবচনং কৃতম্ ।

ধারণাকর্মমিত্যাহর্ক্যো ধারয়তে প্রজাঃ । যৎ শ্রাদ্ধারণসংযুক্তং স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ ।

যাহারা তর্ক দ্বারা হরণেচ্ছু হইয়া, কদাচিৎ ধর্ম ইচ্ছা করে ; যদি কোনও কথা না বলিয়া প্রাণীদের নিকট নিকৃতি পাওয়া যায়, তবে কোনক্রমেই বাক্যালাপ করিবে না । যদি অবশ্যই আলোচনা করিতে হয়, অথবা কিছু না বলিলে যদি শঙ্কা করে, সে স্থলে মিথ্যা বলাই শ্রেয়ঃ ; সেই মিথ্যা নিঃসন্দেহ সত্য হইবে । প্রাণ-বিনাশ, বিবাহ, সমুদায় জাতিগণের বধ বা বিপদ এবং সর্বতোভাবে আরক্ত ক্রম,—এই সকল স্থলে মিথ্যা কথিত হইলেও, তাহা মিথ্যা হইবে না । শপথ দ্বারাও তত্ত্বদিগের সংসর্গ হইতে যে যুক্ত হয়, ইহাতে ধর্ম-তত্ত্বাদর্শী পণ্ডিতেরা অধম জ্ঞান করেন না । সে স্থলে, মিথ্যা বলাই শ্রেয়ঃ ; তাহা নিঃসন্দেহ সত্য হয় । সাধ্য-সম্বন্ধে তাহাদিগকে ধন দেওয়া কর্তব্য নহে ; কেন-না, পাপাত্মা লোক-দিগকে যে ধন প্রদত্ত হয়, তাহা দাতাকেও পীড়িত অর্থাৎ নরকপ্রাপ্ত করে । অতএব, ধর্মের নামে মিথ্যা বলিলে, মিথ্যাবাদী হইতে হয় না ;—তন্মাত্রদ্বার্মমুত্তমুক্তা নানুত বাগ্ভবেৎ ।” তবেই বুঝা গেল, সত্য ও মিথ্যার বিরুদ্ধ সংজ্ঞা—শ্রীকৃষ্ণ নির্ধারণ করিলেন । তবেই বুঝা গেল,—কেমন-ভাবে মামাংসার উপরই ধর্মধর্ম অবস্থিত রহিয়াছে । বলা বাহুল্য, এ মামাংসার ক্ষমতা—বাহার তাহার সত্ত্ববর্ণ নহে । শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞান পুরুষ-প্রধান ব্যক্তিরূপে একরূপ মামাংসার অধিকারী । এক স্থলে নহে ; শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রে মহাভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থলে, এই মামাংসা-তত্ত্বেরই প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায় । কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধের পূর্বে, বিরাট-রাজ-গৃহে যখন মন্ত্রণা-সভা বসিয়াছিল, রাজ্য-প্রাপ্তি-বিষয়ে পাণ্ডবদিগের কি করা কর্তব্য—যখন তাহার পরামর্শ চলিতেছিল ;—সেখানেও এই মামাংসা-তত্ত্বের পরিচয় পাই । তিনি যুদ্ধ করিতেও বলিতেছেন না ; তিনি ক্ষমারও সমর্থন করিতেছেন না । অথচ, কৌশলে—অস্থিতীয় রাজ-নীতিজ্ঞের জ্ঞান, ইজিতে কর্তব্য-পথ নির্দেশ করিয়া দিতেছেন । কুরু-পাণ্ডবের মনোজ্ঞ-সংক্রান্ত আত্মপূর্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া, উভয় পক্ষের দোষাদোষ নিরপেক্ষ-ভাবে আলোচনা করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—“একরূপ অবস্থায় যুদ্ধের ও দুর্ব্যোধনের দ্বারা হিতকর, এবং কুরু-পাণ্ডব উভয়-পক্ষেরই ধর্মাবহ, জাতি ও যশস্বরূপ হয়, আপনারা তাহা চিন্তা করুন । অধর্মীচরণ দ্বারা যদি দেবতাদিগের রাজ্যও প্রাপ্ত হইতে পারেন, যুদ্ধের দ্বারা তাহাতে অতিলাভ করেন না ; পরন্তু, একদানি সামান্য

গ্রামের উপরেও ধর্মার্থ-যুক্ত আধিপত্য-লাভ করিতে ইচ্ছা করেন।" এখানে, শ্রীকৃষ্ণ কাহাকেও বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে উৎসাহিত করিলেন না; অথচ, আবশ্যক হইলে, তাহাতে বিরত হইতেও বলিলেন না। উপেক্ষা বা বল-প্রয়োগ—আবশ্যকাক্রান্তে বিধেয়, এখানে সেই আত্মসই তিনি প্রদান করিলেন। কৌরব-পক্ষ হইতে সঞ্জয় আসিয়া বেদিন যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, যুদ্ধ অপকর্ম ইত্যাদি বাক্যে যুদ্ধ না করার উৎসাহ দিতেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ সেদিন সঞ্জয়ের বাক্যের যে উত্তর প্রদান করেন, তাহা কর্তব্য-কর্ম-বিষয়ক উপদেশে পরিপূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—“হে সঞ্জয়! আমি এই পাণ্ডবদিগের যেমন অবিনাশ কল্যাণ ইচ্ছা করি, সেইরূপ বৃহৎ-পুত্রশালী রাজা ধৃতরাষ্ট্রেরও সমৃদ্ধির আশা করি। তোমরা সময়-প্রযুক্তি পরিহার-পূর্বক শান্তি-মার্গ অবলম্বন কর,—এতদ্ব্যতীত আর কোনও কথা বলাই আমার অভিপ্রেত নহে।” এই কথা বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ বুঝাইতে লাগিলেন,—“রাজ্যের নিমিত্ত শান্তি হওয়া নিতান্ত সুহৃদয়; যেহেতু, যুধিষ্ঠির কত্রিয়; তাঁহার ধর্ম—রাজ্য-রক্ষা। অথচ, ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ তৎপক্ষে প্রতিবাদী। এ ক্ষেত্রে যুধিষ্ঠিরের কর্তব্য কি? কেবল-মাত্র ত্যাগ-স্বীকারই কি তাঁহার কর্তব্য ও ধর্ম? ” শ্রীকৃষ্ণ বলিতে আরম্ভ করিলেন—“কেহ কেহ বলেন, কর্ম-দ্বারা পরলোকে সিদ্ধি-লাভ হয়; আবার, অল্প কোনও পণ্ডিতেরা নির্দেশ করেন যে, কর্ম পরিত্যাগ পূর্বক শুদ্ধ বিজ্ঞান দ্বারা সিদ্ধি হয়। কিন্তু বিজ্ঞানবান হইয়াও ভ্রম্যভোজ্যের ভোগ ব্যতীত কোনও ব্যক্তিই তৃপ্ত হইতে পারেন না। যে সকল বিদ্যা ইহলোকে কর্ম-সাধিকা হয়, তাহাদেরই ফল আছে; তত্ত্বগ্ন অল্প বিদ্যার ফল নাই। কর্মের ফল যে প্রত্যক্ষ, তাহাতে আর কেহই আপত্তি করিতে পারে না। দেখ, তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি জলপান করিলেই তাহার পিপাসার শান্তি হয়। ফলতঃ, শাস্ত্রে কর্মের সহিত মিলিত হইয়াই জ্ঞানের বিধি বিহিত হইয়াছে। অতএব, হে সঞ্জয়! সেই সিদ্ধি-বিষয়ে কর্মের সাধনতা বিজ্ঞমান আছে; তাহাতে যে ব্যক্তি কর্মের প্রতি অনাদর করিয়া, শুদ্ধ বিজ্ঞান-মাত্রেরই প্রশংসা করে, তাহার কেবল বৃথা বাগাড়ম্বর মাত্র প্রকাশ পায়।” এখানেও সেই সামঞ্জস্য নীতি—জ্ঞান ও কর্ম উভয়েরই আবশ্যকতা প্রতিপাদন। ইহার পর, চাতুর্ভূষণের কোন্ বর্ণের কি কর্তব্য, শ্রীকৃষ্ণ তাহা বিবৃত করেন। কত্রিয়ের ধর্ম—প্রজাপালন, রাজ্য-রক্ষা প্রভৃতি নির্দেশ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—“ক্রুরবতি পাপাত্মা মহুশ্য বিধি-বৈশুণ্য-প্রযুক্ত বলপ্রয় করিয়া, পরের সম্পত্তিতে লোভ করিতে পারে, সেই নিমিত্ত রাজগণ-মধ্যে যুদ্ধ-ব্যাপারের সৃষ্টি হইয়াছে; এবং যুদ্ধের নিমিত্তই ধর্ম, শত্রু ও ধনুকের উৎপত্তি হইয়াছে।...হে সঞ্জয়! চৌর্য-রতি-অবলম্বন পূর্বক যে ব্যক্তি অদৃষ্টের হইয়া, পরধন হরণ করে; অথবা যে দুরায়া প্রকৃত-রূপে বল-পূর্বক তাহা লুপ্তিত করিয়া লয়, তাদৃশ উভয় প্রকার দস্যুই যে নিশ্চল, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।...দুর্ধ্যোধন বিনা কারণে পাণ্ডবদিগের ধর্ম্যুগত পৈতৃক রাজ্য অপহরণ করতঃ, পুত্রাতন রাজধর্ম অবলম্বনে অন্ধ হইয়াছেন। পাণ্ডব-দিগের যে ভ্রাতৃ অংশ, সেই অবশ্য-প্রাপ্য অংশের নিমিত্ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, তাহাদিগকে যদি কালক্রমে পতিত হইতে হয়, তাহাও দায়। পররাজ্য অপেক্ষা ইহাদের পৈতৃক

রাজ্য যে শ্রেষ্ঠ, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?” যুদ্ধ না হয়—শ্রীকৃষ্ণ সে ইচ্ছাও প্রকাশ করিলেন ; আবার আবশ্যক বিষয়ে যুদ্ধ অনিবার্য—তাহাও বুঝাইলেন । যাহা কর্তব্য, তাহাই করিতে হইবে—ইহাই তাঁহার নীতি । শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনা-যাত্রার সময়, তাঁহার সহিত পাণ্ডবগণের যে কথাবার্তা হইয়াছিল, সেখানেও এই ভাব । দ্রৌপদী বলিতেছেন,—

যথাবধ্যে বধ্যমানে ভবেদ্যে নো জনর্দিনঃ । স বধ্যস্তাবধে দৃষ্ট ইতি ধর্মো বিদ্যো বিদ্বঃ ॥

“হে জনর্দিন ! অবধ্যকে বধ করিলে, বাদৃশ দোষের সম্ভাবনা ; বধ্যের অবধেও যে তাদৃশ দোষের আশঙ্কা হইতে হয়, তাহা ধর্মজ্ঞ পণ্ডিতেরা স্পষ্টই ব্যক্ত করিয়াছেন ।” বলা বাহুল্য, শ্রীকৃষ্ণ, দ্রৌপদীর এই উক্তির অননুমোদন করেন নাই । পরন্তু, শ্রীমদ্ভগবদগীতায় শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে পদে পদে এই নীতির সার্থকতা প্রতিপন্ন হইয়াছে । এইরূপ, দৈব ও পুরুষকারের বিচারেও শ্রীকৃষ্ণ উভয়েরই সার্থকতা স্বীকার করিয়াছেন । সন্ধির লজ্জা কোরবগণের নিকট গমন উপলক্ষে, অর্জুনের কথার উত্তরে, শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—

“হে অর্জুন ! আমি কোরব ও পাণ্ডব উভয় পক্ষেরই কল্যাণ-প্রতিপাদনে সমুৎসুক হইব । কিন্তু দৈব ও পুরুষকার উভয়ের সংযোগ না হইলে, কোনই শুভ-ফলের আশা করা যায় না । দেখ, মানুষ-কর্ম সহকারে ক্ষেত্র সকল রসবৎ ও পরিশোধিত হইলেও, অর্থাৎ উর্বর ক্ষেত্রে যথানিয়মে হল-চালন বীজ-বপনাদি করিলেও, দৈবকৃত বর্ষণ ব্যতীত কদাপি ফল-নিষ্পত্তি হয় না । তদ্বিষয়ে কেহ কেহ যত্ন-সম্পাদিত বারিসেক পর্য্যন্ত পৌরুষের কথা বলিতে পারেন ; কিন্তু জল-সেচন করিলেও, দৈব-বিড়ম্বনায় শুষ্ক হওয়াও নিঃসন্দেহ দৃষ্টিতে পান । অতএব, পণ্ডিতগণ দৈব-কর্ম ও মানুষ-কর্ম উভয়েই লোকহিতকর কার্য্য সংযুক্ত রহিয়াছে বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন । পুরুষকারে যতদূর হইতে পারে, আমিও তাহা করিব । কিন্তু প্রাক্তন-কর্মের খণ্ডন করিতে কোনক্রমেই সমর্থ হইব না ।” স্থূলতঃ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—“দৈবে চ মানুষে চৈব সংযুক্তং লোককারণং ।” এই উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণ যে কর্তব্য-তত্ত্বের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাও পরম শিক্ষাপ্রদ । কুরু-পাণ্ডবে সন্ধি হইবে না,—শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন ; তথাপি তিনি সন্ধির লজ্জা কোরব-সভায় গমন করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না । যাহা কর্তব্য তাহা করিতে হইবে, তাহাতে ফল হউক বা না হউক,—ইহাই তাঁহার মূল মন্ত্র ছিল ; তাই তিনি সন্ধি-প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হইতে সঙ্কুচিত হন নাই । তাঁহার শিক্ষাই এই । শ্রীমদ্ভগবদগীতায় তাই তিনি পুনঃপুনঃ নিকাম কর্মের প্রাধিকার্ত্তন করিয়া গিয়াছেন । অর্জুনকে তিনি বুঝাইয়াছেন,—

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কবাচন । বা কর্মফলহেতুত্বা তে সঙ্গোষকর্মণি ॥

যোগঃ কুরু কর্মণি সঙ্গং ভ্যক্তা ধনঞ্জয় । সিদ্ধাসিদ্ধাঃ সমভ্যাসা সমাধা যোগ উচ্যতে ॥

“হে অর্জুন ! তোমার কর্মেতে কামনা হউক ; কিন্তু সংসার-বন্ধ-হেতু যে কর্মফল, তাহাতে যেন কামনা না থাকে । অর্থাৎ, ফলের নিমিত্ত কর্ম করিতে যেন তোমার প্রেরণা না হয় । হে ধনঞ্জয় ! তুমি আসক্তি পরিত্যাগ পূর্বক যোগস্থ হইয়া কর্ম করিবে ; সন্ধি হউক কিংবা নাই হউক, উভয়েই সমদর্শী হইয়া কর্ম করিবে । যেহেতু, সমভাবই যোগ বলিয়া কথিত হয় ।”

এই নিকাশ-কর্মের শিকায়—শ্রীমত্তগবদগীতা । বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, দর্শন,—সর্ব-
শাস্ত্রের সার-সম্বন্ধে—এই শ্রীমত্তগবদগীতা । মহাভারতের অন্তর্গত এই শ্রীমত্তগবদগীতাংশ
অষ্টাদশ অধ্যায়ে, সপ্তশত পঞ্চত্রয়াংশ শ্লোকে সম্পূর্ণ । তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ
শ্রীমত্তগবদগীতা । ষট্শত বিংশ সংখ্যক শ্লোক, অর্জুন-সপ্তপঞ্চাশৎ শ্লোক, সঞ্জয় সপ্তষষ্টি শ্লোক
এবং ধৃতরাষ্ট্র একটী মাত্র শ্লোক উচ্চারণ করিয়াছেন । * শ্রীমত্তগবদগীতার
প্রথম অধ্যায়ের সপ্তবিংশতি শ্লোক—ধৃতরাষ্ট্র-সঞ্জয় সংবাদ নামে অভিহিত । তাহাতে ধৃতরাষ্ট্রের
প্রশ্নে সঞ্জয় যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন । ঐ অধ্যায়ের শেষাংশ এবং পরবর্ত্তী
অধ্যায়ের দশম শ্লোক পর্য্যন্ত অর্জুন-বিষাদ-যোগ নামে কথিত হয় । তাহাতে আত্মীয়-
স্বজন-বিনাশে কুলক্ষয়ের সম্ভাবনায়, শোক ও ঔদাসীণ্য প্রকাশে, অর্জুন বলিতেছেন,—
দৃষ্টে মাতৃ স্বজনান্ কক যুযুৎসু সমবস্থিতান্ । সীদন্তি যম গাত্রাণি মুগ্ধক পরিণুব্যতি ॥

বেগবৃদ্ধ শরীরে যে রোমহর্ষণ জায়তে । গাওঁবং সংসতে হস্তাৎ দৃক চৈব পরিদহ্যতে ॥
'হে কৃষ্ণ ! এই সকল যুযুৎসু স্বজনগণকে সমবস্থিত দেখিয়া, আমার গাত্র অবসন্ন, মুগ্ধ
তৃক, শরীর কম্প, লোমহর্ষণ, হস্ত হইতে গাওঁব শ্রুত এবং মন বিযুক্ত হইতেছে । আমি
আর টাড়াইতে পারিতেছি না । আমি সংগ্রামে স্বজন হনন করিয়া শ্রেয়ঃ দেখিতেছি না ।
যদি আমি শত্রুহীন ও প্রতিকার-চেষ্টা রহিত হই, ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রেরা শত্রু-হস্ত হইয়া রণস্থলে
আমাকে বিনাশ করে, তাহা হইলেও আমার পক্ষে কল্যাণতর হয় ।' দ্বিতীয় অধ্যায়—
একাদশ শ্লোক হইতে শেষ পর্য্যন্ত সাংখ্যযোগ-বর্ণনে নিয়োজিত । ঐ অংশে শ্রীকৃষ্ণ
অর্জুনকে বুঝাইতেছেন,—আত্মার বিনাশ নাই । জীর্ণ বাস পরিত্যাগ করিয়া, মাঘুঃ নূতন
বাস গ্রহণ করেন ; আত্মাও পুরাতন শরীর পরিত্যাগ করিয়া, নূতন শরীর গ্রহণ করেন ।

ন জায়তে ভ্রিয়তে বা কদাচিত্ত্রায়ং তু ভাবিতা বা ন ভুয়ঃ ।

অজ্ঞো নিত্যঃ শাস্বতোহয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥

বাসাংসি জীর্ণানি বথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নদ্রোহপরাণি ।

তথা শরীরানি বিহায় জীর্ণান্দ্ভুতানি সংযাতি নবানি দেহী ॥

এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ বুঝাইলেন,—‘বিষয়-চিন্তা হইতেই মাতৃবের সর্বনাশ উপস্থিত হয় ;
বিষয়-চিন্তাই আসক্তির মূল ; আসক্তি হইতেই তীব্র অতিলাষ ; তৎপরে, ক্রমে ক্রমে ক্রোধ,
বিবেক-নাশ প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হয় । যিনি সর্বপ্রকার বাসনা পরিত্যাগ করিয়া,
জীবনের প্রতিও নিম্প্ৰহন, অহং-মদীয়ত্ব-ভাব বিসর্জন দেন, তিনিই মুক্তি-লাভের
অধিকারী ।’ ইহার পর, তৃতীয় অধ্যায়ে—কর্মযোগ । পূর্বোক্ত জ্ঞানোপদেশ শ্রবণ করিয়া,
অর্জুন যখন জিজ্ঞাসা করিলেন,—‘তবে আর কর্মের প্রয়োজন কি ?’ শ্রীকৃষ্ণ তখন আবার

* মহাভারতের ভীষ্মপর্বের ৪০শ অধ্যায়ে শ্লোক-সংখ্যা এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—“ষট্শতানি সবিংশানি
শ্লোকান্যং প্রাহ কেশব । অর্জুনঃ সপ্ত-পঞ্চাশৎ সপ্ত-ষষ্টিং তু সঞ্জয় । ধৃতরাষ্ট্রঃ শ্লোকদ্বৈকং পীতাম্বান-
বুভুতে ।” কিন্তু অসম্বন্ধ-প্রচলিত শ্রীমত্তগবদগীতা-সমূহে এরূপ শ্লোক-সংখ্যা মিলাইয়া গাওঁয়া যায় না ।
সঞ্জয় উবাচ, ষষ্ঠস্র উবাচ,—ইত্যাদি বাক্যকেও এক একটী শ্লোক ধরিলে, শ্লোক-সংখ্যা হয়—১৬৭টী ।
তন্ত্রিঃ, শ্লোক-সংখ্যা দেখিতে পাই—মাত্র ১০২টী । মূল মহাভারতের সহিত মিলাইতে গেলে, আরও দুইটী
বাকিতে গাওঁয়ে । কিন্তু প্রচলিত পুস্তকে তাহা নাই ।

কর্মযোগ-তত্ত্ব বিবৃত করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন,—“জ্ঞান ও কর্ম পৃথক্ভাবে নাকদানে সমর্থ নহে। কর্মসম্পাদন ব্যতিরেকে পুরুষ জ্ঞান লাভ করিতে পারে না; এবং কর্মজনিত চিন্তাশক্তি বিনা, কেবল সম্যাস-মাত্র দ্বারা, মোক্ষ লাভে অধিকারী হয় না। কি জানী, কি অজানী, কেহই কোনও অবস্থাতেই কণমাত্র কর্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। যেহেতু সকলেই স্বভাবজাত রাগদ্বেষাদি গুণের পরভক্ত হইয়া, কর্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। অতএব, এ স্থলে কর্মে যে আদক্তি না থাকা, তাহাকেই সম্যাস বলিয়া জ্ঞাত হইবে। ঈশ্বরারাদনার্থক কর্ম-মাত্রেই লোকের বন্ধন কারণ হয়। অতএব, তুমি নিষ্কাম হইয়া, ঈশ্বরারাদনার্থ কর্মচারণ কর।” উপসংহারে শ্রীকৃষ্ণ বুঝাইলেন,—

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিত্তগঃ পরধর্মায় স্বচিন্তিতাৎ । স্বধর্মো নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ ॥

চতুর্থ অধ্যায়ে,—যজ্ঞবিভাগ-যোগ বা জ্ঞান-কর্মন্যাস-যোগ। জ্ঞান ও কর্মের ফলাফল দেখাইয়া, শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—“যাঁহার আত্মজ্ঞান লাভ হইয়াছে, তিনিই মোক্ষ-লাভের অধিকারী। কর্মযোগ ও সমাধিযোগে আত্মজ্ঞান লাভ হয়। জ্ঞানন্ত অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠকে ভস্মসাৎ করে, আত্মজ্ঞানরূপ অগ্নি সেইরূপ প্রারম্ভ কর্ম ভিন্ন সকল কর্মকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলে। যাঁহার কর্ম-সকল পরমেশ্বরের আরাধনারূপ যোগদ্বারা পরমেশ্বরে সমর্পিত হয়, তাঁহাকে সেই কর্ম-সকল ফলদ্বারা আবদ্ধ করিতে পারে না। সুতরাং জ্ঞান-রূপ ঐক্য দ্বারা সংশয়কে ছেদন করিয়া, কর্মযোগ আশ্রয় কর।” এখানেও সেই নিষ্কাম কর্মের প্রাধান্য। পঞ্চম অধ্যায়ে—আবার অর্জুন সংশয়াহিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

“আপনি কর্ম-সম্যাস ও কর্মযোগ, এতদ্ব্যতীতই জ্ঞানের কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু উহাদের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠতর?” তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ সম্যাস-যোগ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া কহিতেছেন—“অধিকারিভেদে কর্ম-সম্যাস ও কর্মযোগ এতদ্ব্যতীত জ্ঞানোৎপত্তি দ্বারা মোক্ষ সাধন করে। যিনি সুখ দুঃখ বা তৎসাধনে ঘেষ বা আকাঙ্ক্ষা করেন, তিনি পরমেশ্বর-প্রীতি নিমিত্ত কর্মসম্পাদন করিতে হইলেও, তাঁহাকে নিত্য সম্যাসী বলা যায়। যেহেতু নিবন্ধ পুরুষ নিষ্কাম-কর্ম জ্ঞাত চিন্তাশক্তি দ্বারা অনায়াসেই সংসার হইতেই মুক্ত হইতে পারেন।” ষষ্ঠ অধ্যায়ে—অধ্যাত্ম-যোগ। এ অধ্যায়েও শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বুঝাইতেছেন,—“যিনি কর্মফলে নিরপেক্ষ হইয়া, অবশ্য-কর্তব্য-বিহিত কর্মের সম্পাদন করেন, তিনি কর্মী হইলেও এক প্রকার সম্যাসী; তিনিই কর্মযোগী। যিনি আপনাকে বশীভূত করিতে পারিয়াছেন, যিনি জীবাচ্ছা, শীতোষ্ণ-শোক-দুঃখে যাঁহার সম্ভাব, যিনি সর্বতোভাবে অবিচলিত, তিনিই যোগিশ্রেষ্ঠ।” এই বলিয়া প্রকারান্তরে তিনি অর্জুনকে তত্ত্বাবে অগ্রপ্রাণিত করিলেন। সপ্তম অধ্যায়ে—জ্ঞানযোগ। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—“সহস্র ব্রহ্মকারীর মধ্যে কেহ আত্মজ্ঞান লাভ করেন, এবং সহস্র আত্মজ্ঞানীর মধ্যে কেহ, পরমাত্মা বে আনি, আত্মাকে ব্রহ্মপতঃ জানিতে পারেন। আবার প্রকৃতি—মায়া, জড়রূপ শক্তি,—ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার,—এই অষ্ট প্রকারে বিভক্ত হইয়াছে। এই অষ্ট প্রকার প্রকৃতি, যাহা উক্ত হইল, ইহা নিকৃষ্ট; যেহেতু, ইহা সংসার-বন্ধন-রূপ। ইহা ব্যতীত জীব-ব্রহ্ম আবার অপর প্রকৃতিকেই

উৎকৃষ্ট বলিয়া জানিবে । সেই চেতনরূপ প্রকৃতি কর্তৃক স্বকর্ম দ্বারা ইহ-সংসার চলিতেছে ।

কীৰ্ত্তং বাৎ সৰ্বভূতানাং বিকি পার্থ সনাতনম্ । বুদ্ধিঃ পুঙ্খানুপুঙ্খমিত্যনামহম্ ।

দেহ উৎপন্ন হইলে, তাহার অল্পকাল বিষয়ে ইচ্ছা ও প্রতিকূল বিষয়ে শেখ—এই উভয় দ্বারা উৎপন্ন যে দম্ব-মোহ অর্থাৎ শীতোষ্ণ-সুখ-দুঃখাদি-দম্ব-জনিত মোহ—বিবেক-জ্ঞান, তদ্বারা সমস্ত প্রাণী মোহ প্রাপ্ত হয়; অর্থাৎ, আমি সুখী, আমি দুঃখী,—এইরূপে গাঢ়তর অভিনিবেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । সুতরাং আমাকে ভজন করো না ।” অর্জুনকে এই কথা বলিয়া, তিনি ভবদাসক্ত-চিত্তে কর্ম করিতে উপদেশ দেন । অষ্টম অধ্যায়ে—ব্রহ্মাদি-স্বরূপ প্রসঙ্গ উত্থাপিত । অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে,—ব্রহ্ম কি, অধ্যাত্ম কি, কর্ম কি, অধিভূত কি, এবং অধিদৈব কি, শ্রীকৃষ্ণ তাহা বুঝাইয়া দিতেছেন । ইহাতেও শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বুঝাইয়াছেন,—সকাম যজ্ঞাদি কর্মে স্বর্গাদি লাভ হইলেও, কর্মফল-ভোগাবসানে পুনরায় সংসারে আসিতে হয় ; কিন্তু নিকাম কর্মে জীব সর্ব বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে । নবম অধ্যায়ে—রাজবিদ্যাযোগ বিবৃত ; যজ্ঞাদি দ্বারা সুরলোক-গমন এবং অনন্তকাম হইয়া উপাসনার আত্মজ্ঞান লাভে পরমানন্দ প্রাপ্তির বিষয় কথিত হইয়াছে । দশম অধ্যায়ে—বিভূতি যোগ । শ্রীকৃষ্ণ বুঝাইতেছেন,—“বিভূতির অন্ত নাই । আমার সকল বিভূতি পৃথক পৃথক জানিবার প্রয়োজন নাই । সমুদায় জগতেই আমি স্বকীয় একাংশ নাভে ব্যপিয়া আছি । আমি ব্যতিরিক্ত কোনও বস্তুই নাই ।” একাদশ অধ্যায়ে,—বিশ্বরূপ দর্শন । অর্জুন দেখিতেছেন,—সেই অব্যয়, অক্ষয়, অনন্ত রূপ । দেখিয়া, অর্জুন বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিতেছেন,—

পশ্যামি দেবাস্তনু দেব দেহে সকাংস্তথা ভূতবিশেষদমংবাশ্ ।...

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমত্ৰ বিশ্বস্ত পরং নিবানম্ ।...

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্ঘদনন্তবাহুং শশিসূর্য্যাদেজম্ ।...

নমো নমোন্তেষস্ত সহস্রকরঃ পুনশ্চ হুয়োহপি নমো নমস্তে ।

এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ আপনার বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়া, অর্জুনকে বলিলেন,—“যিনি আমার নিমিত্ত কর্ম করেন, আমারই আশ্রিত, এবং যাহার আমাতেই পুরুষার্থ জ্ঞান, পুত্রাদিতে আসক্তি-রাহিত্য ও সর্বভূতে নির্ভৈর ভাব, তিনিই আমাকে প্রাপ্ত হন ।” দ্বাদশ অধ্যায়ে—ভক্তিযোগ । এখানেও সেই আসক্তি-নিবৃত্তির উপদেশ । শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—“প্রিয়-বস্তু প্রাপ্ত না হইয়া সন্তুষ্ট না হন, অপ্রিয় বস্তু প্রাপ্ত হইলেও তাহাতে ঘেঘযুক্ত না হন, ইষ্ট-বিষয়লব্ধবশে শোক না করেন এবং অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা না করেন,—এইরূপ নির্দম, নিরহঙ্কার সুখ-দুঃখে সম-ভাবাপন্ন মত্তকৃত্ত যিনি, তিনিই আমার প্রিয় ।

সমঃ শত্রৌ চ বিন্দে চ তথা নানাপমানয়োঃ । শীতোষ্ণসুখদুঃখেযু সমঃ সর্ববিবর্জিতঃ ।

চুল্যানিকান্তভিবৌদী সন্তপ্তৌ যেন কেনচিৎ । অনিকতঃ হিরণ্যভির্ভক্তিমান যে প্রিয়ো নরঃ ॥”

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে—প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক । এই অধ্যায়ে সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্ব সংক্ষেপে পরিবর্তিত । সাংখ্যের প্রকৃতি ও পুরুষ, এখানে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ নামে অভিহিত । যাহারা বিবেক-জ্ঞান-চকু-দ্বারা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের প্রভেদ অবগত হন, তাহারা ই পরমার্থ-তত্ত্ব ব্রহ্ম লাভ করেন । চতুর্দশ অধ্যায়ে—গুণত্রয় বিভাগ । ইহাতে সম্বন্ধসত্ত্বম—এই ত্রিগুণ-তত্ত্ব আলোচিত । পঞ্চদশ অধ্যায়ে—পুরুষোত্তমযোগ । শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিতেছেন,—

“আমারই অংশ অবিদ্যাবশতঃ সর্বদা সংসারী ও জীবরূপে এসিদ্ধ। আমি যে পুরুষোত্তম, আমাকে যিনি জানেন, তিনিই নিত্য মুক্ত।” ষোড়শ অধ্যায়—দেবাসুর-সম্পত্তি-বিভাগ যোগ-কথনে নিয়োজিত। ষাঁহার সঙ্ঘাদি গুণসম্পন্ন, তাঁহার দৈবীভাবপ্রাপ্ত; আর যাহারা অনৃতাদি দোষসংযুক্ত, তাহার আশুরীভাবাপন্ন। শাস্ত্রাহুশাসন-পরায়ণ ব্যক্তিই দৈবীভাব প্রাপ্ত হইয়া, মোক্ষলাভের অধিকারী হয়। সপ্তদশ অধ্যায়—শ্রদ্ধাক্রয়-বিভাগ নামে অভিহিত। সাত্বিকী, রাজসী ও তামসী—এই ত্রিবিধা শ্রদ্ধা কর্তৃক আত্মা কিরূপভাবে কোন্ পথে পরিচালিত হয়,—এই অধ্যায়ে তাহাই আলোচ্য। অষ্টাদশ অধ্যায়ে—মোক্ষ-সন্ন্যাস উপদেশ। এখানে শ্রীকৃষ্ণ সর্বকর্মের ফলত্যাগ—সন্ন্যাস বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন; বুঝাইয়াছেন,—“চাতুর্কর্ণের নিদিষ্ট ধর্মই শ্রেয়ঃ-ধর্ম। ভগবন্তুক্তি প্রণোদিত হইয়া, শুভাশুভ ফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া, যিনি অনুর্তেয় কর্ম সম্পন্ন করিবেন, তিনিই মোক্ষ লাভের অধিকারী হইবেন।” শ্রীকৃষ্ণের নিকট এবংবিধ উপদেশ শ্রবণানন্তর অর্জুনের মোহ দূর হয়। অর্জুন কুরুক্ষেত্রের ধর্ম-যুদ্ধে প্ররম্ব হন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের ইহাই সার মর্ম্ম। তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করিয়া, কিরূপে কন্ধ্যামুঠান করিতে হয়,—জ্ঞান ও কর্মের সেই স্বরূপ-তত্ত্ব-গীতার পরিবর্ণিত হইয়াছে। শাস্ত্রা-বেদান্তাদি দর্শনের গভীর-তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, মহুগ্ধ-সমাজ যখন পরমাত্মার প্রাধান্ত বিস্মৃত হইতে বসিয়াছিল, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সেই সময়ে তাঁহাদিগকে যথার্থ পথ নির্দেশ করিয়া দেয়। এ পর্য্যন্ত গীতার বহু ভাষ্য, বহু টীকা, লিখিত ও প্রচারিত হইয়াছে। গীতা এমনই গভীর সার্বজনীন ভাবপূর্ণ যে, যিনি যে চক্ষে দেখিবেন, গীতা সেইরূপ-ভাবেই তাঁহার নিকট প্রকাশমান হইবে।

যে ঘটনা যত দূরে সরিয়া যায়, অতীতের অন্ধতম গর্ভে তাহার স্মৃতি ততই বিলীন হয়। তখন আর সত্যকেও সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে প্ররম্বিত হয় না। আমাদের এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে—বাল্যে, কৈশোরে, যৌবনে, বার্দ্ধক্যে—এমন কত কত ঘটনা সংঘটিত হইয়া গিয়াছে, অন্তরের অন্তস্তল অহুসন্ধান করিলেও এখন তাহার স্মৃতি-চিহ্ন মাত্র খুঁজিয়া পাই না। যদি কখনও কোনও বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াও রাখি, সময় সময় তাহার সত্যতা সন্দেহও সন্দেহ জন্মে। অনন্ত কাল-মাগরের ক্ষুদ্র-জলবিদ্য-প্রায় ক্ষণস্থায়ী এই জীবনের মধ্যেই এতাদৃশ বিস্মৃতি!—অনন্ত কাল-প্রবাহের ধারাবাহিক-গতি-তত্ত্ব কে নির্ণয় করিয়া রাখিতে পারে? শত বর্ষ পূর্বে সংঘটিত ঘটনাবলী সন্দেহেই ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতান্তর দেখিতে পাই; স্মৃতরাং কোন্ স্মরণাতীত কালের হিন্দু-জাতির ইতিহাস-সম্বন্ধে সদাই সংশয়-সন্দেহের উদয় হইবে, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি? হিন্দু-জাতির গৌরব-গরিমার ইতিবৃত্ত-তত্ত্ব আলোচনা করিতে হইলে, সৌভাগ্যই বল—আর দুর্ভাগ্যই বল, পাঁচ-সহস্র বৎসরাধিক কালের পূর্ববর্তী সময়ের চিত্রপট সাধারণের সমক্ষে উপস্থাপিত করিতে হইবেই হইবে। সেই চিত্র-পট—মহাভারত। ভারতবর্ষ গৌরবের যে উচ্চ-চূড়ায় আরোহণ করিয়া ছিল, মহাভারত পরিবর্ণিত কুরু-পাণ্ডব-সময়ের ভূকম্পনে বা তুর্ধ্ব-বাত্যায়, সেই চূড়া স্থলিত হইয়া

মহাভারতের
ঐতিহাসিকতা।

যায়। সুতরাং মহাভারত—ভারতবর্ষের হিন্দুজাতির ইতিহাসের এক সীমা-নির্ণায়ক খণ্ড-বিশেষ। আমরা মনে করি, ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক খণ্ড, যত সংক্ষিপ্তভাবেই হউক, সেইখানেই শেষ হওয়া বিধেয়। তাহার পূর্বের ইতিবৃত্ত, বলিয়াছি স্তোত্র, এক্ষণে ধ্যান-ধারণা-কল্পনার অতীত হইয়া পড়িয়াছে। সে দিনের ভারতীয় হিন্দু-জাতির গৌরবের ইতিহাসের শেষ পরিচ্ছেদের সেই বিষয়-পরম্পরাও এখন ভ্রান্তির ও অবিস্থানের কুআটিকার ঘেরিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং দুর্ভাগ্য আমাদের—আমাদিগকে এখন অনুসন্ধান করিতে হইতেছে,—মহাভারতের কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কি না। ইতিহাসের স্বরূপ-তত্ত্ব আমরা পূর্বেই বিবৃত করিয়াছি। * এখন দেখা যাউক, মহাভারতের ঐতিহাসিকত্ব কোথায়? চতুর্নিধ কারণে বিষয়-বিশেষের ঐতিহাসিকত্ব সপ্রমাণ হয়। প্রথম,—কিংবদন্তী; দ্বিতীয়,—পুঁথিপত্র; তৃতীয়,—বংশাবলুচরিত; চতুর্থ,—দেশ-কাল-পাত্রের সামঞ্জস্য। এতদ্ভিন্ন, কোনও বিষয়ের ঐতিহাসিকত্ব প্রমাণে, অল্প উপায় দেখিতে পাই না। মহাভারতের কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ-কাহিনী, ভারতবর্ষে—কেবল ভারতবর্ষেই বা বলি কেন—পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই, কিংবদন্তী-রূপে প্রচারিত। আমাদের ঘরে ঘরে, পুরুষ-পরম্পরাক্রমে উহা প্রচলিত; আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই উহা অবগত। বিশেষতঃ, সকলেই উহাকে সত্য ঘটনা বলিয়া বিশ্বাস করে; কেহই উহাকে উপকথা বলিয়া মনে করে না। সুতরাং কিংবদন্তী হিসাবে মহাভারতের ঐতিহাসিকত্ব সম্পূর্ণরূপে অবিসংবাদিত। পুঁথি-পত্রে বা প্রাচীন গ্রন্থাদিতে-কুরু-পাণ্ডব-সমরের বিবরণ যে নানা আকারে নানারূপে লিখিত আছে, তাহা বলাই বাহুল্য। কোন্‌কোন্‌ পুরাণে ঐ আধ্যাত্মিক পরিবর্তিত আছে, পূর্বেই আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছি। † কোনও পুরাণেই ঐ ঘটনাকে কল্পিত উপাখ্যান বলিয়া উল্লিখিত হয় নাই। পরন্তু, বংশ-পর্যায়াদির আলোচনার উহার ঐতিহাসিকত্বই প্রতিপন্ন হইয়াছে। বিষ্ণু-পুরাণে, শ্রীমদ্ভাগবতে, কন্দ-পুরাণে এবং বামু-পুরাণে, যুধিষ্ঠিরাদির আবির্ভাবের সময় নির্দিষ্ট হইয়াছে। ব্রহ্ম-সংহিতার বচনান্তরে যুধিষ্ঠির-প্রবর্তিত এক শকাব্দের পর্য্যন্ত পরিচয় পাওয়া যায়। কল্কি মিশ্রের রাজতরঙ্গিনী, ইতিহাসের একটা শিরোমণি বলিয়া, পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের নিকট সমাদৃত হয়; সেই রাজ-তরঙ্গিনীতেও কুরু-পাণ্ডবেরা কোন্‌ সময়ে বিজয়মান ছিলেন, তাহা লিখিত আছে। পাণিনির অষ্টাধ্যায় সূত্রে, গোত্রের উদাহরণে, যুধিষ্ঠিরাদির নাম দৃষ্ট হওয়ায় এবং অজ্ঞান পাণ্ডব-গণের উল্লেখ থাকায়, অনেকে মহাভারতোক্ত ঘটনাকে তৎ-পূর্ববর্তী কালের ইতিহাস বলিয়া মনে করেন। জ্যোতির্বিদ্যাত্তরঙ্গ প্রভৃতি নানা জ্যোতিষ-গ্রন্থে মহাভারতোক্ত কুরু-পাণ্ডব-যুদ্ধের কালনির্ণয় সংক্রান্ত গণনা দেখিতে পাওয়া যায়। কোলকটক, উইলসন, এলফিনষ্টোন, মনিয়ার উইলিয়ম্‌স্‌, লাসেন, ম্যাক্সমুলার প্রভৃতি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ, যদিও সময়ের বা ঘটনার তারতম্য দেখিতে পান, তথাপি মহাভারতের ঐতিহাসিকতা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং পুঁথি-পত্রের এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সমর্থন হিসাবেও

* এই গ্রন্থের চতুর্থ পরিচ্ছেদের ৪১শ—৪২শ পৃষ্ঠা দৃষ্টব্য।

† ইতিপূর্বে ২৪৪ ও ২৪৬ পৃষ্ঠায় "ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে মহাভারত প্রসঙ্গ" আলোচিত হইয়াছে।

মহাভারতের ঐতিহাসিকত্ব প্রমাণিত হয়। বংশাশুচরিত-সম্বন্ধে তো কথাই নাই। আজিও ভারতবর্ষের বহু প্রসিদ্ধ বংশ, কুরু-পাণ্ডবের বংশধর বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দিয়া থাকেন। এক এক বংশের পরবর্তী কত শত পুরুষের তালিকা নানা গ্রন্থে দেখিতে পাই। রাজপুতনার বহু রাজ-বংশ আপনাদিগকে চন্দ্রবংশ বা সূর্য্যবংশ-সম্বৃত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। কেবল পরিচয় প্রদান নহে; তাঁহাদের বংশ-তালিকা দৃষ্টেও তাহা প্রতীত হয়। মনুষ্য হয়তো অল্প পরিচয় বাড়াইয়া কনাইয়া প্রকাশ করিতে পারে; কিন্তু পিতৃ-পরিচয় পরিবর্তন করিতে—মিথ্যা বলিতে—প্রায়ই দেখা যায় না; বিশেষতঃ, ভারতবাসী হিন্দু-জাতির পক্ষে সেরূপ কল্পনাও অপবিত্র ও পাপ-মূলক। সহস্র সহস্র বৎসর হইতে এতদেশে যে বংশাশুচরিত চলিয়া আসিতেছে, কোনক্রমেই তাহা উড়াইয়া দেওয়া যায় না। * মহাভারতে যে বংশাশুচরিত আছে, তাহার সহিত অত্যন্ত গ্রন্থান্তর্গত বংশাশুচরিতের প্রায়ই অনৈক্য নাই। স্মৃতরাং, বংশাশুচরিত হিসাবেও মহাভারতের ঐতিহাসিকত্ব অস্বীকার করা যায় না। দেশ-কাল-পাত্র-বিষয়ক আলোচনাতেই বা কি বুঝিতে পারি? সেই কুরুক্ষেত্র, সেই ইন্দ্রপ্রস্থ, সেই সমরাস্তন—কত কাল হইতে লোকে নির্দেশ করিয়া আসিতেছে, কে তাহার নির্ণয় করিতে পারে? আজিও সেই স্থান-সমূহ দর্শন করিয়া, লোকে কুরু-পাণ্ডবের লীলা-ক্ষেত্র বলিয়া মনে করে; আজিও সেই সকল স্থানে গমন করিলে, সেই যুধিষ্ঠির-ভীমার্জুন প্রভৃতির শ্রীকৃষ্ণ-দুর্য্যোধনাদির স্মৃতি মানস-পটে প্রতিভাত হয়। ঘটনার যদি ঐতিহাসিকত্ব না থাকিত, তাহা হইলে একই স্থানে এমন-ভাবে এত দিন সে স্মৃতি কখনও উজ্জ্বল থাকিতে পারিত কি? সমাজ-পতি যেক্রপ-ভাবে পরিবর্তিত হইয়া আসিতেছে, হিন্দু-জাতির গর্ভ দিন দিন যেক্রপ বর্ধ হইয়া আসিতেছে; তাহার তুলনা করিলেও, কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধের জায় বিপ্লব-শ্রোত এক সময়ে ভারতবর্ষে প্রবাহিত হইয়াছিল এবং সে শ্রোতে হিন্দু-জাতির প্রতিষ্ঠার ভিত্তি-ভূমি ভাসিয়া গিয়াছিল, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। হিন্দুদিগের শাস্ত্রানুসারে সমাজ-নীতি দিন দিন শিথিল হইয়া আসিতেছে, পুণ্যের স্থান পাপে আসিয়া অধিকার করিতেছে, উন্নতির পরিবর্তে মানব-সমাজ অধোগতির পথে প্রধাবিত হইতেছে। আমরা প্রতিপন্ন করিয়াছি,—রামায়ণ-বর্ণিত ঘটনা-সমূহ মহাভারতের পূর্ববর্তি-কালে সংঘটিত হইয়াছিল। † এদিকেও দেখিতে পাই,—রামায়ণে যে বিত্তম্ব সমাজ, যে বিত্তম্ব নীতি, যে গৌরবান্বিত রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল, মহাভারতে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। কাল-ধর্ম্মে ধীরে ধীরে সমাজের যে অবনতি হয়, রামায়ণের ও মহাভারতের চরিত্র-চিত্রে তাহা দেখিতে পাই। সেই হিসাবে ক্রমালোচনা করিয়া আসিলে, মহাভারতের সময় অপেক্ষা বর্তমান সময়ের সমাজ-ধর্ম্ম নানা বিষয়ে কলুষিত বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। স্মৃতরাং দেশ-কাল-পাত্রের বিবেচনায় মহাভারতের ঐতিহাসিকত্ব আপনাই প্রতিপন্ন হয়। এইরূপে, যে দিক দিয়াই দেখি না কেন, যে ভাবেই আলোচনা করি না কেন, মহাভারতের ঐতিহাসিকত্ব কোনক্রমেই সন্দ্বিহান হওয়া যায়

* পরবর্তী পরিচ্ছেদান্তরে হিন্দুরাজপুত্রের বংশ-তালিকা দ্রষ্টব্য।

† এই গ্রন্থের ২০৬ হইতে ২৩৯ পৃষ্ঠার রামায়ণের আটালিকা দ্রষ্টব্য।

না। মহাভারতের ঐতিহাসিক অবিসংবাদিতরূপে প্রতিপন্ন হইলেও, আশ্চর্যের বিষয়, কোনও কোনও মহাপুরুষ মহাভারতকে রূপক বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা পান। পাশ্চাত্য-দেশের গবেষণাই, অনেক স্থলে, এইরূপ রূপকের সৃষ্টিকর্তা। এ সম্বন্ধে লাসেন-প্রমুখ ঐতিহাসিকগণের সিদ্ধান্তের প্রত্যুত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র বাহা বলিয়াছেন, তাহা বড়ই কৌতুক-প্রদ। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি,—“তিনি (লাসেন) বলেন,—অর্জুনাদি সব রূপক মাত্র। যথা—অর্জুন অর্থ শ্বেতবর্ণ; এজ্ঞা যাহা আলোকময়, তাহাই অর্জুন। যিনি অন্ধকার, তিনি কৃষ্ণ। কৃষ্ণাও তদ্রূপ। পাণ্ডবদিগের অনবস্থান-কালে যিনি রাজ্য ধারণ করিয়াছিলেন, তিনি সুভদ্রা। পঞ্চ-পাণ্ডব—পাঞ্চালের পাঁচটি জাতি, এবং পাঞ্চালীর সহিত তাঁহাদের বিবাহ—ঐ পঞ্চ জাতির একীকরণ হুচক মাত্র। যিনি ভদ্র অর্থাৎ মঙ্গল আনয়ন করেন, তিনি সুভদ্রা। অর্জুনের সঙ্গে যাদবদিগের সৌহার্দ্যই এই সুভদ্রা, ইত্যাদি-ইত্যাদি।...সংস্কৃত সাহিত্যে বা শাস্ত্রে যাহা কিছু আছে, তাহা রূপক হউক বা না হউক, রূপক বলিয়া উড়াইয়া দিতে অনেকেই ভালবাসেন। রামের নামের ভিতর ‘রম্’ ধাতু পাওয়া যায়, এবং সীতার নামের ভিতর ‘সি’ ধাতু পাওয়া যায়, এই জ্ঞাত্যুপাধি কৃষিকার্যের রূপকে পরিণত হইয়াছে। জর্জ-পণ্ডিতেরা এমনই দুই চারিটি ধাতু আশ্রয় করিয়া, ঋগ্বেদের সকল সূক্তগুলিকে সূর্য ও মেঘের রূপক করিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। চেষ্টা করিলে, বোধ করি পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, তাহা এইরূপে উড়াইয়া দেওয়া যায়। আমাদেরিগের মনে পড়ে, এক সময়ে রহস্যচ্ছলে আমরা বিখ্যাত নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রকে এইরূপ রূপক করিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলাম। তোমরা বলিবে, তিনি সে দিনের মনুষ্য—তাঁহার রাজধানী, রাজপুরী, রাজবংশ, সকলই আজিও বিদ্যমান আছে, তিনিও ইতিহাসে কীৰ্ত্তিত হইয়াছেন। তাঁহার উত্তরে বলা যায় যে, কৃষ্ণ অর্থে অন্ধকার, তমোরূপী। কৃষ্ণনগরে অর্থাৎ অন্ধকার-পূর্ণ স্থানে তাঁহার রাজধানী। তাঁহার ছয় পুত্র, অর্থাৎ তমোগুণ হইতেই ছয় রিপূর উৎপত্তি। একজন বালক পলাসি-যুক্ত সম্বন্ধে এইরূপ রূপক করিয়াছিল যে, পলমাত্র উদ্ভাসিত যে অসি, তাহা ক্লীব-গুণ-যুক্ত ক্লৈব (Clive) কর্তৃক প্রযুক্ত হওয়ায়, সুরাজা অর্থাৎ যিনি উত্তম রাজা ছিলেন, তিনি পরাভূত হইয়াছিলেন। অতএব রূপকের অভাব নাই। আর এই বালক-রচিত রূপকের সঙ্গে লাসেন-রচিত রূপকের বিশেষ প্রভেদ দেখা যায় না। আমরা ইচ্ছা করিলে, ‘লস্’ ধাতু খোদ লাসেন সাহেবের নাম ব্যুৎপত্তি সিদ্ধ করিয়া, তাঁহার ঐতিহাসিক গবেষণা ক্রোড়াকৌতুক বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারি।” বোধ হয়, এতদ্বিষয়ে অধিক আলোচনা নিম্প্রয়োজন। অনেকে হয় তো জানেন, আর্চ-বিশপ হোয়েটলি আপনার ‘লজিক’-গ্রন্থে তর্ক দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন—পৃথিবীতে বীরবর নেপোলিয়নের অস্তিত্ব ছিল না। ইহার অধিক হাস্তকর ব্যাপার আর কি হইতে পারে? কলতঃ, তর্কের সাহায্যে সত্য উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করা বাইতে পারে; কিন্তু উহাকে বাতুলতা ভিন্ন আর কি বলিতে পারি? কেহ কেহ আবার বলেন,—মহাবীর আলেক-জান্ডারের দূতরূপে মেগা স্থনীস ভারতবর্ষে আগমন করিয়া, ভারতবর্ষের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে কুরু-পাণ্ডব-যুদ্ধের প্রসঙ্গ লিখিত হয় নাই; সুতরাং

কুরু-পাণ্ডবদিগের যুদ্ধের ঐতিহাসিকতা স্বীকার করা যায় না। একরূপ সিদ্ধান্তও বাতুলতা মাত্র। একরূপ সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে হইলে, নিশ্চয়ই বলিতে হয়,—ভারতবর্ষের বহু গ্রহে যখন মেগাহিনীস বা আলেকজান্ডারের নামোল্লেখ নাই, তখন মেগাহিনীস বা আলেকজান্ডারের অস্তিত্বও সম্ভবপর নহে।

কুরু-পাণ্ডবগণের যুদ্ধের সমসময়ে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিল, মহাভারতের নানা স্থানে তাহার আভাস পাওয়া যায়। “পূর্ণ-শশধর-সদৃশ নিম্নলিখিত ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি প্রজাদিগের নয়ন ও মন উভয়ই তুল্যরূপে অমুরক্ত হইয়াছিল। প্রজাগণ তাঁহাকে রাজা বলিয়াই যে তাঁহাতে অমুরক্ত ছিল, এমন নহে; পরন্তু যে কার্যে প্রজাদিগের চিত্ত সন্তোষ হয়, তিনি সেই কার্যেই রত হইতেন। তিনি আপনার এবং অল্প সমস্ত লোকের হিতসাধনে সমভাবে নিযুক্ত থাকিয়া, পরম সুখে কালযাপন করিতেছিলেন।” * যুধিষ্ঠিরের রাজত্ব-সম্বন্ধে মহাভারতে এইরূপ উক্তি আছে। রাজা কিরূপভাবে রাজ-কার্য পরিচালনা করিবেন; কিরূপ কার্যে ইহলোকে ও পরলোকে তাঁহার মঙ্গল সাধিত হইবে; কিরূপভাবে প্রজাপালন করিলে, নৃপতিকে আধিরূপ বন্ধে আবদ্ধ হইতে হইবে না;—মহাভারতের শান্তি-পর্বে, যুধিষ্ঠিরের প্রেমের উত্তরে, ভীষ্ম তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন। যদাদি সংহিতায় যে উচ্চ রাজনীতির পরিচয় পাই, ভীষ্ম-মুখে অবিকল সেই সকল উপদেশ বিবৃত হইয়াছে। সেই একই উপদেশ!—মোহবশতঃ অশাজ্ঞীয় কর গ্রহণ করিয়া, প্রকৃতি-পুঞ্জকে পীড়া দিয়া, নৃপতি আপনার বিনাশের পথ আপনিই প্রশস্ত করিয়া থাকেন। “যে রূপ কীর্ত্তী-ব্যক্তি উদ্বোধন করিলে দুঃখলাভ করিতে পারে না, তদ্রূপ অসহুপায় অবলম্বন করিয়া রাজাকে পীড়িত করিলে তাহা কখনই পরিবর্তিত হয় না। যে রূপ যে ব্যক্তি নিয়ত পরস্বিনী গাভীর সেবা করে, সেই দুঃখ লাভ করে; তদ্রূপ নরপতি উপায়ানুসারে রাজ্য-পালন করিলে সুখ লাভ করিয়া থাকেন। যদ্রূপ মাতা শিশুকে শুষ্ক দান করেন, তদ্রূপ বসুমতী নরপতি কষ্টকর সুরক্ষিতা হইয়া, দোষীর জায়, সকলকেই ধাত্ত-হিরণ্যাদি প্রদান করিয়া থাকেন। মহারাজ! তুমি আঙ্গারিকের জায় মূলোৎপাটনকারী না হইয়া, প্রহর-সঞ্চয়-কারী মালিকরের রূতি অবলম্বন করিয়া, রাজ্য রক্ষা করিবে; তাহা হইলেই চিরকাল বসুমতীরূপে ভোগ করিতে সমর্থ হইবে।” মনু-সংহিতায় অল্প কথায় এবং গুরুড়-পুরাণে প্রায় একই ভাষায় এই উপদেশ দেখিতে পাই। † প্রজাগণের প্রতি রাজার কর্তব্য সম্বন্ধে মনুও উশনার আদেশ এবং শঙ্খ-লিখিত-অঙ্গিরার উপদেশ প্রতিপালিত হইত, প্রমাণ দেখিতে পাই। রাজকার্য পরিচালনে যে কিরূপ অভিজ্ঞতা প্রয়োজন,—শান্তি-পর্বে যুধিষ্ঠির ও ভীষ্মের প্রমোত্তরে তাহা বিবৃত আছে। সমাজ-সম্বন্ধে চাতুর্ক্যের কর্ম-বিভাগ, ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব, তখনও পূর্ণ মাত্রায় বিরাজমান ছিল। পরন্তু, এই সময়ে বর্ণ-সঙ্কর উৎপত্তিরও বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। দ্বাদশ প্রকার পুত্র এবং অষ্ট-বিধ বিবাহ,—এই সময় প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল।

* আদি-পর্বের ২২তম অধ্যায়; শান্তি-পর্বের ৭১শ অধ্যায়।

† এই গ্রন্থের ১৬২শ এবং ১৭৮শ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বিজ্ঞাপিতগণের স্তব্ধাভ্যাস বিচার, ব্রাহ্মণগণের আশীর্বাদ-গ্রহণ পূর্বক রাজার রাজত্ববনে
 প্রবেশ, বিশ্রামগণকে গো-ভূমি-হিরণ্যাদি দান—এ সকল তখনও কর্তব্যের মধ্যে পরিগণিত
 হইত । * সতীদাহ-প্রথা, মৃতের সংস্কার, প্রোত-তর্পণ, শ্রাদ্ধ-বিধি, সর্গবিধ সংস্কার-কার্য্য এবং
 তীর্থ-দর্শনের প্রাধান্যও তখন পরিলক্ষিত হয় । পাণ্ডু-রাজার পরলোক-প্রাপ্তিতে মাতীর
 শূদ্রগমন এবং যুধিষ্ঠিরের গঙ্গাসাগরাদি তীর্থ-দর্শন—এতৎ-প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য
 বাগ-যজ্ঞেরও তখন বিশেষ প্রচলন ছিল । পুত্র-কামনায় যজ্ঞ সর্বদাই বিহিত হইত । কন্যা-
 বিবাহে পণ-গ্রহণ প্রভৃতি অপকর্ম্ম এই সময় হইতেই প্রবর্তিত অথচ নিন্দনীয় হইয়াছিল ।
 ব্রাহ্মণগণ এই সময় হইতেই ব্রতলোপী হইতে আরম্ভ করেন । তাঁহাদের অধঃপতনের পথ দিন
 দিন প্রশস্ত হইয়া আসে । কোনও কোনও সমাজে পুরুষের এবং স্ত্রীলোকের পর্য্যন্ত বহ-
 বিবাহ প্রচলিত হওয়ায়, ততৎ সমাজ কলুষিত হইয়াছিল । ফলতঃ, মহাভারতের সময়ে
 সমাজের বিবিধ অঙ্গ প্রকাশ পাইয়াছিল । এক দিকের সমাজ-শরীর পবিত্র ছিল ; অল্প
 দিকের সমাজ-শরীর কলুষিত হইতে বসিয়াছিল । বর্তমান কালে হিন্দু-সমাজ যে অবস্থায়
 উপনীত, তদ্বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিলে, মহাভারতের সমাজের আভাস আপনিই মনোমধ্যে
 উদয় হইতে পারে । তৎকালে শিল্প-বিজ্ঞানাদি কিরূপ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল,
 ময়-দানব নির্মিত যুধিষ্ঠিরের রাজ-সভার এবং যুদ্ধের অস্ত্র প্রভৃতির বিবরণে তাহা বুঝিতে
 পারা যায় । যুধিষ্ঠিরের রাজত্বয় যজ্ঞোপলক্ষে ময় যে সভাগৃহ নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার
 ভুলনা হয় না । সেই সভায় তিনি “একটী অপ্রতিম সরোবর নির্মাণ করেন । ঐ সরোবরে
 মণিময় মৃগাল ও বৈদূর্য্যময় পদ্মযুক্ত শত শত শতপত্র ও কাঞ্চনময় কঙ্কার-কদম্ব সুশোভিত
 ছিল ; এবং বহুতর বিহঙ্গমগণ কেলি করিতেছিল । প্রকুল পঙ্কজ এবং সুবর্ণ-নির্মিত
 মৎস্য-কুর্মা-বিচিত্রিতা, চিত্রফটক সোপানবন্ধা, মন্দমন্দ সমীরণ দ্বারা আন্দোলিতা,
 যুক্তাবিন্দুনিচয়ে ষষ্ঠিতা, মহামণি-শিলাপট দ্বারা চতুর্দিকে বদ্ধ-বেদিকা, মণি-রয়ে বিভূষিতা,
 ঐ নির্মল সরসী দৃষ্টি করিয়া, কোনও কোনও রাজপুরুষেরাও ভ্রমক্রমে উহাতে পতিত
 হইয়াছিলেন । ঐ সভার চতুর্দিকে পুষ্পিত নীলবর্ণ শীতলছায়া-যুক্ত, নানাবিধ মনোহর
 মহাবৃক্ষসমূহ ও সুগন্ধি কানন এবং হংস-কারণ্ডব-চক্রবাকাদি সমাকীর্ণ পুষ্করিণী-সকল
 ইত্যন্তঃ সুশোভিত ছিল । গন্ধবহ সর্পত্র হইতে স্থলজ ও জলজ কমল সকলের সুগন্ধ
 বহন করিয়া, পাণ্ডবদিগের সেবা করিত ।” এরূপ কারুকার্য্যের পরিচয়—বর্তমান বিংশ
 শতাব্দীতেও বিরল নহে কি ? তার পর, জড়গৃহ-দাহের সময় পাণ্ডবগণ যে পুরস্কাপথে পলায়ন
 করিয়া প্রাণরক্ষা করেন, তাহাও সুচতুর শিল্পীর অপূর্ব শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় ভিন্ন—অল্প
 আর কি বলিতে পারি ? যুধিষ্ঠিরের সেই রাজসভায় যে সকল ঋষিগণ, যে সকল পরাক্রান্ত
 রাজগণ এবং যে সকল ক্রিয় বীরগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের পরিচয় বুঝিতে
 পারা যায়,—ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সকল দেশের সকল প্রধান
 ব্যক্তিরই ভাষায় শুভাগমন হইয়াছিল । কত দেশের কত নৃপতি—অজ্ঞ, বদ্র, কলিঙ্গ,

* শান্তিপর্ব্ব, ৩৮শ এবং ৩৯শ অধ্যায়ে এই সকল বিষয় বর্ণিত আছে ।

† আদিপর্ব্ব, ১২৬শ অধ্যায় এবং বনপর্ব্ব, ১২৪শ অধ্যায় ।

উড়, মগধ, বিদেহ, মজ্জ, কেকয় প্রভৃতি দেশের হিন্দুরাজগণ এবং কিরাত-রাজ পুলিশ, যবনাধিপতি চানুর প্রভৃতিও সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন । * সেই রাজসভায় সমাপ্ত অগ্নিগণের এবং রাজন্যগণের বিবরণ পাঠ করিলে, তৎকালের সম-সাময়িক চিত্র ফুটয় উঠে । ঐ অংশ পাঠ করিলে আরও বুঝা যায়,—ভারতবর্ষের বহির্দেশেও পাণ্ডবগণের গতিবিধি ছিল । অর্ণব-বান দ্বারা বিজিত সমুদ্র পার হওয়া, সাগর-প্রবাহে নৌ-পরিচালনা,—এ সকল উপমা দেখিয়া, সেই কথাই মনে হইতে পারে । † অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় জিগীর্ষ দেশ, প্রাগ্জ্যোতিষ দেশ, সিন্ধুদেশ, মগধ দেশ, মণিপুর রাজ্য প্রভৃতি জয়ের বিবরণ দেখিতে পাই ; আর দেখিতে পাই,—ধনঞ্জয় সমুদ্র তীর দিয়া গমন পূর্বক অঙ্গ প্রভৃতি দেশ জয় করিয়া ‘দশার্ণ’ দেশ এবং ‘গান্ধার’ দেশ অধিকার করেন । ইহাতে, ভারতের সুদূর দক্ষিণ প্রান্ত হইতে কান্দাহার, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশ পাণ্ডবগণের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল—বুঝিতে পারা যায় । যুদ্ধান্তের কিরূপ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল, কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধে তাহার কতই পরিচয় পাই ! বিনা অগ্নিতে রথ ভস্মীভূত হইয়াছিল,—ইহার অপেক্ষা অধিক বৈজ্ঞানিক ক্রিয়ার পরিচয় আর কি হইতে পারে ? বলিতে গেলে, আরও কত কথাই বলিতে হয় ! দেখিতে গেলে, আরও কত পরিচয়ই দেখিতে পাই ! যুধিষ্ঠিরের রাজ-সভায় উপনীত হইয়া, নারদ যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহাতে দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার কি সুন্দর চিত্রই প্রকটিত ! নারদ জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—‘তোমার অর্থ সমস্ত সঞ্চিত ও বিহিত কার্যে ব্যয়িত হইতেছে তো ? তোমার মন ধর্মে রত আছে তো ? তুমি যথাকাল বিভাগ করিয়া, সমভাবে ধর্ম-অর্থ-কাম সেবা করিয়া থাক তো ? তুমি আপনার ও পরের অবস্থা জানিয়া শুনিয়া কর্ম করিয়া থাক তো ? পরিশুদ্ধ, কার্য্যাকাব্য-বোধনে সমর্থ, পরের অনুরক্ত, আত্ম-সদৃশ, সংকুল-সন্তুষ্ট বৃদ্ধদিগকে মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিয়াছ তো ? বিদগ্ধ, নিলোভ, পুরাতন কর্মচারিগণ কর্তৃক তোমার রাজকাব্য-সমূহ অহুষ্ঠিত হয় তো ? বিনয়-সম্পন্ন, সৎসংজ্ঞাত, বহুশ্রুত, অযয়াশূন্য, মহামুভব পুরোহিতকে তুমি সতত সৎকার করিয়া থাক তো ? গুরু, বৃদ্ধ, বণিক, শিল্পজীবী, আশ্রিত ও দুর্দশাপন্ন ব্যক্তিদিগকে ধন-দান দিয়া অহুগ্রহ করিয়া থাক তো ? আয়-ব্যয় নিযুক্ত গণক ও লেখকেরা প্রত্যহ পূর্ণাঙ্কে তোমার আয়-ব্যয় নিরূপণ করে তো ? উত্তম, মধ্যম ও অধম লোকদিগকে বিশেষরূপে জানিয়া অতরূপ কার্যে নিযুক্ত করিয়া থাক তো ? চোর, লুন্ড, বৈরী, কি বালকগণ তোমার কার্য্য নির্বাহে তো নিযুক্ত হয় না ? তোমার রাজ্যের কৃষাণেরা তো সর্বদা সন্তুষ্ট থাকে ? বৃহৎ বৃহৎ তড়াগ সকল জলপূর্ণ হইয়া বিভাগানুসারে স্থানে স্থানে স্থাপিত আছে তো ? কৃষিকার্য্যে রতের নিতান্ত আবশ্যকতা নাই তো ? তোমার কৃষি, বাণিজ্য, পশু-পালন ও ঋণদান—এই চতুর্লিঙ্গ বার্তা গচ্ছরিত্র মানবগণ কর্তৃক অহুষ্ঠিত হয় তো ? বাদি-প্রতিবাদিগণ উপস্থিত হইলে, তাহাদের সুবিচারে শৈথিল্য প্রকাশ কর না তো ?’ এইরূপ কত কথাই আছে ! সভা-সমুদয় সমাজের বাহা প্রশ্ন-স্থানীয়, এই সকল প্রশ্ন তাহারই পরিচায়ক নহে কি ?

* সভাপক্ষ, চতুর্থ অধ্যায়ে রাজসভার নাম দ্রষ্টব্য ।

† দ্বাদশ পর্কের দ্বিতীয় অধ্যায় এবং উদ্যোগ-পর্কের ২৯শ অধ্যায় ।

যাহা হউক, মহাভারতের ঐতিহাসিকত্ব অবিসংবাদিত হইলেও, উহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কিছু অনেকেই সন্দেহান। কেবল ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বলিয়া নহেন; অসম্ভবীয় পণ্ডিতগণেরও অনেকেই মহাভারতের ঘটনাবলীকে আধুনিক বলিয়া প্রচার করেন। অধিক বলিব কি,—যে বক্ষিমচন্দ্র মহাভারতের ঐতিহাসিকত্ব লইয়া, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের প্রতি তীব্র বাস্তবিক করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, তিনিও বলেন,—মহাভারতের কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ ১৪৩০ পূর্ব-খৃষ্টাব্দে সংঘটিত হইয়াছিল। ‘বিষ্ণুপুরাণ হইতে যে খৃঃ পূঃ ১৪৩০ পাওয়া গিয়াছে, তাহাই ঠিক বোধ হয়।’ যথাসম্ভব প্রমাণ-পরম্পরার অবতারণা করিয়া, বক্ষিমচন্দ্র উপসংহারে বলিয়াছেন,—“ভরসা করি, এই সকল প্রমাণের পর, আর কেহ বলিবেন না যে, মহাভারতের যুদ্ধ ঝাপরের শেষে, পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে হইয়াছিল।” ইউরোপীয় পণ্ডিতগণও অনেকেই প্রায় এই মতাবলম্বী। তবে তাঁহাদের সিদ্ধান্তে বিশ পঞ্চাশ বৎসর বা শতাব্দীর পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। কোলকর, উইলসন, এলফিনষ্টোন—খৃষ্ট-পূর্ব চতুর্দশ শতাব্দীতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। উইলফোর্ডের মতে—১৩৭০ পূর্ব খৃষ্টাব্দে। প্রাট্—দ্বাদশ খৃষ্ট-পূর্ব শতাব্দীতে, বুকানন—ত্রয়োদশ খৃষ্ট পূর্ব শতাব্দীতে, এবং আমাদিগের রমেশচন্দ্র দত্ত—১২৫০ পূর্ব-খৃষ্টাব্দে, কুরু-পাণ্ডব-যুদ্ধের কাল নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। অথচ, যে দেশের ঘটনা, সে দেশে প্রচার—অনুন পাঁচ সহস্রাব্দিক বৎসর পূর্বে, ঝাপর-কলির সন্ধিস্থলে, কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। ব্যবধান—দুই দশ বৎসরের নহে—দুই এক শতাব্দীর নহে—প্রায় দেড় হাজার দুই হাজার বৎসরের। কেন এমন হয়? নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকগণ ইচ্ছা করিয়া যে এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা কোনক্রমেই স্বীকার করিতে পারি না। অথচ, দেশ-প্রচলিত যে প্রবাদ-বাক্য, পুরাণে—শাস্ত্রে ভ্রমোভ্রমঃ যাহার প্রতিষ্ঠা, তাহাই বা কি প্রকারে ভ্রম-প্রমাদপূর্ণ বলিতে পারি? তবে কেন এমন হয়! আমরা যতদূর আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি তাহাতে কোন-না-কোনও পক্ষের গণনায় ভুল ঘটিয়াছে বলিয়াই বুঝিতে পারিয়াছি। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—এই উত্তর মতের গণনায় আলোচনা করিয়া দেখিলে, কোথায় ভ্রম হইয়াছে, উপলব্ধি হওয়া সম্ভবপর। সুতরাং প্রথমে আমরা তাহাই দেখিবার চেষ্টা পাইতেছি। যে সকল গ্রন্থের যে সকল প্রবচন-পরম্পরায় উপর নির্ভর করিয়া পণ্ডিতগণ কাল-নির্ণয়ের সিদ্ধান্তে উপনীত হন, প্রথমতঃ আমরা তৎসংক্রান্ত কয়েকটা পুরাণ-প্রবচন এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি।

যাবৎ পরীক্ষিতে জগৎ যাবৎলাভিবেচনম্। এতদবৎসহস্রস্ত জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্ ॥

সপ্তবীণাক যৌ পুরৌ দৃষ্টতে উদিতৌ দিবি। তয়োস্ত নবানক্ষত্রং দৃষ্টতে যৎ সয়ং নিশি ॥

তেন সপ্তবীণো যুগান্তিষ্ঠত্যাদশতং যুগম্ ॥

তে তু পরীক্ষিতে কালে নবানক্ষত্রং দৃষ্টোত্তরম্। তদা প্রবৃন্তস্ত কলিযুগশ্যাপত্যয়কঃ ॥

প্রযুক্তস্তি যদা তে তে পূর্বান্যাতা নক্ষত্রাঃ। তদানন্দাৎ প্রভূত্যো কলিযুগিং গনিষ্যতি ॥

—বিষ্ণু-পুরাণ, চতুর্বিংশ, ২৪শ অধ্যায়, ৩২শ—৩৩শ এবং ৩৪শ স্লোক।

‘পরীক্ষিতের জগৎ হইতে নব্বের অতিশেষ পর্যন্ত কালের পরিমাণ—পঞ্চ-দশাব্দিক ব্রহ্ম বৎসর।’
‘যাকালে সপ্তবীণের মধ্যে প্রথমোদিত যেন নক্ষত্রের আছে, সেই নক্ষত্রের এবং তৎ-পূর্ববর্তী

নক্ষত্রের মধ্যে, সমদেশাবস্থিত যে একটি করিয়া নক্ষত্র দৃষ্ট হয়, ঐ এক একটি নক্ষত্রের সহিত যুক্ত হইয়া, সপ্তর্ষিগণ এক শত বৎসর কাল অবস্থিতি করেন। হে দ্বিজোৎম! সপ্তর্ষিগণ পরীক্ষিতের রাজ্য-কালে মধ্যাবর্তী মথানক্ষত্রে ছিলেন। সেই সময় কলির দ্বাদশ শত বৎসর পরিমিত-কাল প্রবৃত্ত হয়।...এই মহর্ষিগণ বৎকালে পূর্বোক্ত প্রকারে পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্রে গমন করিবেন, সেই সময় নন্দের রাজ্যকাল হইতেই কলি বুদ্ধি প্রাপ্ত হইবে।'

অরভা ভবতো অগ্না বাবগ্নদাভিবেচনম্ । এতদ্রদসহস্রস্ত শতং পঞ্চদশোত্তরম্ ॥

সপ্তর্ষীমাস্ত সৌ পূর্বৌ দৃষ্টোতে উদিতৌ দিবি । তয়োস্ত মধ্য নক্ষত্রঃ দৃষ্টোতে বৎ সমং নিশি ॥

তেনব জ্বরো বুলান্তিষ্ঠন্ত্যকশতং বৃণান্ । তে তদীয়ে দ্বিজাঃ কাল জধুন্য চাপ্রিতা মথাঃ ॥

নদা দেববর্ষঃ সপ্ত মথাহ বিচরন্তি হি । তদা প্রবৃত্তস্ত কলিদ্বাদশাংশতায়কঃ ॥

নদা মথাভ্যো যাস্যান্ত পূর্বাষাঢ়াং মহর্ষয়ঃ । তদা নন্দাৎ প্রভূতোষ কলিবুদ্ধিং গমিষ্যতি ॥

—ঐমত্ভাগবত, দ্বাদশ স্কন্ধ, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৬শ-২৮শ এবং ৩১শ-৩২শ শ্লোক ।

শুকদেব, পরীক্ষিতকে বলিতেছেন,—‘তোমার জন্মাবধি নন্দের অভিষেক-কাল পর্য্যন্ত এই এক সহস্র এক শত পঞ্চদশ বৎসর। গগনমণ্ডলে উদয়-কালে সপ্তর্ষিগণের মধ্যে যে ছই ঋষিকে প্রথমে উঠিতে দেখা যায়, সেই ছই ঋষির মধ্যে আবার নিশাকালে (অধিনী প্রভৃতির মধ্যে) যে নক্ষত্রে সমদেশে অবস্থিত দেখ, ঋষিগণ মন্ত্রাদিগের পরিমাণে এক শত বৎসর সেই নক্ষত্রে অবস্থিতি করেন। তোমার সময়ে এখন সেই ঋষির মধ্য-নক্ষত্রেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন।.....যখন সপ্ত-দেবর্ষি মধ্য আশ্রয় করেন, তখনই দ্বাদশ-শত-বর্ষাত্মক কলি প্রবেশ করে। যখন মহর্ষিগণ মধ্য হইতে পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্রে গমন করিবেন, তখন নন্দরাজ্য-কালাবধি কলির বিক্রম বাড়িতে থাকিবে।’

মহানন্দিস্ততঃ শূদ্রাগভোক্তবোহতিলুকা মহাপদ্মানন্দঃ পরশুরাম ইবাপরোহয়িলক্ষজাতকামী ভবিষ্যতি।...

মহাপদ্মঃ, ৩৫-পূর্বাষ্ট একং বর্ষশতমবনীপত্যয়ে ভবিষ্যতি । নটৈব তান্ নন্দান্ কোটিল্যো ব্রাহ্মণ

সমুক্রিষ্যতি ॥ তেযামভাবে মোখ্যাষ্ট পৃথিবীং ভোক্তসি । কোটিল্য এব চক্রগুপ্তং রাজ্যোহভিবেক্ষ্যতি ॥

—বিষ্ণু-পুরাণ, চতুর্থাংশ, চতুর্বিংশাধ্যায়, ৪৭, ৪৮, ১ম শ্লোক ।

‘মহানন্দীর শূদ্রাগভুক্ত্যত অতিলোভী মহাপদ্মা-নন্দনামা এক পুত্র হইবে। এই ব্যক্তি দ্বিতীয় পরশুরামের দ্বারা অধিল ক্ষত্রিয়-কুলের বিনাশ করিবে।...মহাপদ্ম এবং ৩৫-পুত্রগণের রাজ্য-ভোগ-কাল—এক শত বৎসর। কোটিল্য ব্রাহ্মণ (চাণক্য) নয়জন নন্দ-বংশীয়কে উচ্ছেদ করিবেন। নন্দ-বংশীয়গণের উচ্ছেদের পর, মৌর্য্য শূদ্র-রাজগণ পৃথিবী ভোগ করিবে। কোটিল্য, মৌর্য্য-বংশীয় চক্রগুপ্তকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন।’

মহানন্দিস্ততো ব্রাহ্মণ শূদ্রাগভোক্তবো বলী ॥ মহাপদ্মপতিঃ কশিরন্দঃ ক্ষত্রবিনাশকঃ ।

তত চাত্তৌ ভবিষ্যন্তি স্ত্রমালাশ্রমথাঃ কুতাঃ । য ইমাং ভোক্তান্ত মহীং ব্রাহ্মাণ্ড শতং সমাঃ ॥

নব নন্দান্ দ্বিজঃ কশিচৎ প্রপন্নানুক্রিষ্যতি । তেযামভাবে জগতীং মোখ্যাভোক্তসি বৈ কলৌ ॥

স এব চক্রগুপ্তং বৈ দ্বিজো রাজ্যোহভিবেক্ষ্যতে ॥

—ঐমত্ভাগবত, দ্বাদশ স্কন্ধ, প্রথম অধ্যায় ।

‘হে রাজন্! মহানন্দীর পুত্র শূদ্রা-গভুক্ত্যত বল-সম্পন্ন ক্ষত্রিয়দিগের হস্তা নন্দ নামে এক রাজা জন্মিবে। তাঁহার নামান্তর—মহাপদ্ম।...তাঁহার স্ত্রমালা প্রভৃতি অষ্ট পুত্র উৎপন্ন হইবেন। সেই পুত্রগণ শত বৎসর পৃথিবী-পতি হইবে। চাণক্য-নামে কোনও ব্রাহ্মণ

অনুগত ও বিশ্বস্ত নন্দরাজ। এবং তাঁহার আট পুত্রকে বিনাশ করিবেন। তাঁহাদিগের অভাবে মৌর্যেরা কলিযুগে পৃথিবী পালন করিবেন। চাণক্য কর্তৃক চন্দ্রগুপ্ত রাজ্যভিত্তিক হইবেন।

আসন্ন অথাত্ম মনয়ঃ শাসতি পৃথ্বী যুধিষ্ঠিরে নৃপভৌ। বড়বিকপঞ্চবিয়তঃ শককালন্তস্য রাজশক।

—বরাহ-মিহির কৃত বৃহৎ-সংহিতা, ১৩শ অধ্যায়ঃ।

‘রাজা যুধিষ্ঠির যে সময়ে রাজ্য-শাসন করিয়াছিলেন, মথ্য-নক্ষত্রে তখন সপ্তর্ষি নক্ষত্র-মণ্ডল অবস্থিতি করিতেছিলেন। সে হিসাবে, এক্ষণে যুধিষ্ঠিরের শকাব্দ—২৫২৬ হইতে পারে।’

ইহা হইতে বুঝা যায়,—বৃহৎ-সংহিতা রচনার সময়ে ২৫২৬ যুধিষ্ঠিরাব্দ ছিল।

“গভেষু ঘটনু সাদেক্ষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে। কলৈর্গতেষু বর্ধানামভবন কুরু-পাণ্ডবাঃ॥”—রাজ-তরঙ্গিনী।

কলির ছয় শত তিথ্যায় বৎসর গত হইলেও কুরু-পাণ্ডবগণ বিজয়মান ছিলেন। রাজ-তরঙ্গিনী-প্রণেতা আরও বলেন,—“কাশ্মীরের রাজা গোনন্দ, যুধিষ্ঠিরের সম-সাময়িক।”

মন্তরে চৈব সম্রাণ্ডে কলিযাগরয়োদয়ঃ। স্যামন্তপঞ্চকে বুদ্ধং কুরুপাণ্ডব সেনয়োঃ॥

—মহাভারত, আদি-পর্ব, প্রথম অধ্যায়।

এই সকল ভিত্তির উপর বিবিধ তর্ক-যুক্তির অবতারণায়, বৃধ-মণ্ডলী নানারূপ কাল-নির্ণয় সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মধ্যে বেণ্টরি, হিন্দু-জ্যোতিষ-শাস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনায়, ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কার করিতে গিয়া, সপ্তর্ষি-মণ্ডলীয় ধাঁধায় পড়িয়া, ৫৭৫ পূর্ব-খৃষ্টাব্দের অধিক পূর্বে যুধিষ্ঠিরাদির কাল-কল্পনা মনোমধ্যে স্থান দিতে পারেন নাই। তদ্ব্যতীত, অধিকাংশ পণ্ডিতই খৃষ্ট-পূর্ব ত্রয়োদশ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীতেই কুরু-ক্ষেত্রের মহা-সমর সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সকলেই প্রায় একই-রূপ যুক্তির অনুসরণকারী। সকলেরই সিদ্ধান্তের মূলে—মৌর্য-বংশীয় রাজা চন্দ্র-গুপ্তের রাজ্য-প্রাপ্তির উল্লেখ। চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব-কালে গ্রীক-বীর আলেকজান্ডার ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন;—সে ঘটনার বিবরণ পাশ্চাত্য-দেশের ইতিহাসে বিশেষরূপেই লিখিত আছে। ৩১৫ পূর্ব-খৃষ্টাব্দে চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন; আর, ৩২৫ পূর্ব-খৃষ্টাব্দে আলেকজান্ডার ভারতে আসিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য বৃধ-মণ্ডলী সেই ঘটনাকে ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটা সীমা বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন। * সুতরাং ঐ সময়কে কেন্দ্ররূপে গ্রহণ করিয়া, অনেকেই তৎপূর্ব ও তৎপরবর্তী ইতিহাসের আলোচনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন,—‘চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য-প্রাপ্তির অব্দ—বর্তমান খৃষ্টাব্দ হইতে (১৯০৯+৩১৫) দুই হাজার দুই শত চব্বিশ বৎসর। তৎপূর্বে নন্দ-বংশের রাজত্ব এক শত বৎসর। নন্দ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা নন্দ রাজত্ব পাইয়াছিলেন—পরীক্ষিতের জন্মের এক হাজার পনের বৎসর পরে। সুতরাং পরীক্ষিত হইতে আরম্ভ করিয়া, চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য-প্রাপ্তি পর্যন্ত ব্যবধান কাল—(১০১৫+১০০) এগার শত পনের বৎসর। তাহা হইলে, পরীক্ষিত হইতে বর্তমান-কালের ব্যবধান—(১০১৫+১০০+৩১৫+১৯০৯=৩০৩৯) তিন হাজার তিন শত ঊনচব্বিশ বৎসর। এ হিসাবে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ঘটয়াছিল—১৪৩০ পূর্ব-খৃষ্টাব্দে। এ সিদ্ধান্ত বোধ হয়, সহজেই স্বপ্নময় হইতে পারিবে। রাজ-তরঙ্গিনীর গণনাক্রমে কাশ্মীর-রাজ গোনন্দ যুধিষ্ঠিরের সম-সাময়িক হইলে, এবং কলির ৬৫৩ বৎসর গতে গোনন্দো

* এই ঘটনাকে ম্যাক্সমুলার “The sheet anchor of Indian chronology” বলেন।

রাজ্যকাল মানিয়া লইতে হইলে, (৫০১০—৬৫৩) ৪৩৫৭ বৎসর পূর্বের যুধিষ্ঠিরের বিদ্যামানতা সপ্রমাণ হয়। তাহা হইলে, (৪৩৫৭—১১০৯) ২৪৪৮ পূর্ব-খৃষ্টাব্দে যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকাল ছিল—নির্দিষ্ট হইতে পারে। বলা বাহুল্য, জুই গণনার অনানুসঙ্গিক বৎসরের পার্থক্য। এদিকে, দেশ-প্রচলিত মতের আলোচনা করিলে, দ্রাপর-কলির সন্ধি-স্থলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল স্বীকার করিতে গেলে, ব্যবধান আরও বাড়িয়া যায়। তাহাতে, অন্ততঃ (কলিগুণতান্দ ৫০১০—বর্তমান খৃষ্টাব্দ ১৯০৯) ৩ হাজার ১০১ পূর্ব-খৃষ্টাব্দে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ মানিয়া লইতে হয়। এখানে আরও প্রায় এক হাজার বৎসরের পার্থক্য।

এখন কোন্ মত মানিব? কেহ বলেন—৫৭৫ পূর্ব-খৃষ্টাব্দে, কেহ বলেন—১৪৩০ পূর্ব-খৃষ্টাব্দে, কেহ বলেন—১২৫০ পূর্ব-খৃষ্টাব্দে, কেহ বলেন—১১৭৬ পূর্ব-খৃষ্টাব্দে, কেহ বলেন—

২৪৪৮ পূর্ব-খৃষ্টাব্দে; কিন্তু লোক-প্রচলিত মত—৩১০১ পূর্ব-খৃষ্টাব্দে।

মহাভারতের
কাল-নির্ণয়।

এতাদৃশ মতবৈষম্য-স্থলে, কোন্ মত মান্য করিব? কাজেই আমাদের কাছে এ বিষয়ে আরও একটু বিস্তৃত-ভাবে আলোচনা করিতে হইতেছে।

পূর্বেই দেখাইয়াছি, এ পর্য্যন্ত যাহারা এ বিষয় আলোচনা করিয়াছেন, তাহাদের প্রায় সকলেই শাখা হইতে কাণ্ডের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন। কেহই মূল হইতে উদ্ভূতভাবে উঠবার প্রয়াস পান নাই। যদি মাকিদনের বীর আলেকজান্ডার ভারতবর্ষে না আসিতেন, যদি তাহার দূত মেগাস্থিনীস ভারতবর্ষের বিবরণ বিবৃত না করিতেন, তবে তো দেখিতো, —কুরু-পাণ্ডবের কাল-নির্ণয় কদাচ সম্ভবপর হইত না! আমরা নিয়ে জ্যোতির্বিদ্যাতরণ হইতে একটা অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। দেখা যাউক,—তাহাতে যুধিষ্ঠিরাদির কাল-নির্ণয় হয় কি না। রাজা বিক্রমাদিত্যের সভাসদ বিশ্ববিশ্রুত কবি-কেশরী কালিদাস জ্যোতির্বিদ্যাতরণ গ্রন্থ রচনা করেন।* বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় সেই গ্রন্থের বিশেষ সমাদর হইয়াছিল। সেই জ্যোতির্বিদ্যাতরণ জ্যোতিষ গ্রন্থ রচনা করিয়া, কবি তন্মধ্যে যুধিষ্ঠিরের সময় নির্দেশ করিয়া যান। তাহা কি এ বিষয়ে অধিকতর প্রামাণ্য নহে? জ্যোতির্বিদ্যাতরণ গ্রন্থ কোন্ সময় বিরচিত হইল, কবি কালিদাসের ঐ গ্রন্থেই তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

বর্ষে সিংহ দর্শনাবসরগুণৈর্ঘ্যাতে কলেঃ সংমিতে মাসে মাঘবসংজ্ঞিতেহজ্র বিহিতো গ্রহক্রিয়োগক্রমঃ।
ইহাতে স্পষ্টই জানিতে পারা যায়,—কলির ৩০৬৭ বৎসর গত হইলে, মধু মাসে, কালিদাস জ্যোতির্বিদ্যাতরণ গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করেন। ঐ জ্যোতির্বিদ্যাতরণ গ্রন্থে দুই হয়,—

যুধিষ্ঠিরো বিক্রম-শালিবাহনো নরাধিনাথো বিজয়াভিনন্দনঃ।

ইমেহম্ নাগার্জুনমেদিনীবিভবলিঃ ক্রমাৎ যটশককারকা নৃপাঃ।†

যুধিষ্ঠিরাদেবমুগাধরায়ঃ ৩০৪৪ কলম্ববদে ১৩০২ হজ্রখাট্টব্দঃ ১৮০০০।

ততোহবুতং ১০০০০ লক্ষ চতুষ্টয়ং ৪০০০০০ ক্রমাৎ বরাহগুপ্তা ৮২১ বিতি শাকবৎসরাঃ।

—জ্যোতির্বিদ্যাতরণ, দশম অধ্যায়।

* মহাকবি কালিদাস যে এই গ্রন্থ রচনা করেন, স্বর্গীয় গ্রন্থের ভগ্নত্বাৎ তাহা অসম্ভব,—
“জ্যোতির্বিদ্যাতরণকালবিধানশাস্ত্রং। ঐকালিদাসকবিতো বিত্ততো বহুঃ।”

† এই শ্লোকের নিম্নলিখিত পাঠান্তর আছে,—

“যুধিষ্ঠিরাদিক্রমশালিবাহনো ততো নৃপাঃ কালবিজয়াভিনন্দনঃ।

ততস্ত নাগার্জুন ভূগতিঃ কলৌ ককি বহুতে শককারকা নৃপাঃ।”

যুধিষ্ঠির, বিক্রমাদিত্য, শালিবাহন, বিজয়াভিনন্দন, নাগার্জুন এবং বলি—এই ছয় জন নৃপতি শকাব্দ স্থাপন করেন । তন্মধ্যে ৩০৪৪ বৎসর যুধিষ্ঠিরের শকাব্দ । তাহার পর, ১৩৫ বৎসর বিক্রমাদিত্যের শকাব্দ । তৎপরে, ১৮ সহস্র বৎসর শালিবাহনের, তৎপরে ১০ সহস্র বৎসর বিজয়াভিনন্দনের, তৎপরে ৪ লক্ষ বৎসর নাগার্জুনের, তৎপরে ১ বৎসর বলির শকাব্দ । বলা বাহুল্য, যুধিষ্ঠিরের শকাব্দ অতীত হইলে, বিক্রমাদিত্যের শকাব্দ আরম্ভ হয়; অর্থাৎ মহারাজ বিক্রমাদিত্যের প্রভাবে যুধিষ্ঠিরের শকাব্দ অপ্রচলিত হইয়া আসে । বিক্রমাদিত্যের শকাব্দ ১৩৫ বৎসর কাল অক্ষুর ছিল । তৎপরে শালিবাহনের শকাব্দ আরম্ভ হয় । জ্যোতিষ-গণনাদিতে সেই শকাব্দ আজিও ব্যবহৃত হয় । বোম্বাই-প্রদেশে আজিও ইহার প্রচলন আছে । শালিবাহনের শকাব্দ—এখন ১৮৩০ । সুতরাং ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায়,—যুধিষ্ঠিরাদি কত বৎসর পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন । যুধিষ্ঠিরের প্রবর্তিত শকাব্দ, বিক্রমাদিত্যের শকাব্দ এবং শালিবাহনের প্রবর্তিত শকাব্দের বিগত বর্ষ-সমূহ যোগ করিলে (৩০৪৪ + ১৩৫ + ১৮৩০ = ৫০০৯) পাঁচ হাজার নয় বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে,—বুঝিতে পারা যায় না কি ? এতাদৃশ সামঞ্জস্য সত্ত্বে, পুরুষ-পরম্পরা প্রচলিত মতের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন,—সমীচীন কি ? তবে এ সম্বন্ধে একটা আপত্তির কথা উঠিতে পারে । কেহ কেহ বলিতে পারেন,—‘কালিদাস ভবিষ্য ঘটনা কি করিয়া লিপিবদ্ধ করিলেন ? তাঁহাকে ত্রিকালজ্ঞ ঋষি বলিয়া তো মানিতে পারি না !’ এ ক্ষেত্রে সেরূপ আস্থা-স্থাপনের আবশ্যকতাও উপস্থিত হয় নাই । তবে বিগত ঘটনা তিনি যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, যুধিষ্ঠিরাদির ৩০৪৪ বৎসর পরে বিক্রম সংবৎ প্রবর্তিত হয়,—তাঁহার এ কথায় কোনই সংশয় জন্মিতে পারে না । তার পর, কালিদাসের ভবিষ্যতোক্তিতে যদি আস্থা স্থাপন করিবার প্রবৃত্তি না হয়; কিন্তু তাঁহার পরবর্তী কালে ভাস্করাচার্য্য এবং মকরন্দকর প্রমুখ জ্যোতির্বিদগণ শালিবাহনের শকাব্দ সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা তো কোনক্রমেই উপেক্ষা করা যায় না । তাঁহারা বলেন—

“নন্দাক্রীন্দুগাশ্বখা শকনৃপস্যান্তে কলেকংসরাঃ ।”—ভাস্করাচার্য্য ।

“গাকো নবাগেন্দুকশাস্ত্রযুক্তকলেভবত্যুদগণো যুগস্য ।”—মকরন্দকর ।

এতদ্ব্যতীত শ্রোকের মর্ম,—“৩১৭৯ তিন হাজার এক শত উনাশী কলির্দাতাকে শকাব্দ আরম্ভ ।” ইহাতেও বুঝা যাইতেছে,—বিক্রম-সংবতের পরে (যুধিষ্ঠির-প্রবর্তিত শকাব্দের পরে তো বটেই) শালিবাহনের শকাব্দ প্রবর্তিত হইয়াছিল । তাহার সহিত বর্তমান শালিবাহন শকাব্দের বিগত ১৮৩০ বৎসর যোগ করিলেও অতীত মণনার উপনীত হওয়া যায় । কালিদাসের জ্যোতির্বিদ্যান্তরণে বাহার প্রমাণ পাইলাম, ভাস্করাচার্য্য এবং মকরন্দকর তাহার সমর্থন করিলেন । ইহার উপর আর কি সংশয় থাকিতে পারে ? কলির ৩০৪৪ বৎসর গত হইলে, বিক্রমাদিত্য সিংহাসনে আরোহণ করেন ; সেই হইতেই সংবতের প্রবর্তনা । এই বিক্রমাদিত্যের রাজ্যাধিকার-লাভ সম্বন্ধে “রাজাবলী” গ্রন্থে যাহা লিখিত আছে, তাহাও পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের সমর্থক বলিয়া মনে করি । “রাজাবলীতে” লিখিত হইয়াছে—“কলির আরম্ভ অবধি ৪২৬। বৎসর পর্য্যন্ত ১১১ জন নানা জাতীয় হিন্দু দিল্লীর সম্রাট হন।

ইহার বিবরণ—রাজা যুধিষ্ঠির অবধি ক্ষেত্রকর্ণ পর্য্যন্ত ২৮ জন কৃত্তির-জাতির পুরুষেতে ১৮১২ বৎসর। এই পর্য্যন্ত কলিতে বাস্তব কৃত্তির জাতির বিরাম হইল। তাহার পর, মহানন্দী নামে কৃত্তিরের ঔরপেতে শূদ্রায় গর্ভজাত নন্দের বংশজ বিশারদ অবধি বোধমল্ল পর্য্যন্ত ১৪ জনেতে ৫০০ বৎসর। এই নন্দ অবধি রাজপুত্র জাতির সৃষ্টি হয়। তাহার পর, গোতম বংশজাত বীরবাহু অবধি আদিত্য পর্য্যন্ত নাস্তিক-মতাবলম্বী ১৫ জনেতে ৪০০ বৎসর। এই সময়ে নাস্তিক মতের অত্যন্ত প্রচার হওয়াতে বৈদিক-ধর্ম উচ্ছিন্ন-প্রায় হইয়াছিল। তাহার পর ‘ময়ূর’ বংশীয় ধ্রুবর অবধি রাজপাল পর্য্যন্ত ৯ জনেতে ৩১৮ বৎসর। তাহার পর, শকাদিত্য নামে পার্শ্বতীয় রাজা এক জনেতে ১৪ বৎসর। এইরূপে কলির প্রথম অবধি ৩০৪৪ বৎসর গত হইল এবং মহারাজাধিরাজ যুধিষ্ঠিরের শকেরও নিরুত্তি ঘটিল। তাহার পর, বিক্রমাদিত্যের সংবতের আরম্ভ হইল। এই সংবতের আরম্ভ অবধি বিক্রমাদিত্যের পিতা-পুত্র দুই জনেতে ২৩ বৎসর।” বিক্রমাদিত্য-প্রবর্তিত সংবৎ এখনও পঞ্জিকাধিতে অগ্রচলিত নহে। অধুনা বিক্রমাদিত্যের ১৯৬৬-৬৭ সংবৎ চলিতেছে। তাহার সহিত যুধিষ্ঠিরাদি যোগ দিলেও, যুধিষ্ঠিরাদির কাল-নির্ণয় সুগম হইয়া আসে। প্রাচীন শিলালিপি প্রভৃতি দৃষ্টেও কুরুক্ষেত্র মহাসমরের কাল-নির্ণয় হইতে পারে। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে গুজরাটে ‘চালুক্য’ বংশের রাজা পুলিকেশি কুরুক্ষেত্র মহাসমরের কাল-নির্ণয় করিয়াছিলেন। রবিকীর্তি-নামক জটনৈক কবি তদুপলক্ষে যে কবিতা প্রণয়ন করেন, রাজা পুলিকেশি শিলাফলকে তাহা খোদিত করিয়া যান। শিলাফলকে সংস্কৃত-ভাষায় অনেকগুলি শ্লোক লিখিত হইয়াছিল। পুলিকেশির সেই শিলাফলকের দুইটী শ্লোক এই,—

“ত্রিশশংসু ত্রিসহস্রেষু ভারতাদ্যবাদিতঃ । সম্ভাদ শতযুক্তেষু গতেষ্বেষু গগনং ॥

পঞ্চাশংসু কলৌকালে ঘটসু পঞ্চাশভাং ৮ । সমাস সমভীতাসু শকানামপি ভূভুজাম ॥”

অর্থাৎ,—‘৫৫৬ শকে এই শিলাফলক উৎকীর্ণ হইয়াছিল। ইহার ৩৭৩৫ বৎসর পূর্বে কুরু-পাণ্ডবের মহাসমর সংঘটিত হয়।’ চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলিকেশি ৬১০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তখন কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের প্রায় ৩৭১০ বৎসর অতীত হইয়াছিল। এ হিসাবে বেশ প্রতিপন্ন হয়, কলির পূর্বে, ষাপরের শেষ-ভাগে, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ সংঘটিত হয়। রাজা দ্বিতীয় পুলিকেশি ৫৩১ হইতে ৫৫৬ শক পর্য্যন্ত ২৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন; আর তাহার রাজত্বের শেষ-বর্ষে ঐ শিলাফলক খোদিত হইয়াছিল। তাহা হইলে বুঝা যায়,—(৬১০ + ২৫) ৬৩৫ খৃষ্টাব্দে ঐ শিলাফলক প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন ১৯০৯ খৃষ্টাব্দ। সুতরাং বর্তমান খৃষ্টাব্দের ১২৭৪ বৎসর পূর্বে ঐ শিলাফলক উৎকীর্ণ হইয়াছিল। তাহা হইলে, বর্তমান বর্ষের ৫০০৯ বৎসর (৩৭৩৫ + ১২৭৪) পূর্বে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ সংঘটিত হয়,— তাহাই প্রতিপন্ন হইতে পারে। ১২৭৪ বৎসর পূর্বে এক জন হিন্দু-নৃপতি বিশেষ-রূপ বিচার করিয়া, যে সময় নির্ধারণ করিয়াছিলেন, এবং যে নির্ধারণে সন্দেহই সামঞ্জস্য লক্ষিত হইতেছে, তৎপ্রতি কোনক্রমেই উপেক্ষা প্রদর্শন করা যাইতে পারে না। অতএব কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ ষাপরের শেষ-ভাগে, পঞ্চ সংক্রান্তিক বৎসর পূর্বে সংঘটিত হইয়াছিল, স্বীকার করিতে হয়।

এতৎপ্রসঙ্গে আরও একটী গুরুতর বিষয়ের অবতারণা করা যাইতে পারে। কুরু-পাণ্ডব-যুদ্ধের কাল-নির্ণয় করিতে হইলে, তৎপ্রতি কোনক্রমেই উপেক্ষা করা যায় না। সে বিষয়টী—

শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গ-গমন। শ্রীকৃষ্ণ কোন সময় স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন, কালনির্ণয়ে
শ্রীকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ। নানা পুরাণে তাঁহার উল্লেখ দেখিতে পাই। শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গ-গমন সম্বন্ধে পুরাণের মত আলোচনা করিলে, বুধিষ্ঠিরাদির এবং কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের

সময় আরও দূরে পিছাইয়া পড়ে। বিষ্ণুপুরাণের একাধিক স্থলে এবং শ্রীমদ্ভাগবতের একাধিক স্থানে শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গারোহণের সময় বিশেষ-ভাবে লিখিত হইয়াছে। যথা,—

যদৈব ভগবদ্বিকারংশো যাতো দিবং দ্বিজ। বসুদেব কুলোদ্ভূতস্তদৈব কলিরাগতঃ।

যস্মিন্ কৃষ্ণো দিবং যাতস্তস্মিন্নেব তদাহনি। প্রতিপন্নং কলিযুগং তচ্চ সংখ্যাম্ নিবোধ মে।

—বিষ্ণুপুরাণ, চতুর্থঃস্ক, ২৪শ অধ্যায়, ৬৭শ এবং ৪০শ শ্লোক।

‘যে সময় ভগবান্ বিষ্ণুর অংশ বাসুদেব স্বর্গ-গমন করেন, সেই সময়েই কলি আগমন করিয়াছে।...কৃষ্ণ যে দিন স্বর্গে গমন করেন, সেই দিনই কলি উপস্থিত হইয়াছে।’

কৃষ্ণে অধামোপগতে ধর্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ। কলৌ নষ্টদৃশ্যমেব পুরাণাকৌহল্যুনোদিতঃ।...

যস্মিন্নহনি বর্ষেব ভগবান্‌সংসর্জ্যগাম। তদৈবেহানুস্মতোহসাবধর্মপ্রভবঃ কলিঃ।

—শ্রীমদ্ভাগবত, প্রথম স্কন্ধ, ৩য় অধ্যায়, ৪৫ শ্লোক এবং ১৮শ অধ্যায়, ৬ষ্ঠ শ্লোক।

‘কলি-যুগের সঞ্চার হইবা-মাত্রেই শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞান ও ধর্ম লইয়া নিজধামে প্রস্থান করেন। তখন লোক-সকল অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন হয়। সেই অজ্ঞানান্ধকার দূর করিবার জন্য ভাগবত-সূর্য্য সমুদিত।...ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে দিন এবং যে ক্ষণে এই পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়াছেন, অধর্মের উৎপত্তি-স্থান-ভূত কলি সেই দিনে সেই ক্ষণে পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়াছে।’

বিকোষ্ঠগবতো ভাস্নিঃ কৃষ্ণাযোহসৌ দিবং গতঃ। তদাবিশং কলিলোকং পাশে যজ্ঞমতে জনঃ।

যস্মিন্ কৃষ্ণো দিবং যাতস্তস্মিন্নেব তদাহনি। প্রতিপন্নং কলিযুগমিতি প্রাচ্যঃ পুরাবিদঃ।

—শ্রীমদ্ভাগবত, দ্বাদশ স্কন্ধ, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২২শ ও ৩৩শ শ্লোক।

‘ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দেহ যখন স্বর্গে গিয়াছেন, তখনই কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছে। এই কলিযুগে লোক পাপপরত হইয়া থাকে।...যে দিন শ্রীকৃষ্ণ মর্ত্যধাম পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গিয়াছেন, সেই দিনে তখনই কলিযুগ দেখা দিয়াছে, পূর্ব পণ্ডিতেরা ইহা বলিয়া থাকেন।’

যস্মিন দিনে হরির্ধাতো দিবং সত্যজ্য মেদিনীম্। তস্মিন দিনেহবতীর্ণোহয়ং কালকায়ঃ কলিঃ কিল।

—ত্রৈলোক্যপুরাণ, দ্বাদশাধিক দিশততমোহধ্যায়, ৮৭শ শ্লোক।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে দিন মর্ত্যধাম পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করেন, এই কালকায় কলি সেই দিন হইতেই, তাঁহার স্বর্গ-গমনের সঙ্গে-সঙ্গেই, এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

‘নতে কৃষ্ণে বলিলয়ং আদৃত্বতো যথা কলিঃ।’—কলিপুরাণ, প্রথম অধ্যায়, ১৩শ শ্লোক।

‘ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বৈকুণ্ঠ-ধামে গমন করিলে, পৃথিবীতে কলির আকৃতিই হয়।’ ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, শ্রীকৃষ্ণ কুরু-পাণ্ডব-যুদ্ধে নেতৃপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন; অতঃ, তিনি মর্ত্যধাম পরিত্যাগ করিলে, কলিকাল প্রবৃত্ত হয়; সুতরাং কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ কলিকাল প্রবর্তনার পূর্বেই সংঘটিত হইয়াছিল,—তৎসম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে না। তাহা হইলে বুধিষ্ঠিরাদি, বুধিষ্ঠিরের রাজ্য-প্রাপ্তির পর, শেষ রাজত্ব-যজ্ঞের সময়, অথবা তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে প্রবর্তিত হইয়াছিল বলিয়াও মনে হইতে পারে। অতএব কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ, কলির

প্রারম্ভে, পাঁচ হাজার বৎসরের পূর্বে সংঘটিত হইয়াছিল,— তাহাতে কোনই সংশয় থাকিতে পারে না। বরং এ হিসাবে উহা আরও কিছু পূর্ববর্তী কালের ঘটনা বলিয়া মনে হয়। তার পর, মহাভারতে দেখিতে পাঠ,—যাপর ও কলির সন্ধিকালে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। সন্ধিকাল অর্থে—একের শেষ ও অস্ত্রের আরম্ভ। সে হিসাবে, যাপর যুগের শেষ বর্ষসমূহ এবং কলিযুগের প্রথম বর্ষসমূহ সন্ধিকাল মধ্যে গণ্য। একটা স্থল দৃষ্টান্তে এ বিষয়ের মীমাংসা হইতে পারে;—যেমন, দুর্যোৎসবের সন্ধি পূজা। ১৩১৫ সালে ১৭ই আশ্বিন শনিবার ৩২ দণ্ড ৪৭ পল অর্থাৎ রাত্রি ৭টা ২ মিনিট পর্যন্ত অষ্টমী তিথি ছিল; তৎপরে নবমী তিথি আরম্ভ হয়। এতদ্রুতয়ের সন্ধিকালে সন্ধি-পূজার ব্যবস্থা; কিন্তু পূজা আরম্ভ হয়—রাত্রি ৬টা ৩৮ মিনিটের সময়; অর্থাৎ, ২৪ মিনিট (এক দণ্ড) অষ্টমী থাকিতে। এইরূপ পূজা শেষ হয়—নবমীর এক দণ্ডের মধ্যে। সুতরাং এক তিথির শেষ এবং অল্প তিথির প্রথম যখন সন্ধিকাল হইল, তখন যাপরের ও কলির সন্ধিকাল অর্থে—মিশ্রচর্য্যই যাপরের শেষাংশ এবং কলির প্রথমাংশকে বুঝায়। বিশেষতঃ যখন দেখিতে পাঠ,—কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের মেরুদণ্ড-স্থানীয় শ্রীকৃষ্ণ কলি-প্রবর্তনার পূর্বেই অন্তর্হিত হন; তখন কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ যে যাপরের শেষ-ভাগেই সংঘটিত হইয়াছিল,—তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারেনা। এই স্থলে কেহ কেহ একটা আপত্তির কথা তুলিতে পারেন। মার্ত্ত রত্নন্দন আপন “তিথিতত্ত্ব” গ্রন্থে ব্রহ্মপুরাণ হইতে একটা ঘটন উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিথিতত্ত্ব গ্রন্থের সেই ঘটনটী এই,—

“অথ ভাদ্রপদে মাসি কৃষ্ণাষ্টম্যাং কলৌ যুগে । অষ্টাবিংশতিমে জাতঃ কৃষ্ণোহসৌ দেবকীমৃতঃ ।”

কেহ কেহ এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন,—“ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমীতে অষ্টাবিংশতিতম কলিযুগে দেবকীর পুত্র শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।” ব্রহ্মপুরাণোক্ত শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া, তর্কিকগণ বলেন,—যখন কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইল, তখন যাপরে তাঁহার উপস্থিতি কি প্রকারে সম্ভবপর? এই ব্রহ্মপুরাণোক্ত অপর শ্লোকে আবার দেখিয়াছি,—‘শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গারোহণের অবাবহিত পরেই কলির প্রবর্তনা হয়।’ তাহা হইলে, একই পুরাণের দুই শ্লোকে ঘোর অসামঞ্জস্য! কুরুদৈপায়ন বেদবাস কি এমনই পরম্পর-বিরোধী মত প্রকাশ করিবেন? অস্ত্রে বিশ্বাস করেন, করুন; কিন্তু শাস্ত্রদর্শী হিন্দু কোন-ক্রমেই তাহা বিশ্বাস করিতে পারেন না। তবে কেন এমন হইল? এমন হইল—প্রকৃত তাৎপর্য্যের অল্পসন্ধি নিবন্ধন। ব্রহ্মপুরাণোক্ত তিথিতত্ত্বোক্ত ঘটনের “কলৌ” শব্দের অর্থ অল্পরূপ। উহাতে বুঝা যায়,—“কলাবিত্তি নিমিত্ত সপ্তমী কলিপালঙ্কারার্থে আবির্ভূত।” এখানে “কলৌ” শব্দে নিমিত্তার্থে সপ্তমী হইয়াছে; অর্থ—কলি-পাপ-ধ্বংসার্থে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কলিকালে লোক পাপরত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ-মহাত্মা কীর্ত্তন-পূর্বক পাপহইতে মুক্তিসাধ করিবে,—এই নিমিত্তই তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বিতীর্ণতঃ,—“কেচিৎ তু কলৌ তাবিনী সতি ইত্যর্থমাতঃ।” কেহ কেহ আবার “কলি হইবে” (যাপর শেষে) এই অর্থেও “কলৌ” শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া থাকেন। তৃতীয়তঃ,—“বস্তুতঃ অষ্টাবিংশতিমে অষ্টাবিংশতিপুরণে এতদ্দ্য দিব্য সংখ্যার জ্ঞেয়ঃ”—এই অর্থও সিদ্ধ করেন। তাঁহারা বলেন,—শাস্ত্রমতে লৌকিক চক্ষু যুগে এক দিব্য-যুগ হয়। সে হিসাবে, দেবতাদিগের সপ্তবিংশ দিব্য-

যুগ অতীত হইয়া অষ্টাবিংশতি দিব্যযুগান্তর্গত কলিতে (লৌকিক যাপন যুগে) শ্রীকৃষ্ণ জন্ম গ্রহণ করেন; “অষ্টাবিংশতিমে কলৌ যুগে” শব্দদ্বয়ে সে অর্থও সঙ্গত হইতে পারে। ফলতঃ, এই ত্রিবিধ প্রকারে অর্বসম্বন্ধি দ্বারা অসামঞ্জস্য দূরীভূত হয়। স্মৃতরাং বুঝিয়া দেখুন,—বেদবাস্য কখনই পরম্পর-বিরোধী মত প্রকাশ করেন নাই। বিশেষতঃ, স্মার্ত রঘুনন্দন ব্রহ্মপুরাণের ঐ বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি তো উহার কোনও অর্থই করেন নাই। তবে কেন কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইয়াছিল মানিয়া লইব? তার পর, বৃহদ্রথ-পুরাণে ঐ একই শ্লোক রূপান্তরে দেখিতে পাই। তাহাতে কলির কোনই উল্লেখ নাই। পরন্তু বুঝা যায়,—ভাদ্রমাসের কৃক-পক্ষের অষ্টমী তিথিতেই শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইয়াছিল।

“অথ ভাদ্রপদে মাসি কৃকপাক্ষ্যষ্টমীত্বক্ । বড়ব কৃকঃ কৃকাক্ষ্যঃ কাছচাকচতুর্ভুজঃ ॥”

রঘুনন্দনোদ্ধৃত ব্রহ্মপুরাণের বচনের অন্তর্গত ‘কলৌযুগে’ শব্দের পরিবর্তে ‘ত্রেতাযুগে’ অথবা বৃহদ্রথ-পুরাণের ‘কৃকপাক্ষ্যষ্টমীত্বক্’ পাঠ নির্দিষ্ট করিয়াও কেহ কেহ পুরাণ-প্রবচন-সমূহের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া থাকেন। বাহ্য হউক, কলির পূর্বে, যাপনের শেষ ভাগে, শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যমান ছিলেন এবং তখনই কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল,—এই সকল বচন-পরম্পরার আলোচনায় তাহাই সপ্রমাণ হয়।

এই কাল-নির্ণয়-সম্বন্ধে যে কয়েকটি আপত্তির কথা আছে, এইবার তাহার আলোচনা করা যাউক। প্রথম কথা,—পুরাণাদিতে দেখিতে পাই, সপ্তর্ষিগণ যখন মঘা-নক্ষত্রে অবস্থিত ছিলেন, তখন যুধিষ্ঠির রাজ্য-শাসন করিতেন; সপ্তর্ষিগণ যখন মঘা-নক্ষত্রে আপত্তির কথা। অবস্থিত, তখন পরীক্ষিৎ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত; আবার সপ্তর্ষিগণ যখন পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্রে গমন করেন, তখন নন্দের অভিষেক হইয়াছিল।*

এহলে একটা ঘোর আপত্তির কথা উঠে। সে আপত্তি—“সপ্তর্ষি-মণ্ডল কতকগুলি স্থির নক্ষত্র; উহার বিলাতী নাম Great Bear (গ্রেট বিয়ার) বা Ursa Major (উরসা মেজর)। মঘা নক্ষত্র কতকগুলি স্থির তারা। সকলেই জানেন স্থির তারার গতি নাই। তবে বিষুবের একটু সামান্য গতি আছে,—ইংরেজ-জ্যোতির্বিদেয়া বলেন, Precession of the equinoxes (অয়ন চলন)। এই গতি হিন্দু মতে প্রতি বৎসর ৫৪ বিকলা। এক এক নক্ষত্রে ১৩ একের ভিন অংশ। এ হিসাবে কোনও স্থির তারার এক নক্ষত্র পরিভ্রমণ করিতে সহস্র বৎসর লাগে—শত বৎসর লাগে না। তাহা ছাড়া, সপ্তর্ষি মণ্ডল কখনও মঘা নক্ষত্রে থাকিতে পারে না। কারণ, মঘা নক্ষত্র সিংহ রাশিতে। দ্বাদশ রাশি—রাশি-চক্রের ভিতর। সপ্তর্ষি-মণ্ডল রাশি-চক্রের বাহিরে। যেমন ইংলণ্ড ভারতবর্ষে কখনও থাকিতে পারে না, তেমন সপ্তর্ষি মণ্ডল মঘা নক্ষত্রে থাকিতে পারে না।” এ সিদ্ধান্ত নানা কারণে মানিতে পারা যায় না। প্রথমতঃ, পুরাণকার বাহ্যকে সপ্তর্ষি বলিয়াছেন, তাহা Great Bear বা Ursa Major কি না,—কে বলিতে পারে! তার পর, পুরাণকার স্মৃতি করিয়া যখন বলিয়া দিয়াছেন,—“সপ্তর্ষিগণ যজুর্গদিগের পরিমাণে এক শত বৎসর

* এই গ্রন্থের ২৪৬শ ও ২৪৭শ পৃষ্ঠার বিষ্ণু পুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবতে দ্রুত যোক স্মৃতি।

এক এক নক্ষত্রে অবস্থিতি করেন; তখন আর সে সম্বন্ধে কোনও তর্কের কথাই উঠিতে পারে না। সপ্তর্ষির মধ্য নক্ষত্রে অবস্থান—সম্ভব হউক বা অসম্ভব হউক, যখন শত বর্ষ করিয়া এক এক নক্ষত্রে তাঁহাদের অবস্থিতির সময় স্পষ্টতঃ নির্দিষ্ট হইতেছে, তখন আর অবাস্তব আলোচনার প্রয়োজন কি? দ্বিতীয় কথা,—“তদা প্রবৃত্তস্ত কলি-দ্বাদশাব্দ শতাব্দকঃ”—এই বাক্যের অর্থে আধুনিক পণ্ডিতগণ নির্দেশ করেন,—‘ইহাতে বুঝা যাইতেছে, কলির দ্বাদশ শতাব্দী প্রবৃত্ত হইলে, পরীক্ষিৎ বিজয়মান ছিলেন।’ এতদ্বারা তাঁহারা প্রমাণ করিবার চেষ্টা পান,—অভিমত্যা-পুত্র পরীক্ষিৎ কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই যখন জন্মগ্রহণ করেন। এবং তিনি যখন কলির দ্বাদশ শতাব্দীতে বিজয়মান ছিলেন, তখন তাঁহার জন্মের অর্থাৎ কলির দ্বাদশ শতাব্দীর অব্যবহিত পূর্বেই কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ সংঘটিত হওয়া সম্ভবপর। এক্ষণ অর্থও মানিয়া লইতে হইলে, আবার পুরাণকারের পরস্পর-বিরোধী মতের অবতারণা করা হয়। সুতরাং এখানেও অর্থান্তর ঘটয়াছে বলিয়া মনে হইতে পারে। ভাগবতের ঢীকার ত্রীধর স্বামীও তাহাই নির্দেশ করিয়াছেন। এই “দ্বাদশাব্দশতাব্দকঃ” শব্দের ঢীকায় তিনি লিখিয়াছেন,—“দ্বাদশাব্দশতাব্দক ইতি। দিব্যেন মানেন সঙ্খ্যাসঙ্খ্যাংশভ্যাং সহ যে দ্বাদশাব্দশতাব্দকঃ স কলিস্তদা সঙ্খ্যামতিক্রমা প্রবিষ্ট ইত্যর্থঃ।” অর্থাৎ ‘সঙ্খ্যা ও সঙ্খ্যাংশ-সমেত কলি-যুগের পরিমাণ—দেবতাদিগের পরিমাণে দ্বাদশ শত বৎসর।’ তাহা হইলে, দিব্য-পরিমাণের দ্বাদশ-শতাব্দ-যুক্ত কলি পরীক্ষিতের শাসন-সময়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। পরীক্ষিতের শাসন-সময়েই যে কলির আবির্ভাব হয়, তাহারও প্রমাণ শাস্ত্রে ভূয়োভূয়ঃ বিজয়মান। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে, সপ্তদশ অধ্যায়ে, পরীক্ষিৎ কলিকে বলিতেছেন,—

“যস্মৈ কৃষ্ণে গতে দ্বয়ং সহ গাভীবধন। শোচ্যোহস্যশোচ্যান্ রহসি প্রহরণ বধমহসি।”

‘ত্রীকক্ষ এবং গাভীব-বধা অর্জুন ইহ-সংসার পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়াই কি তুমি নিরপরাধ প্রাণীর প্রতি হিংসা করিতে সাহসী হইয়াছিস।’ সর্ব-সামঞ্জস্ত বিধান করিতে হইলে, “কলি-দ্বাদশাব্দশতাব্দকঃ” শব্দ-সমূহের ত্রীধরস্বামিকৃত ব্যাখ্যাই ঠিক বলিয়া মনে হয় না কি? তার পর, ‘কলি-দ্বাদশাব্দশতাব্দকঃ’ পর্য্যন্ত শব্দে কলির দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত পরীক্ষিতের বিজয়মানতা যদি স্বীকার করিতে হয়, তাহাতেই বা আপত্তি কি? তিনি দ্বাদশ শত বৎসর জীবিত ছিলেন,—ইহাও ভো মনে হইতে পারে! আরও আমরা দেখিতে পাই,—একাধিক নন্দ একই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; এবং নন্দ-নামে বহু নৃপতি প্রতিষ্ঠাবিত হইয়াছিলেন। নন্দ-নামে গুত্তরাষ্ট্রের এক পুত্র ছিল; বসুদেবের এক পুত্রও নন্দ-নামে অভিহিত হইতেন। গোপরাজ নন্দের পরিচর—কে না অবগত আছেন? রাজা শুক্লোদনেরও এক পুত্রের নাম নন্দ ছিল; তিনি গৌতম-বুদ্ধের বৈমাত্র ভ্রাতা। নন্দ-নামে নর জন বিখ্যাত নৃপতি পাটলিপুত্রের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মহাপদ্মনন্দকে মহানন্দীর পুত্র বলিয়া জৈন ও বৌদ্ধ-গ্রন্থকারগণ স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন,—দিবাকীর্তির ঔরসে গণিকার গর্ভে নন্দের জন্ম হয়। রাজা উদায়ীর হত্যার পর, ৪৬৪ পূর্ব-খ্রীষ্টাব্দে, সেই নন্দ রাজা হইয়াছিলেন। আপন

আচার্যের কস্তার সহিত তাঁহার বিবাহ হয় ; বিবাহের শোভাযাত্রার সময় রাজচন্দ্র তাঁহাকে কক্ষে তুলিয়া লইয়াছিল বলিয়া তিনি রাজ্যপাট প্রাপ্ত হন । এই নন্দের বংশে লাভ জন নন্দ জনপ্রহরণ করিয়াছিলেন । পর্য্যায়ক্রমে তাঁহার্য রাজ্য হইয়াছিলেন । গ্রহান্তরে আবার প্রকাশ,—বৃদ্ধদেবের নির্মাণ-লাভের এক শত বৎসর পরে কালাশোকের যুগ্য হয় । তাঁহার নয় পুত্র তখন রাজ্য করেন । তাহাদের গৃহ-বিবাদে রাজ্যে অরাজকতা উপস্থিত হয় । সেই সময়ে দশ্যামলপতি নন্দ সিংহাসন লাভ করেন । বহু দিন তিনি রাজত্ব করিয়াছিলেন, তৎপরে তাঁহার ভ্রাতৃগণ ২৮ বৎসর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন । অবশেষে নবম নন্দ রাজ্য পান । তাঁহার নাম—ধননন্দ । তিনি চাণক্য কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন । সন্ধান করিলে, এইরূপ আরও কত নন্দের পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে ।

শ্রুতরাং পরীক্ষিতের জন্ম-কাল হইতে কোন্ নন্দের অভিষেক-কালের উল্লেখ হইয়াছে, সে বিষয়ে ঘোর সংশয় বিস্ত্রমান । বংশ-তালিকার আলোচনায় আমরা দেখিতে পাই, সকল পুরাণে সকল বংশের সকল ব্যক্তির নাম উল্লিখিত হয় নাই । শ্রুতরাং মহাপদ্মনামক নন্দের পূর্বে, পূর্ববর্তী অপর নন্দের অভিষেকের বিষয় উহাতে যে বৃকায় না, তাহাই বা কি প্রকারে বলিতে পারি ? হইতে পারে, পরীক্ষিত দ্বাদশ শত বৎসর জীবিত ছিলেন ; না হয়,—মহাপদ্মনন্দের পূর্ববর্তী-কালে অল্প নন্দের আবির্ভাব হইয়াছিল । এরূপ সিদ্ধান্ত ভিন্ন, অল্প কোনও প্রকারেই পুরাণ-প্রবচন-পরম্পরার সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায় না । তার পর, শ্লোক-সমূহের পাঠ্যগত এবং অর্থগত পার্থক্যের বিষয় আলোচনা করিলেও দেখা যায়,—পরবর্তী-কালে লিপিকার-প্রমাদ-হেতু পাঠের অনেক রূপান্তর ঘটিয়াছে । বিষ্ণু-পুরাণ ও ভাগবত প্রভৃতির শ্লোক মিলাইয়া দেখিলে এ কথা সার্বকথা প্রতিপন্ন হয় । কোথাও আছে,—“এতদ্বর্ষ সহস্রন্ত জেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্” ; কোথাও আছে—“এতদ্বর্ষ সহস্রন্ত শতং পঞ্চদশোত্তরম্” । এই দুই পাঠান্তরে পাঁচ শত বৎসরের তফাৎ হইয়া যায় । ফলে, যত গণগোল—নন্দের অভিষেক-কাল লইয়া । এ সম্বন্ধে ত্রিবিধ বিপত্তি উপস্থিত ;—

(১) শ্লোকের পাঠান্তর, (২) শ্লোকের অর্থান্তর, (৩) নন্দের পরিচয় । বিষ্ণু-পুরাণের পাঠ,—“এতদ্বর্ষ সহস্রন্ত জেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্” ; ভাগবতের পাঠ,—“এতদ্বর্ষ সহস্রন্ত শতং পঞ্চদশোত্তরম্” । দুই পাঠের কখনই এক অর্থ হইতে পারে না । শ্রুতরাং, ইহার একটিকে অবলম্বি লিপিকার-প্রমাদ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে । অর্থও—প্রচলিত অনুবাদ-গ্রন্থ-সমূহে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার দৃষ্ট হয় । “এতদ্বর্ষ সহস্রন্ত শতং পঞ্চদশোত্তরম্”—ইহার অর্থ, কেহ করিয়াছেন—এক হাজার পনের বৎসর ; কেহ করিয়াছেন—এক হাজার এক শত পঞ্চদশ বৎসর ; কেহ করিয়াছেন,—এক হাজার পাঁচ শত দশ বৎসর ! আবার সম্ভাব্যগণ শত বৎসরে এক লক্ষেরে গমন করেন,—এ হিসাবে, ব্যবধান এক হাজার বৎসরের মধ্যে হওয়াই সম্ভবপর । কারণ, যথা হইতে পূর্বাঘাটা নয়টী লক্ষ্যের ব্যবধান ; যথা তইতে পূর্বাঘাটা একাদশ স্থানে অবস্থিত । তাহাতে বরং ‘এক হাজার পনের বৎসর’—এই অর্থ উপলব্ধি হইতে পারে ; কিন্তু এগার শত বা পনের শত বৎসর অর্থ কখনই হইতে পারে না । তাহা হইলে, পরীক্ষিতের জন্মের এবং নন্দের অভিষেকের ব্যবধান-কাল কখনই সহস্র বৎসরের অধিক

হয় না। তাহা হইলে, নিশ্চয়ই মহাপদ্মা নন্দের পূর্বে অপর কোনও নন্দ রাজা হইয়াছিলেন, বুঝিতে পারা যায়। বিশেষতঃ, পরীক্ষিত হইতে যে নন্দের ব্যবধান-কাল সহস্রাধিক বৎসর, তিনি যে মগধাধিপতি নন্দ, তাহারও কোনও উল্লেখ নাই। অপিচ, “নবনন্দান্” শব্দে মগধের নন্দকে ‘নূতন নন্দ’ বলিয়াই বা না বুঝিব কেন? উহাতে পূর্বে এক জন নন্দ ছিলেন, আর পরে নূতন এক জন নন্দ হইলেন—এই অর্থ-সঙ্গতিও হইতে পারে না কি? শ্রীধরস্বামী যদিও টীকায় “নবনন্দান” শব্দের—“নবনন্দান্ নন্দঃ তৎ পুত্রাংশ্চৈত্যেব্যং নব”—এইরূপ অর্থ করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু ‘নব’ শব্দের ‘নূতন’ অর্থও কোনও কোনও গণ্ডিত করিয়া থাকেন। ফলতঃ, পরীক্ষিতের জন্মের সহিত নন্দাভিষেক-কালের ব্যবধান সহস্রাধিক বৎসর ধরিতে হইলে, মগধবংশীয় মহাপদ্মা নন্দ ভিন্ন তৎপূর্ববর্তী অপর এক জন নন্দের অস্তিত্ব ও বিদ্যমানতা স্বীকার করিতে হইবেই হইবে। যদি মহাপদ্মা নন্দকেই নন্দ বলিয়া মানিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে আর একটা কথা মনে আসিতে পারে। শ্লোক-সমূহের আলোচনায় দেখিতে পাই,—পরীক্ষিতের শাসন-সময়ে সপ্তার্ধগণ মগধানক্ষত্রে অধিষ্ঠিত ছিলেন; এবং নন্দের রাজ্যকালে তাঁহারা পূর্বাঘাটা নক্ষত্রে বিরাজ করিতেছিলেন। ইহাতে মগা নক্ষত্রের অবাবহিত পরবর্তী পূর্বাঘাটা নক্ষত্রও না বুঝাইতে পারে। পরীক্ষিতের রাজ্যকালে যে মগা নক্ষত্রে সপ্তার্ধগণ অবস্থিত ছিলেন, তাঁহারা যুরিয়া ফিরিয়া আবার সেই মগা নক্ষত্রে আসিয়াছিলেন; এবং তাহার পর তাঁহারা যখন পূর্বাঘাটায় গিয়াছিলেন, সেই সময়ে নন্দের রাজ্যাভিষেক হইয়াছিল। তাহা হইলে পরীক্ষিতের জন্ম হইতে নন্দের অভিষেক-কালের ব্যবধান—প্রায় তিন হাজার সাত শত বা আট শত বৎসরে দাঁড়াইতে পারে। যদি তাহাই হয়, সকল পুরাণের মধ্যে অনেকটা সামঞ্জস্য সম্ভবপর। তাহা হইলে, ঝাপরের শেষ ভাগে, কলির সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল—সপ্রমাণ হয়। কিন্তু এরূপ অর্থ করিতে গেলে, “এতদ্বর্ষ সহস্রস্ত শতং (জ্যেং) পঞ্চদশোত্তরম্”—এই বাক্যের সহিত ঘোর অসামঞ্জস্য হইয়া পড়ে। সুতরাং নন্দকে অপর নন্দ বলা ভিন্ন গতান্তর দেখিতে পাই না। পরন্তু এরূপ ক্ষেত্রেও “এতদ্বর্ষ সহস্রস্ত শতং পঞ্চদশোত্তরম্” পাঠান্তরের অবতারণা করিয়া, কেহ কেহ পরীক্ষিতের জন্ম হইতে নন্দের অভিষেক-কালের ব্যবধান—আড়াই হাজার বৎসর নির্দেশ করিয়া থাকেন। সে হিসাবেও অনেকটা সামঞ্জস্য রক্ষা হইতে পারে। ফলতঃ, হয় পাঠান্তর ঘটিয়াছে; নয়, মহাপদ্মা নন্দ ভিন্ন অন্য নন্দের সহিত কাল-ব্যবধান উল্লিখিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতিরেক একটা সিদ্ধান্ত না মানিলে, কোনও মতেই শাস্ত্র-বাক্যের সামঞ্জস্য রক্ষা হয় না। উপসংহারে—রাজতরঙ্গিণীর সিদ্ধান্ত। রাজতরঙ্গিণীকার বলেন,—“কলির ছয় শত তিগ্নায় বৎসর গত হইলে, কুরু-পাণ্ডবগণ প্রোদ্ধূত হন, এবং কাশ্মীর-রাজ গোনর্দ, যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক।” বলা বাহুল্য, রাজতরঙ্গিণী আলোড়ন করিলেই এ সিদ্ধান্তের অযৌক্তিকতা উপলব্ধি হইতে পারে। প্রথমতঃ, কল্যাণ মিশ্র যখন ‘রাজতরঙ্গিণী’ প্রণয়ন করেন, তখনও প্রচার ছিল,—ভারত-যুদ্ধ ঝাপরাস্ত্রে সংঘটিত হয়; তখনও কেহ কেহ হিসাব করিতেন,—কুরু-পাণ্ডবের সময় হইতে ৫২ জন রূপতি ২২৬৮ বৎসর

কাল রাজত্ব করিলে, তৃতীয় গোনর্দ কাশ্মীরের সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু রাজতরঙ্গিনী-প্রণেতা ঐ প্রচলিত-মতের প্রতিবাদ করিতে গিয়া, যত গভগোল বাধাইয়া বলিয়াছেন। রাজতরঙ্গিনীর প্রথম তরঙ্গ পাঠ করিলে, তাঁহার ভ্রম সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে। রাজতরঙ্গিনীতেই লিখিত আছে,—“পঞ্চত্রিংশৎ রাজানঃ যঃ বিশ্বতি-সাগরে। তদ্রাজ্যে গত বর্ষাণি ১২৬৬।” অর্থাৎ, পঁয়ত্রিশ জন রাজার নাম বিশ্বতি-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছে এবং তাঁহাদের রাজ্যকাল—১২৬৬ বৎসর। অথচ, পঁয়ত্রিশ জনের স্থলে রাজতরঙ্গিনীকার ৫২ জন নৃপতির রাজত্বকাল—১২৬৬ বৎসর নির্দেশ করিয়াছেন। প্রচলিত মত অনুসারে ঐ ৫২ জনের রাজ্যভোগ-কাল—২২৬৮ বৎসর হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু তাহা না করিয়া, তিনি ১২৬৫ বৎসর ধরিয়াছেন। তাঁহার এই ভ্রমের প্রতি দৃষ্টি পড়িলে, যুধিষ্ঠিরাদির কাল-নির্ণয়ে কোনই গোল থাকিতে পারে না। হইতে পারে, গোনর্দ যুধিষ্ঠিরাদির সমসাময়িক; কিন্তু কলির ৬৫৩ বৎসরে তাঁহার বিজ্ঞমানতায় সংশয়াযুক্ত হইতে হয়। আর এক কথা, কাশ্মীরের প্রকৃত ইতিহাস গোনর্দের শাসন-কালে আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া বুঝা যায়; গোনর্দের পূর্ববর্তী-কালের কোনই পরিচয় রাজতরঙ্গিনীতে নাই। রাজতরঙ্গিনীকার গোনর্দকেই আদি বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। সকল দেশের সকল ইতিহাসই আদি-নির্ণয়ে অল্পমানের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। অল্পমান সকল স্থলে অশ্রাস্ত নহে। গোনর্দের কাল-নির্ণয়ে রাজতরঙ্গিনীকারের সিদ্ধান্তও অশ্রাস্ত বলিয়া স্বীকার করা যায় না। বিশেষতঃ, বর্ণনার মধ্যে যখন মতবৈধ ঘটিয়াছে, তখন কি করিয়াই বা তাঁহার সিদ্ধান্ত অশ্রাস্ত বলিতে পারি? তার পর গোনর্দ যদি যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক প্রবল-পরাক্রান্ত নৃপতি হইতেন এবং শ্রীকৃষ্ণের হস্তে তাঁহার সংহার-সাধন হইত, তাহা হইলে মহাভারতে ও পুরাণাদিতে কোনও-না-কোনও প্রসঙ্গে নিশ্চয়ই গোনর্দের নাম দোষিতে পাইতাম। যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ-যজ্ঞে সকল দেশের সকল নৃপতিই উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু কাশ্মীরাদিপতি গোনর্দের নামমাত্রও সে স্থলে উল্লেখ হয় নাই। সুতরাং গোনর্দ যে যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক এবং শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন,—তাহা কোনক্রমেই স্বীকার করিতে পারি না। উপসংহারে বল্য়,—পুরাণাদিতে যে সকল ভবিষ্যদ্বক্তা আছে, অনেকে তাহাকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করেন। বাঁহারা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই পরীক্ষিতের রাজত্ব-কাল হইতে নন্দের অভ্যুদয়-কাল লইয়া বিচার-বিতণ্ডার প্রয়োজন-অনুভব করিবেন না। প্রক্ষিপ্ত বা পরবার্তা-কালের সংযোজন হইলে, বলিতে হয়—পুরাণের সহিত তাহার সঙ্গ নাই। যে চন্দ্রগুপ্ত, যে আলেকজান্ডার বা যে নন্দ লইয়া বিচার-বিতণ্ডা, তাঁহাদের সঙ্গকেই কত নতাস্তর দেখিতে পাই। কেহ বলেন,—চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে আলেকজান্ডার ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন; কেহ বলেন,—চন্দ্রগুপ্তের সহায়তায় তিনি নন্দকে পরাজিত করিয়াছিলেন; কেহ বলেন,—আলেকজান্ডারের সেনাপতি সেলিউকসকে চন্দ্রগুপ্ত ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত করেন। কেহ বলেন,—আলেকজান্ডার ৩২৫ পূর্ব-খৃষ্টাব্দে ভারতে আসিয়াছিলেন; কেহ বলেন,—আলেকজান্ডার

৩২৭ পূর্ব-খৃষ্টাব্দে ভারতে আসিয়াছিলেন। কেহ বলেন,—৩১২ পূর্ব-খৃষ্টাব্দে চন্দ্রগুপ্ত রাজ-সিংহাসন লাভ করেন; কেহ বলেন,—৩১৫ পূর্ব-খৃষ্টাব্দে চন্দ্রগুপ্ত রাজ্যভার প্রাপ্ত হন। যে বিষয়টী বিচার্যের মূল ঘটনা, সেই সম্বন্ধেই এতাদৃশ মতবৈধ রহিয়া গিয়াছে। সুতরাং তাহার কত সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বের কুরুক্ষেত্র-সমর সম্বন্ধে যে মতান্তর ঘটিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ফলতঃ, দুই মত এখন প্রচলিত। এক পক্ষ বলেন,—কলির কয়েক শতাব্দী গত হইলে, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল; অপর পক্ষ বলেন,—ঊষ্মকির শেষ-ভাগে কুরু-পাণ্ডবের মহাসমর সংঘটিত হয়। আমরা সকল পক্ষের সকল মতই যথাশাধ্য আলোচনা করিয়াছি। যে বিষয়ে আমাদের যাহা বক্তব্য, তাহাও বলিবার চেষ্টা পাইয়াছি। যিনি যে মতেই আস্তা স্থাপন করুন না কেন, পৃথিবীর অগাঢ় জাতির গৌরব-গরিমা-প্রতিষ্ঠার অনেক পূর্বে কুরু-পাণ্ডবের অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। রামায়ণাদির প্রাচীনত্ব, সে হিসাবে, আরও কত দূরবর্তী—সহজেই অনুমিত হয়। *

হরিবংশ—মহাভারতের পরিশিষ্ট বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু মহাভারতের পরবর্তী ঘটনাবলীই যে ইহাতে লিখিত হইয়াছে, তাহা নহে। হরিবংশে প্রধানতঃ শ্রীকৃষ্ণের জীবন-কথা পরিবর্ণিত রহিয়াছে। প্রসঙ্গতঃ, কুরুবংশ, যদুবংশ, ইক্ষ্বাকু-বংশ ও হরিবংশ। আয়ুবংশ প্রভৃতির বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। কৃষ্ণ-বলরামের বাল্যজীবন—ব্রজলীলা, নাপুত্র-কংসাদিবধ এবং দ্বারকা-গমন বৃত্তান্ত—হরিবংশের প্রধান আলোচ্য। শ্রীকৃষ্ণের সহিত দৈত্য ও অসুরগণের যুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ, দ্বারকায় পুরী নিষ্কাশ, শ্রীকৃষ্ণের প্রধানা মহিষীগণ, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নানা দেশ পরিভ্রমণ প্রভৃতির বিবরণ হরিবংশে দেখিতে পাওয়া যায়। হরিবংশে কি কি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, উহার অষ্টপঞ্চাশদধিক দ্বিগুণতম অধ্যায়ে তাহার নির্ধট দেখিতে পাই। উদ্ভূত ভবিষ্য-পর্ক নামে হরিবংশে একোনষষ্ঠি তম অধ্যায় আছে। সে অধ্যায় কয়টী সকল পুঁথিতে পাওয়া যায় না; নালকর্ত্ত ও তাহার টীকা করিয়া যান নাই; সুতরাং কেহ কেহ ঐ অংশকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করেন। হরিবংশ বেদবাস্যের রচিত বলিয়া পরিচিত। কিন্তু ইহার প্রথম অধ্যায়ে, সৌনকাদি ঋষির প্রেরে, উগ্রশ্রবা সৌতি এষ্ট হরিবংশ পুরাণ বর্ণন করিতেছেন, লিখিত আছে। তাহাতে স্পষ্টতঃ উক্ত হইয়াছে,—“বাসদেবের শিষ্য ধর্ম্মজ্ঞ বৈশম্পায়নকে জনমেজয় নৃপতি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমি আপনার নিকট সেই বৃষ্ণিগণের জন্ম-বিবরণ প্রথম হইতেই কহিতেছি।” তবেই বুঝা যায়,—জনমেজয়ের সর্পসন্ধে যাহা পাঠিত হইয়াছিল, পরবর্তী-কালে উগ্রশ্রবা সৌতি, শৌনক প্রভৃতি ঋষিদিগের নিকট যাহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, হরিবংশে তাহাই লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। বিশেষতঃ, এই হরিবংশের প্রথমেই দেখিতে পাই, পুরাণকার বলিতেছেন,—“যাহাকে পিতামহ হইতে বর্জ্য কহে, যিনি অক্ষয় বিভূতিযুক্ত মহর্ষি এবং নারায়ণের অংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, একমাত্র শুকদেব

অতীত ও এতদ্বিষয় আলোচিত হইবে; নির্ধটানুসরণে তাহা স্ফটক্য।

যাহার পুত্র, সেই দ্বৈপায়নকে আমি ব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞান করি।” স্বয়ং বেদব্যাস যদি এই গ্রন্থের রচয়িতা হইতেন, এরূপভাবে আত্ম-পরিচয় প্রদান করিতেন কি? সুতরাং পুরাণাদির রচনা-সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, হরিবংশ-রচনা সম্বন্ধেও প্রথমতঃ তাহাই বলিতে পারা যায়; অর্থাৎ; বেদব্যাস যাহা বলিয়া গিয়াছিলেন, তাহা অবলম্বন করিয়া পরবর্ত্তিকালে এই হরিবংশ লিপিবদ্ধ হইয়াছিল।

পূর্বেও বলিয়াছি, উপসংহারেও বলিতেছি,—অল্প কোনও দেশের কোনও ভাষায় মহাভারতের সম্যকক গ্রন্থ দ্বিতীয় নাই। রামায়ণ ও মহাভারতের তুলনায় কেহ কেহ পাশ্চাত্য-দেশের হোমারের ‘ইলিয়ড’ এবং ভার্জিলের ‘ইনিড’ প্রভৃতির উপসংহার। নাম উল্লেখ করেন। কিন্তু সে তুলনা—তুলনাই নয়! প্রথমতঃ,

আকারের পরিমাণ যদি তুলনা করিতে যাই, দেখিতে পাই,—মহাভারতে অল্পমাত্র দুই লক্ষ বিংশসহস্র পংক্তি এবং রামায়ণে অল্পমাত্র অষ্টচত্বাধিশং সহস্র পংক্তি বিদ্যমান। কিন্তু হোমারের ‘ইলিয়ড’ পনের সহস্র ছয় শত তিরানব্বইটি এবং ভার্জিলের ‘ইনিড’ নয় সহস্র আট শত আটষট্টিটি মাত্র পংক্তি বিদ্যমান। ‘ইলিয়ড’ ও ‘ভার্জিস’—এই উভয় গ্রন্থের পংক্তি-সংখ্যা একত্র করিলেও ত্রিশ সহস্রের অধিক হয় না। আকারে এই; বিষয়ের গুরুত্বও যে আরও কত অধিক, তাহা কি বলিব? যে কোনও সমাজের, যে কোনও ধর্মের, যে কোনও নীতির যদি মূল তত্ত্ব অল্পসংখ্যক করিতে চান, মহাভারতে তাহা খুঁজিয়া পাইবেন। বিশাল মহাভারত গ্রন্থের এক একটী অংশ লইয়াই কত পণ্ডিতের মস্তিষ্ক কত প্রকারে বিবৃণিত হইয়াছে! মহাভারতের চীকাকারগণের মধ্যে বৈশম্পায়ন, নীলবট, অর্জুন মিশ্র, চতুর্ভূজ মিশ্র, জনার্দন ভট্ট, শ্রীনিবাস আচার্য্য, আনন্দপূর্ণ মুনি বিজ্ঞানাগর প্রভৃতি সবিশেষ প্রসিদ্ধ। স্বয়ং শঙ্করাচার্য্য মহাভারতের অন্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার চীকা করিয়াছেন; শ্রীধরস্বামী, রামানুজ, বল্লাভাচার্য্য, মাধবাচার্য্য, বলদেব বিদ্যাসুত, আনন্দতীর্থ, বিজ্ঞানভিষ্ম, দত্তাত্রেয়,—কত নাম করিব?—গীতার ভাষ্যকার ও চীকাকার অসংখ্য। পাশ্চাত্য-দেশে গ্রীক-ভাষায় ‘প্যালেমাস ডোমাজিয়াস’ প্রথমে গীতার অম্ববাদ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়। কাশীতে আসিয়া, সংস্কৃত-ভাষা শিখিয়া, তিনি গীতার অম্ববাদ করিয়াছিলেন। কাশীতেই তাঁহার লোকান্তর হয়; তৎপরে তাঁহার অম্ববাদিত গ্রন্থ তাঁহার এক বন্ধু এবেলো লইয়া পিয়া মুদ্রিত করিয়াছিলেন। ইংরেজের মধ্যে চার্লস উইলকিন্স ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে গীতার অম্ববাদ করেন। সেই গীতা, ওয়ারেন হেষ্টিংসের উদ্যোগে, ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। প্রসিদ্ধ জন্মণ পাণ্ডিত প্রজেক্স ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে লাতিন-ভাষায় গীতার অম্ববাদ প্রকাশ করেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে এক্ষণে পৃথিবীর প্রায় সকল ভাষায় গীতার অম্ববাদ প্রকাশিত হইয়াছে। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে, তাঁহারই আদেশ অনুসারে, পারস্য-ভাষায় মহাভারতের অম্ববাদ হয়। কত বলিব? মহাভারতের মহিয়ার কি অল্প আছে? মহাভারতের যাহা-প্রসঙ্গে মহাভারতকার সত্যই বলিয়া গিয়াছেন,—

“যথা সমুদ্র ভগবান যথাহি হিমবান্ গিরিঃ। যাতা বুভোরহনিবী তথা ভারতবৃন্দাভো।”

পূর্বেবর্ণ্য্যশালী সমুদ্র ও হিমবান্ শৈল যেমন রত্ননিধি বলিয়া বিখ্যাত, ভারতও তদ্রূপ।

একবিংশ পরিচ্ছেদ ।

সূর্যবংশ ।

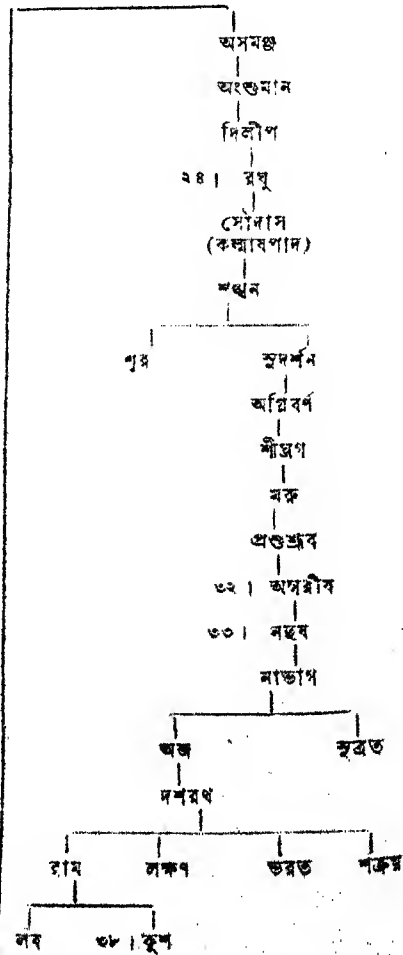
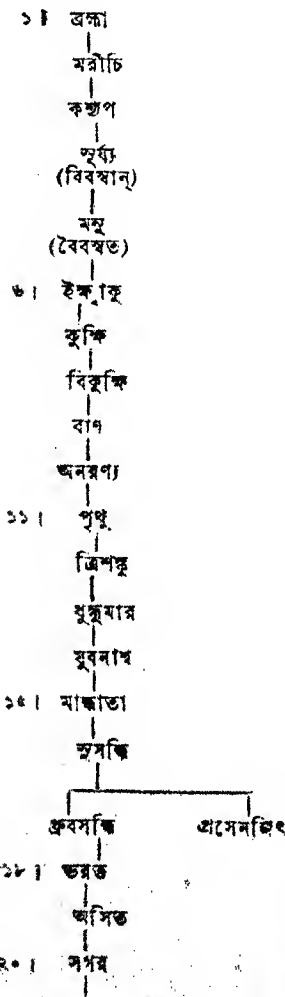
শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করিলে, দেখিতে পাই,—প্রাচীন কালে দুইটী প্রধান রাজবংশ ভারতবর্ষের শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন । সেই দুই রাজবংশের নাম—সূর্য্যবংশ ও চন্দ্রবংশ । রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণাদি গ্রন্থে সেই সূর্য্যবংশ ও চন্দ্রবংশের বিবরণ পরিবর্ণিত আছে । সূর্য্যবংশ ও চন্দ্রবংশ হইতে যে সকল শাখা-প্রশাখা দেশে বিদেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, পুরাণাদিতে তাহারও আভাস পাওয়া যায় । তবে স্থূল দৃষ্টিতে দেখিলে, রামায়ণে, মহাভারতে এবং পুরাণ-পরম্পরায় লিখিত বংশ-তালিকার মধ্যে অনেকস্থলে অমিল দেখিয়া অনেকে আশ্চর্য্যাবিত হইতে পারেন । কোনও পুরাণে পুরুষবার পাঁচপুত্র, কোন পুরাণে আট পুত্র, কোন পুরাণে সাত পুত্রের বিবরণ লিখিত আছে । কোনও পুরাণে জহ্নুর পুত্র সূজহ্নু, কোনও পুরাণে জহ্নুর পুত্র পুরু, কোনও পুরাণে জহ্নুর পুত্র সুনহ দৃষ্ট হয় । সাধারণ দৃষ্টিতে দেখিতে, এ সকল বড়ই বিসদৃশ বলিয়া মনে হয় না কি ? কিন্তু বাস্তব ইহার কারণ—অন্তরূপ । প্রথমতঃ,—কত কোটী কল্প কালের কত কোটী কল্প লোকের কত জনের পরিচয় সম্ভবপর ? সম্ভবপর নহে বলিয়াই পুরাণকার আবশ্যকানুসারে বিশেষ বিশেষ বংশের বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিগণের নামোল্লেখ করিয়া গিয়াছেন । তাই দেখিতে পাই,—কোথাও ‘পুত্র’ বলিয়া উল্লেখ আছে, কোথাও ‘বংশসম্ভূত’ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে । যেখানে “অনমিত্রৈস্যেবায়ৈ পুণি তস্মাচ্চক্ষকঃ” এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হয়, সেখানে অনামিত্রের বংশে পুণি জন্মগ্রহণ করেন এবং পুণির পুত্র ক্ষক ইহাই বুঝিতে পারা যায় । দ্বিতীয়তঃ,—লিপিকার-প্রমাদ বশেও অনেক নামের পাঠান্তর ঘটিয়াছে । পুরুষবার এক পুত্রের নাম—কোনও গ্রন্থে ‘শতাবু’ আছে, কোনও গ্রন্থে ‘সত্যাবু’ আছে ; আর এক পুত্রের নাম—কোনও গ্রন্থে ‘রয়’ আছে, কোনও গ্রন্থে ‘বয়’ আছে । জহ্নুর পুত্রের নাম—কোনও গ্রন্থে সূজহ্নু, কোনও গ্রন্থে সুনহ দৃষ্ট হয় । এরূপ নামান্তর হওয়ার কারণ—লিপিকার-প্রমাদ ভিন্ন অথ আর কি বলিতে পারি ? যাহা হউক, প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের নাম-সম্বন্ধে কিন্তু প্রায়ই অটনৈক্য দেখা যায় না । দশরথের পুত্রের নাম রামচন্দ্র কিংবা পাণ্ডুপুত্র মুদিত্তির,—এরূপ প্রসিদ্ধ বাক্যে কোথাও অসামঞ্জস্য নাই । আমরা রামায়ণ, মহাভারত এবং অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও উপপুরাণ সমূহ আলোড়ন করিয়া, সকল পুরাণের বংশপর্যায় প্রকাশ করিতেছি । তৎসমুদায় মিলাইয়া দেখিলে, যদিও স্থানে স্থানে পার্থক্য দৃষ্ট হইবে, কিন্তু মূল বিবরণ সম্বন্ধে কখনই মতান্তর ঘটিবে না, পরন্তু বংশ-তালিকার সঙ্গে সঙ্গে তদ্বিলিখিত প্রধান প্রধান রাজত্ব-বর্ণের পরিচয় আপনিই অধিগত হইবে ।

প্রথমে সূর্য্যবংশের বিবরণ প্রকাশ করিতেছি। এই সূর্য্যবংশে—ইন্দ্রাকু, পুরুষবা, পুণ্ড্র, মাজ্জাতা, সগর, ভরত, দিলীপ, কুরুৎস, রঘু, শ্রীরাম, কুশ, নিমি, অশ্বরীষ, প্রভৃতি বহু প্রাণীঃ

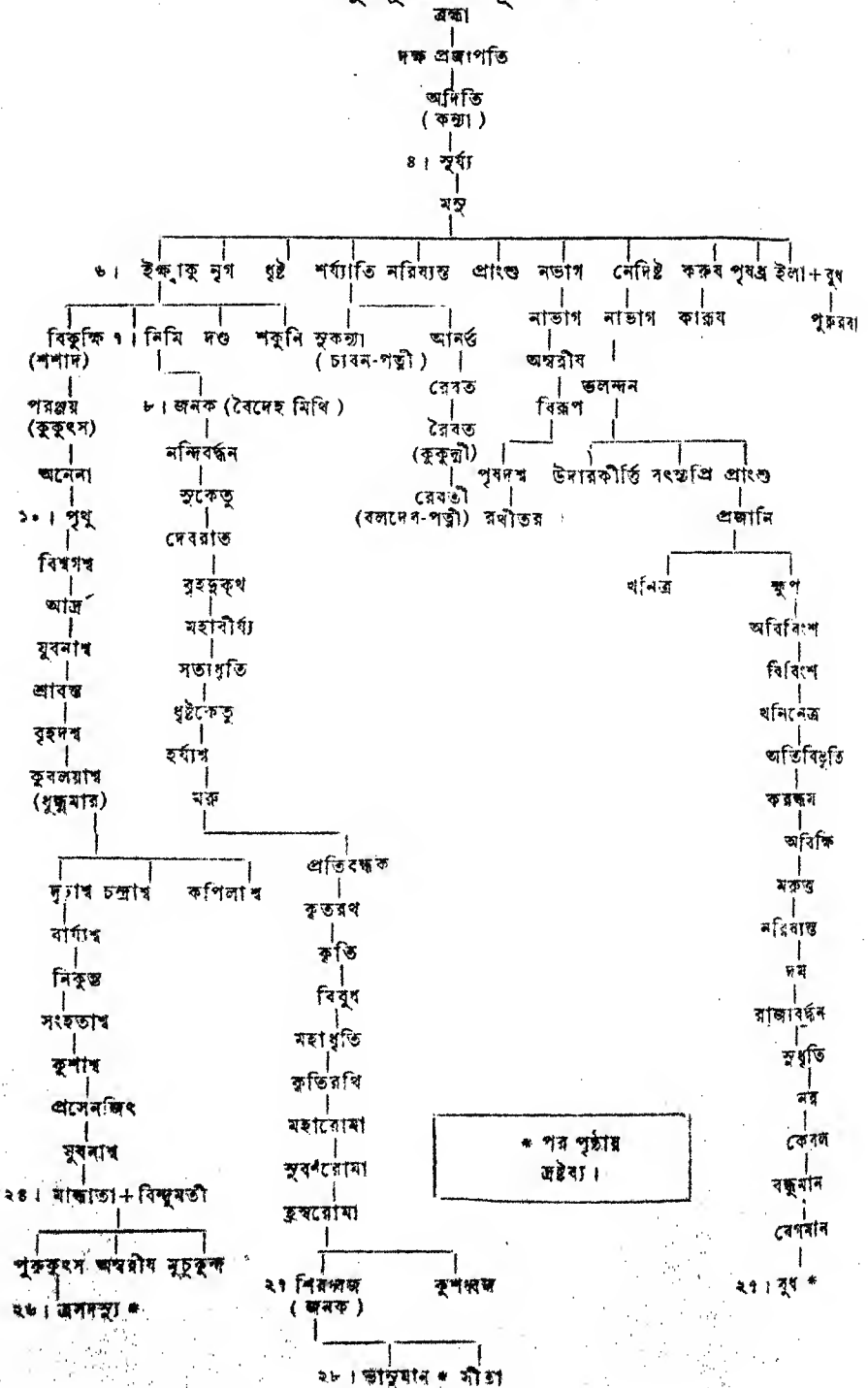
স্মরণীয় পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; এবং তাহাদের সম্ভান-সম্ভৃতি-ক্রমে সূর্য্যবংশ। সহস্র সহস্র মহীপতির আবির্ভাব হইয়াছিল। সকল পুরাণে সকল বংশের

সকল ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে যে যে গ্রন্থে যে যে ভাবে যে যে বংশের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, আমরা একে একে তাহাই উল্লেখ করিতেছি। প্রথমতঃ রামায়ণে সূর্য্যবংশের যে পরিচয় পাওয়া যায়, পাঠক তৎপ্রতি লক্ষ্য করুন। তার পর, বিষ্ণু-পুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ এবং ভাগবত প্রভৃতিতে সেই সেই বংশ কিরূপভাবে পরিবর্ণিত হইয়াছে, তৎপ্রতি দৃষ্টি করুন। তাহাতে, কোন্ গ্রন্থের সহিত কোন্ গ্রন্থের কোণায় কিরূপ অসামঞ্জস্য আছে, তাহাও বুঝিতে পারিবেন; অপিচ, সে অসামঞ্জস্যের কারণও কতকটা উপলব্ধি হইবে।

রামায়ণে—সূর্য্যবংশ।



বিষ্ণু-পুরাণে—সূর্য্যবংশ ।



বিষ্ণু-পুরাণে—সূর্যাবংশ ।

২৯৫

৮। কদমহা (পূর্ব পৃষ্ঠায় পর ।)

সত্ত্বত
নরগ্য
বদন
খ্যাম
নগ্ন
রথমা
চাক্রণ
ভাবত
(ত্রিশঙ্ক)
প্রশস্তি
মহিতাম
হরিত
চক্ৰ
ভয়
বহুদেব
কক
কুক
বহু
৯। নগর
অসমঞ্জ
অশ্বমান
দিলীপ
১০। ভগীরথ
শ্রুত
নাভাগ
অবসীয
সিদ্ধধীপ
অমৃতাদ
কৃতপর্ণ
সদাকাম
অদাস
সোদাস
(কল্যাণপাদ)

অশ্বক
মূলক
দলমথ
ইলিবিলা
বহুসহ
দলীপ
(বটাজ)
দীর্ঘবাহু

৬৫। রঘু *

২৮। ভাস্করাম

শতহারা
শুতি
উর্বাবহ
সত্যকাজ
কুনি
অজ্ঞান
অভূজিৎ
অরিষ্টনেমি
শ্রুতায়ু
সূর্য্যাম
সঞ্জয়
কেনারি
অনেনা
নীলমথ
সত্যমথ
সাতারিণি
উপশু
শ্রুত
শাস্ত
সুশমা
সুভায়
সুশ্রুত
জয়
বিজয়
স্বত
সুদয়
বীতহব্য
সঞ্জয়
কেনারি
মুতি
বহুলাশ
৬৬। কুতি

২৭। রঘু

তৃণবিন্দু
বিশবল
ইলিলি
(কথা)
হেমচন্দ্র
সুচন্দ্র
ধূম্রাখ
ঐজয়
সহদেব
কুশাম
সোমদত্ত
জনমেজয়
৬৮। সূমতি

* রঘু-বংশের অষ্ট বিবরণ
পর পৃষ্ঠায়
দ্রষ্টব্য ।

৬৫। রঘু (পূর্ব পৃষ্ঠার শ্লোক।)

অজ
দশরথ

৬৮। রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন

হনু লব অঙ্গদ চন্দ্রকেতু তক পুত্র সুবাহু শূরসেন

অতিথি

নিষধ

৭২। নল

নভ

পুণ্ডরীক

কেমবদ্য

দেবানীক

অহিন্ড

রূপ

রুদ্র

পারিপাত্র

দল

ছল

উকথ

বজ্রনাভ

শঙ্খনাভ

ব্যুথিতাথ

বিষমহ

হিরণ্যাক

পুণ্ড

ঋবসজ্জি

সুদর্শন

অগ্নিবর্ণ

শীত

মরু

প্রশ্রুত

শুগন্ধি

অবর্ণ

মহাবান্

বিশ্রুতবান্

১০০। বৃহৎ

বৃহৎক্ষণ

গুরুক্ষেপ

বৎস

বৎসবুহ

প্রতিষোম

দিবাকর

সহদেব

বৃহৎ

ভাস্কর

সুপ্রভীক

মরুদেব

সুদক্ষ

কির

১০০ বৃহৎ হইতে
“ভবিষ্যতসংগ” নামে
উক্ত হইয়াছে।

অন্তরিক

সুবর্ণ

অমিত্রজিৎ

বৃহৎ

বর্ষা

কৃতজ্ঞ

সংজ্ঞ

সঞ্জয়

শাক্য

কুশোদন

রাতুল

প্রসেনজিৎ

কৃত

কৃত

কৃত

১২৯। কৃত

হরিবংশে—সূর্যবংশ।

২৯৭

কল্প + অমিত

২। বিবাহান

৩। মহু (বৈবস্বত) আক্কেদেব ঘন যমুনা

৪। ইকাকু নাভাগ পুত্ৰ শর্যাপতি নরিস্বন প্রাংশ নাভাগারিষ্ট করন পুত্র ইড়া + বুধ (কক্কা) (সোমসুত)

নিবৃদ্ধি অমরীম (শাশদি)

বাক্য ক রণধুত

শক

শর্যাপতি

প্রজাপতি

কার্য

৫। পুরুষবা

পত্নী

কুকুৎস্থ

অনেনা

৮। পুত্ৰ

বিশ্বরাম

অজ

যুবনাম

প্রাবস্ত

বৃহদশ

কুবলাস

(ধুজুয়ার)

দুগাশ

চন্দ্রাশ

কপিলাস

৩গাশ

নিবৃদ্ধ

সংগঠাশ

৬গাশ

৭গাশ

প্রসেনজিৎ

যুবনাম

২১। সাক্ষাতা + বিন্দুমতী

পুরুকুৎস

মুচুকুল

৩দশ

সকুত

সুখরা

ক্রিধরা

ক্রিধাক্রিণ

সত্তাব্রত

(ত্রিশকু)

আনন্ত

সুকক্কা

(চাবন-পত্নী)

৯েব

৯েবত

(কুকুগ্নি)

৯েবতী

(বলদেব-পত্নী)

২৮। হরিশচন্দ্র

রোহিত

হরিত

৮কু

বিজয়

সুদেব

করক

৮ক

৮ক

৩৬। মগর

অসমগা

(গফজল)

অংশুমান

দিলীপ

(খট্টজ)

৪৫। ভগীরথ

জত

নাভাগ

অমরীম

সিদ্ধার্থীপ

অযুতাজিৎ

কতুপর্ণ

আর্তপর্ণি

সুদাস

সৌদাস

(কক্কাবপাদ)

সর্বকক্কা

অনরণ্য

নিম্র

অনমিত্র

৮লিহুহ

৮লীপ

৮ল

অজ

৮ল

৮ল

৮ল

৮ল

৮ল

৮ল

৮ল

৮ল

৮ল

৮ল

৮ল

৮ল

৮ল

৮ল

৮ল

৮ল

৮ল

৮ল

৮ল

৮ল

৮ল

৮ল

৫৬। রাম

কুশ

অতিথি

নিবধ

নল

নভ

পুণ্ডরীক

কেশবধা

দেবানিক

দারাদ

অহিনজ

সুখরা

৮০। বৃহদশ

৮০। বৃহদশ

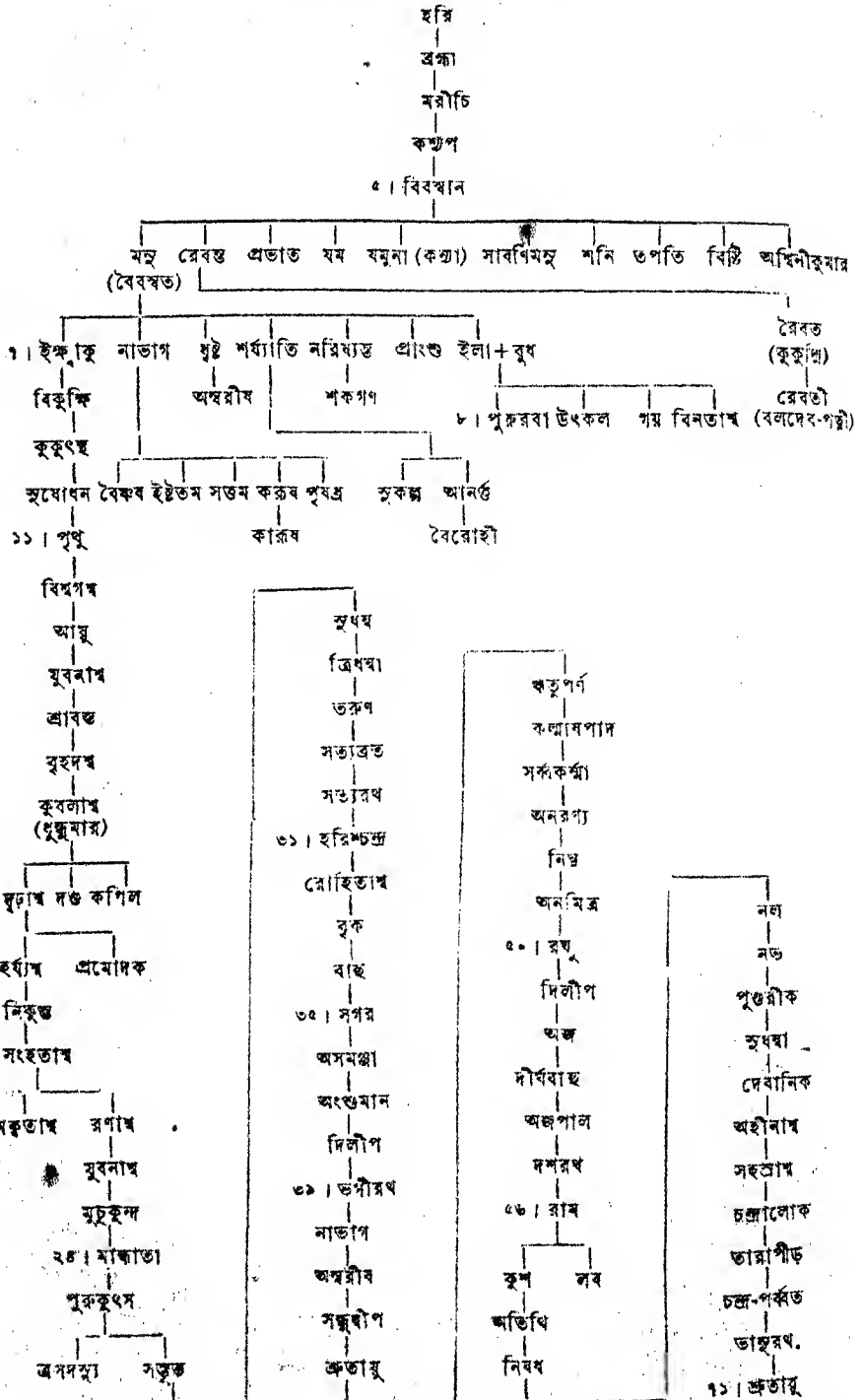
৮০। বৃহদশ

৮০। বৃহদশ

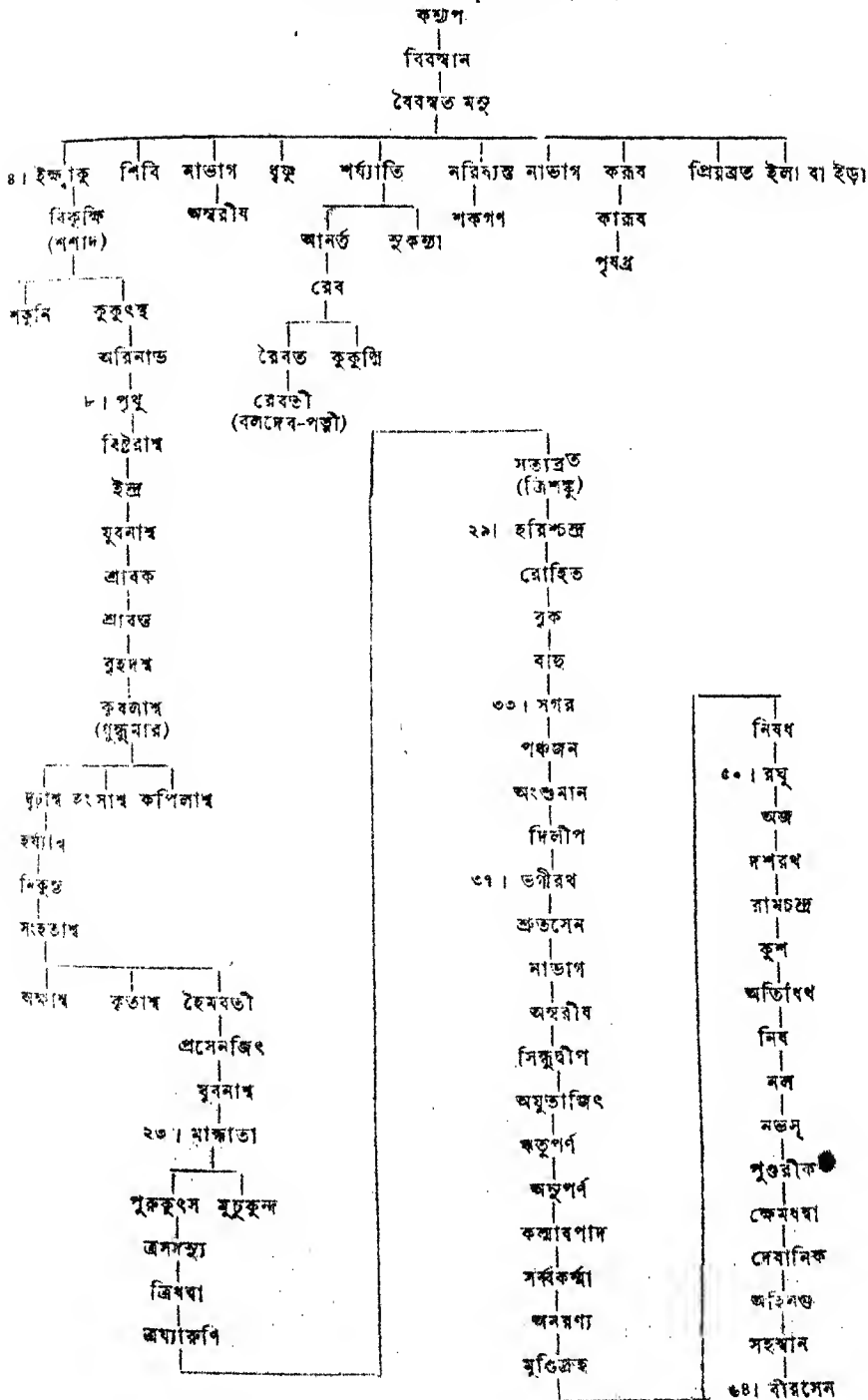
৮০। বৃহদশ

৮০। বৃহদশ

অগ্নিপুরাণে—সূর্য্যবংশ ।

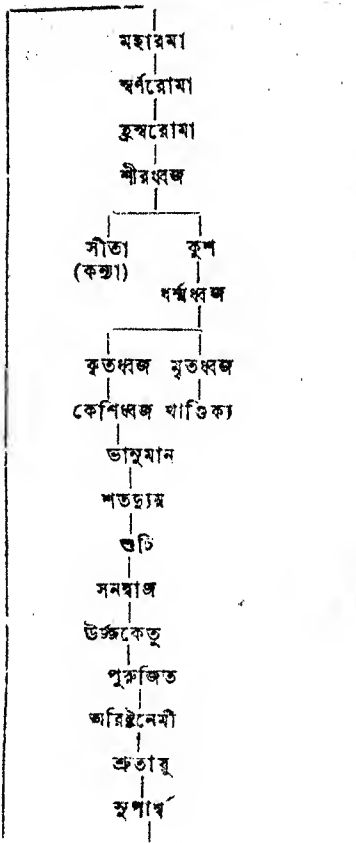


শিবপুরাণে—সূর্যাবংশ ।



৮। নিমি
(বৈদেহ ও মিলি)

উদারহু
নন্দীবর্জন
হকেতু
দেবরাত
বৃহজ্জ
মহাবীর্ষ্য
সুহুত
ধৃষ্টকেতু
বর্ষাধ
মরু
প্রভাপ
কুতরথ
দেবযীত
বিক্রত
মহামুতি
কুতিরাত



চিহ্নরথ
কেশাধি
সমরথ
সত্যরথ
উপগুরু
উপগুপ্ত
বধনন্ত
যজুর্জাণ
শুভাবণ
ক্রত
জয়
বিজয়
ঋত
শুনক
বীতহব্য
মুতি
বহলাধ
কুতি

মহাভাগবতে—সূর্য্যবংশ । *

১। প্রচোতা

মরু
(প্রজাপতি)
অদিতি + কশ্যপ
(কস্তা)
সূর্য্য
(বিবস্বান)

মত বব

* মহাভাগবতে অত্রান্ত
স্থলেও বিচ্ছিন্নভাবে সূর্য্য-
বংশের বিবরণ আছে । কিন্তু
ভদ্রহুসরণে ক্রমপরিচয় নির্ধা-
রণ দ্রষ্টব্য ।

বেণু বৃহৎ সরিষাধ দ্যাক্ষাণ ইক্ষাকু কারকব শর্ঘ্যাদি পৃথক নাভাগ্যাদি ইলা

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ ।

চন্দ্রবংশ ।

সূর্য্যবংশের সহিত চন্দ্রবংশের সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন। সূর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠা-পরিচয় স্মরণ করিতে করিতে চন্দ্রবংশের প্রতিষ্ঠা-পরিচয় আপনাপনিই মনোমধ্যে উদ্ভূত হয়। যে বৈবস্বত মহুর পুত্র ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি নৃপতি হইতে সূর্য্যবংশের উৎপত্তি, চন্দ্রবংশ। সেই বৈবস্বত মহুর কণ্ঠা ইলা (ইড়া) হইতে চন্দ্রবংশের উদ্ভব। কোনও কোনও পুরাণের মতে সোম (চন্দ্র) ইলাকে বিবাহ করেন; এবং তাঁহা হইতে চন্দ্রবংশের সৃষ্টি হয়। আবার কোনও কোনও পুরাণে দেখিতে পাই,—চন্দ্র-পুত্র বুধের সহিত ইলার বিবাহ হইয়াছিল; এবং বুধের পিতা চন্দ্রের নামানুসারে চন্দ্রবংশ, চন্দ্রবংশ নামে অভিহিত হয়। পুরাণ-সমূহের মধ্যে এইরূপ বিষম মতভেদের কারণ কি, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। লিপিকার-প্রমাদ-বশেই যে এরূপ ঘটিয়াছে, অতঃই তাহা মনে হয়। এই চন্দ্রবংশে পুরুষ, নহষ, যযাতি, যদু, ভরত, পুরু, কুরু, শাক্তু, ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু, দ্রুপদ্বির, দুর্য্যোধন প্রভৃতি বিখ্যাত নৃপতিগণ জন্মগ্রহণ করেন; এবং এই বংশেই ত্রীকণ ও বলরাম, জমদগ্নি ও পরশুরাম প্রভৃতিও অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ধনুর্জি, শিখামিত্র, ব্রহ্মি, মধু, বেণু, বসুদেব, কংস প্রভৃতিও এই বংশেরই অন্তর্ভুক্ত। ত্রেতাযুগে সূর্য্যবংশের প্রাধান্যের বিষয় যেরূপ রামায়ণে পরিকীর্তিত আছে; তাপসযুগে চন্দ্রবংশের প্রাধান্যের পরিচয় সেইরূপ মহাভারতে পরিদৃষ্ট হয়। সে হিসাবে, ঐ দুই গ্রন্থ, উভয় বংশের প্রতিষ্ঠা-পরিচয়ের ইতিহাস বলিলেও অত্যাুক্তি হয় না। রামায়ণ ও মহাভারত ভিন্ন অস্ত্রাঙ্গ গ্রন্থেও সূর্য্যবংশ ও চন্দ্রবংশের বিবরণ নানারূপে লিপিবদ্ধ আছে। তবে আশ্চর্য্যের বিষয়, সূর্য্যবংশের ত্রায় চন্দ্রবংশের বংশ-তালিকায়ও ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভারতে, বিষ্ণুপুরাণে, হরিবংশে, ভাগবতে, অগ্নিপু্রাণে ও গরুড়পুরাণে চন্দ্রবংশের বংশ-তালিকায় যে ইতর-বিশেষ দৃষ্ট হয়, সূর্য্যবংশের সূচনায় যাহা বলিয়াছি, এতদ্বিষয়েও তাহা বলা যাইতে পারে। এক এক বংশে সহস্র সহস্র ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু ঐগণদের সকলের নাম ও পরিচয় পুরাণ-সমূহে স্থান পায় নাই; আবশ্যক অনুসারে এক এক বংশের বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির পরিচয়ই পুরাণ-পরাম্পরায় প্রদত্ত হইয়াছে। কয়েকখানি বিশেষ বিশেষ পুরাণ হইতে আরম্ভে চন্দ্রবংশের বংশ-তালিকা প্রকাশ করিতেছি। তাহাতে কোন পুরাণের সহিত কোন পুরাণের বংশ-তালিকার কিরূপ অসামঞ্জস্য আছে, সহজেই প্রভীত হইবে। যুগযুগান্তর পূর্ব্বের ঘটনাবলী বহুকাল যুগে যুগে প্রচলিত ছিল; সুতরাং অনেক স্থলের অনেক বিষয় বিস্তৃতি-সাগরে বিলীন হওয়াই সম্ভবপর। যাহা হউক, এখনও যাহা পাওয়া যাইতেছে, স্থলভাবে তাহাই প্রদত্ত হইল। অন্তর্দ্বিষয়ে যাহা বক্তব্য, স্থানান্তরে তাহাও আলোচিত হইবে।

মহাভারতে—চন্দ্রবংশ ।

ইলার পুত্র পুরুষবা হইতে মহাভারতে চন্দ্রবংশের বংশ-পরিচয় লিখিত আছে । তাহাতে চন্দ্রের সহিত ইলার বা পুরুষবার কোনও সম্বন্ধের পরিচয় নাই । তবে হরিবংশ গ্রন্থটিতে দেখিতে পাই,—পুরুষবা চন্দ্রবংশ-সম্বৃত । ব্রহ্মার পুত্র অজি, অজির পুত্র চন্দ্র, চন্দ্রের পুত্র বুধ, বুধের পুত্র পুরুষবা ইত্যাদি । কিন্তু মহাভারতে আছে,—

১। ইলা

পুরুষবা

আয়ু বীমান্ অমাবশু বুঢ়ায় বলায় শতায়

নয়ষ বৃদ্ধশর্মা যজি পয় অনেনা

যতি ৫। যযাতি সংযাতি আয়াতি অযতি ক্রব

যয় তুরকশু ক্রহ্য অমু ৬। পুরু

প্রবীর ইষর মৌহাষ

মনসু

অবগভাসু

শক্ৰ সংহনন

বাগ্মী

অচের (অনাচুতি)

যতিনার

ভংস মহাহ্যতি অতিরথ ক্রহ্য

ইলিন

হৃষত

শুর

ভীষ

এবশু

বহু

১৪। ভরত

কুমসু

হৃষোজ্জ

হৃষোতা

হৃষবি

হৃষক

কটাক

দিবিরথ

অজমীড়

হৃষীড়

পুরুষীড়

কক

হৃষত

শরযেতি

অকু

ব্রহ্মন

কুপিণ

সমরথ + ভগতি

কুরু (এই কুরু হইতে কুরু-সাম্রাজ্য ভীষ এবং কুরুক্ষেত্রের উৎপত্তি)

২। অবিজিত* অভিযাৎ

চৈত্রেরথ

মুনি

২১। জনমেজয়*

* ২১ অবিক্রিতের ও ২১ জনমেজয়ের বংশ-পরিচয় পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

মহাভারতে—চন্দ্রবংশ।

কুরুবংশোদ্ভূত অবিস্মিতের ও জনমেজয়ের বংশ।

(পূর্ব পৃষ্ঠার পর)

২১। অবিস্মিত

২১। জনমেজয়

পরীক্ষিৎ সরলাখ আদিরাজ বিরাজ শাখ্যলী উচ্চৈঃশ্রবা ভঙ্গকার জিতারি

ককসেন উগ্রসেন বীর্ঘ্যবান চিত্রসেন ইন্দ্রসেন সুবেণ ভীমসেন

২২। বৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু বাহ্লিক নিমগ্ন আশ্বিনদ কুন্তোদর পদ্মাত্তি বসতি

হুতিক হস্তী বিতর্ক ক্রাথ কুন্তীন বহিঃশ্রবা ইন্দ্রাভ ভূমহু

(পৌত্র)*

প্রতীপ ধর্ম্মনেত্র সুনত্র

দেবাপি শান্তনু বাহ্লিক

বিচিত্রবীর্ঘ্য চিত্রাঙ্গদা
(কন্যা)

২১। বৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু বিহুয়

দুহ্যোধন দুঃশাসন বিতর্ক চিত্রসেন

যুধিষ্ঠির ভীম ভীষ্মন নকুল মহদেব
দ্রৌপেয় সর্কগ নিরমিত্র সুহোত্র

অভিনবমুখ্য + উত্তরা

পরীক্ষিৎ

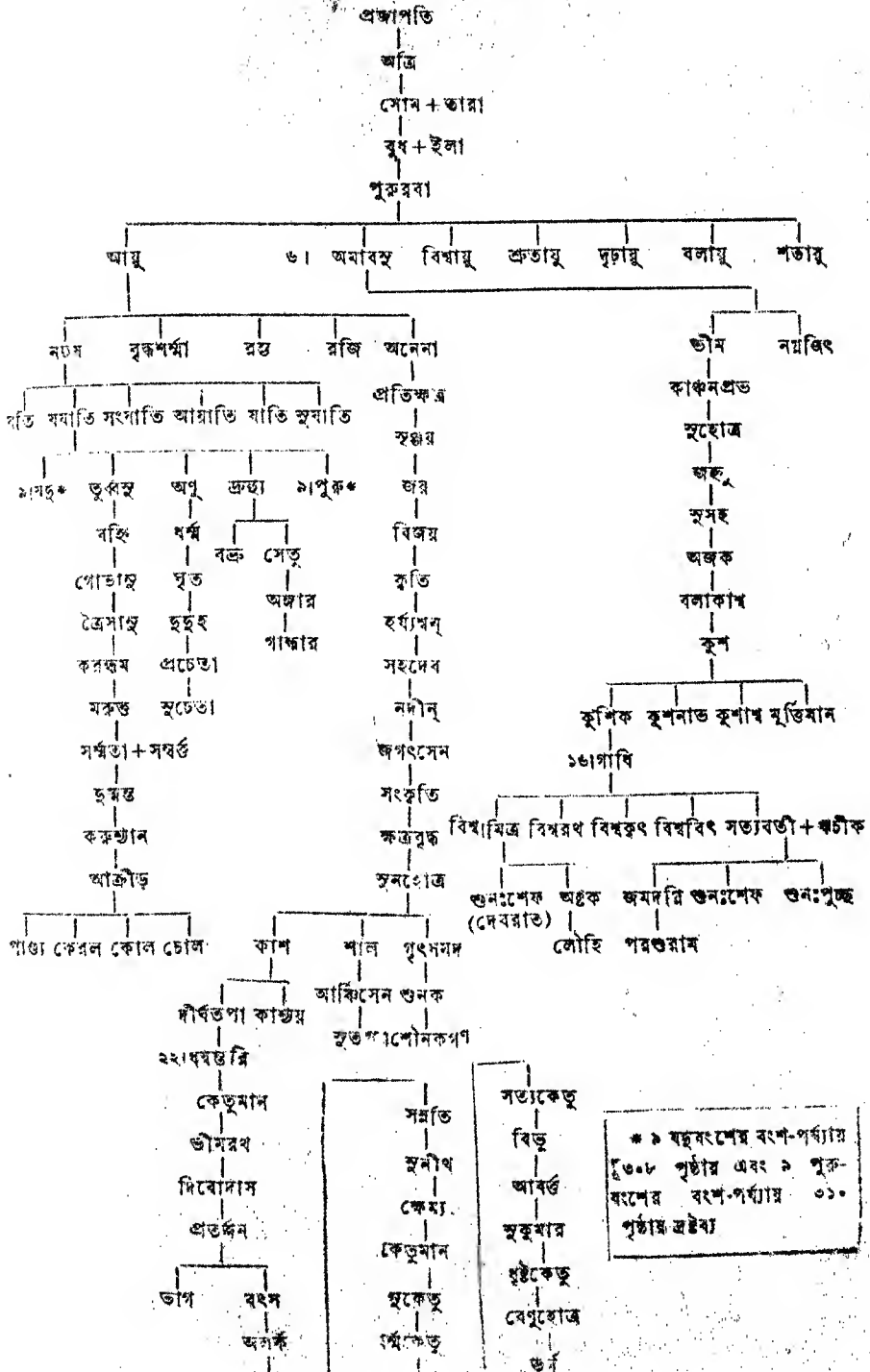
জনমেজয়

শতানিক শতকর্ণ

অশ্বমেধবত্ত

* এই তালিকায় ২২শ ও ২৩শ পর্বায়ে দুইবার বৃতরাষ্ট্র ও দুইবার পাণ্ডুর নাম বৃট্ট হয়। ২১শ ও ৩১শ পর্বায়ে জনমেজয়ও দুইবার আছে। অধিকন্তু ২২শ পর্বায়ে বৃতরাষ্ট্রের পৌত্র প্রতীপ প্রভৃতি উক্ত হইয়াছেন। কিন্তু তাহারা কোন পুত্রের পুত্র, তাহারা উল্লেখ নাই।

হরিবংশে—চন্দ্রবংশ ।

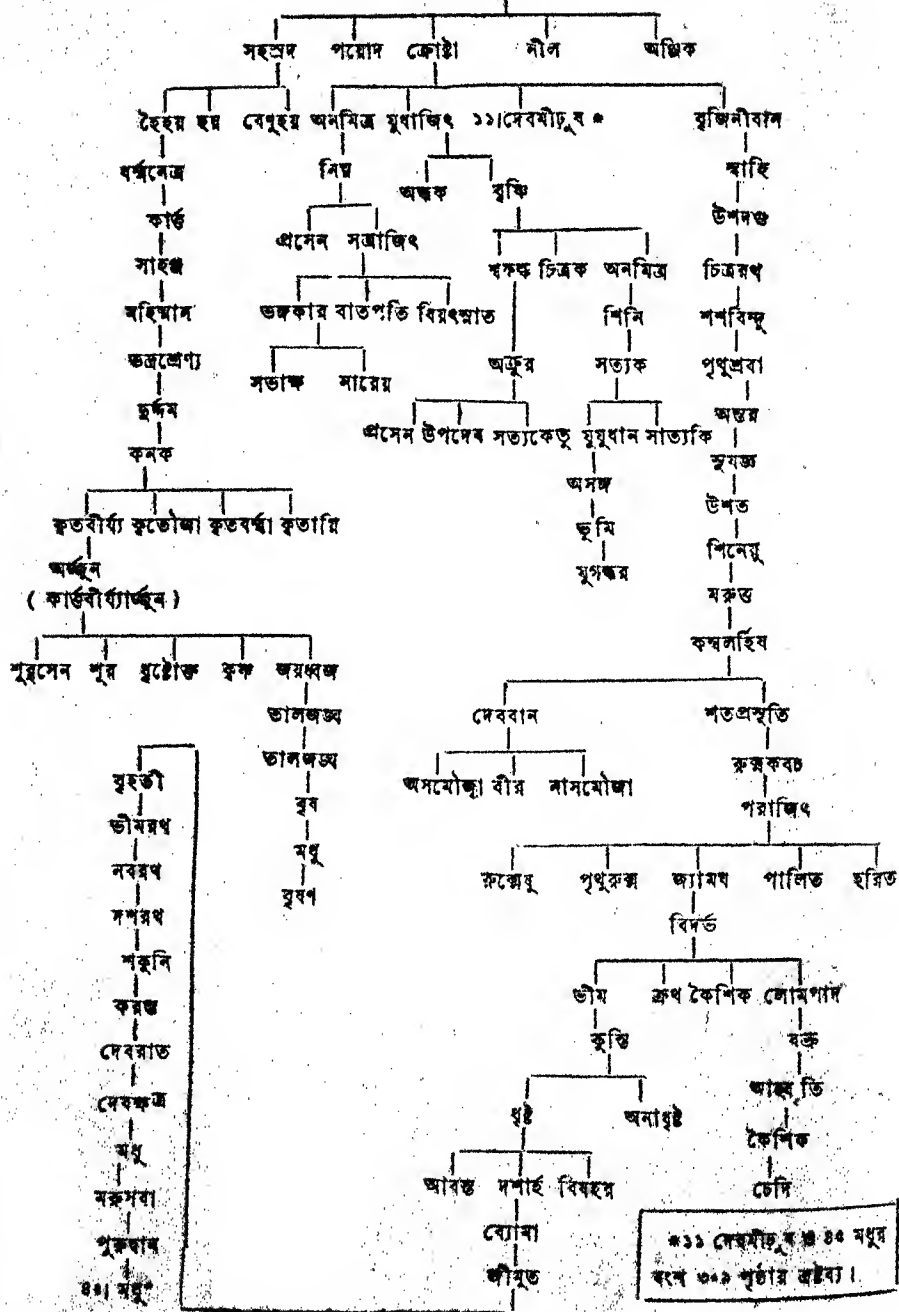


হরিবংশে—চন্দ্রবংশ ।

यष्टुवर्णः ।

(७०३ पृष्ठान्न पत्र ।)

२। यक्ष

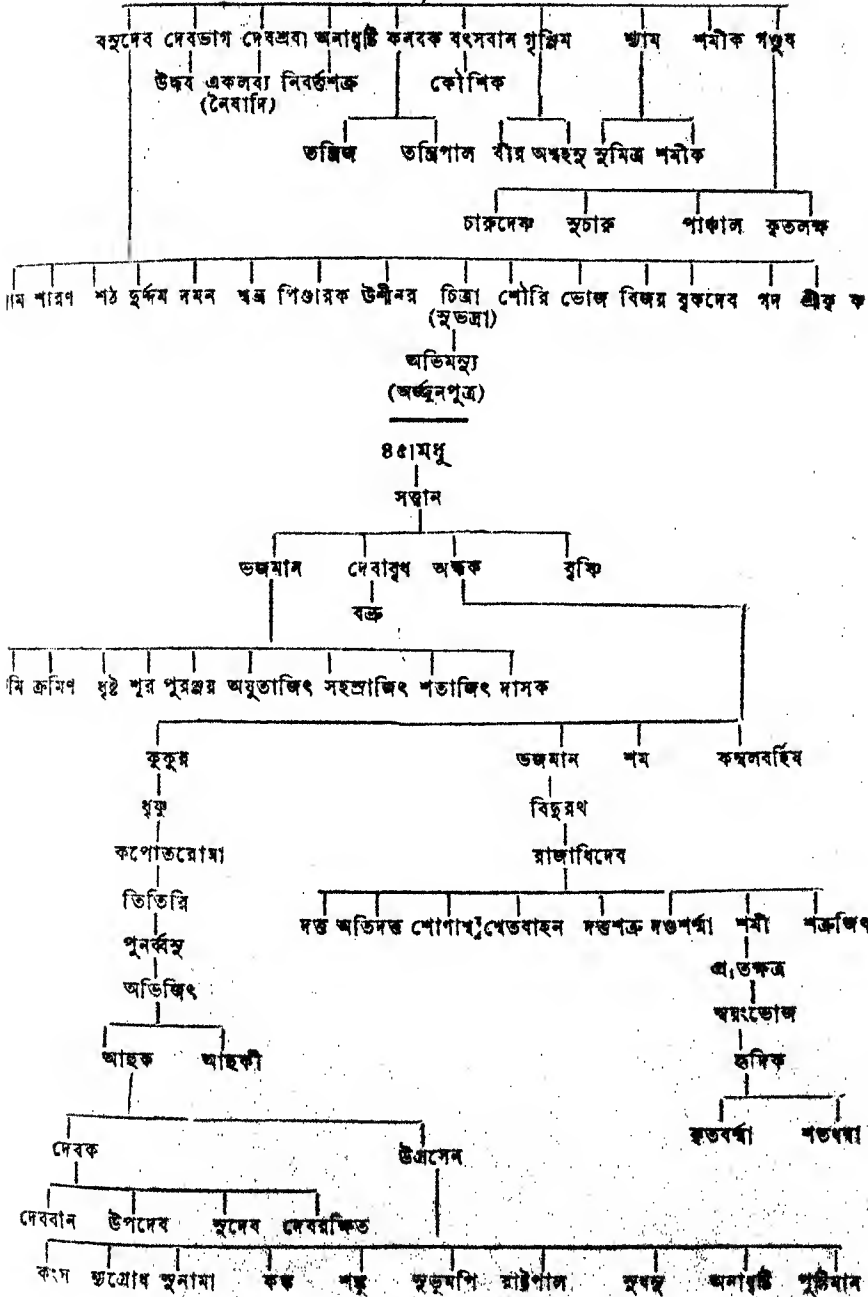


হরিবংশে—চন্দ্রবংশ ।

বহুবংশান্তর্গত দেববীর্যবৈর ও মধুর বংশ ।

(৩০৮ পৃষ্ঠার পর)

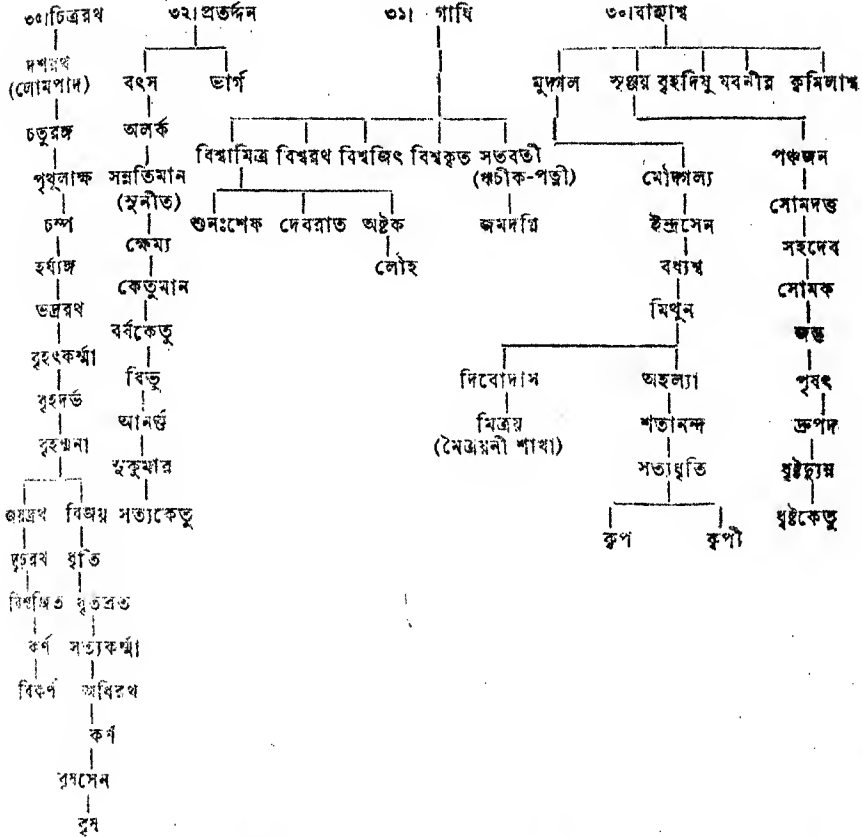
১১। দেববীর্যবৈর ।



হরিবংশে—চন্দ্রবংশ ।

পুরুবংশান্তর্গত চিত্ররথ, প্রতর্দন, গাধি, বাহ্যস্থ প্রভৃতির বংশ-পর্যায় ।

(পূর্ব পৃষ্ঠার পর)



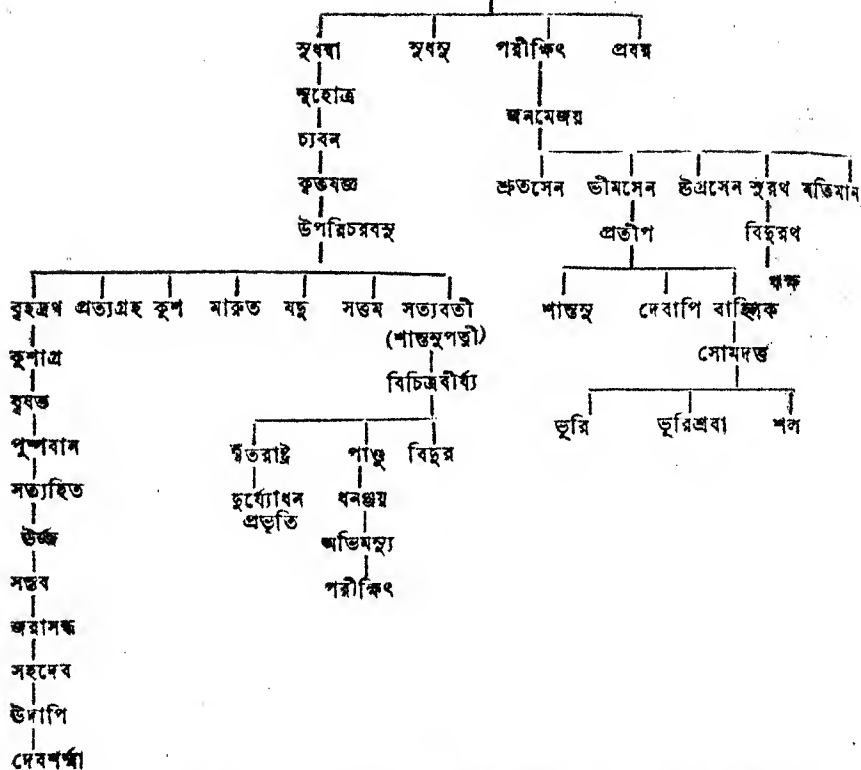
হরিবংশের মতে,—ঐকৃষ্ণের বহু সহস্র পুত্রের মধ্যে আটজন প্রধান মহিষী ছিলেন । তন্মধ্যে কুমিল্লাখ গর্ভে প্রহ্মার, চাক্রদেহ, চাক্রভজ, চাক্রপর্ভ, হৃদগুপ্ত, ক্রম, সুষেণ, চাক্রগুপ্ত, চাক্রবাহু নামক পুত্র এবং চাক্রবর্তী নামী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন । ঐকৃষ্ণের দ্বিতীয় মহিষী সত্যভামা । তাঁহার গর্ভে—ভানু, ভীমরথ, হুপ, মোহিত, দীপ্তিমান, তাজজাক, অলান্তক নামক সাত পুত্র এবং চারি কন্যা ; তৃতীয় মহিষী, জাম্ববর্তী গর্ভে—সমরশোভন শাস্ত্র, মিজবান, মিজবিল, মিজবাহ ও সুনীধ নামক পাঁচ পুত্র ও এক কন্যা ; চতুর্থ মহিষী নাগজিতীর গর্ভে,—ভজকার, ও ভজবিল নামক দুই পুত্র ও এক কন্যা ; পঞ্চম মহিষী শৈব্যা হইতে নংগ্রামজিৎ, সত্যজিৎ, শ্যোমজিৎ, শূর ও সপ্তজিৎ নামক পুত্র ; ষষ্ঠ মহিষী নামী হইতে বৃকাস, বৃকনিরুতি ও বৃকদীপ্তি প্রভৃতি পুত্র ; সপ্তম মহিষী লক্ষ্মণা হইতে রাজবান, রাজগুপ্ত, রাজবিল প্রভৃতি পুত্র ; এবং অষ্টম মহিষী কালিন্দী হইতে শ্রুত-সম্রাত ও অশ্রুত নামক পুত্র উৎপন্ন হয় । এতগুলি তাঁহার অষ্টম মহিষীর গর্ভেও অসংখ্য পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল । কৃষ্ণপুত্র প্রহ্মারের অনিরুদ্ধ নামে পুত্র জন্মে । অনিরুদ্ধের দুই পুত্র সাহু ও বজ্র ; বজ্র হইতে প্রতিরথ এবং প্রতিরথ হইতে সূচাক উদ্ভূত হন । বলদেবের সন্তান-সন্ততির মধ্যে দেখিতে পাই, তাঁহার দেবতী নামী পুত্রীর গর্ভে—নিশট ও উল্লুক নামে দুই পুত্র জন্মিয়াছিল ।

হরিবংশে—চন্দ্রবংশ ।

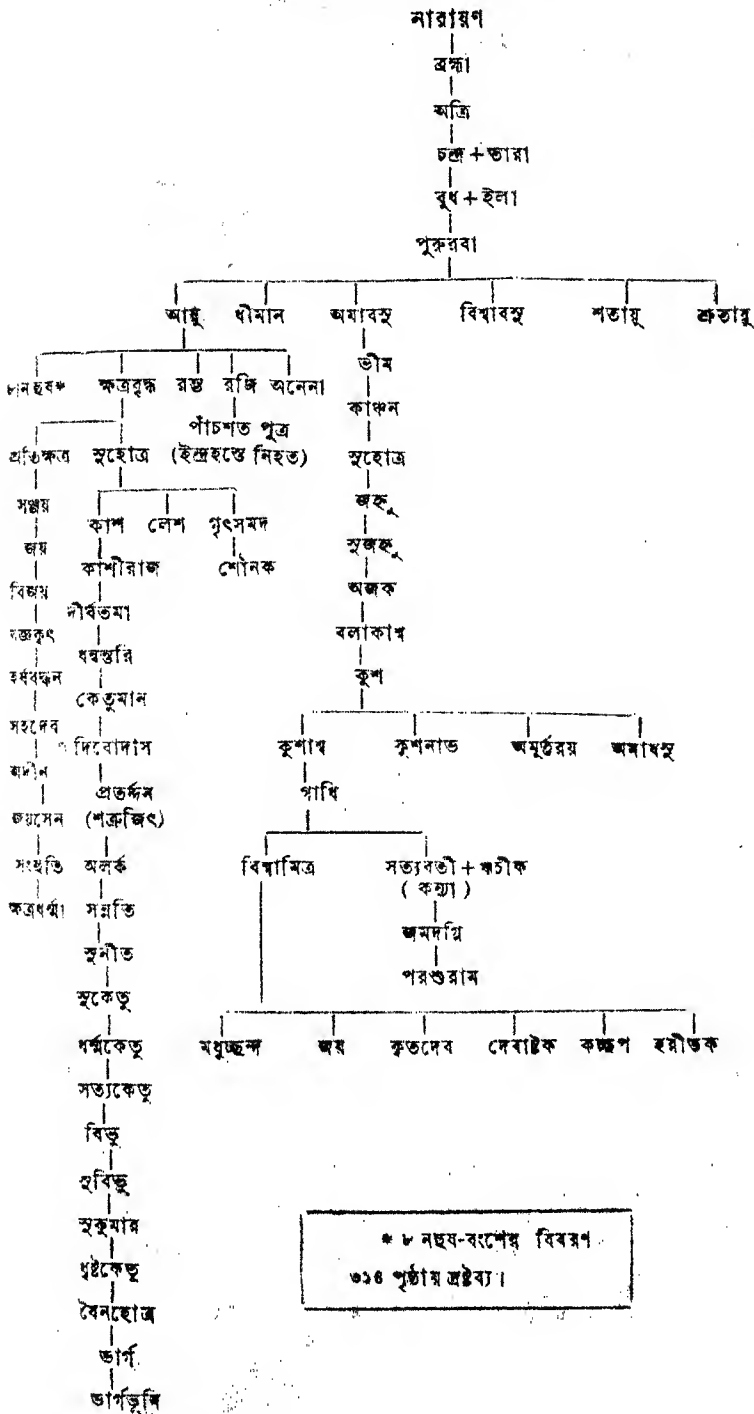
পুরুবংশান্তর্গত কুরু বংশ ।

(৩১০ পৃষ্ঠার পর)

২৮। কুরু

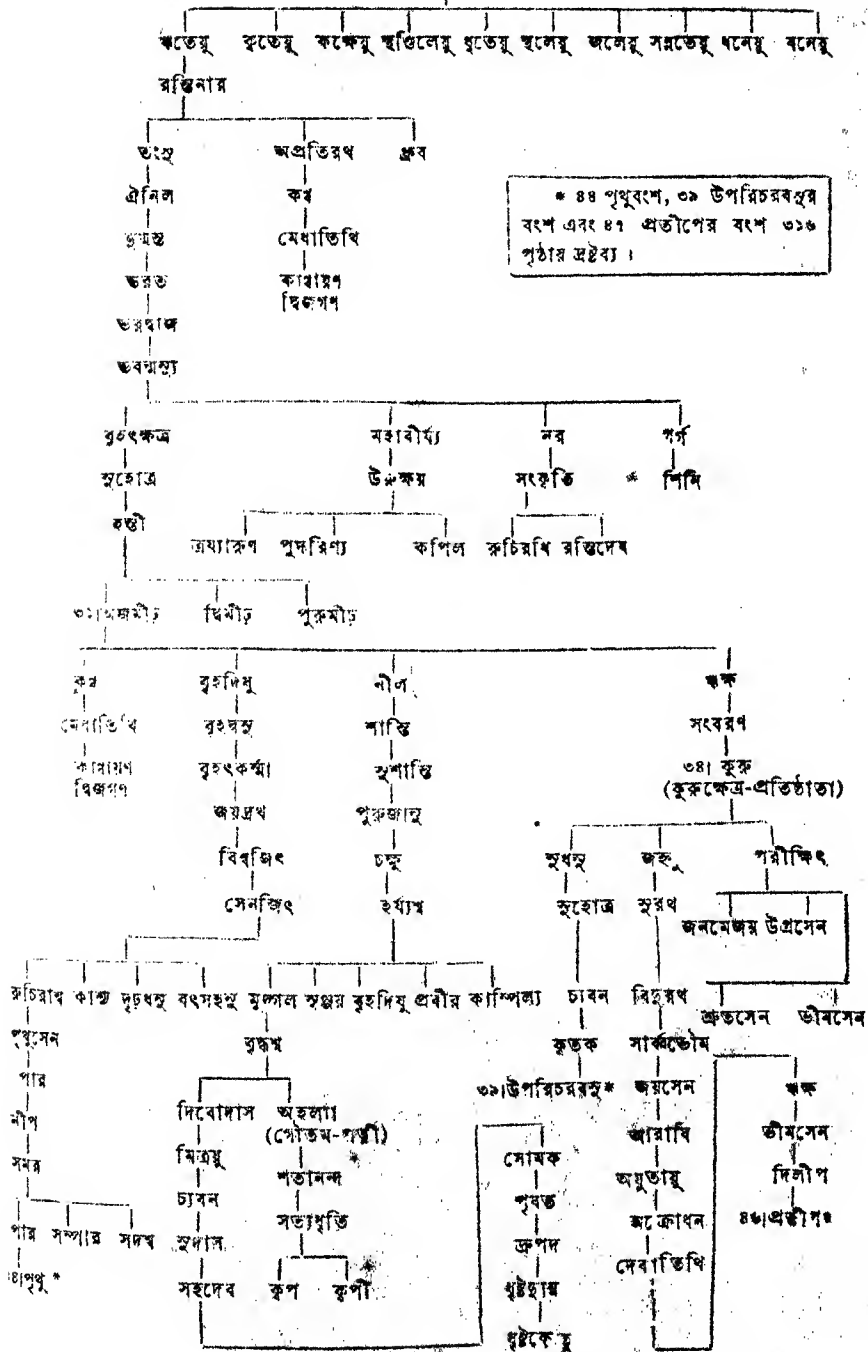


•• হরিবংশে চন্দ্রবংশের যে বংশপর্যায় দৃষ্ট হয়, তাহার অনেক স্থলে অনেক অসামঞ্জস্য আছে। প্রথমতঃ দেখিতে পাই—৬ষ্ঠ অমাবসু হইতে ১৭শ পর্য্যায়ের পাণ্ডু-তনয় বিখ্যামিত্র এবং তাঁহার ভগ্নী সত্যবতীর পৌত্র পরশুরাম (৩০৭ পৃষ্ঠার বংশপর্য্যায় দ্রষ্টব্য)। কিন্তু অশ্রুজ আবর দেখিতে পাই,—অমাবসুর জ্যেষ্ঠ আয়ুর বংশে ৩২শ পর্য্যায়ের পাণিনন্দন বিখ্যামিত্র বিদ্যমান, এবং সেই বিখ্যামিত্রের ভগ্নী সত্যবতীর পুত্র জমদগ্নির উৎপত্তি (৩১১ পৃষ্ঠার বংশপর্য্যায় দ্রষ্টব্য)। উভয় তালিকায় কি আকাশ পাভাল পার্ধক্য! উভয় বিখ্যামিত্রেরই পুত্র পৌত্রের নামে মিল আছে। এখন বিচার্য্য—হুই বিখ্যামিত্র একই ব্যক্তি কিনা এবং কালবশে লিপিকার-প্রমাদে এরূপ ঘটনা হইছে কিনা। দ্বিতীয়তঃ, আয়ুর কনিষ্ঠ পুত্র অনেনার বংশে ২২শ পর্য্যায়ের আয়ুরকেন্দ-প্রবর্ত্তক ধনঞ্জয় (৩০৭ পৃষ্ঠার বংশপর্য্যায় দ্রষ্টব্য) নাম দেখিতে পাই। তিনি কাশীর অধিপতি ছিলেন এবং তাঁহার বংশে সুপ্রসিদ্ধ দিবোদাস জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু অশ্রুজ আবর দৃষ্ট হয়,—আয়ুর জ্যেষ্ঠ পুত্র নহবের পৌত্র পুরু বংশে ২৮শ পর্য্যায়ের ধনঞ্জয় (৩১০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) বিদ্যমান আছে। উভয় ধনঞ্জয় পিতার নামই দীর্ঘতাপ। অধিকন্তু কাশীরেশ দিবোদাস উভয় ধনঞ্জয়ই প্রপৌত্র (৩০৭ পৃষ্ঠার ও ৩১০ পৃষ্ঠার বংশপর্য্যায় দ্রষ্টব্য)। এইরূপ পরীকিং, অনমেজয়, বৃকি, যমু, অক্ষক, হুই প্রভৃতি নামের একাধিক বার উল্লেখ আছে। তাহাতেও অনেক স্থলে গণ্ডগোল ঘটয়া থাকে। কত কাল পুরকের ঘটনাবলী, কত পরিবর্তন-প্রবাহের নথ্য দিয়া চলিয়া আসিয়াছে, তাই এরূপ ঘটনা হইতে পারে। ইহাতে ভারতের ও ভারতীয় হিন্দুর প্রাচীনত্ব তির অস্ত্র আর কি মনে হইতে পারে!



১৯। বৌদ্ধাধ

১৯। বৌদ্ধাধ



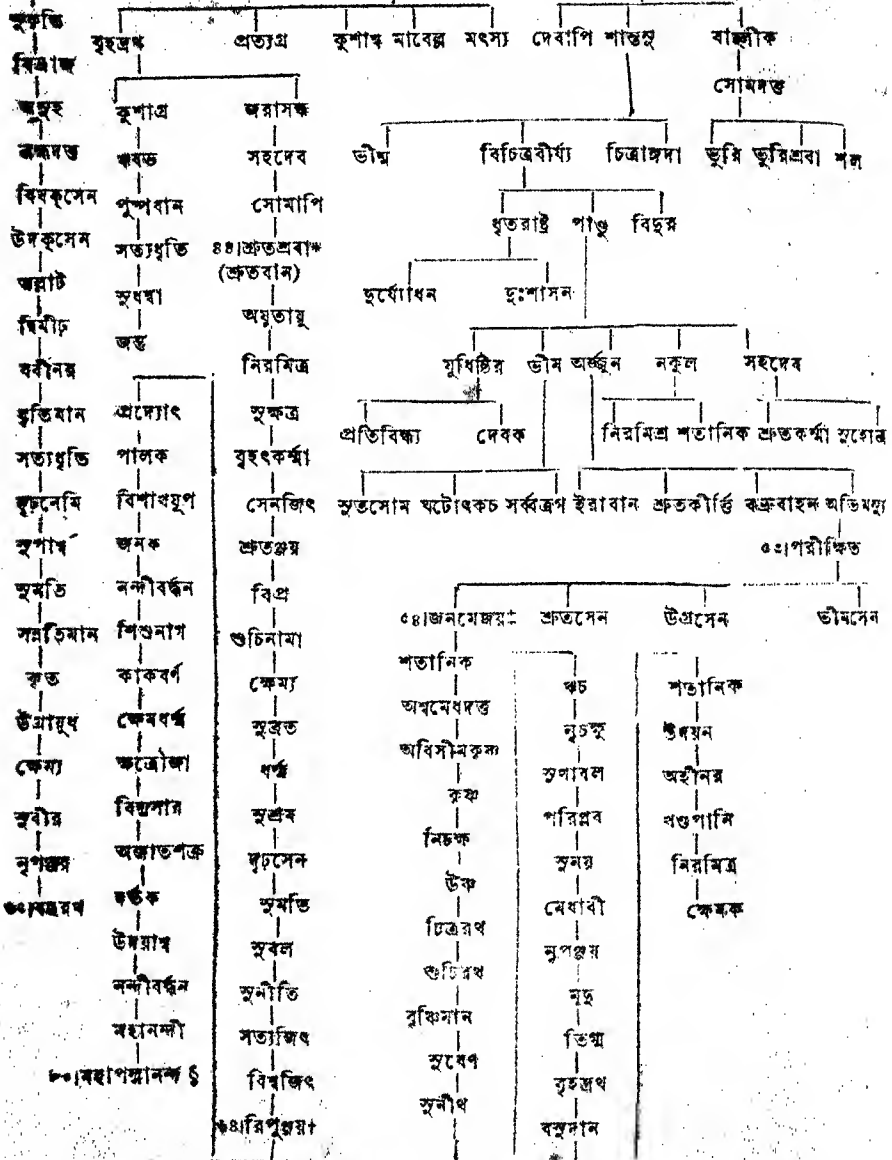
পুরুষবংশোত্তরগত পুত্র, উপরিচরবস্তুর এবং প্রতীপের বংশ ।

(৩১৫ পৃষ্ঠার পর)

৪৪। পুত্র

৩৯। উপরিচরবস্থ

৪১। প্রতীপ



* ক্রতব্রহ্ম হইতে পরবর্তী রাজগণ মাগব-বংশীয় ভবিষ্য নৃপতি নামে অভিহিত হন ।

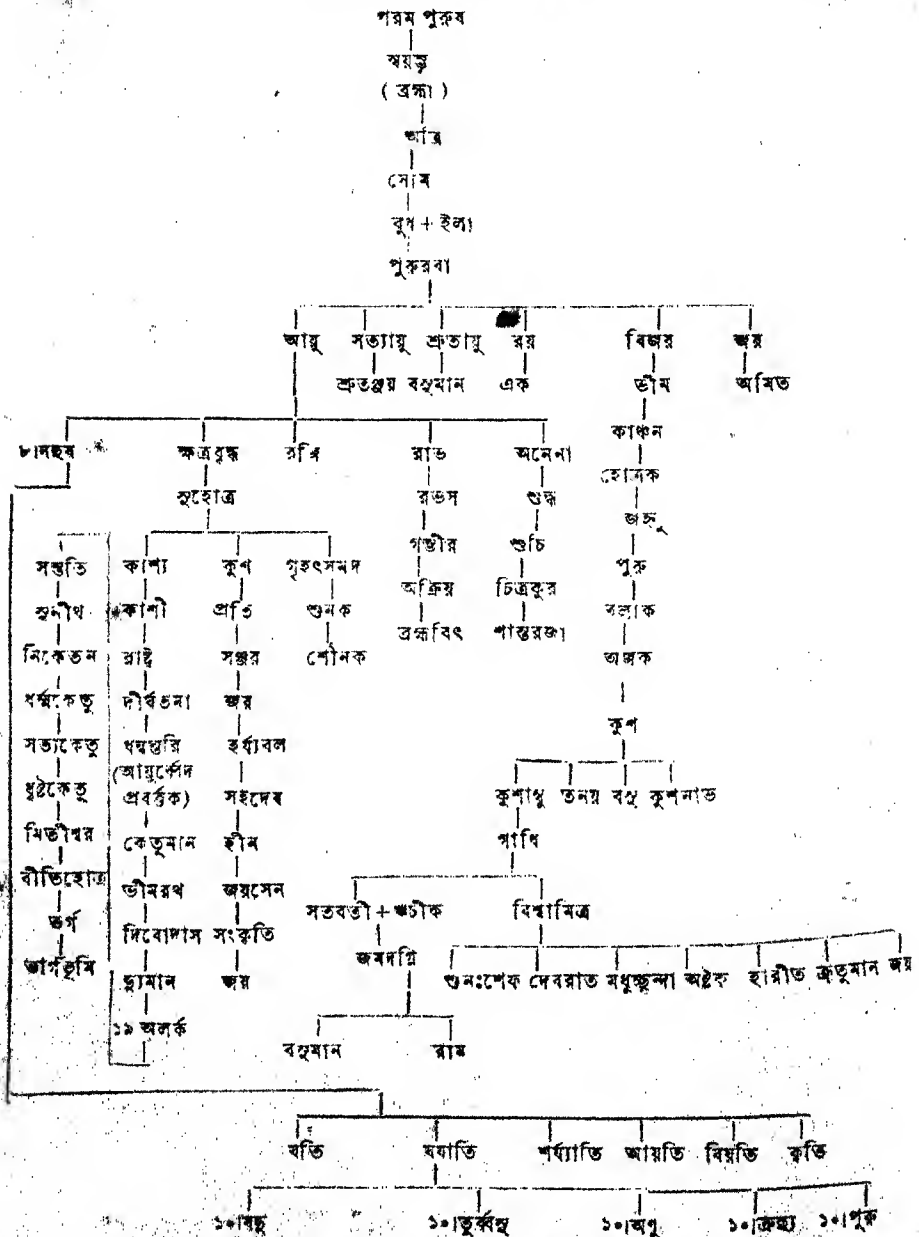
† ৪৪ রিপুঞ্জয়কে হত্যা করিয়া ভীমার মন্ত্রী হুনিক আপন পুত্র অম্বোৎককে রাজ্য করেন ।

‡ ৪৫ জনমেজয় হইতে পরবর্তী রাজগণ, ভবিষ্য রাজ বলিয়া অভিহিত । কলিযুগে কেমক রাজার ঐ বংশের পরিসমাপ্তি ।

§ ৪৬ মহাপ্রলয় ও ভীমার আদি পুত্রের এক শত বৎসর রাজত্বের পর, কোটিলা রাজ্যের চক্রান্তে মৌর্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত অগাধের সিংহাসনে আরোহণ করেন । তৎপরসম্বর্তী বিবরণ ৩১৭ পৃষ্ঠার ত্রয়োদশ ।

[২* বিষ্ণুপুরাণের মতে,—ঐন্দ্রোৎবংশীয় পাঁচ জন নৃপতি ১৩৮ বর্ষ, তৎপরে শিশুনাগবংশীয় দশ জন নৃপতি ৩৬২ বৎসর, তৎপরে নন্দবংশীয় নয় জন নৃপতি ১০০ বৎসর রাজত্ব করিলে, মৌর্যবংশ সিংহাসন প্রাপ্ত হন। সেই বংশের দশ জন নৃপতির রাজ্যকাল—১৩৭ বৎসর। তৎপরে, শুঙ্গবংশ ১১২ বৎসর, কন্ববংশ ৪০ বৎসর, লক্ষ্যবংশ ৪৫৬ বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরবর্তী বিবরণ পরবর্তী পরিচ্ছেদান্তরে দ্রষ্টব্য।]

শ্রীমদ্ভাগবতে—চন্দ্রবংশ।



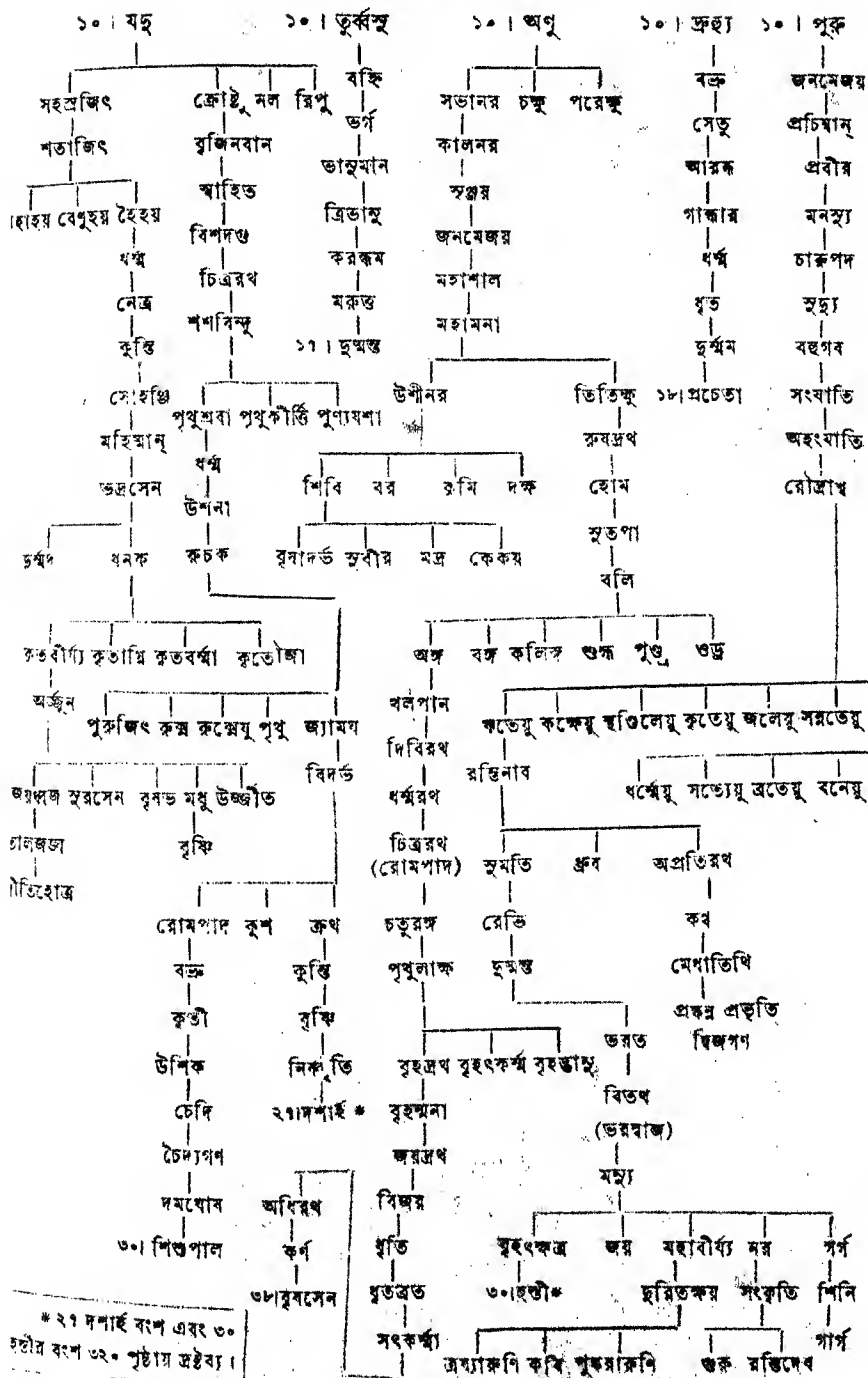
[১০ বর্ষ, ভুর্জ, অণু, ক্রিয় ও পুরু বংশের বিবরণ ৩১৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।]

শ্রীমদ্ভাগবতে—চন্দ্রবংশ ।

୨୧୬

ସହ, ତୁର୍କିଶ, ଅଂଗ୍ଳ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଓ ପୁରୁଷ ବଂଶାବଳୀ ।

(୭୧୪ ମୂର୍ତ୍ତୀର ମନ୍ତ୍ର ।)

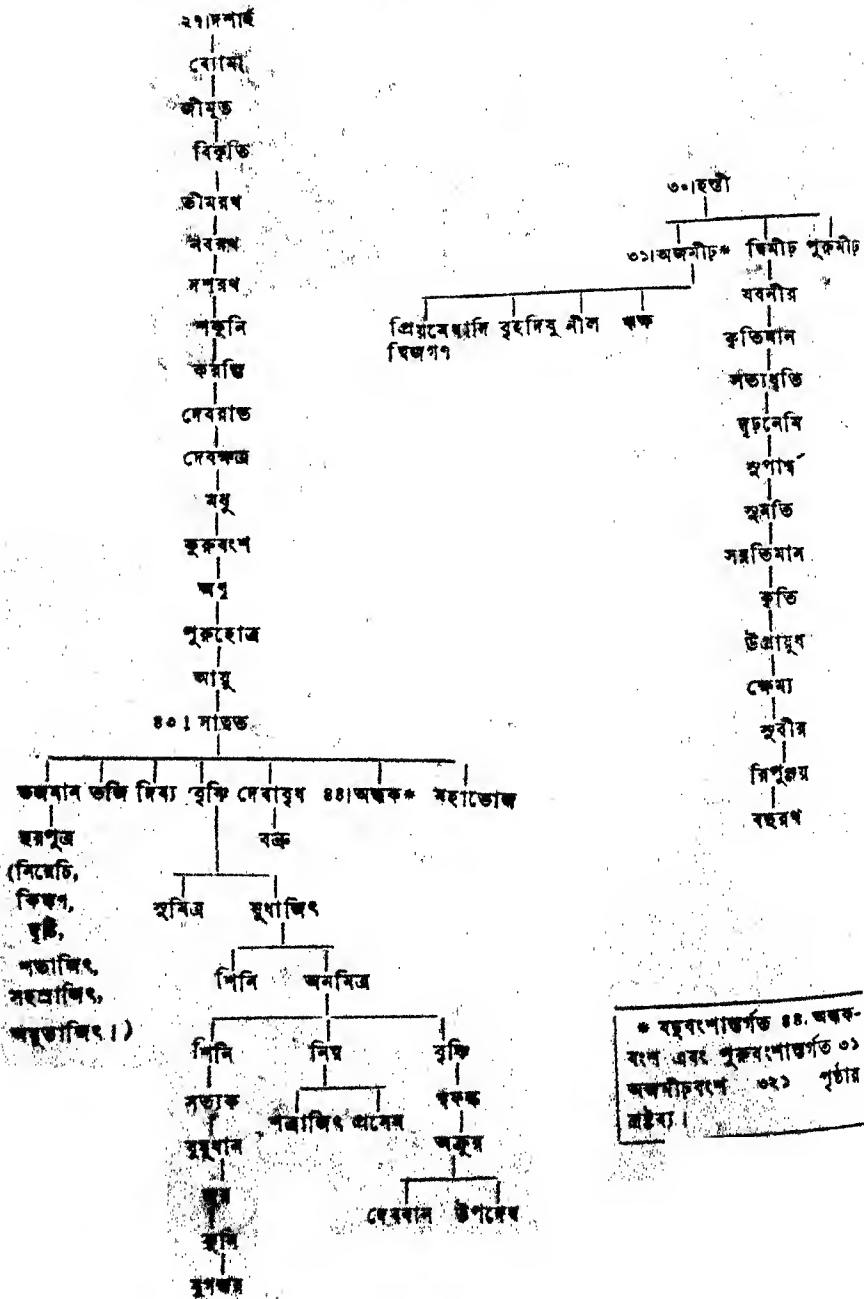


* ২৭ দশাই বংশ এবং ৩০
হতীয়া বংশ ৩২০ পৃষ্ঠায় প্রদেয়া।

শ্রীমদ্ভাগবতে—চন্দ্রবংশ ।

পুরুবংশোদ্ভূত হস্তীর এবং বহুবংশোদ্ভূত দশাহীর বংশ-পরিচয় ।

(৩১২ পৃষ্ঠার পর ।)

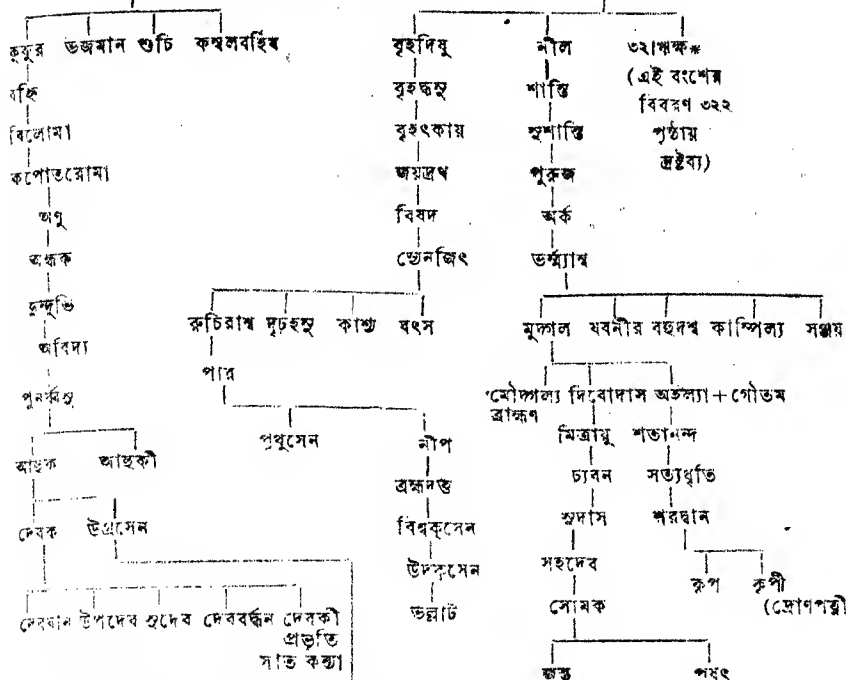


যদুবংশোক্তগত অক্ষক-বংশ এবং পুরুবংশোক্তগত অক্ষমীঢ়-বংশ ।

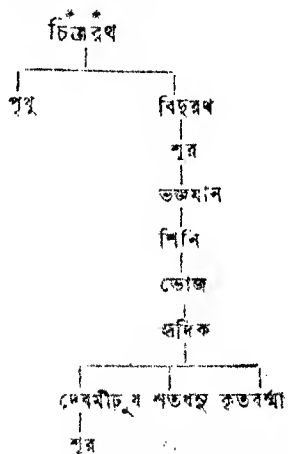
৪৪। অক্ষক

(৩২০ পৃষ্ঠার পর)

৩১। অক্ষমীঢ়



সে কন্যা হুগ্রোণ কক্ষ শঙ্কু হুগ্র রাষ্ট্রপাল কৃষ্টি কৃষ্টি কংসাবতী প্রভৃতি কন্যা।

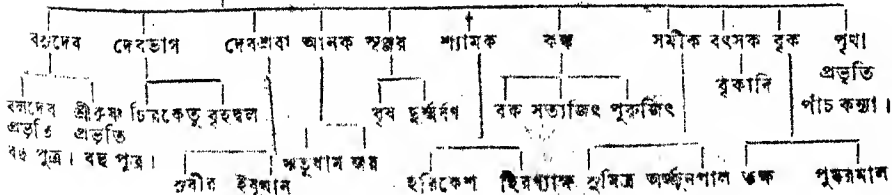


ক্রোপদী

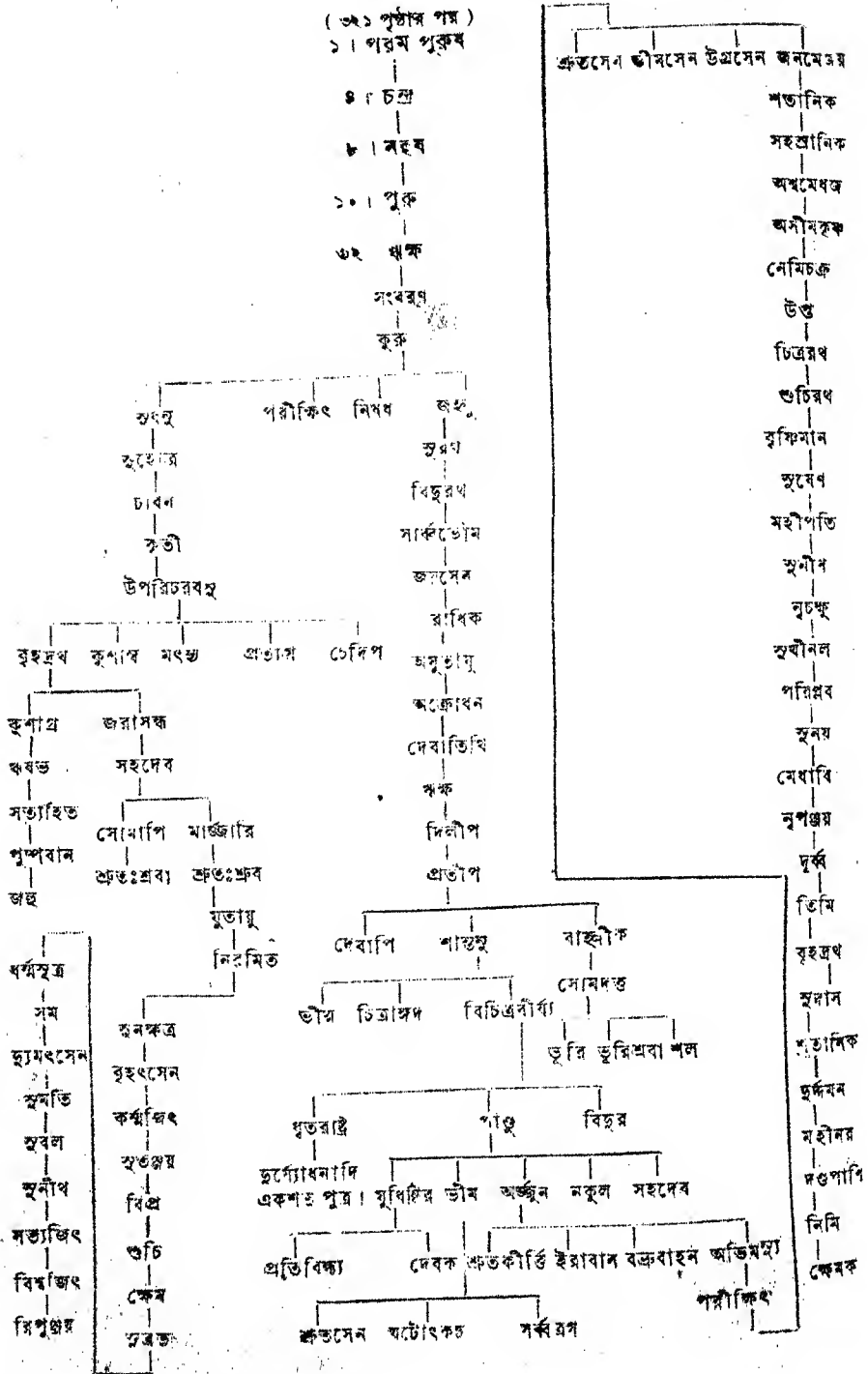
ধৃষ্টদ্যু

ধৃষ্টকেতু

* এই চিত্রংর কাহার পুত্র, তাহার কোনই বিবরণ নাই। তিনি বৃষ্ণি-বংশজ—এই মাত্র উল্লেখ আছে। কিন্তু অশ্ব পুরাণের সহিত মিলাইলে এই চিত্রংরকে অক্ষকবংশীয় বলিয়াই প্রভীত হয়। বিষ্ণুপুরাণের বংশ-পর্যায় (এই গ্রন্থের ৩১পৃষ্ঠায়) “সত্য” শাখার ভজমান-পুত্র বিদুরথ উল্লিখিত আছে। যদিও সেখানে চিত্রংর নাম নাই, কিন্তু চিত্রংর সেই পর্যায়েরই অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে হয়। সম্ভবতঃ ভজমানের পর চিত্রংর ছিলেন; তাঁহা হইতে বিদুরথ জন্মগ্রহণ করেন।

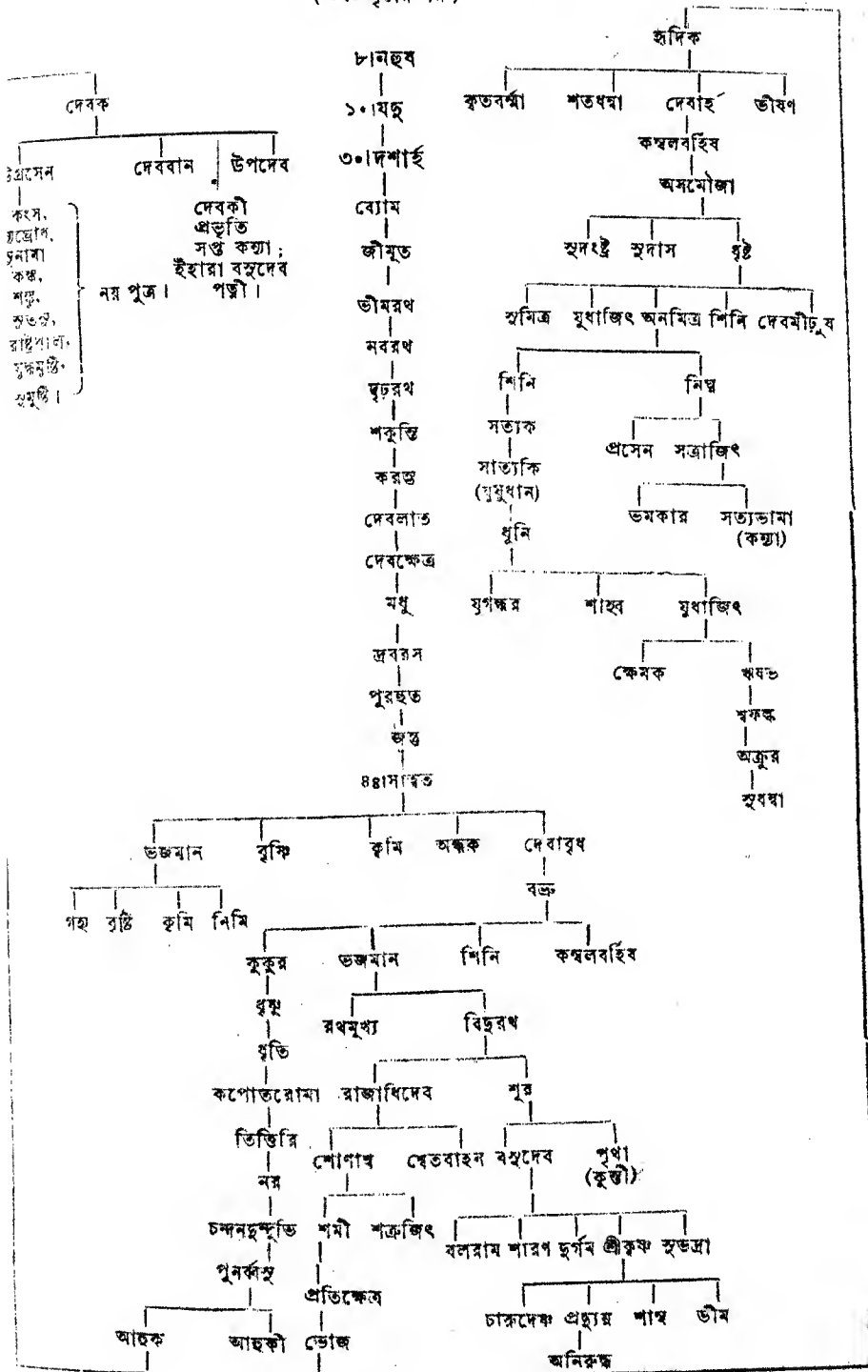


পুরুবংশান্তর্গত ঋক্ষ-বংশ ।



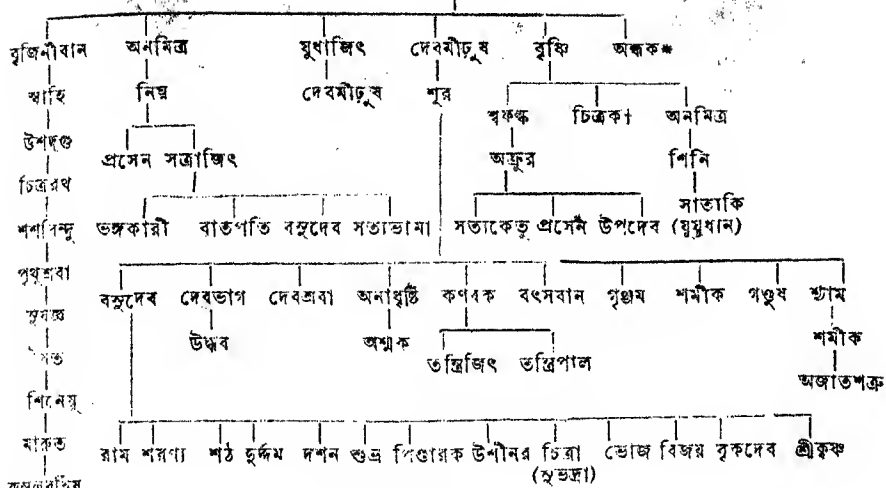
যত্নবংশান্তর্গত দশাঙ্কের বংশ পর্যালোচনা ।
(৩২৩ পৃষ্ঠার পর)

(৩২৩ পৃষ্ঠার পর)

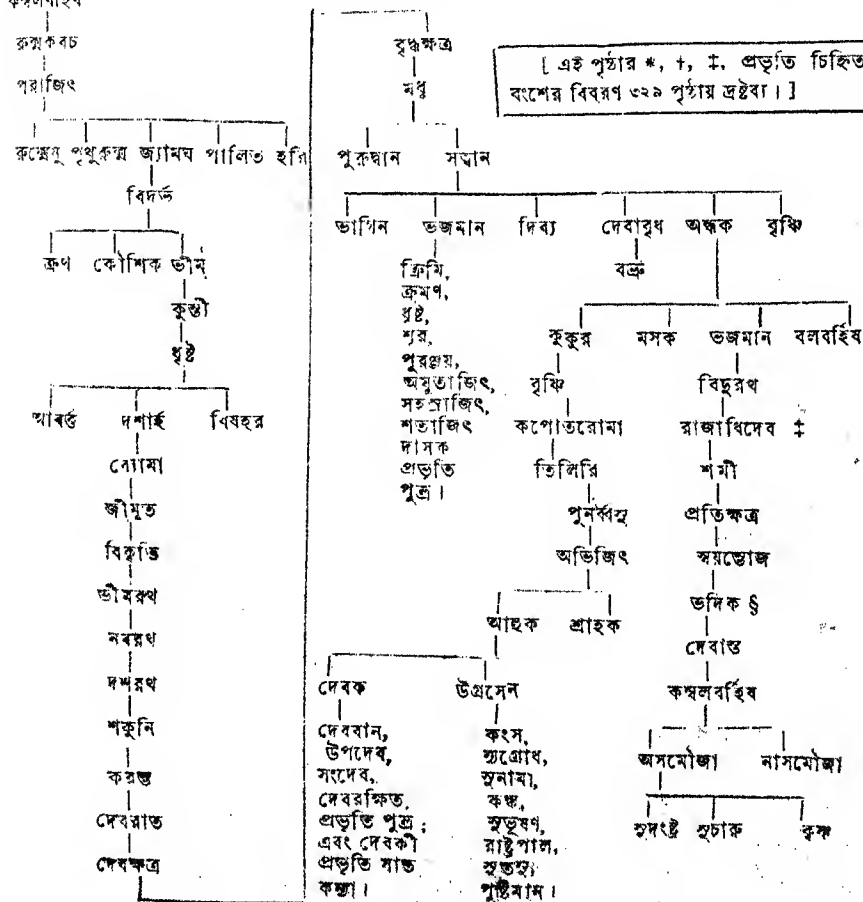


১০।ক্রোড়

୭୨୭



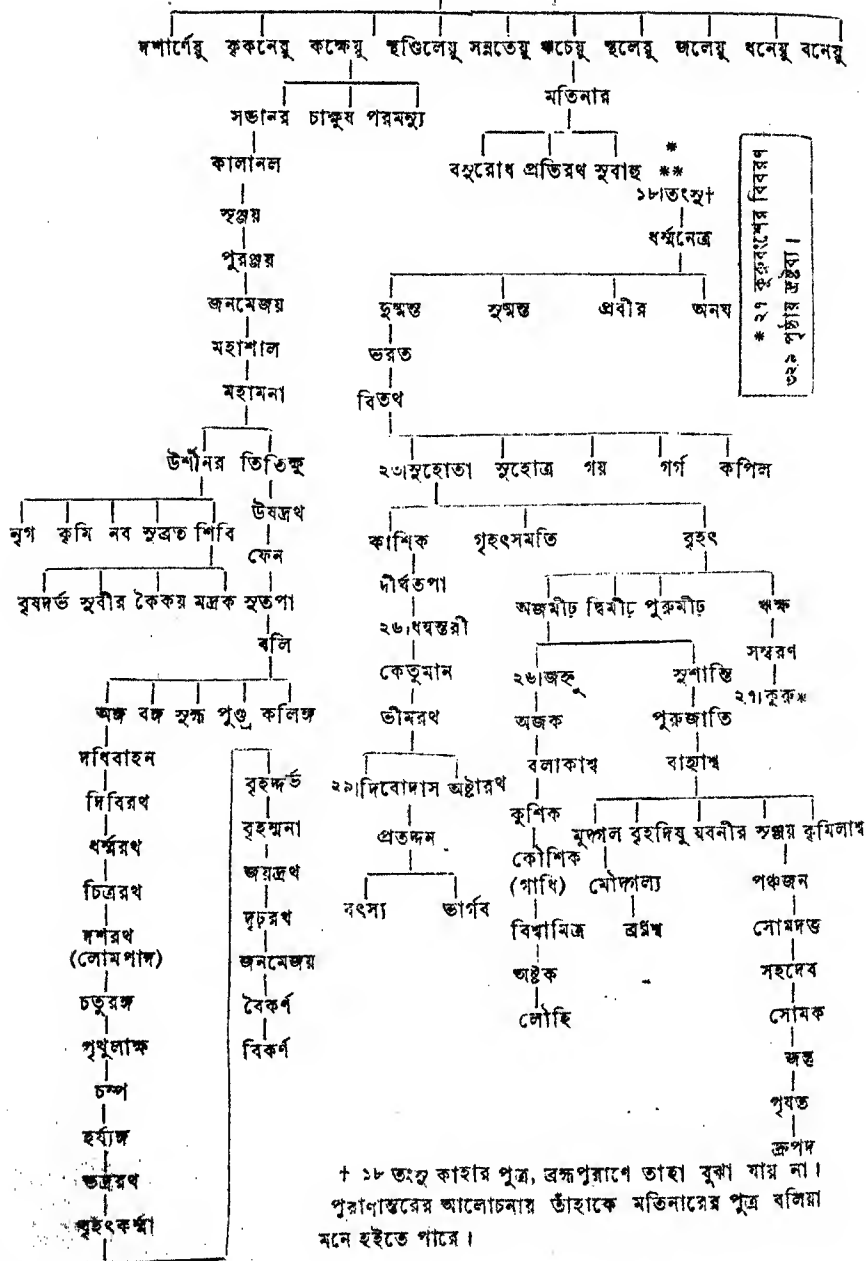
[এই পৃষ্ঠার *, †, ‡, প্রভৃতি চিহ্নিত
বংশের বিবরণ ৩২৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।]



(৩২৮ পৃষ্ঠার পর)

১। পুরু

১৫। রোত্রাধ



ব্রহ্মপুরাণে—চন্দ্রবংশ ।

৩২৯

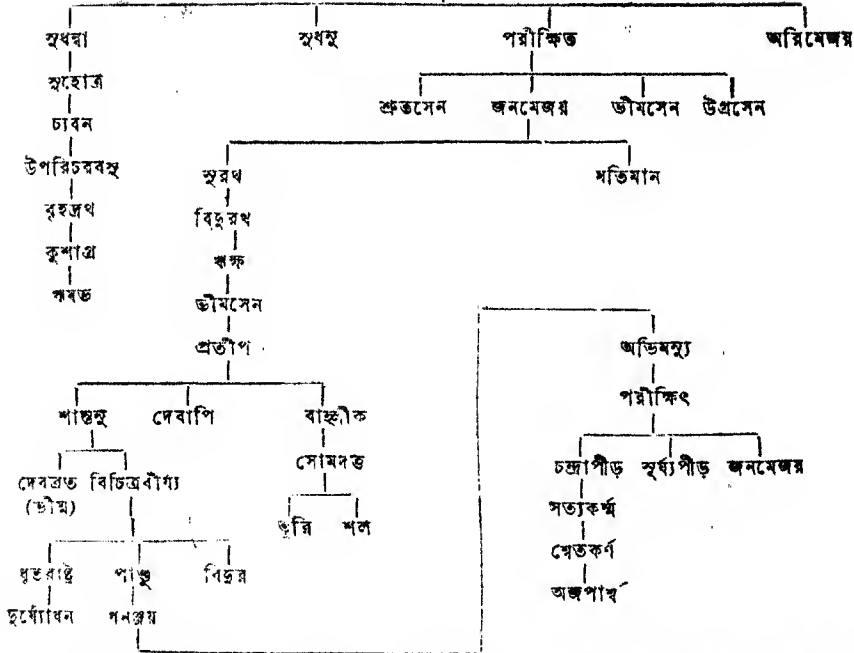
পুরুবংশান্তর্গত কুরু-বংশের বংশপর্যায় ।

(৩২৮ পৃষ্ঠার পর ।)

২১ পুরু

১৮৭ তংস্থ

২৭ কুরু



*. কুরিবংশের আয় (৩১২ পৃষ্ঠা জটব্য), এই ব্রহ্মপুরাণেও বিখ্যাত এবং ধর্মন্তরি সম্বন্ধে গণ্যমান্য আছে। তাহাতে দেখিতে পাই,—অমাবস্য-বংশে ১৭শ পর্য্যায় বিখ্যাত এবং আয়ু-বংশে ২২শ পর্য্যায় ধর্মন্তরি বিদ্যমান (৩২৬ পৃষ্ঠা জটব্য)। আবার অম্বত্র দেখিতে পাই,—তংস্থ-বংশের ২৬শ পর্য্যায় ধর্মন্তরি এবং ৩১শ পর্য্যায় বিখ্যাত আছে। কিন্তু শেষোক্ত স্থলে বিখ্যাতের ভগ্নী সত্যবতী বা তাঁহার পৌত্র পরশু-রামের নামোল্লেখ নাই। দুই বংশেরই একজন পূর্ব-পুরুষের নাম জহু। সেই জহুর পুত্র-পৌত্রাদির নামের মধ্যেও একটা দৃষ্ট হয়। এইরূপ যহু-পুত্র সহস্রদের বংশে মহিমান্ন রাজার নাম বংশ-তালিকায় (৩২৬ পৃষ্ঠার) দৃষ্ট হইবে। কিন্তু সেই মহিমান্ন রাজা যে কাহার পুত্র ছিলেন, ব্রহ্মপুরাণে তাহার উল্লেখ নাই। পুরাণান্তরের বংশ-পর্য্যায় দৃষ্টে আমরা মহিমান্নকে যহুবংশের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছি।

[৩২৭ পৃষ্ঠার নোট,—

* অন্ধকের উপমদগু, মদগু, মেহর, অরিমেজয়, অবিক্রীত, অন্ধপ, শক্রর, অরিমর্দন, ধর্মধুক, বতিধর্ম, যক্ষোক্ষর, অন্ধকরু, আবহ ও প্রতিবাহ প্রভৃতি পুত্র ও যক্ষরী নামে কহা হয়।

† চিত্রকের পুণ্ড, বিপুণ্ড, অম্বগ্রীব, অম্ববাহ, অম্বপাথ, গবেষণ, অরিষ্টোনিমি, অম্ব, সুধর্মী, ধর্মভূত, সুবাহ ও বহুবাহ প্রভৃতি পুত্র ও ছই কহা।

‡ রাজাধিদেবের শর্মী ব্যতীত দত্ত, অতিদত্ত, শোণাব, শ্বেতবাহন, দত্তশর্মী, প্রভৃতি পুত্র ও ছই কহা।

§ ভদ্রিকের দেবান্ত বাতীত কৃতবর্মী, শতধর্মী, নরান্ত, ভীষক, বৈভরণ, সুদাত, অতিদাত, নিকান্ত ও কাণদত্ত প্রভৃতি পুত্র ছিলেন।

¶ ভদ্রকায়ের সভাক ও নারের নামে ছই পুত্র ।]

৩৩০ স্বয়ংবংশের এবং চন্দ্রবংশের বংশপর্যায়-সমালোচনা স্তম্ভবিংশ পরিচ্ছেদে জটব্য।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ ।

মনু ও মনু-পুত্রগণ ।

[মনু ও মনুস্তর,—স্বায়ম্ভুব মনু,—ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে তাঁহার বংশ-বিবরণ ;—উত্তানপাদ ও প্রিয়ব্রতের পরিচয় ;—প্রিয়ব্রতের পুত্রগণ,—পুরাণান্তরে মতভেদ,—প্রিয়ব্রতের রাজ্যাধিকার,—প্রিয়ব্রত কর্তৃক পৃথিবীর সপ্তদ্বীপ বিভাগ,—প্রিয়ব্রতের বশোগৌরব ;—আগ্নীত্রাদি নয় পুত্র মধ্যে জম্বুদ্বীপ বিভাগ,—জম্বুদ্বীপ ও ভারতবর্ষ প্রদেশ ;—স্বায়ম্ভুব মনুর বংশলতা (ক্রীমদ্ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতির অনুসরণে) ;—বনভট্ট ভরত প্রভৃতির বৃত্তান্ত ;—উত্তানপাদ-বংশে প্রব, পৃথু, বেণ প্রভৃতি ;—অপরাগর মনু ও তাঁহাদিগের পুত্রগণ ।]

স্বর্ঘ্যবংশ ও চন্দ্রবংশই যে পৃথিবীর আদিভূত, ভারবর্ষের পুরাতত্ত্ব আলোচনা করিলে, তাহাও বলিতে পারা যায় না । কারণ, পুরাণাদি শাস্ত্রে আমরা দেখিতে পাই,—স্বর্ঘ্যবংশের

স্বায়ম্ভুব
মনু ।

ও চন্দ্রবংশের রাজগণ বৈবস্বত মনুস্তরে বিদ্যমান ছিলেন, এবং তাঁহাদের পূর্বে স্বায়ম্ভুব-স্বারোচিষাদি আরও ছয়টা মনুস্তর অতীত হইয়া গিয়াছিল ।

সেই সকল মনুস্তরেও কত কত মহাবল-পরাক্রান্ত নৃপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; কত কত মনীষি ঋষি-মহর্ষির আবির্ভাব হইয়াছিল । পূর্বেই আমরা বলিয়াছি,—এক সপ্ততি যুগে এক এক মনুস্তর হয় । * সেইরূপ ছয় মনুস্তরে চারিশত চব্বিশ যুগ অতীত হওয়ার পর, বৈবস্বত মনুস্তর আরম্ভ হইয়াছে, এবং শাস্ত্রানুসারে এখনও সেই মনুস্তরই চলিতেছে । † সে হিসাবে, প্রথমে স্বায়ম্ভুব মনুর রাজত্বকাল চলিয়া গিয়াছে ; তৎপরে যথাক্রমে দ্বিতীয় স্বারোচিষ মনুর, তৃতীয় উত্তমি (উত্তম) মনুর, চতুর্থ তামস মনুর, পঞ্চম রৈবত মনুর এবং ষষ্ঠ চাক্ষুষ মনুর বংশধরগণ রাজত্ব করিয়াছিলেন । এক বৈবস্বত মনুস্তরের ইতিহাস উদ্ধার করাই হুঃসাধ্য ; সে ক্ষেত্রে, তৎপূর্ববর্তী মনুস্তর-সমূহের—দূর অতীতের—বিবরণ কি প্রকারে সংগ্রহ হইতে পারে ? শাস্ত্রকারগণই বলিয়া গিয়াছেন,—সমস্ত মনুস্তরের বৃত্তান্ত, শত বর্ষেও বর্ণন করিতে পারা যায় না ;—“ন শক্যো বিস্তরো বিপ্রা বক্তুং বর্ষশতৈরপি ।” তবে, পুরাণাদি শাস্ত্রে তত্তৎ-মনুস্তরের যৎকিঞ্চিৎ যে আভাস পাওয়া যায়, আমরা সংক্ষেপে তাহা উল্লেখ করিতেছি । সে সম্বন্ধে অবশ্য নানা পুরাণে নানা মত দেখিতে পাওয়া যায় । প্রথম স্বায়ম্ভুব মনু ;—তাঁহার বংশ-সম্বন্ধেই কত মত-পার্থক্য বিদ্যমান ! বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে,—‘স্বায়ম্ভুব মনুর দুই পুত্র,—প্রিয়ব্রত এবং উত্তানপাদ । তন্মধ্যে প্রিয়ব্রতের আগ্নীধ্রু, অগ্নিবাহ প্রভৃতি দশ পুত্র ; এবং উত্তানপাদের উত্তম ও প্রব নামে দুই পুত্র । সেই প্রবের বংশে বেণ, পৃথু প্রভৃতি প্রবল-পরাক্রান্ত নৃপতিগণ জন্মগ্রহণ করেন ।’ ব্রহ্মপুরাণের মতে,—‘প্রিয়ব্রত এবং উত্তানপাদ ব্যতীত স্বায়ম্ভুব মনুর বহু পুত্র ; অগ্নিধ্রু, অগ্নিবাহ প্রভৃতিও তাঁহার পুত্র মধ্যে পরিগণিত ।’ বেণ, পৃথু প্রভৃতি সম্বন্ধে ব্রহ্মপুরাণে ও বিষ্ণুপুরাণে বিশেষ মতান্তর নাই । শিবপুরাণের মতে,—‘প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ প্রভৃতি মনুর বহু পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ।’ এই পুরাণে প্রব-বংশের পরিচয়

* এই গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে মনব ও বোড়শ পৃষ্ঠার ‘নোট’ ত্রুটি ।

† বিষ্ণুপুরাণ, তৃতীয় অংশ, প্রথম অধ্যায়, ৩১শ শ্লোক ; শিবপুরাণ, ধর্মসংহিতা, ১৮শ অধ্যায়, ২৪ শ্লোক ; ক্রীমদ্ভাগবত, অষ্টম স্কন্ধ, তৃতীয় অধ্যায়, ২৪ শ্লোক, এবং ভ্রমোদন অধ্যায়, ২৪ শ্লোক ; হরিবংশ, সপ্তম অধ্যায় ।

পাওয়া যায় বটে ; কিন্তু আশীধু প্রকৃতি কাহার পুত্র,—তাহা নির্ণয় করা কঠিন। গরুড়-পুরাণে উক্ত হইয়াছে,—‘স্বায়ম্ভুব মনুর অশ্বিধু প্রকৃতি পুত্র হয় ;—মনুঃ স্বায়ম্ভুবঃ পূর্ব-ময়ীধানাশ্চ তৎসুতাঃ । গরুড়-পুরাণে এবং বংশের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায় না । হরিবংশে দেখিতে পাই,—‘অশ্বিধু, অশ্বিবাহ প্রকৃতি স্বায়ম্ভুব মনুর দশ পুত্র ।’ আবার শ্রীমদ্ভাগবতে আছে,—‘স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ, এবং সেই প্রিয়ব্রত হইতে আশীধু প্রকৃতি জন্মগ্রহণ করেন ।’ সে হিসাবে, এবং, বেণু, পৃথু—মনু-পুত্র উত্তানপাদের বংশ-সমুদ্ভূত । অশ্বিপুরাণের মতে,—‘স্বায়ম্ভুব মনুর দুই পুত্র ও এক কন্যা । পুত্র—প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ ; এবং কন্যার নাম—কাম্যা ।’ ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে দৃষ্ট হয়,—‘স্বায়ম্ভুব মনুর অপর নাম—বৈরাজ মনু । তাঁহার শতরূপা-নারী পরীর গর্ভে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামক দুইটি পুত্র-রহ জন্মগ্রহণ করেন । এই মনুর আরও অসংখ্য পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল ।’ বরাহ-পুরাণেও প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ, স্বায়ম্ভুব-মনুর পুত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছেন । কিন্তু উহাতে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদের বংশ-বিষয়ে অধিক কিছু লিখিত নাই । দেবী-ভাগবতে লিখিত আছে,—‘স্বায়ম্ভুব-মনুর ষোষ্ঠ পুত্র প্রিয়ব্রত ;’ ইত্যাদি । * এইরূপ পুরাণ-সমূহের মধ্যে যতাস্তর থাকিলেও, একটু অমূল্যকান করিলেই বুঝিতে পারা যায়,—প্রিয়ব্রত, উত্তানপাদ প্রকৃতি স্বায়ম্ভুব-মনুর পুত্র এবং আশীধু প্রকৃতি তাঁহার পৌত্র ।

স্বায়ম্ভুব-মনুর ষোষ্ঠ পুত্র প্রিয়ব্রত, প্রজাপতি বিবকর্ণার কন্যা বহিষতীকে বিবাহ করেন । সেই স্ত্রীর গর্ভে আশীধু প্রকৃতি তাঁহার দশ পুত্রের উৎপত্তি হয় । শ্রীমদ্ভাগবতে এই

প্রিয়ব্রত মত ব্যক্ত হইয়াছে । কিন্তু বিষ্ণু-পুরাণের মতে,—প্রিয়ব্রত, কর্দ্দমের ঔরস-
ও কাত কন্যাকে বিবাহ করেন, এবং তাঁহার সপ্তাট ও কুশি নারী দুই কন্যা
হৎপুত্রগণ । ও দশ পুত্র জন্মগ্রহণ করে । প্রিয়ব্রতের সেই দশ পুত্রের নাম

সম্বন্ধে সকল পুরাণ এক মত নহেন । ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে, ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে, প্রিয়ব্রতের দশ পুত্রের নাম ও পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে । তাঁহাদের সেই নাম সম্বন্ধে কোন্ পুরাণের সহিত কোন্ পুরাণের বিরূপ অসামঞ্জস্য বিদ্যমান, নিয়ে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে ;—

বিষ্ণুপুরাণে ।	শ্রীমদ্ভাগবতে ।	গরুড়পুরাণে ।	দেবীভাগবতে ।
আশীত্র,	আশীত্র,	অশ্বিধু,	আশীত্র,
অশ্বিবাহ,	ইশ্বজিহব,	অশ্বিবাহ,	ইশ্বজিহব,
বপুমান,	যজ্ঞবাহ,	বপুমান,	যজ্ঞবাহ,
ভাতিমান,	মহাবীর,	হ্যতিমান,	হিরণ্যাবেশ্ব,
বেণা,	হিরণ্যাবেতা,	মেধক,	সুতপূর্ণ,
বেণাজিবি,	সুতপূর্ণ,	বেণাজিবি,	বেণাজিবি-
ভব্য,	সবন,	ভব্য,	বীতিহোত্র,
সবন,	বেণাজিবি,	সবন,	মহাবীর,
পুত্র,	বীতিহোত্র,	পুত্র,	করুণকর,
জ্যোতিমান্ ।	কবি ।	জ্যোতিমান্ ।	সবন ও কবি ।

* বিষ্ণুপুরাণ, প্রথমার্ণ, সপ্তম অধ্যায় এবং দ্বিতীয়ার্ণে প্রথম অধ্যায় ; ব্রহ্মপুরাণ, দ্বিতীয় ও পঞ্চম অধ্যায় ; শিবপুরাণ, ধর্মসংহিতা, বি-পঞ্চাশৎ অধ্যায় ; হরিবংশ, সপ্তম অধ্যায় ; শ্রীমদ্ভাগবত, চতুর্থ স্কন্ধ, একত্রিংশ অধ্যায় ; অশ্বিপুরাণ, অষ্টাদশ অধ্যায় ; বরাহপুরাণ, দ্বিতীয় অধ্যায় ; দেবীভাগবত, অষ্টম স্কন্ধ, চতুর্থ অধ্যায় ; ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, দশম অধ্যায় ।

উল্লিখিত দশ পুত্র ব্যতীত প্রিয়ব্রতের অপর এক ভাৰ্য্যার গণ্ডে উত্তম, তামস ও রৈবত নামে তিন পুত্র উৎপন্ন হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের মতে,—সেই তিন পুত্র পরবর্ত্তি-কালে মন্বন্তরাধিপতি হইয়াছিলেন। যাহা হউক, প্রিয়ব্রতের প্রথমোক্ত দশ পুত্রের মধ্যে তিন পুত্র সম্ভ্রাসাশ্রম গ্রহণ করেন। অবশিষ্ট সাত পুত্র রাজ্যাধিকার লাভ করিয়াছিলেন। প্রিয়ব্রত সমাগরাধরগীর অধীশ্বর ছিলেন। তিনি পৃথিবীকে সপ্ত ভাগে বিভক্ত করিয়া, আপনার সপ্ত পুত্রকে তাহা প্রদান করেন। তিনি যে সাত ভাগে পৃথিবীকে বিভাগ করিয়াছিলেন, সেই সাত ভাগের নাম,—জম্বু-দ্বীপ, প্লক্ষ-দ্বীপ, শাল্মলী-দ্বীপ, কুশ-দ্বীপ, ক্রৌঞ্চ-দ্বীপ, শাক-দ্বীপ, পুষ্কর-দ্বীপ। * ঐ দ্বীপ-সমূহের চতুর্দিকে লবণ-সমুদ্র, ইক্ষু-সমুদ্র, সুরা-সমুদ্র, হৃত-সমুদ্র, ক্ষীর-সমুদ্র, দধি-সমুদ্র ও জল-সমুদ্র নামে সাতটি সমুদ্র বিস্তারিত ছিল। পূর্বোক্ত সপ্ত-দ্বীপের মধ্যে, রাজা প্রিয়ব্রত আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র আয়ীধকে জম্বুদ্বীপে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি ইয়াজ্জিবকে প্লক্ষ-দ্বীপ, মজ্জবাহকে শাল্মলী-দ্বীপ, হিরণ্যারেতাকে কুশ-দ্বীপ, হৃতপৃষ্ঠকে (হৃতপৃষ্ঠ) ক্রৌঞ্চ-দ্বীপ, মেধাতিথিকে শাক-দ্বীপ এবং বীতিহোত্রকে পুষ্কর-দ্বীপ প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ সপ্ত-দ্বীপে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে, বর্ত্তমান পৃথিবীর যে সাতটি অংশকে বুঝাইয়া থাকে, পূর্বেই আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছি। † ফলতঃ, পাশ্চাত্য-মতের নূতন ও প্রাচীন ভূ-গোলার্ধ, উভয়ই ঐ সপ্ত-দ্বীপের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পৃথিবীকে সপ্তভা বিভক্ত করিয়া, প্রিয়ব্রত কোন্ পুত্রকে কোন্ ভাগ প্রদান করেন,—তদ্বিষয়ে দেবী-ভাগবত ও শ্রীমদ্ভাগবত এক মত হইলেও, কিছুপুরাণে পার্থক্য দৃষ্ট হয়। কিছুপুরাণের মতে,—“প্রিয়ব্রতের দশ পুত্রের মধ্যে মেধা, অঘিবাহ ও পুত্র (শ্রীমদ্ভাগবতের ও দেবী-ভাগবতের মতে, কবি, মহাবীর ও সর্বন) —এই তিনজন উর্দ্ধরেতা, সংসার-ত্যাগী, যোগপরায়ণ হন। প্রিয়ব্রত পৃথিবীকে সপ্তভাগে বিভক্ত করিয়া, আয়ীধকে জম্বু-দ্বীপ, মেধাতিথিকে প্লক্ষ-দ্বীপ, বপুমানকে শাল্মলী-দ্বীপ, জ্যোতিমানকে কুশ-দ্বীপ, দ্রাতিমানকে ক্রৌঞ্চ-দ্বীপ, ভব্যকে শাক-দ্বীপ এবং সর্বনকে পুষ্কর-দ্বীপ অর্পণ করেন।” ‡ প্রিয়ব্রত সর্ববিষয়েই পুরুষ-শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিকীৰ্ত্তিত। শ্রীমদ্ভাগবতের মতে,—“তিনি একাদশ অর্কুদ বৎসর পৃথিবী ভোগ করেন। তিনি অশ্বগুণীর বলপূর্ণ বাহ-যুগলে ধনুকের গুণ আকর্ষণ করিয়া টঙ্কার দিলে, বিনা যুদ্ধেই আত্মকে প্রতিপক্ষগণ নিরস্ত হইত।” প্রিয়ব্রতের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া, বহু গাথা প্রচলিত আছে। অর্কু-পৃথিবী অন্ধকারে আবৃত হয়, এবং অর্কু-পৃথিবী আলোকে উদ্ভাসিত থাকে,—আপন সাম্রাজ্য মধ্যে এইরূপ প্রাকৃতিক ভাব-বৈচিত্র্য লক্ষ্য করিয়া, রাজা প্রিয়ব্রত অন্ধকার দূর করিবার জন্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। তিনি প্রতিজ্ঞা করেন,—“আমি স্বকীয় তেজে রজনীকেও দিন করিব।” অতঃপর বেগবান্ জ্যোতির্গয় রথে আরোহণ করিয়া, দ্বিতীয় ভাস্করের স্থায়, তিনি সূর্য্যের অনুসরণ করেন। তাঁহার সেই অনুসরণ-কালে রথচক্রে যে সাতটি খাত

* শ্রীমদ্ভাগবত, পঞ্চম স্কন্ধ, প্রথম অধ্যায়; দেবীভাগবত, অষ্টম স্কন্ধ, চতুর্থ অধ্যায়; গরুড়পুরাণ, পূর্ব-খণ্ড, চতুঃপাদ্যে অধ্যায়।

† এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়, ষোড়শ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

‡ কিছুপুরাণ, দ্বিতীয়োপাখ্যান, প্রথম অধ্যায়; শ্রীমদ্ভাগবত, পঞ্চম স্কন্ধ, প্রথম অধ্যায়; দেবীভাগবত, অষ্টম স্কন্ধ, চতুর্থ অধ্যায়।

হইয়াছিল, তাহাই সপ্ত-সমুদ্র ; এবং সেই খাত-পরিবেষ্টিত ভূমিখণ্ড-সমূহ সপ্ত-দ্বীপ নামে অভিহিত । প্রিয়ব্রত-মহিমা কীর্তনে যে গাথা পুরাণাদি শাস্ত্রে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার মর্ম্ম এই,—“ঈশ্বর বাতীত কোন্ ব্যক্তি প্রিয়ব্রত-কৃত কার্য্য করিতে পারে?” শেষ বয়সে রাজচক্রবর্তী প্রিয়ব্রত, আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া, মোক্ষপদের অধিকারী হইয়াছিলেন ।

প্রিয়ব্রতের পুত্রগণের মধ্যে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র, জম্বুদ্বীপের অধিকারী আগ্নীধু, বিশেষ প্রসিদ্ধ । তাঁহার বংশ হইতেই ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধি । রাজা আগ্নীধু, পিতা প্রিয়ব্রতের

আগ্নীধুদি
প্রিয়ব্রত
বংশ ।

অনুশাসন-ক্রমে, ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, জম্বুদ্বীপ-নিবাসী প্রজা-পুঞ্জকে পুত্র-সদৃশ প্রতিপালন করিয়াছিলেন । তিনি বহু অযুত বৎসর জম্বু-দ্বীপে অধিষ্ঠিত ছিলেন । রাজর্ষি আগ্নীধুর নয় পুত্র । পুত্রগণের নাম—

নাভি, কিস্পুরুষ, হরি, ইলাবৃত, রম্যক, কুরু, হিরণ্ময় (হিরণ্যন), ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল । রাজা আগ্নীধু আপনার নয় পুত্রকে জম্বুদ্বীপ নয় ভাগে ভাগ করিয়া দেন । সেই এক এক ভাগ, এক এক বর্ষ নামে অভিহিত হয় ;—নাভি-বর্ষ, কিস্পুরুষ-বর্ষ, হরি-বর্ষ, ইলাবৃত-বর্ষ, রম্যক-বর্ষ, কুরু-বর্ষ, ভদ্রাশ্ব-বর্ষ, কেতুমাল-বর্ষ । জম্বুদ্বীপের কোন্ অংশে কোন্ বর্ষ অবস্থিত, বিষ্ণুপুরাণের বর্ণনায় তাহার আভাস পাওয়া যায় । বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—তিনি নাভিকে দক্ষিণ হিমবর্ষ, অর্থাৎ হিমালয়ের দক্ষিণে অবস্থিত দেশ, কিস্পুরুষকে হেমকূটবর্ষ, হরিবর্ষকে নৈষধ-বর্ষ, ইলাবৃতকে মেরুর চতুর্দিকবর্তী স্থান, রম্যকে নীলাচলের আশ্রিত বর্ষ, হিরণ্ময়কে তদু-ত্তরবর্তী শ্বেতবর্ষ, কুরুকে শৃঙ্গবান পর্ব্বতের উত্তরস্থ শৃঙ্গবৎবর্ষ, ভদ্রাশ্বকে মেরুর পূর্ব্বভাগ এবং কেতুমালকে গন্ধমাদনবর্ষ দান করেন । আগ্নীধুর জ্যেষ্ঠ-পুত্র নাভি—যিনি হিমালয়ের দক্ষিণাংশ প্রাপ্ত হন, তিনিই—ভারতবর্ষের অধিপতি হইয়াছিলেন বলিয়া বুঝিতে পারা যায় । তাঁহার পুত্র ঋষভ এবং ঋষভ হইতে ভারত জন্মগ্রহণ করেন । ঋষভের শত-পুত্রের মধ্যে ভারত জ্যেষ্ঠ ; তাঁহার নামানুসারেই ‘ভারতবর্ষ’ নামের উৎপত্তি । পণ্ডিতগণ অনেকেই জম্বুদ্বীপকে ভারতবর্ষ বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন । কিন্তু প্রিয়ব্রতের পৃথিবী বিভাগ এবং আগ্নীধুর জম্বুদ্বীপ ভাগ প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করিলে, জম্বুদ্বীপকে একমাত্র ভারতবর্ষ বলিয়া মনে হয় না । দেবী-ভাগবতের বর্ণনায় প্রকাশ,—‘জম্বুদ্বীপ, পদ্মের কর্ণিকার ত্রায়, গোলাকারে অবস্থিত । উহা বহু যোজন বিস্তৃত ; উহাতে আটটি মহাদাকার পর্ব্বত এবং বহু নদ-নদী বিস্তৃত আছে ।’ অন্যান্য পুরাণেও জম্বুদ্বীপের আকারের, বিভাগের এবং নদ-নদী প্রভৃতির যে পরিচয় আছে, তাহাতেও উহাকে ভারতবর্ষ বলিয়া বুঝা যায় না । পরন্তু, তাহাতে জম্বু-দ্বীপ অর্থে—সমগ্র প্রাচীন গোলাদিকেই বুঝাইয়া থাকে । জম্বুদ্বীপ বৈষ্ণব-ভাবে নয় বর্ষে বিভক্ত হইয়াছিল,—বিষ্ণুপুরাণে, শ্রীমদ্ভাগবতে, দেবীভাগবতে, গরুড়পুরাণে, ব্রহ্মপুরাণে তাহা পরি-বর্ণিত হইয়াছে ।* ভারতবর্ষ যে জম্বুদ্বীপের মধ্যবর্তী ভূভাগ, ব্রহ্মপুরাণে তাহা বিশদভাবে লিখিত আছে । এমন কি, ব্রহ্মপুরাণ স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন,—“সমুদ্রের উত্তরে এবং

* বিষ্ণুপুরাণ, দ্বিতীয় অংশ, দ্বিতীয় অধ্যায় ; শ্রীমদ্ভাগবত, পঞ্চম স্কন্ধ, ষোড়শ অধ্যায় ; দেবীভাগবত, অষ্টম স্কন্ধ, চতুর্থ ও অষ্টম অধ্যায় ; গরুড়পুরাণ, পূর্ব্বখণ্ড, ৫৪শ অধ্যায় ; বরাহ-পুরাণ, পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় ; ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ, পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় ; ব্রহ্ম-পুরাণ, অষ্টাদশ অধ্যায় ।

হিমাচলের দক্ষিণে যে বর্ষ বিদ্যমান, তাহার নাম ভারতবর্ষ।...ভারতবর্ষের পূর্ব দিকে কিয়ত এবং পশ্চিমে যবনগণের বাস। এই বর্ষমধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ যথাযথ বিভাগ-ক্রমে অবস্থিত। জম্বুদ্বীপান্তর্গত ভারতে যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণু সর্বদাই পূজিত হন; জম্বুদ্বীপের মধ্যে ভারতবর্ষই প্রধান।" * পুরাণাদির মতে, ভারতবর্ষের বিস্তার পরিমাণ—নব সহস্র যোজন।

রাজা প্রিয়ব্রতের বৃদ্ধ-প্রপৌত্র যে ভরত হইতে ভারতবর্ষ নামের উৎপত্তি হয়, তিনি পরম ভাগবত বলিয়া প্রসিদ্ধ। ভরতের পিতা ঋষভ দেব আপন পুত্রগণকে ধর্মপরায়ণ ও সদগুণাবিত

করিবার জন্ত বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রদিগের মধ্যে, ভরত
 ৳৮৩ ও ভরত এবং কুশাবর্ত প্রমুখ নয় পুত্র ব্যতীত, কবি, হরি, অন্তরীক্ষ, প্রব্রু, প্রভৃতি।

পিপ্লনায়ন, আবির্হোত্র, দ্রবীড়, চমস এবং করভাজন প্রভৃতি পুত্রগণ ভাগবদ্ধর্ম-প্রদর্শক পরম-ভাগবত বলিয়া প্রসিদ্ধ। রাজাদিরাজ ঋষভ-দেব ব্রাহ্মণদিগের প্রদর্শিত পথানুসারী হইয়া, সামাদি উপায় অবলম্বন পূর্বক, প্রজাপালনে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে অশ্বের স্রব্যের প্রতি কেহ দৃষ্টিপাতও করে নাই। প্রজারা তাঁহার নিকট অনুক্ষণ-বর্তমান স্নেহাতিশয় ভিন্ন আর কিছুই কামনা করিত না। ঋষভের পুত্র ভরত, পৃথিবী-পতি নামে পরিচিত হইয়া, পিতৃ-পিতামহের হ্রায় প্রজাবাসল্য প্রকাশ করিয়া-ছিলেন। পিতৃ-পিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণে তিনি ধর্ম-কর্ম যাগ-যজ্ঞের অমুষ্ঠানে রত ছিলেন। সহস্র অযুত বৎসর রাজ্যভোগের পর, পুলস্ত্য আশ্রমে হরিক্ষেত্রে গিয়া, তিনি সম্মাস-ধর্ম অবলম্বন করেন। কিন্তু তখনও তিনি মায়া পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। সুতরাং পরীক্ষার বিষম পাকে পড়িয়া, তাঁহাকে মোক্ষের পথ হইতে পিছাইয়া আসিতে হয়। এক-দিন তিনি মহানদী গঙকীতে স্নান করিতে গিয়া প্রণব-জপে মগ্ন ছিলেন; এমন সময় একটা ভৃগুচূরা হরিণী জল পান করিতে আসে। সেই সময় সহসা সিংহের গর্জনে শুনিয়া, উল্লঙ্ঘনে নদী পার হইতে গিয়া, হরিণীর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে সে এক শিশু-সন্তান প্রসব করে কিন্তু হরিণীর মৃত্যু হইলে, তাহার সঙ্গিগণ সকলেই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়; তাহার সন্তোজাত শিশু যুবু অবস্থায় নদীর ত্রোতে ভাসমান হয়। সেই সময়, স্নেহপরবশ হইয়া, ভরত সেই মৃগশিশুটিকে পালন করিতে প্ররত্ত হন। অবশেষে সেই মৃগ-শিশুর বিষয় চিন্তা করিতে করিতেই তাঁহার দেহান্তর ঘটে। ফলে, তিনি মৃগ প্রাপ্ত হন। তাহার পর, জন্ম-জন্মান্তরে জড়ভরত-রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া, তিনি আত্মজ্ঞান লাভ করেন এবং পরিশেষে তাঁহার মুক্তিলাভ হয়।† প্রিয়ব্রত-বংশের অন্ত্যস্ত নৃপতিগণের মধ্যে গয়, বিরজ ও শতভিৎ বিশেষ প্রসিদ্ধ। গয়—রাজর্ষি নামে পরিচিত ছিলেন; তাঁহার সম্বন্ধে বহু গাথা প্রচলিত আছে। তিনি প্রজাপুঞ্জের লালন-পালন, পোষণ, প্রীণন ও শাসনাদিরূপ ধর্ম্যাচরণে এবং যাগ-যজ্ঞাদি ক্রিয়া-কর্মের অমুষ্ঠানে বিশেষ

* ব্রহ্মপুরাণ উনবিংশ অধ্যায়ে,—

"উক্তরেণ সমুদ্রস্য হিমাশ্রোশ্চব দক্ষিণে। বর্ষ ভভারতঃ নাম ভারতী বত্র সম্ভতি ॥"

† ঐশ্বর্য্যপুস্তকের পঞ্চম স্কন্ধে, সপ্তম হইতে চতুর্দশ অধ্যায়ে, রাজা ভরতের এই কৌতূহলোদ্দীপক চরিত্র-চিত্র চিত্রিত আছে।

বংশী হইয়াছিলেন। প্রচলিত গাথা-সমূহে উক্ত আছে,—‘তিনি মনস্বী, বহজ, ধর্মরক্ষক ও সাধুদিগের সেবক ছিলেন। ভগবানের অংশ ভিন্ন অস্ত্র কোন্ ব্যক্তি কর্তৃক দ্বারা তাঁহাকে অম্লকরণ করিতে পারেন?’ মহাত্মা বিরজ ও শতজিতের গুণ-কীর্ত্তন করিয়াও নানা শ্লোক প্রচলিত আছে। একটী শ্লোকের মর্ম্ম এই,—‘ভগবান বিষ্ণু যেমন দেবগণকে অলঙ্কৃত করেন, প্রিয়ত্রতের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া মহাত্মা বিরজ এবং শতজিৎ উভয়েই আপনাপন গুণ ও কীর্ত্তি দ্বারা ঐ বংশকে সেইরূপ ভূষিত করিয়াছেন।’

স্বায়ম্ভুব মনুর জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিয়ত্রতের বংশধরগণ বরাহ-কল্পে এই পৃথিবীর অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহাদের আধিপত্যকাল—‘স্বায়ম্ভুব মনন্তর’ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

উত্তানপাদের
বংশ।

তদনন্তর স্বারোচিষ মনন্তর; এই মনন্তরে পৃথিবীতে উত্তানপাদ রাজার বংশধরগণের আধিপত্য বিস্তৃত হয়। * রাজা উত্তানপাদের দুই মহিষী ছিলেন। মহিষীদ্বয়ের নাম—সুনীতি (ব্রহ্মপুরাণের মতে সুনতা) ও

সুরুচি। সুরুচির গর্ভে উত্তম এবং সুনীতির গর্ভে ঐব জন্মগ্রহণ করেন। রাজা উত্তানপাদ সুরুচিতে অমুরজ হইয়া, ঐবের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করায়, পঞ্চমবর্ষীয় শিশু ঐব দুর্লভ তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তপস্যার ফলে, সিদ্ধকাম হইয়া, তিনি সঙ্গাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হন এবং ঐবলোক লাভ করেন। ঐবের ভ্রাতা উত্তমকে বন্ধগণ নিহত করিয়াছিল। তাহাদিগকে শাস্তিদানের জন্ত, ঐব বন্ধদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। ঐব যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে, তাহার বাণাঘাতে বন্ধগণ বহুধা ছিন্ন ভিন্ন হয়; সিংহ কর্তৃক বিদারিত হইয়া গজেন্দ্র যেমন পলায়ন করে, ঐবের অস্ত্রে আহত হইয়া বন্ধগণও সেইরূপ পলায়নপর হয়। পরিশেষে বন্ধগণ মায়াজাল বিস্তার করিলে, পিতামহ স্বায়ম্ভুব মনু আবিভূত হইয়া, তদ্ব্যপদেশ দ্বারা ঐবের ক্রোধ নিবৃত্তি করেন। মহামতি ঐব যজ্ঞাহুষ্ঠানে ভগবানের ভূষ্টি সাধন করিয়াছিলেন। তিনি আপনার আত্মাতে এবং যাবতীয় প্রাণীর শরীরে, ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাহার প্রজাবাৎসল্য প্রভাবে প্রজাগণ তাঁহাকে পিতার স্থায় জ্ঞান করিত। ভোগ দ্বারা পুণ্যক্ষয় এবং যজ্ঞাহুষ্ঠান দ্বারা পাপনাশ করিয়া, ঐব ষট্‌ত্রিংশ সহস্র বৎসর পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন। † এই ঐবের বংশে অঙ্গ রাজা জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া, আপনার প্রাধান্ত-প্রভাব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অঙ্গের ঔরসে উগ্রস্বভাব বেণ উদ্ভূত হন। পুত্র বেণের দৌরাত্ম্যে অঙ্গ পুরত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি প্রতজ্যায় গমন করিলে, ভৃগু প্রভৃতি মুনিগণ বেণকে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। বেণ বাল্যকাল হইতেই দুর্ভীষ ও নির্দয়-স্বভাব ছিলেন। বেণের নির্দয়তার পরিচয় সম্বন্ধে লিখিত আছে,—‘বাল্যকালে বয়স্কগণ সঙ্গে খেলা করিতে করিতে সেই নির্দয়-স্বভাব রাজকুমার তাহাদিগকে পশুর স্থায় মারিয়া ফেলিতেন।’ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, ঐশ্বর্য্যমদে অঙ্গ ও গর্জিত হইয়া, বেণ বিবম

* বিষ্ণুপুরাণ, দ্বিতীয় অংশ, প্রথম অধ্যায়।

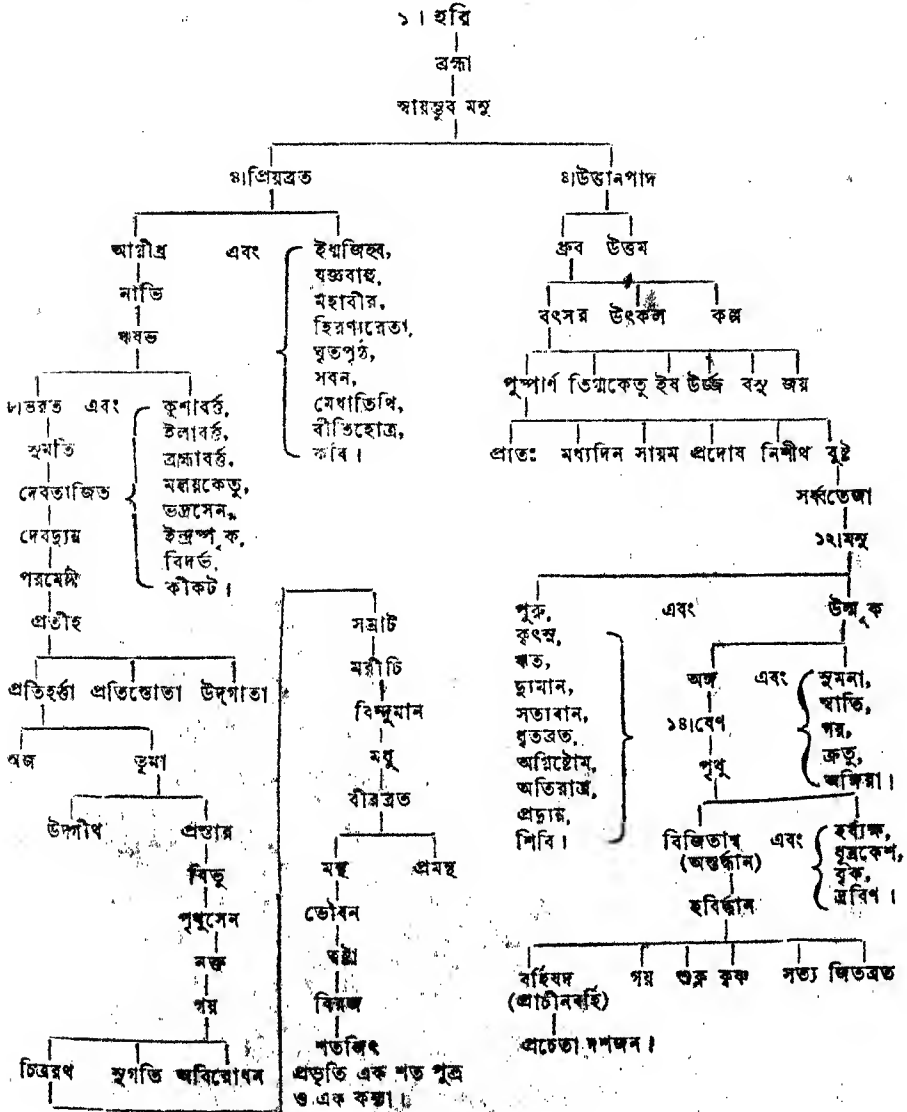
† ঐবভোগবত, চতুর্ভ বন্ধ, অষ্টম হইতে দ্বাদশ অধ্যায়; বিষ্ণুপুরাণ, প্রথম অংশ, একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায়; এবং অজ্ঞান পুরাণেও ঐব-চরিত্র বিশদরূপে পরিদর্শিত হইয়াছে।

অত্যাচার আরম্ভ করেন। ধর্ম-কর্ম লোপ পায়; লোক-সকলের মহা বিপদ উপস্থিত হয়; ব্রাহ্মণদিগকে ধরিয়া আনিয়া তিনি আপন শিবিকাবাহক নিযুক্ত করেন। ফলে, দেশমধ্যে অরাজকতা উপস্থিত হয়। তখন প্রজাবর্গ এক মত হইয়া, বেগের প্রাণসংহার করে। সেই সময় আবার কিছুকাল অশান্তি-বহি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। রাজার মরণে দম্ভাগণ নির্ভয় হয়; প্রজার ধন-লুণ্ঠন ও যথেষ্টভাবে নরহত্যা চলিতে থাকে। তখন আবার ব্রাহ্মণগণ চিন্তিত হইয়া পড়েন। তাঁহারা একমত হইয়া বেণ-পুত্র পৃথুকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। পৃথুর অভিষেক-উৎসবে আনন্দের কল-কল্লোল উথিত হইয়াছিল; দেব-গন্ধর্ব্ব সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। অভিষেক-উৎসবের সময় বন্দিগণ ও মাগধগণ তাঁহার স্তব উচ্চারণ করিলে, তিনি সন্তুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন,—“আমি এখনও কোনও কার্য্য করি নাই। তবে কেন আপনারা মিথ্যাবাক্য উচ্চারণ করিয়া, আমার গুণগান করিতেছেন?” রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়া, রাজরাজ পৃথু রাজ্যমধ্যে একাধিপত্য বিস্তার করেন। সমগ্র পৃথিবী তাঁহার করতলগত হইয়াছিল। তিনি বহুতর পর্ব্বতশৃঙ্গ ভঙ্গ করিয়া, তদুপরি জনস্থান নির্মাণ করিয়াছিলেন; তাঁহার রাজত্বকালে নূতন নূতন গ্রাম, পুর, পত্তন, দুর্গ, ব্রজ, শিবির, আকর প্রভৃতি নির্মিত হইয়াছিল। তাঁহার কীর্ত্তি-কলাপ—তাঁহার যশোরশি, এতদূর বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল যে, শাস্ত্রকারগণ বলিয়া গিয়াছেন,—“পৃথুর পূর্বে ধরণীমণ্ডলে এ প্রকার পুর-গ্রামাদি ছিল না; তাঁহার রাজত্বে গৃহাদি প্রাপ্ত হইয়া, প্রজাসকল নির্ভয়ে স্ব স্ব স্থানে পরম সুখে বাস করিয়াছিল। স্বর্ঘ্য যেমন রশ্মিযোগে পৃথিবীর রস আকর্ষণ করিয়া, পুনর্ব্বার বর্ষণ দ্বারা তাহা তাগ করিয়া থাকেন; পৃথু সেইরূপ প্রজাবর্গের নিকট কররূপে ধনগ্রহণ করিয়া, উপযুক্তকালে তাহা প্রত্যর্পণ করিতেন। তিনি প্রজাবাৎসল্যে মম্বর তুল্য, প্রভুত্বে ব্রহ্মার সদৃশ, বেদবাদে বৃহস্পতির সমান এবং সাক্ষাৎ বিষ্ণুর স্থায় জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। গৌ, ব্রাহ্মণ, শূদ্র ও বিষ্ণুতন্ত্রজনের প্রতি তাঁহার ভক্তি, লজ্জা, বিনয় ও শীল ছিল। পরকার্য্যসাধনে তাঁহার উপমাস্থান ছিল না; ত্রৈলোক্যের সর্ব্বস্থানে সকল পুরুষই তাঁহার কীর্ত্তি গান করিত।” ধরণীর অধীশ্বর পৃথু দোহন (করগ্রহণ) করিতেন বলিয়া, ধরণীর নাম ‘পৃথ্বী’ বা ‘পৃথিবী’ হইয়াছিল,—পুরাণ-পরম্পরার ইহাই অতিমত। অগ্নি-পুরাণের মতে, —“পৃথুর রাজত্বকালেই প্রথমে সূত ও মাগধ প্রমুখ ত্তিবাদকগণের উৎপত্তি হইয়াছিল।” শ্রীমদ্ভাগবতের মতে,—পৃথুর মহিষী সাক্ষী অর্চ্চি পৃথুর সহমত্যা হইয়াছিলেন।* পৃথুর স্বর্গলাভ হইলে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিজিতাশ্ব ধরণীর অধীশ্বর হন। দেহবশতঃ তিনি তাঁহার চারি ভ্রাতাকে চারিদিকের অধিকার প্রদান করেন। রাজা বিজিতাশ্ব (অন্তর্জান) কিছু দিন রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া, মনে মনে চিন্তা করিলেন,—‘কর আদায়, দণ্ডদান প্রভৃতি রাজত্বের নিদারুণ পীড়াদায়ক। এতদ্বারা যে অর্থ সঞ্চিত হইয়াছে, তাহা সদমুহূর্ত্তানে ব্যয় করা কর্তব্য।’ এই মনে করিয়া, দীর্ঘকাল-সাধ্য যজ্ঞ ও দানাদিতে তিনি সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন।

* শ্রীমদ্ভাগবত, চতুর্থ স্কন্ধ, পঞ্চদশ হইতে ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে; বিষ্ণুপুরাণ, প্রথমাবংশ, ত্রয়োদশ অধ্যায়ে; শিবপুরাণ, বর্ষদেহিতা, ৫০শ-৫১শ অধ্যায়ে; হরিবংশ, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে; ব্রহ্মপুরাণ, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে;—বেণ, পৃথু প্রভৃতি উদ্ভানগাদ-কন্যায় দৃগতিগণের বিবরণ প্রদত্ত।

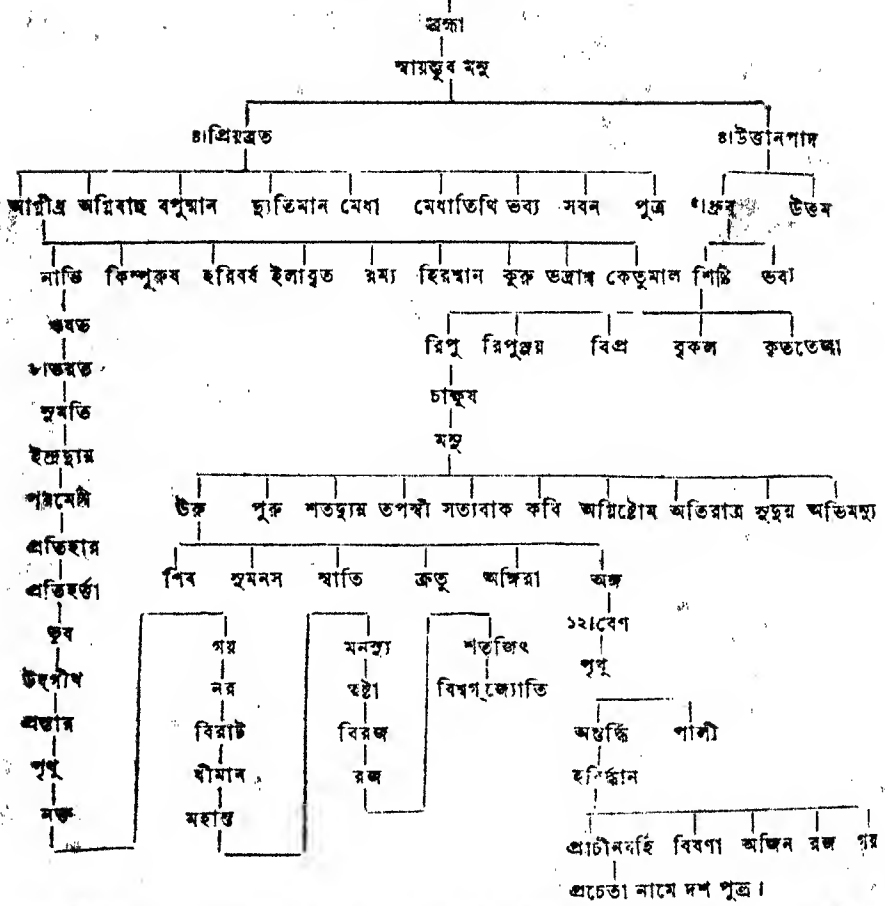
বিজিতাখের পৌত্র প্রাচীনবর্হি (বর্হিবর্হ) যজ্ঞ ও ক্রিয়াকাণ্ডে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। তদীয় যজ্ঞকুশ দ্বারা ধরণীতল আচ্ছন্ন হইয়াছিল, এবং বসুধাকে তিনি যজ্ঞবেদীয় করিয়াছিলেন। অতঃপর প্রচেতাগণের মুক্তিলাভের সঙ্গে-সঙ্গেই উত্তানপাদ-বংশের অবসান হয়। নিম্নে স্বায়ত্ত্ব মনুর বংশলতা প্রকটিত হইল। তাহাতে ভরত প্রভৃতি প্রিয়ত্রতের বংশধরগণের এবং ক্রব-পৃথু-প্রমথ উত্তানপাদের বংশধরগণের সম্বন্ধ-পরিচয় বুঝা যাইবে।

শ্রীমন্তাগবতে—স্বায়ত্ত্ব মনুর বংশ।



বিষ্ণুপুরাণে—স্বায়ম্ভুব মনুর বংশ ।

১। নারায়ণ



*** শ্রীমদ্ভাগবত এবং বিষ্ণুপুরাণের বংশ-পর্যায়ের অসামঞ্জস্য, দুই পুষ্ঠার বংশলতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই উপলব্ধি হইবে। অন্ত্যায় পুরাণের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভরতের পৌত্র তেজস, তৎপরে পর্যায়ক্রমে ইন্দ্রদ্যাম, পরমেষ্ট্র, প্রতিহার, প্রতিহর্ষা, অস্তার, বিভূ, পুণ্ড, নজ, গয়, নর, বুদ্ধিরাট, ভোবন, বট্টা, বিরজা, রজস, শতজিৎ ও বিষগ্জ্যোতি নাম দৃষ্ট হয়। ঐ পুরাণের মতে,—প্রিয়ব্রত-পুত্র বপুমানের বেত, হরিক, অীবৃত, রোহিত, বৈদ্যুতি, ম্যানস এবং হৃপ্রভ নামে পুত্র ছিল। হ্যাতিনানের কুশল, মলপ, উকা, পীবর, অগ্নিকারক, মণি ও হুমুভি নামে সন্তান জন্মিয়াছিল; মেধাতিথির শান্তভব, শিশির, কুপোদয়, নলা, শিব, কেমক ও ব্রহ্ম-নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। ভব্যের গুলন, কুমার, হৃহুমর্ষি, মুনিক, কুণোদ, নল, মোক্ষাকি, মহাজোপ এতুতি পুত্র; সবলের (সবন ?) মহানীর ও বাতকী নামে পুত্রদ্বয় এবং জ্যোতি-আনের উজ্জিন, বেগুমান, বৈরথ, লবন, দৃতি, অত্যাকর ও কশিল নামে পুত্র বিদ্যমান ছিল। ব্রহ্মপুরাণের সহিত ইহার সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়। অগ্নিপুরাণে প্রিয়ব্রত-বংশের বিবরণ বিশেষ কিছুই উল্লিখিত হয় নাই; কিন্তু উত্তরানগারের বংশে ক্রমের তিন পুত্রের উল্লেখ আছে—শিষ্টি, ভব্য ও শতু। শিষ্টির পাঁচ পুত্রের (বিষ্ণুপুরাণের অনুরূপ) মধ্যে রিপু পুত্র—চাক্ষুষ মনু। সেই মনুর দশ পুত্রের মধ্যে অগ্নিষ্টোম ছিল অগ্নিষ্ট্র এবং হয় গোত্রের মধ্যে শিব ছিলো রজ নাম দৃষ্ট হয়। ঐ পুরাণে পুণ্ড পুত্র অজ্ঞান এবং অশুদ্ধিসের হয় গোত্রের মধ্যে রজের পত্নিবর্তে রজ এবং বিষগ্জ্যে পরিবর্তে কুরু নাম লিখিত আছে। এইরূপ আলোচনা করিলে, অন্ত্যায় পুরাণের সহিত ব্রহ্ম-বিষ্ণু পার্শ্বক্য দেখিতে পাওয়া যায় বটে; কিন্তু মূল বিষয়ে, বংশের প্রধান প্রধান ব্যক্তির সম্বন্ধে, এটিই মতামত নাই। ব্রহ্মা বিধায় ভ্রমবিশিষ্ট ভাবে আলোচিত হইল না।

স্বায়ম্ভুব মহুর অধিকারের পর, স্বরোচিষ মহুর অধিকার-কাল উপস্থিত হয়। স্বরোচিষ মহুর দশ পুত্র ;—হবির (হবিধ্র), সুরুতি, জ্যোতি, আপমুর্তি, প্রতীত (অয়প্রতিত), নভস্ত, নত ও উর্জ। ব্রহ্মপুরাণ ও হরিবংশে এ বিষয়ে সামান্য পার্থক্য আছে।
 অপরায়ণ মহু ও মহুপুত্রগণ।
 বটে ; কিন্তু গরুড়পুরাণের সহিত পার্থক্য কিছু বেশী। গরুড়পুরাণ প্রায় স্থলেই বহু পুত্র বলিয়া তাঁহাদের কয়েক জনের মাত্র নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতে ব্রহ্মপুরাণ বা হরিবংশোক্ত দশ পুত্রের নাম বাদ পড়িতে পারে। যাহা হউক, গরুড়পুরাণের মতে, স্বরোচিষ মহুর পুত্রগণের নাম,—বিনত, কণীত, বিদ্যাত, রবি, বৃহৎগণ ও নভ। এই স্বরোচিষ মহুর বংশধরগণ সকলেই প্রবল-পরাক্রান্ত ছিলেন। এই বংশের অধিকারান্তে ঐশ্বর্য মহুর অধিকার-কাল। তাঁহারও দশ পুত্র ;—ইষ (ঈশ), উর্জ, তমুর্জ, মধু, মাধব, শুচি, শুক্র, সহ, নভস্ত, নভ। কিন্তু গরুড়পুরাণের মতে ঐশ্বর্য মহুর পুত্রগণের নাম,—অজ, পরশু, বিনীত, সুকেতু, সুমিত্র, সরল, শুচি, দেব, দেবায়ণ, মহোৎসাহ, অজিত প্রভৃতি। তৎপরে তামস মহুর আবির্ভাব। তাঁহারও বহু পুত্রের মধ্যে দশ জন বিখ্যাত ;—হ্রতি, তপস্ত, সূতপা, তপোমূল, সনাতন (তপোশন), তপোরতি, কল্মাষ (অকল্মাষ), তদ্বী, ধবী ও পরস্তপ। কিন্তু গরুড়পুরাণের মতে তামস মহুর পুত্রগণের নাম—জাহ্নু, জরুঘ, নর, ধ্যাতি, নয়, প্রিয়ভূতা, পৃথু, কাব্য, চরিত্র প্রভৃতি। তৎপরে পঞ্চম রৈবত মহু। রৈবত মহুর পুত্রগণের মধ্যেও দশ পুত্র প্রসিদ্ধ। তাঁহাদের নাম,—ভৃতিমান, অব্যয়, যুক্ত, তদ্বদর্শী, নিরুৎসুক, অরণা, প্রকাশ, সত্যবাক্, কৃতী (কবি)। কিন্তু গরুড়পুরাণের মতে, রৈবত মহুর বহুসংখ্যক পুত্রের মধ্যে—মহাপ্রাণ, সাধক, বলবদ্ধ, নিরমিত্র, প্রভাস, পরহা, শুচি, দূতব্রত ও কেতুশ্রু প্রধান। অতঃপর চাক্ষুষ মহু। তাঁহার নড়লা নান্দী পত্নীর গর্ভে রুরু (উরু) প্রমুখ দশ পুত্র উৎপন্ন হয়। গরুড়পুরাণ বলেন,—চাক্ষুষ মহুর পুত্রগণের মধ্যে উরু, পুরু, মহাবল, শতদ্বার, তপস্বী, সত্যবাক্য, কৃতী, অগ্নিষ্টম প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। ইহার পর, সপ্তম বৈবস্বত মহন্তর। এই সপ্তম মহন্তরই এখন চলিতেছে। এই মহন্তরের মহুপুত্রগণের—চক্রবংশের ও সূর্য্যবংশের—বংশ-পর্যায় পূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। * তবে এখন যে সপ্তম মহন্তর চলিতেছে, তাহা খেতবরাহ কল্পের বৈবস্বত মহন্তর। বৈবস্বত মহন্তরের পর, সাবর্ণি মহন্তর। সাবর্ণি মহু পাঁচ জন। অষ্টম বে ভবিষ্যৎ সাবর্ণি মহু, তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে—বিরজা, অর্কিরীবান ও নির্যোহাদি রাজা হইবেন। নবম ভবিষ্যৎ মহু—দক্ষ সাবর্ণি নামে অভিহিত। যতকেতু, দীপ্তিকেতু, পঞ্চহস্ত, নিরাময় ও পৃথুশ্রবা প্রভৃতি তাঁহার পুত্রগণ রাজ-পদ লাভ করিবেন। দশম ভবিষ্যৎ মহু—ব্রহ্মসাবর্ণি। তাঁহার পুত্রগণের নাম,—হবিমান, সুরুতি, সত্য, আপানমুর্তি, নাতাপ, অপ্রতিমোজা, সত্যকেতু, সুক্ষেত্র, উত্তমোজা, হরিসেন প্রভৃতি। ব্রহ্ম-সাবর্ণি মহন্তরে ইহার এবং ইহাদেরই বংশধরগণ পৃথিবীপতি হইবেন। এই দশম মহুর পুত্রগণের নাম সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতির সহিত গরুড়পুরাণ প্রভৃতির কিঞ্চিৎ অনৈক্য দৃষ্ট হয়। সে হিসাবে দশম মহুর পুত্রগণের নাম—সুক্ষেত্র, উত্তমোজা, ভুরিষোজা, বীর্ষকর্ষন, অশ্লোক, নিরমিত্র

* এই গ্রন্থের ২০১ ও ৩০৪ পৃষ্ঠায় সূর্য্যবংশের ও চক্রবংশের বংশ-বিবরণ দ্রষ্টব্য।

রুশসেন, জয়দ্রথ, ভুবিস্ময়, সুবৰ্চা, শাস্তি ও ইন্দ্র। একাদশ ভবিষ্য-মহু—ধর্মসাবর্ণি। সর্কগ, সর্কধর্ম ও দেবানিক প্রভৃতি এই মহুর পুত্রগণ রাজা হইবেন। দ্বাদশ ভবিষ্য-মহু—রুদ্র-সাবর্ণি। দেববান, উপদেব, দেবশ্রেষ্ঠ প্রভৃতি উক্ত মহুর মহাবলশালী পুত্রগণ এই মহন্তরে রাজ্যার্থ্য লাভ করিবেন। ত্রয়োদশ ভবিষ্য-মহু—দেব-সাবর্ণি। ইনি রৌচ্য মহু নামে অভিহিত। এই মহুর পুত্রগণের নাম—চিত্রসেন, বিচিত্র প্রভৃতি। ত্রয়োদশ মহন্তরে ইহার সর্বসেই পৃথিবীপতি হইবেন। চতুর্দশ ভবিষ্য-মহু—ইন্দ্র-সাবর্ণি। ইনি ভৌত্য মহু নামে পরিচিত। উরু, গভীর, ব্রহ্ম, প্রভৃতি এই মহুর পুত্রগণ পৃথিবী পালন করিবেন। এইরূপে চতুর্দশ মহন্তরে প্রায় সহস্র চতুর্গ অতীত হইলে, একটা কল্প পূর্ণ হয়। অনন্তর ঐ কল্প পরিমিত রাজি। তার পর, পুনরায় নূতন কল্পের নূতন মহন্তরের স্বরূপাত। এইরূপ চতুর্দশ মহন্তরে কর্মফলে পর্যায়ক্রমে কেহ দেবতারূপে, কেহ ইন্দ্ররূপে, কেহ সপ্তর্ষিরূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। সেই যে দেববা স্থিত ইন্দ্র-পদ—চতুর্থ মহন্তরে শিবি নামে কোনও ঋষি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পঞ্চম মহন্তরে ইন্দ্র পাইয়াছিলেন—বিভু নামা এক সিদ্ধপুরুষ। ষষ্ঠ মহন্তরে ইন্দ্র পাইয়াছিলেন—মহাশাল নামে এক জন দৈত্য। এইরূপ সপ্তম বৈবস্বত মহন্তরে পুরন্দর দেবগণের অধিপতি হন। অষ্টম মহন্তরে বলিরাজ ইন্দ্র প্রাপ্ত হইবেন। নবম মহন্তরে অজুত নামা মহাবীরা ইন্দ্র লাভ করিবেন; সপ্তম মহন্তরের তিনিই ষড়ানন কার্তিকেশ্বর। দশম মহন্তরে শাস্তি নামক জনৈক মহাবল ইন্দ্র লাভ করিবেন। একাদশ মহন্তরে রুশ নামে ইন্দ্র উৎপন্ন হইবেন। দ্বাদশ রুদ্র সাবর্ণি মহন্তরে ঋতধামা ইন্দ্র-রূপে জন্মগ্রহণ করিবেন। ত্রয়োদশ মহন্তরে দিবস্পতি ইন্দ্র হইবেন। চতুর্দশ ইন্দ্র সাবর্ণি মহন্তরে শুচি নামে ইন্দ্র দেবধিপতি লাভ করিবেন। এইরূপে কোন্ মহন্তরে কে সপ্তর্ষি হন, তৎসম্বন্ধে দৃষ্ট হয়;—স্বায়ম্ভব মহন্তরে সপ্তর্ষি হইয়াছিলেন—মরীচি, অত্রি, অত্রিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ; স্বায়ম্ভব মহন্তরে—উর্জ, শুষ্ক, প্রাণ, ঋত, নিশ্চল, দন্তলি, অর্করীবান; ঐশ্বর্য মহন্তরে—রযোজা, উর্জবাহ, শরণ, অনধ, যুনি, সূতপা ও শকু; তামস মহন্তরে—কৃত, জ্যোতির্কামা, পৃথু, কাবা চৈত্র, খেতাগ্নি ও হেমক; রৈবত মহন্তরে—দেবজী, দেববাহ, উর্জবাহ, হিরণ্যারোমা, পর্জন্ত, সত্য ও সুধামা; চাক্ষুষ মহন্তরে—ঐশ্বর্য, ত্রীমান, সুধামা, বিরজ, অভিমান, সহিষ্ণু ও মধুজী; এবং বর্তমান বৈবস্বত মহন্তরে—অত্রি, বশিষ্ঠ, জমদগ্নি, কশ্যপ, গৌতম, ভরদ্বাজ ও বিশ্বামিত্র সপ্তর্ষি হইয়াছেন। এতদ্বিবরণ এবং ভবিষ্য মহন্তর-সমূহে যাহারা সপ্তর্ষি বা দেবতাদি হইবেন। তদ্বিবরণ প্রায় প্রতি পুরাণেই লিখিত আছে। * এই চতুর্দশ মহু ও মহন্তরের নাম এবং তাঁহাদের বংশধরগণের পরিচয় সম্বন্ধেও অনেক মতান্তর দৃষ্ট হয়। তদ্বিবরণে অধিক আলোচনা বাহ্য্য নাত্র।

* অতীত ও অনাগত মহন্তর ও কল্পাদি সম্বন্ধে—ব্রহ্মপুরাণ, পঞ্চম অধ্যায়; বিষ্ণু-পুরাণ, তৃতীয় ভাগে, প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়; পরব্রহ্মপুরাণ, সপ্তাংশিতম অধ্যায়; হরিবংশ, সপ্তম অধ্যায়; শ্রীমদ্ভাগবত, তৃতীয় স্কন্ধ, একাদশ অধ্যায় এবং অষ্টম স্কন্ধ প্রথম অধ্যায়; দেবী-ভাগবত, দশম স্কন্ধ, প্রথম, দ্বিতীয়, ত্রয়োদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ অধ্যায়; শিবপুরাণ, বর্ষসংহিতা, অষ্টপকাশং অধ্যায়; এবং মার্কণ্ডেয়-পুরাণ, ৫৫ম, ৭৫ম-৭৬ম, ৮০ম, ৮৪ম অধ্যায়-সমূহে উল্লিখিত। এই গ্রন্থের ২ম, ১৩ম ও ১০২ম পৃষ্ঠায়ও কল্প-মহন্তরাদির অনেক উল্লেখ হইয়াছে।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ ।

সূর্য্যবংশীয় নৃপতিগণ ।

[সূর্য্য-বংশের নৃপতিগণ,—ইক্ষাকু, বিকৃক্ষি, কুবলয়াধ, মাক্কাতা, কুকুৎস্থ, ত্রিশঙ্কু প্রভৃতি ;—হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান ;—অযোধ্যার অষ্টাশ্র নৃপতিগণ—সপত্ন, ভগীরথ, কন্দ্রাবপাদ, সোদাস, অম্বরীষ, দশরথ, ক্রীষাচন্দ্র প্রভৃতি,—পরশুরাম ঐন্দ্রজ,—নিকত্রিয়া পৃথিবীতে ক্ষত্র-বংশের মূল—মূলক-রাজা,—নরেন্দ্র-যজ্ঞে হরিশ্চন্দ্রের ও অম্বরীষের ইতিহাসে সান্নিধ্য ;—মিথিলার রাজ-বংশ,—জনক ও সীতা প্রভৃতির কাহিনী ;—মহুর অষ্টান্য বংশধরগণ,—হুকন্যার পতিভক্তি,—জবনের নৌবন-প্রাপ্তি,—বলদেব ও রেবতীর বিবাহ,—ক্ষত্রিয় হইতে রাজ্য-বংশের উৎপত্তি ।]

প্রজাপতি কশ্যপের পৌত্র বিবস্বান্ সূর্য্য হইতেই সূর্য্য-বংশের উৎপত্তি । সূর্য্য-বংশের প্রথম রাজার নাম—ইক্ষাকু । তিনি বৈবস্বত মহুর জ্যেষ্ঠ পুত্র । পুরাণের রূপকে প্রকাশ,—হাঁচিবার সময় মহুর জাগ্রোজ হইতে তাঁহার উৎপত্তি হয় ।

সূর্য্য-বংশের
আদি রাজগণ ।

বলিয়া তিনি ইক্ষাকু নামে পরিচিত । ইক্ষাকু অযোধ্যার সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন । তিনিই অযোধ্যার প্রথম ক্ষত্রিয় রাজা বলিয়া অভিহিত হন । ইক্ষাকুর এক শত পুত্রের মধ্যে তিন পুত্র প্রধান ;—বিকৃক্ষি, নিমি ও দণ্ড । বিকৃক্ষি অযোধ্যার এবং নিমি মিথিলার রাজা হইয়াছিলেন । বিকৃক্ষির বংশে দশরথ, রামচন্দ্রাদি এবং নিমির বংশে জনকাদি জন্মগ্রহণ করেন । শশক-মাংস ভক্ষণ করিয়া, বিকৃক্ষি গুরু কতৃক ‘শশাদ’ নামে অভিহিত ও পিতা কতৃক পরিভাজ হন । বাহা হউক, পরিশেষে ইক্ষাকুর মৃত্যু হইলে, তিনিই অযোধ্যার সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । ইক্ষাকুর অপরাপর পুত্রগণ আর্য্যাবর্তের ভিন্ন ভিন্ন ভাগের আধিপত্য লাভ করেন । বিকৃক্ষির পুত্র পুরঞ্জয় (রাজর্ষি পুরঞ্জয়) বিশেষ প্রসিদ্ধ । দেবাসুরের যুদ্ধে বৃষভরূপধারী ইন্দ্রের ‘কুকুৎ’ অর্থাৎ বৃদ্ধদেশে অবস্থিত ছিলেন বলিয়া, তিনি ‘কুকুৎস্থ’ (কাকুৎস্থ) নামে পরিচিত হন । ইন্দ্র কতৃক সংবাহিত হইয়াছিলেন বলিয়া, ‘ইন্দ্রবাহ’ নামেও তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন । দানব-সমরে জয়লাভ করিয়া, তিনি দানবদিগের ধনরাশি বজ্রপাণি ইন্দ্রকে প্রদান করিয়াছিলেন ;—তাঁহার পুরঞ্জয় নামের সার্থকতা তাহাতেই উপলব্ধি হইয়াছিল । এই বংশের শ্রাবস্ত্র নামক নরপতি ‘শ্রাবস্তি’ নারী পুরী নির্মাণ করিয়াছিলেন । শ্রাবস্ত্রের পৌত্র রাজা কুবলয়াধ, ধুম্র নামক অসুরকে বিনাশ করিয়া ‘ধুম্রনার’ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন । ধুম্র অসুর, মহর্ষি উত্কের যজ্ঞ-কার্য্যের অনিষ্ট সাধন করিত । সেই জন্ত মহর্ষির হিতসাধন অভিপ্রায়ে কুবলয়াধ অসুরকে বধ করিয়াছিলেন । কুবলয়াধের একবিংশতি সহস্র পুত্র ছিল । কিন্তু তাঁহার তিন পুত্র ভিন্ন সকলেই অসুরের নিগাস-সজ্জত অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া বিনষ্ট হয় । অতঃপর যুবনাথের পুত্র—মাক্কাতা । এই মাক্কাতার উৎপত্তি-বিবরণ অলৌকিক রহস্ত-পরিপূর্ণ । পুরাণে প্রকাশ,—অপুত্রত্ব-নিবন্ধন নির্বেদ প্রাপ্ত হইয়া, যুবনাথ অধিগণের আশ্রমে বসতি করিতেছিলেন । ঋষিগণ রূপা-পরবশ হইয়া, যুবনাথের জন্ত পুত্রোষ্ট্র-যজ্ঞের অমুষ্ঠান করেন । মধ্য-রাত্রে যজ্ঞ শেষ হইলে, মন্ত্রপুত্ৰ জগ যুবনাথের মহিষীর জন্ত রাধিয়া

দেওয়া হয়। সেই জল পান করিলে মহিষীর গর্ভে প্রবল-পরাক্রান্ত পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করিবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু মুনিগণ নিজিত হইলে ভ্রমক্রমে যুবনাথ ঋতুপুত্র জল পান করিয়া ফেলেন। তাহাতে যুবনাথেরই গর্ভ হয়। সেই গর্ভে মাকাতা জন্মগ্রহণ করেন। কৃষ্ণ বিদীর্ণ করিয়া, সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। কিন্তু যুবনাথের তাহাতেও মৃত্যু হয় নাই। বাহা হউক, চক্রবর্তী-লক্ষণাক্রান্ত সেই পুত্র সন্ত-পানার্থ রোদন করিলে, দেবরাজ ইচ্ছা তাহার রোদন নিবারণ জন্ত ‘মাং ধাতা’ অর্থাৎ ‘আমাকে পান করিবে’ বলিয়া আপন তর্জনী অর্পণ করিয়াছিলেন। তাহাতেই যুবনাথের পুত্র ‘মাকাতা’ নামে পরিচিত। দস্যুগণ রাজা মাকাতার প্রতাপে সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকিত বলিয়া, তিনি ‘ত্রৈশদস্য’ নামেও অভিহিত হইয়াছিলেন। তিনি সম্রাট নামে পরিচিত হইয়া, অচ্যুতের তেজে সপ্তদ্বীপা পৃথিবী শাসন করিয়াছিলেন। যজ্ঞ দ্বারা তিনি দেবগণকে পরিতুষ্ট রাখিয়া-ছিলেন। সুশাসন-সুপালনের জন্ত তাঁহার প্রসিদ্ধি চির-বিশ্রুত। তাঁহার রাজ্যের বিস্তৃতি সম্বন্ধে পুরাণাদি শাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে,—“যাবৎ সূর্য্য উদেতি স্ম যাবচ্চ প্রতি-তিষ্ঠতি। সর্বং তদ্ব্যবোনাক্ষত্ব মাকাতাঃ ক্ষেত্রমুচ্যতে॥” অর্থাৎ, যেখান হইতে সূর্য্য উদয় হন এবং যেখানে গিয়া অস্ত যান, সেই সমস্ত ক্ষেত্রই যুবনাথ-বংশীয় রাজা মাকাতার রাজ্য বলিয়া পরিকীর্তিত আছে। সম্রাট মাকাতা, রাজা শশবিন্দুর দুহিতা ইন্দুমতীকে বিবাহ করেন। তাঁহার তিন পুত্র ও পঞ্চাশৎ কন্যা উৎপন্ন হয়। ঋষি সৌভরি সেই কন্যা-গণকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই মাকাতার দ্বিতীয় পুত্র অম্বরীষের পৌত্র হারীত হইতে ‘আঙ্গিরস’ নামে ক্ষত্রিয়-কুল প্রবর্তিত হইয়াছে। মাকাতার জ্যেষ্ঠ পুত্র পুরুকুৎস রসাতলে গমন করিয়া, গন্ধর্ব্বগণকে হনন পূর্ব্বক, আপন প্রাণাত্মের পরিচয় দিয়াছিলেন। পুরুকুৎসের বংশে অধস্তন বর্ষ পুরুষে সত্যব্রত জন্মগ্রহণ করেন। পরিণয়মান। ব্রাহ্মণ-কন্যাকে অপহরণ করায়, পিতৃ-শাপে তিনি চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হন। তদবধি তিনি ‘ত্রিশঙ্কু’ নামে পরিচিত হইয়া-ছিলেন। * তাঁহার সেই পাপে তাঁহার রাজ্যে দ্বাদশ বৎসর অনারুটি হয়। প্রজাকুল হৃদিকে আকুল হইয়া পড়ে। যথারীতি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া, বিধানিত ঋষির অনুকম্পায়, চণ্ডালত্ব হইতে মুক্তিলাভের পর, তিনি স্বর্গে গমন করেন।

ত্রিশঙ্কুর পুত্র—লোক-বিশ্রুত হরিশ্চন্দ্র। অলৌকিক তাঁহার চরিত্র-কাহিনী! রাজ্যা-ধিকার লাভ করিয়া কিছুকাল অপত্য-নির্কিষেযে প্রজা-পালনের পর, অপুত্র্য-নিবন্ধন হরিশ্চন্দ্র বড়ই ক্ষুব্ধ হন। দেবর্ষি নারদ, মহারাজ হরিশ্চন্দ্রকে পুত্রলাভ-হরিশ্চন্দ্র। কামনায় বরুণদেবের উপাসনা করিতে পরামর্শ দেন। তাহাতে হরিশ্চন্দ্র বরুণদেবের শরণাপন্ন হইয়া, বর প্রার্থনা করেন। কিন্তু বর-প্রদান-কালে বরুণদেব বলেন,—“যদি ভূমি তোমার প্রথম পুত্রকে যজ্ঞে বলি দান করিতো পার, তোমার বন্ধ্যাক বিদূরিত হইবে।” হরিশ্চন্দ্র তাহাতেই সম্মত হন। তাঁহার মনে হয়,—“আমার

* বিষ্ণুপুরাণে ও ঐন্দ্রকায়ব্রহ্মে পিতৃ-শাপে ত্রিশঙ্কুর চণ্ডালত্ব-প্রাপ্তির বিষয় আছে বটে; কিন্তু দেবীভাগবতের মতে,—বশিষ্ঠের দ্বন্দ্ববতী গাতীকে হত্যা করায়, রাজা সত্যব্রত চণ্ডালাকৃতি প্রাপ্ত ও ‘ত্রিশঙ্কু’ নামে অভিহিত হন।

বন্ধ্যাস দূর হইলে, একাধিক পুত্র জন্মিবার সম্ভাবনা। সুতরাং একটা পুত্র নরমেধ-যজ্ঞে প্রদান করিব, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?” তখন আর তিনি ভাবিয়া দেখিবার অবসর পান না—যুগকাষ্ঠে পুত্রের বলিদান পিতামাতার পক্ষে কিরূপ হৃদয়-বিদায়ক ব্যাপার! যাহা হউক, যথাসময়ে রোহিত নামে তাঁহার এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিলে, বরুণদেব যজ্ঞের জন্ত সেই পুত্র চাহিয়া বসিলেন। কিন্তু পুত্র পরিত্যাগ করিতে পিতার প্রাণ বিদীর্ণ হইতে লাগিল। হরিশ্চন্দ্র প্রথমে নানারূপ ছলনা করিয়া, দিনক্ষয় করিতে লাগিলেন। পরিশেষে পুত্রকে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষার অছিলায় অরণ্যে গুরু-গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিত অনেক দিন পর্য্যন্ত প্রত্যাশিত হইলেন না। ক্রোধ-পরবশ হইয়া, বরুণদেব তখন হরিশ্চন্দ্রকে অভিসম্পাত করিলেন। অভিসম্পাতে উদরী-রোগে আক্রান্ত হইয়া, হরিশ্চন্দ্র অশেষ কষ্ট ভোগ করিতে লাগিলেন। তখন, কি প্রকারে রাজার রোগ-মুক্তি হইতে পারে,—তদ্বিষয়ে ব্যবস্থা গৃহীত হইতে লাগিল। ব্রহ্মাপুত্র কুলগুরু বশিষ্ঠ ব্যবস্থা দিলেন,—‘মূল্যপ্রদানে ক্রীতপুত্র দ্বারা নরমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও শাপ মুক্তি হইতে পারে।’ অতঃপর কোনও দরিদ্র ব্রাহ্মণের পুত্রকে ক্রয় করিবার জন্ত চেষ্টা চলিতে লাগিল। ভূপতির রাজ্য-মধ্যে অজিগর্ত নামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার শুনঃপুত্র, শুনঃশেফ ও শুনঃলাবুল নামে তিন পুত্র ছিল। দরিদ্র ব্রাহ্মণের খতি কষ্টে দিনপাত হয়; ব্রাহ্মণ কোনক্রমেই আপনার ও পুত্রগণের আশাচ্ছাদন নির্বাহ করিতে পারেন না। পুত্রের বিনিময়ে, শত গো-দানের প্রলোভনে, ব্রাহ্মণকে প্রলুব্ধ করিয়া, রাজ-মন্ত্রী তাঁহার মধ্যম পুত্র শুনঃশেফকে ক্রয় করিয়া আনিলেন। অতঃপর নরমেধ-যজ্ঞের আয়োজন হইল। কিন্তু বলিদানের পূর্বে বালক ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিয়া দিল। বালকের ক্রন্দনে ছেদক যুগকাষ্ঠ-বদ্ধ বালককে ছেদন করিতে পরাভূত হইল। কিন্তু বালকের পিতা অজিগর্ত অধিকতর অর্থলোভে স্বয়ং পুত্রকে কাটিতে উদ্বৃত্ত হইলেন। বালক শুনঃশেফের ক্রন্দনে তখন দিগ্দিগন্ত কাঁপিয়া উঠিল। কৌশিক-নন্দন বিশ্বামিত্র দয়া-পরবশ হইয়া, রাজার নিকট শুনঃশেফের প্রাণ ভিক্ষা চাহিলেন। কিন্তু মহারাজ হরিশ্চন্দ্র, স্বাস্থ্য-পুত্রের প্রাণরক্ষা এবং আপনার রোগ-মুক্তি উভয় বিষয় চিন্তা করিয়া, বিশ্বামিত্রের প্রার্থনার কর্ণপাত করিলেন না। বিশ্বামিত্র দুঃখিত হইয়া দয়ার্দ্ৰ-হৃদয়ে বালককে বরুণ-মন্ত্র শিক্ষাইয়া দিলেন। তাহাতে, বালকের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া, বরুণদেব রাজার প্রতি অহুকম্পা প্রদর্শন করিলেন; রাজা রোগমুক্ত হইলেন। মহর্ষি বিশ্বামিত্র শুনঃশেফকে পুস্তকপে গ্রহণ করিলেন। ইহার পর, রাজহয়-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া, এক মায়াবী বরাহের অহুসরণে মহারাজ হরিশ্চন্দ্র বনমধ্যে পথভ্রষ্ট হন। সেই সময় বিশ্বামিত্রের সহিত আবার তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি বিশ্বামিত্রকে বলেন,—“আমি অযোধ্যাধিপতি মহারাজ হরিশ্চন্দ্র; আমার পথ প্রদর্শন করুন।” কথায় কথায় আরও প্রকাশ করেন,—“আমি রাজহয়-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি; কল্পতরু হইয়াছি; আপনার যদি কিছু প্রয়োজন হয়, আমার নিকট প্রার্থনা করিলেই প্রাপ্ত হইবেন।” অনন্তর মহারাজ হরিশ্চন্দ্র যজ্ঞবেদী-মধ্যে সমাসীন হইলে, বিশ্বামিত্র আসিয়া আপন প্রার্থনা জানাইলেন;

বলিলেন,—“সজ-অব-রথ-রত্নাদি-সম্বিত আপনার সমগ্র রাজ্য আশায় দান করুন।” হরিশ্চন্দ্র, মায়ায় মুগ্ধ হইয়া, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিতে পারিলেন না। পূর্ব-প্রতিক্রিয়া বরণ করিয়াই কহিলেন,—“ভাল, আপনার প্রার্থনা পূর্ণ করিলাম।” ইহার পর, হরিশ্চন্দ্র রাজ্যভ্রষ্ট হন ; বিধামিত্রের দক্ষিণার গণ পরিশোধের জন্ত মহিষী শৈব্যাকে বিক্রয় করেন ; এবং আপনিও চণ্ডালের দাসত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। হরিশ্চন্দ্রের পরীক্ষার ইহাই শেষ নহে। ব্রাহ্মণ-গৃহে মহিষী শৈব্যার দাসী-বৃত্তি, রোহিতের সর্প-দংশনে মৃত্যু, চণ্ডালবেশী হরিশ্চন্দ্রের নিকট মৃত পুত্রের দাহের জন্ত শৈব্যার গঙ্গা-তীরে গমন, পরিশেষে চরম-পরীক্ষায় তাঁহাদের মুক্তিলাভ,—হরিশ্চন্দ্রের ইতিহাসের ইহাই সারভূত। পুত্র রোহিতকে রাজ্যে অতিথিত করিয়া, মহারাজ হরিশ্চন্দ্র স্বর্গে গমন করেন। তাঁহার অলৌকিক আখ্যান শ্রবণ করিলে অশেষ পুণ্য লাভ হয়।

হরিশ্চন্দ্রের পৌত্র, রোহিতের পুত্র, হরিত হইতে চম্পের উৎপত্তি। তিনি চম্পাপুরী নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই ঘণ্টের বাহক (বাহ), হৈহয় ও তালজঙ্গ প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ কর্তৃক

অযোধ্যায় হৃতরাজ্য হইয়া, বনে গমন করেন। সেই স্থানেই তাঁহার আত্মশেষ হয়।
অন্যান্য তাঁহার মৃত্যুকালে তাঁহার মহিষী সহমরণে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। কিন্তু
দুর্গতিগণ। গর্ভবতী জানিয়া, মহর্ষি ঔরু তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করেন। সপত্নীগণ,
বাহর গর্ভবতী মহিষীকে অন্নের সহিত ‘গর’ (বিষ) প্রদান করিয়াছিলেন। ‘গর’ সহিত
অগ্রগ্রহণ করেন বলিয়া, সেই পুত্র ‘সগর’ নামে অভিহিত হন। সগরের উপনয়নের পর, মহর্ষি
ঔরু তাঁহাকে বেদাদি শাস্ত্র ও আয়েদ্য শিক্ষা দেন। পরিপক্ব-বুদ্ধি হইয়া, সগর যখন জানিতে
পারেন,—তাঁহার পিতা বাহক, তালজঙ্গ-হৈহয় প্রভৃতি কর্তৃক হৃতরাজ্য হইয়া, বনবাসী
হইয়াছিলেন; তখন তিনি তাহাদিগের প্রতি প্রতিহিংসা-পরায়ণ হন। তিনি হৈহয়-তালজঙ্গাদি
পিতৃশত্রুগণের অনেককেই বিনষ্ট করেন। শক, যবন, কম্বোজ, পারদ, পল্লবগণ—সগর কর্তৃক
আহত হয়। পরিশেষে ঐ সকল জাতি বশিষ্ঠের শরণাপন্ন ও সগরের অহুগ্রহপ্রার্থী হইয়াছিল।
অনন্তর কুলগুরু বশিষ্ঠের পরামর্শ অনুসারে, সগর সেই জীবিত শত্রুগণকে ব্রাহ্মণাদির সংসর্গ
হইতে বিচ্ছিন্ন করেন। তাঁহার আদেশে যবনগণের মস্তক মুণ্ডিত হয়। শকগণ অর্দ্ধ-মুণ্ডিত,
পারদগণ প্রলম্বমান কেশযুক্ত এবং পল্লবগণ শ্মশ্রুধারী হইয়াছিল। এই হইতেই উহাদের
বংশধরেরা নিজ বর্ণ পরিত্যাগে বাধ্য হইয়া স্বেচ্ছা লাভ করে। এইরূপে শত্রুগণের সংহার-
সাধন করিয়া, অপ্রতিহত সৈন্তগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া, মহারাজ সগর পৃথিবীপতি বলিয়া
পরিচিত হন। কশ্যপ-দুহিতা সুমতি এবং বিদর্ভরাজ-তনয়া কেশিনী—মহারাজ সগরের দুই
মহিষী ছিলেন। কেশিনীর একমাত্র পুত্র এবং সুমতির ষষ্টি সহস্র পুত্র অগ্রগ্রহণ করে। দুর্ভাগ্য-
ক্রমে সগরের পুত্রগণ চরিত্রহীন হইয়াছিল। তাহারা যজ্ঞাদিতে কিয়ৎ উৎপাদন করিতে আরম্ভ
করিয়াছিল। এই সময়ে সগর রাজা অবসরার্থে যজ্ঞের অহুতান করেন। তাঁহার পুত্রগণ সেই
অবসর যজ্ঞের অবসর রক্ষক ছিল। এক চোর সেই অব চুরি করিয়া পাতালে লইয়া যায়।
তাহাতে সগর-পুত্রগণ ক্রোধাক্ত হইয়া, ভূতৃট ঘনন করিতে করিতে, পাতালে গমন করে।
তাহাদের সেই পাত হইতেই সাগরের উৎপত্তি। বাহা হউক, সগর-পুত্রগণ পাতালে গমন

করিয়া দেখে—তাহাদের অনতিদূরে মহর্ষি কপিল বোগময় । তখন, মহর্ষি কপিলকেই চোর মনে করিয়া, তাহার এক যোগে তাঁহাকে হনন করিতে উদ্ধত হয় । মহর্ষি কপিল তাহা-
দিগের প্রতি কোপনয়নে চাহিয়া দেখেন । মহর্ষির নয়ন হইতে অগ্নিফুলিঙ্গ নির্গত হয় । সেই
অগ্নিতে সগরের ষষ্টি সহস্র পুত্র ভস্মীভূত হইয়া যায় । * এই ঘটনা জানিতে পারিয়া, মহারাজ
সগর আপন পৌত্র অংশুমানকে কপিলদেবের ক্রোধ-শাস্তির ভয় প্রেরণ করেন । অংশুমানের
জ্ঞেবে সন্তুষ্ট হইয়া, কপিলদেব তাঁহাকে বর দেন,—“তোমার পৌত্র ভগীরথ মর্ত্যধামে
গঙ্গা আনয়ন করিয়া, এই ব্রহ্মদত্ত হস্ত সগর-পুত্রগণের উদ্ধার-সাধন করিবে ।” মহর্ষির
তুষ্টি-সম্পাদনানন্তর অংশুমান পাতাল হইতে অথ আনয়ন পূর্ব্বক, পিতামহের
যজ্ঞ সমাপন করেন । অতঃপর অংশুমানের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া, মহর্ষি
ঔর্যের উপদেশানুসারে সংসার-বন্ধন মুক্ত হইয়া, মহারাজ সগর দিব্যধামে গমন করেন ।
অংশুমান আপন পুত্র দিলীপের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া, মর্ত্যে গঙ্গা আনয়নের ভয়
তপশ্চা করিয়াছিলেন । কিন্তু তিনি কৃতকার্য হন নাই । তাঁহার পুত্র দিলীপও পিতৃ-পদাঙ্ক
অনুসরণে গঙ্গা আনয়নের চেষ্টা পাইয়াছিলেন । তিনিও অসমর্থ হইয়া কালগ্রাসে পতিত
হন । অবশেষে দিলীপের পুত্র ভগীরথ স্বর্ণ হইতে ভূতলে গঙ্গা আনয়নে সমর্থ
হইয়াছিলেন । তাহাতে, গঙ্গাবারি স্পর্শে, ব্রহ্মশাপহস্ত সগর-তনয়গণ মুক্তিলাভ করিয়াছিল ।
রাজ্যি ভগীরথের পুণ্য-কাহিনী সংসারে চিরদিন কীর্তিত হইয়া আসিতেছে । ভগীরথের
বংশে ঋতুপর্ণ জন্মগ্রহণ করেন । ইনি অক্ষকীড়ায় পারদর্শী ছিলেন । মহারাজ নলের
সখা বলিয়া ইহার প্রসিদ্ধি আছে । ইনি নলকে অক্ষকীড়া শিক্ষা দিয়া তাঁহার নিকট হইতে
অর্থবিদ্যা লাভ করেন । ঋতুপর্ণের প্রপৌত্র—সৌদাস । ইনি ‘মিত্রসহ’ ও ‘কল্যাণপাদ’ নামেও
পরিচিত । ইনি যুগয়া করিতে গিয়া, ব্যায়রূপী ছুই রাক্ষস-ভ্রাতার জ্যেষ্ঠকে হনন করিয়া,
কনিষ্ঠকে ছাড়িয়া দেন । কনিষ্ঠ নিশাচর ভ্রাতৃ-হত্যার প্রতিশোধ-গ্রহণে ক্রুতসঙ্কল্প হয় ;
পাচকরূপ ধারণ করিয়া, মহর্ষি বশিষ্ঠকে সে নরমাংস ভোজন করাইবার চেষ্টা করে । তাহাতে
মহর্ষি বশিষ্ঠ রাজার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া, ‘রাক্ষস হও’ বলিয়া রাজাকে অভিশপ্ত করেন । রাজাও
তখন বশিষ্ঠকে অভিশাপ দিতে উদ্ধত হন ; কিন্তু মহিষী মদয়ন্তীর অহুরোধে, কুলশত্রু
বশিষ্ঠকে শাপ দেওয়া অটুট বোধে, তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে হয় । তখন অল্পমিহিত
শাপ-জল পৃথিবীতে বা আকাশে নিক্ষেপ করিলে অনিষ্টের সম্ভাবনা বুঝিয়া, রাজা তাহা আপন
চরণদ্বয়ে সেচন করেন । ক্রোধাগ্নি-তপ্ত জল-সংস্পর্শে চরণদ্বয় ‘কল্যাণ’ বা কৃষ্ণ-পাধুবর্ণ ধারণ
করে ; এবং তাহাতেই রাজা সৌদাস ‘কল্যাণপাদ’ নামে অভিহিত হন । দ্বাদশ বৎসর অতীত
হইলে, রাজা শাপ-মুক্ত হইয়াছিলেন । তাহার সাত বৎসর পরে তাঁহার মৃত্যু হয় । মহিষী মদয়ন্তী
তখন গর্ভবতী ছিলেন । সেই গর্ভে সৌদাস-পুত্র অশ্বক জন্মগ্রহণ করেন । অশ্বকের পুত্র—

যতে,—কপিল-যোগে সগর-তনয়গণ দহ হইয়াছিল—এ কথা ঠিক নহে । মহৎ
ব্যক্তিকে অপমান করার, তাহাদের দেহাহিত অনল ভাহাদিগকে আপনা-আপনিই পুড়াইয়া দিয়াছিল,—
ইহাই সত্য । শুদ্ধ-স্ব-বৃষ্টি সাধ্যাতত্ত্ব-বর্ত্তক মহর্ষি কপিল কি কখনও ভ্রাতৃগণ-সম্পন্ন হইতে পারেন ?—
ঐক্যবস্ত, নবদীপক, অষ্টম অধ্যায় ।

বালিক। তাঁহার অপর নাম মূলক। তাঁহার মূলক নাম সম্বন্ধে একটু ইতিহাস আছে ;—যে সময়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, সেই সময়ে পরশুরাম পৃথিবীকে নিঃকজ্রিয়া করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সকল কজ্রিয় বিনষ্ট হইলে, বিবজ্রা জ্রীলোকগণ বালককে বেঠেন করিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন। স্মৃতরাং পৃথ্বী নিঃকজ্রা হইলে, তিনিই কজ্র-বংশের মূল। তাঁহার মূলক নামেরও তাহাই সার্থকতা। নারীগণ কর্তৃক রক্ষিত হইয়াছিলেন বলিয়া, তিনি ‘নারীকবচ’ নামেও অভিহিত হন। এই বংশের ষট্টাঙ্গ (দিলীপ) দেবাসুর-সংগ্রামে অসুরগণকে বিনাশ করিয়া, দেবতাদিগের প্রীতিভাজন হন। দেবতাগণ তাঁহাকে বর দিতে চাহিলে, তিনি অল্প বর প্রার্থনা না করিয়া, আপনার আয়ু-পরিমাণ জানিতে চাহেন। তাহাতে দেবগণ উত্তর দেন,— “আপনার পরমায়ু মুহূর্ত্তমাত্র অবশিষ্ট আছে।” সম্রাট ষট্টাঙ্গ দিলীপ তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ না হইয়া, তদুত্তরেই ভগবচ্ছিত্তার আত্মসমর্পণ করেন। এইজন্ত তাঁহার সম্বন্ধে বহু প্রশংসাবাদ বৃদ্ধ হয়। এই বংশের অশ্বরীষ রাজাও বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার যজ্ঞীয় পশু অগ্নত হইলে, তাঁহার পুরোহিত তাঁহাকে যজ্ঞে মাদুষ বলি প্রদান করিতে পরামর্শ দেন। ঋতীক ঋষির মধ্যম পুত্র শুনঃশেফ সেই যজ্ঞের বলি-রূপে রাজার নিকট বিক্রীত হন। কিন্তু বিশ্বামিত্রের অমুগ্রাহে শুনঃশেফ মুক্তিলাভ করেন। হরিশ্চন্দ্র রাজার নরমেধ-যজ্ঞ-প্রসঙ্গে, ভাগবতাদি গ্রন্থে, অজিগর্ত-পুত্র শুনঃশেফের কাহিনী দৃষ্ট হয়। উভয় ঘটনাই প্রায় একরূপ। তবে শেখোক্ত শুনঃশেফ যজ্ঞক্ষেত্রে প্রাণদানে কাতরতা প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু এই শুনঃশেফ আপনিই যজ্ঞে প্রাণদানে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। বায়ীকির রামায়ণের আদিকাণ্ডে অশ্বরীষ রাজার এই যজ্ঞ-বিবরণ বর্ণিত আছে; কিন্তু হরিশ্চন্দ্রের যজ্ঞ-বিবরণের কোনও উল্লেখ নাই। এই সূর্য্যবংশের আর এক প্রসিদ্ধ নৃপতি—রঘু। তাঁহার দ্বিধিজয়-কাহিনী বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাঁহারই নামানুসারে রঘু-বংশের প্রসিদ্ধি। রঘুর পৌত্র দশরথ। তৎপুত্র—রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন। দশরথ ও রামচন্দ্রের রাজত্বকালে অযোধ্যার গৌরব কতদূর পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল, রামায়ণ-প্রসঙ্গে পূর্বেই তাহা বিবৃত হইয়াছে। * মহারাজ দশরথ যে ভারতবর্ষের সার্বভৌম সম্রাট ছিলেন; কেবল ভারতবর্ষ বলিয়া নহে,—সমগ্র বসুধা যে তাঁহার করতলগত ছিল;—নানা স্থানে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। রামের রাজ্যাভিষেক-সংবাদ অবগত হইয়া, অভিমানিনী কৈকেয়ী যখন মহারাজ দশরথকে তাঁহার পূর্ব-প্রতিশ্রুতি স্মরণ করাইয়া দেন, বরলাভের জন্ত প্রস্তাব উপাধন করেন; কৈকেয়ীকে সাহসনা করিবার জন্ত—অল্প বর চাহিবার জন্ত—মহারাজ দশরথ তখন বলিয়াছিলেন;—

“করিষ্যামি তব প্রীতিং মুকুতেনাপি তে শপে। যাবদাবর্ততে চক্রং তাবতী মে রত্নকরা ॥

ত্রাবিড়ঃ সিদ্ধসৌবীর্য্যঃ সৌরাস্ট্রী দক্ষিণাপথঃ। বজ্রাঙ্গমাগধা মংতাঃ সমুদ্রাঃ কাশিকেশলাঃ ॥

ভদ্র জাতং বহু জব্যং ধনদান্তমজাবিকম্। ততো বৃশীষ কৈকেয়ি যদ্যদ্ব্যং মনসেচ্ছসি ॥”

‘আমি নিজপুণ্য শপথ করিয়া বলিতেছি,—তোমার প্রীতির জন্ত তোমার প্রিয়-কার্য্য সম্পাদন করিব। সূর্য্য যত দূর কিরণ বিস্তার করিয়া থাকেন, তত দূর পর্য্যন্ত পৃথিবী আমার অধিকারভূক্ত। ঐ যে সমুদ্র ত্রাবিড়, সিদ্ধ, সৌবীর্য্য, সৌরাস্ট্রী, দক্ষিণদেশীয় রাজা-সমূহ,

এবং বঙ্গ, অঙ্গ, মগধ, যশস্ত্র, কালী, কোশল প্রভৃতি—সমুদায় রাজ্য আমার শাসনাধীন ।
 ঐ সকল জনপদে ধন-ধাত্ত, ছাগ-মেষ,—যে কিছু সামগ্রী আছে, সকলই আমার অধিকার-
 ভুক্ত । তুমি সেই সকল দ্রব্যের বাহা কিছু লইতে ইচ্ছা কর, আমি তাহাই তোমাকে
 প্রদান করিব । তুমি তোমার প্রার্থনা পরিবর্তন কর ।’ ইহাতে বৃষ্ণিতে পারা যায়, তখন কোন্
 কোন্ দেশের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল এবং কোন্ কোন্ দেশ দশরথের প্রাধান্য মাঝ করিত ।
 ত্রীরামচন্দ্রের রাজত্বকালে, দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া, ভরত কোটা কোটা গন্ধর্ব্বকে নিহত
 করিয়া, গন্ধর্ব্বরাজ্যে আপন বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন । শক্রয়ও সেই সময়ে
 মধু-পুত্র প্রবল-পরাক্রান্ত লবণ-দৈত্যকে সংহার করিয়া, মধুবনে মধুরাপুরী প্রতিষ্ঠা
 করেন । ত্রীরাম-তনয় কুশ-বংশের হিরণ্যানভ, জৈমিনি ঋষির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া,
 যোগশিক্ষায় যোগাচার্য্য হইয়াছিলেন । যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি ইহারই নিকট অধ্যায়-যোগ
 শিক্ষা করেন । এই বংশের মরু, বেদব্যাসের পুরাণ-রচনার সমসময়ে ‘কলাপ’ গ্রামে
 যোগাশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন । পরবর্ত্তী যুগে ইনি সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়গণের
 প্রবর্ত্তনিতা । এই বংশের রাজা বৃহদল ভারত-যুদ্ধে অর্জুন-পুত্র অভিমন্যুর হস্তে নিহত
 হন । বৃহদলের পরবর্ত্তী সূর্য্যবংশীয় নৃপতিগণ ভবিষ্য-রাজ বলিয়া অভিহিত । শাস্ত্রানুসারে,
 ঋষিরা রাজা হইলে, কলিযুগে ইক্ষাকু-বংশ ধ্বংস হয় ।

ইক্ষাকুর দ্বিতীয় পুত্র—নিমি । তাঁহার বিবরণ বৈচিত্র্যময় । পুরাণে দৃষ্ট হয়,—তিনি
 সহস্র-বর্ষ-ব্যাপী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া, কুলগুরু বশিষ্ঠকে হোতৃত্বে বরণ করেন । কিন্তু
 ইজ্ঞের পঞ্চশতবর্ষব্যাপী যজ্ঞে ব্যাপ্ত থাকায় বশিষ্ঠ, ইজ্ঞের যজ্ঞ শেষ
 হওয়া পর্য্যন্ত, নিমিকে প্রতীক্ষা করিতে বলেন । নিমি তাহাতে কোনই
 উত্তর প্রদান করেন না । ফলে, বশিষ্ঠ ‘মোক্ষ সম্ভতি লক্ষণং’ মনে করিয়া,
 ইজ্ঞের যজ্ঞ সম্বাদনে ত্রুতী হন । এদিকে নিমি, গৌতমাদি ঋষিকে হোতৃ-পদে বরণ
 করিয়া যজ্ঞ আরম্ভ করেন । ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া বশিষ্ঠ নিদ্রাগত রাজাকে অভিশাপ
 দেন । তাহার ফলে, রাজার দেহ নাশ হয় । কিন্তু বশিষ্ঠ শাপ-প্রদান করিলে, রাজাও
 তাহাকে অভিশপ্ত করিয়াছিলেন । তাহাতে বশিষ্ঠও অপর দেহ লাভ করেন । তৈল-
 গন্ধাদির অমুলেপনে রাজার দেহ সন্দানুতের ত্রায় অবিকৃত রাখিয়া যজ্ঞ সমাপন করা
 হয় । রাজা নিমির কোনও পুত্র ছিল না বলিয়া, অরাজকতা ভয়ে ভীত হইয়া, মুনিগণ
 অগ্ন্যংগাদক অরণীতে নিমির দেহ মছন করেন । তাহাতে রাজার মৃত দেহ হইতে একটি
 কুমার উৎপন্ন হয় । মৃত দেহ হইতে জন্ম-হেতু ঐ পুত্রের নাম—জনক ; এবং পিতার
 বিদেহ অবস্থায় জন্ম-হেতু তাঁহার নাম—‘বৈদেহ’ হয় । মছন (মছন) দ্বারা জাত-হেতু ‘মিষি’
 (মিথিল) নামেও ঐ পুত্র পরিচিত হইয়াছিল । এই জনকই মিথিলাপুরী নির্মাণ করেন । এই
 বংশের সপ্তবিংশতি পর্য্যায় শীরধ্বজ জনকের আবির্ভাব হয় । তাঁহার কন্যার নাম—সীতা ।
 শীরধ্বজ রাজা যজ্ঞার্থ তুমি-কর্ষণ করিবার সময় শীর (সীর) অর্থাৎ লালন-পদ্ধতির
 অগ্রভাগ হইতে ঐ কন্যা উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া তাহার সীতা নাম হয় । শীর হইতেই
 কীর্ত্তির হৃদয় ; এই জন্য রাজার নামও শীরধ্বজ হইয়াছিল । শী ধ্বজের পর এই বংশ

মিথিলায়
 রাজ-বংশ ।

আরও বহু নুপতি জয়গ্রহণ করেন। তাঁহারা সকলেই মিথিলার মুখ উজ্জল করিয়াছিলেন। এই বংশের মহীপালগণের অনেকেই আশ্রয়বিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন। যোগীশ্বরদিগের অমুকম্পার তাঁহারা প্রাসাদবাসী হইয়াও সুখ-দুঃখাদি স্বনির্ভর হইয়াছিলেন। যোগীশ্বর রাজবন্ধ্য এই মৈথিল রাজবংশের জনক প্রভৃতি রাজত্ববর্গের যে কীর্ত্তি-কাহিনী প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহা চির-সমুজ্জ্বল হইয়া আছে। জনক-রাজবংশের জ্ঞান-গরিমা, প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার পরিচয়—শাস্ত্রের অনেক স্থলে দৃষ্ট হয়।

বৈবস্বত, মহুর অত্যাচ্ছ পুত্রের মধ্যে পৃষদ্র, ব্যাঘ্র-ভ্রমে গো-বধ করিয়াছিলেন বলিয়া, পুত্রও প্রাপ্ত হন। পরিশেষে, অম্মশোচনার দাবায়িতে দন্দদেহ হইয়া, পরব্রহ্মে জীন হন।

বৈবস্বত মহুর মনুপুত্র কর্ত্ত্ব হইতে ‘কার্কষ’ ক্ষত্রিয়গণের উৎপত্তি হয়। এই কার্কষ অত্যাচ্ছ ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম-বৎসল উত্তরাপথ রক্ষক ছিলেন। নেদিষ্টের বংশধরগণ। (ভাগবতের মতে—দিষ্টের) পুত্র নাভাগ কর্ত্ত্ববশে বৈশ্বজ্ঞ প্রাপ্ত হন।

তাঁহার বৈশ্বজ্ঞ-প্রাপ্তির পূর্বে ভলন্দন নামে তাঁহার যে পুত্র জন্মে, সেই পুত্রের বংশে মহাবল-শালী মরুত জয়গ্রহণ করেন। তিনি রাজচক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন। অঙ্গিরার পুত্র মহাযোগী সত্ত্বর্জ তাঁহার যজ্ঞকার্য্য সম্পন্ন করাইয়াছিলেন। মরুতের যজ্ঞ সত্ত্বর্জে পাণ্ডা প্রচলিত আছে,—‘তেমন যজ্ঞ ভুবনে আর কোথায় হইয়াছে? সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞীয় বস্তুই সুবর্ণময় ছিল।’ এই বংশের বিশাল—‘বৈশালী’ নগর নির্মাণ করেন। সোমদত্ত বহু অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া যশস্বী হন। বিশাল-বংশীয় নুপতিগণ দীর্ঘায়ু, বীৰ্য্যবান ও ধার্ম্মিক ছিলেন। মনু-তনয় শর্য্যাতির কন্যা—সুকন্যা। মহর্ষি চ্যাবনের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। সে বিবাহ—এক অপূর্ণ ঘটনা। সুকন্যা সখীগণ পরিবৃত্তা হইয়া, উড়ানে ফল-পুষ্প চয়ন করিতে-ছিলেন। সম্মুখে একটা বগ্নীক দেখিতে পাইয়া, ক্রীড়াচ্ছলে কষ্টক দ্বারা তাহা বিদ্ধ করেন। সেই বগ্নীকের মধ্যে মহর্ষি চ্যাবন সমাহিত অবস্থায় অবস্থান করিতেছিলেন। কষ্টকে মহর্ষির চক্ষু বিদ্ধ হওয়ায়, রক্তধারা বিনির্গত হইতে থাকে। সুকন্যা সন্তুষ্ট হইয়া, পিতার নিকট সেই কথা জ্ঞাপন করেন। এদিকে মহর্ষির যোগভঙ্গ-হেতু রাজা শর্য্যাতির সৈন্ত-সমূহের বলমূত্র রোধ হয়। সৈন্তগণের অবস্থা অবলোকন করিয়া আতঙ্কে রাজা শর্য্যাত্তি, মহর্ষি চ্যাবনের নিকট ক্ষমা-প্রার্থী হন। কিন্তু মহর্ষি, সুকন্যাকে বিবাহ করিতে চাহেন। বৃদ্ধ জরাগ্রস্ত ঐবির হস্তে প্রিয়ভবা কন্যাকে রাজা কোন প্রাণে অর্পণ করিবেন? কিন্তু ঐবির আদেশ—উপায়ান্তর নাই! অগত্যা সেই বৃদ্ধ চ্যাবন ঐবির হস্তেই রাজা সুকন্যাকে অর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। পতি বৃদ্ধ হইলেও সুকন্যা কিন্তু স্নেহ হইলেন না। তিনি নিরন্তর পতিসেবার জীবন-মন সমর্পণ করিলেন। অনন্তর সুকন্যার পাতিব্রতা ধর্মে সন্তুষ্ট হইয়া, দেববৈদ্য অথিনীকুমার-বর সুকন্যাকে বর দিলেন। সেই বরে মহর্ষি চ্যাবন চির-যৌবন লাভ করেন। রাজা শর্য্যাত্তির আনর্জ নামে এক পরম ধার্ম্মিক পুত্র ছিলেন। আনর্জের পুত্র রেবত সাগরাত্যন্তরে ‘কুশহসী’ নগরী নির্মাণ করেন। তিনি আনর্জাদি দেশ শাসন করিতেন। রেবতের এক শত পুত্রের মধ্যে রৈবত (কুহুরি) বিশেষ প্রসিদ্ধ। কন্যা রেবতীর বর অব্যবণের কন্য ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া, পঞ্চকর্কগণের সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া, ইনি বহু বহু

অবস্থান করিয়াছিলেন। সপ্তবিংশতি চতুর্ষুপ অতীত হইলে, ব্রহ্মার আদেশে, ইনি মর্ত্যলোকে আগমন করেন। অতঃপর অষ্টাবিংশতিতম চতুর্ষুপান্তর্গত স্বাপর যুগে বহুদেব-পুত্র বলদেবের সহিত তাঁহার কন্যা রেবতীর উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। কন্যা সম্প্রদান পূর্ব্বক রাজা কুকুন্নি তপস্যার্ব নারায়ণাশ্রমে গমন করেন। এই রৈবত রাজাই ‘বৈরতক’ নামে প্রসিদ্ধ। ইহঁার রাজধানী কুশস্থলী, পরবর্ত্তিকালে ‘দ্বারকাপুরী’ নামে অভিহিত হইয়াছে। রৈবত রাজ্যার ব্রহ্মলোকে অবস্থান কালে পুণ্যজন নামা দম্ম্যগণ তাঁহার কুশস্থলী পুরী অধিকার করিয়া ছিল। তাহাতে রৈবতের ভ্রাতৃগণতক দিগ্দিদিকে পলায়ন করিয়া, ক্ষত্রিয়-বংশের বিস্তার করিয়াছিলেন। বৈবস্বত মহুর পৌত্র নাভাগ, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে গুরুকুলে বাস করিলে, তাঁহার ভ্রাতৃগণ বিষয় বর্জন করিয়া লন। তিনি গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাগত হইলেও ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে বিষয় প্রদানে সম্মত হন না। পরন্তু, পিতাকেই ‘দায়’ বলিয়া তাহারা তাঁহার অংশ নির্দেশ করিয়া দেয়। যাহা হউক, পিতার পরামর্শে, আদ্রিস মুনিগণের অনুগ্রহে, নাভাগ বহু ধন প্রাপ্ত হন। তাঁহার পুত্র অম্বরীষ আপন কর্ত্ত্ববলে সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াছিলেন। মহারাজ অম্বরীষ ভগবন্তকৃত ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। তাঁহার ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহার রক্ষার জন্ত, বিষ্ণু তাঁহাকে আপনার চক্র প্রদান করিয়াছিলেন। বিপৎকালে সেই চক্র অম্বরীষের সহায় ছিল। একদা কার্ত্তিক মাসের ষাটশরী দিনে দুর্কাসা-ঋষি অম্বরীষ-গৃহে ব্রত-পারগ করিতে আসেন। অম্বরীষ যথাযোগ্য অভ্যর্থনায় আতিথ্য-সৎকারে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু স্নান করিতে গিয়া, দুর্কাসার প্রত্যাগমন করিতে বিলম্ব হইল। তখন, অতিথির জন্ত অধিকক্ষণ প্রতীক্ষা করিতে না পারিয়া, ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হইয়া, পুরোহিতের অনুমতিক্রমে রাজা অম্বরীষ ভোজন করিলেন। প্রত্যাগত হইয়া, দুর্কাসা তাহাতে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। মহর্ষির জটা হইতে উগ্র-দেবতার সৃষ্টি হইল। সেই উগ্রদেবতা মহারাজকে বধ করিতে অগ্রসর হইলে, বিষ্ণুর সুদর্শন-চক্র আসিয়া মহারাজকে রক্ষা করিল। উগ্রদেবতা বিনষ্ট হইল। দুর্কাসা, অম্বরীষের শরণাপন্ন হইলেন। তখন আবার অম্বরীষকেই দুর্কাসার প্রাণ রক্ষা করিতে হইল। এইরূপে মহর্ষি দুর্কাসার প্রাণ রক্ষা করিয়া, তিনি অশেষ যুগোত্তম হন। এই বংশের রথীতর রাজ্যার পুত্র-সন্তান না হওয়ায়, মহর্ষি আদ্রিস কর্ত্ত্বক তাঁহার ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই হইতেই এই বংশ যথাক্রমে ‘আদ্রিস’ এবং ‘ক্ষত্রোপেত’ ব্রাহ্মণ-বংশ বলিয়া পরিচিত। মহু-পুত্র যুগের বংশের ওষবতী কন্যা, সুদর্শন রাজ্যার সহিত পরিণীতা হন। যুগের ভ্রাতা নরিস্যন্তের বংশে ‘অগ্নিবেশ্য’ নামক মহর্ষির উৎপত্তি হয়। তিনি কানীন ও জাতুকর্ণ নামে রিখ্যাত। তাঁহা হইতে ‘অগ্নি-বেশ্যায়ন’ ব্রাহ্মণবংশের উৎপত্তি হইয়াছিল। সূর্য্যবংশীয় প্রধান প্রধান নৃপতিগণের ইহাই সাক্ষিগুণ পরিচয়। পুরাণ-সমূহে, কোথাও বিস্তৃত-ভাবে, কোথাও বা সংক্ষেপে, এতদ্বিবরণ পরিবর্ণিত আছে।

* অম্বরীষ নামে কত নৃপতির পরিচয় পাওয়া যায় ?—মহারাজ মাচ্ছাতার দ্বিতীয় পুত্রের নামও অম্বরীষ। তিনি ধর্ম্মসেন নামেও পরিচিত। আবার দুর্ককের পুত্র বলিয়াও অপর এক অম্বরীষের পরিচয় পাওয়া যায়। সেই অম্বরীষের বজ্রাস্ত্রাধারের সময় ইন্দ্র-কর্ত্ত্বক তাঁহার বজ্র-পণ্ড অগ্ৰহৃত হইয়াছিল। সেই বজ্র সম্পাদনের জন্ত বজ্রীক মুনির পুত্র ও ঋগ্বেদকে তিনি রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ ।

চন্দ্রবংশীয় নৃপতিগণ ।

[চন্দ্রবংশোদ্ভূত আরু ও অনাবহুর এসঙ্গ,—আরু-পুত্র রজির বৃত্তান্ত,—অনাবহু-বংশের জহু, বিখ্যামিত্র, পরশুরাম প্রভৃতির এসঙ্গ,—নহব-পুত্র যতি ও যযাতি,—যযাতির জরাগ্রহণে পুরুষ মহত্ব,—যহুবংশের বিবরণ,—ক্রেটি, সহস্রজিৎ ও কার্ত্তবীৰ্য্যাস্ত্রনের এসঙ্গ,—জ্যাম্ব, বক্র ও বিদর্ভ,—সাহস-পুত্র বৃদ্ধির বংশ এসেন ও সত্রাজিৎ,—অমন্তক মণির উপাখ্যান,—বহুদেব, কুন্তী, উগ্রসেন, কংস, শ্রীকৃষ্ণ ও বানবগণ,—পুরুষবংশের বিবরণ,—হুমন্ত-শকুন্তলার এসঙ্গ,—ভরত ও রত্নদেবের সাহায্য,—কজ্রিয়ের ব্রাহ্মণ্য প্রাপ্তি,—জরাসন্ধ ও জরা সাক্ষীর উপাখ্যান,—প্রতীপ, শান্তনু, ভীষ্ম, পাণ্ডব, ধার্মাষ্ট্র প্রভৃতি,—ক্রহা, তুর্কম্বু ও অণুর বংশ,—রোমপাদ এসঙ্গ,—দাতাকর্ণের উপাখ্যান ।]

প্রজাপতি অত্রির অংশে চন্দ্রের উদ্ভব । সেই চন্দ্র হইতেই চন্দ্রবংশ । পুরাণে প্রকাশ,—দেবগুরু বৃহস্পতির পত্নী তারাকে চন্দ্র অপহরণ করিয়াছিলেন । তারার গর্ভে তাঁহার এক পুত্র-সন্তান জন্মে । বালকের বুদ্ধির গাভীৰ্য্য দেখিয়া তাঁহার ‘বৃধ’
আরু ও অনাবহুর এসঙ্গ ।
নাম রাখা হইয়াছিল । স্বর্ঘ্যবংশীয় বৈবস্বত মহুর কন্তা ইলার (ইড়ার)
সহিত বৃধের পরিণয় হয় । বৃধের ঔরসে ইলার গর্ভে পুরুষবান জন্মগ্রহণ করেন । পুরুষবান যেমন রূপবান, তেমনিই গুণবান ছিলেন । তিনি তেজস্বী, বিদ্বান, দান-শীল, রাজ্যিক ও ব্রহ্মবাদী বলিয়া প্রসিদ্ধ । তাঁহার জ্যৈষ্ঠ পরাক্রমশালী ও যশস্বী ব্যক্তি সে সময়ে কেহই ছিলেন না । পুরুষবান প্রয়াগ-প্রদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন । পুরুষবার রূপ-গুণের বিষয় অবগত হইয়া অপ্সরা উর্ধ্বনী তাঁহাতে আসক্ত হন । তাঁহার গর্ভে পুরুষবার আরু-প্রমুখ পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করেন । আরু-পুত্র রজির বংশ—সাধারণতঃ ‘রাজেন’ ক্ষত্রিয়-বংশ নামে প্রসিদ্ধ । রজি চন্দ্রবংশের ধুরন্ধর নৃপতি ছিলেন । তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে, বিপক্ষ-পক্ষ আতঙ্কে কম্পিত হইত । দেব-দানবের যুদ্ধে দানবগণকে পরাজিত করিয়া, তিনি দেবগণের প্রণীত-জয়ত্রীর পুনরুদ্ধার-সাধন করেন । তাঁহার বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার পুত্রত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন । রজির পাঁচ শত পুত্র জন্মে । তাহার মোক্ষদত্ত ও ধর্মজ্ঞানশূন্য হইয়াছিল । স্তত্রায় তাহাদের রাজ্যার্থ্য সমস্তই লোপ পায় । রজিনন্দনগণ ইন্দ্র-জাভে প্রয়াসী হইয়া, সকলেই ইন্দ্রহস্তে নিহত হয় । পুরুষবার দ্বিতীয় পুত্র অনাবহুর বংশে জহু নরপতি জয়গ্রহণ করেন । তিনি ‘সর্কমেধ’ নামক মহাযজ্ঞের অর্চনাদান করিয়াছিলেন । সেই যজ্ঞক্ষেত্রে গঙ্গাস্রোতে প্রাবিত হয় । রাজ্যি জহু তাহাতে কুপিত হইয়া, গঙ্গাকে এক গধুবে পান করিয়াছিলেন । যজ্ঞকার্য্যে ত্রুতী ঋত্বিক মহর্ষিগণ জহুকে শাস্ত করিয়া, গঙ্গাকে কস্তাক্রমে গ্রহণ করিতে পরামর্শ দেন । সেই হইতে গঙ্গা ‘জাহুবী বা জহু-কন্তা’ নামে পরিচিতা হন । ইনি স্বর্ঘ্যবংশীয় যুবনাথের কন্যা কাবেরীকে বিবাহ করেন । তাঁহার স্নসহ নামে এক পুত্র জন্মে । এই জহু-বংশের কুশিক, পুরুষবংশের কন্যাকে বিবাহ করেন । তাঁহার পুত্র—পাণি । পাণির পুত্র—মহাম্ম বিখ্যামিত্র । তিনি ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণ্য

লাভ করিয়াছিলেন । তাঁহার ব্রাহ্মণ্য-প্রাপ্তি-সম্বন্ধে পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে ;—
 গাধির সত্যবতী নামী এক কন্যা ছিলেন । ভার্গব ঋচীক সহস্র বৈত অশ্বের বিনিময়ে
 তাঁহাকে বিবাহ করেন । সত্যবতী এবং তাঁহার মাতা, পুত্র-কামনা করিয়া, মহর্ষি
 ঋচীককে যজ্ঞ করিতে বলেন । সেই যজ্ঞে দুই প্রকার চক্র প্রস্তুত হয় । পত্নী
 সত্যবতীর নিমিত্ত ব্রহ্ম-মন্ত্রে এবং স্বশ্রীর নিমিত্ত ক্ষত্র-মন্ত্রে ঋচীক সেই চক্র প্রস্তুত করিয়া-
 ছিলেন । তাহাতে সত্যবতীর গর্ভে ব্রাহ্মণ এবং তাঁহার মাতার গর্ভে ক্ষত্রিয় পুত্র উৎপত্তির
 সম্ভাবনা ছিল । কিন্তু চক্র প্রস্তুত করিয়া মহর্ষি স্নান করিতে গেলে, কন্যা ও মাতা
 ক্রমক্রমে একের চক্র অন্তে ভক্ষণ করেন । প্রত্যাহ্বত হইয়া ঋচীক জানিতে পারেন, চক্র-
 বিপর্যায় ঘটিয়াছে । তাহাতে তিনি সত্যবতীকে বলেন,—“চক্র-বিপর্যয়ে দুই গর্ভে দুই
 বিপরীত প্রকৃতির সন্তান জন্মিবে । তোমার পুত্র ক্ষত্রিয়-প্রকৃতি হইবে, এবং তোমার ভ্রাতা
 শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ্য প্রাপ্ত হইবেন ।” সত্যবতী তাহাতে ক্ষুব্ধ হইলে, সত্যবতীর অমুনয়ে, ঋচীক
 কহিলেন,—“তোমার পুত্র ক্ষত্রিয়-ভাবাপন্ন হইবে না বটে ; কিন্তু তোমার পৌত্র রুদ্র-ভাবাপন্ন
 হইবে ।” তদনুসারে সত্যবতীর গর্ভে জমদগ্নি এবং তাঁহার মাতার গর্ভে বিশ্বামিত্র জন্মগ্রহণ
 করেন । চক্র-বিপর্যয়ে এইরূপে বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণ্য লাভ হয়, এবং জমদগ্নি-পুত্র পরশুরাম
 ঐদৌপ্ত পাবকের আয় সংহারমূর্ত্তি প্রাপ্ত হন । * বিশ্বামিত্র কৰ্ম্মফলে তপঃপ্রভাবে ব্রাহ্মণ্য
 লাভ করিয়াছিলেন,—পুরাণান্তরে এবম্বিধ উক্তিও দৃষ্ট হয় । পরশুরাম একবিংশতিবার
 পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন । প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয় বীর কার্ত্তবীৰ্য্যার্জুনের ইনিই সংহার-
 সাধন করেন । পিত্রাজ্ঞায় পরশুরাম মাতৃহত্যা করিয়াছিলেন । তাঁহার মাতা—প্রসেনজিৎ
 রাজার কন্যা—রেণুকা । জমদগ্নি রেণুকাতে ব্যাভিচার-দোষ-দুষ্টা বলিয়া সন্দেহ করেন । সেই
 সন্দেহ-বশে তিনি পুত্রকে মাতৃ-বধে আদেশ দিয়াছিলেন । কুঠারাঘাতে মাতৃ-বধ করিয়া,
 পিতার সন্তোষ-বিধান-পূর্ব্বক, জমদগ্নি পিতার নিকট বর প্রাপ্ত হন । সেই বরে রেণুকা পাপ-
 মুক্তা হইয়া পুনর্জীবন লাভ করেন এবং পরশুরাম অজ্ঞেয় হন । শ্রীরামচন্দ্রের নিকট
 হরধনুর্ভঙ্গে পরশুরামের দৰ্প চূর্ণ হয় । পরশুরাম ভগবানের ষষ্ঠাবতার এবং অমর বলিয়া
 পরিকীর্ত্তিত । পরশুরামের আকৃতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা শাস্ত্রাদিতে দৃষ্ট হয় ;—

“নীলবর্ণনিভঃ প্রাণ্ডঃ জটামূলমণ্ডিতঃ । ধনুঃপরশুপাণিক সাক্ষাৎ কালমিবাতকঃ ।”

পরশু, কুঠার এবং ধনুর্কাণ ধারণ করিয়া, পরশুরাম যে বীর্য্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন,
 তাহাতে পৃথিবী সন্ত্রস্তা হইয়াছিলেন । † সেরূপ বীর ভূমণ্ডলে অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ।
 অধিকাংশ পুরাণেই পুরুষবার পুত্র অমাবসুর বংশে বিশ্বামিত্র ও পরশুরাম ঐহুতির
 উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ আছে । কিন্তু অগ্নিপু্রাণে আবুর বংশে দ্বাত্রিংশ পর্যায়ে
 এবং শ্রীমদ্ভাগবতে পুরুষবার পুত্র বিজয়ের বংশে ষোড়শ পর্যায়ে বিশ্বামিত্র ও সত্যবতীর
 নাম দৃষ্ট হয় । অগ্নিপু্রাণে এবং শ্রীমদ্ভাগবতে পুরুষবার পুত্রের মধ্যে অমাবসুর নাম
 আদৌ দৃষ্টিগোচর হয় না ।

* বিষ্ণুপুরাণ, চতুর্থ অংশ, সপ্তম অধ্যায় ; শ্রীমদ্ভাগবত, নবম স্কন্ধ, পঞ্চদশ অধ্যায় ; হরিবংশ, সপ্তবিংশ
 অধ্যায় ; ব্রহ্মপুরাণ, দশম অধ্যায় ; এবং মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে দ্রষ্টব্য ।

† মহাভারত, আদিপর্ক, ষট্-সুস্ত্যধিক শততম অধ্যায় ।

পুত্রবধূর জ্যেষ্ঠ পুত্র আয়ু, স্বর্ভানু-নন্দিনী প্রভাকে (বিষ্ণুপুরাণের মতে—বাহুর কন্যাকে) বিবাহ করিয়াছিলেন । তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে নহষ প্রসিদ্ধ । তিনিই ভ্রাতৃগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ

এবং রাজ্য প্রাপ্ত হন । তাঁহার বংশ—বহু-বিস্তৃত । নহষের ছয় পুত্র । তন্মধ্যে
নহষ-পুত্র
যতি ও যযাতি । জ্যেষ্ঠ যতি, ধনৈর্ধর্যের অসারত্ব উপলব্ধি করিয়া, সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন

করেন । সূতরাং যযাতি রাজ-সিংহাসন প্রাপ্ত হন । যযাতি আপন বাহুবলে পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন । তাঁহার দুই ভাৰ্য্যা—শুক্ৰাচার্য্যের কন্যা দেবযানি এবং বৃষপক্ষা অশুরের কন্যা শর্মিষ্ঠা । দেবযানির গর্ভে যদু ও তুর্কসু এবং শর্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রহ্য, অণু ও পুরু জন্মগ্রহণ করেন । এই যদু ও পুরু হইতেই পুরাণ-প্রসিদ্ধ যদুবংশের ও পুরুবংশের উৎপত্তি । যযাতি অতিশয় স্ত্রৈণ ছিলেন । শুক্ৰাচার্য্যের রোষে তিনি জরাগ্রস্ত হন । দেবযানির সহিত যযাতির বিবাহের সময় কথা হইয়াছিল,—দেবযানি ভিন্ন অল্প পত্নীতে রাজা আসক্ত হইতে পারিবেন না । সূতরাং শর্মিষ্ঠার গর্ভে যখন তাঁহার পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করিল, দেবযানি তখন ক্ষুদ্রা হইয়া, পিতা শুক্ৰাচার্য্যের নিকট সমস্ত বিষয় জ্ঞাপন করিলেন । কন্যার বাক্য-শ্রবণে, ক্রুদ্ধ হইয়া, শুক্ৰাচার্য্য রাজা যযাতিকে অভিসম্পাত করেন । তাহাতে রাজা যযাতি জরাগ্রস্ত হন । জরাগ্রস্ত হইয়া, রাজা যযাতি শুক্ৰাচার্য্যের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন । শরণাপন্ন হইয়া, তিনি শুক্ৰাচার্য্যের নিকট জরামুক্তির জন্ত স্তব-স্ততি করিলে, শুক্ৰাচার্য্য আদেশ করেন,—“যদি কেহ তোমার জরা গ্রহণ করিয়া, তাহার যৌবন তোমাকে প্রদান করিতে সম্মত হয়, তুমি জরা বিনিময় করিয়া জরানুক্ত হইতে পারিবে ।” জ্যেষ্ঠাদিক্রমে আপন পুত্রগণের নিকট যযাতি জরা-বিনিময়ের বাসনা জ্ঞাপন করেন । জ্যেষ্ঠ-পুত্র যদু কিছুতেই পিতার জরা গ্রহণে সম্মত হন না । যযাতি তাঁহাকে অভিসম্পাত দেন,—“তোমার বংশের কেহই রাজ্যার্থ হইবে না ।” এইরূপ একে একে দ্রহ্য, তুর্কসু ও অণুর নিকট প্রার্থনা জানাইয়াও যযাতি বিফল-মনোরথ হন । তিনি তখন তাহাদিগকেও পূর্বোক্তরূপে অভিশপ্ত করেন । অবশেষে কনিষ্ঠ পুত্রের নিকট সেই প্রস্তাব উত্থাপিত হয় । পুরু কিন্তু হঠাৎ পিতার জরা-গ্রহণে সম্মত হন ; তিনি বলেন,—“আমার উপর আপনার মহান্ অমুগ্রহ । আপনার অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারিলেই আমি কৃতকৃতার্থ হইব ।” অতঃপর পুত্রের সহিত যৌবন বিনিময় করিয়া, নবযৌবন প্রাপ্ত হইয়া, রাজা যযাতি ভোগ-বিলাসে মত্ত হন । কিন্তু যতই তিনি কামনাবশে উন্মত্ত হইলেন, ততই তাঁহার ভোগ-বাসনা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । অবশেষে একদিন বিবেক-বুদ্ধির ঈদয় হইল । রাজা বুঝিলেন,—“বিষয়-ভোগে কামনার নিবৃত্তি অসম্ভব । বরং তাহাতে, স্নাতাহতি-প্রাপ্ত অগ্নির জ্বালায়, কামনা বৃদ্ধিই পাইয়া থাকে ।” তখন, অহুতাপানলে দগ্ধ হইয়া, রাজা যযাতি ভোগ-তৃষ্ণা পরিহার-পূর্বক পরব্রহ্মের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন ; পুত্রের নিকট হইতে জরা প্রতিগ্রহণ করিয়া, তাঁহাকে যৌবন প্রত্যর্পণ-পূর্বক, তপস্তার জন্ত বনে গমন করিলেন । পক্ষয় উৎপন্ন হইলে পক্ষিপাক্ষক যেমন নীড় পরিত্যাগ করে, জ্ঞানোদয় হওয়াতে যযাতিও তদ্রূপ সন্ন্যাসাশ্রম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । বন-গমনের পূর্বে, রাজা যযাতি, তুর্কসুকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে, দ্রহ্যকে পশ্চিম দিকে, যদুকে দক্ষিণপাশ্বে, অণুকে উত্তর দিকে ঋতু

রাজ্য প্রদান করিয়া, পুরুকে সর্ষ-পৃথী-পতি-র বরণ করিয়াছিলেন । * এই পুরু বংশেই কুরুক্ষেত্র মহা-সমরের প্রধান অভিনেতৃগণ—কৌরব ও পাণ্ডবগণ—জন্মগ্রহণ করেন । যবাত্তির পুত্র-পঞ্চকের প্রত্যেকেই বংশ বহু-বিস্তৃত ।

যহুর পুত্রগণের মধ্যে ক্রোড়ুর এবং সহস্রজিতের (সহস্রদেবের) বংশ বিশেষ প্রসিদ্ধ । সহস্রজিতের পুত্র—হৈহয় । তাঁহার পরবর্তী দশম পর্বায়ে কার্ত্তবীৰ্য্যার্জুন জন্মগ্রহণ করেন ।

দত্তাত্রেয়ের আরাধনা করিয়া, ইনি বর প্রাপ্ত হন । দত্তাত্রেয় পুরাণ-যজুৰাণ । বিশেষে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া পরিকীৰ্ত্তিত । দত্তাত্রেয়ের নিকট ইনি

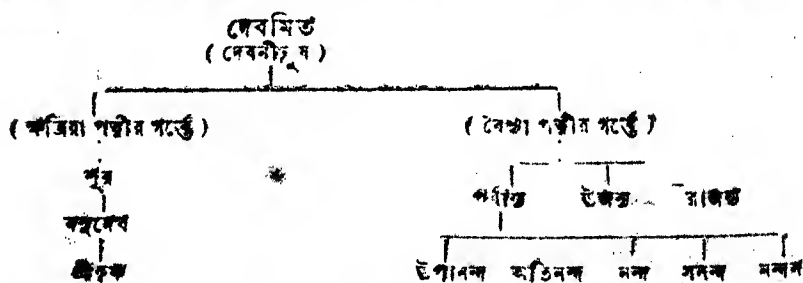
অধর্ষ-সেবা-নিবারণ, ধর্ম্মস্বারা পৃথিবী জয় ও পৃথিবী পালন, শত্রুর নিকট অপরাধময়, অশিস ত্রস্তাও বিখ্যাত পুরুষের হস্তে মরণ এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সহস্র বাহু প্রাপ্তি প্রভৃতির বর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । কার্ত্তবীৰ্য্যার্জুন দশ সহস্র বজ্র সমাপন করিয়া, সমুদ্রীপা বসুমতীকে সর্ষপ্রকারে বশীভূত করিয়াছিলেন । তাঁহার রাজ্যে কাহারও দ্রব্য অপহৃত হইত না ; কেহই শোক ও বিহ্বল-মস্তৃগ ও বিভ্রান্ত হইত না । তিনি ধর্ম্মাত্মসারে প্রজাপালন করিতেন । একদা তিনি নর্ম্মদায় জলকেলি করিতেছিলেন ; ইত্যবসরে লক্ষ্মাধিপতি রাক্ষসরাজ্য রাবণ তাঁহার পুরী আক্রমণ করেন । তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া, তিনি রাবণকে পশুর ভায় বন্ধন করিয়া রাখিয়াছিলেন । কার্ত্তবীৰ্য্যার্জুন কর্কোটক-নন্দন নাগদিগকে পরাজিত করিয়া ‘মাহিষমারী’ পুরী প্রতিষ্ঠা করেন । পঞ্চাশতি সহস্র বৎসর রাজত্বের পর, জামদগ্নি পরশুরামের হস্তে তিনি নিহত হন । কার্ত্তবীৰ্য্যার্জুনের শত পুত্রের (মতান্তরে সহস্র পুত্রের) মধ্যে জয়ধ্বজ প্রভৃতি পঞ্চ পুত্র জীবিত ছিলেন । জয়ধ্বজ অবন্তী-দেশে রাজত্ব করিতেন । তাঁহার তালজয় নামে এক পুত্র হয় । সেই তালজয়ের এক শত পুত্র ছিল । তাহারও তালজয় নামে বিখ্যাত । তাহাদের অনেকে দগর হস্তে নিহত হইলে, ভরত রাজ্য প্রাপ্ত হন । ভরতের পুত্র—যুব ; যুবের পুত্র—মধু ; মধুর বৃষ্টি-প্রমুখ এক শত পুত্র জন্মে । এই বংশ,—যদু হইতে যদুকুল বা ষাঢ়ব সংজ্ঞা ; মধু হইতে মধু-বংশ বা মাধব সংজ্ঞা ; এবং বৃষ্টি হইতে বৃষ্টি-বংশ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে । এই বংশে অর্থাৎ হৈহয়দিগের বংশে বর্ত্তিহোত্র, সুব্রত, ভোজ, অবন্তী, ভৌগির্য, তালজয়, ভরত ও সুব্রাত প্রভৃতি বহু শাখার উৎপত্তি হইয়াছিল । যহুর অপর পুত্র ক্রোড়ুর গান্ধারী ও মাদ্রী নাম্নী দুই ভাৰ্য্যা ছিলেন । ক্রোড়ুর পুত্রগণের মধ্যে অনমিত্র, যুগাজিৎ, দেবমীচুর্ষ (দেবমিত) ও বৃজিনীবান প্রসিদ্ধ । বৃজিনীবানের বংশের শশবিন্দু চতুর্দশ পঞ্চাশতের স্বামী ও রাজচক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন । তাঁহার দশ সহস্র গরী এবং প্রত্যেক গরীতে এক এক লক্ষ সন্তান জন্মগ্রহণ করেন । শশবিন্দুর প্রপৌত্র উশনার এক শত অধমেধ-যজ্ঞ সম্পন্ন করেন । উশনার পৌত্র জ্যামব অত্যন্ত দ্বৈগ ছিলেন । তাঁহার ভাৰ্য্যার নাম—শৈব্যা । জ্যামব নিঃসন্তান হইলেও, ভাৰ্য্যার ভয়ে অন্ত দার পরিগ্রহ করিতে পারেন নাই । জগতে জীর বশীভূত ব্যক্তির নাম উচ্চারণ করিতে হইলে, তৎকালে জ্যামবের নাম সর্বাগ্রে উচ্চারিত হইত । একদা জ্যামব শত্রু-সেনার সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে এক নগর আক্রমণ করেন । সেই নগরের অধিবাসিগণ হতাহত বা পলায়নপর হয় । একটা সুন্দরী

* শিশুপুরাণ, চতুর্থাংশ, দশম অধ্যায় ; ব্রহ্মপুরাণ, ষাণ্মশ অধ্যায় ।

রাজকন্তা কোনও প্রকারেই পলায়ন করিতে পারে না । জ্যামঘ তাহাকে বিবাহ করিবেন বলিয়া গৃহে লইয়া আসেন । কিন্তু রাণী শৈব্যা সেই কন্তাকে দেখিয়া, ভ্রুকুটি-ভঙ্গি করিবা-
 মাত্র, জ্যামঘ আপন অভিপ্রায় গোপন করেন ; রাণী শৈব্যাকে বলেন,—“এই কন্তাকে
 আমার পুত্রবধু করিব বলিয়া আনিয়াছি।” বলা বাহুল্য, তখনও রাজা অগৃহক ছিলেন ।
 স্মৃতরাং রাণীর তীব্র বিক্রম-বাণে তিনি বিব্রত হইয়াছিলেন । যাহা হউক, শৈব্যার পুত্র-
 সন্তান জন্মিলে, সেই পুত্রই ঐ রাজ-কন্তাকে বিবাহ করিয়াছিল । জ্যামঘের সেই পুত্রের
 নাম—বিদর্ভ । বিদর্ভ অল্পবয়স্ক হইলেও, পিতৃ-আদেশে, বয়োজ্যেষ্ঠা কন্তাকে বিবাহ
 করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন । এই বংশে সাহস জন্মগ্রহণ করেন । সাহসের সাত পুত্র ।
 তন্মধ্যে ভজমান, বৃকি, অরুণ, দেবারুণ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ । দেবারুণ এবং তৎপুত্র বক্র সম্বন্ধে
 প্রশংসা-গীতি দৃষ্ট হয় । তাঁহাদের প্রসঙ্গে পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন,—“বক্রঃ শ্রেষ্ঠো মহুত্থানাঃ
 দেবৈবেদে বারুধঃ সনঃ ।” বক্র—মহুত্থগণের শ্রেষ্ঠ ; এবং দেবারুণ—দেবগণের তুল্য । এই
 বক্র ও দেবারুণের উপদেশে ষট্ সহস্র ত্রিসপ্ততি সংখ্যক পুরুষ যোদ্ধা লাভ করিয়াছিলেন ।
 বিদর্ভের আর এক পুত্রের নাম—লোমপাদ । ইনি অঙ্গ-দেশের অধিপতি ছিলেন । সূর্য্যবংশীয়
 রাজা দশরথের সহিত ইহার সখ্যতা ছিল । লোমপাদের পাপে রাজ্যে দ্বাদশবর্ষব্যাপী অনারুণি-
 নিবন্ধন দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় । অবশেষে বিভাণ্ডক মূনির পুত্র ঋতশৃঙ্গকে বেস্তা দ্বারা প্রলোভিত
 করিয়া তিনি স্বীয় রাজ্যে লইয়া যান । তাহাতে রাজ্যে সুরষ্টি হয় । দশরথ-প্রদত্ত শাস্তা নাম্নী
 কন্তার সহিত লোমপাদ ঋতশৃঙ্গের বিবাহ দিয়াছিলেন । সাতহের অপর পুত্র মহাভোজও অতি
 ধর্ম্মাত্মা ছিলেন । তাঁহার বংশে ভোজরাজগণের উৎপত্তি হয় । এই বংশে সুপ্রসিদ্ধ রাজা
 খকর জন্মগ্রহণ করেন । তিনি যেখানে অবস্থান করিতেন, সেখানে ব্যাধি বা অনারুণি ভয়
 থাকিত না । একদা কাশী-রাজ্যমধ্যে তিন বর্ষ কাল অনারুণি হইয়াছিল । কাশীরাজ, খকরকে
 স্বীয় রাজ্যে লইয়া যান । খকরের আগমনে কাশীরাজ্যে প্রচুর বারি বর্ষণ হয় । কাশীরাজ-
 নন্দিনী গান্ধিনীর (গান্ধিনীর) সহিত খকরের বিবাহ হইয়াছিল । সেই গান্ধিনীর গর্ভে
 অকুরের জন্ম হয় । সাহস-পুত্র বৃকির বংশে প্রসেন ও সত্রাজিৎ জন্মগ্রহণ করেন । প্রসেন ও
 সত্রাজিৎ—শ্রমন্তক মণির প্রসঙ্গে পুরাণ-পাঠকমাত্রেরই পরিচিত আছেন । সূর্য্যের উপাসনা
 করিয়া, সত্রাজিৎ সূর্য্যপ্রভ শ্রমন্তক মণি প্রাপ্ত হন । যেই মণি কণ্ঠে ধারণ করিয়া,
 ষারকাণ্ডে প্রবেশ করিলে, যাদবগণ বিষয়াবিষ্ট হইয়াছিলেন । রাজা উগ্রসেনের কণ্ঠেই সে
 মণি শোভা পায়,—শ্রীকৃষ্ণ তদ্রূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন । তখন অনেককেই লোভপরবশ
 দেখিয়া, বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণ প্রার্থনা করিলে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিব না মনে করিয়া,
 সত্রাজিৎ সেই মণি কনিষ্ঠ প্রসেনজিৎকে প্রদান করেন । শুদ্ধভাবে যত্নে রক্ষিত হইলে, শ্রমন্তক
 মণি প্রতিদিন আট ভার সুবর্ণ প্রসব করিত এবং সেই মণির প্রভাবে রাজ্যের সমুদায় বিয়-
 বিপত্তি দূরীভূত হইত । কিন্তু অগুচি অবস্থায় সেই মণি ধারণ করিলে, ধারণ-কর্তার প্রাণহানি
 ঘটিত । প্রসেনজিৎ এক দিন অগুচি অবস্থায় সেই মণি ধারণ করিয়া মৃগয়ায় গিয়াছিলেন ।
 সেখানে সিংহ কর্তৃক তিনি নিহত হন । সিংহ আবার জাহ্নবান কর্তৃক নিহত হইয়াছিল ।
 এইরূপে শ্রমন্তক মণি সত্রাজিৎ হইতে জাহ্নবানের অধিকারে আসিয়াছিল । ষারকাবাসীগণকেই

কিন্তু সে সংবাদ জানিতে পারে নাই। পরন্তু দ্বারকায় মণি-সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের কলঙ্ক-রটনা হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ কোশলে প্রসেনজিৎকে হত্যা করিয়া, সেই মণি অপহরণ করিয়াছেন,— এইরূপই জনসাধারণের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। এইরূপে মিথ্যা-কলঙ্ক প্রচারিত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ মণির সন্ধানে বহির্গত হন। তিনি প্রথমে প্রসেনজিৎের, তৎপরে সিংহের, পরিশেষে জাষবানের অনুসরণ করেন। সেখানে জাষবানের সহিত শ্রীকৃষ্ণের একবিংশতি দিবস মল্লযুদ্ধ হয়। যুদ্ধে জাষবান পরাজিত হইলে, স্তম্ভস্তক মণি শ্রীকৃষ্ণের অধিকারে আসে। অধিকন্তু জাষবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইয়া, আপন কন্যা জাষবতীকে শ্রীকৃষ্ণের হস্তে সমর্পণ করেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যাবর্তনে বিলম্ব দেখিয়া, দ্বারকাবাসিগণ তাঁহার প্রাণহানির আশঙ্কা করিয়াছিল। কিন্তু স্তম্ভস্তক মণি ও জাষবতীকে সঙ্গে লইয়া তিনি যখন দ্বারকাপুরীতে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার জরথ্ববিনিতে দিগ্দিগন্ত নিনাদিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ মণিহরণের কলঙ্ক হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। সত্রাজিৎ, শ্রীকৃষ্ণের নামে কলঙ্ক রটনা করিয়াছিলেন ; তিনি, লজ্জিত হইয়া, অপরাধ-স্বাভাবের জন্ত, আপন কন্যা সত্যভামাকে শ্রীকৃষ্ণের করে সমর্পণ করিলেন। স্তম্ভস্তক মণি পুনরায় সত্রাজিৎের অধিকারে আনিল। সত্যভামাকে বিবাহ করিবার জন্ত পূর্বে শতধন্য, কুশধন্য ও অক্রুর চেষ্টা করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সহিত সত্যভামার বিবাহে তাঁহার অপমান বোধ করিলেন। সেই অপমানের প্রতিশোধ স্বরূপ শতধন্য, সত্রাজিৎকে নিহত করেন। তখন মণিরই সত্রাজিৎের হস্ত হইতে শতধন্যের হস্তে পতিত হয়। এই সময়ে পাণ্ডবগণের জুহু-গৃহ-দাহ উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণ বারণাবতে গমন করিয়াছিলেন। সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে গমন করিয়া, পিতৃহত্যা ও স্তম্ভস্তক মণি অপহরণের বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করেন। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ, শতধন্যের অনুসরণ করিয়া, তাঁহার সংহার-সাধন করিলেন। কিন্তু যুদ্ধার পূর্বে শতধন্য মণিরই অক্রুরের নিকট লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া, পরিশেষে অক্রুর সেই মণি শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করেন। কিন্তু সেই মণির প্রতি অনেকেরই লোভ দেখিয়া, শ্রীকৃষ্ণ অক্রুরের নিকট তাহা রক্ষা করিলেন ; বলিয়া দিলেন,—“রাজ্যের উপকারার্থ আপনিই ইহা রক্ষা করুন।” ইহাই স্তম্ভস্তক মণির উপাখ্যান। এই উপাখ্যান শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিলে, মিথ্যাপবাদ দূরীভূত হয়। দ্রোণ-বংশধর সাহস-পুত্র অক্রুরের—কুরু, ভজমান প্রভৃতি পুত্র জন্ম। কুরুর হইতে উগ্রসেন ও তৎপুত্র কংস। ভজমান হইতে দেবমৌচুষ। দেবমৌচুষের শূর নামে পুত্র হয়। শূরের পত্নী—মারিষা। মারিষার গর্ভে বহুদেব প্রযুষ দশ তনয় এবং পৃথা, ঋতদেবা প্রভৃতি পাঁচ কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। বহুদেবের পিতা শূরের সখা কুন্তীভোজ অপুত্রক ছিলেন। শূর, কুন্তীভোজকে কন্ডারূপে পৃথকে প্রদান করেন। সেই হইতে পৃথা—কুন্তী নামে পরিচিতা। পাণ্ডুর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। পৃথার যুধিষ্ঠিরাদি তিন পুত্র। বহুদেবের অপর চারি তরীয় মধ্যে ঋতদেবাকে কাক্ষ-বৃক্শধন্য বিবাহ করেন। তৎপুত্র দত্তবক্র ও মহাশূর। ঋতদেবীকে কেকয়রাজ বিবাহ করেন ; তাহাতে সন্তর্দন প্রযুষ কেকয়্য পাঁচ পুত্রের উৎপত্তি হয়। রাজাধিদেবীকে অবন্তীরাজ বিবাহ করেন ; তাঁহার বিষ্ণু ও অম্ববিষ্ণু নামে দুই পুত্র। ঋতদেবাকে চেমীরাজ দ্বন্দ্বো বিবাহ করেন ; তাহাতে শিশুপালের উৎপত্তি হয়। যুধিষ্ঠিরের রাজত্ব-যজ্ঞে এই শিশুপা

শ্রীকৃষ্ণের হস্তে মিহত হইয়াছিলেন। দেবকী প্রভৃতি কংসের সাত ভগ্নীকে বশুদেব বিবাহ করেন। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম—এই বশুদেবেরই পুত্র। রোহিণীর গর্ভে বলরাম এবং দেবকীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। কংস-কারাগারে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়। কংস জানিতে পারিয়াছিলেন;—‘দেবকীর অষ্টম-গর্ভজাত পুত্র শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সংহার-সাধন করিবেন।’ সুতরাং তিনি বশুদেব ও দেবকীকে কারাগারে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সন্তান-সন্ততি জন্মিবারাত্র তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিতেছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের জন্মের সময় দৈববশে কংসের প্রহরীগণ মোহাচ্ছন্ন হয়। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-মাত্র বশুদেব তাঁহাকে গোবুলে নন্দালয়ে রাখিয়া আসেন। ঘটনাক্রমে সেই দিন নন্দের এক কন্তা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। পুত্র বিনিময়ে কন্তা গ্রহণ করিয়া, বশুদেব কংস-কারাগারে মথুরায় প্রত্যারম্ভ হন। সেই কন্যা—যোগময়া। কংস যোগময়ার সংহার-সাধনে উত্তোষী হইয়া, তাঁহাকে শিলার নিক্ষেপ করিলে, যোগময়া আকাশে অন্তর্হিত হন। তিনি বলিয়া যান,—‘তোমার সংহার-কর্তা গোবুলে নন্দালয়ে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে।’ সেই হইতে নন্দের প্রতিপালিত শ্রীকৃষ্ণের বধ-কামনার কংস পুনঃপুনঃ চেষ্টা করিতে থাকেন। কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হন না। পরিশেষে যোগময়ার ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়; শ্রীকৃষ্ণ-হস্তে কংস নিধনপ্রাপ্ত হন। গোপরাজ নন্দ, শ্রীকৃষ্ণকে পালন করিয়াছিলেন। বশুদেবের সহিত তিনি একবারে যে নিঃসম্পর্ক ছিলেন, তাহা নহে। কোনও কোনও পুরাণে আমরা দেখিতে পাই,—যহপুত্র জ্যোতীর বংশে দেবমীতুব জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার অপর নাম—দেবমিত। দেবমিতের দুইটা স্ত্রী। প্রথম—অত্রিয়া; দ্বিতীয়—বৈশা। তাঁহার অত্রিয়া স্ত্রীর গর্ভে শুরের উৎপত্তি হয়। সেই শুর হইতে বশুদেব প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। আর, তাঁহার বৈশা স্ত্রীর গর্ভে পর্য্যায়ের উৎপত্তি হয়। সেই পর্য্যায় হইতেই নন্দ প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। নিম্নে বংশলতা প্রদত্ত হইল। তাহাতেই নন্দ ও বশুদেবের বংশের সম্বন্ধ-তত্ত্ব উপলব্ধি হইতে পারিবে;—



ইহাতে বুঝি যায়,—এক হিসাবে শ্রীনন্দ ও বশুদেবে ভ্রাতৃ-সম্বন্ধ। শ্রীকৃষ্ণ আপন পুত্রত্বের পালক-পুত্ররূপে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। নন্দালয়ে প্রতিপালিত হইয়া, কংসের ধর্ম্মক্ষেপিয়া, তিনি কংসের সংহার-সাধন করেন। আপন পিতা উগ্রসেনকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া, কংস মথুরার সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। কংসের অত্যাচারে শ্রীকৃষ্ণের পিতা বশুদেব ও জননী দেবকী কারাগার হইয়া, অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করেন। কংসের ধর্ম্মক্ষেপ-উপলক্ষে বশুদেব উপহিত হইয়া, শ্রীকৃষ্ণ কংসের বিনাশ-সাধন করিয়াছিলেন। তাহাতে উগ্রসেন

সিংহাসনে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হন। বহুবংশের ও দেবকী স্মৃতিলাভ করেন। মাতুল কংসের সংহার সাধন করিয়া, মতামহ উগ্রসেনকে সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা-ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণ অশেষ শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি কংসের কুবলয়পীড় নামক মন্ত-হস্তীকে এবং চানুর-মৃত্যুকে প্রভৃতি মল্লগণকে সংহার করিয়াছিলেন। কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণে জ্ঞান-গবেষণার পূর্ণ ক্ষুধা ; কংসগণের এবং গোহুলে তাঁহাতে বীৰ্য্যবতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ সহস্র এক শত পত্নী ছিল। তন্মধ্যে কন্সিনী, সত্যভামা, জাম্ববতী, জালহাসিনী প্রভৃতি অষ্ট মহিষী প্রধান। শ্রীকৃষ্ণের আট অযুত আট লক্ষ পুত্র-সন্তান জন্মে। সেই সকল পুত্রাদির বংশ-বৃদ্ধিতে স্বরূপে অসংখ্য লোক-সৃষ্টি হইয়াছিল। সে সময়ে একটা প্রাচীন লোক প্রচলিত আছে ; তাহার মর্ম্ম ;—“সেই বহু-কুমারগণকে চাপ-শিক্ষা প্রদানের জন্য তিন কোটি অষ্ট শত সহস্র সংখ্যক গৃহাচার্য্যগণ সর্ব্বদা রত থাকিতেন। বহুবংশের লোক-সংখ্যা গণনা করা যায় না।” বহুকুমারগণ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া, আশ্ব-দ্রোহে ব্রহ্মপাপে, ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

যযাতির কনিষ্ঠ পুত্র পুরু পিতার নিকট অখিল ভূমণ্ডলের আধিপত্য প্রাপ্ত হন। এই পুরু-রাজার বংশেই কুরু-পাণ্ডবগণের জন্ম হয়। পুরুর অশ্বত্থন ত্রয়োদশ বা চতুর্দশ পর্যায়ে (ভিন্ন ভিন্ন পুরাণের ভিন্ন ভিন্ন মত) দ্বয়ন্ত জন্মগ্রহণ করেন। দ্বয়ন্তের পুরুবংশ। সম-পর্যায়ে (প্রতিরোধাত্মক কথের পুত্র) মেধাতিথি হইতে প্রব্রজ প্রভৃতি

‘কাথায়ন’ বিজগণের উৎপত্তি হয়। বাহা হউক, রাজা দ্বয়ন্তের বংশই ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। শকুন্তলার সহিত তাঁহার বিবাহ এবং ভরতের উৎপত্তি-কাহিনী কোতুহলোদ্দীপক। শকুন্তলার সহিত দ্বয়ন্তের গর্ভস্ব-বিধি অনুসারে বিবাহ হয়। রাজা দ্বয়ন্ত, যুগয়ায় গমন করিয়া, এক দিন অরণ্য মধ্যে মহর্ষি কথের আশ্রমে উপনীত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে মহর্ষি কথের কন্যা অনিন্দ্যসুন্দরী শকুন্তলাকে দেখিয়া, তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন। এক দিন মাত্র ঋষির আশ্রমে অবস্থান করিয়া, শকুন্তলাকে সেইখানেই রাখিয়া, রাজা রাজধানীতে প্রত্যাগত হন। তাহার পর তিনি আর শকুন্তলার কোনই সন্ধান লন না। ইতিমধ্যে শকুন্তলা এক পুত্র-সন্তান প্রসব করেন। মহর্ষি কথ বনমধ্যেই কুমারের জাত-কর্ম্মাদি সম্পন্ন করিয়াছিলেন। সেই বালক সিংহ ধরিয়া তাহার সহিত ক্রীড়া করিত। বালক সকল প্রাণীকেই দমন করিতে পারে দেখিয়া, মুনিগণ তাহার নাম রাখিয়াছিলেন,—‘সর্ব্বদমন।’ কিছু দিন পরে, পুত্র লইয়া শকুন্তলা রাজ-সরদানে উপনীত হইলেন। কিন্তু রাজা তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিলেন না। দ্বয়ন্ত কর্তৃক শকুন্তলা প্রত্যাখ্যাত হইলে, রাজার প্রতি দৈববাণী হইল। দৈববাণী শকুন্তলাকে অবমাননা করিতে নিষেধ করিলেন। তাহাতে রাজা দ্বয়ন্ত পুত্র-কলত্রকে গ্রহণ করেন। রাজপুত্র ভরত নামে অভিহিত হন। “হুনি পুত্রকে ভরত কর” — দৈববাণীতে এই কথা উক্ত হইয়াছিল বলিয়া, শকুন্তলার পুত্র সর্ব্বদমন, ‘ভরত’ নামে অভিহিত হন। ভরত রাজচক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন। ব্রহ্ম-পুরাণের মতে,—এই ভরতের নাম অনুসারেই ‘ভারতবর্ষ’ নামের উৎপত্তি হইরাছে। তিনি গঙ্গাকূলে পঞ্চ-পকাশ্যে অধমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি যজ্ঞ-ভীয়ে অষ্টসপ্ততি অধমেধীয় অগ্নি বন্ধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি নিবিজরে মহিগত হইয়া, ক্রিাত, হুণ, যবন, পোণ্ড, কঙ্ক,

শস, শক এবং অন্যান্য অত্রাক্ষ্য নৃপতিকে ও সমস্ত স্নেহ-জাতিকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন। পূর্বে যে সকল দানব জয়লাভ করিয়া, দেব-মহিলাগণকে রসাতলে লইয়া গিয়াছিল, ভরত তাঁহাদিগের উদ্ধার-সাধন করেন। তাঁহার রাজত্বকালে প্রজাবুলের সর্ব অভিলাষ পূর্ণ হইত। তিনি সপ্তবিংশতি সহস্র সংবৎসর রাজত্ব করিয়া, দিকে দিকে আপন প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিয়াছিলেন। বিদর্ভ-দেশীয়া তাঁহার তিনটা মহিষী ছিলেন। তাঁহাদের গর্তে ভরতের নয়টা পুত্র-সন্তান জন্মে। কিন্তু পুত্রগণ ভরতের অমুরূপ না হওয়ায়, স্বামী ব্যভিচারিণী ভাবিবেন মনে করিয়া, রাণীরা স্ব স্ব সন্তান বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিলেন। পুত্র-জন্মের বৈফল্য-হেতু মরুস্তোম যজ্ঞ করিয়া, ভরত এক পুত্র প্রাপ্ত হন। বৃহস্পতির ঔরসে, উত্থা-পত্নী মমতার গর্তে, সেই পুত্রের উৎপত্তি হইয়াছিল। “এই দ্বিজকে ভরণ কর” — এই বলিয়া পুত্রের মাতা-পিতা অস্ত্রর্কান হওয়ায়, সেই পুত্র ‘ভরদ্বাজ’ নামে বিখ্যাত হন। ভরত-বংশ ‘বিতথ’ (নিফল) হইবার উপক্রম হইলে, ভরদ্বাজকে পালক-পুত্ররূপে গ্রহণ করা হইয়াছিল; তাই ভরদ্বাজের অপর নাম, — ‘বিতথ’। এই বিতথের বংশে গার্গ্য ও শৈল্য নামধেয় ‘কৃত্রোপেত ব্রাহ্মণগণের’ উৎপত্তি হয়। বিতথের পুত্র মন্থার (ভবন্থার) বংশে রত্নিদেব জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মহিমা সর্বলোকে গীত হইত। তিনি আপনি অনাহারে থাকিয়াও বৃদ্ধকৃত জনের ক্ষুদ্রিগতি করিতেন। তাঁহার দানের অবধি ছিল না। সমুদায় সম্পত্তি দান করিয়া, নির্ধন হইয়া, তিনি সপরিবারে আটচল্লিশ দিন অনাহারে ছিলেন। সেই সময়ে জন মাত্র পান করিতে পান নাই। ঊনপঞ্চাশৎ দিবসের প্রাতঃকালে তাঁহার আহারের আয়োজন হয়। তিনি আহারে বসিবার অবাবহিত পূর্বেই এক অভুক্ত ব্রাহ্মণ আসিয়া আতিথা গ্রহণ করিলেন। তখন রত্নিদেব সাদরে ব্রাহ্মণকে সেই ‘আহারীয় দ্রব্য’ ধরিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ ভোজনান্তে প্রস্থান করিলে, অবশিষ্ট আহারীয় দ্রব্য পরিবারদিগকে বণ্টন করিয়া দিয়া আপনি ভক্ষণ করিবার মনস্থ করিলেন। ইতি-মধ্যে এক জন শূদ্র আসিয়া আতিথা গ্রহণ করিল। তখন, ভগবানকে স্মরণ করিয়া, আপন ‘আহারীয় দ্রব্যে’ রত্নিদেব সেই শূদ্র অতিথিকেও পরিতুষ্ট করিলেন। তখনও যাহা অবশিষ্ট রহিল, তিনি আহার করিতে পারিতেন। কিন্তু আহারে বসিবার পূর্বেই বহুতর কুকুর সহ এক ব্যক্তি আসিয়া অতিথি হইল। তখন সেই কুকুরদিগকে এবং অতিথিকে আহার করাইতে সকল দ্রব্যই ফুরাইয়া গেল। যখন পানীয়-জলমাত্র অবশিষ্ট, রত্নিদেব তাহা পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণে উচ্চত, এমন সময়ে এক পুরুষ (চণ্ডাল) আসিয়া স্করূপ বচনে তৃষ্ণা-কাতরতা প্রকাশ করিল। তখন রত্নিদেব সেই জলগ্রাস পর্যন্ত অতিথিকে প্রদান করেন। পরোক্ষর চরম হইলে, রত্নিদেব ভগবৎ-কৃপা লাভ করিলেন। তাঁহার মুক্তিলাভ ঘটিল। বিতথের প্রপৌত্র হরিতক্ষর তিন পুত্র লাভ করেন; — ত্র্যাক্ষি, কবি ও পুরুাক্ষি। তাঁহারা তিন জনই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। বিতথের অপর পৌত্র বৃহৎক্ষত্রের বংশে হস্তী জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ‘হস্তিনাপুরী’ নির্মাণ করিয়াছিলেন। হস্তীর তিন পুত্র; — অজমীঢ়, দিমীঢ় ও পুরুমীঢ়। এতমধ্যে পুরুমীঢ় নিঃসন্তান ছিলেন। অজমীঢ়ের নাম সঙ্গুসারেই ‘অজমীঢ়’ নামের প্রতিষ্ঠা। অজমীঢ়ের বহু পুত্র। তাঁহার

পুত্র কণ্ঠের বংশে,—মেধাতিথি, এবং মেধাতিথি হইতে কাশ্যায়ন ও প্রিয়মেধাদি বিজগণ উৎপন্ন হন। * অজমীড়ের অপর পুত্র বৃহদিবুর বংশের যোগী ব্রহ্মদত্ত হইতে বিদ্বৎসেন জন্মগ্রহণ করেন। ঋষি জৈগীষ্যের উপদেশে তিনি যোগ-শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। অজমীড়ের নলিনী নামে এক ভাৰ্য্যা ছিল। সেই ভাৰ্য্যা হইতে নীলের উৎপত্তি। নীলের বংশে হর্য্যাক্ষ (ভর্য্যাক্ষ) জন্মগ্রহণ করেন। হর্য্যাক্ষের পাঁচ পুত্র,—মুদগল, সৃঞ্জয় (সঞ্জয়), বৃহদিবু (বৃহদাক্ষ), কাম্পিলা, প্রবীর (যবীনর)। সেই পাঁচ পুত্র বিষয়-রক্ষণে সমর্থ—হেতু “পাক্ষাল” নামে অভিহিত হন। তাঁহাদের শাসনাধীন পঞ্চ-প্রদেশ—“পাক্ষাল” সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিল। মুদগল হইতে জাত কত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের লাভ করেন। সেই ব্রাহ্মণগণের ‘মৌদগল্য গোত্র’ হয়। এই মুদগলের কন্যা অহল্যা—গৌতম ঋষির পত্নী। অহল্যার পৌত্র সত্যধৃতি ধনুর্কেন্দ্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। কন্যা অহল্যা ব্যতীত মুদগলের দিবোদাস নামে এক পুত্র ছিল। সেই দিবোদাসের বংশে দ্রুপদ, তৎপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং কন্যা দ্রৌপদী প্রভৃতির জন্ম হয়। এই বংশ পাক্ষাল-বংশ নামে অভিহিত। অজমীড়ের ঋক্ষ নামে আর এক পুত্র ছিল। সেই ঋক্ষের পৌত্র—কুরু। হর্য্যাক্ষ-কন্যা তপতির গর্ভে সম্বরণের ঔরসে তাঁহার জন্ম হয়। ইনিই ধাৰ্ত্তরাষ্ট্র ও পাণ্ডবগণের আদি-পুরুষ। ইনিই ‘কুরুক্ষেত্র’ ও ‘কুরুজাঙ্গাল’ তীর্থের প্রতিষ্ঠাতা। কুরুক্ষেত্রে দেহত্যাগ করিলে, স্বর্গলাভ হইবে,—এই সঙ্কল্প করিয়া, রাজর্ষি কুরু, কুরুক্ষেত্র কর্ষণ করিয়াছিলেন। ইজের বরে, কুরুক্ষেত্র-প্রতিষ্ঠায় কুরুরাজের অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছিল। † সুধনু ও জহ্নু প্রমুখ কুরুর অনেকগুলি পুত্র হয়। সুধনুর বংশে উপরিচরবশু জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চেদী-নামক রমণীয় দেশ অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি সম্রাট নামে অভিহিত হন। বসুরাজার পাঁচ পুত্র,— প্রত্যগ্র (প্রত্যগ্রহ), কুশাক্ষ, বৃহদ্রথ, মাবেল (চেদিপ), মংস্ত (যহ)। তিনি পাঁচ পুত্রকে আপন অধিকৃত রাজ্য বিভাগ করিয়া দেন। বৃহদ্রথ—মগধ দেশের রাজা হইয়াছিলেন; অপরপর পুত্রের মধ্যে, মংস্ত—মংস্ত-দেশের অধিপতি হন। এইরূপে বসু-রাজার পাঁচ পুত্র হইতে পাঁচটী স্বতন্ত্র রাজ-বংশের সৃষ্টি হয়। রাজকুমার যহু কখনও স্বর্জ-হস্তে পরাজিত হন নাই। বৃহদ্রথের দুই পুত্রের মধ্যে জরাসন্ধ মগধের সিংহাসন লাভ করেন। তাঁহার জন্ম সম্বন্ধে এক অলৌকিক উপাখ্যান প্রচলিত আছে;—জন্মকালে এই পুত্র দুই খণ্ডে বিভক্ত ছিল। জননী সেই দুই খণ্ডকে বাহিরে ফেলিয়া দেন। জরা-নারী রাক্ষসী তাহা দেখিতে পাইয়া, ক্রীড়া করিতে করিতে, দুই খণ্ডকে মিলাইয়া দেয়; ‘জীবিত হও’

* শ্রীমদ্ভাগবত, নবম স্কন্ধ, বিংশ অধ্যায়ে, অশ্রুতিরথের পুত্র কথ এবং তৎপুত্র মেধাতিথি হইতে প্রথম প্রভৃতি বিজগণের উৎপত্তির বিষয় লিখিত আছে। আবার ঐ ভাগবতেরই উক্ত স্কন্ধের একবিংশ অধ্যায়ে, অজমীড়-বংশে প্রিয়মেধাদি বিজগণের উৎপত্তি-বিবরণ দৃষ্ট হয়। বিদ্বৎসেন-পুত্রগণের চতুর্থ অংশের একই অধ্যায়ে (উনবিংশ অধ্যায়ে) অশ্রুতিরথের পুত্র কথ ও তৎপুত্র মেধাতিথি হইতেও কাশ্যায়ন-বিজগণের উৎপত্তি-বিবরণ লিখিত আছে; আবার সেখানে অজমীড়ের বংশেও কাশ্যায়ন বিজগণের উৎপত্তি বিবরণ দেখিতে পাই।

† মহাভারত, শল্য পর্ক, ত্রিংশোধ্যায়; শ্রীমদ্ভাগবত, নবম স্কন্ধ, ষাটবিংশ অধ্যায়; বিহু-পুত্রগণ, চতুর্থাংশ, বিংশ অধ্যায়।

‘জীবিত হও’ বলিতে বলিতে, সেই যুগ্ম-দেহে প্রাণ-সঞ্চার হয়। জরা রাক্ষসী কর্তৃক সন্ধিত অর্থাৎ যুগ্মর একত্রিত ও জীবন-প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া, ঐ পুত্র ‘জরাসন্ধ’ নামে অভিহিত। জরাসন্ধ বীর ও বিক্রমশালী ছিলেন। তাঁহার অস্তি ও প্রাপ্তি নারী কল্প-ধরকে তিনি মথুরাধিপতি কংসের হস্তে সম্ভ্রাদান করিয়াছিলেন। বহুবর্ষে শ্রীকৃষ্ণ কংসকে বিনাশ করিলে, জামাতৃ-বধে ক্রুদ্ধ হইয়া, জরাসন্ধ অষ্টাদশ বার মথুরা আক্রমণ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বধ-কামনায় তিনি একোনশতবার গদা চালনা করেন। মথুরার সন্নিকটে যেখানে সেই গদা পতিত হইয়াছিল, তাহা ‘গদাবসান ক্ষেত্র’ নামে পরিচিত। যুধিষ্ঠিরের রাজত্ব যজ্ঞে জরাসন্ধকে পরাস্ত করিবার জন্য যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের কৌশলে ভীমের হস্তে জরাসন্ধ নিহত হন। অতঃপর জরাসন্ধের পুত্র সহদেবকে মগধের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ ও ভীমার্জুন জয়োন্মাদে হস্তিনাপুরে প্রত্যাবৃত্ত হন। * কুরু-বংশের প্রতীপ সর্বভূতহিত-রত প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র,—দেবাপি, শান্তনু ও বাহ্লীক। জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবাপি অল্প বয়সেই অরণ্যে গমন করেন। মধ্যম শান্তনু রাজা হন। ইনি কর দ্বারা কোন জরাগ্রস্ত পুরুষকে স্পর্শ করিলে, সেই ব্যক্তি নবযৌবন প্রাপ্ত হইয়া শাস্তি লাভ করিত। সেই জন্যই ইনি ‘শান্তনু’ নামে অভিহিত হন। পুরাণাদি পাঠে জানা যায়,—পূর্বে জন্মে ইনি ইক্ষাকু-বংশে ‘মহাভিষ’ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। শান্তনুর রাজ্যে ষাটশ বৎসর বৃষ্টি হয় নাই; দুর্ভিক্ষে অশেষ রাক্ষসের বিনাশ হইয়াছিল; রাজা শান্তনু উদ্বিগ্ন হইয়া ব্রাহ্মণদিগের নিকট কারণ জিজ্ঞাসা করেন। ব্রাহ্মণেরা উত্তর দেন,—“অগ্রজ বিত্তমানে রাজ্যভোগ করায়, আপনি ‘পরিবেত্তা’ হইয়াছেন; * তাই এইরূপ ঘটিতেছে।” রাজা শান্তনু তখন ব্রাহ্মণগণের নিকট সুপরামর্শের প্রার্থী হন। ব্রাহ্মণগণ বলেন,—“জ্যেষ্ঠ দেবাপির পাতিষ না ঘটিলে, আপনার সুমঙ্গল নাই।” শান্তনুর মন্ত্রী তদনুসারে দেবাপির নিকট কতকগুলি পায়ণ-মত-পোষক ব্রাহ্মণকে প্রেরণ করেন। সেই ব্রাহ্মণগণের যুক্তি-জালে মুগ্ধ হইয়া, দেবাপি বেদ-নিন্দা আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাহাতেই তাঁহার পাতিষ ঘটে। শান্তনুর রাজ্যে পুনরায় সুবর্ষণ সুকর্ষণ আরম্ভ হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায়,—‘শ্রীমদ্ভাগবত রচনার সম-সময়ে দেবাপি কলাপ-গ্রামে যোগাবলম্বন পূর্বক অবস্থিতি করিতেছিলেন। কলিযুগে চন্দ্রবংশের অবসান হইলে, ভবিষ্য সত্যের প্রারম্ভে, তিনিই আবার ঐ বংশের প্রতিষ্ঠা করিবেন।’ শান্তনুর তিন পুত্র;—ভীষ্ম, বিচিত্রবীৰ্য্য ও চিত্রাঙ্গদ। মহাত্মা ভীষ্ম অশেষ-শাস্ত্রবিৎ, বীরশ্রেষ্ঠ ও উদারকীর্তি ছিলেন। মহাভারতে তাঁহার মহান চরিত্র চিত্রিত আছে। ভীষ্মের জায় আদর্শ-পুরুষ জগতে কচিং জন্মগ্রহণ করেন। ভীষ্ম—পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র হইয়াও রাজ্যলিপ্সা পরিত্যাগে গিভুক্তি ও আত্মত্যাগের জীবন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শান্তনুর প্রথম মহিষী গন্ধার গর্তে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার জন্মগ্রহণের পর, শান্তনু দাম-রাজের কন্যা সত্যবতীর রূপযোহে মোহিত হইয়া, তাঁহাকে বিবাহ করেন। সেই বিবাহে দাম-রাজ, শান্তনুকে একটা প্রতিজ্ঞার আবদ্ধ হইতে বলেন। সে প্রতিজ্ঞা—সত্যবতীর গর্তে তাঁহার যদি পুত্র-সন্তান জন্মে, শান্তনু সেই সন্তানকেই

রাজ-সিংহাসন প্রদান করিবেন। প্রাণপ্রিয় জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবব্রত (ভীম) বিজ্ঞান থাকিতে রাজ্য কেমন করিয়া সে প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইবেন? কাজেই সত্যবতীকে বিবাহের জন্য মন একান্ত চঞ্চল হইলেও কুরু মনে তিনি স্বরাজ্যে হস্তিনাপুরে কিরিয়া আসিলেন। কিন্তু রাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলেও, সত্যবতীর চিন্তা তাঁহার মন হইতে বিদূরিত হইল না। অতৃপ্ত-আকাঙ্ক্ষায় রাজ্য দিন দিন বিমলিন হইতে লাগিলেন। ক্রমশঃ ভীম পিতার মনঃকষ্টের কারণ বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার জন্য পিতা কষ্ট পাইতেছেন—অহুতব করিয়া, মনে মনে তিনি ব্যথিত হইলেন। পরিশেষে দাশ-রাজের নিকট গমন করিয়া, তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া, ভীম তাঁহার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন;—‘পিতা শান্তনুর সহিত সত্যবতীর বিবাহ দিলে, তিনি রাষ্ট্রোৎসর্গ্য পরিত্যগ করিবেন।’ অতঃপর শান্তনুর সহিত সত্যবতীর পরিণয়-কার্য্য সম্পন্ন হইল। এই বিবাহের পূর্বে, কুমারী-কালে, মহর্ষি পরাশরের ঔরসে, সত্যবতীর এক পুত্র হইয়াছিল। তিনিই কৃষ্ণ-দৈবপায়ন বেদব্যাচ। বিবাহের পর, সত্যবতীর গর্ভে, শান্তনুর ঔরসে, চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্ষ্য জন্মগ্রহণ করেন। চিত্রাঙ্গদ বাল্যকালে গন্ধর্ব্ব কর্তৃক নিহত হন। সুতরাং কনিষ্ঠ বিচিত্রবীর্ষ্য রাজ-সিংহাসন লাভ করেন। বিচিত্রবীর্ষ্য, কাণীরাঙ্গের দুই কন্তাকে—অম্বিকা ও অম্বালিকাকে—স্বয়ম্বর-মণ্ডপ হইতে বল-পূর্ব্বক হরণ করিয়া আনিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন। ইহার অল্প দিন পরেই বিচিত্রবীর্ষ্য বক্ষারোগে কাল-কবলিত হন। তৎকালে কোনও কোনও বংশে ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপত্তির পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। সুতরাং বংশ-রক্ষার জন্ত, মাতা সত্যবতীর নিয়োগানুসারে, সত্যবতী-নন্দন বেদব্যাচ, বিচিত্রবীর্ষ্যের ক্ষেত্রে, ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর নামক পুত্র-ত্রয় উৎপাদন করেন। বিচিত্রবীর্ষ্যের পুত্র-ত্রয়ের মধ্যে বিদুর সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণ করেন। ধৃতরাষ্ট্র জন্মকাল ছিলেন; তিনি রাজ্যলাভে বঞ্চিত হন। সুতরাং পাণ্ডু হস্তিনাপুরের সিংহাসন লাভ করেন। গান্ধারীর গর্ভে ধৃতরাষ্ট্রের দুর্হ্যোধন দুঃশাসনাদি শত পুত্র ও দুঃশলা নাম্নী এক কন্তা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। পাণ্ডু শাপ-বশতঃ জনন-শক্তি-হীন হওয়ার, তাঁহার পত্নী কুন্তীর গর্ভে ধর্ম্ম, বাহু ও ইন্দ্র কর্তৃক বৃষিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুন উৎপন্ন হন; এবং তাঁহার অপরা পত্নী মাদ্রীর গর্ভে অধিনীকুমারদ্বয় কর্তৃক নকুল ও সহদেবের উৎপত্তি হয়। ধার্তরাষ্ট্র ও পাণ্ডবগণের বিবরণ লইয়াই মহাভারত গ্রন্থ বিরচিত। আমরা মহাভারত-প্রসঙ্গে তাহার পরিচয় প্রদান করিয়াছি।* কুরু-পাণ্ডবের মহা-সমরে এই দুই বংশের অবসান হয়। সেই সময়ে অর্জুন-পুত্র অভিমম্বুর পত্নী উত্তরা গর্ভবতী ছিলেন। পরিশেষে সেই গর্ভে এক পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করে; তদ্বারা কুরু-বংশ রক্ষা হয়। কুরু-কুল পরিলক্ষ্য হইলে সেই পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া, তিনি ‘পরীক্ষিৎ’ নামে অভিহিত হন। ঋষিকুমার শৃঙ্গীর শাপে তক্ষক-দংশনে পরীক্ষিতের মৃত্যু হইয়াছিল। শৃঙ্গীর পিতা মহর্ষি শমীক তপোবনে ধ্যান-মগ্ন ছিলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ, যুগয়ার গমন করিয়া, কুণ্ড-পিপাসার কাতর হইয়া, ধ্যান-মগ্ন ঋষির নিকট জল প্রার্থনা করেন। ঋষি যৌনব্রত অবলম্বন করিয়া ছিলেন। সুতরাং উত্তর দিতে পারেন নাই। পুনঃপুনঃ প্রার্থনায়ও ঋষি নীরব রহিলেন দেখিয়া, রাজা

* এই গ্রন্থের বিংশ পরিচ্ছেদে (২৪১ পৃষ্ঠা) মহাভারত-প্রসঙ্গ উল্লিখিত।

পরীক্ষিতের মনে ক্রোধের সঞ্চার হয়। নিকটে একটা মৃত সর্প পড়িয়া ছিল। রাজা, রোষ-পরবশ হইয়া, শরাসনাগ্রে সেই মৃত সর্প তুলিয়া লইয়া, ঋষির গলদেশে বিলম্বিত করেন। ঋষি-তনয় শূদ্রী মুনিবালকগণের সহিত ক্রীড়া করিতেছিলেন। পিতার গলদেশে রাজা পরীক্ষিৎ মালাকারে মৃত সর্প স্থাপন করিয়াছেন শুনিয়া, শূদ্রী ক্রোধানলে জলিয়া উঠিলেন। পরীক্ষিৎকে লক্ষ্য করিয়া, জল-স্পর্শ-পূর্বক, তিনি অভিসম্পাত দিলেন,—“সেই ব্রাহ্মণাপমানকারী কুল-পাণ্ডুল রাজার সপ্ত-রাত্রি-মধ্যে তক্ষক-দংশনে মৃত্যু ঘটিবে।” ঋষি-কুমারের শাপ-বাক্য অবিলম্বে পরীক্ষিতের কর্ণগোচর হইল। আত্মঃ অবসান হইয়াছে বুঝিয়া, ঋষি-মণ্ডলীকে আহ্বান করিয়া, সেই দিন হইতেই মহারাজ পরীক্ষিৎ গঙ্গাতীরে প্রায়োপ-বেশনে উপবিষ্ট হইলেন। রাজা পরীক্ষিতের তক্ষক-দংশনে মৃত্যু হইবে শুনিয়া, বিজশ্রেষ্ঠ বিদ্বান কাশ্যপ (মতান্তরে ধনন্তরি) রাজ্যের চিকিৎসার নিমিত্ত যাত্রা করেন। পথে ব্রাহ্মণ-বেশী তক্ষকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। কথায় কথায়, কে কোথায় গমন করিতেছেন—প্রকাশ হইয়া পড়ে। তখন তক্ষক, কাশ্যপের চিকিৎসা-নৈপুণ্যের পরীক্ষার জন্ত, একটা বটবৃক্ষকে দংশন করেন। বৃক্ষ তৎক্ষণাৎ ভয়সাৎ হয়। এদিকে কাশ্যপ, সেই ভয়রাশি সংগ্রহ করিয়া, তাহাকে সঞ্জীবিত করেন। কাশ্যপ ধনার্থী হইয়া, পরীক্ষিতের চিকিৎসা করিতে যাইতেছিলেন। তক্ষক তাঁহাকে প্রচুর ধন দিয়া বশীভূত করিলেন। কাশ্যপ ধ্যান-ব্রাণী বুঝিতে পারিলেন,—পরীক্ষিতের আত্মঃশেষ হইয়াছে। স্মৃতরাং তক্ষকের নিকট আশঙ্করূপ ধনপ্রাপ্ত হইয়াই তিনি প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। রাজার চিকিৎসার জন্ত কাশ্যপের উচ্চম স্থগিত হইল। সপ্তম দিবসে তক্ষক-দংশনেই তাঁহার মৃত্যু ঘটিল। মহারাজ পরীক্ষিৎ পুণ্যবান, ভায়রপ ও প্রজাবৎসল ছিলেন। সংসারে কলির প্রাধান্য বিস্তৃত হইতে না পারে, তজ্জন্ত তিনি অশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার কলি-নিগ্রহ-কাহিনী পুরাণোক্তিতে চির-কীর্তিত হইয়া আসিতেছে। রাজা পরীক্ষিৎ একদা সরস্বতী-তীরে মৃগয়ার গমন করেন। সেখানে এক শূদ্র রাজদণ্ড-ধারণ-পূর্বক গো-নিধনের প্রতি নৃশংস-ভাবে পীড়ন করিতেছিল। পরীক্ষিৎ দেখিলেন,—“তাঁহার গুরু-প্রহারে সেই মৃগাল-ধবল দুইটা মলমূত্র পরিত্যাগ করিতেছে, এবং কপিল গাভীটা মৃতবৎসার তায় আর্জুনন্দ করিতেছে।” তিনি আরও দেখিলেন,—“বৃষের তিনটা চরণ নষ্ট হইয়াছে; সে এক পদে অবস্থান করিতেছে।” পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন,—“ছরস্ত কলি শূদ্ররাজরূপ পরিগ্রহ করিয়া, বৃষরূপী ধর্মের তিন পদ ভঙ্গ করিয়াছে, এবং অবশিষ্ট পদটীও ভঙ্গ করিবার জন্ত চেষ্টা করিতেছে।” তিনি আরও বুঝিলেন,—“গাভী সাক্ষাৎ পৃথিবী। ভগবান এত দিন ইহার ভার হরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ইহাকে পরিত্যাগ করার পর হইতে বিপ্রদেবী ভূপালবেশী শূদ্রগণ ইহাকে পীড়ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে।” রাজা পরীক্ষিৎ, বৃষরূপী ধর্মকে এবং গাভীরূপী পৃথিবীকে সান্বনা করিলেন; শানিত ধড়গ উত্তোলন পূর্বক, রাজবেশী কলির মস্তকচ্ছেদে উদ্ভূত হইলেন। রাজা পরীক্ষিৎ বধোদ্ভূত হইয়াছেন দেখিয়া, রাজবেশ পরিহার-পূর্বক পরীক্ষিতের পদ-প্রান্তে পতিত হইয়া, কলি প্রাণভিক্ষা চাহিলেন। কলিকে শরণাগত দেখিয়া, রাজা কহিলেন,—“আমার রাজ্যে ভূমি থাকিতে পারিবে না। ভূমি

রাজ্যবধৌ অবস্থান করিলে, রাজ্যে মিথ্যা, লোভ, চৌর্য্য, স্বধর্ম-ত্যাগ, অলসী, কলহ, কপটতা প্রভৃতি অধর্ম প্রবর্তিত হয়। আমার রাজ্য—সত্য ও ধর্মের রাজ্য। অতএব তুমি এখন হইতে প্রস্থান কর।” কলি বিনীত-স্বরে কহিল,—“সার্বভৌম সম্রাট্ ! যদি প্রাণদান করিলেন, তবে আমার অবস্থানের বাবস্থাও করিয়া দেন। আপনার রাজ্য কোথায় নাই? আপনি সর্বত্র বিচরণ করেন। স্মৃতরাং আমার স্থান কোথায়?” এইরূপে কলি প্রার্থনা জানাইলে, রাজা পরীক্ষিৎ কহিলেন,—‘যে স্থানে দ্যুত-ক্রীড়া, মত্তপান, কুনটা, প্রাণিহত্যা,—এই চারি অধর্ম বিস্তারিত, তোমার জন্ত সেই স্থান নির্দেশ করিয়া দিলাম।’ কলি আরও কয়েকটি স্থান প্রার্থনা করিলেন। রাজা পরীক্ষিৎ তাহাতে কহিলেন,—‘যেখানে মিথ্যা, গর্ভ, কাম, হিংসা ও বৈরভাব দেখিতে পাইবে, সেই সকল স্থানেও বসতি করিতে পারিবে।’ এইরূপে আপন ধর্ম-রাক্ষা হইতে কলিকে বিদূরিত করিয়া, মহারাজ পরীক্ষিৎ বৃষক্রপী ধর্মের ভগ্ন-পদত্রয়ের পুনর্যোজনা করিয়া দিলেন, এবং পৃথিবীকে শান্তি প্রদান করিলেন। সত্যযুগে তপস্বী, শৌচ, দয়া ও সত্য—ধর্মের এই চারিটি পদ ছিল। বিষয়, বিষয়-সঙ্গ ও গর্ভ দ্বারা তাঁহার তিনটি পদ ভঙ্গ হয়। শেষে সত্য মাত্র অবশিষ্ট থাকে। পরীক্ষিৎ আপন কর্ম ও প্রভাব শুণে, স্বাপনের শেষ ভাগেও, ধর্মের সেই চতুস্পাদ রক্ষা করিয়াছিলেন; তাঁহার রাজত্ব-কালে কলি প্রাধান্য বিস্তার করিতে পারেন নাই। পরীক্ষিৎের পুত্র—জনমেজয়। পিতার সর্প-দর্শনে মৃত্যু-বিবরণ অবগত হইয়া, তিনি সর্প-সত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সেই যজ্ঞে বহু সর্প বিনষ্ট হইয়াছিল। জনমেজয় পৃথিবী জয় করিয়া অশ্ব-বধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন,—ভাগবতাদিতে তাহার উল্লেখ আছে। জনমেজয়ের পুত্র শতানিক, যাজ্ঞবল্ক্য মুনির নিকট বেদ পাঠ করিয়া ক্রিয়া-জ্ঞান, শৌনক হইতে আত্ম-জ্ঞান এবং ক্রিয়াচার্য্য হইতে অস্ত্র-জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। এই বংশের অধিসীমকৃষ্ণের (অবাসকৃষ্ণের) পুত্র নিচকুর (নেমিচকুরের) রাজত্বকালে গঙ্গা-প্রবাহে হস্তিনাপুর বিনষ্ট হয়। তিনি কোণাধী-নগরে রাজধানী স্থাপন করেন। কলিযুগে ক্ষেমক রাজ্য এই বংশের অবসান হয়।

অণু দ্রুহা ও তুর্কসু—যযাতির অপর তিন পুত্র। তাঁহাদের বংশে যে সকল কুতী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা বিভিন্ন জনপদে আপনাদের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ঐ

তিন বংশের নৃপতিগণের যে সকল রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে কতকগুলি বিশেষ প্রসিদ্ধ। দ্রুহ্যার বংশে গান্ধার জন্মগ্রহণ করেন।

দ্রুহা, তুর্কসু,
অণুর বংশ।

তিনি ‘গান্ধার’ (বর্তমান কান্দাহার) রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। দ্রুহা-

বংশের প্রচেতার শত পুত্র। তাঁহারা তিন্ন তিন্ন প্রদেশে স্বেচ্ছগণের অধিপতি হইয়াছিলেন।

উত্তর দিক তাঁহাদের অধিকার-ভূক্ত হইয়া ছিল। মরুতের অনপত্য-নিবন্ধন তুর্কসু-বংশ

লোপপ্রাপ্ত হয়। পুরু-বংশীয় দ্রুমত সেই বংশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। অণু-বংশের শিবি

হইতে মদ্র, কেকয় প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। মদ্র-দেশ, কেকয়-দেশ তাঁহাদের নামানুসারেই

প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বংশে, বলির ক্ষেত্রে দীর্ঘতম। ঋষির ঔরসে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সূর্য

পুত্র ও ওল্ল নারক পুত্রগণ উৎপন্ন হন। তাঁহাদের নামানুসারেই অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ

ঐহিকের নামকরণ হইয়াছিল। অশ্বের বংশে রোমপাদ-নামে এক রাজা জন্মগ্রহণ করেন। ইহার সম্বন্ধে পুরাণে বহু মতান্তর দৃষ্ট হয়। বিষ্ণু-পুরাণে লিখিত আছে,—অশ্বের বৃদ্ধ-ঐপৌত্র চিত্ররথের দশরথ নামে এক পুত্র ছিলেন। তাঁহার অপর নাম—রোমপাদ। রোম-পাদেব অপুত্রক-নিবন্ধন সূর্য্য-বংশীয় অজ-পুত্র দশরথ স্বীয় কন্তা শান্তাকে তাঁহার কন্যারূপে প্রদান করিয়াছিলেন। আবার ভাগবতে আছে,—‘চিত্ররথের সন্তান হয় নাই ; চিত্ররথই রোমপাদ নামে বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার সখ্য দশরথ তাঁহাকে শান্তা নামী কন্যা দান করেন। হরিণী-তনয় ঋষ্যশৃঙ্গ সেই কন্যার পানিগ্রহণ করিয়াছিলেন।’ ভগবতের মতে,—এই রোমপাদ রাজার রাজত্বকালেই অনারুটি ও দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল ; এবং বারবনিতাগণের প্রলোভনে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আগমনে, সে দুর্ভিক্ষ নিবারিত হয়। এই বংশের অধিরথ রাজার পুত্রের নাম—কর্ণ। কর্ণ তাঁহার ঔরসজাত পুত্র নহেন ;—পালক-পুত্র। পৃথার (কুন্তীর) অবি-বাহিতা অবস্থায় সূর্য্যের ঔরসে কর্ণের উৎপত্তি হইয়াছিল। লোকাপবাদাশঙ্কায়, কাষ্ঠ-পিঞ্জর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া, কুন্তী সেই পুত্রকে পরিত্যাগ করেন। অধিরথ সেই পরিত্যক্ত পুত্র প্রাপ্ত হন, এবং তাহাকে আপনার পুত্র-রূপে পালন করেন। কর্ণ—বীর বলিয়া প্রসিদ্ধ। কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধে তিনি কুরুপক্ষের সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই কর্ণই ‘দাতাকর্ণ’ নামে বিখ্যাত। দুর্য্যোধনের পক্ষ-গ্রহণে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া, বহু সত্য ও অসত্য জাতিকে জয় করিয়া, কর্ণ যখন প্রত্যাভূত হন ; তাহার অল্প দিন পরেই দুর্য্যোধন একটী বৈষ্ণব-বজ্রের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সেই বজ্রোপলক্ষে কর্ণ প্রতিজ্ঞা করেন,—“যত দিন আমি অর্জুনকে বধ করিতে না পারিব, তত দিন আমার নিকট যে যাহা প্রার্থনা করিবে আমি তাহাই প্রদান করিব।” এই সময় ভগবান ক্রীড়াক্ষ, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিয়া, কর্ণের দাতৃত্ব-শক্তির পরীক্ষা করিতে আসেন। সে পরীক্ষা—ভীষণ পরীক্ষা! বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, কর্ণের একমাত্র পুত্র বৃষকেতুর মাংস ভক্ষণ করিতে চাহেন। কর্ণের স্ত্রী পদ্মাবতী ও কর্ণ উভয়ে স্বহস্তে পুত্রের শৃঙ ছেদন করিবেন এবং পদ্মাবতী স্বয়ং সেই মাংস রন্ধন করিয়া দিবেন,—বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কর্ণ ও পদ্মাবতী তাহাতেই সম্মত হন। অতিথি-সংকারে প্রাণ সমর্পণ করিতে পারিব তাহা, পুত্র বৃষকেতুও আপনাকে বস্ত্র বলিয়া মনে করেন। অতঃপর পিতা-মাতা উভয়ে মিলিয়া—পুত্র বৃষকেতুকে ছেদন করিয়া, অতিথি-সেবার জন্য সেই মাংস রন্ধন করিয়া দেন। কর্ণ ও পদ্মাবতী উভয়েই এই বিষয় পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইলে, ব্রাহ্মণ-বেশী ভগবান, মৃতসঞ্জীবনী বিজ্ঞা-প্রভাবে তাঁহাদের মৃত-পুত্রের পুনর্জীবন দান করেন। এই অলৌকিক দান-ব্যাপারে কর্ণ ‘দাতাকর্ণ’ নামে প্রসিদ্ধ হন।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

দৈত্য ও দানবগণ।

[ব্রহ্মার মানস-পুত্র প্রজাপতিগণ,—কশ্যপ হইতে দেব, দৈত্য, দানব ও মানব বংশের উৎপত্তি ;—
হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু, প্রজ্ঞাদ, বলি প্রভৃতি,—বরাহ, মৃদাংহ ও বামন অবতার,—দানব কশ্যপের সহিত
দেবতা ও মানবের বিবাহ-বহুশ্য ;—বহু-কটভ, মহিষাশুর, শুভ-নিশুভ, হর্গাহ্ম, গর্গাহ্ম প্রভৃতির প্রসঙ্গ ;—
ভিন্ন ভিন্ন মন্তরে ভিন্ন ভিন্ন দৈত্য-দানবগণ ;—বৃহাহ্ম ও অশ্বাস্ত্র দৈত্য-দানবগণ,—রূপকে মতান্তর।]

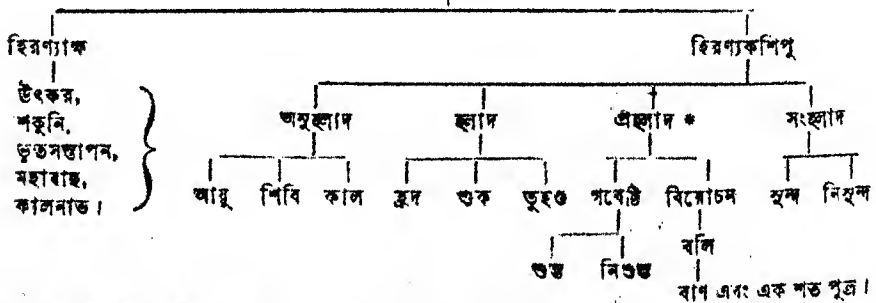
মতান্তর প্রভৃতির—মহু ও মহু-পুত্রগণের—বিষয় আলোচনা করিতে হইলে, আরও অনেক
বিষয় আলোচনা করার আবশ্যক হয়। প্রজাপতিগণের বিষয় আলোচনা করিতে হয়,—

কশ্যপ ব্রহ্মার মানস-পুত্রগণের বিষয় আলোচনা করিতে হয় ; তার পর, কোন্
ও মতান্তরে দেব-দানব-দৈত্যের কখন কিরূপ প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়িয়াছিল,
তাঁহার বংশ। সে সকল কথাও মনে পড়ে। প্রজাপতি সৃষ্টিকর্তা-সম্বন্ধেও পুরাণ-সমূহে

মতান্তর দেখিতে পাওয়া যায়। প্রধানতঃ দুই হয়,—হুগু, পুগুতা, পুগহ, ক্রহু, অদিরা,
মরীচি, দক্ষ, অত্রি প্রভৃতিই প্রজাপতির মধ্যে গণ্য। ইহারা আবার ব্রহ্মার মানস-পুত্র
বলিয়াও পরিকীর্তিত। এতদ্ভিন্ন, কর্দম, বশিষ্ঠ, নারদ প্রভৃতিও, কোনও কোনও পুরাণের
মতে, প্রজাপতি-পর্যায়ভুক্ত। অপিত, ধর্ম, রুদ্র, মহু, সনক, সনাতন, সনৎকুমার, রুচি, শুক
প্রভৃতি ব্রহ্মার মানসপুত্র মধ্যে পরিগণিত। সূর্য্যবংশের আদিভূত কশ্যপ—মরীচির ঔরসে
কর্দম-কন্তা কলার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। এদিকে আবার, তৈত্তিরীয় সংহিতায়,
হিরণ্যবর্ণ ব্রহ্মা হইতে কশ্যপের উৎপত্তি কথা লিখিত আছে। কশ্যপের বহু পত্নী।
সেই সকল পত্নীর—কোনও পত্নীর গর্ভে দেবতাদিগের এবং কোনও পত্নীর গর্ভে দৈত্যাদিগের
উৎপত্তি হয়। দক্ষের কয়েকটা কন্তাকে কশ্যপ বিবাহ করিয়াছিলেন। দক্ষ-কশ্যপগণের মধ্যে
অদিতির গর্ভে কশ্যপের ঔরসে সূর্য্য ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ জন্মগ্রহণ করেন ; এবং সেই
দেবাংশে দানবগণ উদ্ভূত হন। অশ্বপক্ষে আবার, দক্ষ-কন্তা দিতির গর্ভে দৈত্যগণের জন্ম
এবং দমুর গর্ভে দানবগণের উৎপত্তি হয়। ফলতঃ, একই কশ্যপ হইতে দেব, দৈত্য, দানব,
মানব, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়াছিল। কশ্যপ হইতে কেবল যে দেব-দানব-মানবের
উৎপত্তি-কথাই পুরাণাদি শাস্ত্রে লিখিত আছে, তাহা নহে। পুরাণাদি শাস্ত্রে দেখিতে
পাই,—তাঁহার স্ত্রী ইলার গর্ভে বৃক্ষ, প্রেতার গর্ভে সর্প, কাষ্ঠার গর্ভে অশ্বাদি, তাত্রার গর্ভে
শ্বেন-গুপ্ত, সরসার গর্ভে ঋষদ, তিমির গর্ভে জল-জন্তু প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়াছিল। মহর্ষি
কশ্যপের পরিচয় শাস্ত্রে ভূরোভূয়ঃ উল্লেখ আছে। ‘কশ্য’ (সোমরস বিশেষ) পান করিতেন
বলিয়াই তিনি ‘কশ্যপ’ নামে অভিহিত হন। তাঁহার কশ্যপ নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে মার্কণ্ডেয়
পুরাণে এইরূপ উল্লিখিত আছে। কাত্যায়ন ঋষির বোদাহুক্রমণিকায়, ঋক-সংহিতার কতক-
গুলি স্তবের ঋষি বলিয়া, কশ্যপ পরিচিত হইয়াছেন। কোথাও কোথাও কশ্যপ প্রজাপতির
মধ্যে পরিগণিত। যাহা হউক, কশ্যপ হইতে যে সকল প্রধান প্রধান দৈত্য-দানবের উৎপত্তি
হয়, তাহিবরণ সংক্ষেপে প্রদত্ত হইতেছে।

কশ্যপের দৈত্য-পুত্রগণের মধ্যে হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ বিশেষ প্রসিদ্ধ। হিরণ্যকশিপু দৈত্যগণের আদিভূত বলিয়া অভিহিত হন। তিনি বিষ্ণুদেবী এবং লোকপালদিগের উৎপাদক ছিলেন। বিষ্ণু নরসিংহ-রূপে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার সংহার-সাধন করিয়াছিলেন। হিরণ্যাক্ষ নামে হিরণ্যকশিপুর এক প্রবল পরাক্রান্ত সহোদর ছিলেন। হিরণ্যকশিপুর সংহার-সাধনের পূর্বে, বরাহ-রূপে অবতীর্ণ হইয়া, ভগবান বিষ্ণু তাঁহাকে নিধন করেন। হিরণ্যকশিপুর পুত্র হরিপরায়ণ প্রজ্ঞাদ দৈত্য-বংশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। প্রজ্ঞাদ-চরিত্র হিন্দুমাত্রেরই অবগত আছেন। পিতার কঠোর নির্ব্যাতনে নিপীড়িত হইয়া কিরূপ ভীষণ পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হন, পুরাণের অনেক স্থলেই তাহা পরিকীর্তিত হইয়াছে। নরসিংহ-রূপী ভগবানের হস্তে পিতার মৃত্যু হইলে, প্রজ্ঞাদ দৈত্য-রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। দৈত্যকুলে জয়গ্রহণ করিয়াও, ভগবত্তক্তি প্রভাবে, পুণ্যমুষ্ঠানের ফলে, প্রজ্ঞাদ এতই প্রভাব-সম্পন্ন হইয়াছিলেন যে, তিনি মহায়া নামে পরিচিত হন। পুরাণাদি শাস্ত্রেই প্রকাশ,—‘মহাত্মা প্রজ্ঞাদের চরিত্র শ্রবণ করিলে, সমস্ত পাপ সত্ত্ব ধ্বংস হয়। হরি যেমন প্রজ্ঞাদকে সকল বিপদে রক্ষা করিয়াছিলেন, যিনি প্রজ্ঞাদের চরিত্র শ্রবণ করেন, ভগবান তাঁহাকেও সেই-রূপ সকল বিপদে রক্ষা করিয়া থাকেন।’ সংজ্ঞাদ প্রভৃতি প্রজ্ঞাদের কয়েকটী সহোদর ছিল। কিন্তু কৰ্ম্মণ্ডণে প্রজ্ঞাদের বংশই প্রতিষ্ঠাপন্ন হয়। প্রজ্ঞাদের পুত্র—বিরোচন। সেই বিরোচন হইতে বলি জন্মগ্রহণ করেন। দানধর্ম্মাচরণে বলির প্রসিদ্ধি অসাধারণ। ভগবান বিষ্ণু, বামন-রূপ পরিগ্রহ করিয়া, ত্রিপাদ-ভূমি প্রার্থনায়, বলির দান-ধর্ম্মের পরীক্ষা করিয়া-ছিলেন। প্রপিতামহ হিরণ্যকশিপুর স্মার বলিরাজ স্বর্গ-মর্ত্তা-পাতাল ত্রিভুবনের অধীশ্বর ছিলেন। বলির এক শত পুত্র। তন্মধ্যে বাণ জ্যেষ্ঠ। বামন-দেবকে রাজ্যৈশ্বর্য্য প্রদান করিয়া, বলিরাজ পাতালে আশ্রয় গ্রহণ করিলে, তাঁহার বংশধরগণ পাতালেই রাজ্য করিতে থাকেন। হিরণ্যকশিপুর ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষেরও কতকগুলি মহাবল-পরাক্রান্ত পুত্র ছিল। বংশলতা এইরূপ,—

কশ্যপ + দিতি



কশ্যপের অপর ভ্রাতা দক্ষ-তনয়। দক্ষই সকল পুত্র প্রসব করেন, তাহার ‘দানব’ নামে পরিচিত হয়। সেই দক্ষ-পুত্রগণের সংখ্যা—এক শত। তন্মধ্যে বিপ্রচিতি,

* দৈত্যবংশের বংশলতা সম্বন্ধেও শাস্ত্র বহুভাষ্য আছে। পুরাণান্তরে রুদ্র ও বিরোচন—প্রজ্ঞাদের পুত্র বলিয়া এবং রুদ্রের পুত্র—অনুরাজ, শিবি ও রাজল বলিয়া লিখিত হইয়াছে। আরও, প্রজ্ঞাদ, রাজাদ, অনুরাজ প্রভৃতি রূপেও উল্লিখিত ও লিখিত হইয়াছে।

তারক, পুলোমা, স্বর্ভানু, বৃষপর্কী, দিমূর্কী, শকুনি, গবেষ্ট, সুকেশী, হমগ্রীব প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। ইহাদের মধ্যে স্বর্ভানুর কন্যা প্রভাকে সূর্য্যবংশের রাজা আয়ু বিবাহ করেন এবং তাঁহার গর্ভেই নহষের উৎপত্তি হয়। বৃষপর্কীর কন্যা শর্মিষ্ঠাকে নহষ-পুত্র যযাতি বিবাহ করেন। যযাতির সহিত শর্মিষ্ঠার বিবাহ—অপূর্ণ রহস্তপূর্ণ। দৈত্য-গুরু শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানির সহিত বৃষপর্কী-নন্দিনী শর্মিষ্ঠা ক্রীড়া করিতেছিলেন। সেই সময়ে ক্রীড়াচ্ছলে উভয়ের মধ্যে বিবাদ হয়। তাহাতে ক্রোধ-পরবশ হইয়া, শর্মিষ্ঠা দেবযানিকে কুপ-মধ্যে নিক্ষেপ করেন। সেই সময় রাজা যযাতি যুগয়ার্থ বনে গমন করিয়াছিলেন। কুপমধ্যে নিপতিতা বিবদ্রা দেবযানির প্রতি সহসা তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। রাজা যযাতি স্বীয় উত্তরীয় বস্ত্রের সাহায্যে দেবযানির কর-ধারণ করিয়া তাঁহাকে উত্তোলন করেন। যযাতির অমুকম্পায় জীবন লাভ করিয়া, পিতা শুক্রাচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইয়া, দেবযানি সকল বিবরণ নিবেদন করিলেন। তাহাতে শুক্রাচার্য্য বৃষপর্কীর উপর ক্রুদ্ধ হন। শুক্রাচার্য্যের ক্রোধ-শাস্তির নিমিত্ত বৃষপর্কী সহস্র সখীসহ আপন কন্যা শর্মিষ্ঠাকে দেবযানির পরিচর্য্যার জন্য দেবযানির হস্তে অর্পণ করেন। ইহার পর, দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য আপন কন্যা দেবযানিকে, শর্মিষ্ঠা প্রভৃতি অনুচারিণীগণের সহিত, রাজা যযাতির হস্তে সম্প্রদান করিয়াছিলেন। অতঃপর দেবযানির সহিত শর্মিষ্ঠাও যযাতির মহিষী মধ্যে গণ্য হন। * সেই শর্মিষ্ঠার গর্ভে যযাতি-পুত্র পুরু প্রভৃতির উৎপত্তি হয়। পুলোমার দুহিতা শচী, দেবরাজ ইন্দ্রের মহিষী হন। তাঁহার গর্ভে জয়ন্ত জন্মগ্রহণ করেন। হমশিরা-তনয়া উপদানবীর গর্ভে দুয়ন্তের জন্ম হয়। পুলোমা ও কলিকা নাম্নী বৈধানর-তনয়াদ্বয়কে কশ্যপ বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের গর্ভে ‘পোলমেয়’ ও ‘কালকেয়’ নামে অসংখ্য সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। কশ্যপের অজ্ঞাত পত্নীর গর্ভেও বহু নিয়ুগ্য জাতির উৎপত্তি হয়। ফলতঃ, কশ্যপ হইতে এক দিকে মনুজগণের এবং অত্র দিকে দৈত্য-দানবগণের উৎপত্তি হইয়াছিল।

দৈত্য-দানব-বংশে যে সকল ধর্ম্মঘেষী বীর জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে মধু-কৈটভ, মহিষাসুর, শুক্র ও নিমন্ত, ত্রিপুরাসুর, তারকাসুর, ভৃগাসুর, গরাসুর প্রভৃতির নাম অনেকেই অবগত আছেন। তাঁহাদের প্রভাবে দেবগণ বিত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন ;

বিবিধ
দৈত্যের বিবরণ।

পৃথিবী পরিকম্পিত হইয়াছিল। স্বয়ং বিষ্ণু, মধু ও কৈটভ দৈত্যদ্বয়কে সংহার করেন। দৈত্যদ্বয় পঞ্চসহস্র বৎসর ধরিয়া মধুসূদনের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কোনও প্রকারেই দৈত্যদ্বয় পরাজিত হন না দেখিয়া, মহামায়া তাঁহাদের প্রতি মায়াজাল বিস্তার করেন। দৈত্যদ্বয় সেই মায়ায় মুগ্ধ হইয়া নারায়ণকে বর দিতে চাহেন। ভগবান তখন তাঁহাদের নিকট বর প্রার্থনা করেন ;— ‘তোমরা উভয়ে অত্র আমার বধ্য হও।’ দানবদ্বয় ‘তথাস্ত’ বলিয়া বর প্রদান করিলে, বিষ্ণু চক্রদ্বারা তাঁহাদের মস্তক-ছেদন করেন। এক মহিষীর গর্ভ হইতে মহিষাসুর দৈত্যের উৎপত্তি হয়। মহিষাসুর দেবগণকে পরাজিত করিয়া স্বর্গলোক অধিকার করিয়া—

* মৎস্যপু্রাণ, ২৭৭ হইতে ৩০৭ অধ্যায়; মহাভারত, আদি-পর্ক, দশ-সপ্ততিতম অধ্যায় হইতে ষাণীতিতম অধ্যায় প্রভৃতিতে শর্মিষ্ঠা ও দেবযানির বিবরণ ক্রমে।

ছিল। তখন সমস্ত দেবগণের ভেজঃ গ্রহণ করিয়া, দেবী ভগবতী আবিভূতা হইলেন। তিনিই সিংহ-বাহিনী মহিষমর্দিনী। বহুতর দৈত্যসহ দেবীর সহিত রণে প্রবৃত্ত হইলে, দেবী মহিষাসুরের সংহার-সাধন করেন। শুভ-নিশুভ দৈত্য-ব্রাহ্মণ মহাবল-পরাক্রান্ত ছিলেন। তাঁহারও দেবগণের রাজ্য অপহরণ করিয়া দেবগণকে হত-শ্রী করিয়াছিলেন। দেবগণ, নিকৃপায় হইয়া হিমালয়ে গিয়া, ভগবতীর শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। তাহাতে দেবী শুভ-নিশুভের সংহার-সাধনে প্রবৃত্ত হন। প্রথমে শুভের সেনাপতি ধুম্রাক বষ্টি-সহস্র সৈন্ত সহ দেবীর সহিত যুদ্ধ করিতে আসে। দেবী তাহাদিগকে ভয়সাৎ করেন। তৎপরে দৈত্যরাজ শুভ যথাক্রমে চণ্ড, যুগ ও বজ্রবীজকে সেনাপতি-পদে বরণ করিয়া, যুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলেন। দেবী জগদ্ধাত্রী শূলধারী তাহাদিগকে নিপাতিত করেন। অবশেষে শুভ ও নিশুভ যুদ্ধ-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। তখন দেবী তাঁহাদিগেরও সংহার-সাধন করেন। দেবী-মাহাত্ম্য চণ্ডীতে দেবী কর্তৃক এই সকল অসুরগণের সংহার-বিবরণ বর্ণিত আছে। দুর্গাসুর দৈত্য — হিরণ্যাক্ষের বংশে জন্মগ্রহণ করে। তাহাকে কেহই যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত করিতে পারিত না বলিয়া, সে 'দুর্গমাসুর বা দুর্গাসুর' নামে অভিহিত হয়। বেদই দেবগণের বল ;—সুতরাং বেদ বিলুপ্ত করিবার জন্যই তাহার প্রথম আক্রমণ হইয়াছিল। ব্রহ্মার বরে বল-দর্পিত হইয়া, ব্রাহ্মণ-গণকে সে বেদ-মন্ত্র বিস্মরণ করাইয়া দেয়। তার পর, দেবগণকে পরাজিত করিয়া, দুর্গাসুর অমরাবতী নগরী অধিকার করে। তখন বজ্র-কর্ণের অভাবে ভূতলে বৃষ্টির অভাব হয়। উপযুক্ত পরিমাণে বৎসর অনাবৃষ্টি-নিবন্ধন পৃথিবীতে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়ায় প্রাণি-হানি বৃদ্ধিতে থাকে। অগত্যা ব্রাহ্মণগণ হিমালয়ে গমন-পূর্বক দেবীর শরণাপন্ন হন। তাহাতে ভগবতী দুর্গা সেই অসুরের সংহার-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। দূত-যুগে দেবীর যুদ্ধাযোজন বুভাস্ত্র অবগত হইয়া, সহস্র অশ্বোহিণী সৈন্ত সহ দুর্গমাসুর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। সেই যুদ্ধে দেব-দ্বিজগণ প্রথমে সকলেই শঙ্কায়িত হইয়াছিলেন। কিন্তু দেবী, সকলের শঙ্কা দূর করিয়া, দুর্গমাসুর ও তাহার অসুচরগণকে নিহত করেন। এই দুর্গমাসুর সংহার-হেতুই দেবীর 'দুর্গা' নামের প্রসিদ্ধি। তারকাসুর ও ত্রিপুরাসুর দৈত্যদ্বয়ও দেবগণকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল। দেবগণ তাহাতে মহাদেবের শরণাপন্ন হন। মহাদেব স্বয়ং ত্রিপুরাসুরকে বধ করেন ; তাহাতেই তাঁহার 'ত্রিপুরারি' 'ত্রিপুরাস্তক' নাম। তারকাসুরকে দেব-সেনাপতি কার্তিকের সংহার করিয়াছিলেন। তারকাসুর সংহারের জন্য কার্তিকের জন্ম হয়। তারকাসুরকে বধ করিয়াই তিনি 'তারকারি' নামে অভিহিত হন। গয়াসুর—পরম বিকৃতস্ত ছিলেন। বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া, সকল পদার্থ অপেক্ষা তিনি আপন শরীরের পবিত্রতা লাভ করিয়াছিলেন। তাহাকে স্পর্শ মাত্র প্রাণিগণ চতুর্ভুজ হইয়া বৈকুণ্ঠ লাভ করিত। কিন্তু তাহাতে যমপুরী প্রাণি-শূন্য হয় দেখিয়া, দেবগণ কৌশলে গয়াসুরকে নিশ্চল করেন। পরিশেষে দেবতাগণের বরে গয়াসুর, গয়াক্ষেত্রে শিলাব্লগে অবস্থিত হয়। বহু কাল চন্দ্র-সূর্য্য-পৃথিবী, তত কাল সেই শিলায় সর্বদেবগণ অবস্থিতি করিবেন,—ইহাই হির হইয়া যায়। গয়াতীর্থে—গয়াবাহাওয়ার ইহাই মূল তথ্য। গয়াসুরের প্রভাবে গয়া মাহাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়াছে যে, গয়া-ক্ষেত্র—একশ্রেষ্ঠ যুক্তি-ক্ষেত্রে পরিণত। এই

ক্ষেত্রে গমন করিয়া পিণ্ডদান করিলে, পূর্ব-পুরুষগণ উদ্ধার হন । গয়াধামে গমন করিয়া, কি প্রকারে শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি সম্পন্ন করিতে হয়, এবং গয়াধামের কোন্ কোন্ স্থানে কোন্ কোন্ তীর্থ অবস্থিত আছে, —বায়ুপুরাণান্তর্গত গয়া-মাহাত্ম্যে তাহার পরিচয় পাওয়া যায় । *

এক এক মন্বন্তরে আবার এক এক জন অশুরের প্রাধাত্যের বিষয়, পুরাণাদি শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় । স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে, দৈত্য-প্রবর বাহ্লি দেবতাগণকে বিপন্ন করিয়া

তুলিয়াছিল । ভগবান বিষ্ণু সুদর্শন চক্র দ্বারা সেই বাহ্লির সংহার-

বিভিন্ন মন্বন্তরে

বিভিন্ন দৈত্যগণ ।

সাধন করেন । দ্বিতীয়—স্বারোচিষ মন্বন্তরে, পুরুকুৎস নামে এক প্রবল-

পরাক্রান্ত দৈত্য, ইন্দ্রের ইন্দ্র অপরগণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল ।

ভগবান বিষ্ণু হস্তিরূপ ধারণ করিয়া তাহাকে সংহার করেন । তৃতীয়—ঔত্তমি মন্বন্তরে, প্রলম্ব

নামে এক দৈত্য ইন্দ্রের শত্রু হইয়াছিল ; বিষ্ণু মৎস্য-রূপ ধারণ করিয়া তাহাকে বিনাশ

করিয়াছিলেন । চতুর্থ—তামস মন্বন্তরে, ভীমরথ নামক অশুরের প্রাধাত্য হয় । মধুসূদন

কূর্শ-রূপ ধারণ করিয়া তাহার সংহার-সাধন করেন । পঞ্চম—রৈবত মন্বন্তরে, শান্ত নামা

দৈত্য ইন্দ্র অধিকারের চেষ্টা পাইয়াছিল । হংস-রূপী বিষ্ণুর হস্তে তাহার পঞ্চ লাভ

হয় । ষষ্ঠ—চাক্ষুষ মন্বন্তরে, মহাশাল দৈত্য দেবগণের শত্রুতা-সাধন করিয়াছিল ; অশ্ব-রূপী

হরি তাহাকে বিনাশ করিয়াছিলেন । সপ্তম—বৈবস্বত মন্বন্তরে, হিরণ্যাক্ষ দৈত্য প্রাহুভূত

হয় । ইন্দ্র-রিপু সেই দৈত্যকে বরাহ-রূপী বিষ্ণু সংহার করেন । অষ্টম—সাবর্ণি মন্বন্তরে,

সুতপা, অমৃতভ, মুখা প্রভৃতি অশুরগণের উৎপত্তি হইয়াছিল । ভগবান বিষ্ণু তাহাদিগের

সংহার-সাধন করিয়াছিলেন । নবম—দক্ষ-সাবর্ণি মন্বন্তরে, কালকাক্ষ নামক প্রবল-

পরাক্রমশালী দৈত্যের আবির্ভাব হইয়াছিল । পদ্মনাভ বিষ্ণুর হস্তে তাহার মৃত্যু হয় ।

দশম মন্বন্তরে, বলি নামা দৈত্য ইন্দ্রের শত্রুতাচরণ করিয়াছিল । ভগবান শ্রীহরি

গদা-বাতে তাহার সংহার-সাধন করেন । একাদশ মন্বন্তরে, দশগ্রীব নামে রাক্ষসের

প্রাধাত্য হয় । শ্রী-রূপী বিষ্ণুর হস্তে তাহার পঞ্চ লাভ ঘটে । দ্বাদশ মন্বন্তরে, তারক

নামক দৈত্য দেব-শত্রু হইয়াছিল । নপুংসকরূপী হরি তাহার প্রাণ-বিনাশ করেন ।

ত্রয়োদশ মন্বন্তরে, টিটুভ নামক দানব, দেবগণের শত্রুতায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল । মায়ুর-রূপী

নাগব তাহাকে সংহার করিয়াছিলেন । চতুর্দশ মন্বন্তরে, মহাদৈত্য নামে এক দৈত্যের

প্রাধাত্য হয় । দেবগণ বিব্রত হন । হরি স্বয়ং তাহার প্রাণ-বিনাশ করিয়াছিলেন । † এমন

কত মন্বন্তরে কত দৈত্যেরই যে প্রাধাত্য হইয়াছিল, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারিবে ?

প্রধান প্রধান কয়েক জনের বিবরণই সংক্ষেপে পুরাণাদিতে বর্ণিত হইয়াছে । নচেৎ, দৈত্য

অসংখ্য, দেবতা অসংখ্য, মানব অসংখ্য, প্রাণি-পর্যায় অসংখ্য । দৈত্য-দানব সংহারের

জন্ত ভগবান বিষ্ণু যে কত রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, এবং কত অবতারে এই ভূমণ্ডলে

অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, —এ সকল বিষয় আলোচনা করিলে, তাহারও সংখ্যা করা যায় না ।

* অগ্নিপুরাণ, ১১৪শ ও ১১৫শ অধ্যায় ; গরুড়পুরাণ, ৮২শ অধ্যায় হইতে ৮৬শ অধ্যায় ; এবং গয়ামাহাত্ম্যে
উভূতি গ্রন্থে গয়াধাম ও গয়া-তীর্থের মাহাত্ম্য-প্রসঙ্গ বর্ণিত আছে ।

† গরুড়পুরাণ, পূর্ব-খণ্ড, ৮৭শ অধ্যায় ।

অসুরগণের মধ্যে আর এক প্রধান অসুর—ব্রজাসুর। অদ্বুত তাহার জন্ম-বিবরণ! অদ্বুত তাহার বীর্য-বিক্রম! অদ্বুত তাহার সংহার-কাহিনী। প্রজাপতি হুতা, দৈত্য-কর্তা রচনাকে বিবাহ করেন। রচনার গর্ভে তাঁহার বিধ্বংস নামে এক পুত্র-ব্রজাসুর ও সন্তান জন্মে। বিধ্বংস আপন প্রতিভা-প্রভাবে দেবগণের পৌরহিত্য অস্তিত্ব হইয়াছিলেন। পুরাণে প্রকাশ,—‘সেই দেব-পুরোহিত বিধ্বংসের তিনটি মুণ্ড ছিল। তিনি একটি মুণ্ডে সোম পান করিতেন, একটি মুণ্ডে সুরা পান করিতেন, এবং অপর মুণ্ডে অন্ন ভোজন করিতেন। তিনি যজ্ঞ-কালে দেবগণকে প্রকাণ্ডভাবে হবির্ভাগ প্রদান করিতেন বটে; কিন্তু মাতৃস্নেহের অমূল্য হইয়া, মাতৃকুল অসুরদিগকেও তিনি গোপনে গোপনে যজ্ঞাংশ হবির্ভাগ দিতেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাহাতে ক্রুদ্ধ হন; বিধ্বংস দেবতাগণকে অবজ্ঞা করিতেছেন মনে করিয়া, ইন্দ্র তাঁহার শিরশ্ছেদ করেন। প্রজাপতি হুতা তাহাতে ইন্দ্রের উপর রোষান্বিত হইয়া ইন্দ্র-হত্যার কামনায় যজ্ঞাহুতি প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই আহুতির দক্ষিণাগ্নি হইতে একটি ভীষণাকার অসুর উৎপন্ন হয়। তাহারই নাম ব্রজাসুর।’ কোথাও কোথাও আবার দৃষ্ট হয়,—‘গয়ামুরের পুত্রের নাম ব্রজাসুর। মহাদেবের বরে দর্পিত হইয়া, সে দেবগণের শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল।’ যাহা হউক, আহুতির দক্ষিণাগ্নি হইতে যে অসুরের উৎপত্তি হইয়াছিল, শাস্ত্রাদিতে দৃষ্ট হয়,—‘সেই অসুরের বর্ণ তপ্ততায়ুত্বা; লোচনদ্বয় মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের তায় প্রাধ্ব্য-সম্পন্ন; অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পর্ব্বতের তায় দৃঢ়তা-বজ্রক। সেই অসুর, পদভরে ভূমণ্ডল বিকম্পিত করিয়া, ত্রিধ্ব শূলদ্বয়ে স্বর্গ-মর্ত্ত্য ত্রাসিত করিয়া, ইন্দ্রবধে ধাবমান হয়।’ তখন তাহার প্রভাবে ত্রিলোক আবৃত হইয়াছিল; তজ্জগুই সে ‘ব্রজ’ নামে অভিহিত হয়। সেই অসুর, দেব-মানব সকলকেই কম্পমান করিয়া তুলিয়াছিল। ইন্দ্র, বহু চেষ্টা করিয়াও, বহুকাল পর্যান্ত তাহাকে হনন করিতে পারেন নাই। অবশেষে ইন্দ্রাদি দেবগণ, ভগবান বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইয়া, সেই অসুর-বধের জন্ত প্রার্থনা করেন; বলেন,—“হে কৃষ্ণ! হুতনয় ব্রজাসুর ত্রিভুবন-গ্রাসে উদ্ভূত। আমাদের অস্ত্র-শস্ত্র এবং তেজ সমস্তই সে গ্রাস করিয়াছে। আপনি তাহার সংহার-সাধন না করিলে, আর উপায়ান্তর নাই।” বিষ্ণু তাঁহাদিগকে উপদেশ দেন,—“ঋষি-শ্রেষ্ঠ দধীচি (দধ্যক) তপস্তা-প্রভাবে দৃঢ়-দেহ লাভ করিয়াছেন। তাঁহার অস্থি বাচ্ছা কর। সেই অস্থি লইয়া বিধ্বংস যেন অস্ত্র নির্মাণ করিয়া দিবেন; সেই অস্ত্রে ব্রজের সংহার-সাধন হইবে।”* দেবরাজ ইন্দ্র তখন সেই পরামর্শই শ্রবণ বলিয়া গ্রহণ করিলেন। তদনুসারে, মহর্ষি দধীচির নিকট গমন করিয়া, দেবগণ তাঁহার দেহ তিক্ত চাহিলেন। মহর্ষি দধীচি, দেবগণের প্রার্থনা-মাত্র দেহ-দানে সম্মত হইলেন; কহিলেন,—“আমার দেহ দান করিলে যদি দেবগণের উপকার হয়, দেবগণ নিদ্বন্দ্বক হন, পৃথিবী অসুরের উপদ্রব হইতে রক্ষা পান, আমি দেহ-দানে বৃত্ত হইব।” এই বলিয়া, দেবরাজের হস্তে দধীচি আপনার প্রাণ সমর্পণ করিলেন। তখন দধীচির অস্থি

* দেবী-ভাগবতে কৃষ্ট হয়,—ভগবতীর আরাধনায় দেবগণ আপনাদিগের আত্মা বজ্র-সংকার করিতে সর্ব্ব হইয়াছিলেন; আর, অস্ত্রাঙ্কন করে ব্রজাসুর ত্রিলোক-বিজয়ী হইয়াছিল।

লইয়া, বিধকর্ম্মার * সাহায্যে, বজ্র প্রস্তুত হইল। আবার ব্রহ্মাসুরের সহিত দেবগণের তুমুল সংগ্রাম চলিল। সেই যুদ্ধে নমুচি, শম্বর, অনর্কী, দিমুর্দা, হয়গ্রীব, শঙ্কশিরা, বিপ্রচিহ্ন, অয়োমুখ, পুশোমা, বৃষপর্কী, প্রেহতি প্রভৃতি দৈত্যগণ এবং সুমালী, মালী প্রভৃতি অসুরগণ ব্রহ্মের সহিত যোগদান করিয়াছিল। কিন্তু সেই যুদ্ধে তাহাদের সকল উত্তম ব্যর্থ হয়। দধীচি-অস্থি-বিনিশ্চিত কুলিশ-প্রহারে ইন্দ্র ব্রহ্মাসুরকে বধ করেন। যুদ্ধের সময় অসুরের ব্রহ্ম রথাদি সহ ইন্দ্রকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু নারায়ণ-কবচ, যোগবল ও মায়ারলের প্রভাবে ইন্দ্র তাহার কুলি বিদীর্ণ করিয়া নির্গত হন এবং গিরিশৃঙ্গ-সদৃশ তাহার মস্তক ছেদন করেন। ক্রমাগত তিন শত ষাট দিন কাল বজ্রের দ্বারা হনন করিয়া, ইন্দ্র ব্রহ্মাসুরের মস্তকচ্ছেদে সন্মত হইয়াছিলেন। † ব্রহ্মাসুর-বধে ইন্দ্র—‘ব্রহ্ম’ ‘ব্রহ্মহা’ প্রভৃতি সংজ্ঞা লাভ করেন, এবং দেব-গন্ধর্ব্ব-সিদ্ধধিগণ ইহার মস্তকে পুষ্প-বৃষ্টি করিতে প্ররম্ভ হন। যে স্থানে মহর্ষি দধীচি দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই স্থান তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়। স্বয়ং বলরাম, সেই তীর্থে স্নান-দান-যজ্ঞ করিয়া, তাহার মাহাত্ম্য বহু গুণে বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ব্রহ্মাসুর ভিন্ন, আরও বহু অসুরের বিবরণ পুরাণাদি শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়; আর, সেই সকল অসুরের সকল কাহিনীই অপূর্ণ রহস্ত-পূর্ণ। ইন্দ্র, বহু অসুর ও দৈত্য-দানবের সংহার করিয়াছিলেন; যুগে যুগে অবতারগণ আবির্ভূত হইয়াও বহু দৈত্য-দানব-অসুরের সংহার-সাধন করেন; মহুজ-রাজত্ব-বর্ণো হস্তেও বহু দৈত্য-দানব-নিপাতের সমাচার অবগত হওয়া যায়। এক শ্রীকৃষ্ণই কত দৈত্য-দানবের সংহার করিয়াছিলেন! পুতনা, বৎসাসুর, বকাসুর, অঘাসুর, ভৃগুবর্ষ প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিহত হইয়াছিল। শ্রীরামচন্দ্র কৈশোরে তারকা রাক্ষসীকে বধ করিয়াছিলেন। যৌবনে রাবণাদি রাক্ষসগণ তাঁহার হস্তে নিধন-প্রাপ্ত হয়।

পুরাণাদি শাস্ত্রে দৈত্য-দানব-প্রসঙ্গে বহু রূপকের সৃষ্টি হইয়া আছে। অনেকে অনেক সময় সে রূপক উদ্ঘাটন করিবার প্রয়াস পান। হুই একটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতেছি। দেবী ভগবতী ‘দুর্গমাসুর’ বা ‘দুর্গাসুর’ বধ করিয়াছিলেন,—

রূপকে ব্রহ্মাসুর
প্রভৃতি।

পুরাণে লিখিত আছে। কিন্তু ইংারা ‘দুর্গমাসুর’-বধ রূপক বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা বলেন,—“বাতবপক্ষে ‘দুর্গমাসুর’ বা ‘দুর্গাসুর’ বলিয়া কোনও অসুর ছিল না। মাহুঘের আধি-ব্যাধি-শোক-তাপ প্রভৃতি দুর্গতিকে এখানে অসুর-রূপে কল্পনা করা হইয়াছে। ভগবতী দুর্গার শরণাপন্ন হইলে, তিনি সেই সকল

* পরাপতি দ্বষ্টার অপর নাম—‘বিধকর্ম্মা’। কোনও কোনও পুরাণে দেখিতে পাই, ইন্দ্র-বধের ক্ষত ব্রহ্মাসুরকে সৃষ্টি করিয়াও, তাহার কলুধ-গরিষে বিধকর্ম্মা তাহার প্রতি বিরূপ হইয়াছিলেন। তাই শেষে তিনি ব্রহ্মের সংহার-সাধন জন্য বজ্র-নির্মাণে সহায়তা করিয়াছিলেন।

† দেবীভাগবতের মতে,—ইন্দ্র বধনা করিয়া ব্রহ্মাসুরকে বধ করিয়াছিলেন। ব্রহ্ম, বজ্র নিকট বর পাইয়াছিল,—দিবাভাগে কিংবা রাত্রিকালে তাহার মৃত্যু হইবে না এবং শুক বা অগ্নি কোনও প্রকার শাস্ত্র তাহার মৃত্যু হইবে না। যুদ্ধের সময় ইন্দ্র সন্ধির ছলে কোশলে ব্রহ্মের মরণোপায় জিজ্ঞাসা লন। ইন্দ্র ও রাত্রির সন্ধি-মুহুর্তে, সাগর-অলের পর্ব্বভোমর জলধেন লইয়া, সেই কেন্দ্রবৃত্ত বজ্রের দ্বারা ইন্দ্রকে হনন করেন।

দুর্গতি দূর করেন। দেবী সেই জন্তই ‘দুর্গা’ নামে অভিহিতা।” ইন্দ্র এবং যজ্ঞাসুর সন্ধেও এই প্রকার এক রূপক-ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। সে ব্যাখ্যা—বড়ই কৌতুকাবহ। ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলে দ্বাত্রিংশ সূক্তে অগ্নিরার পুত্র হিরণ্যপুংগবী, ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন,—“বজ্রধারী ইন্দ্র প্রথমে যে পরাক্রমের কৰ্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন তাঁহার সেই কৰ্ম-সমূহ বর্ণনা করি। তিনি অহিকে (মেঘকে) হনন করিয়াছিলেন। পর সৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছিলেন, বহনশীল পৰ্ব্বতীয় নদীসমূহের (পথ) ভেদ করিয়া দিয়াছিলেন। ১। ইন্দ্র পৰ্ব্বতান্ত্রিত অহিকে হনন করিয়াছিলেন; অষ্টা, ইন্দ্রের জ্ঞাত সুদূরপাতী বজ্র নির্মাণ করিয়াছিলেন; (তৎপর) যেরূপ গান্ধী সবেগে বৎসের দিকে ধায়, ধারাবাহী জল সেইরূপ সবেগে সমুদ্রাভিমুখে গমন করিয়াছিল। ২। জগতের আবরণকারী বৃত্তকে ইন্দ্র মহাধ্বংসকারী বজ্র দ্বারা ছিন্নবাহ করিয়া বিনাশ করিলেন, কুঠার-ছিন্ন বৃক্ষ-বৃক্ষের আয় অহি পৃথিবী স্পর্শ করিয়া পড়িয়া আছে। ৫। দর্পযুক্ত বৃত্ত (আপনার সমতুল) যোদ্ধা নাই (মনে করিয়া) মহাবীর ও বহু-বিনাশী ও শত্রুবিজয়ী ইন্দ্রকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছিল। ইন্দ্রের বিনাশ-কার্য্য হইতে রক্ষা পাইল না, ইন্দ্র-শত্রু বৃত্ত (নদীতে পতিত হইয়া) নদী-সমুদয় পিষিয়া ফেলিল। ৬। হস্তপদশূণ্য বৃত্ত ইন্দ্রকে যুদ্ধে আহ্বান করিল, ইন্দ্র তাহার সাহু (তুলা প্রৌচ বৃক্ষে) বজ্র আঘাত করিলেন; যেরূপ পুরুষত্বহীন ব্যক্তি পুরুষ-সম্পন্ন ব্যক্তির সাদৃশ্য লাভ করিতে বৃথা যত্ন করে, বৃত্তও সেইরূপ (বৃথা যত্ন করিল), বহু স্থানে ক্ষত হইয়া বৃত্ত ভূমিতে পড়িল *। ৭।” এই সূক্তের অন্ত্যান্ত শ্লোকেও বৃত্তের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ-কাহিনী এইরূপ-ভাবেই বিবৃত আছে। বাহা হউক, এই সূক্তের ব্যাখ্যায়, সারণ্যকার্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া, ন্যায়মূল্য, উইলসন এবং রমেশ চন্দ্র দত্ত প্রমুখ বেদ-ব্যাখ্যাকারিগণ প্রায় সকলেই বলিয়া গিয়াছেন,—“বৃত্ত ও ইন্দ্রের যুদ্ধ-ব্যাপার—রূপক-মাত্র; পুরাণে বজ্র, সৃষ্টি ও মেঘকে এইরূপে রূপকে প্রকাশ করা হইয়াছে।” এই বিষয়ে রমেশচন্দ্রের ঋগ্বেদ-সংহিতার টীকার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি,—“পুরাণে যে বৃত্ত নামক অশুরের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ-সম্বন্ধীয় আখ্যান আছে, তাহার উৎপত্তি আমরা এই সূক্তে (প্রথম মণ্ডলের দ্বাত্রিংশ সূক্তে) পাই। মেঘের নাম বৃত্ত বা অহি, ইন্দ্র মেঘকে বজ্র দ্বারা আঘাত করিয়া সৃষ্টি বর্ষণ করিতেছেন, এইরূপ উপলক্ষি করিয়া ঋগ্বেদের ঋষিগণ উপমা ও কল্পনা-পূর্ণ কবিতা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে পৌরাণিক অশুরের গল্প উৎপন্ন। একই বস্তুর (মেঘকে) এখানে একবার বৃত্ত এবং একবার অহি বলা হইয়াছে। তাহার ভিন্ন অশুর নহে। বৃথা হইতে বৃত্ত, আবরণার্থে। হন ধাতু হইতে অহি, হননার্থে। ‘অহিং মেঘঃ।’ সাধারণ।” † মহর্ষি দধীচির নাম ঋগ্বেদে একাধিক বার উল্লেখ আছে। প্রথম মণ্ডলের চতুর্দশীতিতম সূক্তে দেখিতে পাই, বহু-গণের পুত্র গোতম ঋষি ইন্দ্রের স্তবে বলিতেছেন,—“অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইন্দ্র, দধীচি ঋষির অহি

* অধ্যাপক উইলসন এই স্থানের অর্থ এইরূপ লিখিয়াছেন,—The banks “were broken down by the fall of Indra, i. e. by the inundation occasioned by the descent of the rain.”—Wilson.

† রমেশচন্দ্র দত্ত কর্তৃক সংস্কৃত ‘ঋগ্বেদ-সংহিতা’, প্রথম মণ্ডল, দ্বাত্রিংশ সূক্ত, টীকা ও বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি

দ্বারা, বৃত্তগণকে নমুনবৃত্তিবার বধ করিয়াছিলেন।” এই মণ্ডলেরই আর এক শ্লোকে (ষোড়শাধিক শততম শ্লোকে) দীর্ঘতমার পুত্র কক্ষিবানঋষি, অশিষ্যের প্রার্থনায় বলিতেছেন,—“হেনেতৃদয়! যেমন মেঘ-গর্জন (আসন্ন) বৃষ্টি প্রকটিত করে, আমি ধনলাভার্থ তোমাদের সেই উগ্রকর্ষ সেইরূপে প্রকটিত করিতেছি যে অধর্কার পুত্র দধীচি (ঋষি) অধমন্তকধারণ করিয়া তোমাদিগকে মধুবিন্দু শিখাইয়াছিলেন।” * কি সায়ণ, কি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ—এ দুই স্থলের টীকায়, কেহই কিন্তু মেঘের সহিত বৃত্তের অভিন্নত্ব প্রতিপন্ন করিতে পারেন নাই। সকলেই বলিয়াছেন,—‘এ স্থানের অর্থ উদ্ধার করা দুঃসহ।’ সায়ণ বলিয়াছেন,—‘এই দুই স্থলে কেবল পৌরাণিক প্রসঙ্গই মনে পড়ে।’ সকল রূপকের তাৎপর্য-গ্রহণ সম্ভবপর নহে, এবং আবশ্যকানুরূপ সকল জিনিষকেই রূপক বলিয়া মনে করাও সমীচীন নহে।

রূপক যে একেবারে নাই, তাহাও বলিতে পারি না। এদিকে আবার দৈত্য, দানব, অসুর, রাক্ষস প্রভৃতি সম্বন্ধে সাধারণ লোকের বাহা ধারণা আছে, পুরাণাদি শাস্ত্র-গ্রন্থ

আলোচনা করিলে, সে ধারণাও ঠিক বলিয়া মনে করিতে পারি না।

দৈত্যাদির
তাৎপর্য।

তবে দৈত্য-দানব-অসুর-রাক্ষস বলিতে আমরা প্রকৃত কি অর্থ

উপলব্ধি করিতে পারি? আমরা দেখিতে পাই,—দানব-হুহিতা শচী,

দেবরাজ ইন্দ্রের মহিষী! আমরা দেখিতে পাই,—সূর্য্যবংশাবতঃস যযাতির পত্নী যে শর্মিষ্ঠা, তাঁহা হইতেই পুরু-বংশের উৎপত্তি। তার পর আরও দেখিতে পাই,—একই কল্পপের ঔরসে, প্রজাপতি দক্ষের ভিন্ন ভিন্ন কস্তার গর্ভে, বধন দেবতা ও দানব-দৈত্যাদির উৎপত্তি হইতেছে; তখনই বা কি মনে হয়? পিতা হিরণ্যকশিপু বিষ্ণুদেবী বলিয়া উপেক্ষিত হইতেছেন; আর তাঁহারই পুত্র হরি-পরায়ণ প্রহ্লাদ দেবতার জায় সন্মান পাইতেছেন! একই বংশের রাবণ, একই বংশের কুম্ভকর্ণ, একই বংশের ইন্দ্রজিৎ, আবার সেই একই বংশের বিভীষণ, লোকনয়নে কিরূপ-ভাবে চিত্রিত হইয়াছেন,—কে না তাহা বুঝিতে পারেন? হইতে পারে, অথবা আমরা বুঝিতে না পারি, কতকগুলি রূপক! কিন্তু তাই বলিয়া সকলগুলিই রূপক হইতে পারে না। ধর্মবৈগুণ্যে, আচার-বৈগুণ্যে, ব্যবহার-বৈগুণ্যে পরিচয়ের বিভিন্নতা ঘটিয়াছে। নচেৎ, দৈত্য-দানব-রাক্ষস প্রভৃতিকেও মনুষ্য ভিন্ন অন্য কিছু কল্পনা করিবার উপায় দেখি না। ফলতঃ, বাহারা দৈত্য, দানব, রাক্ষস বা অসুর নামে অভিহিত, তাহারাও মানুষ;—ধর্মহীন, আচারহীন, মনুষ্য যেরূপ পশুর মধ্যে পরিগণিত, তাহারাও সেইরূপ মানুষ হইয়াও রাক্ষসাদি নামে পরিচিত।

* দধীচি পুরাণে প্রাণ-সমর্পণ করিয়াছিলেন,—প্রধানতঃ ইহাই প্রকাশ। কিন্তু কোনও কোনও পুরাণে আবার ইহাতেও মতান্তর দুই হয়। সে মত,—ইন্দ্র, দধীচিকে মধুবিদ্যা (বেদের ‘ব্রাহ্মণ’ অংশ) এবং ঐগব্য-বিদ্যা (ঋক, সাম, যজু) শিক্ষা দিয়াছিলেন। শিক্ষাদানের সময় সর্গ হইয়াছিল, দধীচি যদি ঐ বিদ্যা অগ্নর কাহ্ন-কেও শিক্ষা দেন, ইন্দ্র তাঁহার মন্তক ছেদ করিবেন। অশিষ্য (দেববৈবস্ব অধিনীকুমার-ধর) সেই দুই বিদ্যা দধীচির নিকট হইতে শিখিয়া লইয়াছিলেন। বিদ্যা শিক্ষার পর, তাহারা দধীচির মন্তক ছেদন করিয়া, সেই মন্তক অশ্ব স্থানে রাখিয়া আসিয়া, তাঁহার মেহে অশ্ব-মন্তক সংযোজন করাইয়া দেন। সেই সময়, দধীচি সর্গ ভঙ্গ করায়, ইন্দ্র বজ্র দ্বারা তাঁহার মন্তক ছেদন করেন। অশিষ্য তাহা জানিতে পারিয়া, বে মৃত পূর্বে তাঁহার কাটিয়া লুণ্ঠাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা আনয়ন করিয়া দধীচির মন্তকে পুনর্বোজন করিয়া দেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ ।

বংশ-পর্যায় আলোচনা ।

[বংশ-পর্যায় আলোচনায় বোর অসামঞ্জস্য,—রাম, যুধিষ্ঠির, বলরাম, অভিমুখা, বৃহৎল, রেবতী প্রভৃতির পর্যায় আলোচনা,—বংশ-পর্যায়ের বিসদৃশ ;—বুঝিবার ভ্রান্তি,—টন্ডের হিসাব,—মিশর ও ভারতে ভুলনা,—মিশর, চীন ও আফ্রিকার রাজ্যের প্রতিষ্ঠা-প্রসঙ্গে ভারতের প্রাচীনত্ব-তত্ত্ব,—‘মেনেস’—সম্ভবতঃ মমুর নামান্তর,—ভারতীয় নৃপতিগণের বংশ-পর্যায়ের ক্রমভঙ্গ,—স্বর্গ্যবংশীয় নৃপতিগণ কর্তৃক মিশরে উপনিবেশ স্থাপনের প্রসঙ্গ,—পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতালোচনা ;—স্বর্গ্যবংশের বংশ-লতায় নাম-পর্যায়ের অনানুগত্য,—ইক্বাহু-কুলোস্তা শ্রীরামচন্দ্র, রঘু, দিলীপ, মাক্যাতা, সগর, ভগীরথ প্রভৃতি ;—মমুর অপরায়ণ পুত্রের প্রসঙ্গ,—মিথিলার রাজ-বংশ আলোচনায় অসামঞ্জস্য,—চন্দ্রবংশে ইলার প্রসঙ্গ,—মহম্মদের আলৌকিক উপাখ্যান ;—পুরুষবার পুত্র ও গৌরুগণের নাম ও বংশ-বিশয়ে অনৈক্য,—চন্দ্রবংশের অজ্ঞান্য প্রধান প্রধান নৃপতিগণ,—নহব, যযাতি, যদু, তুর্কু, ক্রতু, অগ্ন, পুরু, ক্রতু, ভরত, অজমীচ, কুরু, যুধিষ্ঠির, জনমেজয় প্রভৃতি,—নারি, বিষ্ণুমিত্র, পরশুরাম, ধর্ম্মর, দিবোদান, অলক ;—কার্ত্তবীৰ্য্যার্জুন, বহুদেব, ঈশ্বর, দেবদীচ, উগ্রসেন, কংস, জরাসন্ধ প্রভৃতি ;—বংশ-পর্যায় আলোচনায় বিবিধ বস্তব্য ।]

বিষম সমস্যা—বংশ-পর্যায় আলোচনায় ! অনন্ত অসীম-কাল-পারাবার—অল্প অল্প-বুদ্ধি মানুষের পরিমাণ-দণ্ডে বুঝি তাহার পরিমাপ করা হুঃসাধ্য ! একই বেদব্যাসের রচিত পুরাণ-সমুদ্র মহন করিয়া, আমরা স্বর্গ্যবংশের ও চন্দ্রবংশের বিবন সমজ্ঞা ! বংশ-লতা উদ্ধার করিয়াছি । কিন্তু কি আশ্চর্য্য !—একটীর সহিত অপরটীর অনেক স্থগেই ঐক্য নাই । মহর্ষি বাম্বীকির রামায়ণে স্বর্গ্যবংশের ধ্রুবধর নৃপতিগণের ইতিহাস বর্ণিত আছে ; বেদব্যাসের পুরাণ-রচনার পূর্ব্ববর্ত্তি-কালে বাম্বীকির রামায়ণ রচিত হইয়াছিল ;—এ প্রসঙ্গ আমরা পূর্ব্বেরই উত্থাপন করিয়াছি । কিন্তু সেই রামায়ণে স্বর্গ্যবংশের যে বংশ-লতা প্রকটিত, তাহার সহিত পুরাণোক্ত বংশ-লতার কি অসামঞ্জস্যই রহিয়া গিয়াছে ! বৈবস্বত মনু হইতে রামায়ণের শ্রীরামচন্দ্র ষড়্বিংশ পর্য্যায়ের অবস্থিত ; কিন্তু বৈবস্বত মনু হইতে ব্রহ্মপুরাণের রামচন্দ্র অষ্ট-পঞ্চাশৎ পর্য্যায়ের, বিষ্ণুপুরাণের রামচন্দ্র চতুঃষষ্টিতম পর্য্যায়ের, হরিবংশের রামচন্দ্র চতুঃপঞ্চাশৎ পর্য্যায়ের, অগ্নিপুরাণের রামচন্দ্র এক-পঞ্চাশৎ পর্য্যায়ের, শিবপুরাণের রামচন্দ্র পঞ্চাশৎ পর্য্যায়ের, ঐমজ্জাগবতের রামচন্দ্র ত্রিষষ্টিতম পর্য্যায়ের, বৃহৎসংস্কৃতপুরাণের রামচন্দ্র ষড়্বিংশৎ পর্য্যায়ের বিস্তারিত । স্বর্গ্যবংশের গৌরব-চূড়া শ্রীরামচন্দ্র-সম্বন্ধেই এই পার্ক্য ! অজ্ঞানের সহজে যে অশেষ পার্ক্যের সম্ভাবনা, তাহা সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে । এইরূপ, চন্দ্রবংশের বংশ-লতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও একের সহিত অপরের কচিং ঐক্য দেখিতে পাই । যে বুধিষ্ঠিরাদির প্রসঙ্গ চন্দ্রবংশের মেরুদণ্ড-স্থানীয়, মহাভারতে দেখিতে পাই, চন্দ্র-পুত্র বুধ হইতে সেই বুধিষ্ঠিরাদি ষড়্বিংশ পর্য্যায়ের অবস্থিত । এদিকে আবার সেই বুধ হইতে হরিবংশের বুধিষ্ঠির চতুঃষষ্টিতম পর্য্যায়ের, বিষ্ণুপুরাণের বুধিষ্ঠির সপ্তচত্বারিংশ পর্য্যায়ের, ঐমজ্জাগবতের বুধিষ্ঠির ষড়্চত্বারিংশ পর্য্যায়ের, অগ্নিপুরাণের বুধিষ্ঠির ষড়্বিংশৎ পর্য্যায়ের,

ব্রহ্মারূপের সুধিষ্ঠির পঞ্চত্রিংশৎ পর্য্যায়ে বর্তমান রহিয়াছেন। কেবল কি এই পার্বক্য। কোথাও আবার দেখিতে পাই, সত্য-ত্রৈতা যুগে ঐহার বিজ্ঞান ছিলেন, তাঁহাদের বংশ-পর্য্যায় অপেক্ষা, তাহারই পরবর্তী দ্বাপর বা কলিযুগের কোনও কোনও পুরুষের বংশ-পর্য্যায় কম রহিয়া গিয়াছে। একটী দৃষ্টান্ত প্রদান করিতেছি;—বৈবস্বত মনুর অধস্তন চতুর্থ পর্য্যায়, সূর্য্যবংশে, রেবত রাজা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার কন্যার নাম—রেবতী। পুরাণ-সমূহে দৃষ্ট হয়,—যজু-বংশের বলরামের সহিত সেই রেবতীর বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু বলরাম অনান চন্দ্রবংশের ষড়পঞ্চাশৎ পর্য্যায়ে বিজ্ঞান। এদিকে আবার দেখিতে পাই,—সূর্য্যবংশের শততম পর্য্যায়ের বৃহৎল, চন্দ্র-বংশ-সম্ভূত ত্রিংশৎ-পর্য্যায়-ভুক্ত অভিমন্যুর হস্তে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে নিহত হন। শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, অভিমন্যু প্রভৃতি, তাহা হইলে, বৃহৎলের সম-সাময়িক। একই সূর্য্যবংশের শততম পর্য্যায়ের বৃহৎল, সে হিসাবে, সেই একই বংশের পঞ্চম পর্য্যায়-ভুক্ত রেবতীর সম-সাময়িক হইয়া পড়িতেছেন। ইহা বড়ই বিসদৃশ! পুরাণের রূপকে অবশ্য রেবতী ও বলরামের বিবাহ-সম্বন্ধে একটী অলৌকিক উপাখ্যানের অবতারণা হইয়াছে।* কিন্তু সে উপাখ্যান মানিয়া লইতে হইলে, রেবতী লক্ষ লক্ষ বৎসর জীবিত ছিলেন, এবং তাঁহার ষড়নবতিতম অধস্তন পর্য্যায়-ভুক্ত লক্ষ লক্ষ বৎসরের বয়ঃকনিষ্ঠ বলরামকে বিবাহ করিয়াছিলেন,—স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু সাধারণ দৃষ্টিতে তাহাও বিসদৃশ নহে কি?

এই বংশ-পর্য্যায় আলোচনার শাস্ত্রতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মস্তিষ্ক বিচলিত হইয়া যায়। অপরে এ তত্ত্ব সহজে কিরূপে নির্ণয় করিবে? এই বংশ-তত্ত্ব আলোচনা করিতে গিয়াই, আধুনিক পণ্ডিতগণ প্রধানতঃ ভ্রমে নিপতিত হন; আর, তাহারই ফলে, বুঝিবার ভ্রান্তি! ভারতের প্রাচীনত্ব এত আধুনিক বলিয়া মনে করেন! বুঝিবার ভুলেই এরূপ দটিয়া থাকে। নচেৎ, ইচ্ছা করিয়া যে কেহ ভারতের প্রাচীনত্ব সন্দিহান হন,† তাহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। অপরের কথা বলিব কি? যে কর্ণেল টড, ভারতের গৌরব-গরিমায় মুগ্ধ হইয়া, রাজস্থানের ইতিবৃত্ত প্রণয়ন করেন; তাঁহার শ্রায় সহৃদেয়-প্রণোদিত সহৃদয় ব্যক্তিও এই ভ্রমের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান নাই। চন্দ্র-সূর্য্য-বংশের বংশলতার আলোচনায়, ভারতের প্রাচীনত্ব নির্ণয় করিতে গিয়া, তিনি ‘রাজস্থানে’ লিখিয়াছেন,—“বৈবস্বত মনু হইতে জীরামচন্দ্র পর্য্যন্ত সূর্য্যবংশীয় সপ্তপঞ্চাশৎ জন নৃপতি রাজত্ব করিয়াছিলেন; বেদব্যাসের বিবরণে ইহাই প্রতিপন্ন হয়। এ পর্য্যন্ত আমি যে সকল বংশ-তালিকা দেখিয়াছি ও সংগ্রহ করিয়াছি, তাহার কোনটীতেই ঐ সময়ে অষ্ট-পঞ্চাশৎ জনের অধিক চন্দ্রবংশীয় নৃপতির পরিচয় পাওয়া যায় না।” এই বলিয়া, আশ্চর্য্যায়িত হইয়া, কর্ণেল টড পুনরায় লিখিয়াছেন,—“মিশর-দেশীয় রাজবংশের বংশ-পর্য্যায়ের সহিত ইহার কত পার্বক্য! হেরোডোটাস, মিশর-দেশীয় পুরোহিতগণের গ্রন্থ-পত্র হইতে জানিতে

* এই গ্রন্থের ৩৪৮শ পৃষ্ঠায় বলরাম ও রেবতীর বিবাহ-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

† ‘টাইমস’ আফিস হইতে প্রকাশিত “হিষ্টোরিয়ান্স্ হিষ্ট্রি অব দি ওয়ার্ল্ড” (Historians’ History of the World) প্রভৃতি গ্রন্থে মিশরের সভ্যতাকে ভারতবর্ষের সভ্যতা অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

পারিয়াছেন,—সেই দেশের প্রথম রাজা ‘সূর্য্য-পুত্র মেনেস’ হইতে তিন শত ত্রিশ জন নৃপতি ভারতবর্ষীয় সূর্য্য-চন্দ্র-বংশ-সমুদ্ভূত নৃপতিগণের সম-সময়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন । * মিশর দেশের প্রাচীন অধিবাসিগণ আপনাদিগকে সূর্য্য-বংশের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিত । কিন্তু সে দেশে সে সময়ে যত নৃপতি রাজত্ব করিয়াছিলেন, এ দেশে সেই সময়ে তত নৃপতির পরিচয় পাওয়া যায় না । ভারতের প্রাচীনত্ব বিষয়ে সংশয়ান্বিত হইবার ইহাই প্রধান কারণ ।” এই সংশয়-বশেই, অনেকে মিশর দেশের সভ্যতা, প্রাচীন আসিরীয় দেশের সভ্যতা এবং প্রাচীন চীনের সভ্যতা, ভারতের সভ্যতা অপেক্ষা অনেক পূর্ববর্তী বলিয়া নির্দেশ করেন । অবশ্য কর্ণেল টড্ স্পষ্ট করিয়া তাহা কিছু বলেন নাই ; পরন্তু তিনি বলিয়াছেন,—“বুধ হইতে ঐক্লব বা বুদ্ধির পর্য্যন্ত গড়ে পঞ্চান্ন জন নৃপতির বিস্ত্রমানতা স্বীকার করিয়া লইলে, এবং তাঁহাদের প্রত্যেকের রাজত্ব-কাল গড়ে কুড়ি বৎসর করিয়া ধরিলে, সর্ব্বশুদ্ধ তাঁহাদের রাজত্ব-কালের পরিমাণ এগার শত বৎসর হয় । তাহার প্রায় এগার শত বৎসর পরে, রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজত্ব-কাল । বিক্রমাদিত্য খৃষ্ট-জন্মের ছাপ্পান্ন বৎসর পূর্বে বিস্ত্রমান ছিলেন । তাহা হইলে চন্দ্রবংশের ও সূর্য্যবংশের আদিভূত রাজগণ খৃষ্ট-জন্মের ২২৫৬ বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়াছিলেন । কিন্তু তাহারই সম-সময়ে অথবা কিছু পরে, মিশর, চীন এবং আসিরীয় দেশের রাজত্ববর্গ প্রতিষ্ঠাযিত হন । মিশরের রাজা ‘মিসুরেমের’ শাসনকাল—২১৮৮ পূর্ব-খৃষ্টাব্দে ; আসিরীয় দেশের প্রতিষ্ঠা—২০৫২ পূর্ব-খৃষ্টাব্দে ; এবং চীনদেশের প্রাধাত্য—২২০৭ পূর্ব-খৃষ্টাব্দে । জলপ্লাবনের প্রায় দেড় শত বৎসর পরে, ঐ সকল দেশ প্রতিষ্ঠাযিত হইয়াছিল ।” যে বিষয়ে কর্ণেল টড্ সংশয়ান্বিত, তৎসম্বন্ধে দুইটা কথা বলি যাইতে পারে । প্রথম, তিনি যে বলিয়াছেন,—একই সূর্য্যবংশ-সমুদ্ভূত বলিয়া পরিচয় দিয়া, একই নির্দিষ্ট কালে, মিশরেই বা কি করিয়া তিন শতাধিক নৃপতির অভ্যুদয় দেখিতে পাই ; আর ভারতবর্ষেই বা কেন সেই সময়ে গড়ে মাত্র পঞ্চ-পঞ্চাশ জন নৃপতির উল্লেখ দৃষ্ট হয় ! সে আলোচনায়, পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, ভারতবর্ষের পুরাণেতিহাসে পর-পর সকল নৃপতির নাম উল্লেখ হয় নাই,—কর্শাসুসারে যেখানে বাঁহার নাম উল্লেখ করার প্রয়োজন হইয়াছে, শাস্ত্রকারগণ সেখানে তাঁহারই নাম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন মাত্র ; ধারাবাহিক বংশ-পর্য্যায় রক্ষা করিয়া, ভারতবর্ষীয় নৃপতিগণের-সকলের নাম কোথাও উল্লেখ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না । তার পর, কর্ণেল টড্ বা আধুনিক পণ্ডিতগণ কেবলমাত্র বৈবস্বত মন্বন্তরের কয়েকটা নৃপতির প্রসঙ্গ লইয়া উক্তরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন ।

* কর্ণেল টড রাজহানে লিখিয়াছেন,—“Vyasa gives but fifty-seven princes of the Solar line from Vaivaswata Manu to Ram ; and no list which has come under my observation exhibits more than fifty-eight for the same period, of the Lunar race. How different from the Egyptian priesthood, who according to Herodotus, gave a list up to that period of 330 sovereigns from their first prince, also the *Sun-born Menes* !”—See Lt. Colonel James Tod, *Rajasthan, Ch III.* [কশ্যপ-পুত্র বিবস্বান সূর্য্য, সূর্য্য-বংশের আদিভূত । এই গ্রন্থের চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদে, ৩৪১ পৃষ্ঠার ৯৯ পাংক্তিতে, ‘কশ্যপের পৌত্র বিবস্বান’ হলে ‘কশ্যপ-পুত্র বিবস্বান সূর্য্য’ ইত্যাদি পাঠ হইবে ।]

কিন্তু বৈবস্বত মন্বন্তরের পূর্বে স্বায়ত্ত্ব স্বারোচিষাদি মন্বন্তরেও কত কত নৃপতি জন্ম-গ্রহণ করিয়া দিকে দিকে আপনাদিগের প্রাধাত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তবে সে নিদর্শন মিশরের প্রাচীন ইতিহাসে যখন দেখিতে পাই না, তখন বৈবস্বত মন্বন্তরেরই কোমল এক যুগ-বিশেষে মিশর উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল,—স্বীকার করিয়া লইতে হয়। কিন্তু তাহা হইলেই বা হুই দেশের নৃপতিগণের সংখ্যার এত তারতম্য কেন? তদ্বিষয়েও বক্তব্য আছে। পুরাণসমূহ হইতে আমরা যে বংশ-লতা প্রকাশ করিয়াছি, সেই বংশ-লতায় নাম নাই, অথচ পুরাণের অন্তর্গত তাঁহাদের বিবরণ পরিকীর্তিত হইয়াছে,—এমন কত নৃপতিরই পরিচয় পাওয়া যায় না কি? বংশ-লতার কোন অংশে তাঁহাদের স্থান আছে, তাহা নির্দেশ করা যায় না বটে; কিন্তু তাঁহাদের অস্তিত্ব ও প্রাধাত্যের বিষয় কখনই উপেক্ষিত হইবার নহে। নল-দয়মন্তী, শ্রীবৎস-চিন্তা, সাবিত্রী-সত্যবান প্রভৃতির প্রসঙ্গ হিন্দুমাত্রেরই অবগত আছেন।* কিন্তু নল, শ্রীবৎস বা সত্যবান প্রভৃতির নাম বংশ-তালিকার কোন স্থান অধিকার করিয়া আছে, কে তাহা নির্ণয় করিবে? সুরথ, সমাধি, দ্যামৎসেন, ইন্দ্রহায়, সুদর্শন, প্রবসন্ধি প্রভৃতি—কত নাম করিব—নৃপতিগণের কীর্তি-কাহিনী পুরাণে উল্লেখ আছে। কিন্তু কোন পর্যায়ের কোথায় তাঁহাদের স্থান নির্দিষ্ট হইবে, কেহ বলিতে পারেন কি? তবেই বুঝা যায়,—তারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসে নৃপতিগণের বংশ-পর্যায় নিশ্চয়ই ক্রম-ভঙ্গ হইয়া আছে; আর সেই জগুই মিশর প্রভৃতির সহিত ভারতীয় প্রাচীন নৃপতিগণের সংখ্যার তারতম্য ঘটিয়াছে। তার পর, আরও এক কথা! যোগবলে, কর্মফলে, মানুষ দীর্ঘ-জীবন লাভ করে। পুরাণাদিতে দৃষ্ট হয়,—কেহ ষষ্টি সহস্র বৎসর, কেহ বহু অযুত বৎসর, কেহ লক্ষ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। স্থূল দৃষ্টিতে অসম্ভব বলিয়া মনে হওয়া আশ্চর্য্য নহে; কিন্তু এ জগতে যে অসম্ভব কিছু ছিল বা হইতে পারে, তাহা কদাচ স্বীকার করিতে প্রস্তুতি হয় না। হুই দশ বৎসরের মধ্যেই যখন দেখিতে পাই,—আজ যাহা ‘অসম্ভব’ বলিয়া মনে করিতেছি, কাল তাহা ‘সম্ভব’ হইয়া যাইতেছে; তখন দূর অতীতের—সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বের—‘সম্ভবাসম্ভব’ বিচারের কি সাধ্য আছে? তার পর, হুঁয়পুত্র ‘মেনেস’—মমুরই নামান্তর হওয়া সম্ভবপর। স্বায়ত্ত্ব মমুর পুত্র রাজা প্রিয়ব্রত যখন আপন পুত্রগণের মধ্যে পৃথিবী ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন; বর্তমান আফ্রিকা মহাদেশ বা তদন্তর্গত প্রাচীন মিশর নামান্তরে প্রিয়ব্রতের এক পুত্রের শাসনাধীনে ছিল। তবে তখনও সে দেশ ‘মিশর’ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। যদি হুঁয়পুত্র ‘মেনেসের’ বংশধরগণই মিশরের প্রতিষ্ঠাতা হন, তাহা হইলে স্বায়ত্ত্ব মন্বন্তরাদি অতি-দূর অতীতের সম্বন্ধ-তদ নির্ণয়-পক্ষে চেষ্টা না করাই শ্রেয়ঃ। সে হিসাবে বুঝা যায়, বৈবস্বত মন্বন্তরে সগর, মাক্রাতা প্রভৃতি যে সকল নৃপতি পৃথিবী জয় করিয়া আপন পুত্রগণের মধ্যে তাহা বন্টন করিয়া দিয়াছিলেন; তাঁহারাি কেহ মিশর-রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হইবেন। মিশর-রাজ্য যে হিন্দুগণের উপনিবেশ-রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের জ্ঞান-গবেষণা-প্রভাবেও এখন তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। ‘বিওজফিকাল সোসাইটীর’ প্রাণভূত

* এই গ্রন্থের অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে ‘অজ্ঞান্য নৃপতিগণের বিবরণ’-এসঙ্গে তাঁহাদের পরিচয় দ্রষ্টব্য।

কর্ণেল অলকট, মিশরের সহিত ভারতের সম্বন্ধ-তত্ত্ব-নির্ণয়-প্রসঙ্গে, বলিয়াছেন,—“আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, আট-সহস্র বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষ হইতে উপনিবেশিকগণ মিশরে গমন করিয়া সভ্যতা ও শিল্প-কলা বিস্তার করিয়াছিলেন। প্রথিত-যশা প্রত্নতত্ত্ববিৎ ‘ক্রপস্ বে’ প্রাচীন মিশরের উৎপত্তি সম্বন্ধে এই কথাই বলিয়া গিয়াছেন। বর্তমান কালে, মিশর-সম্বন্ধে তাঁহার সিদ্ধান্তই অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য। তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন,—‘ইতিহাসের স্মরণাতীত কালে এক দল ভারতবাসী স্ত্রোজ যোজক অতিক্রম করিয়া নীল-নদের তীরে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন।’ মিশর দেশের পুরাতত্ত্ব আলোচনা করিলে, বেশ বুঝিতে পারা যায়,—মিশরবাসীরা ‘পহু’ নামক যে পবিত্র দেশ হইতে নীল-নদের উপত্যকায় আসিয়া বাস করিয়াছিল, সেই পবিত্র ‘পহু’ দেশ—ভারতবর্ষ ভিন্ন অল্প কোনও দেশ হইতে পারে না। তাঁহাদের সেই ‘পহু’ দেশ, ভারত-মহাসাগরের তীরে অবস্থিত ছিল, এবং সেই দেশ হইতে তাঁহাদের দেবতারাও মিশরে আগমন করিয়াছিলেন,—এখন নানারূপেই তাহা প্রমাণিত হইতেছে।.....‘দার-এল-বাবরি’ সহরে, ‘রাণী হাসলিটপের’ মন্দিরের প্রাচীর-পাড়ে যে সাক্ষাতিক চিত্রাক্ষর দৃষ্ট হয়,—তাহাতেও ‘পহু’কে ভারতবর্ষেরই প্রদেশ-বিশেষ ভিন্ন অল্প কিছু বলা যায় না। প্রাচীন মিশরীয়গণ বহুকাল পর্যন্ত আপনাদের আদি-বাসস্থান ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য করিয়াছিল। তাহারা পছের সুব্রাজগণের যে পরিচয় দিয়া গিয়াছে, এবং সেই দেশের পত্র-পুষ্পের—বিশেষতঃ বৃক্ষাদির—যে নাম-সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছে, তাহাতে ভারতীয় সভ্যতা যে মিশরের প্রাচীন সভ্যতার মূলীভূত, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না।” * প্রত্নতত্ত্বাত্মকসিদ্ধিসু পোকক, এ বিষয়ের ষড়্‌বিধ কারণ নির্দেশ করিয়াছেন ;—“ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ এবং হিমালয়ের সন্নিহিত দেশ-সমূহ হইতে আফ্রিকায় যে উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার কয়েকটি প্রধান প্রমাণের বিষয় আমি সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি। প্রথম,—প্রাচীন মিশরের বহু প্রদেশের এবং বহু নদ-নদীর নাম-করণে—ভারতবর্ষের নদ-নদী ও প্রদেশের নাম-করণের সহিত সাদৃশ্য আছে। দ্বিতীয়,—ভারতবর্ষের অথবা ভারতের উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তের নগর ও প্রদেশের নামের সহিত, মিশরের নগরাদির নামের সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। তৃতীয়,—মিশরের শাসনকর্তৃগণের ‘রামেস’ বা ‘রামিসীস্’ আখ্যা হইতেও (স্বর্ধ্যবংশাবতংস জীরামচন্দ্রের বংশ-সমুদ্ভূত রাজত্ব-বর্গ বলিয়াও) সম্বন্ধ-তত্ত্ব বুঝিতে পারি। চতুর্থ,—সমাধি-ক্রিয়ার উপকরণাদিতে সাদৃশ্য বিদ্যমান। পঞ্চম,—স্থাপত্যের শিল্প-নৈপুণ্যে, বৃহদায়তনে এবং জাঁক-জমকে সৌসাদৃশ্য। ষষ্ঠ,—সংস্কৃতের সাহায্যে মিশর-দেশীয় কতিপয় ভাষার অনুবাদে অবিধা।” † অধিক কি,—যে ‘কর্ণেল টড’ মিশরের এবং ভারতের রাজত্ববর্গের বংশ-পর্যায় আলোচনার

* কর্ণেল অলকট এ বিষয়ে আপনাব মতব্য প্রকাশ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন,—“He (Brugsch Bey) insists that they (the Egyptians) migrated from India long before historic memory, and crossed that bridge of nations, the Isthmus of Suez, to find a new fatherland on the banks of the Nile.”

† Mr. Pococke.—*India in Greece.*

উত্তর দেশের রাজগণের সংখ্যার ভারতম্যে বিস্ময়াবিষ্ট ; ভারতবর্ষ হইতে যে আফ্রিকার বহু নগর-গ্রামের নাম সংগৃহীত হইয়াছে, 'জিনিও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত-স্থলে, তিনি বলিয়াছেন,—“গাঙ্গীয়া এবং সেনীগাল নদীর মোহানায় যে সকল নগর অবস্থিত, তন্মধ্যে অনেকেরই হিন্দু-নাম দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন,—‘তাম্ব-কুণ্ড’ (তাম্বকুণ্ড), ‘কুণ্ড’ ইত্যাদি। ‘এসিয়াটিক র্জার্ভাল’ পত্রিকায়, একজন লেখক দেখাইয়াছেন,—‘মধ্য আফ্রিকার অধিকাংশ দেশের ও অধিকাংশ স্থানের নাম সংস্কৃত-মূলক।’ সেই সকল নামের অধিকাংশেরই মূলে ভারতবর্ষের প্রভাব বিদ্যমান, তাহাতে সংশয় নাই।” * এক মিশর বলিয়া নহে,—পৃথিবীর যে দিকের প্রাচীন চিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করি না কেন, সর্বত্রই ভারতবর্ষের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত। †

সূর্য্যবংশের এবং চন্দ্রবংশের নৃপতিগণের বংশ-পর্যায় আলোচনা উপলক্ষে প্রাচীন মিশর প্রভৃতির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছি। কতকটা অবাস্তর বলিয়া মনে হইলেও তদ্বারা বুঝিতে পারা যায়,—গণনায় সে দেশের নৃপতিগণের পর্যায়-
 সূর্য্য-বংশের তদ্বারা বুঝিতে পারা যায়,—গণনায় সে দেশের নৃপতিগণের পর্যায়-
 বংশ-লতায় সংখ্যা অধিক হইলেও, প্রাচীনত্বে সে দেশ ভারতের সমতুল্য
 অসামঞ্জস্য। নহে ; পরন্তু তুলনায় তত্তদদেশের সভ্যতা আধুনিক বলিয়া প্রতিপন্ন
 হইলেও, ভারতীয় নৃপতিগণের বংশ-পর্যায়ের ক্রমভঙ্গ হেতু, সাধারণের দৃষ্টি স্বতঃই ভ্রান্তপথে প্রধাবিত হইয়া থাকে। যাহা হউক, আমরা দেখিতে পাই,—বর্তমান বৈবস্বত মন্বন্তরে ইক্ষ্বাকুই সূর্য্য-বংশীয় ক্ষত্রিয়-নৃপতিগণের আদিভূত। তাঁহার সঙ্ঘে কোনই মতান্তর নাই। তিনি অষ্ট দেশ হইতে এ দেশে আসেন নাই। যাহারা মধ্য-এসিয়া বা উত্তর-মেরু হইতে আর্য্য-হিন্দুগণের ভারতগমন-বার্ত্তা প্রচার করেন, এই ইক্ষ্বাকু এবং তৎসংশয়গণের বিবরণ পাঠ করিলেও, তাঁহাদের সে ধারণা দূর হইতে পারে। কেন-না, ইক্ষ্বাকু এই ভারতেই জন্মগ্রহণ করিয়া, এই ভারতেই প্রতিষ্ঠাধিত হইয়াছিলেন ; তাঁহা হইতেই দিকে দিকে সভ্যতা-স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল ; তাঁহার এক শত পুত্র ভিন্ন ভিন্ন দেশে রাজ্য-বিস্তার করিয়াছিলেন। ইক্ষ্বাকুর পুত্রগণ যে দেশে দেশে রাজ্য-বিস্তার করিয়াছিলেন,—তৎসঙ্ঘে কোনই মতান্তর নাই বটে ; কিন্তু তাঁহার বংশ-লতায় প্রায়ই অনৈক্য দেখিতে পাই। প্রায় সকল পুরাণেই দৃষ্ট হয়,—ইক্ষ্বাকুর জ্যেষ্ঠ পুত্র ‘বিকুক্তি’ নামে অভিহিত। কিন্তু রামায়ণে দেখি,—ইক্ষ্বাকুর পুত্রের নাম কুক্তি ; কুক্তির পুত্র বিকুক্তি। এদিকে, বিষ্ণুপুরাণে, ব্রহ্মপুরাণে, হরিবংশে, শিবপুরাণে, ঐমত্তাগবতে, দেবী-ভাগবতে, বিকুক্তিরই অপর নাম ‘শশাদ’ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তাহাতে দেখিতে পাই,—বিকুক্তির পুত্রের নাম—শকুনি ও কুরুৎস্থ। কুরুৎস্থ—অনেক স্থলেই বিকুক্তির পুত্র বলিয়া পরিচিত। কিন্তু রামায়ণে দেখি, বিকুক্তির পুত্রের নাম—বাণ। রামায়ণের বংশলতায় এ স্থলে কুরুৎস্থের নামোল্লেখ নাই ; কিন্তু পঞ্চবিংশ পর্য্যয়ে, ভগীরথ হইতে কুরুৎস্থ এবং

* Tod's Rajasthan, Vol. II,

† ভারতবর্ষের সভ্যতাই যে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের সভ্যতার আদিভূত, পরিস্ফুটভাবে তাহা আলোচনা হইবে।

কুকুৎস্থ হইতে রঘু উৎপন্ন হন,—লিখিত আছে।* আবার শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাই, বিষ্ণুষ্কির পুত্র কাকুৎস্থ নামে পরিচিত। এখন* কোন বংশলতা অভ্রান্ত, কে নির্দেশ করিবে? এ সকলের আলোচনায়, এক জনকে অপরের পুত্র না বলিয়া, তাঁহার বংশসম্বৃত বলাই শ্রেয়ঃ নহে কি? কুকুৎস্থের পুত্রের নাম—ব্রহ্মপুরাণে, বিষ্ণুপুরাণে, শ্রীমদ্ভাগবতে, হরিবংশে—‘অনেনা’; কিন্তু অগ্নিপুরাণে ‘সুযোধন’, শিবপুরাণে ‘অরিনাভ’, দেবীভাগবতে ‘কাকুৎস্থ’। যুবকর্ষপুরাণে—ইক্ষাকুর পুত্র শশাদ, এবং শশাদের পুত্র পুরঞ্জয় নামে উল্লিখিত হইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে—কাকুৎস্থ, পুরঞ্জয় বা ইন্দ্রবাহ একই ব্যক্তি বলিয়া পরিকীৰ্ত্তিত। ভিন্ন ভিন্ন পুরাণের কথাই বা বলিব কি?—এক ব্যক্তিকীর রামায়ণ-গ্রন্থের দুই স্থানে স্বর্য্যবংশের দুইরূপ বংশ-তালিকা দৃষ্ট হয়। রামায়ণের আদিকাণ্ডে, সপ্ততিতম সর্গে, বৈদেহ-জনকের নিকট মহর্ষি বসিষ্ঠ স্বর্য্যবংশ কীর্ত্তন করিতেছেন। আবার সেই বসিষ্ঠ কর্তৃকই অযোধ্যা-কাণ্ডের দশাধিক শততম সর্গে শ্রীরামচন্দ্রের নিকট সেই স্বর্য্যবংশের বিষয় বিবৃত হইতেছে। একই বসিষ্ঠের উক্তি হই স্থলে দুই রূপ বংশ-পর্য্যায় উল্লিখিত হইয়াছে। আদি-কাণ্ডে আছে,—“প্রশুশ্রক হইতে অম্বরীষ, তাঁহার পুত্র মহাব, নহষের পুত্র যযাতি, যযাতির পুত্র নাভাগ, নাভাগের পুত্র অজ, অজ হইতে দশরথ উৎপন্ন হন।” কিন্তু অযোধ্যা-কাণ্ডে দেখিতে পাই,—“প্রশুশ্রকের পুত্র অম্বরীষ, অম্বরীষের পুত্র নহব, নহবের পুত্র নাভাগ, নাভাগের দুই পুত্র—অজ ও সুব্রত।” এক রামায়ণেরই দুই স্থলে দুইরূপ! রামায়ণের সহিত অত্র পুরাণের যে অনেক অসামঞ্জস্য হইবে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায় না কি? রামায়ণে রঘুর পরবর্ত্তী ত্রয়োদশ গর্ভায়ে শ্রীরামচন্দ্র বিজ্ঞমান; তিনি নাভাগের বন্ধ-প্রপৌত্র। কিন্তু ব্রহ্মপুরাণে, দিলীপের বন্ধপ্রপৌত্র—রাম; তিনি রঘুর প্রপৌত্র, অজের পৌত্র এবং দশরথের পুত্র। বিষ্ণুপুরাণে আবার আর এক পুরুষ পরে শ্রীরামচন্দ্রের বিজ্ঞমানতা দৃষ্ট হয়। সেখানে বিষ্ণুসহের পুত্র দিলীপ, তৎপুত্র দীর্ঘবাহু, তৎপুত্র রঘু, তৎপুত্র অজ, তৎপুত্র দশরথ, তৎপুত্র রাম, ইত্যাদি। হরিবংশের সহিত ব্রহ্মপুরাণের এই অংশে মিল আছে; কিন্তু অগ্নিপুরাণে আবার দেখি,—রঘুর পুত্র দিলীপ, তৎপরে অজ, তৎপরে দীর্ঘবাহু, তৎপরে অজপান, তৎপরে দশরথ, তৎপরে রামচন্দ্র। রামায়ণে এস্থলে দিলীপের বা রঘুর কোনই নাম-গন্ধ নাই। রামায়ণে দশরথের উর্দ্ধতন ত্রয়োদশ পুরুষে রঘুর এবং শোভন পুরুষে দিলীপের অস্তিত্ব বিজ্ঞমান। সেখানে দিলীপ, অংগমানের পুত্র এবং ভগীরথের পিতা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের মতে,—খট্ভাকের পুত্র দীর্ঘবাহু, তৎপুত্র রঘু, তৎপুত্র অজ, তৎপুত্র দশরথ এবং দশরথের পুত্র শ্রীরামচন্দ্র। রামায়ণে দেখিতে পাই,—ব্রহ্মার অধস্তন চত্বারিংশ পুরুষে শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র হুং বিজ্ঞমান। ব্রহ্মপুরাণে ষষ্ঠীতম পুরুষে, বিষ্ণুপুরাণে ঊনসপ্ততিতম পুরুষে, হরিবংশে

* এত গ্রন্থের ২২২ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত বংশলতায় দিলীপের পুত্র ভগীরথ এবং ভগীরথ হইতে কুকুৎস্থ ও কুকুৎস্থ হইতে রঘু বহুদায় উদ্ভূত ছিল। কিন্তু যে রামায়ণ হইতে এই বংশলতা সংকলিত হয়, তাহাতে এই দুইটী নাম শাওরা যায় নাই। বাহা হউক, বংশলতা পাঠকালে পাঠকগণ দিলীপের পদ ভগীরথ, ভগীরথের পর কুকুৎস্থ এবং কুকুৎস্থের পর রঘু পাঠ্য করিয়া লইবেন।

অষ্টপঞ্চাশৎ পুরুষে, অগ্নি-পুরাণে ষট্‌পঞ্চাশৎ পুরুষে, শিব-পুরাণে চতুঃপঞ্চাশৎ পর্য্যায়, শ্রীমদ্ভাগবতে অষ্ট-ষষ্টিতম পর্য্যায়, বৃহদ্রথ-পুরাণে একচত্বারিংশ পর্য্যায়, শ্রীরাম-পুত্র কুশের নামোল্লেখ আছে। একই বংশের একই ব্যক্তির পর্য্যায়-সম্বন্ধে এত অসামঞ্জস্য ঘটবার কারণ আর কি হইতে পারে? প্রধান কারণ, আমাদের মনে হয়, গ্রন্থ-বিশেষে আবগ্ৰকালসারে, কাহারও কাহারও নামের উল্লেখ হয় নাই; আবার হয় তো কোথাও লিপিকার-প্রমাদে একের নাম—অন্যের স্থান অধিকার করিয়া আছে। রামায়ণের বংশ-লতায় এক জন দিলীপ এবং এক জন রঘুর নাম দৃষ্ট হয়। কিন্তু ব্রহ্ম-পুরাণে, বিষ্ণু-পুরাণে, হরিবংশে, শ্রীমদ্ভাগবতে, দুই জন করিয়া দিলীপ বিদ্যমান রহিয়াছেন; আর, হরিবংশে ও ব্রহ্মপুরাণে দুই জন করিয়া রঘুর নাম দেখিতে পাই। ঐ দিলীপ আবার সকল স্থলে সম-পর্য্যয়ে অবস্থিত নহেন। মাক্ধাতা, সগর, ভরত, হরিশ্চন্দ্র, ভগীরথ প্রভৃতি পুণ্যম্পোক নৃপতিগণের পর্য্যায়-সম্বন্ধেও এই বিশৃঙ্খলা! রামায়ণের মতে,—ব্রহ্মার পরবর্তী পঞ্চদশ পর্য্যয়ে মাক্ধাতা, অষ্টাদশে ভরত, বিংশে সগর, চতুর্বিংশে ভগীরথ। এদিকে আবার, ব্রহ্ম-পুরাণের মতে, ব্রহ্মার পরবর্তী ত্রয়োবিংশ পর্য্যয়ে মাক্ধাতা বিদ্যমান। তিনি (স্বর্ঘ্যবংশীয় কন্যা হৈমবতীর পুত্র) প্রসেনজিতের পৌত্র; তাঁহার পুত্রের নাম—পুরুকুৎস। কিন্তু রামায়ণে, মাক্ধাতা—ধুম্রুমারের (কুবলয়াশ্বের) পৌত্র; এবং তাঁহার পুত্রের নাম—সুসন্ধি। বিষ্ণুপুরাণের মতে, কুশাশ্ব-পুত্র প্রসেনজিতের পৌত্রের নাম—মাক্ধাতা। তিনি ব্রহ্মা হইতে অধস্তন চতুর্বিংশ পর্য্যয়ে অবস্থিত। হরিবংশের মতে আবার, সংহতানুসৃত প্রসেনজিৎ—মাক্ধাতার পিতামহ। মাক্ধাতার পুত্রের নাম, এতদ্ব্যতীত পুরাণে,—পুরুকুৎস ও মুচুকুন্দ। হরিবংশের মতে,—মাক্ধাতা ব্রহ্মা হইতে একবিংশ পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। এইরূপ, অন্যান্য পুরাণেও মাক্ধাতার বিষয়ে নানা অসামঞ্জস্য রহিয়াছে। অধিকাংশ পুরাণেই সগরের পিতার নাম—বাহক, বহু বা বাহু; কিন্তু রামায়ণে সগর-পিতার নাম—অসিত। তাঁহার বংশ-লতায় প্রায় সর্বত্রই অমিল আছে। সগরের পিতামহ—রামায়ণে ভরত নামে পরিচিত। কিন্তু অন্য পুরাণের বংশ-লতায় ভরতের নাম আদৌ নাই; পরন্তু সগরের পিতামহ—বৃক নামে পরিচিত। রাজা হরিশ্চন্দ্রের নাম—রামায়ণের বংশ-লতায় আদৌ দেখিতে পাই না। কিন্তু ব্রহ্মপুরাণে ঊনবিংশ পর্য্যয়ে, বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চত্রিংশ পর্য্যয়ে, হরিবংশে অষ্টাবিংশ পর্য্যয়ে, অগ্নি-পুরাণে একত্রিংশ পর্য্যয়ে, শিবপুরাণে ঊনত্রিংশ পর্য্যয়ে, শ্রীমদ্ভাগবতে ত্রয়ত্রিংশ পর্য্যয়ে, দেবী-ভাগবতে ত্রিংশ পর্য্যয়ে তাঁহাকে দেখিতে পাই। প্রায় সকল পুরাণেই তিনি সত্যব্রতের (ত্রিশঙ্কর) পুত্র বলিয়া অভিহিত; কিন্তু অগ্নি-পুরাণে, তাঁহার পিতার নাম—সত্যরথ; এবং সত্যব্রত তাঁহার পিতামহ। ভগীরথ,—দিলীপের (খট্টাদের) পুত্র বলিয়াই সর্বত্র পরিচিত। রামায়ণে চতুর্বিংশ পর্য্যয়ে, ব্রহ্মপুরাণে দ্বিচত্বারিংশ পর্য্যয়ে বিষ্ণুপুরাণে সপ্তচত্বারিংশ পর্য্যয়ে, হরিবংশে পঞ্চচত্বারিংশ পর্য্যয়ে, অগ্নিপুরাণে ঊন-চত্বারিংশ পর্য্যয়ে, শিবপুরাণে সপ্তত্রিংশ পর্য্যয়ে, শ্রীমদ্ভাগবতে ষট্‌-চত্বারিংশ পর্য্যয়ে এবং বৃহদ্রথ-পুরাণে চতুর্বিংশ পর্য্যয়ে তাঁহার বিদ্যমানতা দেখিতে পাই। তাঁহার পুত্রের

নাম, অধিকাংশ পুরাণের মতে, শ্রুত (শ্রুতসেন) । কিন্তু রামায়ণে তাঁহার পুত্রের নাম—
কুব্জুংহ ; এবং অগ্নিপু্রাণে তাঁহার পুত্র ‘নাভাগ’ নামে প্রসিদ্ধ । নাভাগ, অম্বরীষ, নহব—এই
তিন নৃপতির পর্যায়, বংশ-লতার কত রূপান্তরেই স্থান পাইয়া আছে ! রামায়ণে দেখি,—
বংশবধের পিতামহ নাভাগ, প্রপিতামহ নহব, আর বৃদ্ধপ্রপিতামহ অম্বরীষ । ব্রহ্ম-পুরাণে
এই নাভাগ ও অম্বরীষের নাম দুই স্থলে দৃষ্ট হয় । দুই স্থলেই নাভাগের পুত্র
অম্বরীষ নামে পরিচিত । প্রথমতঃ,—বৈবস্বত মনুর পুত্রের নাম নাভাগ, তৎপুত্র অম্বরীষ ।
দ্বিতীয়তঃ, ভগীরথের পৌত্র নাভাগ, তৎপুত্র অম্বরীষ । বিষ্ণুপুরাণে আবার, প্রথমে
আছে—মনু-পুত্রের নাম নাভাগ, তাঁহার পুত্র নাভাগ, তৎপুত্র অম্বরীষ । অপিচ, বিষ্ণু-
পুরাণে ভগীরথের পৌত্র ও প্রপৌত্র যথাক্রমে নাভাগ ও অম্বরীষ নামেও অভিহিত ।
শিবপুরাণ এবং হরিবংশ এ বিষয়ে ব্রহ্মপুরাণেরই অনুসারী । শ্রীমদ্ভাগবতের সহিত
বিষ্ণুপুরাণের প্রথম অংশে অভিন্নতা দৃষ্ট হয় বটে ; কিন্তু শেষাংশে সম্পূর্ণ অসামঞ্জস্য ।
সেখানে ভগীরথের পৌত্রের নাম—নাভাগ ; তাঁহার পুত্র—সিদ্ধদীপ । অগ্নিপু্রাণে আবার
বৈবস্বত মনুর পুত্র নাভাগের অম্বরীষ নামক পুত্রের উল্লেখ নাই । সেখানে মনু-পুত্র
বৃষ্টের বংশে অম্বরীষের উৎপত্তি, এবং ভগীরথের পুত্র ও প্রপৌত্র পর্য্যায়ে যথাক্রমে
নাভাগ ও অম্বরীষ বিস্তারিত । কোন্ বিষয়টির উল্লেখ করিব ? যে বংশের যে নামটির
বিষয় উল্লেখ করি না কেন, তাহাতেই এক পুরাণের সহিত অন্য পুরাণের অনৈক্য
দেখিতে পাই । কয়েক পৃষ্ঠার বংশ-লতা (২৯২ পৃষ্ঠা হইতে ৩০৩ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত) মিলাইয়া
দেখিলেই যে কেহ এ অসামঞ্জস্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন ।

মনুর স্যেষ্ঠ পুত্র ইক্ষাকুর বংশ-লতা সধ্বন্ধেই এই অসামঞ্জস্য ! তাঁহার অষ্টাশ
পুত্রগণের বংশ-পর্য্যায় বিষয়ে আরও যে কত অসামঞ্জস্য রহিয়াছে, তাহার নির্ণয় করা
দুঃসাধ্য । রামায়ণে প্রধানতঃ মনু-পুত্র ইক্ষাকুর বংশ-বিবরণ উল্লিখিত
অষ্টাশ
বনু-পুত্রের বংশে । হইয়াছে । কিন্তু পুরাণ-সমূহে মনুর অপরাপর পুত্রের বিষয়ও প্রসঙ্গতঃ
আলোচনা দেখিতে পাই । শ্রীমদ্ভাগবতে মনু-পুত্র দিষ্টের নাম দৃষ্ট হয় ।

তাহাতে তাঁহার বংশের একটি দীর্ঘ পর্য্যায় প্রকটিত আছে । কিন্তু অন্য কোনও পুরাণে
দিষ্টের নাম আদৌ উল্লেখ নাই । তবে, বিষ্ণুপুরাণে নেদিষ্ট-বংশের উল্লেখ আছে, এবং
সে বংশের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের দিষ্ট-বংশের বংশ-লতার অনেকটা মিল দেখিতে পাওয়া
যায় । কিন্তু সে দুই বংশ-লতারও অনেক অসামঞ্জস্য আছে ! এই বংশের মরুত নামক প্রসিদ্ধ
নরপতির নাম—বিষ্ণুপুরাণে অষ্টাদশ পর্য্যায় এবং শ্রীমদ্ভাগবতে বিংশ পর্য্যায় দৃষ্ট হয় ।
কিন্তু তাঁহার পূর্ব-পুরুষগণের নামে, উভয় পুরাণে, যোর পার্থক্য ! প্রথমতঃ, দিষ্টের
পরবর্তী চতুর্থ পুরুষ, শ্রীমদ্ভাগবতে, বৎসপ্রীতি আছেন ; বিষ্ণুপুরাণে—দিষ্টের পরবর্তী
চতুর্থ পুরুষ প্রাংগু আছেন ; শ্রীমদ্ভাগবতের মতে, বৎসপ্রীতির পুত্র — প্রাংগু । তৎপরেও
অনৈক্য ! বিষ্ণুপুরাণে, প্রাংগুর পর, যথাক্রমে — প্রজানি, জুপ, বিবিশ্ব, ধনিনেত্র,
করুদম, অরাকি, বরুদ, নরিত্ত, দম প্রভৃতির নাম আছে । কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে প্রাংগুর
পর যথাক্রমে—প্রমিতি, শমিত্ত, চাকুস, বিবিশ্বতি, রক্ত, ধনীনেত্র, করুদম, অবাকিৎ,

মরুত, দম প্রভৃতির নাম দৃষ্ট হয়। এই দিষ্ট (নেদিষ্ট) বংশের অষ্টাবিংশ (মতান্তরে ঊনবিংশ) পর্যায়-ভুক্ত তৃণবিন্দের বিশাল প্রকৃতি পুত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। রামায়ণে আদিকাণ্ডে সপ্তচত্বারিংশ সর্গেও এই বিশাল-বংশের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু এই বংশ-সম্বন্ধেও রামায়ণ, শ্রীমদ্ভাগবত এবং বিষ্ণু-পুরাণ প্রভৃতির পরস্পর অনৈক্য। রামায়ণে, বিশাল-বংশের বংশ-পর্যায় যথাক্রমে এইরূপ,—বিশাল, হেমচন্দ্র, সুচন্দ্র, ধ্রুবাধ, স্তম্ভয়, সহদেব, কুশাধ, সোমদত্ত, কাকুৎস্থ, স্তম্ভতি। এ হিসাবে, বিশাল হইতে স্তম্ভতি দশম পুরুষে অবস্থিত। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে বিশাল হইতে স্তম্ভতি সপ্তম পুরুষে বিদ্যমান। বিষ্ণুপুরাণের সহিত পর্য্যয়ে অনৈক্য না থাকিলেও, নামের অনৈক্য সম্পূর্ণরূপে রহিয়া গিয়াছে। মনু-পুত্রগণের নাম-বিষয়েও পুরাণ-সমূহে নানা মতান্তর।^১ কোনও কোনও স্থলে, এক-পুরাণে যিনি পুত্র বলিয়া অভিহিত, অপর পুরাণে তিনিই আবার পৌত্র বা প্রপৌত্র বলিয়া পরিচিত।

ইক্ষাকু-পুত্র নিমির নাম এবং বংশ-বিবরণ কেবল বিষ্ণুপুরাণে ও শ্রীমদ্ভাগবতে দৃষ্ট হয়। রামায়ণের আদিকাণ্ডে, একসপ্ততিতম অধ্যায়ে, তাঁহার বংশ-পর্যায় বিবৃত আছে। নিমি—

ইক্ষাকু-পুত্রগণের মধ্যে দ্বাদশ স্থান অধিকার করিয়া আছেন। বিষ্ণুপুরাণ

মৈথিল-বংশ। ও শ্রীমদ্ভাগবতের বংশ-লতার সহিত রামায়ণের বংশ-লতার অনেক স্থলে

অনৈক্য দৃষ্ট হয়। বিষ্ণুপুরাণে ও শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে,—

নিমির পুত্র জনক, এবং তাঁহারই অন্য নাম—বৈদেহ বা মিথি। কিন্তু রামায়ণে লিখিত আছে,—নিমির পুত্রের নাম মিথি, এবং মিথির পুত্রের নাম জনক। জনকের পুত্রের নাম উদাবস্তু—শ্রীমদ্ভাগবতে এবং রামায়ণে দৃষ্ট হয়। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে সেস্থলে ‘নন্দীবর্জক’ নাম লিখিত আছে। অথচ, রামায়ণে ও শ্রীমদ্ভাগবতে, নন্দীবর্জক—উদাবস্তুর পুত্র বলিয়া পরিচিত। তৎপরে, কোনটার সহিত রামায়ণে এবং বিষ্ণুপুরাণে মিল আছে; আবার কোনটার সহিত রামায়ণে এবং শ্রীমদ্ভাগবতে মিল রহিয়াছে। রামায়ণোক্ত নিমির বংশলতা নিয়ে প্রদত্ত হইল। শ্রীমদ্ভাগবতের এবং বিষ্ণুপুরাণের বংশলতার (এই গ্রন্থের ২২৪ এবং ৩০২ পৃষ্ঠার) সহিত মিলাইয়া দেখিলেই পার্থক্য অল্পভূত হইবে। রামায়ণে নিমির বংশলতা,—

১। নিমি	দেবরাত	মরু	কীর্তিরাত	
মিথি	বৃহজ্জথ	প্রতীক্ষক	মহারোমা	
জনক	মহাবীর	কীর্তিরথ	অর্ণরোমা	
উদাবস্তু	স্তম্ভতি	দেববীড়	ব্রহ্মরোমা	
নন্দীবর্জক	ধৃষ্টকেতু	বিবুধ		
হকেতু	হর্ষাধ	মহীপ্রক	সীরধ্বজ	কুশলজ
			জনক	

পুরাণ-সমূহের মতে, ‘সীরধ্বজই’ জনক নামে অভিহিত। কিন্তু রামায়ণে দেখা যায়,—

১—জনকের পূর্ব-পুরুষ; তিনি সীতার পিতামহ। রামায়ণে ও হরিবংশে,

সীরধ্বজের ভ্রাতার নাম কুশধ্বজ। কিন্তু ত্রীমত্যাগবতে, সীরধ্বজের পুত্র কুশ নামে অভিহিত; তিনি সীতার কনিষ্ঠ পর্যায়ভুক্ত। সর্বত্রই অসামঞ্জস্য। যে দিকেই দেখি, এই অনৈক্য পূর্ণ-মাত্রায় পরিদৃশ্যমান।

সূর্য্যবংশের বংশ-লতা অপেক্ষা চন্দ্রবংশের বংশ-লতায় অসামঞ্জস্য আবার আরও অধিক। বৈবস্বত মনুর কন্যা ইলার গর্ভে যে পুরুষবা জন্মগ্রহণ করেন, পূর্বেই বলিয়াছি, তিনি চন্দ্রবংশের আদি বৃধের পুত্র—কি চন্দ্রের পুত্র, তদ্বিশেষেই মতান্তর আছে। তবে, পুরাণ-ইলার সমুদ্র আলোড়ন করিয়া, আমরা তাঁহাকে চন্দ্রের পৌত্র ও বৃধের পুত্র অলৌকিকরূপে। বলিয়াই নির্দেশ করিয়াছি। যাহা হউক, পুরুষবার জননী ইলার সম্বন্ধে আরও যে অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে, তাহা সৰ্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর। পুরাণে প্রকাশ,—ইলার পুংস্ব ও জীৱ দুই-ই সংঘটিত হইয়াছিল। সূর্য্য-পুত্র মনু নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁহার সন্তান-লাভার্থ ভগবান বসিষ্ঠ ‘মিত্রাবরুণ’-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। মনুর পত্নী শ্রদ্ধা সেই যজ্ঞে মনে মনে কন্যা-লাভের প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এদিকে পুত্র-সন্তান লাভের জন্ত মনুর প্রার্থনা ছিল। এইরূপে, হোতার ব্যতিচারে, যজ্ঞের ফলে, ইলা-নায়ী কন্যা জন্মগ্রহণ করে। মনু তখন ক্ষুব্ধ হইয়া বসিষ্ঠের নিকট কারণ জিজ্ঞাসা করেন। ‘হোতার ব্যতিচারে এরূপ ঘটিয়াছে’—বলিয়া, বসিষ্ঠ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলেন,—“আমি স্বীয় ভেজে তোমাকে পুত্রবান্ করিব।” ইহার পর, বসিষ্ঠের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া, ভগবান ত্রীহরি তাঁহাকে বর-প্রদান করেন। সেই বরে মনু-কন্যা ইলা, পুরুষ-রূপে পরিবর্তিত হন। সেই পুরুষ—‘সুহ্যায়’ নামে পরিচিত। বীর সুহ্যায় একদা মৃগয়ার্থ সৈন্ধব (সিঙ্গ) দেশীয় অশ্বে আরোহণ করিয়া, মেরুর অধঃস্থিত হরপার্বতীর বিহার-স্থান ‘সুকুমার’ বনে গমন করিয়াছিলেন। সেই বনে কেহ গমন করিলে, আপনা-আপনিই জীৱ প্রাপ্ত হইত। পুরাকালে গিরিশের দর্শন-লালসায় কতিপয় ঋষি ঐ বনে গমন করিয়াছিলেন। সে সময় অধিকা বিবসনা ছিলেন। সহসা ঋষিগণের সেই বনে আগমনে, তিনি সঙ্কুচিতা ও লজ্জিতা হইয়া অনুযোগ করেন। সেই হইতে মহাদেব নির্দেশ করিয়া দেন,—‘এই বনে যে পুরুষ প্রবেশ করিবে, সেই জীৱ প্রাপ্ত হইবে।’ সুহ্যায় ও তাঁহার ষোটক ঐ বনে প্রবেশ করায়, উভয়েই জীৱ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে বৃধের সহিত তাঁহার মিলন হয়। সেই মিলনেই পুরুষবার উৎপত্তি। ইহার পর, বসিষ্ঠের উপদেশে, মহাদেবের অনুকম্পায়, সুহ্যায় আবার পুংস্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ভগবান শঙ্কর ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন,—‘সুহ্যায় এক মাস পুরুষ ও এক মাস জীৱ থাকিবেন।’ * প্রতিষ্ঠান্ দেশে সুহ্যায় রাজত্ব করিতেন। উৎকল, গয় ও বিমল নামে তাঁহার তিন পুত্র দক্ষিণাপথ দেশের রাজা হইয়াছিলেন। পুরুষবা পৃথিবীপতি হন। রামায়ণে আবার ইলার কাহিনী অন্তরূপে পরিবর্তিত। রামায়ণে সুহ্যায় নাম নাই। কদম প্রজাপতির পুত্র ‘ইল’ বাহ্লীক (বাহ্লী) দেশের রাজা ছিলেন। যুগয়ায় গিয়া, মহাদেবের ইচ্ছানুসারে, তিনি জীৱ

* ইলা ও সুহ্যায়ের এই অলৌকিক বিবরণ,—ত্রীমত্যাগবত, নবম স্কন্ধ, প্রথম অধ্যায়; দেবীভাগবত, প্রথম স্কন্ধ, বাণন অধ্যায়; বিষ্ণুপুরাণ, চতুর্থ স্কন্ধ, প্রথম অধ্যায় প্রভৃতিতে দ্রষ্টব্য।

প্রাপ্ত হন। সেই সময় তাঁহার পুত্র পুরুরবার জন্ম হয়। বে ইলা হইতে চন্দ্রবংশের উদ্ভব, সেই ইলার ইতিহাসই এইরূপ অলৌকিক রহস্যপূর্ণ! তাঁহার পরবর্তী বংশধরগণের বিবরণ কিরূপ জটিলতা-সম্বল, ইহাতেই তাহার আভাস পাওয়া যায়। সুদৃশ্য (ইলা) বৃদ্ধ হইয়া বনে গমন করিলে, মনু শত বৎসর যমুনা-তীরে তপস্বী করিয়া, পুত্র-লাভের কামনায় যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তাহাতেই তাঁহার ইচ্ছাকু প্রভৃতি শত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

ইলার পুত্র পুরুরবার সম্ভানগণের নাম-সম্বন্ধে সকল পুরাণে সামঞ্জস্য নাই। মহাভারতে, এক আয়ু-বংশের বিবরণ লিখিত হইয়াছে। হরিবংশে এবং বিষ্ণুপুরাণে আরু তিন অমাবসুর বংশেরও পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে অমাবসুর নাম নাই; সেখানে বিজয়ের বংশ বিস্তারিত;—আর সেই বিজয়ের বংশের সহিত, হরিবংশ বা বিষ্ণুপুরাণোক্ত অমাবসুর বংশের অনেক মিল রহিয়া গিয়াছে।

চন্দ্র-বংশ
যোর অনৈক্য।

অমাবসুর অপর নাম বে বিজয় ছিল, সে পরিচয় কোথায়ও পাওয়া যায় না। অথচ, এক পুরাণে যাহা অমাবসুর বংশ বলিয়া অভিহিত, অন্য পুরাণে তাহা বিজয়ের বংশ বলিয়া পরিকীর্তিত। প্রথমেই এই গণ্ডগোল! পুরুরবার অধস্তন তৃতীয় পুরুষে এ গণ্ডগোল আরও বাড়িয়া গিয়াছে। সকল পুরাণই প্রধানতঃ পুরুরবার পৌত্র নহষের বংশ লইয়া বিস্তৃত-ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে এবং শ্রীমদ্ভাগবতে নহষের কনিষ্ঠ ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশ-বিস্তার দেখিতে পাই। অথচ, মহাভারতে ও হরিবংশে, সে ক্ষত্রবৃদ্ধের নাম পর্ণাস্ত উল্লেখ নাই। কিন্তু মহাভারত এবং হরিবংশে বৃদ্ধশর্মা নামে নহষের এক ভ্রাতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ও ক্ষত্রবৃদ্ধ এক ব্যক্তি কি না তাহা বুঝিবার উপায় নাই; কারণ, বৃদ্ধশর্মার পরবর্তী বংশের কোনই পরিচয় দেখিতে পাই না। যযাতির পাঁচ পুত্র (যতু, তুর্বসু, দ্রুহা, অণু ও পুরু) সম্বন্ধে কোথাও অনৈক্য নাই। কিন্তু পুরুর পুত্র ও তাঁহার পরবর্তী বংশধরগণ সম্বন্ধে প্রায় সর্বত্রই অসামঞ্জস্য। মহাভারতে, পুরুর পুত্রের নাম—রৌদ্রাব। হরিবংশে পুরুর অধস্তন অষ্টম পুরুষে, বিষ্ণুপুরাণে অধস্তন নবম পুরুষে, শ্রীমদ্ভাগবতে অধস্তন দশম পুরুষে, ব্রহ্মপুরাণে অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষে, রৌদ্রাব নাম বিস্তারিত। এদিকে আবার, অগ্নিপুরাণে রৌদ্রাব নামে পুরুর কোনও বংশধরের পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে পুরুর অধস্তন নবম পুরুষে ভদ্রাধ নাম দৃষ্ট হয়। তিনি এবং রৌদ্রাব একই ব্যক্তি হওয়া সম্ভবপর; কিন্তু তাঁহাদের পুত্রের নামে বা বংশ-পরিচয়ে সর্বত্র মিল দেখিতে পাই না। মহাভারতে রৌদ্রাবের অধস্তন পাঁচ পুরুষের নাম—অনপভাহু, ঋচেয় (অনারুষ্টি), মতিনার, তংসু এবং দ্বৈলিন; বিষ্ণুপুরাণে—ঋতেয়ু, রস্তিনার, তংসু, ঐনিল, দ্বয়ন্ত; শ্রীমদ্ভাগবতে—ঋতেয়ু, রস্তিনার, স্মৃতি, রেতি, দ্বয়ন্ত; ব্রহ্মপুরাণে—ঋচেয়ু, মতিনার, তংসু, ধর্ম্মনেত্র, দ্বয়ন্ত; হরিবংশে—ঋচেয়ু, মতিনার, তংসু, সুরোধ, দ্বয়ন্ত। কিন্তু অগ্নিপুরাণের তদ্রাধ-বংশে—মতিনার, তংসুরোধ, দ্বয়ন্ত, ভরত, বিতথ। দ্বয়ন্ত-পুত্র ভরত, মহাভারতে চতুর্দশ পর্য্যয়ে, হরিবংশে ত্রয়োবিংশ পর্য্যয়ে, বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চবিংশ পর্য্যয়ে, শ্রীমদ্ভাগবতে ষড়বিংশ পর্য্যয়ে, অগ্নিপুরাণে ত্রয়োবিংশ পর্য্যয়ে এবং ব্রহ্মপুরাণে একবিংশ পর্য্যয়ে অবস্থিত। তার পর, ভরতের পুত্র-সম্বন্ধেও যোর অনৈক্য! মহাভারতে ভরতের পুত্রের নাম

ভূমত্ম্য, হরিবংশে বিতথ, বিষ্ণুপুরাণে ভরদ্বাজ, শ্রীমদ্ভাগবতে বিতথ (ভরদ্বাজ), অগ্নিপুরাণে ও ব্রহ্মপুরাণে বিতথ । ভরতের পৌত্র-সম্বন্ধেও মতভেদ । মহাভারতে, হরিবংশে ও অগ্নিপুরাণে তাঁহার পুত্রের নাম—সুহোত্র ; শ্রীমদ্ভাগবতে মত্ম্য, ব্রহ্মপুরাণে সুহোত্র । ব্রহ্মপুরাণে সুহোত্র নামেও ভরতের এক পৌত্র আছেন বটে ; কিন্তু তাঁহার পরবর্তী বংশ-পরিচয় কিছুই নাই । মহাভারতে সুহোত্রের পুত্র অজমীঢ় প্রভৃতি । হরিবংশে, অগ্নিপুরাণে, ব্রহ্মপুরাণে এবং বিষ্ণুপুরাণে তাঁহার পৌত্র বলিয়া পরিচিত বটেন ; কিন্তু তাঁহাদের পিতার নামে মিল নাই । এদিকে আবার, শ্রীমদ্ভাগবতে অজমীঢ় প্রভৃতি মত্ম্যর প্রপৌত্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন । ফলতঃ, অজমীঢ়াদির পিতার নাম—কোথাও সুহোত্র, কোথাও হুহং, কোথাও বা হস্তী । হস্তিনাপুর প্রতিষ্ঠাতা হস্তীর নাম—মহাভারতের এ বংশ-পর্য্যয়ে অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না ; পরন্তু, দ্বাবিংশ-পর্য্যায়ভুক্ত জনমেজয়-পুত্র ধৃতরাষ্ট্রের হস্তী নামক এক পুত্র দেখিতে পাই ; তিনি অপুত্রক বলিয়াই বুঝা যায় । ঋক—প্রায় সকল পুরাণেই অজমীঢ়ের পুত্র বলিয়া পরিচিত ; কিন্তু ব্রহ্মপুরাণে তিনি অজমীঢ়ের কনিষ্ঠ-পর্য্যায়ভুক্ত । ঋকের পরবর্তী দুই পুরুষ সম্বন্ধে সকল পুরাণই এক মত ; ঋক-পুত্র সংবরণ এবং সংবরণ-পুত্র কুরু (কুরুক্ষেত্র-প্রতিষ্ঠাতা)—এ বিষয়ে প্রায় কোথাও মতভেদ নাই । কুরুর পরবর্তী যে বংশ-পর্য্যায়, তাহাতে কিন্তু আবার গুণগোল উপস্থিত । মহাভারতে দেখিতে পাই,—কুরু-পুত্র জনমেজয়ের বংশে, অধস্তন সপ্তবিংশ পর্য্যয়ে, ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু প্রভৃতি বিদ্যমান ; হরিবংশের মতে,—কুরু-পুত্র সুধমার বংশে, ষট্‌ত্রিংশ পর্য্যয়ে, ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু প্রভৃতি রহিয়াছেন ; বিষ্ণুপুরাণের মতে,—কুরু-পুত্র জহুর বংশে, পঞ্চাশৎ পর্য্যয়ে, ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু প্রভৃতি অবস্থিত ; শ্রীমদ্ভাগবতের মতে,—কুরু-পুত্র জহুর বংশে, ঊনপঞ্চাশ পর্য্যয়ে এবং ব্রহ্মপুরাণ ও অগ্নি-পুরাণের মতে, কুরু-পুত্র পরীক্ষিতের বংশে, যথাক্রমে সপ্তত্রিংশ ও ঊনচত্বারিংশ পর্য্যয়ে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু প্রভৃতি বর্তমান । এদিকে আবার, ধৃতরাষ্ট্র এবং পাণ্ডুর নাম মহাভারতে দুই বার দেখিতে পাওয়া যায় ; প্রথম—দ্বাবিংশ পর্য্যয়ে ; দ্বিতীয়—সপ্তবিংশ পর্য্যয়ে । মহাভারতোক্ত দ্বাবিংশ পর্য্যায়ভুক্ত ধৃতরাষ্ট্রের পৌত্র (তাঁহার কোন্ পুত্রের পুত্র—তাহার উল্লেখ নাই) প্রতীপ হইতে পর্য্যায়ক্রমে শান্তনু, বিচিত্রবীৰ্য্য ও ধৃতরাষ্ট্রাদির নাম দৃষ্ট হয় । কিন্তু হরিবংশে উপরিচর বন্সুর কন্যা সত্যবতী হইতে বিচিত্রবীৰ্য্য প্রভৃতির উৎপত্তি-বিবরণ লিখিত আছে । তবে হরিবংশে কুরুর পরীক্ষিত-নামা পুত্রের বংশ-লতা আলোচনা করিলে জানা যায়,—শান্তনু, পরীক্ষিতের চতুর্থ পর্য্যয়ে অবস্থিত ; তিনি জনমেজয়ের প্রপৌত্র ; তাঁহার পিতামহের নাম—ভীমসেন । উপরিচর বন্সুর কন্যা সত্যবতীকে তিনিই বিবাহ করেন । উপরিচর বন্সু—কুরু-বংশের কোন্ পর্য্যয়ে অবস্থিত, মহাভারতের বংশ-লতা আলোচনায় তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য । মহাভারতের আদিপর্কে, ত্রিষষ্ঠিতম অধ্যায়ে, উপরিচর পৌরব-নন্দন বলিয়া উক্ত হইয়াছেন । তাঁহার অপর নাম—বন্সু । ব্রহ্মপুরাণের এবং হরিবংশের মতে,—তিনি কুরু-পুত্র সুধমার বংশে যথাক্রমে একত্রিংশ এবং ত্রয়োবিংশ পর্য্যয়ে ; বিষ্ণুপুরাণের এবং শ্রীমদ্ভাগবতের মতে, কুরু-পুত্র সুধমার বংশে, ঊনচত্বারিংশ পর্য্যয়ে বিদ্যমান । অগ্নি-পুরাণে কুরু-বংশের বংশলতায় উপরিচর বন্সুর নাম সন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না । মতান্তরে

দৃষ্ট হয়,—এই উপরিচর বসু হইতেই মহাত্মারতের আরম্ভ। কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধেই এত বিন্দুশ! উপরিচর বসুর পুত্র-কন্যা-সম্বন্ধে অজ্ঞাত পুরাণাদির সহিত মহাত্মারতের অনেক অনৈক্য আছে। উপরিচর বসু—চেদিদেশ অধিকার করিয়াছিলেন। ক্ষত্রিয়-নৃপতিগণের মধ্যে তাঁহার বলবীৰ্য্যের প্রসিদ্ধি ছিল। কিন্তু তিনি ক্ষাত্র্য-ধৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, ব্রাহ্মণের স্থায় উগ্র-তপস্শ্রায় প্রবৃত্ত হন। সে তপস্শ্রায় তিনি ইন্দ্র লাভ করিতে পারেন—আশঙ্কা করিয়া, দেবগণ সান্ত্বনা-বাক্য দ্বারা তাঁহাকে তপস্শ্রায় প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলেন। সেই ক্ষত্রে তিনি দেবতাগণের নিকট হইতে দেবভোগ্য আকাশগামী ক্ষটিকময় মহৎ বিমান এবং অগ্নান-পক্ষজা বৈজয়ন্তী মালা লাভ করেন। সে মালা ধারণ-পূর্ব্বক যুদ্ধ-স্থলে উপস্থিত হইলে, তাঁহার শরীরে অস্ত্র প্রবেশ করিতে পারিবে না, এবং সেই দেবদত্ত-বিমানে আরোহণ করিয়া, তিনি আকাশে যথেষ্টভাবে বিচরণ করিতে পারিবেন;—তপস্শ্রায় ফলে, বসু রাজা এই বর প্রাপ্ত হন। দেবদত্ত-বিমানে আরোহণ করিয়া, ‘উপরে বিচরণ’ করিতে পারিতেন বলিয়া, বসু রাজা ‘উপরিচর’ বসু নামে অভিহিত হন। * তাঁহার কন্যা সত্যবতীর (যাঁহা হইতে বেদব্যাস ও ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির উৎপত্তি) ইতিহাস আবার আরও অলৌকিকত্ব-পূর্ণ। সে ইতিহাস এই,—অদ্রিকা-নারী এক অপ্সরা মৎস্তরূপা হইয়া যমুনা-জলে অবস্থিতি করিতেছিল। তাহারই গর্ভে সত্যবতীর উৎপত্তি। সত্যবতীর অপর নাম—মৎস্তগন্ধা। পরাশরের অম্বগ্রহে তিনি ‘গন্ধবতী’ এবং ‘যোজনগন্ধা’ আখ্যা প্রাপ্ত হন। ধীবর-রাজ তাঁহাকে পালন করিয়াছিলেন। শান্তনুর সহিত বিবাহের পূর্বে, সত্যবতীর গর্ভে বেদব্যাসের উৎপত্তি হয়। স্বীপে প্রস্থত হওয়ায়, বেদব্যাস—বৈপায়ন নামে; এবং তিনি ঘোর ক্লমবর্ণ ছিলেন বলিয়া ‘ক্লম-বৈপায়ন’ নামে অভিহিত হন। † ধার্ম্মরাষ্ট্র ও পাণ্ডবগণের বংশাবলী বিষয়ে অধিক কিছু বলা বাহুল্য। বংশ-লতা পর্য্যালোচনা করিলে, স্বতঃই সে পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

যহু-বংশের ধারাবাহিক বংশ-লতা মহাত্মারত দেখিতে পাই না। হরিবংশে, বিষ্ণুপুরাণে, ত্রীমঙ্গাগবতে, অগ্নিপু্রাণে এবং ব্রহ্মপুরাণে কোথাও যহুর চারি পুত্রের, কোথাও বা পাঁচ পুত্রের নাম আছে। কিন্তু প্রধানতঃ তাঁহার দুই পুত্রের পরবর্তী বংশ-পর্যায় দৃষ্ট হয়। সে দুই পুত্রের নাম—সহস্রদ (সহস্রজিৎ), ক্রোষ্টা (ক্রোষ্টু)। অগ্নিপু্রাণে সহস্রজিৎের বংশ নাই; কিন্তু ত্রীমঙ্গাগবতে এবং বিষ্ণু-পুরাণে সহস্রজিৎের পুত্রের নাম—শতাজিৎ; তৎপুত্র হৈহয়। ঐ দুই পুরাণে শতাজিৎের আরও দুই পুত্রের নাম লিখিত আছে বটে; কিন্তু তাঁহাদের নামেও অনৈক্য, এবং বংশেরও কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। হরিবংশে এবং ব্রহ্মপুরাণে হৈহয়—সহস্রদের পুত্র-মধ্যে পরিগণিত। হৈহয়ের পুত্রের নাম—ধৰ্ম্মনেত্র। এ বিষয়ে হরিবংশ.

+ মহাত্মারত, আদি-পর্ক, দ্বিবর্ষীতর অধ্যায়ে, উপরিচর বসুর বিবরণ এবং সত্যবতীর অলৌকিক জন্ম কাহিনী দ্রষ্টব্য।

* ব্রহ্মপুরাণে উপরিচর বসুর অস্তরূপ পরিচয় লিখিত আছে,—‘যহুধার পুত্র সুহোত্র; তৎপুত্র জম্বন চ্যবনের পুত্র কৃতবঙ্ক। তিনি পুত্রেরি বক্ষ্য করিয়া উপরিচর বসু নামে এক আকাশচর ব্রহ্মকায় করে। ঐ পুত্র ইন্দ্রের সখা হইয়াছিলেন। মৎসাবধিগতি ব্রহ্মদত্ত—উপরিচর বসুর পুত্র।’

বিষ্ণুপুরাণ এবং ব্রহ্মপুরাণ এক মত; কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের মতে,—হৈহয়ের পুত্র ধর্ম এবং ধর্মের পুত্র নেত্র। ব্রহ্মপুরাণে এবং হরিবংশে ধর্মনেত্রের পুত্রের নাম—কার্ত্ত, কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে কুন্তি। শ্রীমদ্ভাগবতে নেত্রের পুত্রও কুন্তি। কার্ত্তবীৰ্য্যকুন্—এই বংশ-পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু তিনি হরিবংশে ও অগ্নিপুরাণে বিংশ পর্য্যায়ের, বিষ্ণুপুরাণে ও শ্রীমদ্ভাগবতে ষাটবংশ পর্য্যায়ের এবং ব্রহ্মপুরাণে ঊনবিংশ পর্য্যায়ের বিস্তারিত। এই বংশের বংশ-লতায় আর আর যে অসামঞ্জস্য আছে, বংশ-লতার প্রতি সামান্য দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা উপলব্ধি হইবে। তার পর—যদু-পুত্র ক্রোষ্ট্র (ক্রোষ্ট্রী)। ক্রোষ্ট্রের বংশ বিশেষ বিখ্যাত। হরিবংশে দেখিতে পাই, ক্রোষ্ট্রের তিন পুত্র;—অনমিত্র, যুধামিত্র, দেবমীচুৰ। হরিবংশে, প্রসেন ও সত্রাজিৎ,—অনমিত্রের পৌত্র বলিয়া পরিচিত। এদিকে আবার, তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র যুধামিত্রের বংশে, পরবর্তী পঞ্চম পুরুষে, যুধামান ও সাত্যকি বিস্তারিত। অক্রুরের পিতা ঋক্ক সঙ্ঘকেও এই স্থলে যোর গণ্যগোল। শ্রীমদ্ভাগবতের মতে,—অনমিত্রের ঋক্ক নামে এক তনয় ছিলেন; তাঁহার পুত্রের নাম—ঋক্ক। বিষ্ণুপুরাণে দেখি,—অনমিত্রের বংশে পুন্নি জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহারও পুত্রের নাম ঋক্ক। ব্রহ্মপুরাণের মতে,—ক্রোষ্ট্রের পুত্র ঋক্ক, এবং তাঁহা হইতেই ঋক্ক জন্মগ্রহণ করেন। হরিবংশে দেখি,—দেবমীচুৰের পুত্রের নাম বসুদেব। আবার অন্তর্জ দেখি, বসুদেবের পিতার নাম—শূর; তাঁহার পিতামহ—দেবমীচুৰ। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে, শ্রীকৃষ্ণ-জন্ম-খণ্ডের সপ্তম অধ্যায়ে, লিখিত আছে,—‘দেবমীচুৰের মারিষা নামী পত্নীর গর্ভে বসুদেব জন্মগ্রহণ করেন।’ হরিবংশেরও সেই মত। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে,—‘দেবমীচুৰের পুত্র শূর; শূরের মহিষী মারিষার গর্ভে বসুদেব জন্মগ্রহণ করেন।’ ব্রহ্মপুরাণেরও প্রায় ঐ মত। ব্রহ্মপুরাণে আছে,—‘দেবমীচুৰের অসিরী-নামী মহিষীর গর্ভে শূর জন্মগ্রহণ করেন; এবং শূর হইতে তদীয় মহিষী ভোজ-নন্দিনীর গর্ভ-জাত দশ পুত্রের মধ্যে বসুদেব অন্ততম। তাঁহার অপর নাম—‘অনকহনুভি।’ তিনি ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র দেব-হনুভি নিনাদিত হইয়াছিল; তাই তিনি পূর্কোক্ত নামে অভিহিত হন। বিষ্ণুপুরাণের মতে,—নন্দ, উপনন্দ ও কৃতক প্রভৃতি তাঁহার মদিরা নামী ভাৰ্য্যার গর্ভ-সন্তৃত। সে হিসাবে, কৃষ্ণ-বলরাম নন্দ-উপনন্দের বৈমাত্র ভ্রাতা হইয়া পড়েন। অন্তর্জ আবার দেখা-গিয়াছে,—শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেব, নন্দোপনন্দের ভ্রাতৃ-পর্যায়ভুক্ত! * চন্দ্র হইতে দশম বা দ্বাদশ পুরুষের মধ্যেই কংস-লতায় শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের উৎপত্তি দেখিতে পাই। অত্ৰ দিকে, বিষ্ণুপুরাণে বলরাম-শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রবংশে পঞ্চপঞ্চাশৎ পর্য্যায়ের অবস্থিত। সেখানে, দেবমীচুৰ—ক্রোষ্ট্রের পুত্র নহেন; তিনি ক্রোষ্ট্রের অধস্তন ত্রিপঞ্চাশৎ পুরুষে কৃতবর্ষার পুত্র-রূপে বিরাজমান। কেবল দেবমীচুৰ বলি কেন;—অনমিত্রও, বিষ্ণুপুরাণের মতে, ক্রোষ্ট্রের পুত্র নহেন। তিনি ঐ বংশের পঞ্চচাষাংশ পর্য্যায়ের স্মিত্রের পুত্র-মধ্যে পরিগণিত; প্রসেন ও সত্রাজিৎ তাঁহার পৌত্র। শ্রীমদ্ভাগবতে আবার এ বিষয়েও পার্থক্য দৃষ্ট হয়। সেখানে পঞ্চপঞ্চাশৎ পর্য্যায়-ভুক্ত যুধামিত্রের পুত্র অনমিত্র হইতে প্রসেন ও সত্রাজিৎ উৎপত্তি দেখিতে

* এই প্রকৃত ১০০ পুত্রীক নির্দিষ্ট বংশ-লতার সহিত ইহার পার্থক্য দৃষ্টব্য।

পাই। শ্রীমদ্ভাগবতে দেবমীচুৰ—চিত্রবংশের বংশে, হৃদিক-পুত্র-রূপে পরিচিত।† অগ্নি-
পুরাণে বসুদেব পঞ্চাশৎ পর্য্যায়ে অবস্থিত ; কিন্তু তাঁহার পিতামহ বিহুরথ (দেবমীচুৰ নহেন)।
ব্রহ্মপুরাণে দেবমীচুৰ—এক স্থানে ক্রোষ্ট্র পুত্ররূপে এবং অপর স্থানে ক্রোষ্ট্র পৌত্ররূপে
বিভ্রমান। সেই দুই দেবমীচুৰের মধ্যে ক্রোষ্ট্র-পুত্র দেবমীচুৰের পৌত্র—বসুদেব।
সেখানে শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম প্রভৃতি—চন্দ্রবংশের চতুর্দশ পর্য্যায়ে অবস্থিত। এদিকে আবার,
উগ্রসেনের (শ্রীকৃষ্ণের মাতামহের) বংশ-পর্য্যায় সন্ধান করিতে গেলে, ব্রহ্মপুরাণে
দেখিতে পাই,—তিনি চন্দ্রবংশের একপঞ্চাশৎ পর্য্যায়ে বিভ্রমান। হরিবংশেও এই
অসামঞ্জস্য! স্থানেও, বসুদেব চন্দ্রবংশের দ্বাদশ পর্য্যায়ে অবস্থিত রহিলেও, উগ্রসেন
পঞ্চপঞ্চাশৎ পর্য্যায়ে বিভ্রমান। অণু, দ্রুহ্য, তুর্কসু প্রভৃতির বংশ সম্বন্ধেও এইরূপ গণ্ডগোল
অবধি নাই। বিষ্ণুপুরাণে দেখিতে পাই,—চন্দ্রবংশের পঞ্চদশ পর্য্যায়ভুক্ত তুর্কসু-বংশ-সম্ভূত
মরুত, দ্ব্যস্তকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন ; অথচ, ঐ পুরাণের পুরুবংশান্তর্গত দ্ব্যস্ত চন্দ্রবংশের
চতুর্বিংশ পর্য্যায়ে বিভ্রমান। হরিবংশে আবার মরুতের সর্গতা নারী কন্যার পুত্ররূপে
দ্ব্যস্ত পরিচিত। শ্রীমদ্ভাগবতে, মরুত-পুত্র দ্ব্যস্ত সপ্তদশ পর্য্যায়ে অবস্থিত। ব্রহ্মপুরাণে
তুর্কসু এবং পুরুর বংশে দুই বার দ্ব্যস্তের নাম আছে। পুরুবংশের দ্ব্যস্ত, চন্দ্রবংশের বিংশ
পর্য্যায়ে আছেন ; কিন্তু তিনিই আবার চতুর্দশ পর্য্যায়-ভুক্ত (তুর্কসু-বংশ-সম্ভূত) মরুতের
পালক-পুত্র। পুরু-বংশে,—দ্ব্যস্তের পুত্রের নাম তরত ; আর তুর্কসু-বংশে তাঁহার পুত্রের
নাম—করুরোম। নহষের ভ্রাতা অনেনার বংশ, ব্রহ্মপুরাণে এবং হরিবংশে দৃষ্ট হয়।
ধরন্তরি, দিবোদাস, অলক প্রভৃতি এই বংশের প্রধান পুরুষ। এতদ্ভিন্ন হরিবংশে পুরুবংশের
অধস্তন অষ্টাবিংশ পর্য্যায় হইতে পুনরায় ধরন্তরির বংশ দৃষ্ট হয়। তাঁহার সহিত এই অনেনা-
বংশ-সম্ভূত ধরন্তরির বংশের পার্থক্য নাই বলিলেও চলে। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের মতে, তিনি
(নহষ-ভ্রাতা) ক্ষত্রবৃদ্ধ বংশ-সম্ভূত। হরিবংশে, নহষ-ভ্রাতা অনেনার অধস্তন একাদশ
পর্য্যায়ে ক্ষত্রবৃদ্ধ অবস্থিত। হরিবংশের মতে,—অলকের বংশ আছে। ব্রহ্মপুরাণের
মতে,—তাঁহার বংশ নাই। ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে অলকের বংশলতায় নামেরও অনেক
ইতর-বিশেষ আছে।*

উপসংহারে বিখ্যামিত্র ও পরশুরাম প্রভৃতির বংশলতা আলোচনা করিতেছি। হরিবংশে,
দুই স্থলে দুই বংশে, বিখ্যামিত্র ও পরশুরাম বিভ্রমান। প্রথমতঃ আমরা দেখিতে পাই,—আয়ুর
ভ্রাতা অমাবসুর বংশে, সপ্তদশ পর্য্যায়ে বিখ্যামিত্র এবং ঊনবিংশ পর্য্যায়ে
পরশুরাম বিভ্রমান। তার পর আবার, ঐ হরিবংশের পুরুবংশান্তর্গত
রৌদ্রাধের বংশে, দ্বাত্রিংশ পর্য্যায়ে, বিখ্যামিত্রের অস্তিত্ব দেখিতে পাই।†
বিষ্ণুপুরাণেও বিখ্যামিত্র অমাবসুর বংশোদ্ভব বটেন, কিন্তু অষ্টাদশ পর্য্যায়ে বিভ্রমান ;
এবং তাঁহার পিতামহের নাম (হরিবংশের অনুরূপ 'কুশিক' নহে) কুশাধ। শ্রীমদ্ভাগবতে,
পুরুরবা-পুত্র বিজয়ের বংশে (অমাবসুর বংশে নহে) অষ্টাদশ পর্য্যায়ে বিখ্যামিত্র

* এই গ্রন্থের ৩০১ এবং ৩২৩ পৃষ্ঠায় অনেনা-বংশ দ্রষ্টব্য।

† এই গ্রন্থের ৩০১ ও ৩১১ পৃষ্ঠায় হরিবংশের বংশ-লতায় এতি দৃষ্টপাভ করিলেই ইহা প্রত্যক্ষীভূত হইবে।

আছেন ; কিন্তু তাঁহার পিতামহের নাম—কুশাধু। অগ্নিপুরাণে পুরুবংশান্তর্গত ত্র্যাম্ব-বংশের ত্রয়স্ত্রিংশ পর্যায়ে এবং ব্রহ্মপুরাণে অমাবসু-বংশের সপ্তদশ পর্যায়ে,—বিখ্যামিত্র বিদ্যমান। আবার রামায়ণে দেখিতে পাই,—প্রজাপতি হইতে মাত্র অশস্তন চতুর্থ পুরুষে বিখ্যামিত্র অবস্থিত। রামায়ণের আদিকাণ্ডে, দ্বাত্রিংশ এবং চতুস্ত্রিংশ সর্গে, এই বিখ্যামিত্রের যে বিবরণ লিখিত আছে, তাহা স্মরণ্যতঃ এই ;—‘কুশ-নামক জনৈক সুপ্রতিষ্ঠিত ব্রহ্ম-তনয় ছিলেন। তিনি সদৃশী কুলীনা-পত্নী বৈদর্ভীতে—কুশাধ, কুশনাভ, অহর্জরজস ও বসু নামক আশ্ব-তুল্য মহাবল-সম্পন্ন চারিটা পুত্র উৎপাদন করেন। কুশনাভের গাধি নামে এক পরমধার্মিক পুত্র জন্মিয়াছিল। তিনি বিখ্যামিত্রের জনক। বিখ্যামিত্রের ভগ্নীর নাম—সত্যবতী। তিনি ঋচীকের পত্নী। তাঁহার পুত্রের নাম—শুনঃশেফ।’ পুরাণ-সমূহের বংশ-লতার সহিত এ বংশ-লতার কি বিষম পার্থক্যই দৃষ্ট হয়! পুরাণে বিখ্যামিত্র কোথাও ত্রয়স্ত্রিংশ পর্যায়ে বিদ্যমান ; কিন্তু রামায়ণে তিনি ব্রহ্মা হইতে চতুর্থ পর্যায়ে অবস্থিত। রামায়ণের হিসাবে বিখ্যামিত্রের বংশ-লতা ;—

১। ব্রহ্মা

কুশ

কুশাধ

কুশনাভ

অহর্জরজস

বসু

গাধি

বিখ্যামিত্র

সত্যবতী + ঋচীক

শুনঃশেফ

এই ত ব্যাপার! এ অসামঞ্জস্য দেখিয়াও কেহ কি বলিতে সাহস করেন,—ভারতের প্রাচীন নৃপতিগণের বংশ-পর্যায় অক্ষুর আছে? ফলতঃ, বংশ-পর্য্যয়ে যে ক্রমভঙ্গ হইয়াছে, একের বংশ অন্যের বংশে গিয়া সংযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে কোনই সংশয় নাই। সুতরাং, ভারতবর্ষের প্রাচীনত্ব-তত্ত্ব আলোচনা করিতে হইলে, গড়ে নৃপতিগণের শাসনকাল ধরিয়া তাহা নির্ণয় করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। যদি কেহ কোনও একটা পুরাণের বংশ-লতা ধরিয়া, প্রাচীনত্ব-নির্ণয়ে চেষ্টাযিত হন, তিনি নিশ্চয়ই ভ্রমে পতিত হইবেন। মনে করুন,—যদি কেহ রামায়ণ পাঠ করিয়া, বিখ্যামিত্রের বংশ-লতা স্থির করিয়া লন; তাহা হইলে, ত্রেতাযুগে বিখ্যামিত্রের বিদ্যমানতা সম্ভবপর কি? যদি বলেন—সম্ভবপর, তাহা হইলে পাশ্চাত্য হিসাবে, পৃথিবী সৃষ্টির কয় বৎসর পরে সম্ভবপর? আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি, রাজহানের ইতিহাসে কর্ণেল টড এক এক রাজার রাজত্বকাল গড়ে কুড়ি বৎসর করিয়া ধরিয়াছেন। সে হিসাবে ধরিতে গেলে,—সৃষ্টির আদিভূত ব্রহ্মা হইতে বিখ্যামিত্রের ব্যবধান আশী বৎসরের অধিক হইতে পারে না। আর তাহা হইলে, ত্রেতাযুগে তখন পৃথিবী সৃষ্টির পর আশী বৎসর মাত্র অতীত হইয়াছিল,—মানিয়া লইতে হয়। কিন্তু তাহাই কি ঠিক? এ হিসাব, অন্ধের হস্তি-দর্শনবৎ একদেশ-দর্শিতার পরিচায়ক নহে কি? ঋগ্বেদ-সংহিতায় বিখ্যামিত্র ঋষি বহু সৃষ্টির প্রবর্তক।

তৃতীয় মণ্ডলে হুক্ত-প্রবর্তকগণের মধ্যে তাঁহার নাম পুনঃপুনঃ উল্লিখিত। সেই হুক্ত-প্রবর্তক-গণের মধ্যে তাঁহার দুই পুত্রের পর্য্যন্ত পরিচয় পাওয়া যায়। সে দুই পুত্রের এক জনের নাম—মধুচ্ছন্দা ঋষি ; অপরের নাম—ঋষভ ঋষি। ঋষেদের প্রথম মণ্ডলের প্রথম দশটি স্তোত্রেই বিশ্বামিত্র-পুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষির নাম আছে। এখন, ঋষেদের এই বিশ্বামিত্র এবং রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ-পরম্পরার বিশ্বামিত্র, একই ব্যক্তি কিনা—কে নির্ণয় করিবে ?

বংশ-পর্যায় আলোচনায় সূর্য্য-বংশের সহিত চন্দ্রবংশের সম্বন্ধ-তত্ত্ব নির্ণয় করিবার প্রয়াস পাইলে, আরও অধিকতর সমস্তার মধ্যে পতিত হইতে হয়। পুরাণ-পাঠক-মাত্রেই দশরথের সখা রোমপাদের সহিত পরিচিত আছেন। আমরাও বিবিধ বক্তব্য। একাধিক বার রোমপাদের নাম উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু রোমপাদ

এবং দশরথ বংশ-লতার যে যে স্থান অধিকার করিয়া আছেন, তাহাতে তাঁহাদিগকে কখনই সম-সাময়িক বলিয়া মনে হয় না। রামায়ণের দশরথ অষ্টত্রিংশ পর্য্যয়ে, ব্রহ্মপুরাণের দশরথ অষ্ট-পঞ্চাশৎ পর্য্যয়ে এবং বিষ্ণুপুরাণের দশরথ সপ্তষষ্টিতম পর্য্যয়ে অবস্থিত ; কিন্তু অঙ্গ-দেশাধিপতি রোমপাদ, চন্দ্রবংশের বংশ-লতায়, হরিবংশে বর্ষত্রিংশ পর্য্যয়ে, বিষ্ণুপুরাণে অষ্টাবিংশ পর্য্যয়ে, শ্রীমদ্ভাগবতে ষড়বিংশ পর্য্যয়ে, অগ্নিপু্রাণে ত্রিংশ পর্য্যয়ে, এবং ব্রহ্মপুরাণে চতুস্ত্রিংশ পর্য্যয়ে বিদ্যমান। এ পার্থক্য যদি মানিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে দশরথ এবং রোমপাদকে সম-সাময়িক বলিয়া স্বীকার করা হুঃসাধ্য ! অথচ, সকল পুরাণেই তাঁহাদিগের সম-সাময়িকত্ব উল্লিখিত হইয়াছে। এ ক্ষেত্রে, চন্দ্রবংশের বংশ-লতায়, রোমপাদের পূর্বপুরুষগণের অনেকের নাম যে বাদ পড়িয়া গিয়াছে, তাহা স্বতঃই অমুভূত হয়। কার্ত্তবীৰ্য্যার্জুন রাবণকে বন্ধন করিয়াছিলেন ; শ্রীরামচন্দ্র রাবণের সংহার-সাধন করেন। এদিকে আবার, পরশুরামের হস্তে কার্ত্তবীৰ্য্য নিহত হন এবং শ্রীরামচন্দ্রের নিকট পরশুরামের দর্প চূর্ণ হয়। এ হিসাবে, শ্রীরামচন্দ্র, পরশুরাম, রাবণ এবং কার্ত্তবীৰ্য্যার্জুন সকলেই সম-সাময়িক হওয়া সম্ভবপর। কিন্তু অতত্র আবার দেখিতে পাই,—শ্রীরামচন্দ্রের বহুতর পূর্ববর্তী পুরুষ সগরের হস্তে কার্ত্তবীৰ্য্যার্জুনের তালজঙ্ঘ-নামধেয় পুত্রগণ নিহত হইয়াছিল। রামায়ণে, দশাধিক শততম সর্গে, লিখিত আছে,—‘সগরের পিতার নাম—অসিত (পুরাণের মতে—বাহু বা বাহুক)। হৈহয়, তালজঙ্ঘ, শুর ও শশবিন্দু প্রভৃতি রাজারা তাঁহার বিপক্ষ হইয়াছিলেন। রাজা অসিত যুদ্ধে সেই ঋপতি-চতুষ্টয়কে প্রথমে নিবারিত করিয়াছিলেন বটে ; কিন্তু পরিশেষে বিপক্ষ-বলের বাহুল্য-বশতঃ নগর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বহুকাল পরে তাঁহার পুত্র সগর জন্মগ্রহণ করিয়া সেই পিতৃশত্রুগণকে পরাভূত করেন।’ রামায়ণের এই বর্ণনাক্রমে হৈহয়, শশবিন্দু প্রভৃতি রাজগণ তালজঙ্ঘের সম-সাময়িক। কিন্তু বংশ-তালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে প্রতীত হয়,—তালজঙ্ঘের উর্দ্ধতন একাদশ পুরুষে হৈহয় বিদ্যমান ! এখানে কি মীমাংসা সম্ভবপর,—কেহ নির্ণয় করিতে পারেন কি ? এ সকল বিষয় আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়,—একই বংশে একাধিক হৈহয়, তালজঙ্ঘ ও কার্ত্তবীৰ্য্যার্জুন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; অথবা ঐ সময়ে অল্প বংশেও হৈহয়, তালজঙ্ঘাদি

বিজ্ঞানতা অসম্ভব নহে। বংশ-লতার অপূর্ণতা এতদ্বারাও প্রতীত হয় না কি? জনক-
 ছহিতা জনকী, শ্রীরামচন্দ্রের সহিত পরিণীতা হইয়াছিলেন। কিন্তু নিমি-বংশের সীতার
 সহিত ইক্ষ্বাকু-বংশের শ্রীরামচন্দ্রের বংশ-পর্যায়ের কত পার্থক্য, একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতের
 বংশ-লতার দৃষ্টান্তেই তাহা বিশদীকৃত! শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীরামচন্দ্র অষ্টবর্ষীয় পর্যায়ের
 এবং শ্রীমদ্ভাগবতের সীতা ত্রিংশ পর্যায়ের বিজ্ঞান। পর্যায়ের কত পার্থক্য; বুঝিয়া
 দেখুন। বংশ-লতার ক্রম-ভঙ্গ ভিন্ন,—ইহা আর কি হইতে পারে? চন্দ্রবংশের ও সূর্য্যবংশের
 মধ্যে সময় সময় যে বিবাহ-সম্বন্ধের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাও এতদুপলক্ষে বিশেষ
 আলোচনার যোগ্য বলিয়া মনে হয়। ব্রহ্মপুরাণে যযাতির মহিষীগণের মধ্যে কুরুৎসু-
 কস্তার উল্লেখ আছে। চন্দ্রবংশের জহু, যুবনাথ-কস্তা কাবেরীকে বিবাহ করিয়া-
 ছিলেন। কুরুৎসু-কস্তার গর্ভে যযাতির কোনও পুত্র-সন্তান জন্মিয়াছিল কি না, তাহার
 পরিচয় পাওয়া যায় না বটে; কিন্তু জহুর পুত্র সুনন্দ, ব্রহ্মপুরাণের মতে, কাবেরীর গর্ভে
 উৎপন্ন হইয়াছিলেন। জহু ও কাবেরীর এই বিবাহ-ব্যাপারে বুঝা যায়,—সূর্য্যবংশীয় যুবনাথ
 এবং চন্দ্রবংশীয় জহু উভয়েই সম-সাময়িক ছিলেন। হরিবংশের সহিত এ বিষয়ে
 ব্রহ্মপুরাণের এক মত দৃষ্ট হয়। তবে হরিবংশে তাঁহাদের পুত্রের নাম সূসহ বলিয়া
 উল্লিখিত হইয়াছে। শেষোক্ত বিবাহে পর্যায়-সম্বন্ধে অবশ্য বিশেষ কিছু অসামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়
 না; যেহেতু, যুবনাথ-সূর্য্যবংশের বংশ-লতার একাদশ হইতে চতুর্দশ পর্যায়ের মধ্যে
 অবস্থিত; এবং জহু চন্দ্রবংশের কোনও বংশ-লতার দশম বা একাদশ পর্যায়ের
 এবং কোনও বংশ-লতার অষ্টাবিংশ পর্যায়ের বিজ্ঞান আছেন। কিন্তু প্রথমোক্ত বিবাহে
 মহষ-পুত্র যযাতি বংশ-লতার পঞ্চম হইতে অষ্টম পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত; আর কুরুৎসু,
 রামায়ণের মতে, ষড়বিংশ পর্যায়ের এবং অজ্ঞাত পুরাণের মতে, অষ্টম বা নবম পর্যায়ের
 অবস্থিত। সুতরাং, প্রথমোক্ত বিবাহে কিঞ্চিৎ অসামঞ্জস্য ঘটিতেছে না কি? হরিবংশে
 পুরুৎসু-কস্তার সহিত কুশিকের বিবাহ-প্রসঙ্গ লিখিত আছে; সেখানে কুশিক,
 পাণ্ডির পিতা বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। পুরুৎসু, সূর্য্যবংশের বংশ-লতার মাকাতার
 পুত্ররূপে চতুর্বিংশ বা পঞ্চবিংশ পর্যায়ের বিজ্ঞান; কিন্তু কুশিক, প্রায়শঃই পঞ্চদশ
 পর্যায়ের মধ্যে; কেবল অগ্নিপুরাণে একত্রিংশ পর্যায়ের অবস্থিত। প্রচলিত বংশ-লতার
 অনুসরণ করিলে এ ক্ষেত্রেই বা কি করিয়া সামঞ্জস্য-সাধন সম্ভবপর! এইরূপ যে দিক
 দিয়াই দেখি, বংশ-পর্যায় যে অক্ষুর আছে—কোনক্রমেই মানিয়া লইতে পারি না। বংশের
 প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের পিতা বা পিতামহ সম্বন্ধে প্রায়ই অনৈক্য নাই—স্বীকার করি।
 সেরূপ ব্যক্তিগণের তিন পুরুষের পরিচয়-পর্যায়ের প্রায়ই বিশৃঙ্খলা ঘটে নাই,—তাহা যুক্ত-কণ্ঠে
 বলিতে পারি। কিন্তু সর্ব-সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া বংশ-লতা উদ্ধার করিতে হইলে, বহু
 সাধনা ও গবেষণার প্রয়োজন; তাহাতে সকল শাস্ত্র-গ্রন্থ মিলাইয়া, সংযোগ-বিরোগ
 করিয়া, নূতন বংশ-লতা প্রস্তুত করিতে হয়। আমাদের মতে, সকল বিষয়ে সামঞ্জস্য-
 সাধন করিতে হইলে, বিশেষ বিশেষ স্থানে, বংশ-লতার ‘অমূকের পুত্র অমুক’—এরূপ
 পাঠের পরিবর্তে, ‘অমূকের বংশ-সমুদ অমুক’ এইরূপ পাঠই সঙ্গীতীয়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ ।

অগ্রান্ত নৃপতিগণ ।

[নল-দময়ন্তীর উপাখ্যান,—ভীম, কতূর্ণ, ভদ্রাহর প্রভৃতির এসঙ্গ,—সাবিত্রী-সত্যবানের উপাখ্যান,—অধিপতি, হামৎসেন প্রভৃতির আলোচনা,—অযোধ্যার আদি ও শেষ নৃপতিগণ—কবচ ও কুপ,—ইক্ষাকু, মনু পুত্র কিনা,—কুপ, প্রসূকি ও ইক্ষাকুর বিবরণ,—বিদর্ভ-রাজ দত্ত, বেত এবং সুদেবের কাহিনী,—মরুতের বক্র এবং স্বর্গবৃক্ষের বিবরণ,—নৃগ এবং ব্রহ্মদত্তের উপাখ্যান,—ঐবৎস-চিন্তার উপাখ্যান,—ইক্ষাকু এবং পুরুষোত্তম জগন্নাথ,—উৎকলখণ্ডে ও অগ্রান্ত গ্রামে পার্বত্য,—কাশীরেশগণ,—হৃপ্রতীক, ব্রজসিং, সুহ্মার, দিবোদাস, প্রতর্দন, সুদেব প্রভৃতি,—বীতহব্যের ব্রাহ্মণ-প্রাপ্তি,—তবংশীর গুৎসমদ, শৌনক প্রভৃতি,—কাশীর পুরাতত্ত্ব,—অলকের এসঙ্গ,—কুবলয় ও মদালসা,—পাতালকেতু দৈত্য এবং অশুর নাগরাজ,—অলক ও শৈব্য,—পদ্ম-পুরাণোক্ত হৃমদ, ঋতন্ত, হুরথ, মহীরথ, ঐধর, বীরমণি প্রভৃতি রাজগুণ,—মহাভারতোক্ত শিব, সুদর্শন, সেতুক, নীল, বৃষদর্ভ, পৌরিক, বীরহ্যার, শক্রর প্রভৃতি নৃপতিগণ,—ঋষদৌক্ত বহুতর নৃপতিগণ,—হৃদাস, বহু, তুর্কশ, ক্রহ্য, অণু, পুরু, আবু, অতিথ্য, হৃপ্রবশ, পুরুহুৎস, তুজি, জহু, ভ্রাক্ষণ ও কুৎস প্রভৃতি রাজগুণ,—কজিখা, আসঙ্গ, পৃথুপ্রবা প্রভৃতি রাজবিগণ,—হৃগ ও চন্দ্রবংশের নৃপতিগণের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ-তত্ত্ব,—বিবিধ ।]

বংশ-পর্য্যায়ে লক্ষ্য করিয়া পাওয়া যায় না, অথচ প্রসিদ্ধির অবধি নাই,—এক্লপ নৃপতির সংখ্যাও অল্প নহে। নল-দময়ন্তীর উপাখ্যানে রাজা নলের নাম অনেকেরই অবগত আছেন; কিন্তু সূর্য্যবংশের বা চন্দ্রবংশের বংশ-লতায় কোথাও নল-দময়ন্তী। তাঁহার অস্তিত্ব দৃষ্ট হয় না! মহাভারত, রামায়ণ এবং পুরাণ-পরম্পরায় আলোড়ন করিলে দেখিতে পাই,—তিনি নিবধ দেশের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম,—বীরসেন। দময়ন্তীর সহিত তাঁহার স্বয়ংবর হয়। দময়ন্তী—বিদর্ভরাজ-নন্দিনী। তাঁহার পিতার নাম—ভীম। বলা বাহুল্য, এই ভীমের নামও কোনও বংশ-লতায় দৃষ্ট হয় না; অথচ, তিনি চন্দ্রবংশীয় বলিয়া পরিচয় পাওয়া যায়। নল-দময়ন্তীর স্বয়ংবর কোতুল-প্রদ। তাঁহাদের দাম্পত্য-প্রেম আদর্শস্থানীয়। নল-দময়ন্তী উভয়েই অসামান্য রূপ-লাবণ্য-মন্মথ ছিলেন। তাঁহাদের উভয়েরই রূপ-গুণের বিবরণ লোক-মুখে প্রচারিত হইয়াছিল। তাঁহারা উভয়েই উভয়কে মনে মনে বরণ করিয়াছিলেন। নল ও দময়ন্তী যখন অন্তরে অন্তরে পরম্পরের প্রতি আগ্রহ, সেই সময়ে নল আপন অন্তঃপুর-সমীপস্থ কানন-মধ্যে স্তবর্ণ-পক্ষ-বিশিষ্ট কতকগুলি হংসকে বিচরণ করিতে দেখিতে পান। তাহারই একটি হংস নল কর্তৃক ধৃত হয়। সেই হংস আশ্র-প্রাণ রক্ষার জন্য নলের নিকট প্রতিজ্ঞা করে,—“আমি দময়ন্তীর নিকট গমন করিয়া আপনার বিবরণ এক্লপ বর্ণন করিব যে, তিনি আপনাকে অতঃকালে কোনও পুরুষকে পতিরূপে গ্রহণ করিবেন না।” হংসের এই প্রতিজ্ঞার নল তাহাকে ছাড়িয়া দেন।

হংস নিবধ দেশ হইতে বিদর্ভ দেশে গমন করে। সেখানে দময়ন্তীর সহিত হংসের সাক্ষাৎ হয়। দময়ন্তী হংসের নিকট নলের রূপ-গুণের পরিচয় বিশেষরূপেই অবগত হন। হংসের দ্বারা নল-দময়ন্তীর মধ্যে বাগ্‌দাদ সম্পন্ন হইয়া যায়। যথা-সময়ে দময়ন্তীর স্বয়ংবর-বার্তা ঘোষিত হইলে, দেবগণ, গন্ধর্বগণ, এবং নানা স্থানের রাজগণ দময়ন্তীর প্রণয়-প্রার্থী হন। দেবতারা নলের নিকট আপন আপন পরিচয় প্রদান করিয়া তাঁহাকে অনুরোধ করেন,—“তুমি দময়ন্তীকে আমাদের আগমন-সংবাদ জ্ঞাত কর এবং আমাদের কাহাকেও পতি-রূপে বরণ করিতে উপদেশ দাও।” যথাসময়ে দময়ন্তীর নিকট নল দেবতাদিগের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু দময়ন্তী তাহা শুনিলেন না; তিনি বলিলেন,—“আমি আপনাকেই পতিত্বে বরণ করিব। মনে-প্রাণে আপনাকেই বরণ করিয়া রাখিয়াছি।” এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া, দময়ন্তীর এক-নিষ্ঠা পরীক্ষা করিবার জন্ত, দেবগণ এক কৌশল-জাল বিস্তার করিলেন। ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, যম—চারি দেবতা তখন চারিটী নলরূপে অবতীর্ণ হইলেন। স্মরণ্যঃ পাঁচটী নল-মূর্তির মধ্য হইতে নল রাজাকে চিনিয়া লওয়া দময়ন্তীর পক্ষে বড়ই দুষ্কর হইয়া উঠিল। দময়ন্তী তখন মনে মনে দেবতাদিগের রূপ-ভিক্ষা চাহিলেন; মনে মনে কহিলেন,—“আমি নল-রাজাকেই পতিত্বে বরণ করিয়াছি। আমার সত্য-ধর্ম-রক্ষার্থ আপনারা আমার নিকট তাঁহাকে বিদিত করিয়া দেন।” দময়ন্তীর একাগ্রতায় দেবতারা সন্তুষ্ট হইলেন। সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহারা আপন আপন মূর্তি পরিগ্রহ করিলে, দময়ন্তী নল-রাজার গলদেশে বর-মালা প্রদান করিলেন। দময়ন্তীর পাণি-গ্রহণ জন্ত কলির একান্ত আগ্রহ হইয়াছিল। কিন্তু তিনি আসিয়া স্বয়ংবর-সভায় উপস্থিত হইবার পূর্বেই, স্বয়ংবর-কার্য সম্পন্ন হইয়া যায়; স্মরণ্যঃ তিনি নলের উপর ক্রুদ্ধ হন। তখন হইতেই নলের ক্রটি-বিচ্যুতির প্রতি কলির ঘর-দুষ্টি পতিত হয়। স্বয়ংবরের পর দ্বাদশ বৎসর অতীত হইলে, নল-রাজার একটা অনাচারের পরিচয় পাইয়া, কলি তাঁহার দেহে প্রবিষ্ট হন। সেই অরম্ভের নলের ভ্রাতা পুঙ্কর নলকে দ্যুত-ক্রীড়ায় আহ্বান করেন। পুঙ্করের সহিত অক্ষ-ক্রীড়ায় নলকে রাজ্যভ্রষ্ট ও বনবাসী হইতে হয়। দময়ন্তী পতির অঙ্গুগামিনী হন। ক্রমশঃ কলি-প্রভাবে তাঁহাদের অশেষ দুঃখবস্থা হয়; এমন কি, তাঁহারা দুই জনে এক বস্ত্র পরিধান করিতে বাধ্য হন। সেই অবস্থার, ক্ষুধা-তৃষ্ণার কাতর হইয়া, বুদ্ধি-ভ্রংশ-হেতু, নিদ্রিতা সহধর্মিণীকে বনমধ্যে একাকী ফেলিয়া, নল পলায়ন করেন। অর্ধ বস্ত্র দময়ন্তীর পরিধানে রাখিয়া এবং অর্ধ বস্ত্র আপনি কাটিয়া লইয়া, নল-রাজা সেই বন হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন। নিদ্রাভঙ্গে দময়ন্তী, পতিকে দেখিতে না পাইয়া, ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে করিতে, করুণ-ক্রন্দনে বুন-ভূমি বিকল্লিত করিয়া তুলেন। পরিশেষে স্বর্গবাহ বনিকৃপণের সাহায্যে দময়ন্তী চেদিরাজ্য সুবাহুর আলয়ে উপনীত হন। সেখানে দময়ন্তী আপনাকে লৈরিঙ্গী বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু রাজ-মাতা তাঁহাকে আপন দুহিতার জায়গাই কর করিতেন। এদিকে কত ও আশাতার রাজ্যচ্যুতির সংবাদ অবগত হইয়া, বিদর্ভ-রাজ তীয়, তাঁহাদের সন্ধানের জন্ত চারিদিকে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহাতে চেদি-রাজ্য হইতে দময়ন্তী বিদর্ভ-রাজ্যে পুনরানীত হইয়াছিলেন।

কিন্তু নলের সন্ধান অনেক দিন পর্যন্ত তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হয় নাই। দময়ন্তীকে পরিত্যাগের পর, বিপদে উপর্যুপরি আসিয়া নল-রাজাকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল। সেই সময়ে তাঁহার আকৃতি-প্রকৃতি পর্যন্ত পরিবর্তিত হইয়াছিল; এবং তিনি অদৃষ্ট-চক্রের পেষণে নিশ্চেষ্ট হইতে হইতে ঋতুপর্ণ রাজার আলয়ে অশ্ব-রক্ষকের কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সেখানে তিনি বাহক নামে পরিচিত হন। এই সময়ে বিদর্ভ-রাজ দময়ন্তীর পুনঃ-স্বয়ংবরের বার্তা ঘোষণা করেন। ঋতুপর্ণ সেই স্বয়ংবর-সভায় উপস্থিত হইবার জন্ত আমন্ত্রিত হন। সেই স্বয়ংবর-সভায় ঋতুপর্ণকে পৌছাইয়া দিবার জন্ত বাহক-বেণী নল-রাজ, তাঁহার সারথি-রূপে রথ-পরিচালনা করিয়াছিলেন। অশ্ব-পরিচালনায় বাহকের অসীম কৃতিত্বের পরিচয় পাইয়া, ঋতুপর্ণ তাঁহার নিকট অশ্ব-বিজ্ঞা শিক্ষা করিতে চাহেন। নল তাঁহাকে অশ্ব-বিজ্ঞা শিক্ষা দিলে, ঋতুপর্ণ নলকে অক্ষ-বিজ্ঞা শিক্ষা দেন, এবং সেই অক্ষ-বিজ্ঞা শিক্ষার ফলে কলি নলকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। যাহা হউক, স্বয়ংবর-সভার আরোজন হইলেও, দময়ন্তী নল ভিন্ন অন্য কাহাকেও পতিত্বের বরণ করিতে সম্মত হন না। তিনি মনে মনে নলেরই পুনরাগমন কামনা করিয়া দিবা-নিশি ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাইতে থাকেন। নল-রাজা কতকগুলি আশ্চর্য্য বিজ্ঞা জানিতেন। তিনি জল ও অগ্নি ভিন্ন, জলের ও অগ্নির কার্য সম্পন্ন করিতে পারিতেন; পুষ্প-সমূহ তাঁহার করে মন্দিত হইলেও নষ্ট হইত না; প্রত্যুত, সমধিক দৃষ্ট ও স্নগন্ধিযুক্ত হইত। দময়ন্তীর বিশ্বাস ছিল, তাঁহার পুনঃ-স্বয়ংবর সংবাদ পাইলে, যে অবস্থায়ই থাকুন, নল-রাজা নিশ্চয়ই স্বয়ংবর-সভায় উপস্থিত হইবেন। সুতরাং দময়ন্তী আপন পরিচারিকাকে স্বয়ংবর উপলক্ষে সমাগত ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ সন্ধান লইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। এবং বিধি অনুসন্ধানের ফলে, দময়ন্তীর নিকট বাহক-বেণী নলের পরিচয় অজ্ঞাত রহিল না। অবিলম্বেই দময়ন্তীর সহিত নলের মিলন হইল। রাজা ঋতুপর্ণ তখন ছয়বেণী নলকে চিনিতে পারিয়া, স্বরাজ্যে প্রস্থান করিলেন। এদিকে নল-রাজাও এক মাস কাল বিদর্ভ-রাজ্যে বসতি করিয়া, নিষধ-রাজ্যাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। সেখানে নলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পুরুর রাজা হইয়াছিলেন। আবার পুরুরের সহিত তাঁহার দূত-ক্রীড়া আরম্ভ হইল। ক্রীড়ার জরনাত করিয়া নল আপন রাজ্য ফিরিয়া পাইলেন। দিন দিন তাঁহার যশোরশ্মি দিকে দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। এখন কাব্যে, পুরাণে, গাথার—সর্বত্র তাঁহার কীর্ত্তি বিবোধিত। এখন ‘পুণ্যলোক’-গণের মধ্যে তিনি অস্তুতম। “পুণ্যলোকো নলো রাজা পুণ্যলোকো যুধিষ্ঠিরঃ। পুণ্যলোকো চ বৈবেদী পুণ্যলোকো জনার্দনঃ॥” মহারাজ নলের এক পুত্র ও এক কন্যা হয়। পুত্রের নাম—ইজ্ঞসেন; কন্যার নাম—ইজ্ঞসেনা। * রাজা ঋতুপর্ণ অযোধ্যার অধিপতি ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম—অযুতাব বা অযুতাস্ত্রিৎ। মহাত্মার মতে, ঋতুপর্ণের পিতার নাম—ভদ্রাসুর। অযুতাব, অযুতাস্ত্রিৎ বা ভদ্রাসুর এক ব্যক্তি কিনা—তাঁহা নির্ণয় করা কুশাধ্য। তবে হর্ষাবশেষে

* মহাত্মারত, বনগর্ভ, বিগর্ভাশ্ব অথবা হইতে একোন্নীততম অথবা ‘অযোধ্যা’ নাম-প্রকরণ জটিল। শিবপুরাণে এবং ব্রহ্মপুরাণে নল-দময়ন্তীর জন্মভর-বৃত্তান্ত লিখিত আছে।

বংশ-লতায় ইক্ষাকুর বংশে ষট্চক্রারিংশ পর্য্যায়, বিষ্ণুপুরাণে ত্রি-পকাশ পর্য্যায়, হরিবংশে এক-পকাশ পর্য্যায়, শিবপুরাণে ত্রি-চক্রারিংশ পর্য্যায়ে এক শ্রীমভাগবতে এক-পকাশ পর্য্যায়, ঋতুপর্ণ নামে অযোধ্যার এক রাজার পরিচয় পাই। নলের সহিত তাঁহার বন্ধুত্বের পরিচয়ও প্রায় এতি পুরাণেই দৃষ্ট হয়। ইহাতে বুঝা যায়, রাজা ঋতুপর্ণ (ঋতপর্ণ) যখন অযোধ্যার সিংহাসনে অধিরূঢ়, সেই সময়ে নিষধ-রাজ্যে নল, বিদর্ভ-দেশে ভীম এবং চৈদি-দেশে সুবাহ রাজত্ব করিতেন। কিন্তু ইহারা কোন্ বংশ-লতার কোন্ স্থান অধিকার করিয়া আছেন—নির্ণয় করা যায় না। ভীম নামে চন্দ্রবংশে একাধিক নৃপতির নাম দৃষ্ট হয় বটে; কিন্তু তাঁহাদের সহিত দময়ন্তীর পিতার কোনই সাদৃশ্য নাই। তাঁহাদের পুত্রের নামে এবং দময়ন্তীর ভ্রাতৃগণের নামে বিশেষ পার্থক্য আছে। তার পর, মহাভারতের মতামুসারে ভদ্রাসুরকে যদি ঋতুপর্ণের পিতা বলিয়া মানিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে সূর্য্যবংশের বংশ-লতায় সে ঋতুপর্ণের স্থান কোথায়? রামায়ণের সুল্লরকাণ্ডে, চতুর্বিংশ সর্গে, সীতা-দেবী দময়ন্তীর সহিত উপমিত হইয়াছেন। সূত্রাং শ্রীরামচন্দ্রের পূর্ববর্ত্তি-কালে কোনও এক সময়ে নল-দময়ন্তীর বিদ্যমানতা প্রতিপন্ন হয়। তাহাতেও শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতির উদ্ধর্তন পুরুষে ঋতুপর্ণ রাজার সম-সময়ে নল-দময়ন্তীর অস্তিত্ব সম্ভবপর। কিন্তু বংশ-লতার দৃষ্ট হয়,—ঋতুপর্ণ, শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতির বহু পরবর্ত্তী অধস্তন পর্য্যায়ে বিদ্যমান। এদিকে, পুরাণে দুই জন নল বিশেষ বিখ্যাত। এক জন—বীরসেনাশ্রাজ্জ; অপর জন—ইক্ষাকু-কুলোদ্ভব।* অথচ ইক্ষাকু-বংশে নিঃসের পুত্র-রূপে যে নলকে দেখিতে পাই, নিমখাধিপতি বীরসেনের পুত্র নলের সহিত তাঁহার কোনও সাদৃশ্য আছে কিনা—বিবেচনার বিষয়।

তার পর, সাবিত্রী-সত্যবান ! রামায়ণে, মহাভারতে, মৎস্যপুরাণে এবং দেবী-ভাগবতে সাবিত্রী-সত্যবানের কাহিনী বিবৃত আছে। মদ্রদেশে অশ্বপতি নামে এক ধর্ম্মনিষ্ঠ নর-পতি ছিলেন। সাবিত্রী-শুলে আহুতি প্রদান করিয়া, সাবিত্রীর প্রীতি-সাবিত্রী-সত্যবান। সাধন-পূর্ব্বক, তিনি সাবিত্রী-নারী কন্যা লাভ করেন। সত্যবানের সহিত সাবিত্রীর পরিণয়-কার্য্য সম্পন্ন হয়। শাশুদেশে দ্রুমৎসেন নামে এক ধর্ম্মাত্মা ক্রতুয় ভূপতি ছিলেন। সত্যবান - তাঁহারই একমাত্র পুত্র। দ্রুমৎসেন এবং তাঁহার মহিষী অন্ধ হইয়াছিলেন; তাঁহাদের পুত্র সত্যবান তখন-অন্ধ-বয়স্ক বালক মাত্র। সূত্রাং সুবিধা পাইয়া দ্রুমৎসেনের কোনও পূর্ব্ব-জ্ঞাত তাঁহাদিগের রাজ্য কাড়িয়া লন। স্ত্রী-পুত্র সহ অন্ধ দ্রুমৎসেন যখন অরণ্যবাসী, সেই সময়ে সাবিত্রীর সহিত সত্যবানের বিবাহ হয়। সত্যবান সত্যনিষ্ঠ, তেজস্বী ও শৌর্য্য-সম্পন্ন ছিলেন। সাবিত্রী মনে মনে তাঁহাকে পতিত্ব বরণ করে। বিবাহের পূর্বে মহর্ষি নারদ, অশ্বপতির নিকট সত্যবানের বিষয় বর্ণন করিয়া বলেন,—“এই বিবাহে একটা প্রধান আপত্তির কারণ আছে। সত্যবান সর্গগুণাধিত হইলেও তাঁহার অধিকাল শৈব-প্রায়। অন্ধ হইতে এক বৎসর পূর্ণ হইলেই তিনি দেহ-ত্যাগ করিবেন।” রাজা অশ্বপতি সাবিত্রীর নিকট এই বিষয় সমাচার জ্ঞাপন

* “মলো দ্যাবের বিজ্ঞাতো পুরাণে ভারতবর্ষ। বীরসেনাশ্রাজ্জের বংশে ইক্ষাকু-কুলোদ্ভব।”

করিলেও, সাবিত্রী প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না। শূতরাং, সাবিত্রীর সম্বন্ধ অনুসারে সত্যবানের সহিত তাঁহার উদ্ধা-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। ক্রমশঃ সত্যবানের মৃত্যু-দিন নিকটবর্তী হইয়া আসিল। পতির মৃত্যু সন্নিকট জানিতে পারিয়া, তিন দিবস পূৰ্ণ হইতে সাবিত্রী দিবানিশি উপবাসী থাকিয়া, ‘ত্রিরাত্র’ ব্রত অবলম্বন করিলেন। ব্রত-সমাপ্তির দিবসে সত্যবান, জনক-জননীকে সেবার জ্ঞাত ফল ও কাষ্ঠ সংগ্রহে, দূর বনে গমন করিয়াছিলেন। স্বপুত্র-স্বপুত্রীর অনুমতি লইয়া, সাবিত্রীও সেই দিন সত্যবানের অনুসরণ করেন। সেই দিনই বন-মধ্যে সাবিত্রীর ক্রোড়ের উপর মস্তক রাখিয়া সত্যবানের ইহলীলা সঙ্গ হয়। কিন্তু ব্রত-পরায়ণা, পতিগত-প্রাণা সাবিত্রী কোনক্রমেই সত্যবানকে পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হন না। যমদেব নিকটে আসিয়া সাবিত্রীকে কত প্রকারে প্রবোধ দেন, কত প্রকারে তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু সাবিত্রী কোনও প্রবোধ, কোনও প্রলোভন, মানিতে চাহেন না। তখন তাঁহার ঐকান্তিকতা ও পতিপ্রাণতা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া, যমরাজ তাঁহাকে পাঁচটী বর প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হন। সাবিত্রী তাহাতে বলেন,—“আমার স্বপুত্র ও স্বপুত্রী দৃষ্টিশক্তি সহ রাজ্য-পদ পুনঃপ্রাপ্ত হউন। তাঁহাদের এক শত পুত্র এবং পতির ঔরসে আমারও এক শত পুত্র লাভ হউক। আমার পতি সত্যবান চারি শত বৎসর পরমায়ু লাভ করুন।” যমরাজ সন্তুষ্ট হইয়া সাবিত্রীকে সেই বরই প্রদান করেন। তখন, সুপ্তোপ্তিতে রাখিয়া সত্যবান লাগিয়া উঠেন। সংক্ষেপতঃ ইহাই সাবিত্রী-সত্যবানের উপাখ্যান। * সাবিত্রী—পতিব্রতাগণের অগ্রগণ্যা। তাঁহাদের প্রণয়—পবিত্র দাম্পত্য-অমুরাগের আদর্শ। রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রিংশ সর্গে, রামের বন-গমনোপলক্ষে, সীতাদেবী শ্রীরামচন্দ্রকে বলিতেছেন,—

“হ্যমংসেন হুতঃ বীরঃ সত্যবন্তমমুত্রতাম। সাবিত্রীমিব মাং বিদ্ধি ত্বমাশ্রয়বর্জিনীম্।”

“সাবিত্রী যেক্ষপ সত্যবানের অনুবর্তিনী হইয়াছিলেন, আমিও সেইরূপ আপনার অনুবর্তিনী হইব।” যাহা হউক, এই সাবিত্রী-সত্যবানের উপাখ্যানে আমরা দুইটী দেশের যে দুই জন নৃপতির বা যে দুইটী রাজ-বংশের পরিচয় পাই, কোনও বংশ-লতার কোথাও তাঁহাদের অস্তিত্ব নাই। কিন্তু পুরাণাদির বর্ণনায় বুঝিতে পারা যায়,—শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতির রাজত্ব-কালের পূর্বে শাৰদ দেশে এবং মর্ত্ত্যদেশে হ্যমংসেন ও অশ্বপতি নৃপতি বিদ্যমান ছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে, চন্দ্রবংশে, অরাসন্ধের অধস্তন ষোড়শ পর্যায়ে, এক হ্যমংসেন নৃপতির নাম দৃষ্ট হয় বটে; কিন্তু তিনি এবং সত্যবানের পিতা হ্যমংসেন কখনই এক ব্যক্তি হইতে পারেন না,—হওয়া সম্ভবপরও নহে। অশ্বপতি নামে রামায়ণে এক নৃপতির পরিচয় আছে বটে; কিন্তু তিনি সাবিত্রীর পিতা অশ্বপতি নহেন। রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে চতুঃ-সপ্ততিতম সর্গে এবং উত্তরাকাণ্ডে অষ্টত্রিংশ সর্গে, তিনি কৈকেয়ীর পিতা, ভরতের শাশুড়ী, কেকয়-রাজ বলিয়া পরিচিত। তাহাতে দেখিতে পাই—শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যভিষেক পর্য্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন।

* মহাভারত, বনপর্ক, বিনবভারিক বিশততম অধ্যায় ইহতে সপ্তবভারিক বিশততম অধ্যায়; দেবী-ভাগবত, নবম স্কন্ধ, বড়বিশং ইহতে ঐক্যদ্বারিংশ অধ্যায়; বংশপুরাণ, অষ্টাবিক বিশততম অধ্যায় ইহতে চতুর্দশাদিক বিশততম অধ্যায় প্রভৃতি উল্লিখ্য।

এক অযোধ্যার রাজ-সিংহাসনের ইতিবৃত্ত যদি অহুসঙ্কান করি, তাহাতেই বা কি দেখিতে পাই! মহাপ্রস্থানের পূর্বে জীরামচন্দ্র আপন পুত্র ও ভ্রাতৃপুত্রগণের মধ্যে রাজ্য বন্টন করিয়া দিয়া যান। বিদ্যা-পর্কতের নিকট কুশের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত অযোধ্যার আদি ও শেষ।

নগরে লবের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কুশ—কোশল-রাজ্যের, এবং লব—উত্তর কোশলের আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। শত্রুদের সুবাহ ও শত্রুঘাতী নামক তনয়দ্বয় যথাক্রমে মথুরা ও বৈদিশ-রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ভরতের পুত্র তক্ষ—তক্ষশীলার,—এবং পুঙ্কল—পুঙ্কলাবতের আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। লক্ষণ-পুত্র অঙ্গদ এবং চন্দ্রকেতু—অঙ্গদীয়া এবং মল্লভূমিতে প্রতিষ্ঠা দ্বিত হইয়াছিলেন। এইরূপে কুমারগণকে আপন-আপন রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিয়া, জীরামচন্দ্র প্রভৃতি যখন মহাপ্রস্থান করেন, অযোধ্যা তখন শূন্য হইয়াছিল। পৌরজন সকলেই তাঁহাদের অহুসরণ করিয়াছিলেন। প্রাণি-গণের মধ্যে ঘাঁহারা সরযুজলে স্নান করিয়া দেহ-ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই নরদেহ পরিত্যাগ পূর্বক দেবরথে দিব্যালোকে উপনীত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে বহু বংশের কাল মনোহরা অযোধ্যাপুরী শূন্য পড়িয়া ছিল। অবশেষে, বহু বংশের পরে, ঋষভ-রাজার রাজত্ব-কালে, অযোধ্যা-নগরী পুনরায় জনপূর্ণ হয়। রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে, চতুর্বিংশতাব্দিক শততম সর্গে অযোধ্যার জনশূন্যতা সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে,—

“অযোধ্যাণি পুরী রম্যা শূন্য বর্গগণানু বহন। ঋষভঃ প্রাপ্য রাজানং নিবাসমুপযাতি ॥”

‘জীরামচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর মনোহরা অযোধ্যাপুরী বহু বংশের পর্য্যন্ত শূন্য থাকিয়া, ঋষভ রাজার রাজত্ব-কালে, পুনরায় জনপূর্ণ হইবে।’ সে ঐবিষ্ণু কাল কবে, কত দিন পরে এবং সে ঋষভই বা কোন বংশ-সম্ভূত,—কোথাও তাহার নিদর্শন নাই।

উপসংহারে যেমন ঋষভ, আরম্ভে তেমনই ক্ষুপ। রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে এবং মহাভারতের অৰ্শমেধ পর্কে ক্ষুপ নামক নৃপতির পরিচয় পাই। রাজায়ণের মতে,—তিনিই পৃথিবীর আদি রাজা। সৃষ্টির আদি-কালে সত্যযুগে মহুতাদিগের কোনও

ক্ষুপ—
আদি রাজা।

রাজা ছিল না বলিয়া মহুজগৎ ত্রক্ষার শরণাপন্ন হন। ত্রক্ষা তখন দেবতাগণকে অংশ দিতে বলিয়া, ‘ক্ষুপ’ শব্দ করিয়া ইচ্ছিয়াছিলেন;

তাহা হইতেই দেবতাদিগের অংশ লইয়া ক্ষুপ রাজা জন্মগ্রহণ করেন। বলা বাহুল্য,

পুরাণে ইক্ষাকুর যে জন্ম-বিবরণ প্রকাশিত, ক্ষুপের জন্ম-বিবরণও এখানে প্রায় তদনুরূপ।

অতঃ দিকে, মহাভারতের অৰ্শমেধ-পর্কে চতুর্থ অধ্যায়ের যাহা লিখিত আছে, তাহাতে

ক্ষুপকে ইক্ষাকুর পূর্ব-পুরুষ বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। সেখানে যুধিষ্ঠির ব্যাসদেবের নিকট

রাজারি মন্ত্রের বিবরণ প্রবণ করিতে চাহিতেছেন; আর, ব্যাস তাহাতে বলিতেছেন,—

“হে ভাত! সত্যযুগে বহু নামে প্রজাপালক দণ্ডধর রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র—প্রসঙ্গি

নামক বিখ্যাত। প্রসঙ্গির পুত্র—ক্ষুপ। ক্ষুপের পুত্র—ইক্ষাকু।” এইবার বুঝিবা সকল

বংশ-লতা উন্টাইয়া যায়। প্রায় সকল পুরাণের বংশ-লতায় ইক্ষাকুকেই মহুর পুত্র

বলিয়া পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে ইক্ষাকু হইলেন—মহুর প্রপৌত্র,—যথো

দুই পুরুষ ব্যবধান ! বিষ্ণুপুরাণে, নেদিষ্ট-বংশে, অশ্বশ্বন একাদশ পর্যায়ে, একজন স্কুপ
আছেন বটে ; কিন্তু তিনি যে মহা পুত্র স্কুপ নহেন,—তাহা বলাই বাহুল্য ।

ইক্ষাকুর এক শত পুত্রের মধ্যে সর্ব-কনিষ্ঠ পুত্র যে ‘দণ্ড’ (দণ্ডক), তাঁহার বিষয় পুরাণ-সমূহে
যদিও বিশেষ কিছু উল্লেখ নাই ; কিন্তু রামায়ণে দেখিতে পাই,—সেই সর্ব-কনিষ্ঠ পুত্রকে
মুখ ও মুচ মনে করিয়া, ইক্ষাকু তাঁহাকে ‘দণ্ড’ নামে অভিহিত করিয়া-
ছিলেন । মুখতার জন্ত ভবিষ্যতে তাঁহার দণ্ড হইতে পারে,—এই
আশঙ্কায়, ইক্ষাকু তাঁহার ঐরূপ নামকরণ করেন । বিষ্ণু ও ঋক

অশ্বাশ্ব
রাজগণ

(মতান্তরে—শৈবল) পর্বতদ্বয়ের মধ্যভাগে তাঁহার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । তাঁহার
রাজধানীর নাম—‘মধুমন্ত’ । তিনি উশনা মুনিকে নিজ পৌরহিত্যে বরণ করিয়া
রাজ্য পালন করিতেন । বহু বর্ষ কাল নিকটকে রাজ্য শাসন করিয়া, রাজা দণ্ড একদা
চৈত্র মাসে শুক্লাচার্যের আশ্রমে গিয়া, এক অপকর্ম করিয়া বলেন । তাহাতেই তাঁহার
রাজ্য ছারেখারে যায় ; তিনি সবংশে নিধন-প্রাপ্ত হন । সে অপকর্ম,—তিনি বল-পূর্বক
ভার্গবের জ্যেষ্ঠা কন্যা অরজার কুমারী-ধর্ম নষ্ট করেন । রাজাকে নিরস্ত করিবার জন্ত
অরজা বিশেষরূপ চেষ্টা পাইয়াছিল ; বলিয়াছিল,—“আপনি আমার পিতার নিকট প্রার্থনা
করিয়া, ধর্ম-সম্বতরূপে আমার পাণি-গ্রহণ করিতে পারেন । নচেৎ, আমার প্রতি বল-প্রয়োগ
করিলে আমার পিতার ক্রোধানলে আপনি দক্ষীভূত হইবেন ।” কিন্তু দণ্ড সে কথা
কর্ণপাত করেন নাই । ফলে, শুক্লাচার্যের অতিশাপে, তাঁহার রাজ্য সপ্তাহ-মধ্যে ভূত,
বল ও বাহন সহ দক্ষ হইয়া গিয়াছিল । বিষ্ণু ও ঋক পর্বতের মধ্যবর্তী যে দণ্ড-রাজ্য
ছিল, তদবধি সেই রাজ্য দণ্ডকারণ্যে পরিণত হয় । রামায়ণের সম-সময়ে তপস্বিগণের
বসবাসে দণ্ডকারণ্য ‘জনস্থান’ নামে পরিচিত হইয়াছিল । * এই বনে বিদর্ভরাজ খেত
তপস্তা করিয়াছিলেন । তিনি সুরদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র । সুরধ নামে তাঁহার এক ভ্রাতা ছিলেন ।
কিন্তু বংশ-লতায় এই সকল ব্যক্তির স্থান নির্দেশ করা যায় না । বিদর্ভরাজ খেত
ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াও ক্ষুধা-তৃষ্ণার হস্ত হইতে অব্যাহতি পান নাই । জীবিত-কালে
রাজ্যভোগের ক্ষয়, তিনি কাহাকেও কখনও কিছু দান করেন নাই ; কেবল নিজের শরীর
সুপুষ্ট করিবার জন্ত সর্বদা ব্যস্ত ছিলেন । সূতরাং, তপঃ-প্রভাবে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলেও,
তাঁহাকে সেই কর্মের ফল-ভোগ করিতে হইয়াছিল । ক্ষুণ্ণিপাসায় কাতর হইয়া তিনি যখন
ব্রহ্মার নিকট কারণ-জিজ্ঞাসু হন ; ব্রহ্মা তাঁহাকে পূর্ব-কর্মের ফল-ভোগ হইতেছে বলিয়া
উপদেশ দেন,—“তোমার নিজের শবদেহ ভক্ষণ করিয়া, এক্ষণে তোমাকে স্মরিত্ব করিতে
হইবে । সেই শবদেহ তোমার তপস্তা-ক্ষেত্রে সরোবরে ভাসমান আছে । ছুমি অগস্ত্যের
অনুকম্পায় মুক্তি লাভ করিবে ।” রাজা খেত একদা ব্রহ্মলোক হইতে অবতরণ করিয়া
শবদেহ ভক্ষণ করিতেছেন ; ইতিমধ্যে মহামুনি অগস্ত্য আসিয়া তথায় উপনীত হন ।
তখন অগস্ত্যকে সকল কথা জ্ঞাপন করিয়া, রাজা মুক্তি-লাভ করিয়াছিলেন । মুক্তি-লাভের
সময় অগস্ত্যকে রাজা বহু ধন-রত্ন উপহার দিয়াছিলেন ।

* রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড, বিনয়ভিত্তিক সর্গ হইতে চতুর্থভিত্তিক সর্গে বর্ণিত এই বণ্ড-বিষয় বর্ণিত আছে ।

রাক্ষস-রাজ রাবণের পৃথিবী-পরিক্রমণ উপলক্ষে দেখিতে পাই,--তিনি 'উশীরবীজ' নামক স্থানে নরপতি মরুতের যজ্ঞ ধ্বংস করিয়াছিলেন। কিন্তু সে মরুত কোন্ বংশের কোন্ মরুতের যজ্ঞ পর্যায়ে অবস্থিত, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। ব্রহ্মস্পতির সহোদর-ভ্রাতা সংবর্ত, দেববর্গ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া, মরুতের যজ্ঞ করিতে-রাবণের শিরাজয়। ছিলেন। দিগ্বিজয়ী রাবণ সেই স্থানে উপনীত হইয়া যুদ্ধ-প্রার্থী হন; বলেন,—“হয় যুদ্ধ কর, নয় পরাজয় স্বীকার কর।” মরুত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়া-ছিলেন; কিন্তু সংবর্ত তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করেন। রাবণের ভয়ে দেবতাগণ এই সময় পক্ষিযোনি মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন; ইন্দ্র ময়ূর হইয়াছিলেন; ধর্মরাজ কাক, কুবের কুকলাস এবং বরুণ হংস হইয়াছিলেন। যজ্ঞ ভঙ্গ করিয়া রাবণ সেই যজ্ঞ-সমাগত মহর্ষি-দিগকে গ্রাস করেন। মরুত রাক্ষসকে পরাজিত দেখিয়া, রাবণের মন্ত্রী শুক রাবণের জয়-ঘোষণা করিয়া বলিয়াছিল,—“এই যজ্ঞে সমাগত মহর্ষিদিগকে ভোজন করিয়া, তাঁহাদের রক্তে আমরা বড়ই পরিতৃপ্ত হইলাম।” বাহা হউক, রাবণ প্রজ্ঞা করিলে, ইন্দ্রাদি দেবগণ আপন আপন স্বরূপ প্রকাশ করেন। তখন, যিনি যে প্রাণি-রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, তিনি সেই প্রাণীর মাহাত্ম্য বাড়াইয়া দেন। পূর্বকালে ময়ূর নীলবর্ণ ছিল। সেই হইতে ইন্দ্রের বরে বিচিত্রতা লাভ করে। যমের বরে কাকের মৃত্যু-ভয় দূর হয়; এবং কুকলাস স্বর্ণ-বর্ণ লাভ করে। এইরূপে এক এক প্রাণী এক এক গুণে গুণাঙ্কিত হয়। * কিন্তু রাবণ কর্তৃক যাহার যজ্ঞ নষ্ট হইল, সে মরুত কে? বিষ্ণুপুরাণের স্বর্ষ্যবংশে অষ্টাদশ পর্যায়ে (নেদিষ্টের বংশে) এবং শ্রীমদ্ভাগবতের স্বর্ষ্যবংশে বিংশ পর্যায়ে (দিষ্টের বংশে) দুই জন মরুতের অস্তিত্ব দেখিতে পাই। কিন্তু তাঁহারা কি এই মরুত? তাঁহাদেরও পুরোহিতের নাম সংবর্ত দেখিয়াছিলাম বটে; কিন্তু তাহা হইলে তিনি কি প্রকারে লঙ্কাধিপতি রাবণের সম-সাময়িক হইলেন;—তাহা কদাচ উপলব্ধি হয় না। রাবণের প্রসঙ্গে আরও দুই একটা অভিনব ঘটনা মনে পড়ে। কার্ত্তবীৰ্য্যার্জুন রাবণকে বধন করিয়াছিলেন এবং পুলস্ত্যের অহুরোধে রাবণকে মুক্তি দান করেন; আবার সেই কার্ত্তবীৰ্য্যার্জুন পরশুরামের হস্তে নিহত হন। অধিকন্তু দেখিতে পাই,—সুরথ, গাধি, গয়, পুরুরবা প্রভৃতি পৃথিবীপালকগণ রাবণের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া-ছিলেন এবং অনরণ্য-সংরক্ষিত অযোধ্যা-নগরী রাবণ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল; রাজা অনরণ্য আহত হইয়া রাবণকে অতিসম্প্রীত দিয়াছিলেন,—“মহেশ্বর-সন্তান দশরথ-পুত্র রাম তোমার প্রাণ-বধ করিবেন।” † অনরণ্যের দেহান্তে, রাক্ষস-রাজ রাবণ অযোধ্যাপুরী পরিত্যাগ করেন। বংশ-লতায় পুরুরবা, অনরণ্য, দুয়ন্ত প্রভৃতির স্থান কোথায়, এবং শ্রীরাঘচন্দ্রের স্থান কোথায়,—বিবেচনা করিতে গেলে, স্তম্ভিত হইতে হয়। সে ক্ষেত্রে, রাবণের অলৌকিক দীর্ঘ-জীবন স্বীকার ভিন্ন, সামঞ্জস্য সাধন কোনক্রমেই সম্ভবপর নহে। রামায়ণে শ্রীরাঘচন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী এক সুধমার নাম দৃষ্ট হয়। সাক্ষাৎ-

* , † রাবণ, উত্তরকাত, অষ্টাদশ ও উনবিংশ সর্গে রাবণ কর্তৃক মরুতের যজ্ঞ-ধ্বংস-বিবরণ এবং অযোধ্যা আক্রমণ প্রভৃতি বর্ণিত।

পুরীতে তাঁহার রাজধানী ছিল। হরষবর্জনের পূর্বে জানকীকে লাভ করিবার জন্য, তিনি মিথিলা আক্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হইলে, জনকের ভ্রাতা কুশধ্বজ তাঁহার রাজধানী অধিকার করেন। সুধবা নামে অনেক নৃপতিরই পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু এ সুধবা কোন্ বংশ-সম্বৃত, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। এদিকে আবার, মহাতারতের অখমেধ-পর্বে হংসধ্বজ রাজার পুত্র—এক সুধবার পরিচয় পাই! বুদ্ধিষ্ঠের অখমেধ-যজ্ঞের অখ বন্ধন করিয়া রাখায়, পাণ্ডবগণের সহিত হংসধ্বজ রাজার যুদ্ধ উপস্থিত হয়। সেই যুদ্ধে সুধবা যথা-সময়ে অস্ত্র ধারণ করেন নাই। তজ্জন্ত পিতৃ-আদেশে তাঁহাকে তপ্ত-তৈল-কটাহে নিমজ্জিত করা হয়। সুধবা হরি-প্রায়ণ ছিলেন। সুতরাং তাহাতে সুধবার মৃত্যু হয় না; পরন্তু, সুধবা নবজীবন লাভ করিয়া, তপ্ত তৈল-কটাহ হইতে উত্থান করিয়াই পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করেন। সেই যুদ্ধে অর্জুনের হস্তে সুধবার মস্তকচ্ছেদ হয়; এবং সেই ছিন্ন-মস্তক কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিতে করিতে ঐকৃষ্ণের চরণে আশ্রয়-গ্রহণ করে। সুধবার ভ্রাতা সুরথ এবং রাজা হংসধ্বজ কিছুকাল যুদ্ধ করিয়া শেষে ঐকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন।

নৃগ ও ব্রহ্মদত্ত নামক দুই জন নৃপতির অলৌকিক বিবরণ দৃষ্ট হয়। রামায়ণে নৃগের পুত্রের নাম—বশু বলিয়া উল্লেখ আছে। কিন্তু নৃগ যে কোন্ বংশ-সম্বৃত, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। ঐমন্তাগবতে ইক্ষ্বাকুর ভ্রাতার নাম—নৃগ; কিন্তু বশু
নৃগ
ও
ভ্রহ্মদত্ত।
তাঁহার প্রপৌত্র। নৃগের সম্বন্ধে এক অলৌকিক উপাখ্যান প্রচলিত আছে। নৃগ পরম ব্রাহ্মণ-ভক্ত ছিলেন। পুঙ্কর-তীর্থে যজ্ঞকালে তিনি ব্রাহ্মণ-গণকে কোটী কোটী গাভী দান করিয়াছিলেন। ভ্রমক্রমে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের একটি সৰৎসা গাভী সেই সঙ্গে বিতরিত হইয়াছিল। গাভীর সন্ধান পাইয়া, ব্রাহ্মণ নৃগের নিকট অভিযোগ করিতে আসেন। কিন্তু বহু চেষ্টায়ও তিনি রাজপুরীতে প্রবেশ করিয়া রাজার সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ হন না। ইহাতে ব্রাহ্মণ রাজাকে অভিশপ্ত করেন; বলেন,—“তুমি যেমন আমার দর্শন না দিয়া অন্তরালে রহিলে, তেমনি তুমি কুকলাস হইয়া গর্ভমধ্যে বাস কর।” কুকলাস হইয়া রাজা গর্ভে প্রবেশ করিলে, (রামায়ণের মতে) তাঁহার প্রপৌত্র বশু রাজা হইয়াছিলেন। স্বাপনের শেষ ভাগে বাসুদেব ঐকৃষ্ণ কর্তৃক নৃগের শাপ-মুক্তি হয়। * নৃগের কুকলাস-প্রাপ্তির স্থায়, রামায়ণে ব্রহ্মদত্ত নামক এক নৃপতির বৃক্ষ-প্রাপ্তির পরিচয় পাওয়া যায়। গৌতম নামক এক ব্রাহ্মণ রাজ-বাটীতে অতিথি হইয়াছিলেন। সেই অতিথির খাতের সহিত দৈব-ক্রমে মাংস মিশ্রিত হয়। তাহাতে সেই অতিথি ব্রাহ্মণ, “গৃধ্র হও” বলিয়া, রাজাকে অভিসম্পাত করেন। বহু অহুন্নয় বিনয়ের পর পরিশেষে ব্রাহ্মণ-রাজার শাপ-মুক্তির উপায় বলিয়া দেন,—

* রামায়ণে, উত্তর-কাণ্ডে, চতুঃষষ্টিতম সর্গে, নৃগের উপাখ্যান এইরূপ ভাবেই বর্ণিত আছে। কিন্তু ঐমন্তাগবতে, দশম অঙ্কে, চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়ে, এই উপাখ্যান একটু ভ্রূপান্তরে দেখিতে পাই। সেখানে দাভা ও প্রতিবর্তা বলিয়া রাজা নিলিভ হন; এবং ভ্রমরাজের বিচারে তাঁহাকে কুকলাস হইতে হয়। পাণ্ডবগণে ঐকৃষ্ণের স্পর্শে বৃদ্ধি-লাভের পর রাজা পুণ্য-কল-ভোগী হইয়াছিলেন।

“ভবিষ্যকালে ঐরামচন্দ্রের স্পর্শে তোমার মুক্তি-লাভ হইবে।” রাম-রাজ্যে এক উল্লুকের সহিত গৃধ্রের বিবাদ হয়। বিবাদ—বাসস্থান লইয়া। রামের নিকট অত্যাচার-ছলে উল্লুক বলে,—“পৃথিবীর সৃষ্টি হইতে আমি এই বাসার অধিকারী।” গৃধ্র বলে,—“মহুচ্ছ-সৃষ্টি হইতে আমি এই বাসার বাস করিতেছি।” ঐরামচন্দ্র মীমাংসা করেন,—‘বৃক্ষাদি সৃষ্টির আদিভূত ; মহুচ্ছ তাহার পরবর্ত্তি-কালে সৃষ্ট হইয়াছে।’ সুতরাং গৃধ্রকেই তিনি দোষী বলিয়া নির্দেশ করেন, এবং তাহার প্রাণ-বধে উদ্যোগী হন। ইতিমধ্যে গৃধ্রকে স্পর্শ করিয়া শাপ-মুক্ত করিবার জন্ত রামের প্রতি দৈববাণী হয়। তখন ঐরামচন্দ্রের স্পর্শে গৃধ্র দেহ-দেহ লাভ করে। রামায়ণে ব্রহ্মদত্তের এতদ্ভিন্ন অল্প কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। মহাভারতের শান্তিপর্বে আর এক ব্রহ্মদত্তের উপাখ্যান দেখিতে পাই। শক্রগণকে বিশ্বাস করা বিধেয় নহে, অথচ বিশ্বাস না করিলে কিরূপে রাজা শত্রু-জয়ে সমর্থ হইবেন,—এই প্রশ্নের উত্তর-ছলে, ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরের নিকট ব্রহ্মদত্ত নৃপতির উপাখ্যান বর্ণন করেন। এই ব্রহ্মদত্ত কাম্পিলা-দেশের অধিপতি ছিলেন। তাহার পুত্র—পুঞ্জনী-নামী পক্ষিণীর পুত্রকে বধ করিয়াছিল। পক্ষিণী তাহাতে পুত্র-হত্যা রাজ-পুত্রের নয়ন-যুগল উৎপাটন করে। রাজা তাহাতে পক্ষিণীর প্রতি কোনরূপ বিরক্তির ভাব প্রকাশ করেন না ; পরন্তু বলেন,—“আমার পুত্র যে গর্হিত কর্ম করিয়াছে, তুমি তাহার উচিত শাস্তিই প্রদান করিয়াছ।” এই বলিয়া, রাজা ব্রহ্মদত্ত পক্ষিণীকে আপন আলয়েই পূর্ব্ববৎ বসবাস করিতে বলেন। কিন্তু পক্ষিণী তাহাতে সম্মত হয় না। সে বলে,—“কাহারও অনিষ্ট করিয়া, তাহার আশ্রয়ে কদাচ বাস করিতে নাই।” অতঃপর, পক্ষিণী সে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়।

ঐবৎস-চিন্তার উপাখ্যান, কালীরাম দাসের মহাভারতের সাহায্যে, বাঙ্গালার ঘরে ঘরে প্রচারিত। চিত্ররথ নামে এক পৃথিবীপতি রাজা ছিলেন। তাহার পুত্রের নাম—ঐবৎস।

চিত্রসেন রাজ-কন্ডা চিন্তার সহিত তাহার বিবাহ হয়। ঐবৎস বিচক্ষণ ধার্মিক নৃপতি ছিলেন। একদা লক্ষ্মী ও শনির মধ্যে পরস্পরের শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়। তাহারা ঐবৎস রাজাকে মধ্যস্থ মাফ করেন।

বহু চিন্তার পর, লক্ষ্মী ও শনির বসিবার জন্ত, ঐবৎস দুই খানি আসন প্রস্তুত করিয়া রাখেন। আসনের এক খানি স্বর্ণে বিনির্মিত, অপর খানি রৌপ্যে বিরচিত। রাজ-সভায় উপনীত হইয়া, কমলা প্রথমেই স্বর্ণ-সিংহাসনে উপবেশন করেন ; শনি রজত-সিংহাসনে উপবেশন করিতে বাধ্য হন। অবশেষে কথায় কথায় তাহাদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয়। রাজা ঐবৎস তাহাতে উত্তর দেন,—“স্বর্ণ-ছত্র-সম্বিত স্বর্ণ-সিংহাসন এবং রজত-ছত্র-সম্বিত রজত-সিংহাসন—এতদ্ভিন্ন আসন-ছত্র হইতেই শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিয়া লউন।” রাজার বিচারে, শনি কোপাধিত হইয়া প্রহান করেন ; লক্ষ্মী সন্তুষ্ট হইয়া রাজাকে আশীর্বাদ জানান। শনি ছল অবেশে রাজাকে বিপদপ্রস্ত করিবার জন্ত চেষ্টা করিত হন। কমলা রাজার বির-বিপত্তি দূরীকরণ পক্ষে প্রয়াস পান। দৈব-ক্রমে এক দিন রাজা ঐবৎসের জ্ঞান-জল কুঁড়ে পান করিল। সঙ্গে সঙ্গে, সুযোগ পাইয়া, শনিও তাহার রাজ্যে প্রবিষ্ট

হইলেন। রাজ্যে ভূ-কম্পন, রক্ত-বৃষ্টি, জল-প্রাবণ, অকাল-মৃত্যু উপস্থিত হইল। রাজা রাজ্য-ত্যাগে বাধ্য হইয়া বনবাসী হইলেন। বন-গমন-কালে তিনি মহিষী চিন্তাকে পিতৃদেবতার হাইবার জন্ত অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু সতী ছায়ার জায় পতির অত্যাচার হইয়াছিল। “যাহা হউক, সেই সময় কমলা তাঁহাদিগকে বলিয়া গেলেন,— “কিন্তু কাল গ্রহ-ভোগের পর, তোমরা রাষ্ট্রার্থ্য পুনঃ-প্রাপ্ত হইবে। দুঃখ-কষ্টের নিপীড়নে কদাচ ধর্মপথ ভ্রষ্ট হইও না।” রাজা ও রাণীর বনগমন-কালে পথি-মধ্যে শনি মায়ার-নদীর স্রোত করেন। রাজ্য-ত্যাগ-কালে রাজা কতকগুলি বহু-মূল্য সামগ্রী সঙ্গে লইয়াছিলেন। নদী পার হইবার সময়, শনির চক্রান্তে, প্রথমেই সেইগুলি তাঁহাদের হস্তচ্যুত হয়; এদিকে মায়ার-নদীও শুকাইয়া যায়। ফল-মুগ্ধাহারে পঞ্চবর্ষ-কাল বনে বনে পরিভ্রমণের পর, এক কাঠুরিয়ার গৃহে তাঁহারা আশ্রয় প্রাপ্ত হন। কাঠুরিয়াগণের সহিত বনে বনে কাঠ সংগ্রহ করিয়া, তখন কিছুকাল তাঁহাদের জীবন-যাত্রা নির্ভর্য্য হইয়াছিল। সেখানে হইতে বণিকগণ কর্তৃক চিন্তা অপহৃত হন। চিন্তার অন্বেষণে ঘুরিতে ঘুরিতে শ্রীবৎস, বাহু রাজার রাজ্যে উপনীত হইয়াছিলেন। সেখানে মালিনীর গৃহে অবস্থিতি করিয়া, স্বয়ংবরে তিনি বাহু-রাজ-কন্যা তদ্বার পাণি-গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে দৈবক্রমে বণিকের নৌকা সেই রাজ্যে উপস্থিত হয়। নৌকায় চিন্তা আবদ্ধ ছিলেন। বাহু-নৃপতির সাহায্যে চিন্তার উদ্ধার-সাধন হয়। শ্রীবৎস এবং চিন্তাকে এতাদৃশ বিপন্ন করিয়াও, শনি তাঁহাদিগকে ধর্ম-ভ্রষ্ট করিতে পারেন নাই। এক্ষণে, তাঁহাদের পরীক্ষার চরম হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া, শনি তাঁহাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন। পরিশেষে রাজা শ্রীবৎসকে বরদান করিয়া, শনি কহিলেন,—“আপনি দীর্ঘ-জীবন লাভ করিয়া, দশ সহস্র বৎসর অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্য-ভোগ করিবেন। আপনার স্ত পুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করিবে।” ইহার পর, বাহু-রাজ-কন্যা তদ্বাকে এবং চিন্তাকে লইয়া, শ্রীবৎস স্ব-রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্ত হন। তাঁহার যশঃ-সৌরভে দ্বিগুণিত পরিপূর্ণ হয়। ইহাই শ্রীবৎস রাজার মূল উপাখ্যান। * কিন্তু এই প্রসঙ্গোক্ত শ্রীবৎস, বাহু, চিত্রাধ ও চিত্রসেন প্রভৃতি কোন্ বংশের কোন্ পর্যায়-ভুক্ত, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

* শ্রীবৎস-রাজার উপাখ্যান-সম্পদে কাশীরাম দাসের মহাভারতে লিখিত আছে,—

“আর্য্যগণের কণী, অতি দুঃখ-মোক্ষদাতা,

রচিলেন মহামূল্য ব্যাস।

রচিল পাঁচালী-ছন্দে, মনের আবেশানন্দে,

কৃষ্ণদাসভূজ কাশীদাস।”

অথচ আশ্চর্য্যের বিষয়, ব্যাস-বিরচিত মহাভারতে এই শ্রীবৎস-রাজার উপাখ্যান আলোচনা দেখিতে পাই না। অধিক বলিব কি, ব্যাস-বিরচিত পুরাণ-গুরুত্বের আলোড়ন করিয়াও আমরা শ্রীবৎসের উপাখ্যান খুঁজিয়া পাইলাম না। তবে কাশীদাস একথা কেন লিখিয়া গেলেন? তিনি কথক-দিগের মুখে মহাভারত পাঠ শ্রবণ করিয়া যদি মহাভারত রচনা করিয়া থাকেন, আর তাহা হইতে এই উপাখ্যান-বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতা-লাভ হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই উপাখ্যান কি কথকদিগেরই মনঃকল্পিত? অথবা, ব্যাস-বিরচিত মহাভারতের অংশ-বিশেষে বা কোমল পুরাণে এই উপাখ্যান লিখিত ছিল,—কালক্রমে তাহা লোপ পাইয়াছে। যাহা হউক, ব্যাস-বিরচিত মহাভারত ও পুরাণ-সমূহে এই উপাখ্যান বৃষ্ট না হইলেও, ভৈরবী প্রণীত মহাভারতে (ভৈরবী-ভারতে) শ্রীবৎস-রাজ বিবরণ বর্ণিত আছে, জানিতে পারা যায় শ্রীবৎস-অবোধার অধিপতি ছিলেন। মহাভারত, শ্রীবৎস-আপদ্দেশের অধিপতি বলিয়া প্রসিদ্ধ।

পুরুষোত্তম মহাতীর্থের সহিত ঐহার নাম চির-সংগ্ৰথিত রহিয়াছে, সেই ইন্দ্রচূলা পরাক্রমশালী ইন্দ্রচূড় নরপতির পরিচয়ই বা বংশ-লতার কোথায় পাই ? সেই সত্যবাদী,

ইন্দ্রচূড়
ও
জগন্নাথ-ক্ষেত্র ।

সৰ্দ্ধ-শাক্তজ, ব্রহ্ম-নিষ্ঠ নৃপতি সত্য-যুগে বিদ্যমান ছিলেন । মালব-দেশে অবজ্জী নামে যে ভুবন-বিশ্রুত নগরী ছিল, সেই নগরেই রাজা ইন্দ্রচূড় রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন । রাজা ইন্দ্রচূড় সঙ্গার পৃথিবীর অধীশ্বর

ছিলেন । তাঁহার রাজধানী অবজ্জী-নগরী হুই-পুই জনগণে পরিপূর্ণ ছিল । সুদৃঢ় প্রাকার, তোরণ, বহু, অর্গল, দ্বার ও পরিখা সমূহে নগরী সৰ্ব্বদা সুশোভিত ও সুরক্ষিত থাকিত ।

‘সে নগরে নানা দেবী বণিক-সম্প্রদায়, রাশি রাশি দ্রব্য-সম্ভার, নানা রথ্যা এবং নানা আপগ বিদ্যমান ছিল । রাজহংসের আয় শুভ্রবর্ণ চিত্র-বিচিত্র ও মনোহর শত

শত সহস্র সহস্র প্রাসাদের দ্বারা ঐ নগরী অলঙ্কৃত থাকিত । কত হস্তী, কত অশ্ব, কত রথ, কত পদাতি, কত বর্ণের কতরূপ ধ্বজ-পতাকা, কত দেশের কত যোদ্ধাপুরুষ এবং

কত জনসমূহ যে ‘সেখানে বসতি করিত, তাহার ইয়ত্তা নাই । ঐ নগরী যজ্ঞোৎসবে সৰ্ব্বদা আমোদিত এবং গীত-বাদিত্র-রবে সৰ্ব্বদা মুখরিত ছিল ।’ সৰ্ব্বগুণাকর রাজা ইন্দ্রচূড়

পৃথিবী-পালনে নিরত হইবার পর, শ্রীহরির আরাধনার জন্ত ব্যাকুল হন । কোন্ ক্ষেত্রে, কোন্ তীর্থে, কোন্ তীরে, কোন্ আশ্রমে, দেবদেব জনার্দনের আরাধনা করা শ্রেয়ঃ, এইরূপ

চিন্তাক্রান্ত হইয়া, তিনি মহীস্থ তীর্থক্ষেত্র-সমূহ পর্য্যটন করেন । পরিশেষে মুক্তিপ্রদ পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে উপনীত হইয়া, প্রভূত দক্ষিণা-প্রদান-পূর্বক, যজ্ঞাহুষ্ঠানে প্রেরিত হন ।

সেই সময়ে তাঁহার মনে শ্রীহরির প্রাসাদ-নিৰ্ম্মাণের চিন্তা সমুদিত হয় । কোন্ মূর্তিতে, কি ভাবে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা করিলে, তাঁহার আবির্ভাব হইতে পারে, আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ

করিয়া, রাজা অমুক্ষণ তাহাই ধ্যান করিতে লাগিলেন । তখন, শ্রীহরি স্বপ্নে দর্শন দিয়া, তাঁহাকে বলিলেন,—“তোমার ভক্তিতে ভগবান প্রীত হইয়াছেন । নিশা-অবসানে, সাগরজলে,

তুমি এক মহাবৃক্ষ দেখিতে পাইবে । তাহাতে শঙ্খ-চক্রের চিহ্ন আছে । সেই বৃক্ষে ভগবানের প্রতিমা নির্মাণ করিও । ভগবান সেই প্রতিমায় চির-বিদ্যমান থাকিবেন ।” প্রভাতে রাজা

ইন্দ্রচূড় স্বহস্তে কুঠার গ্রহণ-পূর্বক যখন সমুদ্র-তীরে গমন করিলেন, বিষ্ণু এবং বিষ্ণুকর্ণা উভয়ে ব্রাহ্মণ-বেশে তাঁহাকে দর্শন দিলেন । সমুদ্রে মহাবৃক্ষ ভাসমান ছিল । ব্রাহ্মণরূপী বিষ্ণুকর্ণা

এবং বিষ্ণুর সাহায্যে ইন্দ্রচূড় তদ্বারা প্রতিমা প্রস্তুত করাইলেন । তিনটি মূর্তি নির্গিত হইল । প্রথম মূর্তি—শুভ্রবর্ণ, শরচ্ছত্র-সমদ্বাতি, আরক্ত-নেত্র, ফণিকণাকুল মস্তক, নীলাধরধর, বল-

মদ-গৰ্বিত, এক-কুণ্ডলধারী, গদামূলপাণি—বলদেব । দ্বিতীয় মূর্তি—নীলজীমূত-সন্নিভ, পুণ্ডরীক নয়ন, অতঙ্গী-পুষ্প-সঙ্কাশ পদ্মপত্রায়ত-নেত্র, পীতবাসা, শ্রীবৎসবন্ধা, সৌম্যবপু,

চক্রধারী, সৰ্ব্বপাপহারী—শ্রীহরি । তৃতীয় মূর্তি—স্বর্ণ-বর্ণাভ, পদ্ম-পলাশ-নেত্র, বিচিত্র-বস্ত্র-পরিহিত, দ্বার-কেয়ুর-ভূষিত, বিচিত্রাভরণযুক্ত, রত্নহার-সমলঙ্কৃত, পীনোন্নতস্তনী, মনোহারিণী

—সুভদ্রা । এই তিন মূর্তি নির্মাণ করিয়া, বিষ্ণুকর্ণা দিব্যালঙ্কারে তাঁহাদিগকে ভূষিত করিলেন । মূর্তিত্রয় অবলোকন করিয়া, রাজা ইন্দ্রচূড় সন্তোষে প্রণত হইলেন । ব্রাহ্মণ-বেশী বিষ্ণু তখন আশ্ব-পরিচয় প্রদান করিয়া কহিলেন,—“আমিই পুরুষোত্তম ; আমিই

জগন্নাথ ; আমিই সর্বময় । যত দিন চন্দ্র-সূর্য্য-পৃথিবী-সমুদ্র, তত দিন ইহাতে আমি অবস্থিত রহিলাম ।” ইহাই পুরুষোত্তম তীর্থে প্রতিষ্ঠা, ইহাই জগন্নাথ-ক্ষেত্রে জগন্নাথের অধিষ্ঠান । বিষ্ণুর বরে দশ সহস্র নব শত বৎসর পর্য্যন্ত ইন্দ্রদ্যুম্ন নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে মহারাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন । পরে তিনি সুরাসুর-দুর্লভ দিব্যধামে গমন করেন । * উৎকল-খণ্ডে এই জগন্নাথ-প্রতিষ্ঠা-কাহিনী একটু রূপান্তরে দৃষ্ট হয় । অবন্তী নগরের বিষ্ণু-মন্দিরে পূজার সময় রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন এক জন বেদবিৎ ব্রাহ্মণকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—“এমন পবিত্র স্থান কোথায় আছে, যেখানে যাইলে এই চন্দ্র-চন্দ্র ভগবানের দর্শন পাইতে পারি ?” বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ তাহাতে উত্তর দিয়াছিলেন,—“ওড়্র-দেশে দক্ষিণ-সমুদ্রতীরে পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র । সেখানে নীলকান্ত-মণি-বিনির্মিত যে নীলমাধব মূর্ত্তি আছে, সেই মূর্ত্তি দর্শন করিলেই, ভগবানের প্রত্যক্ষ-দর্শন লাভ হইবে ।” এই বলিয়াই ব্রাহ্মণ অন্তর্ধান হন । ইন্দ্রদ্যুম্ন অবশেষে রাজৈক্যব্যপ্তি পরিত্যাগ করিয়া, পুরুষোত্তমে গমন করেন । একাক্যানন, কপোতেশ্বর, বিষ্ণেশ্বর, ভুবনেশ্বর প্রভৃতি দর্শন করিয়া পরিশেষে তিনি পুরুষোত্তমে নীলকণ্ঠ-সমীপে উপনীত হন । কিন্তু সেখানে আসিয়া, ব্রাহ্মণ-কথিত নীলমাধব মূর্ত্তি আর তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয় না । কারণ-জিজ্ঞাসায় নারদ বলেন,—“নীলাচল বান্দুকায় আবৃত হইয়াছে । ভক্তের অভাবে নীলমাধব পাতালে প্রবেশ করিয়াছেন ।” † নারদের বাক্যে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন পরিতাপ করিতে লাগিলেন ;—মূচ্ছিত হইয়া পড়িলেন । তখন, রাজাকে সাহায্য করিয়া, নারদ কহিলেন,—“আপনার যজ্ঞস্থতানে গদাধর আবার আবির্ভূত হইবেন ।” তদনুসারে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন শত অধমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন । যজ্ঞের ষষ্ঠ দিনে স্বপ্নে ভগবান তাঁহাকে মহাসাগরস্থিত মহাবৃক্ষ আনয়নের পরামর্শ দেন । সেই বৃক্ষে শঙ্খ-চক্রের চিহ্ন ছিল । দৈববাণী-ক্রমে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন পঞ্চদশ দিবস সেই বৃক্ষ মন্দির মধ্যে বসিয়া, মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখেন । বিধি-মতে হুতধর-রূপে আসিয়া তাহাতে প্রতিমা নিষ্কাশন করিয়াছিলেন । জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমার দিনে দ্বারোন্মোচন করিয়া, রাজা মন্দির মধ্যে আপন স্বপ্ন-দৃষ্ট প্রতিমা-মূর্ত্তি দেখিতে পান । সেই মূর্ত্তি ত্রয়—জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা । রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের এবং জগন্নাথের ইতিহাস—পুরাণে, প্রত্নতত্ত্বে, কাব্যে, বৈকব্য-সাহিত্যে, পরবর্ত্তি-কালে কত রূপান্তরেই পরিবর্ত্তিত হইয়া আছে ! রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন নীলমাধবের বেদীমাত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; পুরুষোত্তম-তীর্থে গমন করিয়া, যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ-পাণ্ডব ইন্দ্রদ্যুম্নেরও বেদীমাত্রের পরিচয় পাইয়াছিলেন । ‡ পরিবর্ত্তনের পর

* ব্রহ্মপুরাণ, চতুর্দশাংশ অধ্যায় হইতে এক-পঞ্চাশ অধ্যায় ; নারদপুরাণ, উত্তরখণ্ড, বিংশাংশ অধ্যায় হইতে ষট্-পঞ্চাশ অধ্যায় ; ব্রহ্মপুরাণ উত্তর খণ্ডে এবং এসকল : অন্ত্যস্ত পুরাণেও এই জগন্নাথ-তীর্থের মাহাত্ম্য পরিবর্ত্তিত আছে ।

† উৎকলখণ্ডের মতে,—রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা-সপ্তমী-তিথিতে, গুরুবারে, পূজা নক্ষত্রে, সন্মিলনে পুরুষোত্তমে যাত্রা করিয়াছিলেন । জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা-চতুর্থী তিথিতে, ‘বাড়ী’ নক্ষত্রে, সেখানে নৃসিংহবেশের প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি যজ্ঞারম্ভ করেন ।

‡ মহাভারত, ‘বনপর্ক’, চতুর্দশাধিক শততমোধ্যায়—বৈতরণী নদী প্রভৃতি পার হইয়া, পাণ্ডবেরা এই পুরুষোত্তম তীর্থে উপনীত হন,—আভাস পাণ্ডুর দায় ।

পরিবর্তন-প্রবাহ আসিয়া, ইন্দ্রহ্যের মন্দির কত প্রকারে ধ্বংস-বিস্তৃত করিয়া ফেলিয়াছিল, অতীত-সাক্ষী ইতিহাস আজিও তাহার কত অক্ষুট পরিচয় বন্ধে ধারণ করিয়া আছে। ফলতঃ, রাজা ইন্দ্রহ্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার কোনই উপায় নাই; অথচ, কোন বংশের কোন পর্যায়ে তিনি অবস্থিত, তাহাও নির্ধারণ করা সুকঠিন। মহাত্ম্যরত্নে বন-পার্শ্বে এক ইন্দ্রহ্যের প্রসঙ্গ আছে। পুণ্যক্ষয় হইলে তিনি স্বর্গ-ভ্রষ্ট হন। সেই সময় প্রতিপন্ন হয়, তাঁহার দক্ষিণাদন্ত গো-যুগের চক্র-মণ্ডে একটি সরোবর উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহাতে তিনি জল-দানের ফলভাগী হন। তখন স্বর্গ হইতে পুনরায় দিব্য রথ আসিয়া ইন্দ্রহ্যকে স্বর্গে লইয়া যায়। মহাত্ম্যরত্নে এই ইন্দ্রহ্য এবং জগন্নাথ-ক্বেত্রে প্রতিষ্ঠাপন্ন সেই ইন্দ্রহ্য—একই ব্যক্তি কি না, কে নির্ণয় করিবে?

যেমন পুরুষোত্তমের ইতিহাসে ইন্দ্রহ্য, তেমনই বারাণসীর ইতিহাসে সুপ্রতীক। কোনও বংশ-লতায়ই যেমন ইন্দ্রহ্যের নাম অল্পসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না; বারাণসীর নৃপতিগণের মধ্যেও সেইরূপ সুপ্রতীকের এবং দুর্জয় ও কানী-নরেশগণ। সুহ্য নামক তাঁহার পুত্রদ্বয়ের কোনই পরিচয় প্রাপ্ত হই না। পুরাণ-সমূহ পাঠ করিয়া সাধারণতঃ বুঝিতে পারি,—সুহোত্রের (সুহোতার) পুত্র কাশ বা কাশ্চ হইতেই কানীরাজ্যের প্রতিষ্ঠা। ধনুস্তরি, দিবোদাস, প্রতর্দন প্রভৃতি কানীরাজগণের নাম, পুরাণ-পাঠক-মাত্রেই প্রায় পরিচিত। যদিও ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বংশ-লতা দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাঁহাদের কীর্তি-কাহিনী চির-প্রসিদ্ধ। আমরা ভিন্ন ভিন্ন পুরাণ হইতে সংগ্রহ করিয়া কানীরাজ-বংশের বংশ-পর্যায় প্রকাশ করিয়াছি।* কিন্তু সে বংশ-পর্যায়ের কোথাও সুপ্রতীকের, সুহ্যের বা দুর্জয়ের নাম নাই। অথচ, সুপ্রতীক সত্য-যুগে মহাবল-পরাক্রান্ত নৃপতি ছিলেন। বারাণসী-পতি সেই সুপ্রতীকের পুত্র দুর্জয়, সমস্ত ভারতবর্ষ স্ব-বশে আনয়ন করিয়া, ক্রমশঃ কম্পুরুষ-বর্ষ, হরি-বর্ষ এবং রোমাবত, কুরু, তদ্রাধ, ইলারূত ও মেরুমধ্য প্রভৃতি সমস্ত দেশ অধিকার করেন। সমগ্র জম্বুদ্বীপ জয় করিয়া, শেষে তিনি দেবরাজ ইন্দ্রকে পর্যাস্ত পরাজিত করিয়াছিলেন। অবশেষে বিকুর চক্রান্তে দুর্জয় নিহত হন। গৌরমুখ ঋষির আশ্রয়-সমীপে তাঁহার বহু-সংখ্যক দৈত্য-সেনার সহিত দেবগণের যুদ্ধ হইয়াছিল। ঋষির প্রার্থনা-মাত্র ‘নারায়ণ চক্রান্ত প্রয়োগ করিয়া, নিমেষ মধ্যে তাঁহার সকল সৈন্য ভস্মসাৎ করেন।’ সেই অরণ্যে দুর্জয় এবং তাঁহার সৈন্যদল ‘নিমেষ মধ্যে নিহত’ হইয়াছিল বলিয়া, তাহা ‘নৈমিষারণ্য’ নামে অভিহিত হয়। বাহা ইউক, এই দুর্জয় এবং সুপ্রতীকের পূর্বে বা পরে, ঐ বংশের আর কেহ বারাণসী রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন কিনা, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। হয় তো তাঁহাদের বংশ-লতায় ক্রম-ভঙ্গ হইয়া থাকিবে। তবে, কাশ বা কাশ্চ হইতে উৎপন্ন যে বংশ কানীর অধীশ্বর বলিয়া পরিচিত, তাহার মধ্যেও কি অল্প বিশৃঙ্খলা দেখিতে পাই? তাহারও একের সহিত অন্তের মিল নাই। কানীরাজ দিবোদাস,—

* এই গ্রন্থের ৩০৭, ৩১০, ৩১৩, ৩১৮, ৩২৩ এবং ৩২৮ প্রভৃতি পৃষ্ঠায় বংশ-লতায় ধনুস্তরি দিবোদাসদির পরিচয় দ্রষ্টব্য।

তাঁহার সম্বন্ধেই কত মতান্তর! আমাদের প্রকাশিত বংশ-লতার তাঁহার সম্বন্ধে কি অসামঞ্জস্য বিদ্যমান, পূর্বেই আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছি। মহাভারতে আবার দেখিতে পাই,—দিবোদাসের পিতামহ হর্ষাশ্ব নামে পরিচিত। দিবোদাস—কাশীরাজ সুদেবের পুত্র। বীতহব্য-বংশীয় শূরগণ কর্তৃক উৎপীড়িত হইয়া, বংশনাশ-ভয়ে, মহীপতি দিবোদাস, বৃহস্পতির স্ত্রী পুত্র ভরদ্বাজ ঋষির শরণাগত হইয়াছিলেন। সেই ঋষির যজ্ঞ-প্রভাবে, প্রতর্দন নামে তাঁহার এক পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করে। সেই পুত্র, জন্মমাত্র সমুদ্রতীরে দশবর্ষীয় পুরুষের আয় বর্দ্ধিত হইয়াছিল এবং অল্প দিনেই সমস্ত বেদ-ধর্ম্মর্ষেদ শিক্ষা করিয়াছিল। প্রতর্দনের সহিত যুদ্ধে রাজা বীতহব্যের পুত্রগণ পরাজিত হয়। ‘তাহারা শত সহস্র ভল্লাজ দ্বারা ছিন্ন-মস্তক ও রুধিরার্দ্্র হইয়া নিকৃত কিংবাকের আয় ধরাতলে পতিত’ হইয়াছিল। তনয়গণ নিহত হইলে, বীতহব্য মহর্ষি ভৃগুর শরণাগত হন। প্রতর্দন পশ্চাদ্ভ্রমরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু নৃপতির প্রাণ-রক্ষার জন্ত প্রতর্দনকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া, মহর্ষি ভৃগু বলিয়াছিলেন,—“এখানে কোনও ক্রিয় নাই। এখানকার সকলেই ব্রাহ্মণ।” আশ্রিত জনের রক্ষার জন্ত ভৃগুর বাক্য শ্রবণ করিয়া, প্রতর্দন সন্তুষ্ট হন। আপন প্রভাবে নৃপতি বীতহব্যকে স্বজাতি-ত্যাগিত করিতে পারিলেন বলিয়াও প্রতর্দনের আনন্দের অবধি রহিল না। এদিকে, ভৃগুর অন্ত্রগ্রহে বীতহব্য ব্রহ্মবিষ ও ব্রহ্মবাদিস্ত লাভ করিলেন। জন্মান্তরের পুণ্যফলে ক্রত্বয়ের ব্রাহ্মণ্য লাভ হইল। বীতহব্যের ইন্দ্রের আয় সৌন্দর্য্য-সম্পন্ন গৃৎসমদ নামে এক পুত্র ছিলেন। তাঁহাকে ইন্দ্র-ব্রমে দৈত্যগণ এক-বার বন্ধন করিয়া লইয়া গিয়াছিল। গৃৎসমদ ব্রহ্মর্ষি হইয়াছিলেন; তাঁহার পুত্র সুতেজাও ব্রাহ্মণ হন। বীতহব্যের বংশ—“শৌনক-ব্রাহ্মণ-বংশ” নামে বিখ্যাত। তাঁহার বংশ-লতা এইরূপ;—



চন্দ্রবংশের বংশ-লতার মধ্যে এক গৃৎসমদের নাম দৃষ্ট হয়। তাঁহার বংশেও শৌনক-ব্রাহ্মণগণের উৎপত্তি-বিবরণ দেখিতে পাই। সে গৃৎসমদ—সুহোত্রের (সুনহোত্রের) পুত্র এবং কাশ বা কাশের ভ্রাতা বলিয়া পরিচিত। কিন্তু সে সকল বংশ-লতার বীতহব্যের নাম কোথাও নাই। প্রতর্দন যে দিবোদাসের পুত্র, তাহা নিয়ে প্রায় মতান্তর দেখি না। তবে, তাঁহার পর্য্যায় সম্বন্ধে বড়ই অনৈক্য। বিষ্ণুপুরাণে আয়-পুত্র কত্রবন্ধের বংশে ষোড়শ পর্য্যয়ে প্রতর্দন বিদ্যমান। হরিবংশে প্রতর্দন দুই জন! এক জন—আয়-পুত্র অনেনার বংশে; অপর এক জন—পুরুবংশে। এক জনের পর্য্যায়—বড়বংশ; অপর জনের পর্য্যায়—ব্রাহ্মণ। ব্রহ্মপুরাণেও দুই প্রতর্দন! প্রথম—অনেনার বংশে বড়বংশ পর্য্যয়ে; দ্বিতীয়—পুরুবংশে ত্রিংশ পর্য্যয়ে। অথচ, আশ্চর্য্যের বিষয়—সকল স্থলেই

প্রতর্দনের পিতার নাম—দিবোদাস; এবং সে দিবোদাস কাণীরাজ্যের অধিপতি বলিয়া পরিচিত। এদিকে আবার, রামায়ণে দেখিতে পাই,—কাণীর রাজা প্রতর্দনের সহিত রামচন্দ্রের মিত্রতা-সম্বন্ধ। রামের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে এবং লঙ্কার মহাসমরে তিনি রামচন্দ্রের সহায়তা করিতেছেন। সেই প্রতর্দন এবং এই প্রতর্দন এক ব্যক্তি কিনা, নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। প্রতর্দন, দিবোদাস এবং তাঁহার পূর্ব-পুরুষগণ সম্বন্ধে বহু কাহিনী প্রচলিত আছে। ইহাদের উৎকৃষ্টতন পুরুষে হর্যাক্ষের (কেহ কেহ বলেন, কেতুমানের অপর নাম—হর্যাক্ষ) রাজত্বকালে যদু-বংশীয় হৈহয়-পুত্রগণ অনেকবার কাণী আক্রমণ করিয়াছিলেন। হৈহয়গণের হস্তে হর্যাক্ষ নিহত হন। হর্যাক্ষের পুত্র স্নেহদেবও রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া হৈহয়গণ কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। দিবোদাস এবং প্রতর্দনের সময়েও হৈহয়গণের সহিত তাঁহাদের যুদ্ধ চলিয়াছিল। হৈহয়-বংশীয় ভদ্রশ্রেণ্য নৃপতি, স্নেহদেবের সংহার-সাধন করিয়া, বারাণসী অধিকার করেন। দিবোদাস অশেষ আয়াসে ভদ্রশ্রেণ্যকে বিনাশ করিয়াছিলেন। ভদ্রশ্রেণ্যের পুত্র—হর্দম, বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া, দিবোদাসকে পরাজয় করেন; কাণী—হর্দমের অধিকারভুক্ত হয়। প্রতর্দন, সেই হর্দমকে পরাজিত করিয়া, কাণীর পুনরুদ্ধার-সাধন করিয়াছিলেন। দিবোদাস এবং প্রতর্দন উভয়েই পরম ধার্মিক এবং রাজ্যিক বলিয়া প্রসিদ্ধ। দিবোদাস কশ্মণ্ডণে দেবতার স্তায় সম্পূজিত হইয়াছিলেন। দিবোদাসের রাজত্বকালে, ক্ষেত্রক রাজ্যের উপদ্রবে, নিকুন্ডের অতিসম্পাতে, কাণী জনশূন্য ও হত-শ্রী হইয়াছিল। দিবোদাস সেই সময়ে গোমতী-তীরে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। দিবোদাস মহীপতির প্রতাপ এবং তাঁহার নির্মাণ-প্রাপ্তির বিষয়, কল্পপুরাণান্তর্গত কাণী-খণ্ডে বিশদ-ভাবে বর্ণিত আছে। তিনি কাণীর বহু স্ত্রীস্বত্ব-সাধন করিয়াছিলেন। * কাণীখণ্ডের মতে, দিবোদাসের অপর নাম—‘রিপুঞ্জয়।’ বিষ্ণুর আদেশে, গঙ্গার পশ্চিম তটে, তিনি ‘দিবোদাসেশ্বর’ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। সে মতে, জ্যেষ্ঠ পুত্র সমঞ্জসকে (মতান্তরে—সজয়কে) রাজ্য প্রদান করিয়া, তিনি নির্মাণ লাভ করিয়াছিলেন। এই বংশের অলর্ক কাণীর প্রনট-গৌরব পুনরুদ্ধার করেন। তাঁহার শাসন-কালে বারাণসী নগরী রমণীয় বেশে সুসজ্জিত হইয়াছিল।

অলর্কের নাম করিতে আবার কত কথাই মনে আসে! অলর্কই কি এক জন! মার্কণ্ডেয়-পুরাণে দেখিতে পাই,—শক্রজিৎ নামে এক রাজা ছিলেন; তাঁহার পুত্রের নাম—ঋতধ্বজ (ঋতুধ্বজ), আর সেই ঋতধ্বজের পুত্র—অলর্ক মহীপতি। সেই অলর্কের অলর্ক-প্রসঙ্গ। দুই জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন; তাঁহাদের নাম—বিক্রান্ত ও সুবাহ।

শক্র-কুলকে দমন করিয়া, মহীপতি অলর্ক ‘অরিমর্দন’ নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। কাণী-নরেশ অলর্ক এবং এই ঋতধ্বজ-পুত্র অলর্ক উভয়ে যে স্বতন্ত্র ব্যক্তি ছিলেন, তাহা সহজেই প্রতীত হয়। মার্কণ্ডেয়-পুরাণে লিখিত আছে,—‘অলর্কের ভ্রাতা সুবাহ, রাজ্য-লাভের নিষিদ্ধ অনেক বার কাণীপতির শরণাপন্ন হইয়াছিলেন; আর, সেই

* কল্পপুরাণান্তর্গত কাণীখণ্ড, ত্রিভুবারিংশ ও অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় এবং হরিবংশে প্রভৃতি লিখিত।

কাশীরাজ, সুবাহর পক্ষ অবলম্বন করিয়া, এই অলঙ্কের প্রতিকূলে যুদ্ধ-যাত্রা করিয়াছিলেন । সেই যুদ্ধে অলঙ্ক নিপীড়িত ও কীর্ণবল হইয়া পড়েন । তাঁহার নগর অবরুদ্ধ হয় ; কোষাগার শূন্য হইয়া যায় । অতঃপর, জননী মদালসার উপদেশ শ্রবণান্তর আত্ম-বিবেক লাভ করিয়া, অলঙ্ক সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন ।’ অলঙ্কের জননী মদালসা অলঙ্ককে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাতে মদালসার জ্ঞান-গবেষণা ও বিজ্ঞাবতার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় । উপদেশচ্ছলে মদালসা, পুত্র অলঙ্ককে এক সময়ে কহিয়াছিলেন,—

‘সঙ্গঃ সর্বাঙ্গনা ত্যাগ্যঃ সচেৎ ত্যক্তুং ন শক্যতে । স সন্তিঃ সহ কৰ্ত্তব্যঃ সত্যং সঙ্গো হি ভেদজন্ম ।

কামঃ সর্বাঙ্গনা হোয়া জাতুক্ষেচ্ছক্যতে ন সঃ । যুমুক্ষাং প্রতি তৎকার্য্যং সৈব তত্কাপি ভেদজন্ম ।’

‘সর্বাঙ্গঃকরণে সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে । যদি সঙ্গ-ত্যাগে সমর্থ না হও, তাহা হইলে সেই সঙ্গ সাধুগণের সহিত করাই কৰ্ত্তব্য ; কারণ, সাধু-সঙ্গই পরম ঔষধ-স্বরূপ । সর্বাঙ্গঃকরণে কাম পরিত্যাগ করা বিধেয় । যদি উহা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ না হও, তাহা হইলে মুক্তি-কামনার প্রতিই কামনা করা উচিত । কেন-না, উহাই তাহার মহৌষধ ।’ বিদূষী মদালসা এক-খানি শাসন-পত্রে এই কয়েকটি কথা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন ; আপৎ-কালে, পবিত্র-চিত্তে, ইহা পড়িয়া দেখিতে পুত্রকে উপদেশ দিয়াছিলেন । জননীর এই উপদেশ-বাণী শ্রবণ করিয়া, অলঙ্ক মহর্ষি দত্তাত্রেয়ের শরণার্থী হন । দত্তাত্রেয় তাঁহাকে যোগ-তত্ত্ব শিক্ষা দেন । দত্তাত্রেয়ের নিকট যোগ-শিক্ষার ফলে, অলঙ্ক মুক্তির পথে অগ্রসর হন । অলঙ্কের পিতা ঋতধ্বজ-সম্বন্ধেও নানা বিচিত্র উপাখ্যান প্রচলিত আছে । বজ্রকেতু দানবের পুত্র পাতালকেতু, গালব ঋষির যজ্ঞ-কর্ণে বিষ উৎপাদন করিত । ঋষি সেই দৈত্যের ধ্বংস-কামনায় দেবধ্বজের শরণাপন্ন হন । তাহাতে আকাশ হইতে একটি অশ্ব পতিত হয় ! দেববাণীতে গালব-ঋষি জানিতে পারেন,—‘সেই অশ্ব জল-স্থল-মরুভোম সর্বত্র বিচরণ করিতে পারিবে । ভুবলয়ে তাহার অব্যাহত গতি বলিয়া, সে ‘কুবল’ নামে আখ্যাত হইবে । শক্রজিৎ রাজার পুত্র ঋতধ্বজকে ঐ অশ্ব প্রদান করিলে, অশ্ব-রত্নে আরোহণ-পূর্বক, তিনি পাতালকেতুর সংহার-সাধনে সমর্থ হইবেন । সেই অশ্বের নামানুসারে ঋতধ্বজ—‘কুবলয়াশ্ব’ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিবেন ।’ দৈববাণী-ক্রমে ঋতধ্বজের নিকট উপস্থিত হইয়া, মহর্ষি গালব সেই দেবদত্ত অশ্ব তাঁহাকে প্রদান করেন । সেই অশ্বে আরোহণ করিয়া, পাতালে গমন-পূর্বক, রাজা ঋতধ্বজ বাণাঘাতে পাতালকেতুকে শমন-সমনে প্রেরণ করিয়াছিলেন । সেখানে অনিন্দ্যাসুন্দরী গন্ধর্ব্বকন্যা মদালসার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় । মদালসা—বিশ্বাবস্তু নামক গন্ধর্ব্বরাজের কন্যা । এক দিন তিনি উজ্জান-মধ্যে ক্রীড়া করিতে-ছিলেন ; এমন সময়, পাতালকেতু তাঁহাকে অপহরণ করিয়া আনে, এবং বিবাহ করিবার উদ্দেশে তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখে । ঋতধ্বজ, মদালসার উদ্ধার-সাধন করেন । ঋতধ্বজের সহিত মদালসার পরিণয়-ক্রিয়া সম্পন্ন হয় । ইহার পর, পাতালকেতু দানবের অমূল্য তালকেতু, ভ্রাতৃ-হত্যার প্রতিশোধ-গ্রহণে উত্তোষী হইয়াছিল । কিন্তু বাহবলে কুবলয়াশ্বকে পরাজিত করা লম্ববপর নহে বুঝিয়া, তালকেতু মারাজাল বিস্তার করে । সে যুনিরূপ গ্রহণ করিয়া, যমুনা-তটে অবস্থান করিতেছিল ;—এমন সময় রাজপুত্র কুবলয়াশ্ব তথায়

উপস্থিত হন। তখন, তালকেতু কুবলয়াখের নিকট তিকা-প্রার্থী হয়; বলে,—“আমি বজ্র করিব; আমার দক্ষিণা দিবার সামর্থ্য নাই। আপনার মুকুট ও কণ্ঠভূষণ যদি আমার প্রদান করেন, আমি কৃতকৃত্য হই।” ধার্মিক-প্রবর কুবলয়াখ তাহাতেই সন্মত হন। অতঃপর কুবলয়াখকে আপন আশ্রমে কিছুকণ অপেক্ষা করিতে বলিয়া, তালকেতু বক্রগদাধার স্তব করিতে যায়। সে কিন্তু তাহার ছলনা মাত্র। সেই অবসরে, কুবলয়াখ-ভবনে গমন করিয়া, তালকেতু মদালসার সহিত সাক্ষাৎ করে; কুবলয়াখের মুকুটাদি দেখাইয়া বলে,—“কুবলয়াখের মৃত্যু হইয়াছে।” ছদ্মবেশী তালকেতুর কথার বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, মদালসা পতিশোকে প্রাণত্যাগ করেন। কুবলয়াখ প্রত্যাগত হইয়া, মদালসার শোকে অভিভূত হন। নাগরাজ অশ্বতরের পুত্রগণের সহিত কুবলয়াখের বন্ধুত্ব ছিল। নাগরাজ দৈব-বিজ্ঞা অবগত ছিলেন। তিনি সেই দৈব-বিজ্ঞাবলে মদালসার জীবন-দান করেন। তার পর, মদালসার অলঙ্কারি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। এই অলঙ্কের সহিত কেহ কেহ কাশীরাজ অলঙ্কের অভিন্নত্ব প্রতিপাদনের প্রয়াস পাইয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে,—‘প্রতর্দনের পুত্র বৎস—‘ঋতধ্বজ’ ও ‘কুবলয়াখ’ নামে বিখ্যাত ছিলেন। মদালসা সেই বৎসের পত্নী। অলঙ্ক তাঁহারই গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।’ কিন্তু পূর্বাগর আলোচনা করিলে, এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বড়ই হুঃসাধ্য। * বাহা হউক, ধর্ম্মাত্মা অলঙ্ক জামাত্বসারে স্ত্রুত-নির্ম্মিশেষে প্রজা-পালন করিতেন। ছুটের দমন এবং শিটের পালন করিয়া, তিনি বহুবিধ শ্রেষ্ঠ বজ্র সম্পন্ন করিয়াছিলেন। রামায়ণে আর এক অলঙ্কের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। সত্যরক্ষার্ক, দশরথকে উৎসাহিত করিবার জন্ত কৈকেয়ী বলিতেছেন,—“দেখুন, সত্যরক্ষার্ক নিমিত্ত মহীপতি শৈব্য, অঙ্গীকার করিয়া, স্তেন-পক্ষীকে স্বীয় শরীর প্রদান করিয়াছিলেন। তজ্জন্ত তিনি উত্তম গতি লাভ করেন। আরও দেখুন,—তেজস্বী অলঙ্ক কোনও বেদজ্ঞ বাচমান ব্রাহ্মণকে স্বীয় নেত্রদ্বয় প্রদান করিতে অঙ্গীকার করিয়া, অব্যাকুলিত চিত্তে স্বীয় নেত্রদ্বয় উৎপাটন করিয়া, তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন।” † মহিষী কৈকেয়ীর এই উক্তিতে রামায়ণে যে শৈব্যের ও অলঙ্কের পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁহারাই বা কে? রামায়ণে শৈব্যের নামে যে উপাখ্যান প্রচলিত, মহাত্মারূপে তিন হলে তিন প্রকারে সেই প্রসঙ্গ উত্থাপিত। প্রথম,—বনপর্বের বহুব্রাহ্মণিক শততম অধ্যায়ে দেখিতে পাই,—উদীনর-পুত্র শিবি, শরণাগতের প্রাণ-রক্ষার্থি এইরূপে আশ্র-ত্যাগের পরাকর্ষ্য প্রদর্শন করিতেছেন। সেই শিবির পুত্রের নাম—কপোতরোমা। দ্বিতীয়,—শান্তিপর্বের দুইটি অধ্যায়ে সেই একই কাহিনী রূপান্তরে পরিবর্ণিত। সেখানে শিবির পরিবর্তে উদীনর (নামান্তরে—বৃষদর্ভ বা শৈব্য) শরণাগতের প্রাণ-রক্ষার জন্ত আশ্রপ্রাণ সমর্পণ করিতেছেন। সে উপাখ্যান এই,—‘রাজা উদীনর পরম ধার্মিক ছিলেন; তিনি বজ্র করিয়া, ইন্দ্রভূজ্য প্রভাববান্ হইয়াছিলেন। তাঁহার বর্ষবল পরীক্ষা করিবার জন্ত, ইন্দ্র ও অগ্নি যথাক্রমে স্তেন ও কপোত-রূপ ধারণ করিয়া, তাঁহার বজ্রহুগ্নে উপনীত হন। কপোত,

* এই অলঙ্কের বিভিন্ন চরিত্র, বার্কণ্ডের পুরাণের বিংশ হইতে চতুস্তম্বাধিঃ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

† রামায়ণ, অব্যাকুলিত, চতুর্দশ সর্গ।

যেন স্তেন-ভয়ে পীড়িত ও শরণার্থী হইয়া, রাজা উশীনরের উরুদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে ; সঙ্গে সঙ্গে স্তেন-পক্ষী তাহাকে গ্রাস করিবার জন্য তাহার অঙ্গসমূহে রাজার নিকট উপস্থিত হয় । ভয়চকিত শরণাগত কপোতকে জোড়ে রক্ষা করিয়া, রাজা স্তেন-পক্ষীকে বুঝাইয়া প্রতিনিবৃত্ত করিবার প্রয়াস পান । কিন্তু স্তেন-পক্ষী তাহাতে উত্তর দেয়,—“আমার ভক্ষ্য-সামগ্রী আমি ভক্ষণ করিব, আপনি কেন আগতি করিতেছেন ? ক্ষুধিবৃত্তি করিয়া আমাকেও তো প্রাণ বাঁচাইতে হইবে ? আমার প্রাণ-রক্ষা করাও কি আপনার ধর্ম নহে ?” রাজা কহিলেন,—“শরণাগতকে আমি কোনক্রমেই পরিত্যাগ করিতে পারিব না । এই শরণাগত কপোত ব্যতীত শিবি-বংশের সমুদ্র রাজ্য অথবা যে কোনও বস্তু তোমার অভি-লষিত হয়, তাহা তোমাকে প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি ।” পক্ষী তাহাতে উত্তর দিল,—“যদি কপোতের প্রতি আপনার স্নেহ হইয়া থাকে, তবে আপনার দেহ হইতে মাংস কাটিয়া, এই কপোতের সম-পরিমাণ মাংস আমার প্রদান করুন ।” শরণাগতের রক্ষার্থ রাজা তাহাতেই সন্মত হইলেন । আশ্র-মাংস কর্তন করিয়া, তিনি কপোতের সহিত ভৌল করিতে লাগিলেন । কিন্তু শরীরের সকল মাংস কর্তন করিয়াও, কপোতের সমান হইল না । তখন অস্থিমাত্র অবশিষ্ট নির্মাংস রুধিরাম্লুত রাজা বৃষদর্ভ স্বয়ং ভুলাদণ্ডে আরোহণ করিলেন । পরীক্ষার চরম হইল ! ইচ্ছাদি দেবগণ রাজার মস্তকে পুষ্প-ফুটি করিতে লাগিলেন । রাজা স্তেন-কপোতের প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হইলেন । অতঃপর দেব-বিমানে আরোহণ করিয়া, রাজা উশীনর শাশ্বত-স্বর্গে গমন করিলেন । * কীর্ত্তি-কাহিনী বৈষ্ণব-ভাবেই পরিবর্ণিত হউক, কিন্তু এ উশীনর বা বৃষদর্ভ কোন্ বংশ-সম্বৃত ? মহাভারতে, রাজার উক্তিতে, আত্মা পাওয়া যায়,—উশীনর শিবি-বংশীয় । রামায়ণে ‘শৈব্য’ নামে অভিহিত হওয়ার, তাঁহাকে শিবি-বংশজ বলিয়া বুঝিতে পারি । কিন্তু বংশ-লতা অঙ্গুসন্ধান করিয়া আমরা তাঁহাকে পাইতেছি কৈ ? চন্দ্র-বংশান্তর্গত পুরু-বংশে এক উশীনর রাজার নাম দেখিতে পাই । তিনি হরিবংশে বড়বিংশ পর্যায়ে এবং ব্রহ্মপুরাণে চতুর্বিংশ পর্যায়ে অবস্থিত । কিন্তু তাহার পিতার নাম—মহামনা ; এবং শিবি প্রভৃতি তাহার পুত্র বলিয়া পরিচিত । তাহার উল্লেখ কোনও পুরুষে শিবির নাম-গন্ধ পর্য্যাপ্ত নাই । সুতরাং, স্তেন-কপোত-উপাখ্যানের উশীনর এবং হরিবংশ বা ব্রহ্মপুরাণের চন্দ্র-বংশ-সম্বৃত উশীনর যে অভিন্ন নহেন,—তাহা সত্যই প্রতীত হয় ।

পদ্মপুরাণে ত্রিরাশচন্দ্রের সমসাময়িক কতকগুলি রাজ-বংশের পরিচয় পাওয়া যায় । ত্রিরাশচন্দ্রের অধিবেশ-যজ্ঞের সময়, রাজার অশ্ব নানা দেশ পরিভ্রমণ করিয়া, জয়-শ্রী ঘোষণা করিয়াছিল । যে যে রাজ্যে সেই অশ্ব গমন করে এবং যে যে রাজা বৃত্ততা স্বীকার করেন, পদ্মপুরাণে তাহার কতকগুলি পরিচয় আছে । তখন অহিচ্ছত্র-নগরে জয়দ নামে এক রাজা ছিলেন । সেই নগরে ‘কামাক্য’ দেবী বিরাজ করিতেন । রাজা জয়দ কঠোর তপস্তার ফলে, স্ব-রাজ্যে দেবীর

* মহাভারত বনপর্বে—ত্রিশদ্বিক শততম ও একত্রিশদ্বিক শততম অধ্যায়-দ্বয়ে এবং অঙ্গুশাসন পর্বের ষাটবিংশ অধ্যায়ে স্তেন-কপোত-উপাখ্যানে উশীনর রাজার অঙ্গুত্বেই বা ।

আধিকানে সমর্থ হইয়াছিলেন। অহিচ্ছত্রা-নগরী বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ-কৃত্রিয় প্রকৃতি বহুতর জাতির আবাস-স্থান ছিল। সেখানে নানা রকম বিভূষিত ক্ষটিকময় অট্টালিকা-শ্রেণী শোভা পাইত। শ্রীরামচন্দ্রের মন্ত্রী সূমতির সহিত শক্রর যজ্ঞাধের অনুসরণে সেই রাজ্যে গমন করেন। রঘুকুলতিলক রামচন্দ্রের প্রতাপ, রাজা সূমদ সর্বতোভাবে বিদিত ছিলেন। শক্রর প্রকৃতি উপস্থিত হইবামাত্র তিনি উপচোকন-সহ তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। এইরূপে সূমদ রাজা বশুতা জ্ঞাপন করিলে, শক্রর ভিন্ন-দেশাভিমুখে গমন করেন। এই অহিচ্ছত্রা-নগরীর অনতিদূরে মহর্ষি চ্যবনের আশ্রম ছিল। সূমতির সহিত শক্রয়ের কথাবার্তায় প্রতীত হয়,—যেন চ্যবন ঋষি তখনও বিত্তমান আছেন। যজ্ঞাধ অতঃপর রত্নাতট নগরে উপনীত হয়। মহারাজ বিমল সেই দেশে রাজত্ব করিতেন। বহু যোদ্ধবর্গে পরিবৃত্ত হইয়া, যজ্ঞীয় অশ্ব রত্নাতট-অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে শুনিয়া, রাজা বিমল যথাযোগ্য উপচোকন-সহ শক্রয়ের শরণাপন্ন হন। শক্রর মহারাজ বিমলকে মিত্রভাবে আলিঙ্গন করিলে, মহারাজ বিমল পুত্রের উপর রাজ্য-ভার অর্পণ করিয়া, বহু-ধনুর্ধরে পরিবৃত্ত হইয়া, শক্রয়ের সহিত যাত্রা করেন। এই রাজ্য অতিক্রম করিলে নীলগিরি এবং পুরুষোত্তম-তীর্থ তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হয়। পুরুষোত্তম দর্শন করিয়া, তাঁহারা চক্রাকা-পুরীতে প্রবেশ করেন। সুবীর শক্রর, রাজা লক্ষ্মীনিধি এবং প্রচুর অগ্রগামী সৈন্ত সহ রাজা প্রতাপাশ্র অশ্বের রক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন। অশ্বের ললাট-পত্রে লিখিত ছিল,—“দশরথ-পুত্র রামচন্দ্রের শ্রায় ধনুর্ধর বীর জগতে দ্বিতীয় নাই। যাঁহারা আপনা-দিগকে ধনুর্ধরী বীর বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহারা বলপূর্বক এই রত্নমালা-বিভূষিত অশ্ব ধারণ করুন। সর্ব-বীর-শিরোমণি শক্রর তাঁহাদের হস্ত হইতে অশ্ব মোচন করিবেন। যদি কাহারও অভিমান না থাকে, তিনি বশুতা স্বীকার করুন।” চক্রাকাধিপতি সুবাহর পুত্র দমন, যজ্ঞাধের ললাট-লিপি দর্শন করিয়া, সে অশ্ব বন্ধন করিলেন; উত্তেজিত-কণ্ঠে কহিলেন,—“আমার পিতা বর্তমান থাকিতে পৃথিবীতে রামের এতই গর্ব হইয়াছে? তিনি কি আমাদের ক্ষত্রিয় বলিয়া মনে করেন না? যাহা হউক, আজ আমি তাঁহাদের দর্প চূর্ণ করিব।” ইহার পর, উভয়-পক্ষে ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হয়। বহু দিন সে যুদ্ধ চলিয়াছিল। যুদ্ধে দমনের হস্তে বহু সৈন্ত নিহত হয়। পরিশেষে, ভরত-পুত্র পুঙ্কলের নিকট দমন পরাজিত হন। দমনের পরাজয়ের পর, দমনের পিতা সুবাহ এবং দমনের খুল্লতাত চিত্রাঙ্গ অনেক দিন যুদ্ধ চালাইয়াছিলেন। পরিশেষে, হুর্জিত হইয়া রাজা সুবাহ স্বপ্নে শ্রীরাম-চন্দ্রকে দর্শন করেন। সেই হইতে তাঁহার মনে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি ভক্তির উদ্বেক হয়। শক্রর-সমীপে প্রণত হইয়া রাজা সুবাহ যজ্ঞাধ প্রত্যর্পণ করেন। অতঃপর, সেই জয়-পত্র-শোভিত অশ্ব, সত্যবান রাজার রাজ্যে—তেজপুরে উপনীত হয়। ভাগীরথী-তীরে অবস্থিত সেই তেজপুর নগর বহুল দেবায়তন এবং ঐতিগণে-পূর্ণ মঠ-সমূহে সুশোভিত ছিল। চতুর্দিকে বিচিত্র প্রাচীর এবং শুষ্কপরি শ্রেণীবদ্ধ স্তূপ-কলস-নিচয় ঐ নগরের শোভা-সম্বর্দ্ধন করিতেছিল। সত্যবান—রামচন্দ্রের অনুগত ছিলেন। সুতরাং যজ্ঞাধের উপস্থিতি-মাত্রে তিনি উপচোকনাদি প্রদানে বশুতা স্বীকার করিলেন। এই সত্যবানের পিতার নাম—ঋতজর।

বহু যজ্ঞের ফলে, বহু ব্রতাহুষ্ঠান-দ্বারা, তিনি এই পুত্র-রত্ন লাভ করেন। তেজপুর পরিত্যাগ করিয়া, অশ্ব আরণ্যক ঋষির আশ্রমে প্রবেশ করে। অতঃপর, নরুদা-সলিল অতিক্রম করিয়া, অশ্বসহ শক্রয়াদি বীরগণ দেব-নির্দ্রিত দেবপুরে উপস্থিত হন। ‘তথায় মানব-গণের গৃহসকল ঋক-মণিরয় ভিত্তি-বিত্তাস-হেতু যেন নাগগণ-সেবিত বিমল বিদ্যা-চলকেও উপহাস করিতেছিল।’ নৃপবর বীরমণি সে রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার পুত্র রুদ্ৰাঙ্গদ সেই যজ্ঞাশ্ব বন্ধন করেন। এ নগরেও ঘোরতর যুদ্ধ হয়। রাজা বীরমণি পুত্রের নিকট পরাজিত হইলে, রাজ-ভ্রাতা বীরসিংহ প্রবল বিক্রমে সমরারূপে অবতীর্ণ হন। স্বয়ং মহেশ্বর বীরসিংহের সহায় হইয়াছিলেন। স্মৃতরাং যুদ্ধে শক্রয়াদির পরাজয় হয়। পরিশেষে শ্রীরামচন্দ্র উপস্থিত হইলে, শিব-রামের অভিন্নত্ব উপলব্ধি করিয়া, বীরমণি দিব্যজ্ঞান লাভ করেন। যজ্ঞাশ্ব প্রত্যর্পিত হয়। রাজা বীরমণি, শ্রীরামচন্দ্রের শরণাগত হইয়া, বীর্য সৈন্ত-সামন্ত-সমভিব্যাহারে শক্রয়ের অঙ্গুগমন করেন। ইহার পর, ভারত-প্রান্ত-বর্ষী হেমকূট পর্বতে অশ্ব উপনীত হয়। সেই পর্বত অতিক্রম করিয়া, যজ্ঞাশ্ব একে একে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ দেশের রাজগণ-কর্তৃক সন্মান-প্রাপ্ত হইয়াছিল। অবশেষে, সুরথ-রাজার রাজধানী কুণ্ডল-নগরে অশ্ব উপনীত হইলে, রাজা সেই অশ্ব বন্ধন করেন। রাজার মহাবল-পরাক্রান্ত দশটি পুত্র ছিল। তাঁহাদের নাম—চম্পক, মোহক, ত্রিগুণক, হর্ষার, প্রতাপি, বলমোদক, হর্যাক, সহদেব, ভুরিদেব ও স্মৃতাপন। সেই বীর রাজকুমারগণও পিতার আদেশে যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইলেন। সুরথ-রাজের সহিত ঘোর যুদ্ধ চলিল। সুরথ শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত ছিলেন। কিন্তু মনে মনে তাঁহার দর্শনাকাঙ্ক্ষা করিয়াই যুদ্ধ চালাইয়া-ছিলেন। যুদ্ধে শত্রুর প্রভূতি পরাজিত হইলে, শ্রীরামচন্দ্রের আগমনে, সুরথ-রাজা ভক্তিতরে যজ্ঞাশ্ব প্রদান করেন। ইহার পর, চম্পককে রাজ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, রাজা সুরথ শত্রুর সহিত দেশ-বিজয়ে গমন করিলেন। তখন, তাঁহারা যে যে দেশে গমন করেন, একে একে সকল দেশের নৃপতিই তাঁহাদের বশ্রতা স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষে বান্দীকির তপোবনে অশ্ব উপনীত হইলে, লব ও কুশ সে অশ্ব বন্ধন করেন। শ্রীরাম-পুত্র সেই দুই বালকের সহিত যুদ্ধে বীরগণ কেহই সমর্থ হন না। স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্রও সেই বালক-যুগলের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হন। সেই যুদ্ধে শ্রীরামচন্দ্রের পক্ষীয় যোদ্ধাবৃন্দ নিহত হইলে, মহর্ষি বায়দীকি মৃত-সজীবনী-মন্ত্রে তাঁহাদিগকে সজীবিত করেন ; যজ্ঞাশ্ব প্রত্যর্পিত হয়। শ্রীরামচন্দ্রের অশ্বমেধ-যজ্ঞের অহুষ্ঠানে, এই সকল নৃপতির পরিচয় পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন, পদ্মপুরাণে, মহাবীর, শ্রীধর, ভদ্রপ্রভা, চিত্রসেন প্রভৃতি আরও কত রাজার কতরূপ কীর্তি-কাহিনীর উল্লেখ দেখিতে পাই। মহাবীর রাজার এসঙ্গে পদ্মপুরাণে লিখিত আছে,—‘রাজা সর্ষদা কাম-ক্রীড়ায় আসক্ত ছিলেন। ধর্মার্থ-বিষয়ে কখনও তাঁহার মন আকৃষ্ট হইত না। মদ্রি-হস্তে রাজ্যভার প্রদান করিয়া, তিনি নিরত ইন্দ্রিয়-সুখ-সম্ভোগে নিরত ছিলেন। তদীয় পুরোহিত কল্প তাহাতে বড়ই ক্ষুব্ধ হন। অনেক বুঝাইয়া শেষে তিনি রাজাকে বৈশাখ-মাসের অহুষ্ঠের দান-দানাদি কয়েকটা কার্যে অহুগত করেন। পুরোহিতের উপদেশে অতি কষ্টে বৈশাখ মাসে রাজা ধর্ম-কর্ম করিতেন ; আর,

বংশের অবশিষ্ট একাদশ মাস কাল তিনি যথেষ্ট-ক্রীড়াযোনে বৃত্ত থাকিতেন। কিন্তু বৈশাখী ত্রৈতের জন্ম, বৃহস্পতি পর রাজা বিজুলোক প্রাপ্ত হইরাছিলেন। তখন, নরকের যন্ত্রণা দর্শনে, তাঁহার চিত্ত জীবের হিত-সাধনে উদ্ভূত হইরাছিল।' ক্রীড়ার রাজার প্রসঙ্গে, কোন্ কর্ণে কিরূপ পুত্র জন্মে, পদ্মপুরাণে তাহাই উল্লিখিত হইরাছে। লক্ষ্মীজন্ম-প্রসঙ্গে পদ্মপুরাণে তন্ত্রপ্রবা রাজার নাম উল্লিখিত। তিনি সৌরাষ্ট্রদেশবাসী এবং বেদ-বেদাঙ্গ-পারদর্শী। স্বাপর-যুগে তিনি বিজ্ঞান ছিলেন। সিদ্ধেশ্বর নৃপতির পুত্র মালাধর কিরূপে লক্ষ্মীকে প্রাপ্ত হইরাছিলেন, এই প্রসঙ্গে তাহাও উক্ত হইরাছে। কোন্ কোন্ পুণ্যে নরগণ গতপাতক হইরা হরিহরানে গমন করে, দীননাথ রাজার উপাখ্যানে, এই গ্রন্থে তাহা পরি-বর্ণিত। প্রসঙ্গতঃ, এইরূপ আত্মও কত রাজারই নাম দেখিতে পাই। কিন্তু তাঁহারা কোন্ বংশে, কাহার অংশে, জন্মগ্রহণ করিয়াছেন,—নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

মহাভারতে আরও কত কত নৃপতির প্রসঙ্গ উৎখাপিত হইরাছে! যুধিষ্ঠিরের রাজত্ব-যজ্ঞে বহু দেশের বহু নৃপতি যজ্ঞ-সভার শোভা-সম্বৰ্দ্ধন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে—যজ্ঞকেতু,

মহাভারতভোক্তা বিবর্দ্ধন, সংগ্রামজিৎ, উগ্রসেন, কঙ্কসেন, কেমক, কঙ্কোজ-রাজ কমঠ,
অপরায়ণ কম্পন, জটাহর, যজ্ঞাধিপতি কুজি, কিরাত-রাজ পুলিন্দ, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ,
রাজত্ববর্গ। পুণ্ড্রক, পাণ্ড্য, উড়ুরাজ, অঙ্গক, সুমিত্র, শৈব্য, কিরাতরাজ সুনান,

যবনাধিপতি চানুর, দেবরাত, ভোজ, ভীমরথ, কলিঙ্গ-রাজ প্রতাপরথ, মগধাধিপতি জয়সেন, সুকর্ণা, চেকিতান, পুরু, কেতুমান, বসুদান, বৈদেহ, কৃতকর্ণ, সুধর্মী, অনিরুদ্ধ, প্রতাপ্য, অঙ্গুগরাজ, সুদর্শন, ক্রমজিৎ, শিশুপাল, কল্লবাধিপতি আহক, বিপ্রধু, গদ, শারঙ্গ, অকুর, কৃতবর্মা, সত্যক, ভীষ্মক, অম্বুজি, দ্রুম্যংসেন, কেকয়গণ, সোমক-নন্দন, যজ্ঞসেন, যজ্ঞি-বংশের কুমারগণ প্রসিদ্ধ। রাজত্ব-যজ্ঞের সময় যে সকল নৃপতির নাম দৃষ্ট হয়, কুরুক্ষেত্র-সমরে তদপেক্ষা অধিক-সংখ্যক নৃপতির পরিচয় পাই। তাঁহাদের কেহ পাণ্ডব-পক্ষে, কেহ বা কৌরব-পক্ষে, যোগদান করিয়াছিলেন। উজ্জোগ-পক্ষে মহারাজ ভূপদ —পাণ্ডব-পক্ষে সহায়তার জন্য বহু নৃপতির নিকট দূত প্রেরণের উপদেশ দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—“মহারাজ শল্য এবং তাঁহার অনুগত রাজগণের নিকট শীঘ্র চর প্রেরণ কর। অনন্তর পূর্ব-সাগরবাসী মহারাজ ভগদত্ত, হার্দিক্য, আহক, রোচমান, বৃহত্ত, সেনাবিন্দু, সেনজিৎ (পাপজিৎ), প্রতিবিন্দ্য, চিত্রবর্মা, সুবাস্তক, বাহ্লিক, বৃহকেশ (যজ্ঞকেশ), চৈদিপতি সুপার্ব, সুবাহ, গৌরব, শক-রাজ, পল্লব-রাজ (পল্লব-রাজ), দরদ-রাজ, কঙ্কোজ-রাজ, নদীজ (ঋষিক) প্রভৃতি রাজগণের নিকট দূত প্রেরণ করা কর্তব্য। আরও, পশ্চিমবঙ্গ অঙ্গুগদেশীয় ভূপাল-বর্গ, পর্বত-বাসী ভূপতি-বর্গ, কালব-দেশীয় নৃপতিবর্গ, পঞ্চদশ রাজ্যের ভূপতিগণ, সকলকেই সংবাদ দেওয়া হউক। জয়ংসেন, কান্ত, দুর্ধর্ষ, সুধর্মী, জানকী, মণিয়াম, পোতিমৎসক, পাণ্ড্য-রাষ্ট্রাধিপতি বৃষ্টকেতু, ওড়্র, বৃহৎসেন, নিবাদ, প্রোগিয়ান, বসুদান, বৃহৎস, বাহ, মনুজসেন, কেমক, প্রতাপ, দৃঢ়ার, উত্তব, পৌণ্ড্র, বজ্রধার, একদার্য, আবার, জনবেজর, বায়ুরেণ, পূর্ব-পালি, ভুরিত্তোজা, দেবক, কর্ণবের্ড, নীল, বীরধর্মী, সুবারি, কলিঙ্গাধিপতি কুমার, কেমধূর্তি, বাটধান, অচক, নিচক,

ভুল, ক্রোধ, বজ্রমান প্রভৃতি ভূপালগণের নিকট হৃত প্রেরণ করিয়া অগৌণে তাঁহাদিগকে আনয়ন কর ।” কুরুক্ষেত্র-সমর আরম্ভ হইলে, দুঃস্বপ্নী শত্রু, যুধিষ্ঠিরের নিকট উভয়-পক্ষীয় বীরগণের যুদ্ধ-বাহী সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছেন । সেখানেও বহু নৃপতির পরিচয় পাওয়া যায় । হৃষীকেশ তখন দ্রোণাচার্য্যের নিকট উভয় সৈন্ত-বলের পরিচয় দিতেছেন,—

“পশ্চিমাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমু । বৃঢ়াং ক্রপদপুঞ্জেন তব শিব্যেণ বীমতা ।

অত্র শূরা মহেধ্বাশা ভীমার্জুনসমা যুধি । যুধিষ্ঠানো বিরাটশ্চ ক্রপদশ্চ মহারথঃ ।

ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কানীরাজশ্চ বীৰ্য্যবান্ । পুরুজিৎ কুন্তীভোজশ্চ শৈব্যাশ্চ নরপুংসবঃ ।

যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীৰ্য্যবান্ । সৌভদ্রো দ্রোণদেয়শ্চ সৰ্গ এব মহারথঃ ।

অমাকন্ত বিশিষ্টা য়ে তান্ নিবোধ বিজ্ঞোত্তম । নারকা নব সৈন্তস্ত সংজার্থ তান্ ব্রবীমিহে ।

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিক্রয়ঃ । অশ্বখামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তিক্রয়ধ্বজঃ ।”

অর্থাৎ,—“হে গুরুদেব ! ঐ দেখুন, আপনার শিষ্য সূচতুর ক্রপদ-নন্দন (ধৃষ্টদ্যুম্ন) পাণ্ডু-পুত্র-দিগের জন্ত বিশাল সৈন্তবাহ রচনা করিয়াছে । সমুদ্ববর্তী সৈন্তসমূহের মধ্যে ভীমার্জুন-সম বলশালী মহাধাতুকি যুধিষ্ঠান, বিরাট, মহারথ ক্রপদ, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, বীৰ্য্যবান্ কানী-রাজ, পুরুজিৎ, কুন্তীভোজ, নরশ্রেষ্ঠ শৈব, মহাপরাক্রমশালী যুধামন্যু, বীৰ্য্য-সম্পন্ন উত্তমৌজা, সূভদ্রা-তনয় অভিমন্যু এবং দ্রোণদী-নন্দনগণ,—এই সকল বীরগণ সমবেত হইয়াছেন । হে বিজ্ঞোত্তম দ্রোণাচার্য্য ! আমাদের পক্ষেও যে সকল প্রতিষ্ঠাধিত বীরগণ নেতৃপদ গ্রহণ করিয়াছেন, আপনার জ্ঞাতার্থ তাঁহাদের নামও উল্লেখ করিতেছি । আপনি স্বয়ং তো আছেনই ; অধিকন্তু, পিতামহ ভীষ্ম, কর্ণ, যুদ্ধজয়ী কৃপাচার্য্য, অশ্বখামা, বিকর্ণ, সৌমদত্ত-সুত ভুরিপ্রবা এবং জয়দ্রথ,—মৎপক্ষে এই সকল শূর বিজ্ঞমান রহিয়াছেন ।”

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের প্রারম্ভে হৃষীকেশ উভয়-পক্ষের যে যে বীরের নাম উল্লেখ করিলেন, তাঁহারা এক এক জন নরকর দিকপাল-বিশেষ । বীর সাত্যকির অপর নাম—যুধিষ্ঠান । পারিজাত-হরণ-কালে স্বর্গ-পুরে গমন করিয়া ইনি দেব-শত্রুদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন । কুরুক্ষেত্র-সময়ে পাণ্ডব-পক্ষ অবলম্বনেও তিনি যশস্বী হইয়াছিলেন । বিরাট—মৎস্ত-দেশের অধিপতি ছিলেন । অজ্ঞাত-বালের সময়, পাণ্ডবগণ ছদ্মবেশে বৎসরেক কাল তাঁহারই তবনে অভিবাহিত করিয়াছিলেন । বিরাট-রাজের কন্যা উত্তরার সহিত অভিমন্যুর বিবাহ হয় । সে হিসাবে, বিরাট-রাজ—পাণ্ডবগণের বৈবাহিক-স্থানীয় । তিনি অসংখ্য সৈন্ত-সহ কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে পাণ্ডবগণের সহায়তা করিয়াছিলেন । ক্রপদ—পাণ্ডবগণের পক্ষাবলম্বন করিয়া তাঁহারা সেই পূর্ব-মিত্রতারই পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন । কুন্তীভোজ—পাণ্ডবদিগের মাতা কুন্তী-দেবীর পালক-পিতা । চেকিতান—চিকিতান রাজার পুত্র । তিনি বীর বলিয়া প্রসিদ্ধ । ধৃষ্টকেতু—ক্রপদ রাজার পুত্র ; দ্রোণদীর সহোদর । যজ্ঞভরে, তিনি আবার ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র বলিয়াও উক্ত হইয়া থাকেন । বাহা হউক, তাঁহার সমুদীন কেতন দর্শনে শত্রুহন

ভয়-বিচলিত হইত। কথিত হয়, সেই জন্তই তিনি বুটকেতু নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। পুরুজিং নামে বহু-বংশীয় এক নৃপতির নাম বুট হয়। ঐমন্তাগবতের মতে,—তিনি কুচকের পুত্র। তবে, এই কুরুক্ষেত্র মহা-সমরে তাঁহার উপস্থিতি সম্ভবপর কি না, বংশ-লতা আলোচনায় তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। পুনঃপুনঃ শত্রু-জয় করিয়া তিনি পুরুজিং নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন;—তাঁহার নামানুসারে ইহাই বুঝিতে পারা যায়। উত্তমোজা এবং যুধামন্যু—পাকাল-দেশের দুই জন নৃপতি বলিয়া প্রসিদ্ধ। বুট-ক্ষেত্রে অপরিমেয় সাহস-সম্পন্ন বলিয়াই উত্তমোজা নাম;—বুটে শত্রুর প্রতি ক্রোধাধিত বলিয়াই যুধামন্যু নাম। অভিমন্যু এবং দ্রোণদীর পঞ্চ-পুত্রের বিষয় পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। শত্রুধী-পরিবেষ্টিত হইয়া, অস্ত্রায় সমরে, অভিমন্যু নিহত হন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের অবসানে, পঞ্চ-পাণ্ডব-ব্রহ্মে, দ্রোণদীর পঞ্চ পুত্রকে, নিজিহত অবস্থায়, অশ্বখামা নিহত করেন। ভীষ্ম এবং কর্ণের পরিচয় পূর্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। পরশুরামের নিকট অস্ত্র-বিজ্ঞা শিক্ষা করিয়া কর্ণ অসাধারণ বীর বলিয়া প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছিলেন। কর্ণের দান-শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া, ইন্দ্র তাঁহাকে শত্রু-সংহার-কারিণী শক্তি দান করেন। দুর্যোধনের সাহায্যে তিনি অঙ্গ-রাজ্যে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। কর্ণের অপর নাম—বৈকর্জন। দুর্যোধন কর্ণকে বীর-কুল-চূড়ামণি বলিয়া বিশ্বাস করিতেন; কিন্তু ভীষ্মের নিকট কর্ণ অর্জুনের মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। কৃপাচার্য্যের জন্ম-বিবরণ অদ্ভুত রহস্য-পরিপূর্ণ। ধনুর্বিজ্ঞা-পারদর্শী তপস্বী শরদাম্ আপন পুত্র-কন্তাকে বন-মধ্যে ফেলিয়া যান। রাজা শান্তনু, যুগয়ায় গমন করিয়া, সেই নিঃসহায় অনাথ বালক-বালিকাকে গৃহে আনয়ন করেন। তাঁহার কৃপায় সেই বালক-বালিকা প্রতিপালিত হয়। কৃপায় প্রতিপালিত বলিয়া, বালক-বালিকা কৃপ-কৃপী নামে অভিহিত হইয়াছিল। কিছুকাল পরে শরদাম্ পুত্রকে আশ্রয়-পরিচয় প্রদান করিয়া, শাস্ত্র ও অস্ত্র-বিজ্ঞা শিক্ষা দিয়াছিলেন। দ্রোণাচার্য্যের সহিত কৃপীর বিবাহ হয়। দ্রোণাচার্য্য পাণ্ডব ও কৌরবদিগকে অস্ত্র-শাস্ত্র শিক্ষা দিতেন। ইনি ভরদ্বাজ ঋষির পুত্র। যেমন শস্ত্র-বিজ্ঞায়, তেমন শাস্ত্র-বিজ্ঞায় ইনি পারদর্শী ছিলেন। পরশুরামের নিকট ইনি অস্ত্র-পরিচালনা এবং ধনুর্বেগ শিক্ষা করেন। কথিত হয়, একটা 'দ্রোণ' বা কলসের মধ্যে ইহার জন্ম হইয়াছিল, সেই জন্তই ইনি 'দ্রোণ' নামে পরিচিত। ইহার পত্নী কৃপীর গর্ভে অশ্বখামা জন্মগ্রহণ করেন। জন্মকালে অশ্বের জ্ঞান ধ্বনি করিয়াছিল বলিয়া, শিশুর নাম অশ্বখামা হয়। দ্রোণ—কৃপদ-রাজের বাল্য-সহচর ছিলেন। পিতা পৃথ্বীর মৃত্যুর পর, যৌব-রাজ্যে অভিযুক্ত হইয়া, কৃপদ দ্রোণের প্রতি অবজার ভাব প্রকাশ করেন। সেই সময়ে তিনি দ্রোণের প্রতি এতই বিরক্ত হইয়াছিলেন যে, দ্রোণের বিনাশ-কাৰ্য্যনার পুত্র-কামী হইয়া, এক বজ্র করিয়াছিলেন। প্রকাশ,—সেই বজ্রীয় হত্যাশন হইতে বুটচ্যুর এবং দ্রোণদী উদ্ভিত হন। কৃপদের বিরূপ ভাব দেখিয়া, দ্রোণ পাকাল-রাজ্য হইতে হস্তিনা-রাজ্যে চলিয়া আসেন। ভীষ্ম তাঁহাকে রাজ-সুবারগণের আচার্য্য-পদে নিয়োজিত করেন। অর্জুন প্রিয়-শিষ্য হইলেও, দুর্যোধনের অহুরোধাত্মক দ্রোণাচার্য্য তাঁহারই পঞ্চ অবলম্বন করিয়া সেনাপতির পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বুটচ্যুরের সহিত বুট, পঞ্চাশীতি

বর্ষ বয়সে দ্রোণাচার্য্য নিহত হন। বাহা হউক, রূপ ও রূপীর সম্বন্ধে একটু মতান্তর দৃষ্ট হয়। শ্রীনন্ডাগবতে তাঁহার। শরদানের পুত্র-কন্তারূপে পরিচিত হইলেও, হরিবংশে এবং অগ্নিপুরণে তাঁহার। সত্যধৃতির পুত্র-কন্তারূপে পরিকীর্তিত। বিকর্ণ—ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র; দুর্যোধনের ভ্রাতা। ভুরিষ্রবা—চন্দ্রবংশীয় সৌমদত্ত রাজার পুত্র। ইনি মহাবীর ও মহা-বলী বলিয়া বিখ্যাত। সাত্যকি-হস্তে ইনি নিহত হন। জয়দ্রথ—সিন্ধুদেশের অধিপতি ছিলেন; ইনি ধৃতরাষ্ট্রের জামাতা। দুর্যোধনের ভগিনী দুঃশলার (দুঃশীলার) সহিত ইহার বিবাহ হয়। অতিমহ্য-বধে সপ্তরথীর মধ্যে ইনি অগ্রণী ছিলেন। অর্জুন ইহার সংহার-সাধন করেন। কুরুক্ষেত্র মহাসমরে আরও যে কত নৃপতি যোগদান করিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা হয় না। রাজা নীল, পাণ্ডব-পক্ষ অবলম্বন করিয়া, কুরুক্ষেত্র-সমরে অশ্বখামার হস্তে নিহত হন। তিনি কোন্ বংশের (কোন পর্যায়ে) বংশধর ছিলেন, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। মহারথী শিবি রাজা পাণ্ডব-পক্ষে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। দ্রোণ-হস্তে তিনি নিহত হন। শিবি-রাজের পরিচয়-সম্বন্ধেও বিধম মতানৈক্য দৃষ্ট হয়। বসান্তি রাজা পৌরব-পক্ষে যোগদান করিয়াছিলেন; অতিমহ্য-হস্তে তিনি নিহত হন। রাজা সুদর্শন, দুর্যোধনের পক্ষাবলম্বন-পূর্বক যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সাত্যকি তাঁহার সংহার-সাধন করেন। কুনুতপতি ক্ষেমবুর্জি, ধনুর্দারণ-পূর্বক, বকোদরকে বিন্ধ করিয়াছিলেন। গদাহত হইয়া ভীমসেনের হস্তে তিনি নিপাতিত হন। কুনুতদিগের যশস্বর সেই নৃপতিকে নিহত দেখিয়া, দুর্যোধনের সৈন্তগণ পলায়নপর হইয়াছিল। কুলিন্দরাজ সসৈন্তে পাণ্ডব-পক্ষ অবলম্বন করিয়া, কুরুপক্ষকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার বিখর্দ্দি-প্রযুখ ভ্রাতৃত্ব যুদ্ধে নিহত হন। কত নাম করিব? এই যুদ্ধে পারদ, শক, হন, কষোজ, পলুব, কিরাত প্রভৃতি নানা দেশের আর্য্য ও অনার্য্য নৃপতিগণ যোগদান করিয়াছিলেন। কিন্তু বংশ-পর্যায় অগুপস্ফান করিয়া তাঁহাদের অনেকেরই নাম পাওয়া যায় না।

যুধিষ্ঠিরের রাজত্ব-বক্ষে এবং কুরুক্ষেত্রের মহা-সমরে যেরূপ অসংখ্য নৃপতির পরিচয় পাওয়া যায়; সেইরূপ আবার তাঁহার অশ্বমেধ যজ্ঞে, পাণ্ডব-গণের দিগ্বিজয়ের সময়, বহু

অশ্বমেধ যজ্ঞে রাজা ও বহু নৃপতির উল্লেখ দেখিতে পাই। শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শ অনুসারে অগ্নিহত যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞে প্রবৃত্ত হন। স্থির হয়,—মহাবাহু অর্জুন অশ্বকে পূর্ণিত-বন্দ। রক্ষা করিবেন; ভীমসেন এবং নকুল রাষ্ট্র-রক্ষায় ত্রতী রহিবেন; মহাযশা সহদেব কুটুম্বগণের অভ্যর্থনায় নিযুক্ত থাকিবেন; নকুল পুর-রক্ষায় নিয়োজিত হইবেন। ধৃতরাষ্ট্রের অগ্নুমতি লইয়া, এইরূপ-ভাবে কার্য্য-বিভাগ হইয়াছিল। যজ্ঞাশ্ব প্রথমে উত্তরদেশে ধাবমান হয়। উত্তর-দিক হইতে পরে সেই অশ্ব পূর্ব-দিকে গমন করিয়াছিল। যজ্ঞাশ্বের অনুসরণে মহাবীর ধনঞ্জয় যখন রাষ্ট্র-সকল বিমর্দিত করিয়া পরিভ্রমণ করেন,—কত কত নৃপতির সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইয়াছিল! বহু শত কিরাত ও যবন, বহুবিধ যোদ্ধা, এবং বহু প্রদেশের বহু আর্য্য-নৃপতি তাঁহাকে বাধা দিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু কেহই তাঁহার যজ্ঞাশ্বের গতিরোধ করিতে সমর্থ হন নাই। উত্তর প্রদেশ জয় করিয়া, যজ্ঞাশ্ব পূর্ব প্রদেশে উপনীত হইলে, প্রথমে ত্রিগর্ত-রাজের সহিত অর্জুনের, যুদ্ধ

উপস্থিত হয়। ত্রিগর্ত-রাজ স্বর্গ্যবর্মী এবং তাঁহার অল্পজ তেজস্বী কেতুকর্মী সঙ্কুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। একে একে ভ্রাতৃত্ব নিহত হইলে, ধৃতবর্মী অর্জুনের প্রতিদ্বন্দ্বিতাচরণ করেন। কিন্তু ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধে তিনি কৌনক্রমেই জয়লাভ করিতে পারেন না। পরিশেষে ত্রিগর্তবাসীরা পাণ্ডবগণের বশুতা-স্বীকারে বাধ্য হয়। ত্রিগর্ত-দেশ হইতে তুরঙ্গম প্রাগ্-জ্যোতিষ দেশে গমন করিয়াছিল। ভগদত্তাশ্বজ মহীপতি বজ্রদত্ত যজ্ঞাধ বন্ধন করেন। বজ্রদত্তের সহিত অর্জুনের ত্রিরাত্র যুদ্ধ চলিয়াছিল। যুদ্ধে বজ্রদত্ত পরাজিত হন। অর্জুন তাঁহার সংহার-সাধন না করিয়া, বজ্রদত্তকে অধীন রাজগণ মধ্যে গণ্য করেন; বলেন,—“তোমার জীবন দান করিলাম। আগামী চৈত্র-পূর্ণিমাতে ধর্ম্মরাজের অশ্বমেধ যজ্ঞ হইবে, তৎকালে তোমরা তথায় উপস্থিত থাকিবে।” নির্জিত বজ্রদত্ত তাহাতেই সন্তুষ্ট হন; প্রাগ্-জ্যোতিষ দেশ পাণ্ডবগণের প্রাধান্য স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। ইহার পর, সিদ্ধ-রাজ-বংশীয়দিগের সহিত কিরীটীর যুদ্ধ হয়। সিদ্ধরাজ জয়দ্রথের নিধন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, সিদ্ধবাসিগণ অর্জুনকে আক্রমণ করে। কিন্তু পার্থ তাহাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ করিয়া দেন। এই যুদ্ধে অর্জুনের হস্তে সিদ্ধরাজ-কুল নির্মূল হয় দেখিয়া, ধৃতরাষ্ট্র-হৃহিতা হুঃশলা, নণ্ডা সুরথ-সুতের সহিত রথে আরোহণ করিয়া, ধনঞ্জয়ের নিকট ক্রুপা-প্রার্থী হন। তাঁহার করুণ ক্রন্দনে ব্যথিত হইয়া, ধনঞ্জয় ধনুঃ-ত্যাগ করেন। ফলে, সিদ্ধদেশ—পাণ্ডবগণের অধীনতা-পাশে আবদ্ধ হয়। সিদ্ধদেশ হইতে ধনঞ্জয় মণিপুত্রাভিমুখে অগ্রসর হন। বহুবাহন তখন মণিপুত্রের অধিপতি ছিলেন। তিনি অর্জুনের পুত্র,—চিত্রাঙ্গদার গর্ভ-সম্ভূত। যজ্ঞাশ্বের রক্ষক-রূপে পিতা অর্জুন আসিয়াছেন—সংবাদ পাইয়া, বহু অর্থ উপহার লইয়া, ব্রাহ্মণগণ সমভিষায়াহায়ে, বহুবাহন অর্জুনের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; পাণ্ডবগণের প্রতি আশুগত্য-স্বীকারের অভিপ্রায় জানাইলেন। কিন্তু ক্ষাত্রা-ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া, তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া, অর্জুন বরং বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিলেন; কহিলেন,—“এরূপ ভাবে আশ্র-সমর্পণে বশুতা-স্বীকার—ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে। আমি অস্ত্র-শস্ত্র-সহ সদলবলে যুদ্ধার্থ সমবেত হইয়াছি। তুমি জ্বীলোকের ত্রায় আমার প্রতিগ্রহ করিতেছ।” বহুবাহনের এই অপমানের সংবাদ শ্রবণ করিয়া, নাগরাজ-নন্দিনী উলূপী, বহুবাহনকে সমর-সজ্জায় সজ্জিত হইতে উৎসাহিত করিলেন। উলূপী—বহুবাহনের বিমাতা; অর্জুনের অপরা গম্ভী; কৌরব্য-নামক নাগরাজের কন্যা। দ্বাদশ বৎসর বনবাস-কালে অর্জুন ইহাকে বিবাহ করেন। বহুবাহনকে উলূপী এমনই ওজস্বিনী ভাষায় উত্তেজিত করিলেন যে, বহুবাহন তখন পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। পিতা-পুত্র সঙ্কুল সমর আরম্ভ হইল। সমরে অর্জুন হত-চেতন এবং পিতৃ-হত্যাশঙ্কায় বহুবাহন মূচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন পতি-পুত্রের শোকে অধীরা হইয়া চিত্রাঙ্গদা রোদন করিতে লাগিলেন; উলূপীকে দর্শন করিয়া, পতি-পুত্র কিরূপে ছেতনা-লাভ করেন,—তাহার উপায় নির্ধারণ করিতে কহিলেন। উলূপীর অধিকারে সজীবন-মণি ছিল। উলূপী সেই মণি পুত্রের হস্তে প্রদান করিয়া, অর্জুনের বন্ধদেগে স্থাপন করিতে পরামর্শ দিলেন। অর্জুন পুনর্জীবন লাভ করিলেন; বহুবাহনকে তাঁহার মাতৃধর্ম্ম-সহ যজ্ঞ-ক্ষেত্রে উপস্থিত

হইতে উপদেশ দিলেন। পরিশেষে সেই যজ্ঞীয় অশ্বের অহুসরণে তিনি অত্র দেশে গমন করিলেন। নানা স্থান পর্যাটন করিয়া, অশ্ব—মগধ-দেশে উপনীত হইল। সেখানে মহাদেব-তনয় মেঘসন্ধি যজ্ঞাধ্ব বন্ধন করিলেন। সবাসাটীকে পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইল। সে যুদ্ধে অৰ্জুন জয়লাভ করিলেন। তখন, মগধ-রাজকেও অশ্বমেধ-যজ্ঞে উপস্থিত হইবার জ্ঞাত আনয়ন করা হইল। তৎপরে বীরবর ফাল্গুনী, ক্রমশঃ সমুদ্র-তীর দিয়া, বঙ্গ, পুণ্ড্র, কোশল প্রভৃতি দেশে গমন করিলেন। সেখান হইতে দক্ষিণ-দেশে গমন করতঃ অশ্ব চৈদি-দেশে উপনীত হইল। তৎপরে ঠাঁহার কাশী, অঙ্গ, কোশল, কিরাত ও তঙ্গন-দেশে উপনীত হইলেন। ঠাঁহার দশার্ণ-দেশে উপস্থিত হইলে, তত্রত্য চিত্রাঙ্গদ বাধা-প্রদানের উত্তোগ করিতে লাগিলেন। চিত্রাঙ্গদ বশীভূত হইলে, অশ্ব নিষাদ-রাজ একলব্যের রাজ্যে উপস্থিত হইল। একলব্য-সুত যজ্ঞাধ্ব বন্ধন করিলে, সেখানে রোমহর্ষণ তুমুল সংগ্রাম চলিয়াছিল। কিন্তু সেখানেও অৰ্জুন জয়লাভ করিলেন। ইহার পর, সুরাষ্ট্র, গোকর্ণ-দেশ ও প্রতাপ অতিক্রম করিয়া, অশ্ব দ্বারবতী-নগরে উপনীত হইল। বৃষ্যক্লক-পতি উগ্রসেন স্নিতি-পূর্বক অৰ্জুনের অভ্যর্থনা করিলেন। সেখান হইতে সমুদ্রের পশ্চিম-প্রদেশে বিচরণ করিয়া, অশ্ব পঞ্চনদ-প্রদেশে উপনীত হয়। তৎপরে গান্ধার-রাজ্য শকুনি-পুত্রের সহিত সবাসাটীর তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল। গান্ধার-রাজ-পুত্র, অৰ্জুনের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিয়াছিলেন। পরিশেষে তাঁহাকে আহ্বান করিয়া, অভয় দিয়া, যজ্ঞাধ্ব-সহ ধনজয় হস্তিনাপুরে প্রত্যাবৃত্ত হন। পাণ্ডবগণের দিগ্বিজয় সম্বন্ধে মহাভারতে যে যে দেশের যে যে নৃপতির প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে, জৈমিনি-ভারতে এবং অত্যাচর গ্রন্থে তন্ত্রিণ আরও কতকগুলি দেশের ও রাজার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই সকল রাজগণের মধ্যে মাহিগতী-রাজ নীলধ্বজ রাজার কাহিনী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নীলধ্বজের পত্নীর নাম—জনা। পুত্র—প্রবীর। পাণ্ডবগণের যজ্ঞাধ্ব মাহিগতী-পুরীতে উপনীত হইলে, নীলধ্বজ পুত্র প্রবীর সেই অশ্ব বন্ধন করেন। অৰ্জুনের সহিত তাঁহার যুদ্ধ আরম্ভ হয়। নীলধ্বজ রাজা ক্রুদ্ধভক্ত ছিলেন। পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিবার তাঁহার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু নীলধ্বজ-পত্নী জনা বিনা যুদ্ধে যজ্ঞীয় অশ্ব প্রত্যর্পণ করা অপমান-জনক মনে করিয়া, পুত্র প্রবীরকে যুদ্ধে উৎসাহিত করিলেন। কুমার প্রবীর, মহাদেবের বরে, অদ্বিতীয় শক্তিশালী হইয়াছিলেন। সুতরাং যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, তিনি অৰ্জুনকে বিব্রত করিয়া তুলিলেন। পরিশেষে, ঐকৃষ্ণের সহায়তায়, অশ্ব কোশলে, সে যুদ্ধে পাণ্ডব-পক্ষের জয়লাভ হয়; প্রবীর নিহত হন। তখন রাজা নীলধ্বজ, জামাতা (কণ্ঠা ঠাঁহার পতি) অগ্নিদেবের পরামর্শ-অনুসারে সন্ধি-স্থাপনে অগ্রসর হন। কিন্তু জনা কিছুতেই সন্ধি-স্থাপনে সন্মত হন না; পরন্তু পুত্র-হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে, পুত্র-হত্যার মত্তক ছেদনে, উত্তেজিত হন। নীলধ্বজ যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইলেও, জনা আপনিই যরণসিগী মূর্তিতে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করেন। তাঁহার তেজোগর্ভে, পাণ্ডব-সৈন্য ভয়-বিহ্বল হয়। পাণ্ডব-পক্ষীয় বহু সৈন্য হতাহত হওয়ার পর, ঐকৃষ্ণের কৌশলে পাণ্ডবগণ জয়লাভ করেন। তখন জনা, পুত্র-শোকে মুহমানা হইয়া, জাহ্নবী-সলিলে আত্ম-বিসর্জন দেন। পাণ্ডবগণের

অখমেধ-যজ্ঞের অর্থ যে যে স্থানে—যে যে রাজ্যে উপনীত বা বাধা-প্রাপ্ত হইয়াছিল, সে সকল রাজ্যের রাজত্ববর্গের কয় জনের পরিচয় বংশ-লতায় দৃষ্ট হয় ?

এসময়, কর্ণাকর্ণের ফলাফলের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, মহাভারতে আরও বহু নৃপতির নামোল্লেখ দেখিতে পাই। ষাণ্ডব-দাহন প্রসঙ্গে, বৈশম্পায়ন, জনমেজয়ের নিকট যেতকি রাজার

এসময়
মৃগভিগণ ।

উপাখ্যান কীর্তন করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন,—“পূর্বে-কালে বল-বিক্রম-সম্পন্ন মহেন্দ্র-সদৃশ যেতকি নামে বিখ্যাত এক ভূপতি ছিলেন।

সেই ধীমান্ অবনী-পতি ঋত্বিক-গণের সহিত সুদীর্ঘ-কাল যাগ অনুষ্ঠান করিলে, ঋত্বিকগণ, ধূম-ব্যাঙ্কুলিত-লোচন এবং ক্ষিপ্র হইয়া, সেই নরাধিপকে পরিত্যাগ করিলেন। ব্রাহ্মণ অভাবে যজ্ঞ-কার্য্য পণ্ড হয় দেখিয়া, ভূপতি শূলপাণির শরণাপন্ন হন। দ্বাদশ বর্ষ ব্রহ্মচার্য্যাবলম্বনে ক্রন্দনবের প্রীতি-সাধন করিলে, তদংশ-সমুত দুর্কাসা ঋষির দ্বারা যেতকি যজ্ঞ-কার্য্য সম্পন্ন করেন। সেই যজ্ঞে অপরিমিত হব্যপানে হতাশনের গ্লানি বোধ হয়। ষাণ্ডব-বন ভ্রমসাৎ করিয়া, তিনি সেই গ্লানি নিবারণ করেন।” যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণ-মহাত্ম্য জ্ঞানিতে চাহিলে, মার্কণ্ডেয় ঋষি অযোধ্যার এক নৃপতি-বংশের নামোল্লেখ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—“অযোধ্যাতে ইক্ষ্বাকু-কুলনন্দন পরীক্ষিৎ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র, —শল, দল ও বল। রাজা পরীক্ষিৎ শল নামক রাজকুমারকে যথা-সময়ে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া, সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করেন।” শলের পুত্রের নাম—সেনজিৎ। পরীক্ষিৎ মৃগয়ায় গমন করিয়া, এক রমণীয় সরোবর-তীরে রূপবতী সুদৃশ্য কঙ্কার রূপ-মোহে মুগ্ধ হন। সুন্দরী গান করিতে করিতে পুষ্প-চয়ন করিতেছিল। রাজা তাহার পাণিগ্রহণ করেন। স্তম্ভ হয়—সেই সুন্দরীকে কখনও রাজা সলিল-সন্দর্শন করাইবেন না। কিন্তু সেই রমণীয় উজানে বিহার করিতে করিতে, এক দিন রাজা সহসা তৃষ্ণাতুর হন। তৃষ্ণাতুর হইয়া, সুধাসম স্নিগ্ধ-সলিল-পূর্ণ বাগী-তটে উপস্থিত হইলে, সুন্দরী সেই জলে অদৃশ্য হইলেন। সরোবরের জল সেচন করিয়া, রাজা সুন্দরীর উদ্ধারের চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা ব্যর্থ হইল। তখন সুন্দরীর পরিবর্তে এক মধুক মাত্র তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইলে, রাজা মধুক-বধে উজোগ্রী হইলেন। পরীক্ষিৎ-সমীপে উপনীত হইয়া, মধুক-রাজ মধুকগণের প্রাণ ভিক্ষা চাহিল; জানাইল,—সুন্দরী তাহারই কন্যা; নাম—সুশোভনা। এই বলিয়া মধুক-রাজ, পরীক্ষিতের হস্তে সুশোভনাকে প্রদান করিল। সেই সুশোভনার গর্ভে রাজার পূর্বোক্ত তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। রাজা পরীক্ষিৎ সংসারাত্যাগ পরিত্যাগ করিলে, জ্যেষ্ঠ পুত্র শল, এক দিন মৃগয়ায় গমন করেন। কিন্তু কোন-ক্রমেই সে দিন মৃগ গ্রহণ করিতে পারেন না। সারথির নিকট রাজা অবগত হন,—‘বামদেবের দুইটা অশ্ব আছে। সেই অশ্বদ্বয়ের নাম—বামী-অশ্ব। সেই অশ্বদ্বয় সংবাহিত হইলে, মৃগ অনায়াসে করতলগত হইবে।’ নৃপতির প্রার্থনা-অনুসারে বামদেব সেই অশ্ব-মুগল রাজাকে প্রদান করেন। মৃগ ধৃত হইলে, রাজা তাঁহাকে অশ্বদ্বয় প্রত্যর্পণ করিতে সম্মত হন। মৃগ ধৃত হইল; রাজা কিন্তু অশ্ব প্রত্যর্পণ করিলেন না। পরন্তু, বামদেব অশ্ব চাহিতে বাইলে, বচসা হইল। রাজা শল, বামদেবকে লক্ষ্য করিয়া শর নিক্ষেপ করিলেন। বামদেব তাহাকে প্রতিসম্মত দিলেন,—“সেনজিৎ নামে তোমার দশমবর্ষীয়

পুত্র আছে ; তুমি এই যে বিবক্ষিত শর আমার প্রতি সন্ধান করিতেছ, এই সায়ক তাহার সংহার-সাধন করিবে ।” ব্রাহ্মণের অভিসম্পাত ব্যর্থ হইবার নহে । রাজা শল, বামদেবকে লক্ষ্য করিয়া যে শর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই শর অন্তঃপুরে রাজকুমার সেনজিৎকে বিনাশ করিল । বাহা হউক, এই উপাখ্যানোক্ত পরীক্ষিৎ, শল বা সেনজিৎ—ইচ্ছাকৃত-বংশের বংশ-লতায় কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না ; অথচ, তাঁহারা অযোধ্যার নৃপতি ছিলেন । রাজহস্ত-বর্ণের মহাভাগা ও মাহাত্ম্য বর্ণন-প্রসঙ্গে মার্কণ্ডেয় মুনি সেহুক, বৃষদৰ্ভ ও অষ্টক রাজার উপাখ্যান কীর্তন করেন । এক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ সেহুক, রাজার পরামর্শ-অনুসারে, বৃষদৰ্ভ রাজার নিকট সহস্র অর্থ ভিক্ষা প্রার্থনা করিয়াছিলেন । বৃষদৰ্ভ ব্রাহ্মণকে কশাবাত করেন । ব্রাহ্মণ রাজাকে অভিসম্পাত করিতে উত্তত হন । রাজা ব্রাহ্মণকে বলেন,—“ইহাই কি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ?” ব্রাহ্মণের চৈতন্যোদয় হয় । রাজা তাঁহাকে এক দিনের সমস্ত আয় প্রদান করেন । সহস্র অর্থের মূল্য অপেক্ষা তাহা অনেক পরিমাণে অধিক । অষ্টক রাজার উপাখ্যানে দৃষ্ট হয়,—তিনি বিখ্যামিত্র ঋষির পুত্র । তিনি যে অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাহাতে “প্রতর্দন, বসুমনা ও উনীনের-সুত শিবি, তাঁহার এই তিন ভ্রাতা” উপস্থিত ছিলেন । বংশ-লতায়, এই চারিজনের বিবয় আলোচনা করিলে, ইহাদের কোনও সম্বন্ধ-তত্ত্ব নির্ণয় করা যায় কি ? অভিমত্ম্যর নিধন-সংবাদে যুধিষ্ঠির শোকসন্তপ্ত হইলে, কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাস তাঁহার নিকট অকম্পন রাজার উপাখ্যান কীর্তন করিয়া বলিয়াছিলেন,—“সত্য যুগে অকম্পন নামে এক রাজা ছিলেন । তাঁহার পুত্রের নাম হরি । সেই একমাত্র পুত্র রণমধ্যে হ্রস্ব কর্ষ করিয়া, পরিশেষে শত্রুগণ কড়ক আক্রান্ত ও নিহত হইয়াছিলেন । সে ঘটনা—অভিমত্ম্য-বধ সদৃশ ।” এতৎপ্রসঙ্গে মৃত্যুর উৎপত্তি ও পরিণাম ফল শ্রবণ করিয়া, রাজা যুধিষ্ঠির সত্যব্রত রাজর্ষিগণের বিবরণ জানিতে চাহেন । মহামুনি বাস তাহাতে ষিষ্ঠ্য-রাজার পুত্র স্বজয় রাজার কাহিনী কীর্তন করিয়াছিলেন । স্বজয় রাজার পুত্রকে দম্বাগণ অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়া, খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিয়াছিল । তজ্জন্ত রাজার শোকের অবধি ছিল না । মৃত্যু-রহস্ত বুঝিয়া রাজা স্বজয় সেই শোক বিন্মত হন । স্বধ, দুঃখ ও মৃত্যু প্রকৃতির তদ্বজ্জ নৃপতিগণের মধ্যে মহাপ্রাজ্ঞ নরপতি সেনজিৎ সবিধেব প্রসিদ্ধ । পাণ্ডবগণের শাস্তি উৎপাদনের জন্ত এই সেনজিৎ রাজার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছিল । বাহারা প্রিয়দর্শন নহে, তাহারা প্রিয়দর্শনরূপে ; আর বাহারা প্রিয়দর্শন, তাহারা অপ্ৰিয়দর্শনরূপে প্রতিভাত হয় ;—ইহার কারণ কি ?—এই প্রশ্নের উত্তর-স্বরূপ ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরের নিকট গৃহ-গোশ্বয়-সংবাদ-সংবলিত একটা প্রাচীন ইতিহাস বর্ণন করেন । সেই উপলক্ষে তিনি বলেন,—“পুরাকালে জীমতী পুরিকা নারী পুরী মধ্যে পরহিংসারত ক্রুর-স্বভাব পুরুষাধম পৌরিক নামে এক নৃপতি ছিল ।” “আশার কারণ ও সামর্থ্য-নির্ণয়” প্রসঙ্গে ভীষ্মদেব বীরহ্রায় নৃপতির পুত্রাষেযণ-কাহিনী কীর্তন করেন । বীরহ্রায় নৃপতির পুত্র ছুরিহ্রায় অমুদ্বিষ্ট হন । পুত্রের অসুসন্ধানে মহারাজ নরনারায়ণাশ্রমে উপনীত হইয়া, ঋষিগণের নিকট পুত্রের সন্ধান জানিতে চাহেন । ঋষভ ঋষি নৃপতির আশাঙ্কেদের নিমিত্ত নানা উপদেশ দিয়াছিলেন । রাজার জ্ঞান-সঞ্চার হইলে,

তিনি বিজ্ঞাবলে রাজার অমুদ্রিত পুত্রকে দর্শন করাইয়াছিলেন। এইরূপে, আর আর যে নৃপতিগণের নাম দেখিতে পাই, তন্মধ্যে সৌবীর দেশের শত্রুগণ রাজা অর্ধ-তরু জিজ্ঞাসার জন্ত, বিচক্ষু রাজা পশুগণের প্রতি অমুকল্লা-হেতু, দিগদন্ত রাজা জিতেন্দ্রিয়তা ও ধর্মপ্রাণতার জন্ত, সবিশেষ প্রসিদ্ধ। অথচ, ইহাদের অনেকরই বংশ-লতা পূর্বাপর মিলাইয়া পাওয়া যায় না।

ঋগ্বেদে যে সকল নৃপতির নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তাঁহাদের কয়েক জনের পরিচয় পূর্বেই আমরা প্রদান করিয়াছি। * ঋগ্বেদে অগ্নি, অন্তক, ঋজিমা, ঋজাম, শত্রি, দভীতি, পৃথুশ্রবা, তুগ্র প্রভৃতি রাজর্ষিগণের নাম দৃষ্ট হয়; মাক্কাতা, নর্বা, তুর্কশ (তুর্কশু), যদু, পুরু, নববাসু, বৃহদ্রথ, তুর্কীতি, কুংস, অতিগিথ, ^{ঋগ্বেদোক্ত} ^{নৃপতিবর্গ।}

আয়ু, নহয়, পুরুকুংস, ত্রসদস্য প্রভৃতি রাজন্ত-বর্গের নাম দেখিতে পাই; চিত্র, ত্রাক্ষণ, স্বখ, জহু, খেল, পুরুমীড়, স্বনয়, মশর্শার, অযবস, জাহব, বৃষশচ, কক্ষীবান প্রভৃতি রাজগণের উল্লেখ আছে। সুদাস, দিবোদাস ও সুশ্রবা (সুশ্রবস) প্রভৃতি রাজন্ত-বর্গের কীর্ত্তি-কাহিনী ঋগ্বেদে পুনঃপুনঃই উল্লিখিত হইয়াছে। আমরা ঋগ্বেদের কতকগুলি হুক্তের মর্ম্মানুবাদ নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি; তাহাতে ঋগ্বেদোক্ত প্রাচীন নৃপতিগণের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। ঋগ্বেদের প্রধান মণ্ডলের অষ্টাদশ হুক্তে, কথ ঋষি অগ্নি-দেবতার স্তোত্রে বলিতেছেন,—“দম্য-দমনকারী অগ্নির সহিত তুর্কশ ও যদু ও উগ্রদেবকে আহ্বান করি; অগ্নি, নববাসু ও বৃহদ্রথ ও তুর্কীতিকে এই স্থানে আনয়ন করুন।” এই ঋকোক্ত তুর্কশ, যদু, উগ্রদেব, নববাসু, বৃহদ্রথ এবং তুর্কীতিকে সারণাচার্য্য ‘রাজর্ষি’ বলিয়া অভিহিত করেন। পুরাণের বংশ-লতায় যদু ও তুর্কশ (তুর্কশু) — যবান্তির পুত্র-রূপে পরিচিত আছেন। বৃহদ্রথ নামে বংশ-লতায় একাধিক নৃপতির নাম দৃষ্ট হয়। কিন্তু এই ঋকে কি তাহাদিগকেই দক্ষ্য করা হইয়াছে? ঐ মণ্ডলেরই ত্রি-পঞ্চাশ হুক্তে, অদ্বিরার পুত্র শবা ঋষি, ইন্দ্র দেবতার স্তোত্রে বলিতেছেন,—“তুমি অতিথি (নামক রাজার) জন্ত কহজ ও পর্গর (নামক অমুরদ্বয়কে) তেজস্বী বর্তনী দ্বারা বধ করিয়াছ; তৎপর তুমি অমুর-রহিত হইয়া (অর্থাৎ একাকী) ঋজিমান (নামক রাজার) দ্বারা চারিদিকে বেষ্টিত বঙ্গদ (নামক অমুরের) শত নগর ভেদ করিয়াছিলে। ৮॥ সহচর রহিত সুশ্রবা (নামক রাজার) সহিত (যুদ্ধ করিবার জন্ত) যে বিংশ নরপতি ও ৬০,০২২ অমুর আসিয়াছিল, হে প্রসিদ্ধ ইন্দ্র! তুমি শত্রুদিগের অলম্ব্য রথ-চক্র দ্বারা তাহাদিগকে পরাজয় করিয়াছিলে। ৯॥ হে ইন্দ্র! তুমি তোমার রক্ষা সমূহ দ্বারা সুশ্রবা (রাজাকে) রক্ষা করিয়াছিলে, তুর্কিয়ান, (রাজাকে) তোমার পরিত্রাণ-সাধন সমূহ দ্বারা রক্ষা করিয়াছিলে; তুমি কুংস, অতিথি এবং আয়ুকে এই মহৎ যুবক রাজার (সুশ্রবার) অধীন করিয়াছিলে। ১০॥” এই হুক্ত-ত্রয়ে আমরা ছয় জন নৃপতির নাম প্রাপ্ত হইলাম; আরও দেখিলাম,—সুশ্রবা রাজার বিরুদ্ধে বিংশতি জন নৃপতি সহস্র নবনবতি সাংখ্যক সহচর লইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এবং

* এই ঋগ্বেদে তুর্কশ পরিচ্ছেদের ৫৫শ হইতে ৫৭শ পৃষ্ঠা হইয়া।

রাজা সুশ্রবা—কুংস, অতিথি ও আয়ুকে বশীভূত করিয়াছিলেন! পুরাণে সুশ্রবা রাজার এই বীরত্ব-কাহিনী শুনিতে পাই না। বায়ুপুরাণে সুশ্রবা নামে এক জন প্রজাপতির উল্লেখ আছে বটে; কিন্তু তাঁহার সহিত এই ঘটনার কোনই সম্বন্ধ নাই। তবে এ সুশ্রবা কে? পুরুষবার পুত্রের নাম—আয়ু। এই ঋকোক্ত আয়ু যদি সেই আয়ু হন, তাহা হইলে তাঁহার সম-সময়ে দেবভক্ত সুশ্রবার বিদ্যমানতা স্বীকার করিতে হয়; তুর্কযান, কুংস এবং অতিথিও তাঁহাদিগেরই সম-সাময়িক ছিলেন। সায়ণাচার্য্য—তুর্কযান এবং অতিথিকে দুই স্থলে দিবোদাস বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু সে অনুমান কতদূর সঙ্গত—বলা যায় না। চন্দ্রবংশের বংশ-লতায় দুই জন দিবোদাসের নাম দৃষ্ট হয়। তুর্কযান এবং অতিথি—সেই দুই দিবোদাসের কোনও দিবোদাস হওয়া অসম্ভব; কারণ, তিনি আয়ুর বহু অধস্তন পর্যায়ে অবস্থিত। কিন্তু প্রথম মণ্ডলের এক-পঞ্চাশ স্তরের ষষ্ঠ ঋকে, দ্বাদশাদিক শততম স্তরের চতুর্দশ ঋকে এবং ত্রিংশদিক শততম স্তরের সপ্তম ঋকে দিবোদাসের বিষয় যেরূপ-ভাবে লিখিত আছে, তাহাতে অতিথি—দিবোদাসেরই নামান্তর বলিয়া বুঝা যায়। সেখানে ‘অতিথি’ শব্দের অর্থ—অতিথিবৎসল। তাঁহার পুত্রের নাম—পুরুচ্ছেদ। এতদ্বারাও পুরাণোক্ত দিবোদাসের সহিত এই দিবোদাসের স্বাতন্ত্র্য প্রতিপন্ন হয় না কি? চতুঃপঞ্চাশ স্তরের ষষ্ঠ ঋকে তুর্কয ও যহকে ‘নর্য্য’ এবং তুর্ক্যাতিকে ‘বর্য্য’ কুলোদ্ভব বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ‘নর্য্য’ ও ‘বর্য্য’ কুলের অল্প পরিচয় পাওয়া যায় না। সুদাস নৃপতির বিষয় পূর্বেই আমরা উল্লেখ করিয়াছি। প্রথম মণ্ডলের সপ্তচত্বারিংশ স্তরে সুদাস রাজার নাম প্রথম দেখিতে পাই। সেখানে অশ্বিনয় সুদাসকে অন্ন আনিয়া দিয়াছিলেন—উল্লেখ আছে। তার পর, ত্রিষষ্টিতম স্তরের সপ্তম ঋকে গোতম-পুত্র নোথা ঋষি ইন্দ্র দেবত্বের স্তবে বলিতেছেন,—“হে বজ্রিনু! তুমি পুরুকুংস (নামক ঋষির) সহায় হইয়া যুদ্ধ করতঃ সেই সপ্ত-নগর ধ্বংস করিয়াছ; এবং তুমি সুদাস (নামক রাজার) নিমিত্ত অংহা নামক অসুরের ধন, যজ্ঞ-কুশের জায় অনায়াসে কর্ত্তন করিয়াছ। পরে হে রাজনু! সেই হব্যদাতা (সুদাসকে) সেই ধন দিয়াছ।” এই স্তরে কুংসের নামও উল্লেখ আছে। স্তরের তৃতীয় ঋকে ঋষি বলিতেছেন,—“সাম্বাতিক ও তুলুল সংগ্রামে তুমি দীপ্তিমান তরুণ কুংসের সহায় হইয়া শুক নামক অসুরকে বধ করিয়াছিলে।” এই কুংসের বিষয় সপ্তম মণ্ডলের উনবিংশ স্তরের দ্বিতীয় ঋকে উক্ত আছে,—“হে ইন্দ্র! তুমি যখন অর্জুনীর পুত্র এই কুংসকে ধন প্রদান করতঃ দাস, শুক ও কষকে বশীভূত করিয়াছিলেন, তখন শরীর দ্বারা শুশ্রম্যান হইয়া যুদ্ধে কুংসকে রক্ষা করিয়াছিলেন।” প্রথম মণ্ডলের দ্বাদশাদিক শততম স্তরে কুংসকে অর্জুনের পুত্র বলিয়া, উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু চতুর্থ মণ্ডলের বোড়শ স্তরের দ্বাদশ ঋকের টীকায় সায়ণ কর্ত্তক কুংস ‘কক-পুত্র’ বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। সেই ঋকে দেখিতে পাওয়া যায়, ইন্দের সহিত কুংস ইন্দ্র-লোকে গমন করিলে, কুংসের ও ইন্দের সমান রূপ-সৌন্দর্য্য দেখিয়া, ইন্দের স্ত্রী—দুই জনের মধ্যে কে ইন্দ্র, তাহা নির্ণয় করিতে পারেন নাই। সায়ণ বলিয়াছেন, অর্জুন—ইন্দেরই নামান্তর। কিন্তু ঘটনাবলী পর্যালোচনা করিলে, কুংসকে ইন্দ্র-পুত্র বলিয়া মনে হয় কি?

সুদাস রাজার প্রসঙ্গ ঋগ্বেদের বহুতর হুক্তেই দেখিতে পাই। সপ্তম বঙলের অষ্টাদশ হুক্তে তাঁহার কীর্তি কাহিনী বিশদ-রূপে পরিবর্ণিত আছে। সেই হুক্তের কয়েকটি ঋকের

সুদাস ও মর্য্য নিয়ে উদ্ধৃত করা হইল ;—“যজ্ঞ-শীল, দানকারী তুর্কশ নামে রাজা অহু, ক্রহঃ, আহু ছিলেন। মৎস্যের জায় নিয়ন্ত্রিত হইলেও ভৃগু ও ক্রহ্যগণ ধনার্হ (সুদাস) প্রভৃতি। এবং তুর্কশের পরম্পর সাক্ষাৎ করাইয়া দিয়াছিলেন। ব্যক্তিগীল এই

উভয়ের মধ্যে সখা সখাকে বধ করিয়াছিলেন। ৬ ॥ (সুদাস) রাজা যশোলাভের জন্ত দুইটি জনপদের একবিংশ জন লোককে বিনাশ করিয়াছিলেন। যজ্ঞ-গৃহে যুবা (অধ্বর্যু) যেক্রপ কুশ-ছেদন করে, সেইরূপ তিনি (শক্রগণকে) ছেদন করেন।...১১ ॥ আর বজ্র-বাহু ইন্দ্র, শ্রুত, কবচ, বৃদ্ধ ও ক্রহ্যকে আহুপূর্ব্ব রূপে জল-মধ্যে নিমগ্ন করিয়াছিলেন। এই সময়ে যাহারা তাঁহাকে কামনা করিয়া তাঁহার গুতি করিয়াছিল, (তাহারা) সখ্যের জন্ত বরণ করিয়া সখ্য (লাভ) করিয়াছিল। ১২ ॥ ইন্দ্র নিজ বল দ্বারা উহাদিগের দৃঢ়-পুরী সমস্ত এবং সপ্ত প্রকার (রক্ষার উপায়) তৎক্ষণাৎ বিদীর্ণ করিয়াছিলেন। অহুর পুত্রের গৃহ তৎক্ষণে দান করিয়া-ছিলেন। ১৩ ॥ অহুর ও ক্রহ্যর গবাভিলাষী ষষ্টি শত এবং ষট্ সহস্র বড়দিক ষষ্টি সংখ্যক পুত্রগণ পরিচর্যাভিলাষী (সুদাসের) জন্ত শায়িত হইয়াছিল। ১৪ ॥” এই হুক্তে বিশিষ্ট ঋষি ইন্দের স্তবে আরও বলিতেছেন,—“হে দেবশ্রেষ্ঠ! দেববান রাজার পৌত্র, পিজবনের পুত্র, সুদাসের দুই শত গো এবং দুই খানি রথ আমি ইন্দ্রকে স্তব করিয়া প্রাপ্ত হইয়াছি। হোতা যেমন যজ্ঞ-গৃহে গমন করে, আমি সেইরূপ গমন করিতেছি। ২২ ॥ দানাদ্রুত স্বর্ণালঙ্কার-বিশিষ্ট, দুর্গতিতে ঋজুগামী ও পৃথিবীস্থিত, পিজবন-পুত্র সুদাসের প্রদত্ত চারিটি অশ্ব পুত্রবৎ পালনীয় বসিষ্ঠকে পুত্রের অম্বার্ষে বহন করিতেছে। ২৩ ॥ যে সুদাসের যশ বিস্তীর্ণ দাব্যা পৃথিবীর মধ্যে অবস্থিত, যে দাতাশ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ-ব্যক্তিকে ধনদান করেন, সপ্তলোক তাঁহাকে ইন্দের জায় স্তব করে। নদী সকল যুদ্ধে যুধ্যামধি (নামক শক্রকে) বিনাশ করিয়াছেন। ২৪ ॥ হে নেতা মরুগণ! এই সুদাস রাজার পিতা, দিবোদাসের (পিজবনের) জায় তোমরা ইহাকেও সেবা কর। পিজবন-পুত্রের গৃহ রক্ষা করুন। ইহার বল বিনাশরহিত এবং অশিথিল হউক। ২৫ ॥” এই সকল ঋক আলোচনা করিলে, আমরা বুঝিতে পারি, যিনি পিজবন, তিনিই দিবোদাস—তিনিই অতিথি—তিনিই আবার সুদাসের পিতা। পুরাণে হর্য্য-বংশে এবং চন্দ্র-বংশে দুই তিন জন সুদাসের নাম দৃষ্ট হয়। এক জন—হর্য্য-বংশের সুদাস—ত্রকপুরাণে ও হরিবংশে আভির্গণির পুত্র এবং ক্রীমদ্ভাগবতে সর্ষকামের পুত্র বলিয়া পরিচিত। সে সুদাসের পিতামহের নাম—ঋতুপর্ণ। অপর জন—চন্দ্র-বংশের সুদাস—বিষ্ণুপুরাণে এবং ক্রীমদ্ভাগবতে তিনি দিবোদাসের প্রপৌত্র-পর্য্যায়ভুক্ত। তাঁহার পিতার নাম—চ্যবন। * সুতরাং ঋগ্বেদোক্ত সুদাস এবং পুরাণোক্ত সুদাস অভিন্ন ব্যক্তি কিনা,—নির্ণয় করা দুর্ধট। বিশেষতঃ, ঋগ্বেদোক্ত অহু ও ক্রহ্য যদি বধাতি-পুত্র অহু, ক্রহ্য হন; তাহা হইলেও সেই সুদাসের সহিত পুরাণোক্ত সুদাসের সম-সাময়িকত্ব অসম্ভব। চন্দ্র-বংশের বংশ-লতায় অহু ও ক্রহ্য প্রধানতঃ দশম পর্য্যায়ের অবস্থিত। কিন্তু সুদাসের পর্য্যায়—

* এই গ্রন্থের ২২০নং, ২২১নং ৩১৪নং এবং ২২২নং পৃষ্ঠায় বংশ-লতা দৃষ্টব্য।

সূর্য্য-বংশে ত্রিগুণাশ এবং চন্দ্র-বংশে ত্রিচন্দ্রাংশ । এতদ্ব্যতিরিক্ত সমসাময়িক কল্পে সম্ভবপর হইতে পারে ? চীকাকারগণ ত্রিষষ্ঠিতম যুগোক্ত পুরুকুৎসকে সূর্য্যবংশজ মাক্কাতার পুত্র বলিয়া অভিহিত করিয়া গিয়াছেন । কিন্তু সে সম্বন্ধে কেহই বিশেষ কোনও প্রমাণ প্রদর্শন করিতে পারেন নাই । প্রথম মণ্ডলের দ্বাদশাধিক শততম যুগে জনৈক ক্বেত্রপতি মাক্কাতার নাম উল্লিখিত হইয়াছে বটে ; কিন্তু সেই মাক্কাতাই যে সূর্য্যবংশীয় মাক্কাতা,— তাহা বুঝিবার উপায় নাই । অষ্টম মণ্ডলের উনচন্দ্রাংশ এবং চন্দ্রাংশ যুগেও মাক্কাতার নাম দৃষ্ট হয় । সেখানে, কথ-পোত্রীয় নাতাক্ ঋষি অগ্নি-দেবতার স্তোত্রে বলিতেছেন,—“তিনি (অগ্নি) তিন-হান-বিশিষ্ট মাক্কাতার জন্ত সর্কাপেক্ষা অধিক দ্রব্য হনন করিয়াছিলেন ।” ইহাতে বুঝা যায়,—যেন অগ্নি-দেবের সাহায্যে মাক্কাতা স্বর্গ-মর্ত্য-রসাতল ত্রিভুবনের অধীশ্বর হইয়াছিলেন । পুরাণে মাক্কাতা পৃথিবীপতি বলিয়া পরিচিত আছেন বটে ; কিন্তু ঠিক এইরূপ উক্তি সেখানে দেখিতে পাই না । প্রথম মণ্ডলের দ্বাদশাধিক শততম যুগে আর এক ঋকে ত্রসদস্যুর নাম দৃষ্ট হয় । চীকাকারগণ তাঁহাকে পুরুকুৎসের পুত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন । সূর্য্যবংশের বংশ-লতা আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, মাক্কাতার পুত্র পুরুকুৎস এবং পুরুকুৎসের পুত্র ত্রসদস্যু । ঋগ্বেদের যুগে তাঁহাদের সে সম্বন্ধ-পরিচয় দৃষ্ট হয় না বটে ; কিন্তু নামের মিল দেখিয়া, চীকাকারগণ তাঁহাদের সম্বন্ধ-তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া লইয়াছেন । ইহার পর, প্রথম মণ্ডলের ষোড়শাধিক-শততম যুগে, বিমদ, তুগ্র, ভুহু, খেগ, ঋশ্রাখ, জহু, দিবোদাস, জাহব, পৃথুপ্রবা প্রভৃতি রাজধিগণের উল্লেখ আছে । দীর্ঘতমার পুত্র কন্দীবান ঋষি অশ্বিনয়ের স্তবে বলিতেছেন,—“তাঁহারা (অশ্বিনয়) শক্রসেনা পশ্চাতে ফেলিয়া রথ দ্বারা যুবক বিমদ রাজর্ষির জীকে তাঁহার নিকট পৌছাইয়া দিয়াছিলেন ।” এই পক্ষোক্ত বিমদ রাজর্ষির পরিচয়ে সাধারণ বলিয়াছেন,—‘বিমদ রাজর্ষি স্বয়ংবরে পরী লাভ করেন । পথে, স্বয়ংবর-সভায় আগত রাজগণ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া, সেই কথা অপহরণের চেষ্টা করিয়াছিলেন । অশ্বিনয়, রাজর্ষি বিমদের জীকে বিপক্ষ রাজগণের আক্রমণ হইতে মুক্ত করেন ;—আপনাদের রথে চড়াইয়া বিমদের রাজধানীতে পৌছাইয়া দেন ।’ তুগ্র এবং ভুহু সম্বন্ধে ঋকের মর্ম্ম এই,—“কোনও ত্রিগুণাশ মনুষ্য বৈরুপ ধন ত্যাগ করে, সেইরূপ তুগ্র (অতি কষ্টে তাঁহার পুত্র) ভুহুকে সমুদ্রে পাঠাইয়াছিলেন । যে অশ্বিনয় ! তোমরা আপনাদিগের নৌকাসমূহ দ্বারা তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনিয়াছিলে ।” এই ঋকংশের চীকার সাধারণ্যে বাহা লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম,—“তুগ্র নামে অশ্বিনদিগের প্রিয় এক জন রাজর্ষি ছিলেন । তিনি দ্বীপান্তরবর্তী শত্রুদিগের উপদ্রবে ক্রিষ্ট-হইয়া, তাহাদিগকে জয় করিবার জন্ত আপন পুত্র ভুহুকে সেনার সহিত নৌকায় প্রেরণ করেন । সমুদ্রে অনেক দূর গিয়া সে নৌকা ভাসিয়া যায় । ভুহু অশ্বিনয়কে স্মৃতি করিলেন, তাঁহারা সন্মুখে ভুহুকে আপনাদিগের গোতে আরোহণ করাইয়া তিন দিন তিন রাত্রিতে তাহাদিগকে তুগ্রের নিকট পাঠাইয়া দিলেন ।” এই যুগের পঞ্চদশ ঋকে খেল রাজার সম্বন্ধে লিখিত আছে,—“খেলের (জী বিশপ্লার) পুত্র পানী, পানীর একটা পান্যর জায়, যুদ্ধে ছিন্ন হইয়াছিল । যে অশ্বিনয় !

তোমরা রাজ্যযোগে সতাই বিশপ্লার গমনের জন্ত এবং (শত্রু) জন্ত ধন লাভার্থ লৌহময় জন্ম পর ইয়া দিয়াছিলে।” এই খেল নৃপতির পরিচয়ে সায়ণ-কৃত টীকার মর্ম,—“খেল নামক এক জন রাজা ছিলেন। তাহার পুরোহিত—অগস্ত্য। খেলের জী—বিশপ্লা; কোনও যুদ্ধে শত্রুদিগের দ্বারা তাহার একটা পা ছিন্ন হইয়াছিল। অগস্ত্য অশিষ্যের স্তুতি করিতে অশিষ্য রাজ্যে আসিয়া বিশপ্লাকে লৌহের পা করিয়া দিয়াছিলেন।” ঋজাখ রাজার সন্ধে ঋকের মর্ম,—“যে ঋজাখ বৃকীকে শত মেঘ খণ্ড করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাকে তাহার পিতা দৃষ্টিহীন করিয়াছিল; হে তিবজ দ্রাক্ষাসত্যদয়! তাহার চক্ষুদর্শন দর্শনে অসমর্থ হইয়াছিল, তোমরা তাহার চক্ষুদর্শন-সমর্থ করিয়াছিলে।” সায়ণের টীকার মর্মার্থ,—“বৃষাগিরের পুত্র ঋজাখ নামক একজন রাজর্ষি ছিলেন। অশিষ্যের বাণে গর্দভ তাহার নিকট বৃকী (নেকড়ে বাঘিনী) হইয়াছিল। ঋজাখ তাহাকে ১০১ পৌর জনের মেঘ খণ্ড খণ্ড করিয়া দিয়াছিলেন। পৌর জনের এইরূপ অপকার করিতে ঋজাখের পিতা তাহাকে নেত্রহীন করিলেন। তিনি অশিষ্যকে স্তুতি করিলেন, এবং তাহার, নিজের বাহনের জন্ত ঋজাখের অন্ধতা হইয়াছে জানিয়া তাহাকে পুনরায় চক্ষুদান করিলেন।” পুরোহিত হুক্তোক্ত জহু এবং পৃথুশ্রবার নাম, পুরাণের বংশ-লতায় দৃষ্ট হয়। সায়ণ তাহাদিগকে সেই পুরাণোক্ত জহু এবং পৃথুশ্রবা বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। প্রথম মণ্ডলেরই ষাণ্ঠ্যত্যাধিক শততম যুক্তের ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ ঋকে, দীর্ঘতমার অপত্য কক্ষীবান ঋষি—ইষ্টাখ, ইষ্টরশ্মি, মশর্গার ও অযবশ রাজার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। স্বনয় এবং কক্ষীবান সন্ধে পঞ্চবিংশত্যাধিক শততম যুক্তের প্রথম ঋকের মর্ম,—“(স্বনয় রাজা) প্রাতঃকালে আসিয়া প্রাতঃকালেই রত্ন আনিয়া রাখিলেন। (কক্ষীবান) চেতনা পাইয়া রত্ন গ্রহণ করিয়া স্থাপন (প্রস্থান?) করিলেন। সুবীত্র (দীর্ঘতমা) সেই রত্ন দ্বারা প্রজা ও আবু বর্ধন করিয়া ধন-বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন।” এই ঋকের সায়ণাচার্য-কৃত টীকার মর্ম,—“কক্ষীবান্ অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া গৃহে গমন কালে পথপার্শ্বে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। স্বনয় রাজা অমুচরবর্গের সহিত তথায় আসিয়া কক্ষীবানের রূপ দেখিয়া তুষ্ট হইয়া তাহাকে নিজ গৃহে লইয়া গেলেন এবং আপনার দশ কন্তার সহিত তাহার বিবাহ দিয়া তাহাকে ১০০ নিষ্ক সুবর্ণ, ১০০ অৰ্ঘ, ১০৬০ পাণ্ডী ও ১১০০০ প্রদান করিলেন। কক্ষীবান্ গৃহে আসিয়া সেই অৰ্ঘ সমুদায় পিতাকে অর্পণ করিলেন।” পরবর্তী যুক্তেও সায়ণোক্ত সিদ্ধান্তের সমর্থন দৃষ্ট হয়। সে যুক্তের তাৎপর্য,—“স্বনয়-বর্জক প্রদত্ত গ্রামবর্ণ অথবুলক বধু-সম্বিত দশখানি রথ আমার নিকট উপস্থিত হইল। এক সহস্র বটি সংখ্যক গাভী উপস্থিত হইল। কক্ষীবান্ গ্রহণ করিয়া পর দিনই তাহা (আপনার পিতাকে) দান করিলেন।” এই যুক্তের প্রথম ঋকে তাবয়ব্য রাজার নাম দৃষ্ট হয়। তিনি সিদ্ধ-বীণের * অধিপতি ছিলেন। অনুর নামক জনৈক নৃপতিরও দান-মহিমা এই ঋকে পরিকীর্তিত। দানের জন্ত সেই (অনুর) “রাজা বর্গলোকে শাখতী-কীর্তি বিস্তার করিবেন”—

* উল্লঙ্গন বলেন,—“Either the river Indus or the sea-shore” অর্থাৎ যুদ্ধে যে “সিদ্ধান আধ” আছে, তাহাতে হয় ‘সিদ্ধানদ’, নয় ‘সমুদ্র-তীরবর্তী স্থান’ বুঝাইতেছে।

একের ইহাই মর্য়ার্থ। একপঞ্চাশদধিক শততম স্রুতের দ্বিতীয় ঋকে পুরুষিল শব্দ দৃষ্ট হয়। টীকাকারগণের কেহ তাহার অর্থ করিয়াছেন—“অভীষ্টপ্রদারী” ; কেহ করিয়াছেন—পুরুষিল রাজা। সায়ণাচার্য্য ণেযুক্ত অর্থেরই পোষকতা করেন। আমি না—এই পুরুষিলের সহিত পুরাণোক্ত চন্দ্রবংশোদ্ভব পুরুষীড়ের কোনও সাদৃশ্য আছে কি না! ত্রিপঞ্চাশদধিক শততম স্রুতে রাতহব্য রাজার নাম আছে। চতুঃসপ্তত্যধিক শততম স্রুতের দ্বিতীয় ঋকে ‘ইন্দ্র দেবতা শারদীপুরী ভেদ করিয়াছিলেন’—উক্ত হইয়াছে। যুক্তোক্ত ‘শারদীপুরঃ’ শব্দে টীকাকারগণ শরৎ নামক রাজার পুত্র বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ঐ স্রুতের সপ্তম ঋকে অগস্ত্য ঋষি ইন্দ্র-দেবতার স্তবে বলিতেছেন,—“হে ইন্দ্র! তুমি দুর্ঘ্যোনি রাজার জ্ঞাত কুয়বাচকে হনন করিয়াছ।” তৃতীয় মণ্ডলের ত্রিপঞ্চাশ স্রুতে প্রমগন্ধ রাজার নাম দেখিতে পাই। স্রুতের চতুর্দশ ঋকের মর্ম্ম,—“কীকট-সমূহের মধ্যে গাতী সকল তোমার কি করিবে? উহারা সোমের সহিত মিশ্রিত হইবার যোগ্য দুগ্ধ দান করে না, দুগ্ধ প্রদান দ্বারা পাত্ৰকেও দীপ্ত করে না। (উহাদিগকে) আমাদিগের নিকট আনয়ন কর। প্রমগন্ধের ধন আনয়ন কর। হে মঘবন! নীচ-বংশীয়দিগের ধন আমাদিগকে প্রদান কর।” টীকাকারগণ বলেন,—এই ঋকোক্ত কীকট-দেশ—বিহার-প্রদেশ। প্রমগন্ধ—বিহারের নৃপতির নাম। “সায়ণ বলেন,—যে স্তম্ভ লইয়া টীকা দেয়, তাহার নাম—‘মগন্ধ’ ; তাহার অপত্য প্রমগন্ধ।” তাহার মতে,—‘কীকটেবু অনাধ্য-নিবাসেবু জনপদেবু।’ * তৃতীয় মণ্ডলের ষষ্টিতম স্রুতে সূর্য্য নাম দৃষ্ট হয়। সূর্য্যার পুত্রগণ ‘কর্ম্মদ্বারা শক্রপরাত্যবোপযুক্ত তেজ-বিশিষ্ট হইয়া যজ্ঞীয় ভাগ প্রাপ্ত’ হইয়াছিল। চতুর্থ মণ্ডলের ত্রিংশ স্রুতে, দাস শব্দর, দাস বর্জিত প্রভৃতির নাম দৃষ্টে, তাহাদিগকে নীচ-বংশীয় রাজা বলিয়া অনেকে মনে করেন। আর্য্য, অর্ণ ও চিত্ররথকে, ইন্দ্র সরস্ব-নদীর তীরে বধ করিয়াছিলেন, এবং দভীতি রাজার জন্য ত্রিংশ সহস্র দাসকে হনন করিয়াছিলেন,—ঐ স্রুতে এইরূপ উল্লেখ আছে। টীকাকার বলেন,—“আর্য্যগণ ক্রমে সরস্ব-তীর অতিক্রম করিয়া রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। অনাধ্যগণের সহিত যুদ্ধ ভিন্ন আর্য্য রাজগণের পরস্পরের মধ্যেও যুদ্ধ-বিবাদ হইত ; এবং সরস্বর পূর্বপারস্থ দুই জন আর্য্য রাজা এইরূপ যুদ্ধে হত হইলেন, তাহা এই ঋকে (ত্রিংশ-স্রুতের অষ্টাদশ ঋকে) প্রকাশ হইতেছে।” চতুর্থ মণ্ডলের বিচত্রারিংশ স্রুতের অষ্টম ও নবম ঋকের মর্য়ার্থ,—“দুর্গহের পুত্র বন্দী হইলে পর, সপ্ত পরিগণ এই (দেশ) পিতা হইয়াছিলেন। তাহার এই পুরুষস্রুতের জীৱ জন্ত ত্রসদস্যকে বধ করিয়া লাভ করিয়াছিলেন। ত্রসদস্য ইন্দ্রের জায় শত্রু-বিনাশক এবং অর্জ্জুদেব। ৮। হে ইন্দ্র ও বরুণ! পুরুষস্রুত-পত্নী তোমাদিগকে দ্ব্য ও স্তুতি দ্বারা প্রীত করিয়াছিলেন। অনন্তর তোমরা তাহাকে শক্রনাশক অর্জ্জুদেব রাজা ত্রসদস্যকে দান করিয়াছিলেন। ৯।” এই দুই ঋকের টীকায় সায়ণাচার্য্য বাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম,—“দুর্গহ রাজার পুত্র

* “Kikat is usually identified with South Bihar”—Wilson “In the Rik Samhita, where the Kikats—the ancient name of the people of Magadha—and their king Pamaganda are mentioned as hostile, we have probably to think of the aborigines of the country.”—Weber’s *Indian Literature*.

পুরুকুৎস কার্যরত হইলে পর তাঁহার মহিষী রাজ্য অরাজক দেখিয়া পুত্র-পাতের ইচ্ছার বেজা-পূর্বক সমাগত সপ্তবিংশকে পূজা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রীত হইয়া রাজ্যকে এই কথা বলিলেন যে, ইন্দ্র ও বরুণের বিশেষরূপে যজ্ঞ করা অনন্তর রাজ্যী, ইন্দ্র ও বরুণের যজ্ঞ করিয়া ত্রসদস্যকে প্রাপ্ত হইলেন।” আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, পুরুকুৎস—মাকাতার পুত্র; কিন্তু এখানে দেখি, পুরুকুৎস—দুর্গহের পুত্র। দুর্গহ এবং মাকাতা কি তবে একই ব্যক্তি? অথবা, বেদোক্ত ও পুরাণোক্ত পুরুকুৎসের স্বাতন্ত্র্য আছে?

রাজর্ষি ত্র্যাক্ষ সঙ্ঘে পঞ্চম মণ্ডলের সপ্তবিংশ সূক্তে অত্রি ঋষি অগ্নি-দেবতার স্তবে বলিতেছেন,—“হে মানবগণের অধিনায়ক বৈশ্বানর! সাধুগণের ব্রহ্মক, জ্ঞানবান, অম্বর এবং ধনবান, ত্রিযজ্ঞের পুত্র ত্র্যাক্ষ নামক রাজর্ষি আমাকে শকট-সংযুক্ত গৌ-ঘর এবং দশ সহস্র (সুবর্ণ) প্রদান করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।” * এই মণ্ডলের দ্বিতীয় সূক্তে প্রথম ঋকের চীকায় ত্র্যাক্ষ রাজর্ষির

ঋষ্যদোক্ত
রাজর্ষিগণ।

একটু পরিচয় পাওয়া যায়। চীকাকার লিখিয়াছেন,—“শাঠ্যায়ন ব্রাহ্মণে এই ঋকের এইরূপ ইতিহাস আছে; যথা, ইক্ষাকু-বংশীয় ত্র্যাক্ষ রাজা পুরোহিত বংশের সহিত এক রথে গমন করিতেছিলেন। রথচক্র সংঘর্ষে একটি ব্রাহ্মণ-কুমারের প্রাণনাশ হওয়ায় সন্দেহ হইল, রথ-চালক পুরোহিত বা রথস্বামী রাজা ইহাদের মধ্যে কে ব্রহ্ম-হত্যার জন্ত অপরাধী হইবে। ইক্ষাকু-বৃদ্ধগণ স্থির করিয়াছিলেন যে, পুরোহিতই অপরাধী। পুরোহিত তখন বার্ষাগম মন্ত্র দ্বারা বালকটাকে পুনর্জীবিত করিলেন। কিন্তু তিনি ইক্ষাকু-বংশীয়গণকে গন্ধপাতী বলিয়া শাপ দিলেন, যে তোমাদের ঘরে অগ্নি আর থাকিবেন না। অগ্নির অভাবে ইক্ষাকুগণ একান্ত কষ্টে পড়িয়া পুনরায় পুরোহিতকে প্রসন্ন করতঃ আপনাদের শাপ বিমোচন করাইবার চেষ্টা করিলেন। পরে ঋষি দেখিলেন—ব্রহ্মহত্যা পাপ ত্রসদস্য রাজার ভার্য্যা হইয়া পিষাচ-রূপে অগ্নির হর অপহরণ করিয়া বজ্র মধ্যে লুকাইয়া রাখিল। ঋষি হরকে নানা প্রকারে প্রীত করতঃ অগ্নির মধ্যে স্থাপন করিলেন।”† বুদোক্ত এই ত্র্যাক্ষ নৃপতির নাম পুরাণোক্ত ইক্ষাকু-বংশের বংশ-লতায় কোথাও দৃষ্ট হয় না। ইক্ষাকু-বংশে ত্র্যাক্ষ (ত্র্যাক্ষিণ) নামে এক জন নৃপতি আছেন বটে; কিন্তু তিনি, বিষ্ণুপুরাণের মতে, ত্রসদস্যর অধস্তন অষ্টম পুরুষে অবস্থিত। ত্র্যাক্ষপুরাণের মতে, ত্র্যাক্ষিণ—ত্রসদস্যর পৌত্র-স্থানীয়। সুতরাং, ত্র্যাক্ষিণ ও ত্র্যাক্ষ এক ব্যক্তি হওয়া সম্ভবপর কি? তার পর, ত্র্যাক্ষিণের পিতার নাম—পুরাণে ত্রিধ্বা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কিন্তু ঋগ্বেদে তাঁহার পিতার নাম—ত্রিযজ্ঞ। যদি তাঁহার একই ব্যক্তি হইবেন, তাহা হইলে এ বৈশ্বানরোক্ত কার্য কি? চীকাকারগণ বলেন,—এখানেও রূপক। “প্রথম অর্ধে কুমার শব্দে রথচক্রে কিহু ব্রাহ্মণ-কুমার। দ্বিতীয় অর্ধে কুমার শব্দে অগ্নি। মাতা অরণি লুকায়িত ভাবে অগ্নিকে ধারণ করেন, যজমান-রূপ পিতাকে প্রদান করেন না। লোকে অরণি

* ত্র্যাক্ষ নৃপতির বংশ সহস্র স্বর্ণ প্রদান উপলক্ষে উইলসন সাহেব স্বর্ণ-মুদ্রা দান অর্থ উপলব্ধি করেন,—

“It is not impossible, however, that pieces of money are intended; for, if we may trust Arya, the Hindus had coined money before Alexander.”—“H Wilson.

† রথচক্রের ঘর্ষের সমুদায়িত্ব ঋগ্বেদের চীকা হইয়া।

অগ্নি দেখিতে পায় না, কিন্তু অরবির ফোড়ন অগ্নিকে দেখিতে পায়।...কাষ্ঠই অগ্নির মাতা, সেই কাষ্ঠ নিজীব অগ্নিকে নুকাইয়া রাখে, যজমান কাষ্ঠ বর্ষণ করিলে সে অগ্নি জীবিত হইয়া দৃষ্ট হয়।” উপাখ্যানের অন্তর্নিহিত রূপক বাহাই হউক, ইন্দ্র-কুলে ত্র্যম্বক নামক রাজার পরিচয় ঋগ্বেদে যে পাওয়া যাইতেছে, তাহা বলাই বাহুল্য। রাজর্ষি ঋজিষার নাম ঋগ্বেদে একাধিক স্থানে দৃষ্ট হয়। ঐষ্ঠ মণ্ডলের বিংশ সূক্তে, ভরদ্বাজ ঋষি ইন্দ্র-দেবতার স্তবে বলিতেছেন,—“হে বদান্ত ইন্দ্র ! তুমি হব্যরূপ ধন প্রদাতা (রাজর্ষি) ঋজিষাকে অক্ষয় ধন প্রদান করিয়াছ।” রাজর্ষি ঋজিষা এদিকে আবার ভরদ্বাজের অপত্য বলিয়া পরিচিত; বিপকাশ সূক্তের প্রবর্তক-রূপেও তাঁহার নাম উক্ত হইয়াছে। রাজর্ষি ঋজিষা যজ্ঞ-কার্য্যের জ্ঞাত প্রসিদ্ধ। অতিবাজ ঋষি যজ্ঞ-কর্ম্ম-দ্বারা ঋজিষার সমকক্ষতা লাভ করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। ঋজিষা তজ্জ্ঞাত তাঁহাকে অভিসম্পাত দেন। ঐষ্ঠ মণ্ডলের দ্বিপকাশ সূক্তে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ঋজিষা, উশিজের পুত্র,—দশম মণ্ডলের নবনবতিতম সূক্তে এইরূপ উল্লেখ আছে। পঞ্চম মণ্ডলের উনবিংশ সূক্তে আবার দেখিতে পাই, বিদধিনের পুত্র—ঋজিষা ; অন্ততঃ টীকাকারগণ সেখানে সেই অর্থই পরিগ্রহ করিয়াছেন। রাজর্ষি দতীতি, ‘সোম্যভিষব, হব্যপাক ও ইক্ষন সঞ্চয় করিয়া’ ইন্দ্রের পরিচর্যা করিয়াছিলেন। ঐষ্ঠ মণ্ডলের বিংশ এবং ষড়বিংশ সূক্তে ইন্দ্রদেবের আরাধনার ভরদ্বাজ ঋষি দতীতির গুণ-কীৰ্ত্তন করিতেছেন। এই ‘দতীতির জ্ঞাত দস্যু, চুম্ব্রি ও ধুনিকে ইন্দ্র বজ্র দ্বারা বধ’ করেন। সপ্তম মণ্ডলের উনবিংশ সূক্তে তাহার পরিচয় পাই। অসঙ্গ (আসঙ্গ) রাজর্ষির বিবরণ বড়ই কৌতুকাবহ। অষ্টম মণ্ডলের প্রথম সূক্তের ত্রিংশ হইতে ত্রয়ত্রিংশ ঋকের প্রবর্তক বলিয়া তাঁহার পরিচয় পাই। সেই ঋক-চতুষ্টয়ের মধ্যে দৃষ্ট হয়,—তিনি বহু-বংশোৎপন্ন, তিনি প্রয়োগ রাজার পুত্র। ঋক-সমূহের টীকার টীকাকার লিখিয়া গিয়াছেন,—‘অসঙ্গ শাপ-প্রাপ্ত হইয়া জীৱ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মেঘাতিথির অহুগ্রহে তিনি পুরুষ লাভ করেন। শব্বতী নারী অঙ্গিরা ঋষির কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। তিনি মেঘাতিথিকে বহু ধন প্রদান করিয়া প্রশংসাজনন হইয়াছিলেন।’ শান্তনু রাজার জ্ঞাত দেবাপি ঋষি নানা দেবতার নিকট বারি-বর্ষণের কামনা করিতেছেন (দশম মণ্ডল, ১৮ম সূক্ত)। তাহা দেখিয়া, পুরাণোক্ত শান্তনুর কথাই মনে আসে। ঐষ্ঠ মণ্ডলের সপ্তবিংশতি সূক্তে সত্রাট অভ্যবর্তীর বিবরণে এক নূতন তথ্যের আভাস পাওয়া যায়। সেই সূক্তের কয়েকটি ঋকের মর্ম্ম এই,—“ইন্দ্র চরমানের পুত্র অভ্যবর্তীর প্রতি অনুরক্ত হইয়া বরশিখের পুত্রগণকে সংহার করিয়া ছেন। তিনি হরিবৃন্দার পূর্ব-ভাগে অবস্থিত (বরশিখের পুত্র) বৃচীবানের বংশধরদিগকে বধ করেন। তখন পশ্চিম ভাগে অবস্থিত (বরশিখের) শ্রেষ্ঠ পুত্র ভরে বিদীর্ণ হইয়াছিল। ৫। হে পুরুহুত ! তোমার প্রতি হিংসা করণ দ্বারা বশোলিন্দু হইয়া বজ্র-পাত্র ভঞ্জনকারী ব্যা-বতীর নিকট সমবেত ত্রিংশৎ শত বর্ষধারী বৃচীবৎ পুত্র এক কালে নিধন-প্রাপ্ত হইয়াছিল। ৬। ... বৃচীবৎগণকে দেবরাত-বংশীর (অভ্যবর্তীর) বশতাপন্ন করিয়াছিলেন। ৭। হে অগ্নি ! চরমানের পুত্র, ঐশ্বর্য্যশালী সত্রাট অভ্যবর্তী আমাকে রথ ও রথগী-সহকারে বিংশতি গোমিবুন প্রদান করিয়াছেন। পুত্র বংশধরের এই দান অক্ষয় অর্থাৎ

কেহই ইহার বিশেষ করিতে সমর্থ নহেন। ৮।' উপরি-উদ্ধৃত হুক্তে আমরা দেখিতে পাই,—পৃথুর বংশে দেবরাত্নের অধস্তন পর্যায়ে চরমান-পুত্র ঐর্ষ্য-শালী সম্রাট অত্যবর্তী জয়প্রাপ্ত করিয়াছিলেন এবং তিনি হরিশ্চন্দ্রীর যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন। কাহারও কাহারও মতে—হরিশ্চন্দ্রী বর্তমান ইউরোপের (যুরোপের) আদিভূত। তবে এই ঋকে যে পৃথুর নাম দৃষ্ট হয়, তিনি কোন্ পৃথু? স্বায়ম্ভুব মহুর বংশে বেণ-পুত্র এক পৃথু আছেন; স্বর্য্যবংশে অনরণ্যের (অনেনার) পুত্র পৃথু বলিয়া পরিচিত; চন্দ্রবংশেও পৃথু নামে একাধিক নৃপতির পরিচয় পাই। কিন্তু ঋগ্বেদোক্ত এই পৃথু—কোন্ পৃথু? ঋগ্বেদে (১০ম মণ্ডলের ১৪৮ হুক্তে) বেণ-পুত্র পৃথুর উল্লেখ আছে বটে; কিন্তু তাঁহার সহিত এই পৃথুর সম্বন্ধ-তত্ত্ব নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। যাহা হউক, সম্রাট অত্যবর্তী যে ইউরোপের পূর্বাংশ ও পশ্চিমাংশ জয় করিয়াছিলেন, ইহাতে তাহা বুঝিতে পারা যায়। পঞ্চম মণ্ডলের ত্রিংশ হুক্তে আমরা দেখিতে পাই,—ঋণকয় রাজা ক্রশম-রাজ্যে রাজত্ব করিতেন। সায়ণ বলেন,—“ক্রশম ইতি কশিচ্জনপদবিশেষঃ অত্র ক্রশম-শব্দেন তত্রত্যা জনা উচ্যন্তে। ক্রশমা ঋণকয়নারঃ রাজ্যঃ কিস্রাঃ।” অর্থাৎ, ক্রশম নামক কোনও জনপদের অধিবাসিগণ ঋণকয় রাজার বশীভূত ছিল। রাজা ঋণকয় ইত্যাদি দেবগণের উপাসক ছিলেন—হুক্তে তাহা বুঝিতে পারা যায়। এখন, প্রশ্ন উঠিতে পারে—ক্রশম-রাজ্য কোথায়? ক্রশম-রাজ্যকে কেহ কেহ বর্তমান ক্রশ-রাজ্যের আদিভূত বলিয়া মনে করেন। পুরুষবা ও উর্কশীর উক্তি-প্রত্নত্ব উপলক্ষে ঋগ্বেদে (১০ম মণ্ডলের ৯৫শ হুক্তে) যে আখ্যান দৃষ্ট হয়, টীকাকারগণ তদুক্ত পুরুষবা ও উর্কশীর নানারূপ অর্থ করিয়া থাকেন। সেখানেও রূপকের অবতারণা দেখিতে পাই। টীকাকর বলেন,—বৈদিক উপাখ্যান—‘পুরুষবা অমরা উর্কশীর সহিত কিছুকাল সহবাস করিয়াছেন। উর্কশী এক্ষণে পুরুষবাকে ছাড়িয়া যাইতেছেন।’ ইহার তাৎপর্য্য,—উর্কশীর আদি অর্থ—‘উবা’, পুরুষবার আদি অর্থ—‘স্বর্য্য’। স্বর্য্য উদয় হইলে উবা আর থাকে না। ‘উর্কশী’ শব্দে সায়ণাচার্য্য ‘মহত্তের বাক্য’ অর্থ উপলব্ধি করেন। ম্যাক্সমুলার একস্থলে উর্কশী শব্দকে ইউরোপের আদিরূপ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। * এদিকে আবার তিনি উর্কশীকে উবা এবং পুরুষবাকে স্বর্য্য বলিয়াও পরিচয় দিয়াছেন। † পুরুষবা—ইহার পুত্র বলিয়া পুরাণে উক্ত হইয়াছেন। ঋগ্বেদে দশম মণ্ডলের পঞ্চনবতিতম হুক্তের অষ্টাদশ ঋকেও ‘ইলা-পুত্র’ বলিয়া পুরুষবার পরিচয় পাই। সে ঋকের মর্ম্মার্থ,—“হে ইলা-পুত্র পুরুষবা! এই সকল দেবতা তোমাকে বলিতেছেন যে, তুমি যত্ন-জয়ী হইবে, বর্কীয় হোম-দ্রব্য দ্বারা দেবতা-দিগের পূজা করিবে, তুমি স্বর্গে ঝাইয়া আনন্দ-আজ্ঞাদ করিবে।” এই ইলা আবার অতীত অল্প অল্পেও প্রযুক্ত। প্রথম মণ্ডলের ত্রয়োদশ হুক্তের নবম ঋকে ‘ইলা (ইড়া)

* “The name which approaches nearest *Urvashi* in Greek might seem to be *Europe*.”—Max Müller, *Selected Essays*.

† “That *Purushas* is an appropriate name of a solar hero requires hardly any proof... this name (*Urvasi*) is derived from *Uru*...thus compare *Uru-asi* with another frequent epithet of the dawn *Uruki*.”—*Ibid*.

সরস্বতী ও মহী' অগ্নির দীপ্যমান মূর্তিএরূপে পরিচিত । ঋগ্বেদে ইলা—দেবী বলিয়াও অভিহিত । তৃতীয় মণ্ডলের প্রথম হুক্তে ইলা—‘পুন্নিবী’ অর্থে ব্যবহৃত । যাহা হউক, রূপকে যে অর্থ ই প্রতীত হউক, পুন্নিবীর জননী-রূপেও ঋগ্বেদে যে ইলার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা বলাই বাহুল্য । বিবস্বান-পুত্র মনুর ও নহষ-পুত্র যযাতির উল্লেখ—ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে (৬৩শ হুক্তের প্রথম ঋকে) এবং মনু-পুত্র শর্যাতির বিবরণ প্রথম মণ্ডলে (৫১শ হুক্তের ১২শ ঋকে ও ১১২শ হুক্তের ১৭শ ঋকে) দৃষ্ট হয় । শর্যাতি সম্বন্ধে ঋকের মর্ম,— “হে ইন্দ্র ! আপনি শর্যাত রাজর্ষির সংকৃত সোম পান করিয়া হর্ষযুক্ত হউন ।” সরস্বতীর টীকায় দেখিতে পাই,—“সারণাচার্য্যের মতামুসারে শর্যাত এক জন তুণ্ড-বংশীয় রাজর্ষি । ঋগ্বেদে (৩ম ৫১ হু ৭ ঋকে) দৃষ্ট হয় যে, ইন্দ্র শর্যাতের গৃহে সোম-পান করিতেছেন । ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মতে শর্যাত মনু-বংশীয় রাজা-বিশেষ । শর্যতি—বৈবস্বত মনুর চতুর্থ পুত্র । চ্যবন ঋষি তাঁহার কন্যার পাণি-গ্রহণ করেন এবং তদুপলক্ষে একটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয় । সেই যজ্ঞে ইন্দ্র এবং অশ্বিনীকুমারেরা উপস্থিত ছিলেন । অশ্বিদেবদিগের উদ্দেশে অভিপ্রেত হবির্ভাগ চ্যবন ঋষি নিজে রাখিয়াছিলেন ; ইহাতে ইন্দ্র অত্যন্ত ক্রূপিত হইলে, চ্যবন ঋষি পুনর্বার নূতন হবি প্রস্তুত করিয়া ইন্দ্রকে প্রীত করেন । কৌশিতকী ব্রাহ্মণ হইতে এই আখ্যান উদ্ধৃত হইয়াছে । পর ও ভাগবত পুরাণে ইহার সবিশেষ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় ।” পরবর্তী ঋকে দৃষ্ট হয়,—‘ইন্দ্র কক্ষীবানু মহারাজকে নব-যৌবনা ঈন্ড্রা-নারী প্রদান করিয়াছিলেন । ইন্দ্র আপনিই বৃষগণ রাজার যেনা-নারী ভাৰ্য্যা হইয়াছিলেন ।’ সরস্বতী এখানে টীকায় বলিয়াছেন,—“পৌরাণিক যেনা, পিতৃগণের মানসী কন্যা এবং হিমবতের পত্নী । শাটায়ন এবং তাণ্ড্য ব্রাহ্মণে যেনার ইতিহাস আছে ।” নহষের নাম, প্রথম মণ্ডলের একত্রিশ হুক্তেও দেখিতে পাই । ঐ হুক্তের একাদশ ঋকের মর্ম,—“হে অগ্নিদেব ! মদীর পূর্ব-পুরুষ অদ্রিয়ো নামক ঋষির পিতার পুত্র-রূপে যখন আপনি জন্মিয়াছিলেন, তখন দেবগণ মনুষ্য-রূপী আপনাকে (নহষকে) মনুষ্যের হিতার্থ মনুষ্যের রাজা করিয়াছিলেন এবং ইলা-নারী দেবীকে মনুষ্যদিগের উপদেশ-দাত্রী করিয়াছিলেন ।” সরস্বতীর টীকায় দৃষ্ট হয়,—“প্রথমে মনুষ্য-রূপে জাত অগ্নি নহষ-রাজার সেনাপতি-রূপে দেবগণ কর্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিলেন । ঐতিহ্যেরা বলেন,—ইলা মামবী এবং যজ্ঞের উপদেশ-দাত্রী ।” এই একত্রিশ হুক্তের প্রবর্তক—অগ্নির ঋষির পুত্র হিরণ্যপু ঋষি । এই ঋকে তাঁহাকে (নহষকে) অগ্নি-বংশজ বলিয়া উপলব্ধি হয় । অথচ, পুরাণে তিনি চন্দ্র-বংশজ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন ।

ঋগ্বেদে আরও বহুতর নৃপতির নাম দৃষ্ট হয় । পঞ্চম মণ্ডলের একবর্ত্তম হুক্তে রথবীতি, জাবাথ, পুরুষীহ, বিলদথ ওজুতির নাম দেখিতে পাই । “সারণাচার্য্য বলেন, একটি আশ্চর্য্য প্রাচীন ইতিবৃত্ত অবলম্বন করিয়া এই ত্রয়োত্রয় (পঞ্চম মণ্ডলের একবর্ত্তম হুক্তের) হ্রষ্ট হইয়াছে । তিনি বলেন,—আগম পারমর্শীরা এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন যে, দর্ভের পুত্র রাজা রথবীতি অগ্নি-বংশীয় অর্জুনাকে হোতৃ-কার্য্যে বরণ করিয়াছিলেন । অর্জুনান্না পিতৃ-সমীপে রাজপুত্রীকে দর্শন

ঋগ্বেদে
অত্যন্ত রাজগণ ।

করিয়া স্ব-পুত্র শ্রাব্যের সহিত তাহার বিবাহ দিবস নিমিত্ত রাজার নিকট প্রার্থনা করিলেন। রাজা তাহাতে সম্মত হইয়া নিজ মহিষীকে জিজ্ঞাসা করায় রাজ-মহিষী এই আপত্তি করিলেন যে, তাঁহাদিগের বংশের সকল কন্তারই ঋষিদিগের সহিত বিবাহ হইয়াছে। অথচ শ্রাব্য ঋষি নহেন, সুতরাং তাঁহার সহিত কিরূপে বিবাহ হইবে। এই আপত্তি উপস্থিত হওয়ার রাজা শ্রাব্যের সহিত নিজ কন্তার বিবাহ দিতে অসম্মত হইলে, শ্রাব্য, রাজকুমারী-প্রাপ্তির আশায় কঠোর তপস্বী আরম্ভ করিয়া তিকার্ষ পর্য্যটন করিতে করিতে রাজ্য তরন্তের মহিষী শশীরসী নিকট উপস্থিত হইলেন। শশীরসী শ্রাব্যাকে সঙ্গে লইয়া পতি সমীপে উপস্থিত হইলে, রাজা তাহাকে সমুচিত অতিথি-সংকার করিতে বলিলেন। অনন্তর শশীরসী তাঁহাকে গোবৃষ ও আভরণ প্রদান করিলে, তরন্ত তাঁহাকে অভিসমিত ধন প্রদান করিয়া নিজ অমুজ পুরুষীহের নিকট প্রেরণ করিলেন। শ্রাব্য গমন-কালে পতি-মধ্যে মরুংগণের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার সভয়-চিত্তে কুতান্ধলিপুটে তাঁহাদিগকে স্তব করিতে লাগিলেন। মরুংগণ তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ঋষি বলিয়া স্বীকার করিলেন ও তাঁহাদিগেরই প্রসাদে তিনি স্বস্ত্রষ্ট হইলেন। অনন্তর রথবীতি ও তাঁহার মহিষী শ্রাব্যের সহিত রাজ-কুমারীর বিবাহ দিলেন। পুরুষীহ, তরন্ত, শশীরসী, রথবীতি ও মরুংগণ তুষ্ট হইয়া শ্রাব্যকে যাহা প্রদান করিয়াছিলেন, এই স্বস্ত্রে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।” এই স্বস্তোক্ত রথবীতি গোমতী-তীরে বাস করিতেন এবং পর্কতের প্রান্ত-ভাগে তাঁহার গৃহ অবস্থিত ছিল। পঞ্চম মণ্ডলের চতুত্রিংশ স্বস্ত্রে অগ্নিবেশ এবং তৎপুত্র শত্রি (রাজবির) নাম দৃষ্ট হয়। ঐ মণ্ডলের ষট্‌ত্রিংশ স্বস্ত্রে শ্রবরথ রাজার এবং একচত্বারিংশ স্বস্ত্রে উজ্জ্বা রাজার নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ষষ্ঠ মণ্ডলের বিংশ স্বস্ত্রে (অষ্টম ঋকে) দেখিতে পাই,—“অভিসমিত সুখদাতা ইন্দ্র—বেতসু, দশোণি, তুভুজি, তুগ্র এবং ইতকে মাতার নিকট পুত্রের ন্যায় (রাজা) দোতনের নিকট সর্কদা প্রশান্ত-ভাবে গমন করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন।” ইহাতে বুঝা যায়,—বেতসু প্রভৃতি রাজকুলবর্গ দোতনের নিকট বশতা স্বীকার করেন। ঐ মণ্ডলের ষড়্বিংশ স্বস্ত্রে, বৃষত, তুজি এবং ক্রতুঞ্জীর রাজার নাম দৃষ্ট হয়। ক্রতুঞ্জীঃ—প্রতর্দনের পুত্র বলিয়া পরিচিত। কেহ কেহ চন্দ্রবংশের দিবোদাস-পুত্র প্রতর্দনের সহিত এই প্রতর্দনের সাদৃশ্য অমুতব করেন। এই ষষ্ঠ মণ্ডলের ত্রিষষ্টিতম স্বস্ত্রে শান্ত রাজার ও সূমীড়ের (৯ম ঋকে) নাম দৃষ্ট হয়। সপ্তম মণ্ডলের ত্রয়ত্রিংশ স্বস্ত্রে বরতের পুত্র পাশহ্যর রাজার যজ্ঞের আভাস পাওয়া যায়। ঐ স্বস্ত্রের দ্বিতীয় ঋকের চীকায় সায়াগাচার্য্য লিখিয়াছেন,—‘পাশহ্যর রাজা যখন যজ্ঞ করিতেছিলেন, সুদাস রাজাও সেই সময়ে যজ্ঞ প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বশিষ্ঠ-পুত্রগণ মন্ত্র-বলে তখন ইন্দ্রকে পাশহ্যর রাজার যজ্ঞস্থল হইতে সুদাস রাজার যজ্ঞস্থলে আনয়ন করিয়াছিলেন।’ অষ্টম মণ্ডলের দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্বস্ত্রে বিভিন্ন এক পাকহাযা রাজার দান-বাহায্য ও প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। এই পাকহাযা রাজার পিতার নাম—হুস্বান। কণ-গেত্রোৎপন্ন মেঘাতিথি ঋষি স্বস্ত্রবয়ে উভয় বৃষভির বাহায্য কীর্তন করিয়াছেন। উক্ত অষ্টম মণ্ডলের পঞ্চম এবং ষষ্ঠ ঋকে কণ (কনু) এবং তিরিশ্ব সুব্রতীর কীর্তি-কাহিনী বর্ণিত আছে। পঞ্চম স্বস্তোক্ত কণ রাজা

চেদি-বংশসম্বৃত বলিয়া পরিচিত এবং ষষ্ঠ হস্তোক্ত তিরিঙ্গ রাজা বহুবংশোদ্ভব পরম-পুত্র বলিয়া অভিহিত। চন্দ্রবংশের বংশ-লতার বহুবংশের এবং চেদি-বংশের যে পরিচয় আছে, তাহাতে কণ্ড, পরম বা তিরিঙ্গের নাম কোথাও দৃষ্ট হয় না। অষ্টম মণ্ডলের একবিংশ হস্তের সপ্তদশ ও অষ্টাদশ ঋকে চিত্র রাজার দান-মাহাত্ম্য পরিকীর্তিত। চিত্র রাজা সরস্বতী-তীরে যজ্ঞ করেন। কণ্ড-পুত্র সোতরি ঋষি তাঁহার স্তুতিবাদ করিয়াছিলেন। টীকাকার এইরূপ বলিয়া থাকেন। ঐ মণ্ডলের দ্বাবিংশ হস্তে ত্রসদস্যুর পুত্র তক্ষির নাম দৃষ্ট হয়, এবং বক্র রাজার পরিচয় পাওয়া যায়। চতুর্বিংশ এবং পঞ্চবিংশ হস্তে বক্র রাজার নাম দেখিতে পাই। তিনি তৈক্ষ-গোত্রের জাত এবং সুয়ামার পুত্র (৮ম, ২৫ স্ত, ২২ ঋক) বলিয়া পরিচিত। ষট্চত্বারিংশ হস্তে উচ্য ও বপু নামক রাজার উল্লেখ আছে। উক্ত অষ্টম মণ্ডলের অষ্টষষ্ঠিতম হস্তে ষোড়শ ঋকে অসিরা-গোত্রোৎপন্ন প্রিয়মেধ ঋষি বলিতেছেন,—“অতিথিধের পুত্রের নিকট হইতে সুরথবিশিষ্ট (অথ-সমূহ) গ্রহণ করিয়াছি। ঋক্ষের পুত্রের নিকট হইতে সুন্দর অতীশুবিশিষ্ট (অথ-সমূহ) গ্রহণ করিয়াছি। এবং অথমেধের পুত্রের নিকট হইতে সুরূপ (অথ-সমূহ) গ্রহণ করিয়াছি।” এই ঋকের পূর্ববর্তী ঋকে ইন্দ্রোত এবং পরবর্তী ঋকে শুক্কর্মা—অতিথিধের পুত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। টীকাকারগণ অনেক স্থলে অতিথিধ ও সুদাসকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু সেখানে সুদাসের এই দুই পুত্রের নাম তাঁহারা একবারও উল্লেখ করেন নাই। আবার ঋক্ষ রাজার পুত্রের নাম—ঋখেদের এই অষ্টম মণ্ডলের চতুঃসপ্ততিতম হস্তে দেখিতে পাই—শুতর্ক। সেখানে রাজা শুতর্কার দান-মাহাত্ম্য পরিকীর্তিত। কিন্তু পুরাণে চন্দ্রবংশে যে ঋক্ষ রাজার বংশ-পর্যায় দৃষ্ট হয়, সে ঋক্ষের পুত্রের নাম—সংবরণ। সেখানে শুতর্ক নাম কোথাও দৃষ্ট হয় না। নবম মণ্ডলে ধ্বজ নামক দুই ব্যক্তির এবং পুরুষক্তি নামক দুই ব্যক্তির উল্লেখ আছে। সায়ণ বলেন,—“তাঁহারা দুই জন রাজা ছিলেন। ঐ দুই রাজার প্রত্যেকে এককালে ত্রিশ সহস্র বস্ত্র দান করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধ।” ঋগ্বেদে এইরূপ আর্য্য ও অনার্য্য আরও বহু নৃপতির উল্লেখ আছে। বাহুল্য-ভয়ে তাঁহাদের পরিচয়-দানে বিরত রহিলাম।*

পুরাণের মধ্যে ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ, বায়ুপুরাণ, ককিপুরাণ, কন্দপুরাণ প্রভৃতিতেও অনেক নূতন নূতন রাজার নাম দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণে সুরথ রাজার পরিচয়ে দেখিতে পাই,—চিত্রা-নারী নারীর গর্ভে চন্দ্র-পুত্র বৃধ এক পুত্র উৎপাদন বিবিধ। করেন। সেই পুত্র চৈত্র নামে অভিহিত। ঐ চৈত্র সপ্তদ্বীপাধিপতি এবং পৃথিবী-শাসক হইয়াছিলেন। সেই চৈত্রের তনয়—অধিরথ। অধিরথের পুত্র—মহাজানী সম্রাট সুরথ। এই সুরথ রাজা এবং সমাধি নামক বৈশ্ব, মেঘস মুনির আশ্রমে তদীয় উপদেশে ভগবতী দুর্গার উপাসনা করিয়া সকলকাম হইয়াছিলেন।

* ঋগ্বেদে নৃপতিগণের পরিচয়-প্রসঙ্গে যে সকল অসুবাদ ও টীকার বর্ষ আমরা পূর্ববর্তী করে পৃষ্ঠায় প্রকাশ করিয়াছি, তাহার কতকগুলি মন্তব্যের অমুর্য্যাদি করেন হইতে এবং কতকগুলি পণ্ডিত রবানাব সরস্বতীর অসুবাদিত করেন হইতে গ্রহণ করিয়াছি।

সম্রাটের পিতামহ দ্বিরাধ—কলিঙ্গের রাজা ছিলেন। তিনি বৈশ্য। তাঁহার পুত্র—মিহ্ম-
তন্ত্র ক্রমিণ। ক্রমিণ পুত্র-তীর্থে দুইর তপস্যা করিয়া বৈষ্ণব-চূড়ামণি সমাধিকে
লাভ করিয়াছিলেন। সম্রাট প্রত্যহ কোটি সূবর্ণ দান করিয়া জলগ্রহণ করিতেন। অত্যধিক
দান-জন্ত, তাঁহার স্ত্রী-পুত্র অত্যন্ত বিরক্ত হন। তখন, অতি-দুঃখিত স্ত্রী-পুত্র কর্তৃক
পরিত্যক্ত হইয়া, তিনি সুরথ রাজার সঙ্গী হইয়াছিলেন। সুরথ রাজা, রাজা নন্দী
কর্তৃক রাজ্যে ব্রষ্ট হন। নন্দী রাজা—স্বয়ম্ভুব মহুর বংশজাত ঋষের পৌত্র এবং উৎকলের
পুত্র। রাজা নন্দী শত অক্ষৌহিণী সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সুরথের রাজধানী কোলা-নগরী
আক্রমণ করিয়াছিলেন। এক বৎসর যৌর যুদ্ধ চলিয়াছিল। নন্দী রাজা পরম বিফল
ছিলেন। সুরথকে তিনি পরাজিত করিলে, সুরথ রজনী-যোগে যৌর বনে গমন করেন।
সেখানে, পুষ্পভদ্রা নদী-তীরে সম্রাট বৈষ্ণোর সহিত তাঁহার মিত্রতা হয়। অতঃপর উভয়ে
পুত্র-তীর্থে যেষদ যুনির আশ্রমে গমন করিয়া ঋষির শরণাপন্ন হন। ভগবতী দুর্গার রূপায়
সুরথ রাজার নষ্ট-রাজ্য পুনরুদ্ধার হইয়াছিল। মার্কণ্ডেয় পুরাণে ও দেবী-মহাত্ম্য-প্রসঙ্গে
এই বিবরণ সামান্য রূপান্তরে পরিবর্ণিত আছে। তবে মনস্তর সম্বন্ধে বড়ই মতান্তর দেখিতে
পাই। মার্কণ্ডেয় পুরাণ দৃষ্টে, সুরথ-সম্রাটের উপাসনা—সাবর্ণি মনস্তরের ঘটনা বলিয়াই মনে
হয়। কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণের বর্ণনায়, উহা কোন্ মনস্তরের ঘটনা, তাহা কিছুই
বুঝিতে পারা যায় না। ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণের অতীত আবার দেখিতে পাই,—স্বর্ঘ্য-
বংশে স্বর্ঘ্যের জ্যৈষ্ঠ-ভ্রাতৃ, সূচক্ষ নামে এক রাজা ছিলেন। দেবীর প্রসাদে দুঃখ
কবচ লাভ করিয়া তিনি সপ্তদ্বীপাধিপতি হইয়াছিলেন। সেই সূচক্ষের পুত্রের নাম—
পুত্রাক্ষ। তাঁহার পিতা-পুত্র উভয়েই পরশুরামের সহিত যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। ব্রহ্ম-
বৈবর্ত-পুরাণে সূযজ নামক আর এক নৃপতির পরিচয় পাওয়া যায়। সূযজ রাজা
সপ্তদ্বীপেশ্বর বলিয়া অভিহিত হন। ঋব-পুত্র উৎকল, পুত্র-তীর্থে রাজহর্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান
করিয়া যেরূপ যশোভাজন হইয়াছিলেন, সূযজ রাজাও ব্রহ্ম কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া
সেইরূপ যশস্বর যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। প্রতিদিন যজ্ঞশেষে রাজা সূযজ দান-ধ্যানের
পরাকর্ষ্য প্রদর্শন করিতেন। যজ্ঞের শেষ দিন তিনি ছত্রিশ কোটি ব্রাহ্মণকে স্নাত্ত্বপক্ষে
তোজন করাইয়াছিলেন, এবং তোজনান্তে সকলকেই রাশি রাশি সূবর্ণ দক্ষিণা দান করিয়া-
ছিলেন। রাজা সূযজ সে দিন এতই দান করেন যে, সে দান-ভার ব্রাহ্মণগণ বহন করিতে
সমর্থ না হইয়া, কতকংশ শূদ্রগণকে প্রদান করিয়া, কতকংশ রাজপথে ছড়াইয়া দিয়া,
অবশিষ্ট গৃহে লইয়া গিয়াছিলেন। যাহা হউক, যজ্ঞ-শেষে, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি
পরিবেষ্টিত হইয়া, রাজা সূযজ যখন রত্নসিংহাসনে উপবিষ্ট, সেই সময় ব্রহ্ম-মলিন-
বেশে এক ব্রাহ্মণ আসিয়া রাজাকে আশীর্বাদ করিলেন। সিংহাসন হইতে গাত্রোথান
করিয়া ব্রাহ্মণকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করা রাজার কর্তব্য ছিল; কিন্তু রাজা মোহবশে
তাহা করিত হইলেন। লজাসঙ্গগণও ব্রাহ্মণের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিলেন
না। ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া রাজাকে অভিসম্পাত দিলেন,—“রে নিকোণ! রাজ্যভ্রষ্ট হও—
কুর্ঘ্যাপ্রভ হও।” সভ্য সম্রাট সাকলকেও ব্রাহ্মণ ঐরূপ অভিসম্পাত-প্রদানে

উক্ত হইলে, সকলেই বিনয়-প্রকাশে কমা-ভিলা চাহিলেন। সুতরাং তাঁহারা আর অভিযুক্ত হইলেন না। তখন, রাজা সুযজ্ঞ 'কুল-গুরু' বশিষ্ঠের উপদেশে, ব্রাহ্মণের চরণ-তলে আশ্র-সমর্পণ করিলেন। পরিশেষে ব্রাহ্মণের অনুগ্রহে আশ্র-জ্ঞান লাভ করিয়া রাজা সুযজ্ঞ মুক্তির পথে অগ্রসর হন। ককিপুরাণে শশিধ্বজ রাজার যুদ্ধ-কাহিনী বর্ণিত আছে। ককিদেব, দ্বিধিক্রমে বহির্গত হইয়া, ধন, কাঞ্চাজ প্রভৃতি অনাৰ্য্য জাতিকে এবং বহু দৈত্য-দানব-অসুরকে সংহার করিয়া, ভল্লাট-নগরে উপনীত হন। ভল্লাট-রাজ শশিধ্বজ বিকৃতকৃত ছিলেন। শশিধ্বজ রাজার পুত্রদ্বয় স্বর্ধ্যাকেতু এবং তাঁহার কনিষ্ঠ বৃহৎকেতু—ককির সহিত ঘোর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। ধর্ম্মবলে বলীয়ান শশিধ্বজ সেই যুদ্ধে ককিকে পরাজিত করিয়াছিলেন। শশিধ্বজ ককিকে বন্দী করিয়া আপন গৃহে লইয়া যান। সেই সময় তিনি ককিকে ভগবানের অবতার বলিয়া বুঝিতে পারেন। ককির হস্তে শশিধ্বজ আপন কন্তাকে সমর্পণ করেন। ইহার পর ককি কর্তৃক কাঞ্চনপুরী-নগরীতে মহামতি রাজার অভিষেক হয়। মহাপ্রভ স্বর্ধ্যাকেতুকে তিনি মথুরা-রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। ককিদেব আর আর যে যে নরপতিকে যে যে দেশে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণও ককিপুরাণে দেখিতে পাই। তিনি যথাক্রমে হরি, কবি, প্রাজ্ঞ, এবং সুমন্ত্রকে—শৌভ, পৌণ্ড, পুলিন্দ, সুরাষ্ট্র ও মগধ দেশ প্রদান করিয়াছিলেন; আপন জাতিদিগকে কৌকট, মধ্য কর্ণাট, অরু, ওড়, অঙ্গ, বঙ্গ প্রভৃতি দেশ দান করেন; কৃতবর্ষ প্রভৃতি পুত্রগণকে দ্বারকার অন্তর্গত চোল, বর্কর ও কর্ক-দেশ দান করিয়াছিলেন; বিশাখযুপকে কক্ক দেশে ও কলাপ দেশে প্রতিষ্ঠিত করেন। ককি স্বয়ং সম্বল-নগরে অবস্থিত করিয়া রমা ও পদ্মা মহিষীদ্বয়ের সহিত যুগ-বিবর্তনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। পদ্মার সহিত তাঁহার বিবাহ-ব্যাপদেশে আমরা এক বৃহদ্রথ রাজার নাম দেখিতে পাই। তিনি নাগর-বেষ্টিত সিংহল-দেশের অধিপতি ছিলেন। বৃহদ্রথের কন্তার নাম—পদ্মা। পদ্মার স্বয়ংবর-সভায় রুচিরাধ, সুকন্দা, মদিরাক, দ্বাণ্ডগ, কৃষ্ণসার, পারদ, জীমূত, জুরমর্দন, কাশ, কুশাযু, বসুমান, কক, ক্রথন, স্বজয় ও অক্ষয়—এই সকল ভূপালগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। লক্ষ্মী-স্বরূপিণী পদ্মা, ককিরূপী বিষ্ণুর কর্ণ-দেশে মালা-প্রদানের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। পদ্মার শিবারাধনার প্রভাবে এক অলৌকিক ব্যাপার সংঘটিত হয়;—সভাস্থ নৃপতিগণ স্ত্রী প্রাপ্ত হন। পরিশেষে, ককিরূপী ভগবানের সহিত পদ্মার পরিণয়-কার্য্য সম্পন্ন হয়। ত্রীমস্তাগবতে, পুরজ্ঞন রাজার এক অলৌকিক কাহিনী পরিবর্ণিত আছে। প্রাচীনবর্হির নিকট নারদ সেই পুরজ্ঞন রাজার কাহিনী কীর্ণন করিয়াছিলেন। পুরজ্ঞন রাজার পুরী 'হয়' নামক যবনাধিপতি কর্তৃক আক্রান্ত হয়। প্রমদাকে চিন্তা করিতে করিতে রাজার দেহত্যাগ হইয়াছিল। সেই জন্য তিনি স্ত্রী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। স্ত্রী প্রাপ্ত হইলে, বিল্ড-রাজ-গৃহে তাঁহার জন্ম হয়। পাণ্ড্য-দেশীয় অরিন্দম রাজা বলরামজ, যুদ্ধস্থলে সমবেত ককিরূপকে পরাজিত করিয়া, তাঁহার কন্য-গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভূপতির সপ্ত পুত্র ও এক কন্তা জন্মগ্রহণ করে। সেই পুত্রগণ ত্রিবিড়-দেশের অধিপতি হইয়াছিলেন। বিল্ড-রাজ-গৃহে জন্মগ্রহণের পর

ভগবত্ত্বজ্ঞি-প্রভাবে, পুরজন মুক্তি-লাভ করেন। * অমুগদান করিতে গেলে, ভারতের পুরাতত্ত্বে আরও অসংখ্য নুপতির পরিচয় পাওয়া যায়। বাঁহারা বংশ-লতার কয়েকটা মাত্র নাম দেখিয়া, ভারতের আৰ্য্য-সভ্যতার আধুনিকত্ব প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পান, তাঁহারা যদি বংশ-লতাভিরিক্ত নুপতিগণের ইতিহাসের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সকল ভ্রম বিদূরিত হইতে পারে। বিভিন্ন পুরাণেতিহাসের বিভিন্ন নুপতিগণের আলোচনা করিতে গিয়া, মনে হয় না কি—ভারতীয় সভ্যতা অনাদি-কাল হইতে আপন প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে? কত বংশের কত নুপতির নাম—কাল-সাগরে ভাসিয়া গিয়াছে; বংশ-লতার কোথায় তাঁহাদের স্থান, এখন তাহা নির্ণয় করাই দুঃসাধ্য।

একোন্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ ।

রাজা ও প্রজা ।

[কবেদে রাজত্বজ্ঞি,—রাজার অভিব্যেক-উপলক্ষে কবির উক্তি ;—রাজার প্রতি প্রজার কর্তব্য,—রাজা—নররূপী দেবতা,—যদি শাস্ত্রের মত,—রাজ-রক্ষাই প্রজার শ্রেষ্ঠ কর্তব্য,—রাজার কর্তব্যহারে প্রজার উদ্ভেজনা অকর্তব্য,—রাজার প্রতি প্রজার পিতৃ-মাতৃবৎ জ্ঞান ;—প্রজার প্রতি রাজার কর্তব্য,—পুত্রবৎ প্রজা-পালন,—দৈবদানি কার্যে প্রজার অংশ-প্রাপ্তির চেষ্টা,—পুরাণাদি শাস্ত্রের গৃহ-ভব ।]

রাজত্ববর্ণের ইতিবৃত্তের সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতি-তত্ত্ব ওতঃপ্রোত বিজড়িত। রাজা কিরূপ-ভাবে প্রজাপালন করিতেন, প্রজা কিরূপ-ভাবে রাজাকে মানিয়া চলিতেন,—

ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্বে তাহার প্রস্ফুট চিত্র-পরিদৃষ্টমান। আমরা
যেদে রাজ-তত্ত্ব । প্রসঙ্গতঃ পূর্বেও সে আভাস প্রদান করিয়াছি। এখন আবার উপ-

সংহারে স্থল স্থল ভাবে তদ্বিষয় আলোচনা করিতেছি। রাজার প্রতি প্রজার কর্তব্য এবং প্রজার প্রতি রাজার কর্তব্য প্রভৃতি বিষয়ে হিন্দু-শাস্ত্র-সমূহে যে উচ্চ আদর্শ দেখিতে পাই, বুঝি গৃহীকীর অন্ত কোনও দেশের অন্ত কোনও সাহিত্যে তাহা বিরল। কবেদের বহুতর সূক্তে রাজা দেবতার জায় পূজিত হইয়াছেন। সেই সকল সূক্ত আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, রাজাও প্রজা-পালনে কি মহামুত্তমতাই প্রকাশ করিতেছেন। যেমন প্রজার অমুরাগ—তেননই রাজার দেহ। রাজার অভিব্যেক-উপলক্ষে কবেদের দশম মন্তলের ত্রিশতত্বত্বিক শততম সূক্তে কবি বলিতেছেন,—“হে রাজন !

* জীবদ্ভাবত, চতুর্থ ভক্ত, পঞ্চবিংশ হইতে ত্রিশ অখার-সমূহে পুরজন-কাহিনী বর্ণিত আছে ।

তোমাকে রাজ-পদে অধিরোপিত করিলাম। তুমি এই জনপদের মধ্যে প্রভু হও ; অটল, অবিচলিত, স্থির হইয়া থাক। তাবৎ প্রজাগণ তোমাকে বাহা করুব। তোমার রাজত্ব বেন নষ্ট না হয়। ১ ॥ তুমি এই স্থানেই পর্বতের স্তায় অবিচলিত থাক, রাজ্যচ্যুত হইও না। ইজের স্তায় নিশ্চল হইয়া এই স্থানে রাজ্যকে ধারণ কর। ২।...বরুণ দেব তোমার রাজ্যকে অবিচলিত করুন, দেব বৃহস্পতি অবিচলিত করুন, ইন্দ্র ও অগ্নি অবিচলিতরূপে ধারণ করুন। ৫ ॥” রাজার স্থায়িত্ব-কামনায় একুপ উদার উচ্চ আকাশ।—কোনও দেশের কোনও জাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় কি? হিন্দুর আরাধ্য বেদ;—সেই বৈদিক-স্বত্রে রাজার স্থায়িত্ব-কামনায় এই উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত। রাজগণের কর্তব্য-সাধন, প্রজাপালনের এবং দান-ধর্মের বিষয় কত স্থানে কত প্রকারেই উল্লিখিত আছে! * সংহিতা-শাস্ত্রে ও পুরাণ-সমূহে রাজার রাজধর্ম-পালনের এবং প্রজার প্রজাধর্ম-সংরক্ষণের ভূয়োভূয়ঃ পরিচয় পাওয়া যায়। যে শাস্ত্রই আলোড়ন করি না কেন, সর্বত্রই প্রজার প্রতি রাজার স্নেহ-প্রদর্শনের এবং রাজার প্রতি প্রজার ভক্তি-প্রদর্শনের উপদেশ আছে। হিন্দু-শাস্ত্রের কোথাও রাজদ্রোহিতার প্রশ্রয় নাই, রাজ-জিহ্বাসার উৎসাহ দেখিতে পাওয়া যায় না; পরন্তু রাজ-জিহ্বাসা বা রাজদ্রোহিতার বিষয় পরিণামের বিষয়ই শাস্ত্রে পুনঃপুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। অধিক বলিব কি, রাজা যদি অত্যাচারী বা উচ্ছৃঙ্খল হন, তাহা হইলেও প্রজা কদাচ উচ্ছৃঙ্খল বা রাজদ্রোহী হইবে না; পরন্তু ভগবানে নির্ভর করিয়া রাজার মঙ্গল-প্রার্থনা করিবে।

রাজার প্রতি প্রজার কর্তব্য সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্র কি উদার মহান আদর্শই হিন্দু-নরনারীর চক্ষের সমক্ষে ধারণ করিয়া আছেন! মবাদি সংহিতা-শাস্ত্রে, রামায়ণে, মহাভারতে এবং পুরাণাদি গ্রন্থে—এ আদর্শ কোথায় নাই? মহু বলিয়াছেন,—‘বালক প্রজার কর্তব্য। হইলেও রাজা সাম্যাত্ত মহু্য নহেন। সাম্যাত্ত মহু্য-জ্ঞানে তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ একান্ত অকর্তব্য। তিনি মহানু দেবতা; নররূপে অবস্থান করিতেছেন মাত্র।’ মহাভারতের শান্তিপর্বে—সেই একই উক্তি দৃষ্ট হয়। সেখানে যুধিষ্ঠিরকে ভীষ্ম বলিতেছেন,—‘তুপতিকে মহু্য জ্ঞান করিয়া কখনই অবমাননা করা উচিত নহে; কারণ, এই মহতী দেবতা নররূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবস্থান করেন।’ গরুড়-পুরাণে, নীতিসার-বণ্ডে, উক্ত আছে,—‘চূড়ামণি, ইন্দ্রমহু, আকাশ, সমুদ্র, অগ্নি ও রাজা, ইহাদিগের মস্তকে স্থিতিই স্বভাব। কদাচ ব্রহ্ম-বশেও পাদদ্বারা স্পর্শ (অবমাননা) করিবে না।’

‘বালোহিণি দাবনকবো। নহু্য ইতি ভূবিণঃ। মহতী দেবতা হোবা নররূপেণ ভিষ্টতি।’

—বহুগাহিতা, সপ্তম অধ্যায়, ৮ন শ্লোক।

‘ন হি আবনকবো। নহু্য ইতি ভূবিণঃ। মহতী দেবতা হোবা নররূপেণ ভিষ্টতি।’

—মহাভারত, শান্তিপর্ব, অষ্টাষ্টম অধ্যায়, ৪০ন শ্লোক।

‘চূড়ামণিঃ সমুদ্রোহরিব’ ওলাবতমহন। অথবা পৃথিবীপালো নৃর্ধি, পাদঃ প্রযাভতঃ।’

—গরুড়পুরাণ, পূর্বখণ্ড, দশাধিক শততম অধ্যায়, ১১ন শ্লোক।

বহু অজ্ঞত আবার কহিয়াছেন,—‘রাজা প্রসন্ন থাকিলে মহতী ঐ লাভ হয়, তাঁহার ক্রোধে বহু বর্জিত থাকে। তাঁহার পরাক্রম-প্রভাবে বিজয়-লাভ অবশ্যসাধ্য। তিনি সর্ব-

* পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে ‘কংকোক্ত ভূপতিধর্মের’ পরিচয়-প্রদর্শনে সে আভাস অদ্যায়সেই পাওয়া যাইবে।

ভেজোবর।' মহাভারতের শান্তিপর্বেও এই একই উপদেশ—প্রায়ই একই ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন,—‘হে যুধিষ্ঠির! এইরূপে পৃথিবীতে যে মনুষ্যগণ মন্দন-কামনা করিবেন, তাঁহারা প্রজাবর্গের অমুগ্রহের নিমিত্ত রাজাকে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিবেন। শিষ্ণুগণ যেরূপ গুরুর নিকট প্রণত থাকেন এবং দেবগণ যেরূপ দেবত্বের নিকট নত হইয়া থাকেন, তদ্রূপ রাজার নিকট প্রজাগণ প্রণত হইয়া থাকিবেন।’

“বস্ত্র প্রসাদে পদ্মা জীবিকরন্ত পরাক্রমে। বৃত্তান্ত বসতি ক্রোধে সর্বভেজোবরো হি সঃ ॥”

—মহাসংহিতা, সপ্তম অধ্যায়, ১১শ শ্লোক।

“এবং যে ভূতিবিজ্ঞেয়ঃ পৃথিব্যাং মানবঃ কচিং। কুর্ধ্য রাজানমেবাগ্রে প্রজামুগ্রহকারণং।

নবস্ত্রংসন্ত তং ভক্ত্যা শিখ্যা ইব গুরুং সদা। দেবা ইব চ দেবেভ্যঃ তত্র রাজানমন্তিকে ॥”

—মহাভারত, শান্তিপর্ক, সপ্তদশিতম অধ্যায়, ৩৩শ—৩৪শ শ্লোক।

প্রজা মনে-প্রাণে ভ্রমেও কখনও রাজার অনিষ্ট-চিন্তা করিবে না;—শত্রু পুনঃপুনঃ সেই উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। মনু বলিয়াছেন,—‘যে ব্যক্তি মোহ বশতঃ রাজার প্রতি ঘেব করিয়া থাকে, সে ব্যক্তি নিশ্চয় বিনাশ-প্রাপ্ত হয়।’ মহাভারতের শান্তিপর্কে ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ-হলে বলিতেছেন,—‘যে পুরুষ মনোমধ্যেও রাজার অনিষ্টাশঙ্কা উৎপাদন করিবে, সে নিশ্চয়ই ইহলোকে ক্লেশ ভোগ করিয়া পরিশেষে নরকে পতিত হইবে।’

“তং যন্ত যেষ্ঠি সন্মোহাৎ স বিনশ্ততাসংশয়ঃ। তস্য হ্রাত্ত বিনাশায় রাজা প্রকুরুতে মনঃ ॥”

—মহাসংহিতা, সপ্তম অধ্যায়, ১২শ শ্লোক।

“বস্ত্রস্য পুরুষঃ পাণ্ডা বনসাপ্যমুচিতয়েৎ। অসংশয়মিহ ক্লিষ্টঃ শ্রেষ্ঠ্যপি নরকং ব্রজেৎ ॥”

—মহাভারত, শান্তিপর্ক, অষ্টদশিতম অধ্যায়, ৫৯শ শ্লোক।

রাজার অহিত-চিন্তা তো নহে-ই; পরন্তু, রাজাকে শ্রেষ্ঠ-জ্ঞান করিয়া তাঁহার রক্ষা-পক্ষে যত্ন করা সর্বতোভাবে প্রের্য। কৃণ্ড-নন্দন গুরু রাম-চরিত কখন-কালে তাই কহিয়াছিলেন,—‘প্রজাগণ ভূপতিকেই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ-জ্ঞান করিয়া, তাঁহাকে রক্ষা করিবে; তৎপরে ভার্য্যা এবং তদনন্তর ধন-রক্ষায় যত্নবান হইবে; কারণ, নুপতি না থাকিলে, তাহাদের ভার্য্যাই বা কোথায় এবং ধনই বা কোথায় থাকিবে?’ অন্ততঃ, আবার দৃষ্ট হয়,—‘প্রজাগণের আশ্রয়-মঙ্গলের নিমিত্তই রাজাকে রক্ষা করা কর্তব্য, ধন অথবা দারাদির নিমিত্ত নহে।’

“রাজানং প্রথমং বিশেষততো ভাষ্যাত্ততো ধনম্। রাজন্তসতি লোকন্ত ভূতো ভাৰ্য্যা কৃত্তো ধনম্ ॥”

—মহাভারত, শান্তিপর্ক, সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায়, ৪১শ শ্লোক।

“তস্মাদ্রাজৈব কর্তব্যঃ সততং ভূতিবিজ্ঞতা। ন ধনার্থে ন দারার্ধভেবাং যেষামরাজকম্ ॥”

—মহাভারত, শান্তিপর্ক, সপ্তদশিতম অধ্যায়, ১২শ শ্লোক।

রাজ্যিকর সামরিকও এই উক্তি ভাষান্তরে একটি। রাবণ-কর্তৃক অষ্টমধ বিষয়ে আদিষ্ট হইয়া, মারীচ সেখানে নির্ভীক হৃদয়ে বলিতেছেন,—“রাজারাই প্রজাবর্গের ধর্ম ও যশোলাভের মূল; সুতরাং সকল অবস্থাতেই তাঁহাদিগকে রক্ষা করা প্রজাবর্গের একান্ত কর্তব্য।”

“রাজমূলো হি ধর্মাক বশন্ত পরতাং বর। তস্মাৎ সর্বাশবদ্যাবু মুরকিতব্য মরাধিপাঃ ॥”

—সামরিক, আরাধ্যকাত্ত, একদ্বাদশিৎম সর্গ, ২০শ শ্লোক।

রাজা যদি কর্তব্য-পালনে বিমূঢ় হন, প্রজার তাহাতে কুপিত হওয়া কর্তব্য নহে। তখন

মনে করিতে হয়,—‘মাতা যদি বাল্যকালে প্রতিপালন না করেন, পিতা যদি সাধু-পথ প্রদর্শন না করেন, রাজা যদি ধন-সম্পত্তি অপহরণ করিয়া লন, বিলাপ করিয়া কোনই ফল নাই। মিত্র, আত্মীয় জন ও নৃপতি সুসেবিত হইয়াও যদি ক্রোধ-পরায়ণ হন, গৃহ যদি অগ্নি বা বজ্র দ্বারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, অসুশোচনা করিয়া কি ফল আছে?’ যথা,—

“মাতা ন পালয়েৎ বালো পিতা সাধু ন শিক্ষয়েৎ। রাজা যদি হরেৎবিভং কা তত্র পরিবেদন।”

সুসেবিতাঃ প্রহুপাতি মিত্র স্বজন পার্শ্ববাঃ। গৃহমগ্নান্ননিহতঃ কা তত্র পরিবেদন।”

—শুক্লনীতি, তৃতীয় অধ্যায়, ৪১শ—৪৮শ শ্লোক।

ইহার অধিক প্রজার প্রতি আত্ম-সংযমের উপদেশ আর কি হইতে পারে? যে দেশের শাস্ত্রে রাজার প্রতি প্রজার কর্তব্য বিষয়ে এইরূপ সারগর্ভ উপদেশ নিহিত রহিয়াছে, সে দেশে—সে রাজ্যে কখনও রাজদ্রোহ বা রাষ্ট্র-বিপ্লব সম্ভবপর কি? ভারতবর্ষের পুরাত্তরে সহস্র সহস্র বৎসরের ইতিহাসের মধ্যেও তাই আমরা রাষ্ট্র-বিপ্লবের বা প্রজা-বিদ্রোহের ছায়া-মাত্র দেখিতে পাই না।*

যেমন প্রজার কর্তব্য-বিষয়ে শাস্ত্রে উপদেশ আছে; তেমনিই রাজার কর্তব্য-সম্বন্ধেও শাস্ত্র উপদেশ দিয়াছেন। রাজা কিরূপভাবে প্রজা-পালন করিবেন, রাজা কিরূপভাবে ধর্ম্মাশ্রয়শাসন মানিয়া চলিবেন, রাজা কিরূপভাবে জ্ঞান-নীতির অনুবর্তী রাজার কর্তব্য। হইবেন,—সকল শাস্ত্রেই তাহার উল্লেখ আছে। তবে, তিনি যদি কখনও মোহবশে ধর্ম্মভ্রষ্ট ও অত্যাচার-পরায়ণ হন, ধর্ম্মই তাহার বিচার করিবেন; পরন্তু প্রজা কখনও রাজার অত্যাচার-অবিচারের প্রতিকার-কল্পে বদ্ধ-পরিকর হইবে না। ইহাই হিন্দু-শাস্ত্রের উপদেশ। মনু বলেন,—“স্বাচ্ছন্দ্যায় পরো লোকে বর্ত্তেত পিতৃবন্ধু।” ‘অর্থাৎ, অধীনস্থ সমস্ত প্রজাবর্গের প্রতি রাজা পিতৃবৎ ব্যবহার করিবেন।’ মনু ‘পিতৃবৎ’ ব্যবহার করিতে বলিলেন। মহাভারতের শান্তিপর্বে ‘মাতৃবৎ’ ব্যবহারের উপদেশ আছে। ‘প্রকৃতি-পুঞ্জের সহিত গর্ভধারিণীর জ্ঞান রাজার ব্যবহার করা কর্তব্য’—সেখানে উল্লিখিত হইয়াছে। সেখানে ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন,—‘প্রকৃতি-পুঞ্জের সহিত গর্ভধারিণীর জ্ঞান ব্যবহার করা রাজার কর্তব্য। মহারাজ! যে কারণে এতাদৃশ উপমা-সংলগ্ন হইতেছে, তাহা শ্রবণ কর। যেরূপ গর্ভধারিণী স্বীয় মনোমত ইষ্ট পরিত্যাগ করিয়া, বাহাতে গর্ভস্থ সন্তানের মঙ্গল হয়, তাহার চেষ্টা করেন; তদ্রূপ বাহাতে প্রকৃতি-পুঞ্জের মঙ্গল হয়, এতাদৃশ কার্য্য করাই রাজার কর্তব্য। হে কুরুপুত্র! যে যে কার্য্য করিলে প্রজামণ্ডলীর মঙ্গল হয়, তুমি স্বীয় মনোগত অভিলাষ পরিত্যাগ করিয়াও সর্বদা তাদৃশ ধর্ম্মানুবর্তী হইবে।’ অগ্নি-পুরাণেও এই একই উক্তি দৃষ্ট হয়; ‘গর্ভিণী সহধর্ম্মিণী যেমন নিজের সুখ ত্যাগ করিয়া গর্ভেরই সুখ আবহন করে, রাজারও তদ্বৎ হওয়া আবশ্যক।’

“ভবিতব্যং নমঃ রাজা গর্ভিণী সহধর্ম্মিণী। কারণং চ মহারাজ নু যেনেদমিচ্ছাসে।

যথা হি গর্ভিণী হিরাং স্বঃ স্মিরাং মনসোহনুগত্ব। গর্ভস্য হিতমাবশ্যে তথা রাজাপ্যনুগত্ব।

* বেণ-রাজার হত্যার পর সাধারণ-ভক্ত শাসন-প্রণালী প্রতিষ্ঠার চেষ্টার দেশের কি দুরবস্থা হইয়াছিল, পুরাণ-পাঠক যাজ্ঞেই তাহা অবগত আছেন।

বর্তিতব্যঃ কুরুক্ষেত্রং নদাঃ বর্ষাশ্রুতবর্তিনাঃ । অঃ প্রিয়ং তু পরিভ্রাজ্য যৎকল্যায়কং তৎকরং ॥”

—মহাভারত, শান্তিপর্ক, বটুগুপ্তাধ্যায়, ৪৪শ-৪৫শ স্লোক ।

“নিত্যং রাজা বধাতাব্যং গতিণী সহধর্মিণী । যথা অঃ যৎকল্যায়কং তৎকরং ॥”

—অগ্নিপু্রাণ, অরোবিংশত্যাধিক ষিণততম অধ্যায়, ৮ম স্লোক ।

রাজার দৈনন্দিন কার্যে প্রজাগণ যাহাতে সন্তোষ প্রকাশ করে, তাহার প্রতি কার্যে বাহাতে প্রশংসা-বাদ কীর্তিত হয়,—রাজা নিয়ত তৎপক্ষে যত্ববান থাকিবেন । এই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া যে রাজা রাজকার্য্য নির্বাহ করিতে পারেন, সেই নৃপতিই শ্রেয়ঃ-লাভে সমর্থ হইয়া থাকেন । ভীষ্মদেব উপদেশচ্ছলে যুধিষ্ঠিরকে তাই বলিতেছেন,—
‘আমার ছিন্ন কি, ক্লেশন কি হইতেছে, অবিনিপাতিত কি আছে, কোথা হইতে আমাকে দোষ আশ্রয় করিতেছে,—এই সকল বিষয় রাজা নিয়ত চিন্তা করিবেন । গত দিবসে যে কার্য্য করিয়াছি, প্রজাগণ পুনর্বার তাহার প্রশংসা করিতেছে কিনা, আমার এই কার্য্য প্রজারা যদি জানিয়া থাকে, তবে তাহা পুনরায় প্রশংসা করিতেছে কিনা ; জনপদ এবং রাষ্ট্র মধ্যে আমার যশঃ প্রজাদিগের অভিলষিত হইয়াছে কি না ;—এই সকল বিষয় অহুসন্ধান করিবার জন্য অহুমত গুপ্তচরকে নিয়ত পৃথিবীতে প্রেরণ করিবে।’

“কিং ছিন্নং কো হু সন্দো মে কিং বাস্ত্যাবিনিপাতিতম্ । কুতো মায়াশ্রয়োদোষ ইতি নিত্যং বিচিন্তয়েৎ ॥

অতীত-দিবসে বৃত্তং প্রশংসন্তি ন বা পুনঃ । গুপ্তৈশ্চাক্ষরৈর্মুখৈঃ পৃথিবী মনুসারয়েৎ ॥

জান্যুর্বাদি মে বৃত্তং প্রশংসন্তি ন বা পুনঃ । কচ্ছিত্রোচ্চেন্নগদে কচ্ছিত্রাষ্ট্রে চ মে যশঃ ॥

বর্ষজানাং ধৃতিমতাং সংশ্রাবেষপলারিনাম্ । রাষ্ট্রে তু যেহমুজীবন্তি যে তু রাজোহমুজীবিনঃ ॥”

—মহাভারত, শান্তিপর্ক, একোনববর্তিতম অধ্যায়, ১৪শ-১৫শ স্লোক ।

অল্প কথায় রাজার কর্তব্য ইহাতে কি সুন্দর পরিষ্কৃত ! বোধ হয়, এই একটা বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিলেই রাজ-কার্য্য সুসম্পাদিত হইতে পারে । বিফলসংহিতায় দৃষ্ট হয়,—“রাজা প্রজার হুঃখে হুঃখী হন, তিনি ইহকালে যশোলাভ করিয়া পরকালে স্বর্গলাভ করেন।’

“প্রজাশ্রমে হুখী রাজা তদুঃখে যন্ত হুঃখিত । স কীর্ত্তিযুক্তো লোকেহশ্বিনু প্রেত্য বর্গে নহীয়েত ॥”

—বিফলসংহিতা, তৃতীয় অধ্যায়, ৭০ম স্লোক ।

রাজার অপকর্মেয় জন্য রাজা আপনি ফলভাগী হন । প্রজার সে জন্য চেষ্টা করার আর আবশ্যক হয় না ! শত্রু কোথাও কোনও অবস্থায় রাজার বিরুদ্ধে প্রজাকে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা পান নাই । শত্রু বলিয়াছেন,—রাজা পিতা, প্রজা পুত্র ; শত্রু বলিয়াছেন,—রাজা গর্ভধারিণী মাতৃবরুণিণী, প্রজা গর্ভস্থ শিশু-স্থানীয় ; শত্রু বলিয়াছেন, রাজার প্রতি প্রজাকে নির্ভর-পরায়ণ হইতে হইবে, কদাচ রাজার বিরুদ্ধাচরণ কর্তব্য নহে । ইহাই শত্রুর স্থূল ভষ ।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ ।

দেবতা ও ব্রাহ্মণ ।

[পরব্রহ্ম, দেবতা, অবতার, ব্রাহ্মণ প্রভৃতির সম্বন্ধ-তত্ত্ব ;—দেবতা অসংখ্য, —দেবতা জগদীশ্বরের অংশ-বিশেষ, —ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, অগ্নি, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দেবতার নাম-রূপের অনন্তর ;—অবতার-তত্ত্ব, —অবতার—জগদীশ্বরের বিবৃতি-বিশেষ, —ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রে অবতারের পরিচয়-প্রসঙ্গ, —অবতার অসংখ্য ;—ব্রাহ্মণ-প্রসঙ্গ, —বেদে ব্রাহ্মণের মহিমা-কীর্তন, —ব্রাহ্মণের উৎপত্তি-তত্ত্ব, —পুরাণে ব্রাহ্মণের বাহ্যিক কথ্য, —ব্রাহ্মণোৎপত্তি ও জাতিভেদ বিষয়ে মতান্তর ;—ঋষি-প্রসঙ্গ, —ঋষি ও ব্রাহ্মণাদির সম্বন্ধ-তত্ত্ব ।]

দেবতা ও ব্রাহ্মণ ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্বে প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছেন । ভারত-বর্ষের ইতিহাস আলোচনা করিতে হইলে, দেবতা ও ব্রাহ্মণের প্রসঙ্গ আপনা-আপনিই আসিয়া পড়ে । দেবগণ, ঋষিগণ, ব্রাহ্মণগণ, অবতারগণ, —ইহারা কি যেন সম্বন্ধ-তত্ত্ব । এক অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত হইয়া আছেন । পরম-পুরুষ পরব্রহ্ম — সেই অবিভীত ঈশ্বর, যখন বিভিন্ন-রূপে বিকাশমান, তখনই তিনি ‘দেবতা’ নামে অভিহিত । পরব্রহ্মের সে রূপ—অসংখ্য ; সুতরাং দেবতাও অসংখ্য । দেবতা স্বর্গের ;—মর্ত্যের মানুষ সচরাচর তাঁহাদের সাক্ষাৎকার-লাভে সমর্থ নহে । সাধুদিগের পরিভ্রমণের নিমিত্ত এবং দুঃস্থ জনের বিনাশের জন্য সেই পরম-পুরুষ যখন নাম-রূপে সংসারে অবতীর্ণ হন, তখনই তিনি ‘অবতার’ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন । মহুগ্নের মধ্যে যাহারা আবার পরব্রহ্মের স্বরূপ-তত্ত্ব বিশেষ ভাবে অবগত, তাঁহারা ই ব্রাহ্মণ । যিনি সামসারিক-সুখ পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞান-মার্গে গমন করিয়াছেন, তিনিই ঋষি । ব্রাহ্মণ সংসারাত্মকে বসতি করিয়াও নির্লিপ্ত ভাবের পরাকর্ষ্য প্রদর্শন করেন ; ঋষিগণ সংসারাত্মক পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম-চিন্তায় নিবিষ্ট থাকেন । স্থূলতঃ, দেবতা, ব্রাহ্মণ, ঋষি, অবতার প্রভৃতির ইহাই তাৎপর্য । তাঁহারা এমনই ভাবে ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্বের সহিত মিশিয়া আছেন যে, তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিলে, ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিবৃত্ত অসম্পূর্ণ রহিয়া যায় ।

মূল—ব্রহ্ম । ঈশ্বর, জগদীশ্বর, পরমেশ্বর, পরব্রহ্ম, পরম-পুরুষ প্রভৃতি—তাঁহার নামের অন্ত নাই । তাঁহা হইতেই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে ; তাঁহাতেই জগৎ অবস্থিত আছে ; আবার, তাঁহাতেই জগৎ লয়প্রাপ্ত হইতেছে । তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর দেবতা । নামে সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার-কার্যের বিধান করেন ; তিনি অসংখ্য দেব-দেবী-রূপে অসংখ্য কার্যে ব্রতী আছেন । তিনি আন্তঃ-মধ্য-পরিশূত । তাঁহার পরিচয় ভাষায় ব্যক্ত হয় না । তিনি ধারণার অতীত, জ্ঞানের অতীত, কল্পনার অতীত । জগৎ তাঁহার অভিব্যক্তি-স্বরূপ । তিনি সর্বভূতে ওতঃপ্রোত বিরাজমান । অনন্ত দেব-দেবী ও প্রাণি-পৰ্য্যায়ে তাঁহার অনন্ত বিকৃতির বিকাশ । এই জন্তই তিনি এক ; এই জন্তই তিনি বহু । বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ ও পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে তাঁহাকে সেই ভাবেই বুঝান হইয়াছে । তিনি এক হইয়াও যে বহু,—সর্ব-শাস্ত্রেই তাঁহার মীমাংসা আছে । কলতঃ, কি ব্রহ্মা, কি বিষ্ণু, কি রুদ্র,—কি বায়ু, কি বরুণ, কি ইন্দ্র,—

কি অগ্নি, কি পৃথিবী, কি সূর্য্য,—কি সোম, কি মিত্র, কি বরুণ,—সকলই তিনি, সকলই তাঁহার বিকাশ মাত্র। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় অনুসারে, তিনি কখনও তেজিশ, কখনও তেজিশ শত ; তিনি কখনও তেজিশ সহস্র, কখনও তেজিশ লক্ষ ; তিনি কখনও তেজিশ কোটী, কখনও বা অসংখ্য অনন্ত। যে যেরূপ দৃষ্টিতে তাঁহাকে দর্শন করে, অধিকারি-ভেদে, সে সেইরূপ নাম-রূপে তাঁহার পরিচয় পায়। বেদ হইতে পুরাণ পর্য্যন্ত শাস্ত্র-সমূহে, তাই কখনও তাঁহাকে এক, কখনও তাঁহাকে তেজিশ এবং কখনও তাঁহাকে অনন্ত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ঋগ্বেদেরই বিভিন্ন স্থানে তাই তাঁহার বিভিন্ন-রূপ সংখ্যার পরিচয় পাই। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের চতুস্ত্রিংশ এবং পঞ্চচত্বারিংশ হুক্তে, তৃতীয় মণ্ডলের ষষ্ঠ ও নবম হুক্তে, অষ্টম মণ্ডলের অষ্টাবিংশ, ত্রিংশ, পঞ্চত্রিংশ, উনচত্বারিংশ ও সপ্তপঞ্চাশ হুক্তে, নবম মণ্ডলের নবম হুক্তে এবং দশম মণ্ডলের দ্বি-পঞ্চাশ হুক্তে, দেবগণের সংখ্যার উল্লেখ আছে। কিন্তু তাহাতেও সংখ্যা-সম্বন্ধে ছুই মত দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে কোনও কোনও হুক্তে দেখিতে পাই,—দেবতার সংখ্যা তেজিশ জন ; আবার কোনও কোনও হুক্তে দেখিতে পাই,—তাঁহাদের সংখ্যা—তিন সহস্র তিন শত উনচল্লিশ জন। এদিকে আবার বৈদিক হুক্ত-সমূহ যে সকল দেবতার উদ্দেশে উক্ত হইয়াছে, তাহার সহিত পূর্ব্বোক্ত সংখ্যাদ্বয়ের মিল দৃষ্ট হয় না। আমরা প্রথমে ঋগ্বেদের একটা ঋক, তাহার বঙ্গানুবাদ এবং তৎসংক্রান্ত টীকা উদ্ধৃত করিতেছি। প্রথম মণ্ডলের চতুস্ত্রিংশ হুক্তের একাদশ ঋক,—

‘আ নাসত্যা ত্রিভিরেকাদশরিহ দেবের্ভিষ্ঠাভঃ মধুপেয়মধিনা ।

প্রামুস্তারিষ্টং নীরপাসি মুকভং সেবভং দেবো ভবতঃ সগাভুবা ॥’

“হে অগ্নিনীকুমারদয় ! আপনারা ত্রয়স্ত্রিংশং সংখ্যক দেবগণের সহিত মধুর সোমপান করিতে, এই যজ্ঞস্থানে আগমন করুন, আমাদিগের আয়ু বৃদ্ধি করুন, আমাদিগের পাপ শোধন করুন, এবং ঘেষকারক রিগুগণের নিবারণ করুন ও আমাদিগের সহিত সহায়-রূপে স্থিতি করুন।” এইরূপ বঙ্গানুবাদের পর, টীকাকার বলেন,—“এহলে ত্রিগুণিত একাদশ অর্থাৎ ত্রয়স্ত্রিংশং সংখ্যক দেবগণের উল্লেখ রহিয়াছে। সায়ণাচার্য্য বলেন, দ্ব্যলোকের একাদশ, অন্তরীক্ষ-লোকের একাদশ এবং ভূলোকের একাদশ, এই সমস্ত লইয়া ত্রয়স্ত্রিংশং। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে পঞ্চচত্বারিংশ হুক্তের দ্বিতীয় ঋকে এবং তৃতীয় মণ্ডলে ষষ্ঠ হুক্তের নবম ঋকে—‘হে অগ্নে ! তেজিশ সংখ্যক দেবগণকে তৎপত্নীদিগের সহিত আনয়ন কর’ দেখিতে পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয় সাহিত্যের (১।৪।১০।১) মতে,—‘যে দেবাসঃ দিবি একাদশস্ব পৃথিব্যামধি একাদশস্ব। অপ্-সুক্কিতো যে একাদশস্ব তে দেবাসঃ।’ অর্থাৎ, সূর্য্যে একাদশ, পৃথিবীতে একাদশ এবং অন্তরীক্ষে একাদশ। শতপথ ব্রাহ্মণে (৪।৫।১।২) অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, ষোঁ এবং ছুঁ এই ত্রয়স্ত্রিংশং দেবতা। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (২।১৮) মতে—‘সোমপা’ নামক এক শ্রেণীর দেবতাগণের সংখ্যা তেজিশ ; এবং দ্বিতীয় শ্রেণী—একাদশ প্রবাল (বা প্রাজী), একাদশ অনুবাল এবং একাদশ উপবাল এই তিনে তেজিশ। প্রথম শ্রেণীর দেবগণ সোমরস দ্বারা প্ৰীত হইবেন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর দেবতাগণ দ্বতাহতি দ্বারা পরিতুষ্ট হইবেন।... বিষ্ণুপুরাণ মতে—একাদশ

রুদ্র, দাদশ আদিত্য, আট বসু, এক প্রজাপতি এবং এক বটকার এই তেত্রিশ ।” * এদিকে আবার, তৃতীয় মণ্ডলের নবম স্তকের নবম ঋকে এবং দশম মণ্ডলের দ্বিগুণ স্তকের ষষ্ঠ ঋকে ৩৩০৯ জন দেবতার উল্লেখ আছে । সায়ণাচার্য বলেন—“দেবতা কেবল তেত্রিশ জন, ৩৩০৯ সংখ্যা তাঁহাদের মহিমা মাত্র ।” অত্যাশ্চর্য্য টীকাকারগণও বলেন,—“বেদে তেত্রিশ দেবতার উল্লেখ আছে । পৌরাণিক-কালে এই তেত্রিশ হইতে তেত্রিশ কোটি দেবতা কল্পিত হইয়াছে । আর্য্যাবর্ত্তে যত লোক বাস করিত, পৌরাণিক সময়ে প্রত্যেকেরই এক ভিন্ন উপাস্ত দেবতা ছিল । সুতরাং তেত্রিশ কোটি দেবতার আবশ্যক হইয়াছিল । বেদার্থব্রত বলেন,—“আর্য্যাবর্ত্তাভীল সাংপ্রত প্রজ্ঞেচী সংখ্যা অজ্ঞমাসে বাবীস কোটি আত্মা ।” কল্পনা-শক্তির অহুসারে তেত্রিশ কোটি দেবতার সৃষ্টি ।” বিভিন্ন-রূপ চিন্তায় ফলে, দেব-তত্ত্ব বিভিন্ন-রূপে পরিবর্তিত হইয়াছে ; অধিকারী অহুসারে, এক এক ভাবে এক এক দেবতা মানস-পটে প্রতিভাত হইয়াছেন । কিন্তু মূল তথ্য অহুসন্ধান করিতে গেলে কি দেখিতে পাই ? দেখিতে পাই,—ব্রহ্ম এক ; এক হইয়াও তিনি অনন্ত ; তাঁহার নাম-রূপের অবধি নাই । এই বিধে কোথায় তাঁহার স্তিতি নাই ? “সৰ্ব্বং ধ্বংসং ব্রহ্ম”—যদি এই শাস্ত্র-বচন মানিতে হয়, জল-স্থল-মরুচ্চ্যাম সৰ্ব্বত্র তিনি ওতপ্রোত বিস্তারমান নহেন কি ? তাই সংসার আপন জ্ঞান-বুদ্ধি অহুসারে তাঁহার এক এক অবস্থা কল্পনা করিয়া লয় । সে হিসাবে, তিনি এক, তিনি তিন, তিনি তেত্রিশ, তিনি তেত্রিশ কোটি, তিনি অনন্ত ; তাঁহাতে সকল সংখ্যা—সকল নাম-রূপই সম্ভবপর । বেদ হইতে পুরাণাদি শাস্ত্র-সমূহে তাই আমরা দেখিতে পাই,—তিনি কখনও অগ্নিদেবতা-রূপে পূজিত হইতেছেন ; তিনি কখনও বায়ুদেবতা-রূপে পূজিত হইতেছেন ; তিনি কখনও ইন্দ্র-দেবতারূপে পূজিত হইতেছেন । তাই দেখিতে পাই,—দেব-মহুচ্চ-পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ-স্বাবর-জলম-জড়-অজড় সৰ্ব্ব-রূপেই তাঁহার আরাধনা-পদ্ধতি আবহমান-কাল প্রচলিত আছে । তিনি অগ্নি, তিনি অদ্বিতি, তিনি অশিষ্য, তিনি আদিত্য, তিনি ইন্দ্র, তিনি উষা, তিনি গো, তিনি জল, তিনি দাব্যা-পৃথিবী, তিনি ছা, তিনি মাধব, তিনি নভঃ, তিনি নক্ষত্র, তিনি পৰ্য্যাক্ষ, তিনি পৰ্কত, তিনি পিতৃগণ, তিনি প্রজাপতি, তিনি বনস্পতি, তিনি বরুণ, তিনি বর্হি, তিনি বাগ্বেদী, তিনি বায়ু, তিনি বিশ্বকর্মা, তিনি বিশ্ব, তিনি বৃহস্পতি, তিনি ভারতী, তিনি মরুদগণ, তিনি মুহী, তিনি যম, তিনি রুদ্র, তিনি শুক্র, তিনি সরস্বতী, তিনি সবিতা, তিনি সীতা, তিনি সিদ্ধ, তিনি স্বর্ঘা, তিনি বাহা, তিনি স্বস্তি, তিনি সোম, তিনি ক্ষেত্রপতি, তিনি কালী, তিনি চূর্ণী, তিনি ব্রহ্মা,—তাঁহার নাম-রূপের সংখ্যা আছে কি ? সেই অসংখ্য দেব-দেবীর পরিচয় বেদ হইতে পুরাণ

* একাদশ রুদ্র,—অঙ্গ, একপাদ, অহিরুদ্র, শিগালী, অপরাজিত, জ্যাক, বহেধর, বুধাকপি, শত্রু, বর ও ঈশ্বর—এই একাদশবিধ গণদেবতা-বিশেষক । অস্ত্র বড়ে—অস্ত্রকপাদ, অহিরুদ্র, বিরগাক, সরস্বত, বহুরূপ, জ্যাক, অপরাজিত, বৈবস্বত, সান্বিতী ও হয় । বতান্তরে এ সকল নামেরও আবার বিভিন্নতা ঘটে হয় । দাদশ আদিত্য,—বিবস্বান্, অর্য্যমা, পূষা, যম, সবিতা, তপ, বাতা, বিধাতা, বরুণ, মিত্র, শক্র অতিভোজা বা উরুক্রম । এ বিষয়েও বানা বতান্তর । কবেদে আদিত্য-সংখ্যা নয়, তেতিয়ারি আট, শতগুণে দাদশ ইত্যাদি । এই বসু,—ভব (ধরা), ঋষ, সোম, বিশ্ব, অশ্বিন, জন, প্রভৃৎ (অতুষ), এতব ।

পর্যন্ত সকল শাস্ত্রে কোনও-না-কোনও হজে পরিবর্ণিত আছে। যাঁহারা কোনও দেব-দেবীকে অধুনা-কল্পিত এবং কোনও দেব-দেবীকে পুরাকল্পিত বলিয়া মনে করেন, শাস্ত্র-সমূহ আলোচনা করিলে, তাঁহাদিগকে ভ্রান্ত-মতাবলম্বী ভিন্ন অন্য কিছুই বলিতে পারা যায় না। সকল দেব-দেবী—সকলেই অনাদি অনন্ত কাল হইতে বিরাজমান আছেন, অনায়াসেই তাহা প্রতিপন্ন হইতে পারে। *

যেমন দেবতা অসংখ্য, তেমনি অবতার অসংখ্য। প্রধানতঃ দশ অবতারের বিধর সাধারণ্যে প্রচারিত হইলেও, অবতারের সংখ্যা হয় না। ভগবান গীতায় বলিয়াছেন,—

অবতার-
তত্ত্ব।

“পরিত্রাণায় সাধুনাম্ বিনাশায় চ দুষ্কৃতান্। ধর্মসংস্থাপনায় চ সন্তবামি
যুগে যুগে ॥” অর্থাৎ, যখনই সাধুদিগের পরিত্রাণের আবশ্যক হইয়াছে,

যখনই দুর্জনের বিনাশ-সাধন প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে, যখনই ধর্ম-সংস্থাপনের আবশ্যক উপলব্ধি করিয়াছেন, ভগবান তখনই অবতার-রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাই যুগে যুগে তাঁহার অসংখ্য অবতারের পরিচয় পাওয়া যায়। ভগবানের যে দশ অবতারের প্রসঙ্গ বাহুল্য-ভাবে প্রচারিত, সেই দশ অবতারের নাম,—মৎস্য, কুর্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, ক্রীরাম, ক্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কন্ধি। এই দশ অবতার বেখানে মাত্র হইয়াছেন, সেখানে দেখিতে পাই,—সত্যযুগে মৎস্য, কুর্ম বরাহ, নরসিংহ ; ত্রেতাযুগে—বামন, পরশুরাম, ক্রীরাম চন্দ্র ; দ্বাপর যুগে—ক্রীকৃষ্ণ (মতান্তরে বলরাম) ; কলির প্রারম্ভে বুদ্ধ এবং কলির শেষ ভাগে কন্ধি অবতার আবির্ভূত হন।† এতদ্ভিন্ন কোনও পুরাণে অবতার-সংখ্যা—চতুর্বিংশ ; কোনও পুরাণে দ্বাবিংশ ; কোনও পুরাণে অষ্টাদশ। আবার সকল পুরাণের—সকল শাস্ত্রের সামঞ্জস্য সাধন করিতে গেলে, অবতারের সংখ্যা করা যায় না। গরুড়পুরাণে দেখিতে পাই,—‘একমাত্র নারায়ণ—দেবতাদিগের ঈশ্বরের। তিনি পরমাত্মা পরব্রহ্ম। তাঁহা হইতেই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। সেই বাসুদেব অজর এবং অমর। জগদ্রক্ষার্থ তিনি কুমারাদি নানারূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। তাঁহার প্রথম অবতারের নাম—কুমার অবতার। এই অবতारे তিনি দুশ্চরিত্র ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় অবতার—বরাহ। রসাতলগতা পৃথিবীকে উদ্ধার করিবার জন্য, তিনি বরাহ-বপু পরিগ্রহ করেন। দেবর্ষি—তাঁহার তৃতীয় অবতার। এই অবতারে তিনি সাহস-তপস্বি বিজ্ঞান করিয়া নিষ্কাম-কর্মের শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। চতুর্থ—নরনারায়ণ অবতার। এই অবতারে তিনি ধর্মরক্ষার্থ কঠোর তপস্যা করেন। তাহাতে পুরাস্থরণ তাঁহাকে অর্চনা করিয়াছিলেন। পঞ্চম—কপিল-অবতার। এই অবতারে তপস্বী সাংখ্য-তত্ত্ব উপদেশ দেন। ষষ্ঠ—দত্তাত্রেয়-অবতার। অত্রি ঋষির ঔরসে অননুগ্রহ পূর্বে নারায়ণ দত্তাত্রেয়-রূপে জন্মগ্রহণ করেন ; এই অবতারে তিনি অগুরুকে আত্মিকী

* এই বিষয় পরবর্তী খণ্ডে পুথানুপুথ আলোচনার চেষ্টা হইয়াছে।

† বরাহ-পুরাণ, চতুর্থ অধ্যায়, দ্বিতীয় শ্লোকে এই দশ অবতারের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। দেবী-পুরাণেও দশ অবতারের সম্বন্ধ। অগ্নিদেবের এবং শঙ্করাচার্য্যের ভোক্ত্রে দশ অবতারের মহিমাই পরিকীর্ণিত দেখিতে পাই।

বিদ্যার উপদেশ দিয়াছিলেন। সপ্তম—যজ্ঞ নামক অবতার। অমৃতের গর্ভে কুচির ঔরসে স্বায়ম্ভুব মনস্তরে তাঁহার জন্ম হয়। এই অবতারে ভগবান সত্যগণের ও সুরগণের যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাহাতে স্বায়ম্ভুব মনস্তর রক্ষা হইয়াছিল। অষ্টম অবতার—উরুক্রম। নান্দির ঔরসে মেরুদেবীর গর্ভে ভগবান উরুক্রম নামে জন্মগ্রহণ করেন। সদাচার প্রণালী প্রদর্শন করাই, এই অবতার গ্রহণের উদ্দেশ্য ছিল। নবমে—পৃথু অবতার। এই অবতারে ভগবান মহৌষধি-রূপ ছন্ধ দ্বারা প্রজাবর্গকে জীবিত করিয়াছিলেন। দশম—মৎস্য অবতার। এই অবতারে, চাক্ষুষ মনস্তরে মহাপ্রলয় কালে, বৈবস্বত মনুকে মুখ্যরী নৌকায় আরোপিত করিয়া ভগবান তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। একাদশে—ভগবান কুর্শ অবতারে অবতীর্ণ হন। দেব ও দানবগণ যখন একত্র মিলিত হইয়া সমুদ্র-মন্থন করেন, কুর্শরূপী ভগবান তখন মন্দরাচল ধারণ করিয়া ছিলেন। দ্বাদশে—ধনন্তরি অবতার। ত্রয়োদশে—মোহিনী অবতার। ধনন্তরি অবতারে তিনি দেবতাদিগকে অমৃত-দানে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন এবং মোহিনী অবতারে মোহিনীরূপ-ধারণে তিনি অশ্বর-দিগকে মোহিত করিয়াছিলেন। চতুর্দশে—নরসিংহ অবতার। এই অবতারে তিনি নখদ্বারা দৈত্যেন্দ্র হিরণ্যকশিপু রক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়াছিলেন। পঞ্চদশ—বামন-অবতার। ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা-ছলে ত্রিলোক গ্রহণ করিয়া ত্রীহরি এই অবতারে বলিকে দমন করেন এবং দেবতাদিগকে স্ব স্ব অধিকারে পুনঃস্থাপন করেন। ষোড়শে—পরশুরাম। নৃপতিগণ ব্রহ্মদ্রোহী হইয়াছিলেন দেখিয়া, কুপিত হইয়া, তিনি এই অবতারে একবিংশতি-বার পৃথিবীকে নিন্মত্রিয়া করিয়াছিলেন। সপ্তদশে—ব্যাস অবতার। সত্যবতীর গর্ভে পরাশরের ঔরসে ব্যাস-রূপে অবতীর্ণ হইয়া এই অবতারে অন্নমেধা মনুজগণের মুক্তির জন্ত তিনি বেদ-তত্ত্ব শাখা-রূপ পুরাণাদি শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। অষ্টাদশ—নরদেক অবতার। এই অবতারে দেবতাদিগের কার্ষ্য-নির্বাহার্থ তিনি সমুদ্র নিগ্ৰহাদি কার্য করিয়াছিলেন। ঊনবিংশতি ও বিংশতি অবতারে—রাম ও কৃষ্ণ নামে ভগবান বৃক্ষবংশে জন্মগ্রহণ করেন। পৃথিবীর ভার-হরণ সেই দুই অবতারের উদ্দেশ্য ছিল। একবিংশতি—বুদ্ধ অবতার। কলিযুগের সন্ধ্যা প্রবৃত্ত হইলে, দেবদেবীদিগের মোহনার্থ কীকট-দেশে জিন-সুত বুদ্ধ নামে আবির্ভূত হন। দ্বাবিংশতি—কঙ্কি অবতার। কলিযুগে, সন্ধ্যার আগমন-কালে, রাজবর্গ নষ্টপ্রায় হইলে, জগৎপতি কঙ্কি-নামে বিজুয়শা নামক ব্রাহ্মণের ভবনে অবতীর্ণ হন। * বাঙ্কলাদি দৈত্য বধের জন্ত ভগবান আরও যে কত অবতারে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, গুরুপুত্রগণেরই অল্প তাহার পরিচয় আছে। † সেই পুরাণের ভাষ্যেই প্রকাশ,—“অবতারাসংখ্যোহা হরেঃ সত্ত্বনির্ধেয়জ্ঞাঃ।” ঐশ্বর্যগবতে ভগবানের যে লীলাবতার-তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, তাহাতে দেখিতে পাই,—“সেই জন্ম-রহিত আদি-পুরুষ কল্পে কল্পে আপনিই আপনার দ্বারা আপনাকে আপনাতে স্বজন ও পালন করিতে-ছেন। তিনি বিত্ত্ব, সত্য ও জ্ঞান-স্বরূপ; সকলের অন্তর্ধানী, সন্দেহ-রহিত ও নিগুণ;

* গুরুপুত্রগণ, পূর্ববৃত্ত, প্রথম অধ্যায়, দ্বাদশ হইতে ত্রয়োবিংশ লোক উল্লেখ।

† এই গ্রন্থের বড়বিংশ পরিচ্ছেদে, ৩৬০ পৃষ্ঠায়, উক্ত অবতারের নাম লিখিত আছে।

তজ্জন্ত তাঁহাতে গুণকোষ-জনিত কোনও চাপল্য নাই। তিনি সত্য, পরিপূর্ণ, জন্ম-নাশ-রহিত, নিগুণ এবং নিত্য অদৈত। মুনিদিগের দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন নির্মল হইলেই তাঁহার তাঁহাকে ঐ-রূপে জানিতে পারেন। কিন্তু কৃত্তক দ্বারা আচ্ছাদিত হইলেই তাঁহার ঐ রূপ তিরোহিত হয়। যে পুরুষ প্রকৃতির প্রবর্তক, তিনিই ভগবানের প্রথম অবতার। তত্ত্বি অদৃষ্ট, স্বভাব, কার্য ও কারণ-রূপা প্রকৃতি, মন-মহাভূত, অহঙ্কার-ভব, গুণত্রয়, ইন্দ্রিয় সকলের সমষ্ট-ভূত বিরাট শরীর, বৈরাজ-পুরুষ, স্থাবর, জঙ্গম, আমি, ক্রত, বিহু, প্রজাপতিগণ, অত্যাশ্র দেববিগণ, স্বলোকপাল, স্ব-লোকপাল, মহুগ্ন-লোকপাল, পাতালাদিপাল, গন্ধর্ব্বপতি, বিদ্যাধরপতি, চারণপতি, যক্ষপতি, উরগপতি, নাগপতি, ঋষিশ্রেষ্ঠ, পিতৃশ্রেষ্ঠ, দৈত্যোজ, সিন্ধুধর, দানবোজ, প্রেতপতি, পিশাচপতি, ভূতনাথ, কুয়াশাধিপতি, যাদোনাত, মুগরাজ, পক্ষিরাজ, এবং লোকে যে কিছু ঐশ্বর্যশালী, তেজঃশালী, ইন্দ্রিয়-শক্তি-সম্পন্ন, মনঃ-শক্তি-সম্পন্ন, বলবান্, ক্ষমাবান্, শোভাশালী, সম্পত্তি-সম্পন্ন, লজ্জাশালী, বুদ্ধিমান্, অদ্ভুত বর্ণশালী, রূপ-সম্পন্ন ও বিরূপাকৃতি—সে সকলই সেই পরতত্ত্ব অর্থাৎ পরম-পুরুষ ভগবানের বিভূতি বা অবতার।” * ভাগবত এইরূপে একবিধ অবতারের পরিচয় প্রদান করিয়া, পরিশেষে ভগবানের অষ্টবিধ অবতার—লীলাবতার—প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছেন। ভাগবতের মতে লীলাবতার অসংখ্য। প্রথম—বরাহ। দ্বিতীয়—সুযজ্ঞ; ত্রিলোকের মহতী পীড়া নষ্ট করিয়া স্বায়ত্ত্ববমু কর্তৃক তিনি হরি-নামে অভিহিত হন। তৃতীয়—দত্ত; অত্রি মুনি পুত্ররূপে ভগবানকে পাইবার প্রার্থনা করায়, “আমি আমাকেই দান করিলাম” বলিয়া, ভগবান তাঁহার গৃহে আবিভূত হইয়াছিলেন; তজ্জন্তই ‘দত্তাত্রেয়’ নাম। যত্ন ও হৈহয় প্রভৃতি তৎকর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া মুক্তিলাভ করেন। চতুর্থ—সনৎকুমার; পঞ্চম—সনক; ষষ্ঠ—সনন্দ; সপ্তম—সনাতন। লোক সৃষ্টির অভিপ্রায়ে ব্রহ্মা পূর্ব্বে ‘সন’ অর্থাৎ অখণ্ডিত তপস্তা করিয়াছিলেন। ভগবান তাহাতে সনৎকুমারাদি চারি ‘সন’-রূপে উৎপন্ন হন। পূর্ব্ব-কল্পের প্রলয়-কালে যে আশ্র-তত্ত্ব নষ্ট হইয়াছিল, ‘সন’-রূপে ভগবান তাহারই উপদেশ দিয়াছিলেন। অষ্টম—নরনারায়ণ। দক্ষ-হুহিতা ও ধর্ম্ম-ভার্যা মূর্ত্তির গর্ভে ঐ রূপে জীহরি অবতীর্ণ হন। এই অবতারে কাম-ক্রোধ-মৃত্ত-ভাবের বিকাশ পাইয়াছিল। নবম—ঐব অবতার। তাঁহার তপস্তা-প্রভাবে ঐবলোকের সৃষ্টি হয়। দশম—পৃথু। উচ্ছৃঙ্খল বেণ-রাজা ব্রহ্ম-শাপ-রূপ বক্ষে দক্ষীভূত হইলে, ঋষিদিগের প্রার্থনায়, নারায়ণ বেণের পুত্র-রূপে অবতীর্ণ হন। সেই অবতারে পিতার উদ্ধার-সাধন করিয়া, তিনি পুত্র-নামের সার্বকতা সম্পাদন করিয়াছিলেন। একাদশ—ঋষভ। অগ্নি-পুত্র নাভির ভার্যা সুদেবীর গর্ভে ঋষভ-রূপে অবতীর্ণ হইয়া, শান্তোজিয় বিষয়াশক্তি-হীনতা-প্রভাবে তিনি পারমহংস্ত-পদ লাভ করিয়াছিলেন। দ্বাদশ—হয়গ্রীব। এই অবতারে ভগবান অধ-মন্তক ধারণ করিয়া, ব্রহ্মার বক্ষে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এবং তদ্বারা নিখিল বেদ প্রকাশ পাইয়াছিল। ত্রয়োদশ—মৎস্ত অবতার; বৈবস্বত মন্বন্তরের অবসান-কালে, প্রলয় উপস্থিত হইলে, বেদবাণী ভ্রষ্ট হয় দেখিয়া, মৎস্ত-রূপী ভগবান সেই বেদবাণী লইয়া মলিল-গর্ভে

অবস্থান করিয়াছিলেন। চতুর্দশ—কুর্ক-অবতার ; মন্দর পর্বত ধারণ করিয়া, ভগবান সমুদ্র-মন্ডনে দেবগণের সহায়তা করিয়াছিলেন। পঞ্চদশ—নৃসিংহ অবতার ; এই অবতारे নখ-দ্বারা হিরণ্যকশিপুকে ভগবান নিমেষ-মধ্যে বধ করিয়াছিলেন। ষোড়শ—বামন-অবতारे, ভগবান, দৈত্যরাজ বলিকে পাতালে প্রেরণ করেন। সপ্তদশ—ধনুস্তরি-অবতারে, ভগবান, ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের রোগ-নাশ করিয়াছিলেন ; এই অবতারেই ভগবান আয়ুর্কেদ অনুশাসন করিয়া যান। অষ্টাদশ—পরশুরাম-অবতার। উনবিংশ অবতার—শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতি ভ্রাতৃ-চতুষ্টয়। বিংশ—শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম অবতার। এই অবতারে ভগবান বহু দৈত্য-দানবের সংহার-সাধন করিয়া, পৃথিবীর ভার লাঘব করেন। একবিংশ—বুদ্ধ অবতারে অমরদিগের বুদ্ধির ভ্রম-সাধন ও লোভ-উৎপাদন জন্ত পাণ্ড-বেশে তাহাদিগকে নানা উপদেষ্টার উপদেশ দিয়াছিলেন। দ্বাবিংশ—ককি-অবতার। ‘কলিযুগের শেষ-ভাগে যখন সাধুদিগের আশ্রয়েও হরি কথা হইবে না ; যখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ নাস্তিক হইয়া উঠিবে ; যখন শূদ্রেরা রাজ্যশাসন করিবে ; এবং যখন স্বাহা, স্বধা ও বঘট্কারবাপী শুনা যাইবে না ; ভগবান তখন ককি-রূপে অবতীর্ণ হইয়া কলির শাসন করিবেন। এই সকল ভিন্ন শ্রীমদ্ভাগবতে কপিলদেবও ভগবানের অবতার বলিয়া পরিকীর্তিত হইয়াছেন। যমু-দুহিতা দেবহুতির গর্ভে কৰ্দম প্রজাপতির ঔরসে তাঁহার জন্ম হয়। বিশেষ-রূপে সাধ্য-জ্ঞান উপদেশ দিবার জন্ত পরব্রহ্ম স্বয়ং-ভগবান কপিলরূপে সত্ত্ব-অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের এই অবতার-তত্ত্ব আলোচনা করিয়া, সৃষ্টি-কর্তার স্বরূপ-তত্ত্ব এবং অবতার-রূপে সংসারে তাঁহার আবির্ভাবের বিষয়, বিশদভাবে উপলব্ধি হইতে পারে। পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করিতে গেলে, অবতারের সংখ্যা হয় না ; ভগবানের মহিমায়ও সীমা পাওয়া যায় না। অনুসন্ধিস্থ দেখিতে পান,—“কার্য্য-কারণ-স্বরূপ সমুদায় বস্তুই সেই কারণ-রূপী নারায়ণ ভিন্ন আর কিছুই নহে।” শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে (তৃতীয় অধ্যায়ে) এই অবতার-তত্ত্ব রূপান্তরে পরিবর্ণিত আছে। সেখানে দেখিতে পাই,—‘সেই বিরাট পুরুষ ভগবান সকল অবতারের অক্ষয় বীজ-স্বরূপ। তাঁহারই অংশ দ্বারা দেবতা, পশু, পক্ষী ও যমুত্বাদি-রূপ নানাবিধ অবতারের সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি প্রথমে বিরাট পুরুষ রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। পশ্চাৎ কোমার নামক সৃষ্টি অবলম্বন পূর্বক ব্রাহ্মণ-রূপে অবতীর্ণ হন। এই অবতারে তিনি জগৎকে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দিয়াছিলেন।’ সেখানে ভগবানের একবিংশ অবতারের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। এই অংশে লিখিত আছে—নারদ বৈকুণ্ঠ-তন্ত্র প্রচার করেন ; দত্তাত্রেয়—অলক ও প্রজ্ঞাদাদির নিকট আশ্র-তত্ত্ব উপদেশ দেন ; রুচির ঔরসে আকুতির গর্ভে যজ্ঞ অবতারে এবং গয়া-প্রদেশে অজ্ঞানের পুত্র বুদ্ধ অবতারে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানেও লিখিত আছে,—“অবতারাহসংখ্যেয়া হরেঃ সৰ্বনির্ধেৰ্জিজাঃ। যথাবিদ্যামিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্ত্র্যাঃ সহস্রশঃ ॥” অর্থাৎ, ‘অবতার অসংখ্য। যেমন কোনও এক অক্ষয় জলাশয় হইতে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলপ্রবাহ নির্গত হইয়া দিকে দিকে ধাবিত হয়, সেইরূপ সৰ্বনির্ধি একমাত্র পরমেশ্বর হইতে বিবিধ অবতারের উৎপত্তি হইয়া থাকে। অবতারদিগের মধ্যে কেহ ভগবানে অংশ, কেহ বা বিভূতি।’

ব্রাহ্মণ, সেই পুরুষের মুখ ছিলেন ; রাজস্ব—বাহ ছিলেন ; বৈশ্ব—উরু ছিলেন ; শূত্র পুরুষের পদ হইতে জাত হইয়াছিলেন । বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন-রূপে এই শাক্তোক্তির তাৎপর্য-ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন । ঋগ্বেদের আলোচনার ব্যাখ্যাকার বলিয়াছেন,—“ইহার প্রকৃত অর্থ এই যে, ব্রাহ্মণেরা সকলের মাতৃ এবং পুত্র্য ছিলেন । রাজস্বগণ সকলের রক্ষক ছিলেন এবং বৈশ্বগণ বাণিজ্য-ব্যবসায়ী দ্বারা সকলের ধারক ছিলেন । ব্রাহ্মণেরা সকলের পুত্র্য ছিলেন বলিয়া পুরুষের মুখ-স্বরূপ । রাজস্বেরা সকলের পালক ও রক্ষক ছিলেন বলিয়া, পুরুষের বাহ-স্বরূপ । বৈশ্বেরা ব্যবসায়ী বলিয়া উরু-স্বরূপ ছিলেন । শূত্রেরা সকলের নিয়ন্ত্র ছিলেন বলিয়া, পুরুষের পাদ-স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছেন ।” * যাহা হউক, যে কারণেই হউক, ব্রাহ্মণের প্রাধান্ত্য বেদে, পুরাণে,—সৰ্ব্বশাস্ত্রে সমভাবে পরিকীর্তিত হইয়া আসিয়াছে । শিবপুরাণে দেখিতে পাই,—দেবদেব মহাদেব পার্শ্বতীর নিকট ব্রাহ্মণ-মহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া বলিতেছেন,—“ধৰ্ম্মাদি চতুর্কৰ্ণ ব্রাহ্মণগণেই প্রতিষ্ঠিত । ব্রাহ্মণগণই যজ্ঞ, হোম এবং হবিঃ ; দেবগণ তদ্বারাই তৃপ্তি লাভ করেন । ব্রাহ্মণ-হিতেই সমগ্র জগৎ প্রতিষ্ঠিত । জগৎই ব্রাহ্মণ-সংজ্ঞার হেতু । সংস্কার (উপনয়ন) — দ্বিজ-সংজ্ঞার কারণ ; বিদ্ভা — বিপ্র-নামের মূল । স্তূতরাং ব্রাহ্মণ ত্রিবিধ ।.....যে ব্রাহ্মণ বেদবেত্তা এবং বহি-হোম-পরায়ণ, তিনিও শ্রেষ্ঠ ; পূজিত হইলে তিনিও নিস্তার করিতে সক্ষম । যে ব্যক্তি মাত্র জন্মতঃ ব্রাহ্মণ, তাহারও সৰ্ব-বিষয়ের পূরণে সামর্থ্য আছে ; তিনিও লোক-গুরু । তিনিও পূজিত হইলে পুণ্য-দানে সমর্থ । অগ্নিহোত্র, তপস্বী, যোগ, শৌচ, ঋতুতা, সত্য এবং বেদাঙ্গুলীনই ব্রাহ্মণগণের কৰ্ম্ম । ব্রাহ্মণ মিথ্যা কথা বলেন না ; ব্রাহ্মণ প্রাণি-হত্যা করেন না ; ব্রাহ্মণ পর-সেবা করেন না ; ব্রাহ্মণ পাপ করেন না ; প্রকৃত ব্রাহ্মণের পুনর্জন্ম হয় না । অতি ক্লিষ্ট ব্রাহ্মণেরাও ওভাঙত বিতরণে সমর্থ ।” ব্রাহ্মণ-মহাত্ম্যের কথা অধিক আর কি বলিব ? শাস্ত্রে আছে,—ভৃগু মুনি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও মহেশ্বরের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, তাহার পরীক্ষা করিতে গিয়াছিলেন । ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া, ব্রহ্মার প্রতি যথোচিত সন্মান প্রদর্শন না করায়, ব্রহ্মা তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া-

* যে পুরুষ-স্বক্বে ব্রাহ্মণ-করিয়াদির এইরূপ উৎপত্তি বিবরণ লিখিত আছে, পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন পণ্ডিতগণ তাহার আধুনিক-অমাণের জন্য বিশেষরূপ যত্নবান । রবানান্দ সরস্বতী বলেন,—“উক্ত পুরুষ-স্বক্বে অশেপ্কারিত আধুনিক স্বক্বে বলিয়া প্রসিদ্ধ । উহা বৈদিক সময়ের চরম-কালে রচিত হইয়াছিল । বেদ যুক্তের প্রাচীনত্ব এবং নুতনত্ব আদিবার বিশেষ লক্ষণ আছে । যে সকল স্বক্বে পাঠ করিলেই তাব সরল, ভাষা সরল ও স্বীকৃতি সরল বলিয়া বোধ হয় এবং স্বাভাবিক বাক্য-স্বরূপ বলিয়া প্রতীত হয়, সেই সকল প্রাচীন স্বক্বে । আর যে সকল স্বক্বে পাঠ করিয়া চিন্তাশীলতার পরিচয়, যজ্ঞ-বাহুল্যের কথা, ভাবের নবীনত্ব এবং ভাবের নব্যত্ব দেখা যায় ; সে সবই অশেপ্কারিত নুতন স্বক্বে । বিচার্যমান পুরুষ-স্বক্বে ভাবার আধুনিকত্ব, ভাবের নুতনত্ব এবং স্বীকৃতির নব্যত্ব বুঝি হয় । অতএব ইহা প্রাচীন স্বক্বে নহে ; শেষ সময়ের রচিত ।” রমেশচন্দ্র গুপ্ত বলেন,—“কবেদ যজ্ঞকালের অনেক পর এই অংশ রচিত হইয়া, কবেদের ভিতর প্রকৃষ্ট হইয়াছে,— তাহার সন্দেহ নাই । কবেদের অন্য কোনও অংশে ব্রাহ্মণ, কবির, বৈশ্য, শূত্র—এই চারি জাতির উল্লেখ নাই । এই শব্দগুলি কোনও স্থানে জ্ঞেয়-বিশেষ বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হয় নাই । ব্যাকরণবিৎ পণ্ডিতগণ এখান করিয়াছেন যে, এই কবেদ ভাষাও বৈদিক ভাষা নহে । ভাষা—অশেপ্কারিত আধুনিক সংস্কৃত । আতি-বিশিষ্ট-প্রথা কবেদের সময় প্রচলিত ছিল না । কবেদে এই সু-প্রথার একটী এখান দৃষ্ট করিবার জন্য এই অংশ প্রকৃষ্ট হইয়াছে ।” আরো এ সকল কথা স্বীকার করি না । এতৎসম্বন্ধে আমাদের বাহ্যিক-সত্য, তির-তির-স্থানে উক্ত হইয়াছে । (এই গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদ এবং একত্রিশ পরিচ্ছেদ হইয়া ।)

ছিলেন। বহাদেবের নিকট শ্রবণ করিয়া, তাঁহারও প্রতি বিশেষ-রূপ সম্মান প্রদর্শন সা
করায়, তিনিও মুনিবরের প্রতি রুষ্ট হন। অবশেষে দ্বন্দ্ব-ব্রতীতে তাঁহাদের কোপ-শান্তি
করিয়া, ভৃগু-মুনি বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হন। বিষ্ণু তখন নিম্নিত ছিলেন। মুনি তাঁহার
বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিয়া, তাঁহার নিদ্রা-ভঙ্গ করেন। তাহাতে রুষ্ট হওয়া দূরে থাকুক,
বিষ্ণু জাগরিত হইয়া, মুনিবরের চরণ-সেবায় প্রবৃত্ত হন; বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিয়া মুনিবর
ব্যথা পাইয়াছেন বলিয়া, বিষ্ণু বড়ই সন্তুষ্ট হন। এইরূপে ব্রাহ্মণ-ভক্তির নিমিত্তই বিষ্ণুর
প্রাধাত্য কীর্তিত হয়। সেই হইতে ভৃগু-পদ-চিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়া, বিষ্ণু আপনাকে ধন্ত
বলিয়া মনে করেন। সেই হইতেই বিষ্ণু সর্ক-শ্রেষ্ঠ; সেই হইতেই বিষ্ণু ব্রাহ্মণেরও উপাত্ত।
ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ-মাহাত্ম্য আরও কত স্থলে কত রূপে পরিকীর্তিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা
হয় না। ব্রাহ্মণের জন্ম, ব্রাহ্মণের কর্ম, ব্রাহ্মণের সম্মান, ব্রাহ্মণের আসন এবং ব্রাহ্মণের
পাতিত্য-সম্বন্ধে প্রায় সকল শাস্ত্রেই কিছু-না-কিছু উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে
লিখিত আছে,—‘ব্রাহ্মণ কর্ম-ফলে ব্রাহ্মণ-কুল-জাত হইয়া স্বধর্ম-পরায়ণতা ও শুদ্ধাচার-
সহকারে ব্রহ্ম-চিন্তা করেন বলিয়াই ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হন।’* ককিপুরাণে ব্রাহ্মণের
লক্ষণ-বর্ণন-প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে,—‘যিনি ব্রাহ্মণদিগের বিবরণ শ্রবণ করেন, তাঁহার সকল
পাপ ধ্বংস হয়। স্বর্গ ব্রাহ্মণদিগের হস্তেই আছে; কারণ, তাঁহাদের বাক্যে বেদ, হস্তে হব্য,
পাশ্রে সমুদয় তীর্থ ও ধর্ম্মাশ্রয় এবং নাভিতে ত্রিগুণা প্রকৃতি বিद्यমান। ব্রাহ্মণেরা ভূদেব।
ইত্যাদি।’† পরপুরাণ স্বর্গ-খণ্ডেও ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব কীর্তিত হইয়াছে এবং ব্রাহ্মণের লক্ষণ
লিখিত আছে। সে লক্ষণ,—‘ক্ষমা, দয়া, বিজ্ঞান (শিল্প-শাস্ত্রাদি জ্ঞান), সত্য, দম
(বহিরিঙ্গিয় নিগ্রহ), সম (অন্তরিঙ্গিয় নিগ্রহ), আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান, জ্ঞান (ব্রহ্ম-জ্ঞান),
—এই সকলই ব্রাহ্মণের লক্ষণ।’‡ কুর্কপুরাণে ব্রাহ্মণের কর্তব্য-তত্ত্ব বিশদ-ভাবে
পরিবর্ণিত। ৩ মহাত্মারতে মোক্ষ-ধর্ম্ম এবং দান-ধর্ম্ম কখন প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব পরি-
কীর্তিত। ব্রাহ্মণের গৌরব সম্বন্ধে অধিক উল্লেখ নিম্নয়োজন। যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনিই
ব্রাহ্মণ; যাঁহার সাহায্যে ব্রহ্মের সমীপস্থ হওয়া যায়, তিনিই ব্রাহ্মণ। ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন
হইয়া, ব্রাহ্মণ আজি পর্যন্ত আপনার প্রাধাত্য ও শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন।
ব্রাহ্মণের দে পর্যায়-ভঙ্গ কখনও হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

যেমন ব্রাহ্মণগণ, তেমনি ঋষিগণ;—উভয়ের মধ্যে যেন এক অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বিद्यমান।
‘ঋষি’-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ আলোচনা করিলেও নৈকট্য সম্বন্ধ প্রতীত হয়। ঋষি (ঋষ
গমন করা অথবা দৃশ্-দর্শন করা + ই), অর্থাৎ যিনি সাংসারিক মুখ
ঋষি-প্রসন্ন। ত্যাগ করিয়া জ্ঞান-পথে গমন করিয়াছেন; যাঁহা হইতে বিজ্ঞা, তপঃ ও
প্রতি এই সকল সম্যক-রূপ নিরূপিত হয়; যিনি পরমার্থ-সম্যক-দৃষ্টি স্থাপন
করিয়া সর্বতোভাবে পরোপকার করেন;—তিনিই ঋষি-পদ-বাচ্য। প্রথমে ব্রাহ্মণই ঋষি-
পদ-বাচ্য ছিলেন; ক্রমশঃ কর্মশূণ্য কোনও কোনও ক্ষত্রিয়ও ঋষি-সমাজ লাভ করিয়াছিলেন।

* ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, দ্বাদশ-খণ্ড, পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়। † ককিপুরাণ, প্রথমোক্ত, চতুর্থ অধ্যায়, ২৪শ হইতে
২৬শ শ্লোক। ‡ পরপুরাণ, স্বর্গ-খণ্ড, সপ্তত্রিংশ অধ্যায়, ২০শ শ্লোক। § কুর্কপুরাণ, চতুর্থ অধ্যায়।

ঋষি প্রধানতঃ সপ্তবিধ—শ্রুতর্ষি, কাণ্ডর্ষি, পরমর্ষি, মহর্ষি, রাজর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি। শ্রুতর্ষি ; যথা—সুশ্রুতাদি। কাণ্ডর্ষি ; যথা—কৈকশি আদি। পরমর্ষি ; যথা—ভেল ইত্যাদি। মহর্ষি ; যথা—ব্যানাদি। রাজর্ষি—ইহার রাজা হইয়াও ঋষির ছায় আচরণ করেন ; যেমন—বিধামিত্র, জনক প্রভৃতি। ব্রহ্মর্ষি—ব্রহ্ম-তত্ত্বাহুসন্ধানে নিযুক্ত ঋষিগণ ; যেমন—বশিষ্ঠাদি। দেবর্ষি—ইহার দেবতার ছায় মাছু ; যেমন—নারদ, ডুমুর প্রভৃতি। তবেই বুঝা যায়, ব্রাহ্মণগণও ঋষি-পর্ধ্যয়ে গণ্য ছিলেন এবং কত্রিয়গণও কৰ্ম-ফলে ঋষি-মধ্যে পরিগণিত হইতেন। ঋষিগণের মধ্যে যবন্তর অহুসারে ভিন্ন ভিন্ন সাত জনের ‘সপ্তর্ষি’ সংজ্ঞা হইত। * ঋষিগণের নামাহুসারেই গোত্রের প্রবর্তনা। কত্রিয় নৃপতিগণের পরিচয়-প্রসঙ্গে তাঁহাদের বেরণ বংশ-লতা প্রদত্ত হইয়াছে, অহুসন্ধান করিলে ঋষিগণেরও সেইরূপ বংশ-লতা প্রাপ্ত হওয়া যায়। † কত্রিয় নৃপতিগণের বংশ-লতায় কৰ্ম শূণ্য কেহ যেমন ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়াছেন এবং কৰ্ম-বৈশিষ্ট্যে কেহ যেমন যবনাদি নীচ জাতিতে পরিণত হইয়াছেন, ঋষি-বংশের বংশ-লতা আলোচনাও তাঁহাদের বংশধরগণের তরুণ উন্নতি ও অধোগতির পরিচয় পাওয়া যায়। সেই বংশধরগণের মধ্যেও কেহ বা দেবদ্ব-ব্রাহ্মণ্যের অধিকারী হইয়াছেন ; কেহ বা, নিম্ন-পর্ধ্যয়ে অধঃপতিত হইয়াছেন। প্রধানতঃ তুম্বাদি মহর্ষি-সন্তানগণ বিপ্র-পর্ধ্যায়-ভুক্ত হইয়াছিলেন। মহর্ষি তুম্ব-ভূবন, ভৌবন, সূর্য্য, সূর্য্যন, ক্রতু, বসু, মূর্ধা, ত্যাজ্য, বহুদ, প্রভব, অব্যয় এবং দক্ষ—এই দ্বাদশ পুত্র দেবতা বলিয়া পরিচিত। তুম্ব-পুত্র চ্যবন ও আগ্ন-বান ; আগ্ন-বানের পুত্র ঔর্য্য, ঔর্য্যের পুত্র জমদগ্নি ; ইহার বিপ্র-পর্ধ্যায়ভুক্ত। ঔর্য্যই তুম্ব-বংশীয়দিগের গোত্র-প্রবর্তক। মহর্ষি অজিতারও দশটি দেব-পুত্র এবং সাতটি ঋষি-পুত্র। অত্রি-বংশে কৰ্ম্মদায়ণ ও সারায়ণ দুই শাখা। মরীচির পুত্র—কশ্ণপ ; কশ্ণপ-বংশীয় গোত্র-প্রবর্তক ঋষির সংখ্যাও অনেক। বশিষ্ঠ-বংশজ বিপ্রগণের এবং অগস্ত্য-বংশোৎপন্ন দ্বিজগণের গোত্র এবং বংশ-পর্ধ্যায়ও অসংখ্য। এই সকল মহর্ষিগণের এবং তাঁহাদের বংশধরগণের গোত্রাহুসন্ধান করিয়াই আজি পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণগণ আপনাদের পরিচয় দিয়া থাকেন। এদিকে আবার, কত্রিয়াদি বংশেও পূর্বোক্ত ঋষিগণের গোত্রের পরিচয় কোথাও কোথাও পাইয়া থাকি। যাঁহারা স্বভাবতঃ ধর্ম্মপ্রবণ, যাঁহারা স্বভাবতঃ তপস্বন্তর, যাঁহারা স্বভাবতঃ নিদাম-কৰ্ম্ম-প্রবণ, তাঁহারা ই প্রধানতঃ ঋষি-পদ-বাচ্য ছিলেন। এখন যেমন সন্ন্যাসপ্রবেশ ব্রাহ্মণ্যের অঙ্গ বর্ণও বিশেষ বিশেষ অবস্থার অধিকারী, কত্রিয়াদিও সেইরূপ বিশেষ বিশেষ অবস্থায় পুরাকালে ঋষি-সংজ্ঞা লাভ করিতে সক্ষম হইতেন। সে হিসাবে, ঋষি-সংজ্ঞা—উপাধি-বাচক বলিলেও অত্যাক্তি হয় না। জনকাদি রাজগণ—কি জানে, কি ভোগ-বীকারে, কি পুণ্য লাভ করিয়া, রাজর্ষি-পদ-বাচ্য হইয়াছিলেন,—পুরাণেতিহাসে তাহার পরিচয় পাঠ করিলে অনায়াসেই ঋষি-তত্ত্ব উপলব্ধি হইবে। ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি, রাজর্ষি প্রভৃতি ঋষি-সংজ্ঞা কৰ্ম্ম-শূণ্য লাভ হইত,—ঋষি-তত্ত্ব আলোচনা করিলে, তাহদের সবজ্ঞেই বোধগম্য হইতে পারে।

* এই ক্রমের জরোবিশেষ পরিচ্ছেদে, ৩৪০ পৃষ্ঠায়, সপ্তর্ষি বিবরণ দ্রষ্টব্য।

† সংস্কৃতপুত্র, ১২২৫ অধ্যায় হইতে ২০২৫ অধ্যায়ের ঋষি বংশের বিবরণ বর্ণিত আছে।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ ।

পূর্বানুস্মৃতি ।

[আভাস মাত্র,—অণু ও অনন্তের ভুলনা ;—ভারতের ধর্ম,—উদার বিশ্বজনীন ভাব ;—ভারতের লম্বাজ,—সর্পি বা একদেশদশী নহে ;—পাপ-পুণ্য, ভাল-মন্দ—হুই দুকুই পরিবৃত্তমান ;—বৈদিক যুগ-এসক,—“বৈদিক যুগ” অনির্দিষ্ট ;—বৈদিক যন্ত্র,—যন্ত্রের অনাদিষ ;—গায়ত্রী ও বিধানিত্র ;—আভিভেদ-ভ্রম,—বিবাহ-এসক,—সামাজিক আচার-ব্যবহার,—সমরগাদির ;—জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি,—আয়ুর্কেন্দ্র ;—সর্ক-বিষয়ে ভারতের উন্নতির পরিচয়,—পৃথিবীর গোলত্ব ও গতি প্রভৃতির এসক ;—বিবিধ,—প্রাচীন আধ্যাত্মের পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশে গতিবিধি,—উাহাদের যান-বাহনাদি ;—উপসংহার ।]

সুত্র বটে অনন্ত আকাশের অংশ-মাত্র উপলব্ধি করিয়াই মানুষ আকাশের পরিচয় দিতে প্রয়াস পায়। গোপাঙ্গে জল-বিন্দু দেখিয়াই মানুষ মহা-সমুদ্রের মহিমা স্মরণ করে।

আভাস-
মাত্র ।

অনন্তকালের অনন্ত ইতিহাসের আভাস-মাত্র পাইয়াই মানুষ পুরাতত্ত্ব-আলোচনার প্রবৃত্ত হয়। অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ ; কর্শকেন্দ্র সীমাবদ্ধ ; অধচ, আলোচ্য-বিষয়—অসীম, অনন্ত। ঘটাকাশে অনন্ত আকাশ কল্পিত হইলে,

অথবা গোপাঙ্গে মহা-সমুদ্রের মহিমা বুঝাইবার চেষ্টা করিলে, তাহাতে যেমন আকাশের বা মহা-সমুদ্রের অনন্তত্ব বোধগম্য হওয়া দুষ্কর ; সুত্র গ্রহের সুত্র গভীর মধ্যে ভারতবর্ষের অনন্তকালের অনন্ত ইতিহাসের পরিচয় দেওয়াও তদ্রূপ দুর্ভাষ্যক্য মাত্র ;—একরূপ অসন্তব বলিলেও অত্যাুক্তি হয় না। কত কালের কত পরিবর্তনে, কত আচার-ব্যবহারও কত রীতি-নীতি, কত প্রকারে উদ্ধৃত ও বিলুপ্ত হইয়াছে,—কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে ? পৃথিবীতে এমন কিছু নূতন তত্ত্ব আবিস্কৃত হয় নাই বা হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়াও বনে হয় না,—প্রাচীন ভারতে বাহার অভ্যুত্থান ও তিরোধান না হইয়াছে ! আমরা স্মরণ করিয়া বলিতে পারি, এমন কোনও নূতন চিন্তা নূতন ভাব কোনও দেশে কখনও বিকশিত হয় নাই,—ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্ব বাহার বীজাহুর দেখিতে না পাই।

ধর্ম—ভারতবর্ষে পূর্ণ প্রকৃষ্ট হইরাছিল। ভারতবর্ষের ধর্ম-তত্ত্বের যে শাখা-পল্লব-কল-পুষ্প উদ্গত হয়, তাহাই এখন পৃথিবীর চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। ধর্মের কোন অঙ্গ ভারতবর্ষে দেখিতে না পাই ? অধিকারি-ভেদে ধর্ম-তত্ত্ব কত ভাবেই ভারতবর্ষে বিকশিত। একেধর-বাদ—ভারতবর্ষে ; আবার নিরীধর-বাদ—সেও ভারতবর্ষে। ভারতবর্ষই শিক্ষা দিতেছেন,—অগদীধর সর্কভূতে সমভাবে অবস্থিত ; আবার ভারতবর্ষেই দেখিতে পাই,—এক জন অল্প জনকে স্মরণ করিতেও সঙ্কচিত। নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনা—ভারতবর্ষই প্রথম শিক্ষা দেন ; আবার সাকার-মূর্ত্তি করনা করিয়া ভগবদ্রাধনার শিক্ষাও ভারতবর্ষেই দেখিতে পাই। যিনি যে চক্ষে যে ভাবে দৃষ্টি করিবেন, তিনি সেই চক্ষে সেই ভাবেই চিত্রই দেখিতে পাই-বেশ। সর্ক প্রাণী—সর্ক জীব, কর্ত্তাভূত্বের আপন গতি-মুক্তির পথ প্রাপ্ত হইবে,—ভারতের ধর্ম ভেবনি সর্ক-জনীন উদার-ভাবে পরিপুষ্ট। ভারতের কোনও ধর্মের কোনও ভাবের

অভাব নাই ; ভারতের ধর্মে সকলের জন্য সকল পথই প্রদর্শিত হইয়াছে । পণ্ডিত হউন, মুখ হউন, সদাচারী হউন, কদাচারী হউন, পাপী হউন, পুণ্যবান হউন,—ভারতের ধর্মে সকলেরই স্থান আছে ; ভারতের ধর্ম, দেব-মানব-বন্ধ-রক্ষ-পণ্ড-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ—সর্বভূত সর্ব-প্রাণীর পথ নির্দেশ করিয়া রাখিয়াছেন ।

ধর্মে যেমন উদার বিশ্বজনীন ভাব—সমাজও সেইরূপ সাম্য-সুত্রে সংগঠিত ! সমাজে অধিকারি-ভেদে কর্ম-ব্যবস্থা । ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূত্র,—সমাজ কি স্তরের স্তর-পর্যায়ে অবস্থিত ।

ভারতের
সমাজ ।

অদৃষ্ট, কর্মফল, বা পরলোক,—ভারতবর্ষের সমাজ-ধর্মের সুশৃঙ্খলার মূলীভূত । অদৃষ্ট-বশে ব্রাহ্মণাদি-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া

কর্মফল ভোগ করিতে হয় এবং ইহজন্মের কর্ম্মফলস্বারে পরজন্মে উচ্চ-নীচ

গতি প্রাপ্ত হইতে হয়,—এ শিক্ষা জগতের কোনও দেশে কোনও জাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না । এই শিক্ষার ফলেই অদৃষ্টবাদী হিন্দু অপরের প্রতি ক্রীড়া-পরায়ণ নহে । এই শিক্ষার ফলেই ধীর-স্থির-ভাবে সে আপন কর্ম সম্পন্ন করিয়া যায় । ভাবা-শিক্ষার প্রথম সোপান যেমন বর্ণ-জ্ঞান ; বর্ণ-জ্ঞানের পর প্রথম শিক্ষা দ্বিতীয় শিক্ষা প্রভৃতির অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া, মনুষ্যক্রমশঃ যেমন গ্রন্থাদি পাঠে সমর্থ হয় ; সেইরূপ, এক এক বর্ণ আপন-আপন নির্দিষ্ট কর্ম সম্পন্ন করিয়া, উচ্চবর্ণের সামীপ্য-লাভে অধিকারী হইয়া থাকে । তাহাতে এ জন্মে যিনি শূত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, পরজন্মে হয় তো তিনি ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে পারেন ; আবার ইহজন্মে যিনি ব্রাহ্মণ লাভে সমর্থ হইয়াছেন, কর্ম্মবৈশিষ্ট্যে পরজন্মে তিনিই হয় তো চণ্ডাল হইতে পারেন । ঠাহারা বলেন,—হিন্দুর শাস্ত্র এবং হিন্দুর সমাজ-পদ্ধতি এক-দেশ-মণ্ডিতা দোষ-হুই, ঠাহারা নিশ্চয়ই জন্মান্তর-তত্ত্ব উপলব্ধি করেন নাই ; ঠাহারা কেবল সমাজ-বিশেষের বা ব্যক্তি-বিশেষের ভ্রান্ত ক্রিয়া-কলাপ মর্শন করিয়াই মূল-তত্ত্বে দোষারোপ করিয়া থাকেন । যে সমাজের, যে ধর্মের মূল-ভিত্তি—ইহজন্মের মনুষ্য পরজন্মে কৃষি-কীট হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে পারে এবং ইহজন্মের অন্ত্যজ প্রাণিরও পরজন্মে দেব-লাভ সম্ভবপর ;—সে অদৃষ্ট-ফল-শাসিত সমাজ অপরের প্রতি কি কখনও ঘৃণা বা তাচ্ছিল্য ভাব প্রকাশ করিতে পারে ? আজ যিনি দেব-পর্যায়ে অবস্থিত ; কর্ম্মফলে কাল তিনি চণ্ডাল লাভ করিতে পারেন ; আবার, আজ যিনি চণ্ডাল আছেন, কর্ম্মফলে কাল তাঁহার দেব-সন্মান অসম্ভব নহে ;—ইহার অধিক সাম্য-ভাব আর কি হইতে পারে ? তবে যে পর্যায়-ভেদ দৃষ্ট হয়, সে কেবল কর্ম্মফল-সাপেক্ষ । সে ভেদ চিরকাল আছে, থাকিবে এবং কেহ কখনও একেবারে তাহা দূর করিতে সমর্থ হইবেন না ।

পাপ-পুণ্য চিরকাল আছে । সমাজের শৃঙ্খলা-বিশৃঙ্খলাও চিরকাল রহিয়াছে । অতরাং কোনরূপ একটা বিশৃঙ্খলার দৃষ্টান্তে, ‘সমাজ বিশৃঙ্খলায় ছিল’, তাহাও বলিতে

ভাল-বদ—
হইই আছে ।

পারা যায় না ; আবার কোনও একটা শৃঙ্খলা দৃষ্টে ‘সমাজ সম্পূর্ণ-রূপ

সুশৃঙ্খল ছিল’, তাহাও বলিতে পারি না । শাস্ত্র-তত্ত্ব আলোচনায়ও সে

ভাব উপলব্ধি হয় না । পৃথিবী কখনও যে একেবারে পাপশূন্য ছিল, অথবা

পৃথিবীতে কোনও সময়ে যে একেবারে পাপীর অস্তিত্ব ছিল না, শাস্ত্র-তত্ত্ব আলোচনা করিয়া,

আমরা কচিং তাহা বুঝিতে পারি। যুগ-বিবর্তনে পাপ পুণ্যের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটয়া আসিয়াছে বটে ; কিন্তু পৃথিবী কখনও একেবারে পাপ-পরিশুদ্ধ হইয়াছিলেন—তাহা কদাচ মনে হয় না। কালবশে সকল প্রকার বিবর্তনই সম্ভবপর। অনন্ত কালের অনন্ত ইতিহাসের মধ্যে তাই শৃঙ্খলা ও বিশৃঙ্খলা—উভয়বিধ চিত্রই আমরা দেখিতে পাই। সে হিসাবে, বলিতে পারা যায়,—ভারতবর্ষে সকলই ছিল, আবার কিছুই ছিল না। সে হিসাবে বলিতে পারা যায়,—ভারতবর্ষে সমাজ-বন্ধনের দৃঢ়তা ছিল, কখনও আবার তাহাতে শিথিলতাও ঘটয়াছিল। কলির আবির্ভাব—সবে তো এই একবার নহে! কত কলি আসিয়া কত কলি চলিয়া গিয়াছে। সুতরাং কত বিশৃঙ্খলার ইতিহাসও শুধু শুধু ভুলপীড়িত হইয়া রহিয়াছে। সাধারণ ভাবে এইটুকু বুঝিলেই প্রাচীন ভারতের ধর্ম-তত্ত্ব ও সমাজ-তত্ত্ব উপলব্ধি হইতে পারে। আর, তাহা হইলে, কাহারও সহিত কাহারও বাগ্-বিতণ্ডার বা মত-পার্থক্যের সম্ভাবনা উপস্থিত হয় না। এই তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে না পারিয়াই অনেকে তর্ক উত্থাপন করেন,—“প্রাচীন ভারতে, বৈদিক-যুগে, ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-বিভাগ ছিল না। এ বর্ণ-বিভাগ—অধুনা-কল্পিত।” তাঁহারা আরও বলেন,—“ভারতে জাতি-ভেদ ছিল না ; ভারতে অসবর্ণ বিবাহ চলিত ; ভারতের ব্রাহ্মণ-শূত্র স্ত্রী-পুরুষ সকলেই বৈদিক-স্মৃতি রচনা করিতেন।” ভারতবর্ষের প্রাচীন সমাজ-সম্বন্ধে এইরূপ কত উপকথারই সৃষ্টি হইয়া আছে। সকলের সকল কথার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা সম্ভবপর নহে ; তবে ঐ সকল বিষয়ে আমরা বাহা বুঝিয়াছি, স্থলভাবে তাহারই আলোচনা করিতেছি।

প্রথম,—‘বৈদিক-যুগ’। আধুনিক পণ্ডিতগণের অনেকেরই মত,—‘বৈদিক-এজ’ (Vedic Age) বা বৈদিক-যুগ নামে একটা নির্দিষ্ট সময় ছিল। ‘সেই সময়েই বৈদিক-

যজ্ঞ-সমূহ রচিত হয় ;—সেই সময়েই সূদাস, যদু, তুর্বশ প্রভৃতি বৈদিক যুগ-এসব। ঋগ্বেদোক্ত নৃপতিগণ বিজ্ঞমান ছিলেন ;—সেই সময়েই আৰ্য্যগণ মধ্য-

এশিয়া বা মেরু-প্রদেশ হইতে আসিয়া, ভারতে উপনিবেশ স্থাপন

করিয়াছিলেন ;—সেই সময়েই আৰ্য্য ও অনার্য্যগণের মধ্যে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ-বিগ্রহ চলিয়াছিল ;—সেই সময়েই যজ্ঞ-বিধির সৃষ্টি হয় ;—সেই সময় হইতেই বৈদিক-যজ্ঞ-সমূহ রচিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল।’ কিন্তু শাস্ত্র-সমূহ আলোচনা করিয়া দেখিলে এবং বিশেষ রূপে বিচার-বিবেচনা করিলে, ‘বৈদিক-যুগ’ বলিয়া কোনও সময়ের নির্দেশ করা যায় না। এক সম্বন্ধে কত বেদবাস জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ; কতবার বেদ-সঙ্কলন বা বেদ-বিভাগ হইয়াছে ; কত ইন্দ্র, কত উপেন্দ্র, কত সূদাস, কত যদু, কত তুর্বশ আবির্ভূত ও তিরোহিত হইয়াছেন।—সে তথ্য দ্রুতধিম্মা। সুতরাং স্থল-ভাবে এখন আমাদেরকে বুঝিতে হয়,—বেদবাস বেদ-বিভাগ বা বেদ-সঙ্কলন করিয়াছিলেন, তাহার তাৎপর্য্য—তাঁহাদের আবির্ভাবের পূর্বে এক এক সঙ্গারে দেবদিগের উপাসনায় যে যে মন্ত্র প্রচলিত ছিল, সেই সেই সঙ্গার হইতে তিনি তাহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। মন্ত্র-স্রষ্টা (পণ্ডিতগণ বাহাদিগকে যজ্ঞ-রচয়িতা বলিয়া নির্দেশ করেন) ঋষিগণের এক সময়ে—এমন কি এক যুগে—বিজ্ঞমানতা সম্ভবপর নহে। কক-সংহিতার ঋষিগণের মধ্যে অগস্ত্য ও অত্রির নাম দেখিতে পাই। আবার, বিশ্বামিত্র,

দিবোদ্যাস প্রভৃতিও বিদ্যমান আছেন। বৈবস্বত মনু, বিবস্বানু আদিভ্য, প্রজাপতি, ভর্গ, সোম প্রভৃতি মন্ত্র-দ্রষ্টা বলিয়া অভিহিত ; আবার, প্রতর্দন, পরাশ্রদ, শুনশেফ, দেবরাত, অষ্টক প্রভৃতিরও সেই পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথমোক্ত ঋষিগণের সহিত শেষোক্ত ঋষিগণের কাল-ব্যবধান,—বহু বিস্তৃত। এক সময়ে তাঁহাদের বিদ্যমানতা সম্ভবপর নহে ; এমন কি, ঐ সকল ঋষিগণের কেহ কেহ এক মন্বন্তরে বিদ্যমান ছিলেন না বলিয়াও বুঝিতে পারা যায়। সে ক্ষেত্রে, ‘বৈদিক-যুগ’ অর্থে কি বুঝিতে পারি? বেদব্যাসের পূর্ববর্তী অনন্ত-অতীত কালকে তবে কি ‘বৈদিক-যুগ’ বলিব? কিন্তু বলা বাহুল্য, সে অর্থে এ পর্য্যন্ত কেহই ‘বৈদিক-যুগ’ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ পাই নাই।

বৈদিক-মন্ত্র অনাদিকাল হইতে ইহ-সংসারে প্রচলিত। অনেক স্থলে অর্ধ-বিকৃতি বা পাঠ-বিকৃতি ঘটিয়াছে,—সন্দেহ নাই ; কিন্তু মূল মন্ত্র কোন অনন্ত কাল হইতে প্রচলিত,—কেহই তাহা নির্ণয় করিতে পারিবেন না। * জন্মগ্রহণের অব্যবহিত বৈদিক মন্ত্র। পরেই মানুষ ‘মা’-বুলি উচ্চারণ করে। সে বুলি মনুষ্য-কণ্ঠ হইতেই মনুষ্য-কণ্ঠে সঞ্চালিত হয় বটে ; তাহাতে আপাতঃ-দৃষ্টিতে আমরা ‘মা’-বুলি মনুষ্য-স্রষ্ট বলিয়া মনে করিতে পারি বটে ; কিন্তু যদি মূল-তথ্য অমুসন্ধান করি, অতীতের অনন্ত পথে অন্বেষণ করিয়া দেখি, বলিতে পারি কি,—সে বুলি কোথা হইতে আসিল? বৈদিক-মন্ত্র সম্বন্ধেও আমাদের সেই সিদ্ধান্ত। বেদ-মন্ত্রের নিত্যানিত্য পৌরুষেয়্যাপৌরুষেয়্য লইয়া সংসারে আবহমান কাল বিচার-বিতর্ক চলিয়া আসিতেছে। কেহ বলিতেছেন,—বেদ অপৌরুষেয় ও নিত্য ; কেহ বলিতেছেন,—বেদ পৌরুষেয় ও অনিত্য। সাংখ্যিকার বলেন,—‘বেদ অনাদি, বীজাকুরবৎ। যেরূপ বীজ হইতে অঙ্কুর, কি অঙ্কুর হইতে বীজ ; অঙ্কুর বীজের কারণ, কি বীজ অঙ্কুরের কারণ ;—তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব ; তদ্রূপ বেদের আদি নির্ণয় করা অসম্ভব।’ মীমাংসকেরা শূদ্রের নিত্য স্বীকার করিয়া বেদের নিত্য স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন,—‘বেদ প্রমাণ এবং নিত্য।’ নৈয়ায়িকগণ তাহাতে আপত্তি করেন। তাঁহারা বলেন,—‘শব্দ নিত্য হইতে পারে না।’ মীমাংসকগণের সহিত এ বিষয়ে নৈয়ায়িকগণের ঘোর তর্ক-বিতর্ক দেখিতে পাওয়া যায়। দর্শনকারগণের এই মত-পার্থক্য হইতেই সংসারে মত-পার্থক্যের স্রষ্টি। এখনও তাই বেদকে কেহ নিত্য, কেহ অনিত্য, কেহ পৌরুষেয়, কেহ অপৌরুষেয় বলিয়া নির্দেশ করেন। ম্বাদি স্মৃতি-শাস্ত্র বেদের অনুসারী। স্মৃতি-শাস্ত্রে বেদের নিত্যত্বের অপৌরুষেয়ত্বের বিষয়ই উল্লিখিত হইয়াছে। স্মৃতি-শাসিত সমাজ তদ্বিষয়ে অগ্রমত হইতে পারে না।

ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলে দ্বিষষ্টিতম স্তোত্রের দশম ঋকে বিখ্যামিত্র ঋষি গায়ত্রী-মন্ত্র আবৃত্তি করিয়াছেন। তাই বলিয়া বলিতে হইবে কি,—তিনিই গায়ত্রী-মন্ত্রের রচয়িতা? তাহা

গায়ত্রী কখনই সম্ভবপর নহে। গায়ত্রী-মন্ত্রে—ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব। যদি বিখ্যামিত্র সে ঋকের রচয়িতা হন, তাহা হইলে বিখ্যামিত্রের পূর্বে গায়ত্রী-মন্ত্রের—
বিখ্যামিত্র। সুতরাং ব্রাহ্মণের অস্তিত্বাত্মক প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু তাহা কি সম্ভব? বাঁহারা বলেন—‘বৈদিক-যুগে জাতিভেদ ছিল না ; ব্রাহ্মণ জাতির স্রষ্টি হয় নাই ;’ এই বিখ্যামিত্র-

এসলে তাঁহাদের সে উক্তিও বিস্ময় বলিয়া মনে হয় না কি ? * বিশ্বামিত্র, ব্রাহ্মণ্য-লাভের জন্য কঠোর তপস্বী করিয়াছিলেন ;—পাশ্চাত্য-মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ কথায় কথায় সেই দোহাই দিয়া, ব্রাহ্মণ্যের বর্ণের ব্রাহ্মণ্য-লাভের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন । যদি বিশ্বামিত্রের পূর্বে জাতিভেদ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যের প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব না থাকিত, তাহা হইলে বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ্য-লাভের জন্য আগ্রহান্বিত হইবেন কেন ? আর তাহা না হইলে, বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণ্য-প্রাপ্তির মূল প্রসঙ্গই তো উত্থাপিত হইতে পারে না ! তার পর, কেবল ঋগ্বেদে নহে ;—গায়ত্রী-মন্ত্র সামবেদে এবং যজুর্বেদেও দেখিতে পাওয়া যায় । * আরণ্যকে, উপনিষদে, পুরাণে, সংহিতা-শাস্ত্রে,—সর্বত্র গায়ত্রী-মাহাত্ম্য পরিকীর্তিত । বিশ্বামিত্রের (গাধি-তনয় বিশ্বামিত্রের) জন্মগ্রহণের বহু পূর্বে গায়ত্রী-মন্ত্র প্রচলিত ছিল, প্রমাণ পাওয়া যায় । যদি বিশ্বামিত্র গায়ত্রী-মন্ত্রের প্রবর্তক হন, তাহা হইলে, তিনি কখনই গাধি-তনয় বিশ্বামিত্র হইতে পারেন না । সে বিশ্বামিত্র—ঐহার পূর্ববর্তী কোনও বিশ্বামিত্র হওয়াই সম্ভবপর । ঋগ্বেদেও গাধি-তনয় বলিয়া বিশ্বামিত্রের উল্লেখ দেখিতে পাই না । ঐহার কোনও বংশ-পরিচয়ও সেখানে প্রদত্ত হয় নাই । যে ব্যক্তি গায়ত্রী গান করেন, ঐহারই ত্রাণ হয়,—এই জন্তই ঐ মন্ত্রের নাম ‘গায়ত্রী’ । বিশ্বামিত্র গায়ত্রী-মন্ত্র জপ করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন,—শাস্ত্রাদির আলোচনায়, সাংগাচার্য্য প্রভৃতির টীকায়, তাহাই উপলব্ধি হয় । শাস্ত্রানুসারে আরও বুঝিতে পারা যায়,—‘যুগান্তে, প্রলয়ের পরে, পূর্ববর্তী ইতিহাস ও শাস্ত্র-গ্রন্থ লোপ পাইলে, ঋষিগণ তপঃপ্রভাবে তৎ-সমুদায় লাভ করেন । বিশ্বামিত্রও সেই ভাবে, তপস্বীর প্রভাবে, ঐ মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।’ ফলতঃ, বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হইয়া গায়ত্রী-মন্ত্র লাভ করেন এবং সেই মন্ত্র-প্রভাবে পরিজ্ঞান পাইয়াছিলেন,—এতদ্বিত্তি অল্প কিছুই মনে করিতে পারি না ।

ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়া গৌরবাধিত হইয়াছিলেন—এক বিশ্বামিত্র নহেন—বিশ্বামিত্রের জ্ঞান আরও অনেকের নাম শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় ।† যে পদ লাভ করিয়া, মাহুশ আপনাকে গৌরবাধিত মনে করেন, সে পদ যে তাঁহার নিকট শ্রেষ্ঠ পদ,—তদ্বিষয়ে জাতিভেদ-ভয় । কোনই সংশয় থাকিতে পারে না । চত্ব-বংশের এবং নৃষ্য-বংশের নৃপতিগণের মধ্যে আঙ্গিরস, ক্ষত্রোপেত, অগ্নিবেষ্ট, অগ্নিবেষ্ঠায়ন, মৌদগল্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণ-বংশের উৎপত্তি হইয়াছিল । ত্র্য্যাক্ষণি, কবি, পুরুষাক্ষণি এবং গৃৎসমদ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়াছিলেন । সেই সকল হলেই ক্ষত্রিয় হইয়া ব্রাহ্মণ্য-লাভ গৌরবের বিষয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে । কর্ণ-ওণে ব্রাহ্মণ্য-লাভ সম্ভবপর ছিল,—

* সামবেদ ২৮.১২ এবং যজুর্বেদে ৩৩৫ ত্রুটব্য ।

† আশ্চর্যের বিষয়,—কবেদের বহুভাব-কালে মনোমত্রে দত্ত মহাশয় আর সকল হলেই ‘ব্রাহ্মণ’ শব্দ পরিহার করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন । তাঁহার অনুবাদ পাঠ করিলে আরই ‘ব্রাহ্মণ’ শব্দটা পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় না । মূলে ব্রাহ্মণ আছে,—এ কথা যদিও তিনি স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু অনুবাদ-কালে তিনি ব্রাহ্মণ-শব্দের অর্থ করিয়াছেন—অভ্যুদয় । সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ শব্দের পরিবর্তে ‘ভোতা’ শব্দ ব্যবহারেই তাঁহার অনুবাদ দেখিতে পাই । কিন্তু ব্রাহ্মণ্যের সরস্বতী কবেদে ব্রাহ্মণ শব্দের উল্লেখ স্বীকার করিয়া, ব্রাহ্মণ শব্দকে আপদ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন ।

এ সকল প্রসঙ্গে তাহা বুঝিতে পারা যায় বটে ; কিন্তু ব্রাহ্মণ-কত্রিয়ারদিগর সঙ্ঘ-গৌরবের যে তারতম্য ছিল, তাহাও স্পষ্টতঃ উপলব্ধি হয় । ঐহারা বলেন,—‘বৈদিক যুগে জাতিভেদ ছিল না’ ; তাঁহারাই আবার বিশ্বামিত্র, গুংসমদ প্রভৃতির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া কত্রিয়ার ব্রাহ্মণত্ব-প্রাপ্তির প্রমাণ প্রদর্শন করেন । যদি জাতিভেদই না রহিল, তবে বিশ্বামিত্র, গুংসমদ প্রভৃতির ব্রাহ্মণত্ব-লাভের প্রসঙ্গই বা উঠে কেন ? তাঁহাদের নাম বেদে উল্লেখ আছে ; সুতরাং তাঁহার ‘বৈদিক-কালে’ বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া স্বীকার করিতে হয় । তাহা হইলে, বৈদিক-কালে জাতিভেদ ছিল,—কি করিয়াই বা অস্বীকার করিতে পারি ? আমরা ঋগ্বেদোক্ত রাজস্ববর্ণের আলোচনায় দেখিয়াছি,—দর্ভের পুত্র রাজা রথবীতি গ্রাবাশ্বের সহিত আপন কন্তার বিবাহ দিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন । তাঁহাদের বংশের কন্তাগণ ঋষি-বংশে সমর্পিত হয় ; গ্রাবাশ্ব সে তুলনায় নীচ-বংশজ, সুতরাং তাঁহাকে কন্তা সম্প্রদান করা বাইতে পারে না ;—তখন এই কথাই উঠিয়াছিল । ইহাতে কি বুঝা যায় ? যদি উচ্চ-নীচ জাতি-ভেদ বিদ্যমান না থাকিবে, তাহা হইলে এ আপত্তি উত্থাপিত হইবে কেন ? কেহ কেহ বলেন,—কবশ ঐলুয (কবশ ও লুয) শূদ্র হইয়াও বৈদিক যুক্ত রচনা করিয়াছিলেন ; সুতরাং ‘বৈদিক-কালে’ জাতি ভেদ ছিল না । কিন্তু কবশ ঐলুয ‘শূদ্র হইয়াও’ বৈদিক যুক্ত রচনা করিয়াছিলেন, এতদুক্তিতেই জাতি-ভেদের আভাস পাওয়া যায় । যদি জাতি-ভেদ না থাকিত, ‘শূদ্র হইয়াও’ বৈদিক যুক্ত রচনা—কখনও স্পর্শ্যের বিষয় হইত কি ? কবশ ঐলুযের বৈদিক যুক্ত রচনা করা, অথবা তিনি শূদ্র ছিলেন কি ব্রাহ্মণ ছিলেন—তাহা নির্ণয় করা,—তাহাই তো বিচার্য্য বিষয় ! কিন্তু তাহা মানিয়া লইলেও তাঁহারই প্রসঙ্গে জাতি-ভেদের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে না কি ? দেবযানি এবং কচের প্রসঙ্গেও এই ভাব উপলব্ধি হয় । দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র কচ, সঞ্জীবনী-বিদ্যা শিক্ষার জন্ত, দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন । দেবাসুরের যুদ্ধে দেবগণ যে সকল দানবকে বিনাশ করিতেন, শুক্রাচার্য্যের মৃত-সঞ্জীবনী-বিদ্যা-প্রভাবে সেই মৃত দানবগণ পুনর্জীবন লাভ করিত । এ দিকে, অসুরগণ সমরে যে সকল অসুরগণকে বিনাশ করিত, বৃহস্পতি তাঁহাদিগকে সঞ্জীবিত করিতে পারিতেন না । ইহাতে দেবতারা, অতি-মাত্র চিন্তিত হইয়া, বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠ পুত্র কচের শরণাপন্ন হন । শুক্রাচার্য্যের আশ্রমে গমন করিয়া, সঞ্জীবনী-বিদ্যা শিখিয়া আসিয়া, বৃহস্পতি-মৃত কচ দেবগণের হিত-সাধন করিবেন,—ইহাই দেবগণের উদ্দেশ্য ছিল । শুক্রাচার্য্যের আশ্রমে সঞ্জীবনী-বিদ্যা শিক্ষার সময় শুক্রাচার্য্য-স্বনয়াদেবযানি, কচের প্রতি অতুল্য হইয়াছিলেন । সঞ্জীবনী-বিদ্যা-শিক্ষা করিয়া, গুরু-সন্নিধানে বিদায় গ্রহণ পূর্বক কচ স্বয়ং ত্রিদশালয়ে গমন করিতে অভিলাষী হন ; দেবযানি তাঁহাকে পতিষে বরণ করিতে অভিলাষ প্রকাশ করেন । কিন্তু শুক্রাচার্য্যের অনুমতি না পাইয়া, বিশেষতঃ গুরু-পুত্রী বলিয়া, কচ দেবযানিকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন । ইহাতে দেবযানি তাঁহাকে অভিসম্পাত দেন ; বলেন,—“আমার প্রার্থনা তুমি প্রত্যাখ্যান করিলে । সুতরাং আমার অভিসম্পাতে তোমার সঞ্জীবনী-বিদ্যা অসিদ্ধ হইবে ।” কচ তাহাতে উত্তর দেন,—“তুমি

কাম-বণবর্জিনী হইয়া আমাকে অভিসম্পাত করিলে ; অতএব তোমার কামনা পূর্ণ হইবে না ; কোনও ঋষি-পুত্র তোমার পাণিগ্রহণ করিবেন না । আর, তোমার শাপে আমার বিদ্যা-শিক্ষা সফল না হইলেও আমি যাহাকে এ বিদ্যা প্রদান করিব, সে অবশ্যই সাফল্য-লাভ করিবে ।” ইহার পর কচ দেবলোকে প্রস্থান করেন ; দেবযানির সহিত যযাতির পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন হয় । এই ঘটনায়ই বা আমরা কি বুঝিতে পারি ? বুঝিতে পারি না কি—ঋষি-কন্যা ঋষি-পুত্রে বিবাহিত হইবারই আকাঙ্ক্ষা করিত, এবং সেই বিবাহই শ্রেষ্ঠ-বিবাহ-মধ্যে পরিগণিত ছিল ? উচ্চবর্ণের কন্যা নীচ-বর্ণে এবং নীচ-বর্ণের কন্যা যে কখনও উচ্চ-বর্ণে সমর্পিত হইত না,—তেমন কথা আমরা বলি না । তবে উচ্চ-বর্ণের সহিত উচ্চ-বর্ণ সম্বন্ধ-রক্ষায় যে অতিমাত্রা ইচ্ছুক ছিলেন,—এই সকল ঘটনায় নিশ্চয় তাহা উপলব্ধি হয় । স্বয়ম্বর-সভায় কোনও রাজ-কন্যা যখন বরমালা গ্রহণ করিয়া পতি-মনোনয়ন করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেন, তখন ক্ষত্রিয়-সন্তানগণের মধ্য হইতেই প্রধানতঃ তিনি আপন বর মনোনীত করিতেন । সেখানেও বর্ণানুসৃত বিবাহেরই আভাস পাওয়া যায় । ব্রাহ্মণের সহিত ব্রাহ্মণ-কন্যার, ক্ষত্রিয়ের সহিত ক্ষত্রিয়-কন্যার বিবাহ-সদৃশ বিহিত হইত ;—সে তো নিয়মই ছিল । অধিকন্তু ব্রাহ্মণের মধ্যেও গোত্র-বিশেষের সহিত গোত্র-বিশেষের বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল । অতি প্রাচীন ভূখাদি-বংশেও এই প্রথার পরিচয় পাওয়া যায় । * মনু-সংহিতায় ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি চারি-বর্ণের অস্তিত্বই উল্লিখিত হইয়াছে । ভগবান মনু বলিয়াছেন,—

“ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়োবর্ণা বিজাতয়ঃ । চতুর্থ এক জাতিস্ত শূদ্রাঃ নাস্তিতু পঞ্চমঃ ॥”

অর্থাৎ,—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিন বর্ণ বিজাতি ; এবং চতুর্থ জাতি—শূদ্র । এতস্তিন্ন পঞ্চম জাতি নাই । এই চারি জাতি হইতেই অজ্ঞাতের উৎপত্তি,—মনু-বচনে তাহাই বুঝিতে পারা যায় । সময়ে সময়ে কোনও কোনও সমাজে এই জাতি-বন্ধন ছিন্ন করিবার পক্ষে যে চেষ্টা চলে নাই, তাহা নহে । ফলতঃ, পুরাতন আলোচনা করিলে, আমরা জাতি-বর্ণের অমুকুল ও প্রতিকূল—উভয় পক্ষের প্রমাণই দেখিতে পাই । আর, সে প্রমাণ দেখিয়া, প্রাচীন ভারতে জাতিভেদ-প্রথা ছিল না,—এ কথা কোনক্রমেই বলা যায় না ।

সমাজের আচার-ব্যবহার প্রভৃতির বিষয় আলোচনা করিলেও অনন্ত কালের অনন্ত তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় । অনেক পদ্ধতি এখনও যেমন প্রচলিত আছে, পূর্বেও সেইরূপ

প্রচলিত ছিল,—বুঝিতে পারি । আবার, অনেক পদ্ধতি পূর্বে প্রচলিত ছিল, এখন বিলুপ্ত হইয়াছে,—তাহারও প্রমাণাতাব নাই । সমাজ-বন্ধনের বিষয় পূর্বেই বলিয়াছি । বিবাহ-পদ্ধতির বিষয়ও পূর্বেই

আভাসে প্রকাশ করিয়াছি । কলিযুগের নিষিদ্ধ ধর্ম-কর্মের বিবরণে বুঝিতে পারা যায়,—প্রাচীন কালে কোন্ প্রথা প্রচলিত ছিল, আর কোন্ প্রথা রহিত হইয়া গিয়াছে । † মনু-সংহিতায় লিখিত বিবাহ-পদ্ধতির বিষয় আলোচনা করিলে, কত প্রকার বিবাহ

* সংস্কৃত-পুরাণ, ১০২ম, ২০১ম, ২০২ম অধ্যায় এবং স্মার্ত রঘুনন্দন-কৃত ‘উদ্বাহ-তত্ত্ব’ প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার প্রমাণ আছে ।

† কলিযুগের নিষিদ্ধ ধর্ম-সমূহের বিষয় এই গ্রন্থের সপ্তদশ পরিচ্ছেদে, ১৮৮ম—১৮৯ম পৃষ্ঠায়, উক্ত হইয়াছে ।

কি ভাবে প্রাচীন ভারতে সময় সময় প্রচলিত হইয়াছিল,—অন্যাসেই বোধগম্য হইতে পারে। * পরিশেষে স্মার্ত রঘুনন্দনাদির বিচার-বিতর্কের ফলে যে প্রকার সমাজ-বন্ধন এবং বিবাহ-পদ্ধতি প্রবর্তিত হইয়াছে,—তাহাতেও সকল বিষয়ের পূর্বানুস্মৃতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিবাহে আনন্দ, বিবাহে বাদ্য, বিবাহে বর-কন্য়ার বেশ-বিছাস প্রভৃতি পদ্ধতি অনন্ত কাল হইতেই বিদ্যমান আছে। ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলে ঋগ্বেদের চতুর্থ ঋকে বরের সুবর্ণময় অলঙ্কার পরিধানের এবং চন্দনাদি অমুল্যবস্তুর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কন্যা-বিবাহে পণ-প্রদান, বিবাহে সালঙ্কারা কন্যা দান,—স্মরণাতীত কাল হইতেই বিদ্যমান আছে। ঋগ্বেদের পঞ্চবিংশত্যধিক শততম সূক্তের প্রথম ঋক হইতে বুঝিতে পারি,—স্বনয় রাজা কক্ষীবানের সহিত আপন কন্য়ার বিবাহ দিয়াছিলেন; এবং সেই বিবাহে জামাতাকে বহু ধন-রত্ন প্রদান করিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরাণ এবং শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাই,—ঋচীক-সত্যবতীর বিবাহে, সত্যবতীর পিতার নিকট মহর্ষি ঋচীক বহু ধন-রত্ন পণ-স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অপিচ, অত্রাত্ত স্থানেও ঋষিগণের সহিত কন্য়ার বিবাহ-দান-কালে এই পণ-দান-প্রথার বাহুলা দেখিতে পাই। ইহাতে বুঝা যায়,—কৌলীভ-মর্যাদা পুরাকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। ঋগ্বেদে নবম মণ্ডলের ষট্চত্বারিংশ সূক্তে এবং দশম মণ্ডলের ঊনচত্বারিংশ সূক্তে সালঙ্কারা কন্যা-দানের উল্লেখ আছে। প্রথমোক্ত সূক্তের দ্বিতীয় ঋকে দেখিতে পাই,—‘পিতৃদত্ত অলঙ্কারে সুশোভিতা হইয়া নববধূ স্বামীর নিকট গমন করেন।’ শেষোক্ত সূক্তের চতুর্দশ ঋকে দৃষ্ট হয়,—‘জামাতাকে কন্যা-সম্প্রদানের সময় তাহাকে বসন-ভূষণে অলঙ্কৃত করিয়া সম্প্রদান করেন।’ পুরাণেও বহু স্থানে এইরূপ ভাবে কন্যা-সম্প্রদানের উল্লেখ আছে। জীলোকের অবগুণ্ঠন-প্রথা, স্বামী-স্ত্রীর একত্র যজ্ঞ সম্পাদন প্রভৃতি বিষয়ও পুরাকালে প্রচলিত ছিল।† সহমরণ-পদ্ধতি কত কাল হইতে প্রচলিত ছিল,—নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে অষ্টাদশ সূক্তের অষ্টম ঋকে সংকুসুক ঋষি পতি-বিয়োগ-বিধুরা সহগমনোচ্ছতা কোনও নারীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন,—উদীর নার্য্যভি জীবলোকমিত্যহমেতমুপশেষ এহি। হস্তাশ্রাভস্য দিধিষোষ্বেদং পত্ন্যর্জনিভ্যমভিসমুভুয়া। অর্থাৎ,—‘হে নারী! সংসারের দিকে ফিরিয়া চল; গাত্রোত্থান কর। তুমি যাহার নিকট শয়ন করিতে যাইতেছ, সে গতানু অর্থাৎ মৃত হইয়াছে। চলিয়া আইস। যিনি তোমার পাণিগ্রহণ করিয়া গর্ভাধান করিয়াছিলেন, সেই পতির পত্নী হইয়া যাহা কিছু কর্তব্য ছিল, সকলই তোমার করা হইয়াছে।’ ইহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায়,—সতী সহমৃতা হইবার জন্ত পতি-পার্শ্বে শয়না হইয়াছিলেন; আর, তাঁহাকে প্রবোধ-বাক্যে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা হইতেছিল। সাধারণতঃ টীকাকারগণ এই অর্থই সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই উক্তি কোন্ যুগে কাহার সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছিল,—তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তবে, বিভিন্ন সময়ে ভারতবর্ষে সহমরণ-প্রথা প্রচলিত ছিল,—পুরাণ ও সংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্র-গ্রন্থে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। মনু-সংহিতার সহমরণের প্রসঙ্গ দেখিতে

* মনুসংহিতার মতে বিবাহ অষ্টবিধ,—ব্রাহ্ম, দৈব, অর্ঘ্য, প্রজাপত্য, আহুত, গাকর্ষ, রাক্ষস এবং গণপত্য।

† ঋগ্বেদ, অষ্টম মণ্ডলের সপ্তদশ, বড়বিংশ এবং একত্রিংশ সূক্তে দ্রষ্টব্য।

পাই না বাটে ; মন্থ কেবল ব্রহ্মচর্যের বিষয়ই আলোচনা করিয়া গিয়াছেন সত্য ; কিন্তু বিষ্ণু-সংহিতায়, পরাশর-সংহিতায়, দক্ষ-সংহিতায়, সহমরণের উল্লেখ বিশেষ-রূপেই দেখিতে পাই। * রামায়ণে বহু সতীর সহমরণের কথা কীর্তিত আছে। দশরথের মৃত্যুর পর কৌশল্যা-দেবী সহমরণের আকাজ্জ প্রকাশ করিয়াছিলেন। অশোক-বনে শ্রীরামচন্দ্রের মায়ামুণ্ড-দর্শনে সীতাদেবী আক্ষেপ করিয়া অহুগমনের কথা কহিয়াছিলেন। বেদবতীর জননী পতির অহুগমন করিয়াছিলেন,—রামায়ণের উত্তর-কাণ্ডে তাহার পরিচয় পাই। শ্রীকৃষ্ণের আট জন প্রাণনা মহিষী সহমৃতা হইয়াছিলেন ; পাণ্ডুরাজার পরলোক-প্রাপ্তিতে মাদ্রী সহগমন করেন ; মহারাজ কংসের পত্নী সহমরণে গমন করিয়াছিলেন। শ্বায়ত্ব মন্থর বংশধর রাজচক্রবর্তী পুথুর মহিষী সাধ্বী অর্জি সহমৃতা হইয়াছিলেন। পৃথ্বীপতি সগর রাজার জননী সহমৃতা হইবার জন্ত চিতানল প্রজ্জ্বলিত করিলে, মহর্ষি ঔর্য ঠাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছিলেন। তিনি গর্ত্বতী ছিলেন বলিয়া, চিতানলে প্রবেশের অব্যবহিত পূর্বে, ঠাঁহাকে বাধা দেওয়া হইয়াছিল। সহমরণ সম্বন্ধে এইরূপ বহু দৃষ্টান্তই শাস্ত্রে দেখিতে পাই। এদিকে আবার ব্রহ্মচর্যের দৃষ্টান্তেরও অবধি নাই। স্মৃতাং বিধবার পক্ষে সহমরণ এবং ব্রহ্মচর্য উভয়ই প্রাচীন ভারতে প্রচলিত ছিল,—বুঝিতে পারা যায়। পরিশেষে, ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে, এই সহমরণ-প্রথা রহিত হইয়াছে। মৃতের অগ্নি-সংকার, অস্থি-সঞ্চয়, প্রেতকৃত্য প্রভৃতি সম্বন্ধে এখন যেরূপ পদ্ধতি-পরম্পরা বিদ্যমান, তাহাও প্রাচীন-কালের অমুসৃতি মাত্র। ফল কথা, কি সদাচার, কি কদাচার,—যে বিষয়েরই অমুসন্ধান করি না কেন, কোনও বিষয়েরই দৃষ্টান্তাভাব ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্বে দেখিতে পাওয়া যায় না। যিনি যেরূপ দৃষ্টিতে অমুসন্ধান করিবেন, তিনি সেইরূপ সামগ্রীই প্রাপ্ত হইবেন। ভারতের অনন্ত ইতিহাস এতই অভিনব সামগ্রী অঙ্কে ধারণ করিয়া আছে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির পরিচয় ভারতের পুরাতত্ত্বে স্তরে স্তরে স্পষ্ট। ভারতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কি উন্নতিই না সাধিত হইয়াছিল ! মৃতের পুনর্জীবন-লাভ—অভাবনীয়

অচিন্ত্য অসম্ভব ব্যাপার—ভারতের পুরাতত্ত্বে অনেক স্থলেই দেখিতে পাই। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য মৃত-সঞ্জীবনী বিদ্যা-প্রভাবে রণাহত মৃত

দৈত্যগণকে পুনর্জীবিত করিতেন। ইন্দ্র কর্তৃক দধীচি মুনির মস্তক-ছেদের পূর্বে ও পরে, দেববৈতথ অধিনীকুমারবর ঠাঁহার নূতন মস্তক সংযোজন করিয়া দিয়াছিলেন। কুব্জী-সবেয় সহিত যুদ্ধে সৈন্য শ্রীরাঘবজ্ঞ নিহত হইলে, মহর্ষি বান্দীকি সঞ্জীবনী-মন্ত্র প্রভাবে ঠাঁহাদিগকে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন। বক্রবাহনের সহিত যুদ্ধে অর্জুন প্রাণত্যাগ করিলে, নাগরাজ-তনয়া উলূপী সঞ্জীবনী মণি-স্পর্শে ঠাঁহার প্রাণদানে সমর্থ হইয়াছিলেন। অমুসন্ধান করিলে এতাদৃশ শত শত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতে পারে। অবিদ্বাসী বিশ্বাস করিতে না পারেন ; কিন্তু যাঁহারা শাস্ত্র-তত্ত্বে আস্থাবান, ঠাঁহারা নিশ্চয়ই এ সকল বিষয় অবিদ্বাস করিতে পারেন না। অতি-বৃদ্ধ অরাজীর্ণ অস্থি-কঙ্কাল-সার চ্যবন ঋষির নববয়স লাভ, কুম্ভাধের চক্ষু-প্রাপ্তি এবং খেল-পত্নী বিশপুলার চলচ্ছক্তি-লাভ—কোন অরণ্যভীত

* পুণ্ড্র-প্রদেশে এই প্রথার বোধগম্য পরিচ্ছেদে, ১০৭৮ পৃষ্ঠায়, এতদ্বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

কালের ঘটনা ;* কিন্তু কি অলৌকিক বিজ্ঞানোন্নতির পরিচায়ক ! চিকিৎসা-বিজ্ঞানে ভারতের আয়ুর্বেদ কি উচ্চ আসনই অধিকার করিয়া আছে ! আয়ুর্বেদ—ঋগ্বেদের উপবেদ বলিয়া অভিহিত । আয়ুর্বেদের সৃষ্টি-সম্বন্ধে পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে,—“প্রথমে প্রজাপতি ব্রহ্মা, ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব নামক চারি বেদ দর্শন করিয়া, পরে তাহার অর্থ সকল পর্যালোচনা পূর্বক আয়ুর্বেদ নামক অপর একখানি বেদের সৃষ্টি করিলেন । অনন্তর ভগবান ব্রহ্মা উক্ত পঞ্চম বেদ ভাস্কর দেবকে দান করিলে, ভাস্কর দেবও সেই আয়ুর্বেদ হইতে স্বতন্ত্র একখানি সংহিতা প্রস্তুত করিলেন । পরিশেষে ভাস্কর আপন শিষ্যগণকে নিজ-কৃত সংহিতার সহিত উক্ত আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন করাইলে, তাঁহারাও সকলে উভয় শাস্ত্র দর্শন করিয়া এক এক খানি সংহিতা প্রস্তুত করিলেন । ধমন্তরি, দিবোদাস, কাশীরাজ, অশ্বিনী-কুমারদ্বয়, নকুল, সহদেব, যমরাজ, চ্যবন, জনক, বুধ, জাবাল, জাজলি, পৈল, করণ, অগস্ত্য—এই ষোড়শ জন ভাস্করের শিষ্য ।” সুশ্রুত বলেন,—“আয়ুর্বেদ-শাস্ত্র প্রথমে ব্রহ্মার মুখ হইতে বিনির্গত হইয়াছিল । তৎপরে প্রজাপতি, তৎপরে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, তৎপরে ইন্দ্রদেব, তৎপরে ধমন্তরি, পরিশেষে সুশ্রুত এই আয়ুর্বেদ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন । জীবন (আয়ু) সুখময় করিবার জন্ত, রোগাক্রান্ত জনের রোগ-নিবারণ-উদ্দেশ্যে, সুস্থ ব্যক্তির স্বাস্থ্য-রক্ষার কামনায়, আয়ুর্বেদ-শাস্ত্র সংসারে প্রচারিত হইয়াছিল ।” আয়ুর্বেদ আট ভাগে বা তত্ত্বে বিভক্ত । সে আট তত্ত্বের নাম,—শল্য, শালাক্য, কায়চিকিৎসা, ভূতবিজ্ঞা, কোষার-ভূতা, অগদ, রসায়ন ও বাজীকরণ । এই অষ্টবিধ চিকিৎসা-তত্ত্বের মধ্যে শারীর-বিজ্ঞান, দেহ-বিজ্ঞান, শস্ত্র-বিজ্ঞান, ষাত্রী-বিজ্ঞান, চিকিৎসা-বিজ্ঞান, ভেষজ-বিজ্ঞান এবং রোগ-নিদান—সকল বিষয়ই বিস্তৃত আছে । কেবল মনুষ্যের চিকিৎসা বলিয়া নহে ; পখাদির চিকিৎসা-প্রণালীও আয়ুর্বেদে বর্ণিত রহিয়াছে । চরক, সুশ্রুত, ভাবমিশ্র, বাগ্‌ভট্ট প্রভৃতি আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থ-রত্ন অমূল্যলন করিলে, সর্ববিধ ব্যাধি-বিপত্তির ঐতিকারোপায় নির্দ্বন্দ্বিত হইতে পারে । কালবশে আয়ুর্বেদোক্ত চিকিৎসা-পদ্ধতি বহু অংশে বহুল পরিমাণে বিলুপ্ত হইয়াছে । কক্ষীবানের চুহিতা ব্রহ্মবাদিনী ঘোষা কুষ্ঠ-রোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন ; রোগাক্রান্ত হওয়ায় তাঁহার বিবাহ হয় নাই । অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁহাকে রোগ-মুক্ত করায়, তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল । অশিষ্য কথ ঋষির অন্ধতা দূর করিয়াছিলেন । নিষধ-পুত্র বধির হইয়াছিলেন ; অশিষ্যের আনুকূল্যে তিনি শ্রবণ-শক্তি প্রাপ্ত হন ।† বক্রিমতীর স্বামী নপুংসক ছিলেন ; অশিষ্য তাঁহার রোগমুক্ত করেন । ঋগ্বেদেই এইরূপ অসংখ্য প্রকার রোগ-মুক্তির বিবরণ দেখিতে পাই । পুরাণাদিতে আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রের উপযোগিতার কত দৃষ্টান্তই বিস্তারিত আছে । শক্তিশৈল্যহত লক্ষণ ঔষধের ও চিকিৎসার গুণে নূতন জীবন লাভ করিয়াছিলেন । তক্ষক-দংশনে পরীক্ষিতের মৃত্যুর পূর্বে বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণ-বেণী ধমন্তরি সর্প-বিষ-নাশের যে অদ্ভুত প্রক্রিয়া প্রদর্শন করিয়াছিলেন,—

* চ্যবন ঋষির যৌবন প্রাপ্তির বিষয় এই গ্রন্থের ৩৪৮ন পৃষ্ঠা এবং ঋত্নাবের অন্ধতা নিবারণের বিষয় এবং খেলপত্নী বিশপ্লার লৌহের পা নির্দ্বাণের বিষয় এই গ্রন্থের ৪২৬ন পৃষ্ঠায় উল্লিখিত ।

† ঋগ্বেদের প্রথম মন্ত্রের ১১৬ন, ১১৭ন, এবং ১১৮ন সূক্তে উল্লিখিত ।

সর্পদষ্ট, বিষজর্জরিত, ভয়ীভূত রূপকে যেরূপে শাখাপল্লবসহ পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন,— তাহার তুলনা আছে কি? এইরূপ যতই আলোচনা করা যায়, প্রাচীন ভারতে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সর্বাধিকার-সম্পন্নতার পরিচয় পাইয়া, ততই বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইতে হয়। পরমায়ু বৃদ্ধি বা যোগ-প্রভাবে দীর্ঘজীবন-লাভ—প্রাচীন ভারতেই দেখিতে পাই।

কেবল কি এক দিকে? যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই প্রাচীন ভারতের গৌরব-গরিমার নিদর্শন বিদ্যমান। অধুনা অনেকানেক নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া অনেকে যশোভাজন হইতেছেন; পৃথিবীতে তাঁহাদের যশের

বিবিধ বিষয়ে
অভিজ্ঞতা।

অবধি থাকিতেছে না। কিন্তু একটু অহুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাই,—

সেই সকল তত্ত্বে ভারতবর্ষ কোন অনন্ত কাল হইতেই অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন! দৃষ্টান্ত কত উল্লেখ করিব? শরীরের রক্ত-সঞ্চালন-ক্রিয়া পাশ্চাত্য ইউরোপে সে দিন মাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে; কিন্তু ভারতের আয়ুর্বেদ কোন্ দূর অতীত কালে সে তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন! পৃথিবীর গতি ও গোলকের বিষয়—পাশ্চাত্য জগতে কয় দিনই বা উপলব্ধি হইয়াছে? কিন্তু প্রাচীন ভারতে কত পূর্বে সে তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছিল,—জ্যোতিষে পুরাণেতিহাসে তাহার সহস্র সহস্র প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে। সূর্য্যের উত্তরাংশ ও দক্ষিণাংশ, সূর্য্য-রশ্মি দ্বারা চন্দ্রের আলোক প্রাপ্তি,—বেদ-পুরাণ সর্বত্রই এ তত্ত্ব বিশদীকৃত! আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, যে দৃষ্টিতে দেখিবে, দৃষ্টি-শক্তির তারতম্যানুসারে ভারতে সকল দৃষ্টই দেখিতে পাইবে। যদি দেখিতে চাও—ভারতে কিছুই ছিল না, ভারতের সকলই ভ্রান্তিপূর্ণ; দৃষ্টি-শক্তি সেই ভাবেই পরিচালিত হইবে। আবার যদি তত্ত্বানুসন্ধিৎসু হইয়া, সত্য আবিষ্কারের জন্ত ব্যাকুল হইয়া, অহুসন্ধান কর; তদনুরূপ দৃষ্টই দেখিতে পাইবে;—তদনুরূপ স্মৃতিই লাভ করিবে। পৃথিবীর গতি ও গোলকের একমাত্র দৃষ্টান্তেই আমাদের এ সিদ্ধান্তের সার্থকতা প্রতিপন্ন হইতে পারে। বেদ, পুরাণ, প্রভৃতি শাস্ত্র-গ্রন্থ আলোচনায়, কেহ দেখিয়াছেন—পৃথিবী গোল, কেহ দেখিয়াছেন,—পৃথিবী চতুর্দশ, কেহ দেখিয়াছেন—পৃথিবী গতিশীল, কেহ দেখিয়াছেন—সূর্য্যই ঘুরিতেছে। শাস্ত্রের সন্ধ্যাধ্যা বা অপস্যাধ্যা অনুসারে, অথবা অতিজ্ঞ-অনতিজ্ঞ দ্বিবিধ ব্যক্তির বাক্য-পরম্পরায় নির্ভর-পরায়ণ হওয়ায় এরূপ ঘটিয়াছে। ফলতঃ, পৃথিবীর গতি ও গোলকের বিষয় আর্য্য-হিন্দুগণের যে অবিদিত ছিল না, তাহা বলাই বাহুল্য। ঋগ্বেদে দেখিতে পাই,—“অজ্রাহ গোরমন্মতত্বষ্টুর পীচাং। ইথা চন্দ্রমসো গৃহে॥” যাকের নিরুক্ত-মতানুসারে ইহার অর্থ হয়,—‘সূর্য্য-কিরণ চন্দ্রে প্রতিকলিত হইয়াই চন্দ্রের আলোক হয়।’ এই রশ্মিপাত হইতেই চন্দ্র-গ্রহণের প্রসঙ্গ আসিতে পারে। ‘পৃথিবীর ছায়াপাত দ্বারা সূর্য্য-কিরণের অবরোধকে চন্দ্র-গ্রহণ বলে। গ্রহণে চন্দ্রের উপরে পৃথিবীর যে ছায়া পতিত হয়, তাহা নিয়তই গোলাকার দেখায়। ধরিয়া গোলাকার না হইলে, তাহার ছায়া নিয়তই গোলাকার দৃষ্ট হইত না।’ সূর্য্য যে গতিশীল নহেন, ঐশ্বর্য্যগবতের একটা শ্লোকেও তাহার আভাস পাওয়া যায়। সূর্য্যের ‘স্বর্গ’ নাম সম্বন্ধে সেখানে উক্ত হইয়াছে,—“সুতেহণ্ড এষ এতদ্ভিন্ন যদছুত ততো স্বর্গতঃ”

ইতি ব্যাপদেশঃ ।” এখানে ‘মৃত’ শব্দে অচেতন অর্থাৎ গতিহীনতাই উপলব্ধি হয় । জ্যোতিষ-গ্রন্থে পৃথিবীর গোলত্ব-বিষয়ে জ্যোতির্বিদগণ কি সুন্দর মীমাংসাই করিয়া রাখিয়াছেন ! প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ ভাস্করাচার্য্য তাঁহার “সিদ্ধান্ত-শিরোমণি” এবং “গোলাধ্যায়” নামক গ্রন্থ-দ্বয়ে এ বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা করিয়াছেন । তিনি বলেন,— “পৃথিবীর আকার কদম্ব-পুষ্পের জায় । কদম্ব-পুষ্প যেমন কেশর-সমূহে আবৃত, ধরা-মণ্ডল সেইরূপ বন-পর্বত-নগরাদিতে বেষ্টিত ।” * তিনি আরও বলেন,— “আতপস্থ ঘট যেরূপ সূর্য্য-কিরণ দ্বারা এক দিকে উজ্জ্বল এবং নিজের ছায়া দ্বারা অপর দিকে সুন্দরী স্ত্রীর কেশ-কলাপের শ্রামল শোভা ধারণ করে, সেইরূপ অমৃত-পিণ্ড চন্দ্রের যে দিক সূর্য্যের অভিমুখে থাকে, সেই দিক চন্দ্রিকার দ্বারা সমুজ্জ্বল এবং তদ্বিপরীত দিক নিজের ছায়ায় মলিন হয় । † পৃথিবী যদি দর্পণোদরের ন্যায় সমতল হইত, তবে তদুপরি বহু উচ্চে ভ্রমণশীল সূর্য্য নিরন্তর মানবগণের দৃষ্টিগোচর হইত । অর্থাৎ, কখনই রাত্রি হইত না ; গোল বলিয়াই দিবারাত্রি হইয়া থাকে ।” ‡ ‘সূর্য্য-সিদ্ধান্ত’ নামক প্রাচীনতম জ্যোতিষ-গ্রন্থে লিখিত আছে,— “বিপুল অবনী-মণ্ডল সম্বন্ধে মানবগণ অতি ক্ষুদ্র ; এই কারণ বশতঃ, বাস্তবিক পৃথিবী গোলাকার হইলেও, তাহারা স্ব স্ব স্থান হইতে ইহাকে চক্রাকার সমতল ক্ষেত্রের জায় দেখিতে পায় ।” § বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ আর্য্য-ভট্টের ‘আর্য্য-সিদ্ধান্ত’ গ্রন্থে পৃথিবীর গতি বিষয়ে অতি সুন্দর একটা উপমা দৃষ্ট হয় । সূর্য্য অথবা অচলা রাশিচক্র পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতেছেন,—সাধারণ দৃষ্টিতে প্রতীত হইতে পারে । কিন্তু একরূপ প্রতীতি জন্মিবার কারণ সম্বন্ধে আর্য্যভট্ট বলিয়াছেন,— “অমুলোম গতি (স্রোতের অনুকূলগামী) জলযানস্থ ব্যক্তি যেরূপ নদী-তীর প্রভৃতি অচল পদার্থকে বিলোমগামী দেখিতে পায়, লঙ্কাতে অর্থাৎ বিষ্ণুবহুত্ব প্রদেশে অচল নক্ষত্র সকলকেও সেইরূপ সম-পশ্চিমাভিমুখে গতিশীল বোধ হয় । ¶ তাৎপর্য্যার্থ এই,—পূর্বাভিমুখে পৃথিবীর পরিভ্রমণ নিমিত্ত অচল রাশিচক্র যেন পশ্চিমাভিমুখে যাইতেছে, জনগণ এইরূপ মনে করে । যাঁহারা দ্রুতগামী জলযানে বা স্থলযানে গতিবিধি করিয়াছেন, তাঁহারা এই বিষয়টী অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন । লঙ্কা-প্রদেশের উল্লেখ করিবার তাৎপর্য্য এই যে, উক্ত প্রদেশ পৃথিবীর মধ্যস্থল বলিয়া তথা হইতে রাশিচক্র সমান-ভাবে দেখা যায় । লঙ্কা বা বিষ্ণুবৎ-প্রদেশের দক্ষিণ-উত্তরে যত দূর অগ্রসর হওয়া যায়, রাশিচক্র ততই তীর্ঘ্যাক্-ভাবে অবনত দৃষ্ট হয় ।” †† পৃথিবী যদি গতিশীল হন, তবে তদন্তর্গত ভ্রমাদি ইত্যন্তঃ বিক্লিষ্ট হয় না কেন ?—এবস্থিৎ প্রশ্নের উত্তরে ভাস্করাচার্য্য মাধ্যাকর্ষণ

* সঙ্গতঃ পর্ব্বতারামগ্রামটৈচতুর্ভয়ৈশ্চিভঃ । কদম্বকুংহগ্রাঃ কেশরপ্রসংরিব ॥—

† তরিণাকরণসঙ্গাদেবপীণুব পিণ্ডো দিনকরদিশি চন্দ্রশ্চন্দ্রিকাভিচক্রাভি ।

‡ দ্রুতরদিশি বালাকুন্তলশ্রামলস্ত্রীর্ঘটাইব নিজমুষ্টিজ্জায়য়েবাতপস্থঃ ।

§ যদি সমা মুহুরোদরদগ্নিভা ভগবতী ধরণী তরণিঃ ক্ষিভেঃ ।

উপরি দ্রুগতোহপি পরিভ্রমণ কিমু নরৈরমরৈরিব দেক্ষ্যতে ।

¶ অলংকারভয়া লোকঃ স্বহান্যং সঙ্গতোমুখং । পশ্যন্তি ব্রহ্মাণ্যেতাং চক্রাকারং বহুক্ষণং ॥

†† অমুলোমগতিনে বীজঃ পশ্চত্যাচলং বিলোমগং যথং । অচলানি তানি তথং সমপশ্চিমগানি লঙ্কারায় ॥

শক্তির বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,-‘পৃথিবীর আকর্ষণ-শক্তি আছে। সেই শক্তি-বলে শূন্যমার্গে ক্ষিপ্ত গুরু বস্তু ইহার অভিমুখে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। বাস্তবিক তাহাকেই পতনশীল বলিয়া বোধ হয়। পৃথ্বী স্বয়ং চতুঃপার্শ্বেই সমান আকাশের কোথায় পড়িবে? * তাৎপর্যার্থ এই যে, বিশাল আকাশের বাস্তবিক উদ্ধাধঃ নাই। আমরা বাহ্যকে উচ্চ-নীচ বলি, তাহা কল্পিত মাত্র। আমরা স্বভাবতঃ দৃশ্যমান হইলে, যে দিক মস্তক, সেই দিক্কে উচ্চ; এবং যে দিকে পাদ, সেই দিক্কে নীচ বলিয়া থাকি। গোলাকার পৃথিবীর সর্বত্রই বসতি আছে। সকল স্থানের মনুষ্যই এইরূপ বলিলে, সর্বত্র সমান আকাশের কোথায়ই বা উচ্চ-নীচ থাকে, আর ধরিত্রীই বা কোথায় পতিত হয়?’ † সার আইজাক নিউটন ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া পৃথিবী-পরিচিত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কত পূর্বে ভারতবর্ষে সে তত্ত্ব অবগত ছিলেন,—ইহাতে তাহা প্রতিপন্ন হয় না কি? অনুসন্ধান করিলে, এইরূপ আরও কত তত্ত্বই পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ণ, দিন-পরিমাণ, বৎসর পরিমাণ,—প্রাচীন ভারতবর্ষে, কোন্ বিষয় আর্য্য-হিন্দু-গণের অপরিজ্ঞাত ছিল?—কোন্ বিষয়ে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা ছিল না? বেদাদি শাস্ত্র-গ্রন্থ হইতেও এতবিষয়ক প্রমাণ প্রদর্শিত হইতে পারে। কিন্তু সেই দূর অতীতের প্রসঙ্গে উপেক্ষা করিয়া যদি কেহ আধুনিক মত-পরম্পরারও আলোচনা করেন, তাহা হইলেই বা কি মনে হয়? পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের গণনা অনুসারেই নির্দেশ হইয়াছে,—ভাস্করাচার্য্য ১০৩৬ শকে জন্মগ্রহণ করেন। সেই ভাস্করাচার্য্যের গ্রন্থে মাধ্যাকর্ষণের উল্লেখ, সার আইজাক নিউটনের অন্ততঃ ৫৭২ বৎসর পূর্বে মাধ্যাকর্ষণ বিষয়ে ভারতের অভিজ্ঞতা ছিল,—তাহা তো কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না!

কোন্ বিষয়ে আর্য্য হিন্দুগণ অনভিজ্ঞ ছিলেন? পৃথিবীর কোন্ তথ্য তাঁহাদের অপরিজ্ঞাত ছিল? পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কলম্বাস কর্তৃক আমেরিকা আবিষ্কৃত হয়।

সর্বত্র
গতিবিধি। সেই উপলক্ষে তাঁহার যশঃ-গৌরবের অবধি নাই। কিন্তু ভারতবর্ষ কত পূর্বে সেই আমেরিকার বিষয় অবগত ছিলেন, আর্য্য-হিন্দুগণ কোন্

অনন্তকাল হইতে পৃথিবীর প্রতি দেশ-মহাদেশের সংবাদ রাখিতেন,—

তাহা স্মরণ করিলেও বিন্দুসাবিষ্ট হইতে হয়। প্রাচীন আর্য্য-হিন্দুগণ আমেরিকা মহাদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, সর্বদা তথায় গতিবিধি করিতেন,—পুরাণাদি শাস্ত্র-গ্রন্থে তাহার ভূরোভূয়ঃ প্রমাণ আছে। অনুসন্ধিৎসু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও অনেকেই তাহা অস্বীকার করিতে পারেন নাই। ইউরোপীয় জাতিরা যখন আমেরিকায় প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেন, তাঁহারা দেখিয়াছিলেন,—আমেরিকায় তখনও প্রাচীন হিন্দুর আচার-

* আকৃষ্টশক্তি মহী তরা বৎ বহুং গুরু বাতিবুৎ যশস্ত্যা।

আকৃষ্ট্যন্তে ভৎ পতন্তীভ ভাতি সবে সমস্তাং হ পতন্তিঃ বে।

† পণ্ডিত গোবিন্দ মোহন বিদ্যাবিনোদ বারিষি মহাশয়ের “স্বপ্নমী” গ্রন্থে পৃথিবীর আকার, গতি এবং মাধ্যাকর্ষণ প্রভৃতি-বিষয়ে আর্য্য-হিন্দুগণের অভিজ্ঞতার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদর্শিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এতৎ-প্রসঙ্গে আমরা তাঁহার বহু মত গ্রহণ করিয়াছি।

ব্যবহার প্রচলিত ছিল । কলম্বাস কর্তৃক আমেরিকা আবিষ্কৃত হওয়ার বহু পূর্বে, ভারতের সহিত আমেরিকার সম্বন্ধ বন্ধন ছিল হইয়াছিল বলিয়া, প্রাচীন ভারতের আচার-পদ্ধতি তখন সেখানে বিকৃত হইয়া পড়িয়াছিল বটে ; কিন্তু সে পরিচয়-চিহ্ন যে একেবারে লোপ পায় নাই, তাহা নিঃসন্দেহ । জর্জবীর প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও পরিব্রাজক ব্যারন হাম্বোল্ট বর্ণন করিয়া গিয়াছেন,—“আমেরিকায় এখনও হিন্দুগণের পরিচয়-চিহ্ন বিদ্যমান ।” পেরু-দেশের অধিবাসিগণের আচার-ব্যবহারের বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া মিঃ পোকক বলিয়াছেন,—“পেরুবাসীদিগের পিতৃ-পুরুষগণ এক সময়ে ভারতবাসিগণের সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত ছিলেন ।” প্রাচীন আমেরিকার স্থাপত্য-কার্য্যে ভারতীয় হিন্দুগণের স্থপতি-বিভার অঙ্গুরণ দৃষ্ট হয় । মিঃ হার্ডি বলেন,—“মধ্য আমেরিকার চিচেনে যে প্রাচীন অট্টালিকা-সমূহ দেখিতে পাই, ভারতবর্ষের মন্দির-চূড়ার সহিত তাহার সাদৃশ্য বিদ্যমান ।” মিঃ স্কয়ার বলেন,—“দক্ষিণ-ভারতে এবং ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে যে সকল বৌদ্ধ-মন্দির দৃষ্ট হয়, মধ্য আমেরিকার বহু অট্টালিকা, গঠনে এবং সাজ-সরঞ্জামে, তাহারই অঙ্গুরণে নিম্নিত । এসিয়াটিক সোসাইটীর সুবিজ্ঞ সদস্যগণ এবং হিন্দুদিগের ধর্ম ও পুরাতত্ত্ব অঙ্গুরণে পণ্ডিতগণ এই কথাই বলিয়া গিয়াছেন ।” ডাক্তার জারফিউ বলেন,—“প্রাচীন মন্দির-সমূহের প্রতি, প্রাচীন দুর্গাদির প্রতি, প্রাচীন সেতু ও জলাশয়াদির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, আর্য্য-হিন্দুগণের অঙ্গুরণেই তৎ-সমুদায় নিম্নিত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারা যায় ।” ভারতীয় দেব-দেবীর অঙ্গুরণে আমেরিকায় দেব-দেবীর মূর্তি প্রস্তুত হইত এবং সেই সকল দেব-দেবীর পূজা-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল,—প্রেক্ট-প্রণীত “মেক্সিকো-বিজয়” গ্রন্থে এবং হেল্ল-প্রণীত “স্পেনীয়গণ কর্তৃক আমেরিকা-অধিকার” গ্রন্থে তাহার ভুরি-ভুরি নিদর্শন দেখিতে পাই । আমেরিকার পৌরাণিক-তত্ত্বানুসন্ধান উপলব্ধি হয়, তৎ-সমুদায়ে ভারতবর্ষেরই প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত । ভারতবর্ষের জায় ধরিত্রী-মাতা বা পৃথ্বী-মাতার পূজা আমেরিকায় প্রচলিত ছিল । ভারতবর্ষে গোকুলে শ্রীকৃষ্ণের চরণ-বমলে, লঙ্কাদ্বীপে বুদ্ধ-দেবের পদচিহ্নে, গয়াধামে গয়াসুরের পাদ-পদ্মে, পূজা-প্রদানের ব্যবস্থা আছে । মেক্সিকো-দেশে ‘কোয়েটজাল কোটল’ নামক দেবতার পদ-চিহ্ন পূজিত হইত । জানি না—তিনি কোন্ দেবতা, ভাষান্তরে কি নামে অভিহিত হইয়া আছেন । ভারতবর্ষের জায় মেক্সিকো-দেশে সূর্য্য-গ্রহণের ও চন্দ্র-গ্রহণের সময় উৎসবাদি হইত । এদেশে যেরূপ রাহু-কর্তৃক সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রাসের কিম্বদন্তী আছে, সে দেশে তদ্রূপ ‘মাল্য’-কর্তৃক সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রাসের কিম্বদন্তী প্রচলিত । মেক্সিকো দেশে হস্তিযুগ-সম্বন্ধিত এক নর-দেবতার পূজা-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল । ব্যারন হাম্বোল্ট বলেন,—“ঐ দেবতার সহিত হিন্দুদিগের গণ-দেবতার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য লক্ষিত হয় ।” * ভারতের ‘দশহরা’-উৎসবের জায় মেক্সিকো-দেশে বৎসর বৎসর রাম-সীতার নামে উৎসব হইত । স্যার উইলিয়ম জোন্স বলেন,—“ইহা প্রসিদ্ধ ঘটনা যে, পেরু-দেশের ইন্সেসগণ আপনাদিগকে সূর্য্য-বংশাবতঃ

* Baron Humboldt remarks on the Mexican deity :—“It presents some remarkable and apparently not accidental resemblance with the Hindu Ganesha” :—*Hindu Superiority*.

বলিয়া পরিচয় দিতে গৌরব বোধ করে, এবং তাহাদের প্রধান পর্কোৎসব—রাম-সীতার পর্কোৎসব। ইহা হইতেই বুঝা যায়, যে হিন্দু-জাতি এসিয়ার দূর-দূরান্তরে গমন করিয়া রাম-সীতার ইতিহাস এবং হিন্দুদিগের আচার-পদ্ধতি প্রবর্তন করিয়াছিল, সেই জাতিই দক্ষিণ আমেরিকায় গমন করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল।* এইরূপ আরও কত সাদৃশ্যই দেখিতে পাওয়া যায়। যুগান্তর ও প্রলয়-কাহিনী, কুর্গাবতার বা কুর্গ-পৃষ্ঠে পৃথিবী ধারণ, মনসা ও নাগ-পূজা প্রভৃতির পুরা-কাহিনীর সহিত ভারতবর্ষ ও আমেরিকায় সাদৃশ্য ছিল, পরিচয় পাওয়া যায়। তত্রতা অনেক দেব-দেবীর মূর্তিতে কালী, তারা, শিব প্রভৃতির প্রতিচ্ছবি প্রকটিত। পুরাকালে যব-দ্বীপ, বলি-দ্বীপ, বোর্নিয়ো প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া হিন্দুগণ আমেরিকার পথে গতিবিধি করিতেন,—এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। স্থলপথেও তখন আমেরিকায় গতিবিধি করিবার সুবিধা ছিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ভূ-তত্ত্ব আলোচনার ফলে প্রতিপন্ন হইয়াছে,—বর্তমান বেরিং-প্রণালী পূর্বে বিद्यমান ছিল না। তখন রুবিয়ার উত্তর-পূর্ব প্রান্তস্থিত প্রদেশের সহিত উত্তর আমেরিকার বর্তমান আলাস্কা-প্রদেশের সংযোগ ছিল; চীন, মঙ্গোলিয়া, সাইবিরিয়া প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া ভারত-বাসিগণ আমেরিকায় গতিবিধি করিতেন। বৌদ্ধ-ধর্মের প্রাচুর্য্য-কালে ভারত হইতে বৌদ্ধ-ধর্মযাজকগণ আমেরিকায় গমনাগমন করিয়াছিলেন,—চীন-দেশের ইতিহাসে তাহার পরিচয় আছে। মেক্সিকোর প্রাচীন ইতিহাসে দেখিতে পাই,—সেই দেশে সভ্যতা-স্রোত উত্তর দিক হইতে প্রবাহিত হইয়াছিল। তাগাতেও প্রতীত হয়,—বর্তমান আলাস্কার পথেই হিন্দুগণ এক সময়ে আমেরিকায় যাতায়াত করিয়াছিলেন। প্রাচীন মিশরে অর্থাৎ বর্তমান আফ্রিকায় আদি-হিন্দুগণই যে প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেন,—তাহার আভাস আমরা পূর্বেই প্রদান করিয়াছি।† কতকগুলি আচার-ভ্রষ্ট কৃত্রিয় সগর রাজা কর্তৃক সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন। তাঁহারা শক, যবন, পারদ প্রভৃতি নামে অভিহিত হন। ভারতবর্ষ পরিত্যাগে সেই কৃত্রিয়-নৃপতিগণ, দিগ্দিগন্তে গমন করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন,—সেই জাতি-ভ্রষ্ট কৃত্রিয়গণের পারদ কর্তৃক পারস্ত-দেশের নামকরণ হইয়াছিল। কেহ কেহ আবার বলেন,—পরশুরামের অমূল্যবর্ণ পারস্ত দেশে প্রবেশ করিয়া সেই দেশ অধিকার করিয়াছিলেন; আর, পরশুরামের নাম হইতেই পারস্ত দেশের নামকরণ হইয়াছিল। খ্রীস্টপূর্বের কোনও বংশধর কর্তৃক রোম রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; মগধ-রাজ্যগণের আধিপত্যে গ্রীস-রাজ্যের উৎপত্তি;—অনেক পাশ্চাত্য-পণ্ডিতের গবেষণায়ই তাহা স্থির হইতেছে। প্রাচীন গ্রীস—যবন-রাজ্য বলিয়া অভিহিত হইত, তাহার বহু নিদর্শন আছে। জর্জর্গদেশে মনু-বংশধরগণ কর্তৃক উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং ভূকিছান ও উত্তর এসিয়ায় হিন্দুগণ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন,—

* Sir William Jones says :—"It is very remarkable that Peruvians, whose Inces boasted of the same (solar) descent, styled their greatest festival Ram Sitva ; whence we may suppose that South America was peopled by the same race who imported into the farthest parts of Asia the rites and the fabulous history of Ram."—*Ibid.*

† এই প্রস্তাব সপ্তম পরিচ্ছেদ, ৩৭৫ম ও ৩৬৭ম পৃষ্ঠা।

তাহারও নানা প্রমাণ পাওয়া যায়। চীনদেশে ভারতের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য আর আয়াস স্বীকারের আবশ্যক হয় না। চীনের ধর্ম-তত্ত্ব, চীনের জাতি-তত্ত্ব প্রভৃতি অল্পসন্ধান করিলে, এ বিষয় অনায়াসেই প্রতিপন্ন হইতে পারে। চীনেরা এখনও হিন্দুদিগের বংশ-সম্ভূত বলিয়াই পরিচয় দিয়া থাকে। সুদূর ইংলণ্ডও এক সময়ে আৰ্য্য-হিন্দুগণের অধিকারভুক্ত ছিল,—পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অনেকেই এখন তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। তাহারা বলেন,—প্রাচীন ব্রিটেনের ‘ক্রইদ’ পুরোহিতগণের উৎপত্তির মূলে ব্রাহ্মণগণের বা বৌদ্ধ-ধর্ম-যাজকগণের প্রাণাচ্ছ নিশ্চয়ই বিদ্যমান ছিল। জম্বু, প্লক্ষ, পুষ্কর, ক্রৌঞ্চ, শক, শাল্মলী, কুণ্ঠ—এই সপ্ত-দ্বীপের প্রসঙ্গ আলোচনা করিয়া, কর্ণেল উইলসন উইলসন প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহাতে সঙ্গায় পৃথিবী ভারতবর্ষের অধিকার-ভুক্ত ছিল—অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। শক, যবন, কদোজ, পারদ, পুরুব, হুণ প্রভৃতি দেশের তত্ত্ব আলোচনা করিলেও অনেক নূতন নূতন তথ্য অবগত হইতে পারি। গান্ধার বলিতে বর্তমান কান্দাহার; কদোজ বলিতে কাশ্মির; পারদ বা পারদ বলিতে পারস্ত, যবন বলিতে গ্রীস, দরদ বলিতে চীন বা চীন, খম্ব বলিতে পূর্ব ইউরোপ বুঝাইয়া থাকে। ফলতঃ, কালবশে নাম-পরিবর্তন হইয়াছে মাত্র; আর, সেই নাম পরিবর্তন-হেতু অনেক তথ্য উদ্ঘাটন করিতে আমাদের আয়াস স্বীকার করিতে হয়; নচেৎ, একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে, বুঝিতে কিছুই বাকি থাকে না। পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে—দূর দেশ সমূহে—গতি বিধির জন্ত যানাদিরও তখন অসম্ভাব ছিল না। প্রাচীন কালে যে দ্রুতগামী রথ ও পোত প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে বর্তমানের কালের বাষ্পীয় বা তাড়িত-শক্তি-সঞ্চালিত অর্ধবপোত, বায়ুযান, বোমযান প্রভৃতির অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় না কি? পুরাণেতিহাসে দেখিতে পাই,—কেহ দণ্ডেচের মধ্যে সহস্র যোজন পথ অতিক্রম করিয়া আসিতেছেন, কেহ আকাশ-পথে বিচরণ করিতেছেন, কেহ সমুদ্র-পথে এক দেশ হইতে অন্য দেশে চলিয়াছেন। বেদে ও পুরাণে—সর্বত্রই ইহার ভূরি ভুরি দৃষ্টান্ত আছে। অধুনা কোনও কোনও পণ্ডিত বৈদিক সূক্ত প্রভৃতির ব্যাখ্যা হইতে পুরাকালে বাষ্পীয় পোত, বাষ্পীয় রথ এবং তাড়িত-সঞ্চালিত যানাদির বিস্তারিত প্রমাণ করিতেছেন। * এমন কি, এখনকার স্তায় তখন লৌহ রেল প্রতিষ্ঠিত ছিল, এবং তাহার উপর দিয়া রেলগাড়ী চলিত,—

* বেদ মন্ত্র হইতে বাষ্পীয় রথ, বাষ্পীয় পোত এবং বোম-যান, বায়ু-যান প্রভৃতির অস্তিত্ব কিরূপ ভাবে উপলব্ধি হইতেছে, তাহার একটী বৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতেছি। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে ৩৭ সূক্তের প্রথম পদ,—

“ক্রীলং বঃ শর্ক্বোয়াক্তম্নরূপং রথে শুভং”। কথা অতি প্রায়শ্চিত্ত।

এই ঋকের ‘অনরূপং’ শব্দে কেহ ‘শর্ক্বোয়াক্ত’, কেহ বা ‘অধরহিত’ অর্থ উপলব্ধি করিয়াছেন। ‘শর্ক্বোয়াক্ত’ শব্দে কেহ ‘মন্ত্রগণের উদ্দেশ্য’, এবং কেহ বা ‘মন্ত্র-মন্ত’ অর্থাৎ ‘বাস্তবিক বলপ্রভাবে’ অর্থ গ্রহণ করিয়া লইয়াছেন। প্রথমোক্ত মতে, ঋকের অর্থ,—“হে কথগোত্রোৎপন্ন মহর্ষিগণ, তোমরা আপনাদিগের নিষিদ্ধ বিহরণ-শীল, শর্ক্বোয়াক্ত রথে শোভমান অবল মন্ত্রগণকে সর্বতোভাবে তব কর।” শেষোক্ত মতে,—“হে কথগোত্রোৎপন্ন মহর্ষিগণ। যে প্রকারে বাষ্পবল-প্রভাবে অধরহিত রথ পরিচালিত হইতে পারে, আমাদেরকে তাহা শিক্ষা দিউন।” ইত্যাদি।

এবং প্রমাণ-পরস্পরা প্রদর্শন করিতেও তাহারা ক্রটি করিতেছেন না। যাহা হউক, প্রাচীন ভারতে দ্রুতগতি-বিশিষ্ট যানাদির যে অভাব ছিল না, এবং সেই সকল যানের সাহায্যে প্রাচীন আর্য্যগণ যথেষ্ট-ভাবে স্থল-পথে, জল-পথে ও ব্যোম-পথে বিচরণ করিতেন, তাহাতে কোনই সংশয় নাই।

সকল দিকেই ভারতবর্ষের মৌলিকত্ব! স্থাপত্যে এখন পাশ্চাত্য ইউরোপ গৌরবের উচ্চ চূড়ায় অধিষ্ঠিত। কিন্তু প্রাচীন ভারত স্থপতি-বিদ্যায় পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন,—তাহারও সহস্র নিদর্শন বিদ্যমান। ভারতবর্ষ হইতে মিশরে, সিবির। গ্রীসে, সে প্রভাব বিস্তৃত হয়। প্রাচীন ভারতের—সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর যুগত্রয়ের—অট্টালিকাদির পরিচয়-চিহ্ন এখন হয় তো অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যাইবে না; কাল-প্রবাহে সে চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়াছে—প্রতীত হইবে। সহস্র দ্বার ও সহস্র স্তম্ভযুক্ত অট্টালিকার, লৌহ-নির্মিত নগরের এবং প্রস্তর-নির্মিত পুরীর বিষয় ঋগ্বেদেই লিখিত আছে। দ্বিতীয় মণ্ডলের একচত্বারিংশ সূক্তের পঞ্চম ঋকে এবং সপ্তম মণ্ডলের অষ্টাশীতিতম সূক্তের পঞ্চম ঋকে সহস্র স্তম্ভ-বিশিষ্ট অট্টালিকার এবং সপ্তম মণ্ডলের তৃতীয় ও পঞ্চমবর্তিতম সূক্তে লৌহ-নির্মিত নগরের এবং চতুর্থ মণ্ডলের ত্রিংশ সূক্তে প্রস্তর-নির্মিত পুরীর পরিচয় পাওয়া যায়। বৈদিক সূক্ত-সমূহে যে সকল নগর, গ্রাম ও অট্টালিকার পরিচয় পাই, তাহার তথ্যানুসন্ধানে প্রয়াস পাওয়া এখন অবশ্য বিড়ম্বনা মাত্র। কিন্তু তাহা হইলেও আর্য্য-হিন্দুগণ পর্ব্বত-গাত্রে, গিরি-গুহায় যে সকল স্থপতি-বিদ্যার নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন, কোনও কালে তাহা বিলুপ্ত হইবে কি? প্রাচীন-কালের গ্রাম, নগর বা অট্টালিকার নিদর্শন না পাই; কিন্তু যে গুহা-মন্দিরগুলি আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার সহিত তুলনা করিলে পৃথিবীর সকল দেশের স্থাপত্যকে নতমুখ হইতে হয় না কি? দৃষ্টান্ত-স্থলে, ইলোরার গিরি-গুহার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেছি। বোম্বাই দ্বীপের পূর্বাংশে দৌলতাবাদের নিকট ইলোরার এই গুহা-মন্দির অবস্থিত। পাহাড় খুদিয়া এই গিরি-গুহায় যে দেব-মন্দির ও দেব-মূর্ত্তি-সমূহ নির্মিত হইয়াছে, তাহা কত কালের—আজি পর্য্যন্ত কেহ নির্দেশ করিতে পারেন নাই। কেহ বলেন,—‘চন্দ্রবংশের আদিভূত বুধ-পত্নী ইলার নামানুসারে ইলোরার নাম-করণ হইয়াছিল। যুবনাথ, ইন্দ্রদ্রায় প্রকৃতি রাজশূবর্গ ইলোরায় রাজত্ব করিয়াছিলেন।’ কেহ বলেন,—‘আট সহস্র বৎসর পূর্বে ইলু নামক রাজা এই ইলোরার অধিপতি ছিলেন। পাহাড় খুদিয়া তিনিই ইলোরায় প্রথম দেব-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।’ কত কাল পূর্বে, কোন্ সময়ে, ইলোরার গিরি-গুহা প্রথম খোদিত হইয়াছিল, প্রকৃত-রূপে তাহার নির্ণয় হয় নাই। এই গিরি-গুহার প্রস্তর-খোদিত মন্দির সমূহে হিন্দু দেব-দেবীগণের মূর্ত্তি আছে; বৌদ্ধদিগের এবং জৈনদিগের কীর্ত্তি-চিহ্নও বিদ্যমান রহিয়াছে। স্মরণ্য! মনে হয়,—প্রাচীন হিন্দুগণের কারুকার্য্যের উপর, বৌদ্ধ ও জৈনগণ আপনাদের শিল্প-চাতুর্য্য প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। ইলোরার গিরি-গুহা অর্দ্ধ-চন্দ্রাকৃতি। ইহার মধ্যস্থলে দেবালয়-সমূহ প্রতিষ্ঠিত; উত্তর ও দক্ষিণ পার্শ্বে বৌদ্ধ ও জৈন-দিগের মন্দির-সমূহ। ইলোরার কৈলাস—ভারতীয় শিল্পিগণের অদ্বিতীয় শিল্প-

নৈপুণ্যের পরিচয়। পর্কত-গাত্র-খোদিত এতাদৃশ কারুকার্য-সম্পন্ন স্তূপস্থ মন্দির পৃথিবীতে আর কোথাও নাই। ভারতীয় ভাস্কর্য্য ও স্থপতি-বিদ্যার পরিচয়ে যদি একমাত্র ইলোরার নাম আমরা উল্লেখ করি, তাহা হইলে আর কোনও পরিচয় প্রদানের আবশ্যক হয় না। পুরাণাদিতে ইলোরা—গ্রীষ্মের নামক শিব-তীর্থ বলিয়া অভিহিত। এইরূপ গিরি-মন্দির ভারতবর্ষের আরও নানাহানে দৃষ্ট হয়। পুনর নিকট কারোলির গিরি-গুহা, সালসতি-গুহা, অবন্তার গিরি-গুহা—কত নাম করিব? উদয়-গিরি ও খণ্ড-গিরিতে যে সকল শৈল-মন্দির খোদিত রহিয়াছে, তাহাই কি অল্প শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচায়ক? একাধিকানন—ভুবনেশ্বরের মন্দির—সেও কত কাল পূর্বে প্রতিষ্ঠিত! পুরুষোত্তমে জগন্নাথ-দেবের মন্দিরকেও পুরা-কীর্ত্তি বলিয়া অভিহিত করিতে পারা যায়। অবশ্য এমন কথা আমরা বলিতেছি না যে, পুরুষোত্তমের বর্তমান মন্দিরই রাজা ইন্দ্রদ্বায়ের প্রতিষ্ঠিত! কিন্তু তাহা না হইলেও ঐ সকল মন্দিরের প্রাচীনত্ব বিষয়ে কোনই সংশয় নাই। যাহা হউক, ভারতবর্ষ যে বহু পূর্বে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যে প্রতিষ্ঠাপন্ন ছিল, পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণও তাহা অস্বীকার করেন নাই। ফারগুসন বলিয়াছেন,—“খিলান নির্মাণ-প্রণালী ভারতবাসীরাই প্রথমে অবগত ছিলেন। ভারতবর্ষ হইতেই তাহা অত্র দেশে প্রচারিত হয়।” অধ্যাপক ওয়েবার বলেন,—“পাশ্চাত্য-দেশে ধর্ম্মালয়ের চূড়া-সমূহ, ভারতবর্ষের বৌদ্ধ-মন্দির-সমূহের চূড়া বা চৌপের অনুরূপে নির্মিত হওয়া অসম্ভব নহে।” * হাট্টার বলেন,—“বর্তমান-কালে ইংরেজ শিল্পিগণ যে সকল সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধক শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় দেন, তাহার অধিকাংশই ভারতের আদর্শে নির্মিত হইয়া থাকে।” † সারাসেন-জাতির খিলান-নির্মাণ-পদ্ধতি অনেকে প্রাচীনতম বলিয়া বিশ্বাস করেন। কিন্তু কর্ণেল টড্ প্রতিপন্ন করিয়াছেন,—“সারাসেনগণ প্রাচীন ভারতের মিকট হইতেই সেই খিলান-নির্মাণ-পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছিল।” ‡ প্রাচীন-ভারত শিল্প-বিষয়ে যে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাহারও বহু নিদর্শন আছে। স্বর্ণময় অলঙ্কার ও উক্কাণ, বিবিধ প্রকার মূল্যবান বস্ত্রাদি এবং মণি-মুক্তা-খচিত ভূষণাদির পরিচয় বেদাদি গ্রন্থেও দেখিতে পাই। যেমন স্থাপত্য ও শিল্প-বিষয়ে, তেমনি গণিতে, জ্যোতিষে, সাহিত্যে, কাব্যে, - ভারতের মৌলিকত্ব প্রতিপন্ন হয়। গণিতে ভারতবর্ষের মৌলিকত্ব—‘নীলাবতী’ প্রভৃতি গ্রন্থে, ‘সূর্য্য-সিদ্ধান্তে’ ত্রিকোনমিতির এবং ‘সুভ-সূত্রে’ জ্যামিতির পরিচয় পাওয়া যায়। মণির উইলিয়মস্ § প্রমুখ অধ্যাপকবর্গকে স্বীকার করিতে হইয়াছে,—‘বীজ-গণিত ও জ্যামিতির আবিষ্কারে এবং জ্যোতির্বিদ্যায় তাহার প্রয়োগে হিন্দুগণই

* “It is, indeed, not improbable that our Western steeples owe their origin to the imitation of Buddhistic topes.”—Professor Weber, *Indian Literature*.

† “English decorative art, in our day, has borrowed largely from Indian forms and patterns.”—Sir W. W. Hunter, *Imperial Indian Gazetteer*.

‡ “The Saracen arch is of Hindu origin”—Col. Tod, *Rajasthan*.

§ “To the Hindus is due the invention of Algebra and Geometry and their application to Astronomy”—Prof. Monier Williams, *Indian Wisdom*.

আদিভূত।’ এই গভীর গণিত-তত্ত্ব আলোচনায় ভারতের মহিলারা পর্যন্ত সময় সময় প্রতিষ্ঠা-লাভ করিয়াছিলেন ;—তাহা স্মরণ করিলেও আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। পূর্বে যে ‘লীলাবতী’ নাম করিয়াছি, তাহা লীলাবতী নামী বিদূষী রমণীর অপূর্ণ বিজ্ঞাবস্তার নিদর্শন। ভারতের প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ ভাস্করাচার্য্যের কন্যা—সেই লীলাবতী। লীলাবতী—পিতার একমাত্র সন্তান। ভাস্করাচার্য্য সেই কন্যাকে পুত্রবৎ শিক্ষা দান করেন। কথিত হয়,—ভাস্করাচার্য্যের “সিদ্ধান্ত-শিরোমণি” গ্রন্থের পাটীগণিত সংক্রান্ত ‘লীলাবতী’ অধ্যায়টী লীলাবতী-বিরচিত। কেবল কি লীলাবতী? গর্গ মুনির কন্যা গার্গী, যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত শাস্ত্রালোচনায় যশোভাজন হইয়াছিলেন। দেবহুতি, মদালসা, মৈত্রেয়ী, লোপামুদ্রা প্রভৃতি বিদূষী রমণীগণের বিজ্ঞাবস্তার পরিচয়—পুরাণে, ইতিহাসে কতরূপে পরিকীৰ্ত্তিত! স্বধর্ম-পালনে, পরহিত ত্রুতে, সংশিক্ষা-দানে হিন্দু-রমণীগণ আদর্শস্থানীয়া ছিলেন। তাঁহাদের প্রাচীন কাহিনী আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই,—কেহ পতি-সেবার পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন; কেহ সন্তান-পালনের উচ্চ আদর্শ সম্মুখে ধরিয়া রাখিয়াছেন; কেহ ভগবদ্ভক্তিতে মাতোয়ারা হইয়াছেন; কেহ পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছেন। ফলতঃ, স্ত্রী-জাতির প্রকৃত শিক্ষার ব্যবস্থায় প্রাচীন ভারতের প্রসিদ্ধি কখনও বিলুপ্ত হইবার নহে। সে সম্পর্কেও স্পর্ধা করিয়া বলিতে পারি,—ভারতবর্ষই আদিভূত, আদর্শ-স্থানীয়। অধিক বলিব কি, ভাষা-তত্ত্ব আলোচনায়ও অধুনা প্রতিপন্ন হইতেছে,—ভারতীয় আর্য্যগণের ভাষাই—পৃথিবীর আদি ভাষা; পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার উৎপত্তির মূলে—ভারতবর্ষের দেবভাষা। পৃথিবীর সকল ধর্মেরই আদিভূত—ভারতীয় সনাতন ধর্ম; সকল ধর্মই ভারতীয় সনাতন ধর্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ফলতঃ, সকল বিষয়েই আমরা ভারতবর্ষকে শ্রেষ্ঠ ও আদি বলিয়া গৌরব অঙ্গভব করি।

কেনই বা গৌরব অঙ্গভব না করিব? স্বদেশের, স্বজাতির গৌরবময়ী পূর্ব-স্মৃতি স্মরণ করিয়া কাহার না হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়? যাহাদের পিতৃ-পুরুষের পুণ্য স্মৃতি এমন

উজ্জ্বল হইয়া আছে,—এমন দিকে দিকে উদ্ভাসিত রহিয়াছে, তাহারা

উপসংহার। গৌরব অঙ্গভব না করিবে কেন? পিতৃ-পুরুষের পুণ্য-স্মৃতি গৌরব

অঙ্গভব না করিলে জাতির অধঃপতন আবশ্যজ্ঞাবী। বিশেষতঃ, আমাদের

পিতৃপুরুষগণের যে আদর্শ-চরিত্র চির দেদীপ্যমান, শিক্ষণীয় বিষয় তাহার অধিক আর কি থাকিতে পারে? তাঁহাদিগের উদারতা, সরলতা, সত্যতা, সত্য-প্রিয়তা, সাহসিকতা,—চিরপ্রসিদ্ধ। শিষ্ট-ব্যবহারে ও সদাচারে, দয়া ও পরোপকারে, তাঁহারা চিরস্মরণীয়। এক কথায়, যে গুণে মর্ত্যের মানুষ দেবতার আসন লাভ করিতে পারে, আর্য্য-হিন্দুগণ সেই গুণেই গুণাবিত ছিলেন। সত্য-পালনের জায় ধর্ম নাই; সেই সত্য-পালনে আর্য্যগণ যে দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন,—কেহ কখনও তাহা বিস্মৃত হইতে পারিবেন কি? প্রাচীন ভারতের প্রাচীনতম ইতিহাসের প্রতিদৃষ্টিপাত না করিয়াও যদি আমরা অপেক্ষাকৃত আধুনিক ইতিবৃত্তের আলোচনা করি, তাহাতেও সে সম্বন্ধে বড় অল্প প্রতিষ্ঠার পরিচয় পাই না। ভারতবর্ষীয় সত্যবাদিতা সম্বন্ধে দ্বিতীয় শতাব্দীর ঐতিহাসিক এরিয়ান বলিয়া গিয়াছেন,—

“আমি কখনও কোনও ভারতবাসীকে মিথ্যা বলিতে শুনি নাই।” * গ্রীক ঐতিহাসিক ষ্ট্রাবো বলিয়াছেন,—“ভারতবাসীরা এতই সংপ্রকৃতি যে, তাহাদিগের গৃহ-দ্বারে চাবিবদ্ধ করার আবশ্যক হয় না এবং চুক্তিপত্র লিখিয়া কোনও বিষয়ে তাহাদিগকে বাধ্য করার প্রয়োজন দেখি না।” † চীনদেশীয় প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী হুয়েন-সাং বলিয়া গিয়াছেন,—“চরিত্রের সত্যতা ও সরলতার জন্ত ভারতবাসীরা চির-প্রসিদ্ধ। তাহারা কখনও কাহারও ধন-সম্পত্তি অত্যাচারে অপহরণ করে না। জ্বালের মর্যাদা রক্ষার জন্ত তাহারা কদাচ তাগ-স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত নহে।” বৰ্ত্ত শতাব্দীর প্রারম্ভে চীন-সম্রাট ইয়াংটিং দূতরূপে ফেইটু ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। ভারতবাসী-দিগের সত্যতা ও সত্যবাদিতা সম্বন্ধে তিনি বলিয়া গিয়াছেন,—“ভারতবাসীরা অস্বীকারে বিশ্বাসবান অর্থাৎ অস্বীকার করিয়া তাহারা কখনও তাহা পালন করিতে কুণ্ঠিত হয় না।” অধিক বলিব কি, ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পরিত্রাজক মার্কোপোলো ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণদিগের সত্যনিষ্ঠা দর্শন করিয়া বলিয়া গিয়াছেন,—“পৃথিবীতে এমন কোনও বস্তুই নাই, যাহার লোভে ব্রাহ্মণেরা মিথ্যা বলিবে।” ‡ সে দিনের আবুল কজেল এই কথাই ঐতিহ্যনি করিয়া গিয়াছেন; তিনি বলিয়াছেন,—“হিন্দুগণ সত্যের অমুসরণকারী। তাহাদের ব্যবহারে অসীম বিশ্বস্ততার পরিচয় পাওয়া যায়।” বিচারপতি কর্ণেল স্লিম্যান হিন্দুদিগের সত্যপ্রিয়তা দেখিয়া বলিয়াছিলেন,—“আমি শত শত মকদ্দমার বিচারকালে দেখিয়াছি, একটী মিথ্যা কথা কহিলেই এক ব্যক্তির সম্পত্তি, মুক্তি এবং জীবন লাভ হইতে পারে, কিন্তু সে ব্যক্তি কখনই মিথ্যা বলিতে সম্মত হয় নাই।” স্লিম্যানের এই উক্তির ঐতিহ্যনি করিয়া অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—“ইংলণ্ডের কোনও ইংরেজ জিজ্ঞাসা কি এ কথা বলিতে পারেন?” § ভারতের প্রথম গবর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস পর্য্যন্ত হিন্দুজাতির গুণ-গরিমার বিষয় অস্বীকার করিতে পারেন নাই। পার্লামেন্ট মহাসভায় সাক্ষাদান-কালে তিনি বলিয়াছিলেন,—“হিন্দুগণ বিনয়ী, পরোপকারী, কৃতজ্ঞ, বিশ্বাসী এবং স্নেহ-পরায়ণ।” ¶ হিন্দুগণের ধর্মপ্রাণতা সম্বন্ধে অধ্যাপক মনিয়ার উইলিয়ম্স্ বলিয়াছেন,—“ইউরোপের কোনও জাতিই ভারতবাসীর ত্রায় ধর্ম-পরায়ণ নহে।” যেমন সত্য-নিষ্ঠায়, তেমন সাহসিকতায়, তেমন স্বদেশ-প্রাণতায়! রাম,

* “No Indian was ever known to tell an untruth”—Arrian, as quoted in *Hindu Superiority*.

† “They are so honest as neither to require locks to their doors nor writings to bind their agreements”—*Ibid*.

‡ “They (the Brahmins) would not tell a lie for any thing on earth”—*Ibid*.

§ “I have had before me hundreds of cases in which a man's property, liberty and life has depended upon his telling a lie and he has refused to tell it”—বিচারপতি স্লিম্যানের এই উক্তির উল্লেখ করিয়া ম্যাক্সমুলার জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—“Could many an English Judge say the same?”

¶ Max Muller's *India, What can it teach us*.

¶ Minutes of evidence before the Committee of both Houses of Parliament, March and April, 1830.

অর্জুন, কর্ণ, ভীষ্ম, কুরু, ভীম, অভিমন্যু প্রভৃতির ইতিহাস দূর অতীতের গর্ভে নিমজ্জিত হইলেও, সে দিনের রাজস্থানে নিবাসের প্রতাপ, মাড়োয়ারের দুর্গাদাস, আজমীরের পৃথ্বীরাজ, এবং হাশ্বর, রাজসিংহ প্রভৃতি যে সাহসিকতা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা আছে কি ? এইরূপ যে কোনও গুণের অনুসন্ধান করি না কেন, ভারতে তাহারই আদর্শ পূর্ণ প্রকটিত। সেই আদর্শের অনুসরণ করিলে শ্রেয়ঃ-লাভ অবশ্যজ্ঞাবী। পিতৃ-গৌরবই—প্রতিষ্ঠার মূলীভূত। পিতৃ-গৌরব বিস্মৃত হইলে, জাতি যে অধঃপতনের পথে অগ্রসর হয়,—আপন জাতীয় জীবন বিনষ্ট করে,—তাহাতে সন্দেহ আছে কি ? হিন্দু আমরা ; আমরা তো ইহা প্রাণে-প্রাণেই অনুভব করি। পিতৃপুরুষগণের গৌরব-কাহিনী শ্রবণ করিবার গন্ধতি অশ্রদ্ধাশে আবহমান কাল হইতেই প্রচলিত আছে। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ—যাঁহারা মনে করেন, পৃথিবী দিন দিন উন্নতির পথে প্রধাবিত হইতেছে, তাঁহারাও—এখন এ কথা অস্বীকার করিতে পারিতেছেন না। এতৎপ্রসঙ্গে ম্যাক্সমুলার যাহা বলিয়াছেন, বোধ হয়, তাহার উপর অধিক কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং তাঁহার ভাষাতেই বলিতেছি,—“A people that can feel no pride in the past, in its history and literature, loses the mainstay of its national character. When Germany was in the very depth of its political degradation, it turned to its ancient literature, and drew hope for the future from the study of the past.” অর্থাৎ, ‘যে জাতি আপন অতীত গৌরবে, পুরাতত্ত্বে ও সাহিত্যে গৌরব অনুভব না করে, সে আপন জাতীয় জীবনের প্রধান অবলম্বন হইতে ভ্রষ্ট হয়। অর্জুণী যখন রাজনৈতিক অবনতির গভীর গহবরে নিমগ্ন হইয়াছিল, সে তখন আপন প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি ফিরিয়া চাহিয়াছিল। আর তাহা হইতেই—অতীত স্মৃতির আলোচনায়—তাহার ভবিষ্য-জীবনের আশা-মকুল অঙ্কুরিত হইয়াছিল।’ এই সিদ্ধান্তই সার সিদ্ধান্ত। আপনাকে উন্নত করিতে হইলে, সমাজকে উন্নত করিতে হইলে, পিতৃপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ ভিন্ন গতান্তর আর কি আছে ?



নির্ঘণ্ট ।

[এই নির্ঘণ্টে (Index) যে সকল শব্দের পার্শ্বে * চিহ্ন দৃষ্ট হইবে, সেই সকল নাম স্বর্ধ্য-বংশের বংশলতায় দেখিতে পাওয়া যাইবে; আর যে সকল শব্দের পার্শ্বে † চিহ্ন দেওয়া হইল, সেই সকল নাম চন্দ্রবংশের বংশলতায় দেখিতে পাইবেন; এবং যে সকল নামের পূর্বে ‡ চিহ্ন রহিল, তৎসমুদায় স্বায়ত্ত্ব মনুর বংশে দেখিবেন। বাহ্য-তয়ে সকল বংশের সকল পর্যায়ের পত্রাক্ষ প্রদত্ত হইল না। স্বর্ধ্যবংশের বংশলতা ২২২ পৃষ্ঠা হইতে ৩০৩ পৃষ্ঠায়, চন্দ্রবংশের বংশলতা ৩০৫ পৃষ্ঠা হইতে ৩২২ পৃষ্ঠায় এবং স্বায়ত্ত্ব মনুর বংশলতা ৩৩৭-৩৩৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে।]

অ

† অংশ ৩১৭	অগ্নিসংকার ২২৩	অতিযাজ ৪২৯
* অংগুমান ৩৪৫	অদ্বানু ৩৭১	† অতিরথ ৩০৫
অকম্পন ৪২১	† অঃ অঃ ২৭৪, ৩১৪, ৩৩৫, ৩৩৭, ৩৬৩, ৩৯১, ৪১৩, ৪১৬, ৪৩৫	‡ অতিরাজ ৩৩৭
* অকুতাস্থ ২২৮	* অঙ্গদ ২২৭, ২২৬	† অত্রি ১৫০, ১৬৪, ৩৩৭, ৩৫০, ৪৪৬, ৪৫১, ৪৫৪
* অকুশাথ (অকুশাথ) ২২৩, ২২৭	† অঙ্গার ৩০৭	অত্রি-সংহিতা ১৫০, ১৫১
অকোপ ২৩৪	† অঙ্গারসেতু ৩২৬	অথ (শব্দতত্ত্ব) ১২০, ১২১
† অক্রুর ৩০৮, ৩৫৪, ৩৫৫, ৩৬৮	অঙ্গিরস ১৫৪, ৪৫১	অথর্ক—ঋষি ৫২; বেদ ২৬, ৬৫, ৬৬; সঙ্কলয়িতা ৩২
† অকৌশল ৩১৫	অঙ্গির-সংহিতা ১৫৪	* অতিথি ২২৪, ৩৬৫, ৩৬৬
অক্ষকৌড়া ৩৪৫	‡ অঙ্গিরা ২৭৩, ৩৩৭, ৩৪৯	† অদীন ৩১৩
অক্ষপাদ ১০১	* ‡ অজ ৭০, ২২২, ৩৩৭, ৩৮০	অদৃষ্ট-তত্ত্ব ১২৯, ১০৬, ১০৭, ১৪১
* অক্ষাথ ২২৮	† অজক (অজকাস্থ) ৩০৭	অদ্বৈত-বাদ ১০৭, ১০৮, ১১২; মতের পরিচয় ১২২; মত-সম্বন্ধে বিবিধ কথা ১২৪; দ্বৈত ও অদ্বৈত মতে পার্থক্য ১১২, ১২৫; গ্রন্থাবলী ১১১; উপাসনা-পদ্ধতি ১২৫
† অক্ষপ ৩২২	* অজপাল ৩৮০	অদ্বৈত রামায়ণ ২১৬, ২৩৩
অকৌশলী ২৪৭	† অজগাধ ৩২২	অত্রিকা ৩৭৭
অগস্ত্য ২১৮, ৩২৯, ৪২৬, ৪২৭, ৪৫১, ৪৫৪	† অজমীচ ৩১০, ৩৫৮, ৩৮৬	অধিকার-তত্ত্ব ১২০, ১৩১
অগ্নি ৫০, ৩৯৪, ৪১০, ৪৩৬, ৪৩৭, ৪৪৩; অগ্নিপূজক ৫০	† অজাতশত্রু ৪৩, ৩১৬	অধিকার-ভেদ ৩৫
অগ্নিদেব ৪১৯	† অজিগর্ত ৩৪৩, ৩৪৬	† অধিরথ ৩১১, ৩৬৪, ৪৩৩
‡ অগ্নিধ্ব (আগ্নিধ্ব) ৩৩০, ৩৩১, ৩৩৭, ৩৩৮	‡ অজিন ৩৩৮	† অধিসীমকৃষ্ণ ৩১৫, ৩৬৩
অগ্নিপুরাণ ১৭১, ১৮০, ১৮১	* অজ্ঞন ২২৫, ৪৪৭	অধ্যাত্ম-যোগ ২৬৭
* অগ্নিবর্ষ ২২২, ২২৬, ২২৭	† অজ্ঞিক ৩০৮	অধ্যাত্ম-রামায়ণ ২১৬, ২২৮, ২৩০
‡ অগ্নিবাহি ৩৩০, ৩৩১	† অণু ৩১৪, ৩৬৩, ৩৮৫, ৩৮৯	† অনন্ন ৩১০
অগ্নিবেশ ৪৩২	† অতিদত্ত ৩২৯	† অনবরণ ৩১৭
* অগ্নিবৈশ্ব ৩৪২, ৪৫৬	† অতিদাত ৩২৯	* † অনমিত্র ২২১, ২২৩, ৩০৮, ৩৫৩, ৩৬৮
অগ্নিবৈজ্ঞান ৩৫২, ৪৫৬	* অতিথি ২২৩	
‡ অগ্নিমিত্র ৩১৭	অতিথি-সংকার—কর্ণ ও পদ্মা-বভ্রীর ৩৬৬; রক্তিদেবের ৩৫৮	
অগ্নিষ্টোম ৩৩৭	অতিথি ৪২২-৪২৪, ৪৩৩	
	অতিনন্দ ৩৫২	
	* অতিবিভূতি ২২৪	

অনয় ৩২৪

*অনরণ্য ২১২ ৪০০, ৪৩০

অনর্কা ৩৭১

*অনল ২৭

†অনাযুষ্টি (অনাযুষ্টি) ৩০৮

অনাযুষ্টি—দ্বাদশ বৎসর-বাপী

৩৪২ ; ত্রিবার্ষ-বাপী ৩৫৪ ;

রোমপাদ রাজার রাজত্বে

৩৬৪ ; শতবার্ষ-বাপী ৩৬৮ ;

দ্বাদশবার্ষ-বাপী ৩৬০ ।

অনার্য ২৪, ২৫, ৪৬

অনু ৫৫, ৩৫২

অনুক্রমণি ৮০

*অনুপর্ণ ২২২

অনুবিন্দ ৩৫৫

†অনুরথ ৩৭

*†অনেনা ২২৩, ৩০৫, ৩৮০,

৪৩০, ৪৩৮

অনুক ৪২২

†অনুর ৩০৮

*অনুদীক্ষ ২২৬ ৩৩৪

†অনুদীন ৩৩৬

‡অনুদ্বি ৩৩৮

অনুজ জাতি ১৫৪, ১৫৭

†অনুক ৩০৮ ৩৫৪, ৩৫৫

†অনু ৪৩৫

†অনুপভাতু ৩৮৫

অপদেব ১১৪

‡অপ্রতিরথ ৩১৫

অবতার—বিভিন্ন মন্তব্যে ৩৫২ ;

তাৎপর্য ৪৪১ ; আবশ্যকতা

৪৪৪ ; সংখ্যা ও তৎসম্বন্ধে

বিভিন্ন মত ৪৪৪ ; অবতার

তত্ত্ব-বর্ণন ৪৪৭

অবজী ৩৫৩, ৪০৪, ৪০৫

অবরোধ প্রথা ২২২

*†অবিকি ২২৪, ৩০৬, ৪৮১

*অবিবিশ ২২৪

‡অবিত্ত ৩২১

অবিত্তা ১১২, ১২৮, ১২৯, ১৩৬

*†অবিকি ৩০০, ৩২২, ৩৮২

†অভয়দ ৩১০

†অভিজিৎ ৩০২

†‡অভিমত ৩০৬, ৩৩৮, ৩৪৭,

৩৬১, ৩৭৫, ৪১৫, ৪১৬,

৪১৭, ৪২১, ৪৭২ ; এবং

মহাভারত প্রসঙ্গে ।

†অভিগুৎ ৩০৫

অভাবস্তী ৪২২, ৪৩০

*অমর্ষ (অমর্ষণ) ২২৬, ৩০১

†অমাবসু ৩৫০, ৩৫১, ৩৮৫, ৩৮৯,

৩৯০

অমিত ৩১৮

*অমিত্রজিৎ ২২৬

*অম্বরীষ ১৫২, ২২০, ২২২,

৩৪১, ৩৪৬, ৩৪৯, ৩৮১,

৩৮২ ; তৎকর্তৃক দূর্দাসার

প্রাণ-রক্ষা ৩৪২

অদ্বালিকা ৩৬১

†অদর্শ ৩১০

অদ্বিকা ৩৬১

†অযত ৩০৫

অযত্নার গিরিগুহা ৪৬২

অযবস ৪২২, ৪২৬

†অযাতি ৩১৪

অযু ৫৭

*†অযুতাজিৎ ২২৩, ৩০২, ৩২৫

*অযুতাত ২২৫

†অযুতাত ৩১৫

অযোধ্যা—বিবিধ চিত্র ২১২-

২২২ ; লঙ্কার সচিত্র তুলনা

২৩৫ ; প্রথম ক্ষত্রিয় রাজা

৩৪১, ৩৮৮

অয়োযুধ ৩৭১

অরজা ৩২২

*অরিনাত ২২৫, ৩৮০

†অরিন্দম ৪৩৫

†অরিন্দম ৩২২, ৪০৮

†অরিন্দম ৩২২

*অরিন্দোম ২২৫

†অরিন্দোম ৩১৭

*অরুণ ৩০৩

†অরু ৩২১

অর্চনানা ৪৩১

অর্চি ৩৩৬ ; তাঁহার সহমরণ

প্রসঙ্গ ৩৩৬, ৪৬০

†অর্জুন ২৪২, ৩০৮, ৪১৬, ৪৭২ ;

মহাভারত-প্রসঙ্গে ৩৪২-

২৭২ ; তাঁহার জন্ম ৩৬১ ;

তৎকর্তৃক সুধবা-নিধন

৪০১ ; যুদ্ধির অখমেধ-

যজ্ঞে তৎকর্তৃক নানা দেশ

বিজয় ৪১৭-৪১৯ ; বক্র-

বাহনের যুদ্ধে তাঁহার প্রাণ-

ত্যাগ ও পুনর্জীবন লাভ

৪১৯, ৪৬০ ; তাঁহার বিষাদ-

যোগ ২৬৬ ; তৎকর্তৃক

আমেরিকা অধিকার ১৮ ।

†অর্জুনপাশ ৩০১

অর্জুনমিশ্র ২২০

অর্জুনসিংহ ১১৩

অর্ণ ৪২৭

অর্ণবান ২৭৫ ; (পোত) বাশ-

পরিচালিত ৪৬৭

*অর্থসিদ্ধি ২২৭

অলকট (কর্ণেল) মিশর ও

ভারতের স্বাধীন বিষয়ে ৩৭৮

†অলক ৩১১, ৩৮২ ৪০৮-৪১০,

৪৪৭

অলৌকিক অর্জুনের পুন-

র্জীবন লাভ ৪১৮, ৪৬০ ;

অভিসম্পাতে কৃষ্ণরোগ

৪৩৪ ; অসঙ্গের দ্বীপ-প্রাপ্তি

৪২২ ; আকাশ হইতে অখ-

পতন ৪০২ ; ইক্ষাকুর উৎ-

পত্তি ৩৪১ ; উলা ও সুহ্মায়ের

কাহিনী—পর্যায়ক্রমে দ্বীপ

ও পুংস্ব-প্রাপ্তি ৩৮৪ ; স্বজা-

ধের অজ্ঞতা নিবারণ ৪২৬ ;

কর্ণের আত্মসাৎকার ও

বৃষকেতুর মাংস ব্রাহ্মণের
ভোজনার্থ দান এবং বৃষ-
কেতুর পুনর্জীবন লাভ
৩৬৪; কুপের জন্ম-বিবরণ
৩৯৮; চাবনের নবযৌবন
লাভ ৩৪৮, ৪৬০; ছত্রিশ
কোটি ব্রাহ্মণ-ভোজন ও
রাশি রাশি সুবর্ণ দান
৪৩৪; ছিন্ন মস্তক পুন-
র্যোজনা ৩৭৩ ৪৬০; দৌর্ব-
জীবন লাভ ৩৭৭; দেব-
গণের পক্ষিবোনিতে প্রবেশ
৪০০; নৃগের রুকলাশত
প্রাপ্তি ৪০১; নৃপতিগণের
জ্ঞান প্রাপ্তি ৪৩৫; পুরুষের
জ্ঞান প্রাপ্তি ৪৩৫; বলরাম
ও সেবতার বিবাহ ৩৭৫;
ব্রাহ্মণের অভিসম্পাতে
শ্রেনজিতের প্রাণতাগ
৪২১; ব্রহ্মদত্তের গুণ-
প্রাপ্তি ৪০১; মৎস্যগন্ধার
উৎপত্তি ৩৮৭; মৃত-সঞ্জী-
বনী-মন্ত্রে সঞ্জীবিত করণ
৪১৩, ৪৫৭; যুবনাথের
গর্ত-ধারণ ৩৪২; শ্রেন
পক্ষীকে শরীরের মাংস
দান ৪১০, ৪১১; সঞ্জীবন-
মণি ৪১৮; সুধার তপ্ত-
তৈল কটা হইতে উত্থান
৪০১; সুন্দরীর পরিবর্তে
মজুক ৪২০; হব্যাপানে
হতাশনের মানি ৪২০।

অদ্রোপনিষৎ ৬৫
অশ্বিনয় (অশ্বিনীকুমারদয়) ৪২৩,
৪২৬, ৪৩১, ৪৬১
*অশ্বিনীকুমার ২৯৮
অশোক বন ২১৯
অশোক-বর্ধন ৩১৭
অশ্ব, অশ্বগ্রীব, অশ্ববাহ ৩২৯
অশ্বতর ৪১০

অশ্বখামা ২৪৬ ২৫৯, ২৬১, ৪১৬
অশ্বপতি ৩৯৬, ৩৯৭
অশ্ববিজ্ঞা ৩৪৪
†অশ্বমেধ (রাজা) ৪৩৩
অশ্বমেধ যজ্ঞ—শ্রীরামচন্দ্রের
২২৭, ৪১২; যুধিষ্ঠিরের
২৪৭, ৪০১; সগরের ৩৪৪;
ভরতের ৩৪৭; উশনার ৩৫৩
অশ্বলায়ন ৭৫
*অশ্বক ২৯৫, ৩৪৫
†অষ্টক ৩২৮
অষ্টবস্ত্র ৪৪২, ৪৪৩
‘অগ্নিঃ’ শ্রুতিতে কলৌ যুগে’—
অর্থ ২৩০
অগ্নিঃশ্রুতি স্থতি ১৬৬
†অসঙ্গ ৩০৮, ৪৪৯
*অসমগ্র (অসমগ্রা) ২২২
†অসমোজা ৩০৮
অসামগ্র্য—কুস্তিবাস ও বাসী-
কিতে ২৩০-২৩৪; বাস ও
কাশীদাসে ২৫৬ ২৬৭;
বংশ-পর্যায়ে ৩৮৪-৩৯২।
অসিক্রী ৩৮৮
*অসিত ২২২, ৩৮১, ৩৯১
অসুর ৪২৬
অমৃতরজস ৩৯০
†অমৃত ৩১৬
অপ্তি ৩৬০
†অহংজাতি ৩২৯
†অহলা ৩১১, ৩৫৯
†অহবাদী ৩২৩
†অহম্প্রতি ৩১৪
অহিচ্ছত্রা নগরী ৪১১, ৪১২
*অহিনশ ২১৩
অহিনর ৩১৬
অহিবারণ ২৩০, ২৩৩
*অহীনাম ২৯৮
অহ্রীদ ৩২৬

আ

আইডিয়ালিজম ১৪৩
আকনা ২৩২
আকবর ৬৫, ২১০
আকাশ—ভাহার পূজাপদ্ধতি
৬১; ভাহার রূপ ৯৯।
আকৃতি ৪৪৭
†আক্রীড় ৩০৭
আগমবাগীশ ২১৪
আগামেমনন ২৪০
আগ্নিরস—ঋষি ১৩২; কৃত্তির-
কুল ৩৪২; মুনিগণ ৩৪৯;
ব্রাহ্মগণ-বংশ ৩৪৯, ৪৫৬।
‡আগ্রী ৩৩১, ৩৩৩, ৩৩৭
আচার—সংহিতার মতে ১৫৯;
তাত্ত্বিক-মতে ২১১; আর্ধ্য-
গণের ৩৭
আজমীড় ৩৫৮
আজ্ঞাত্ব-বিবেক ১০২
আত্মা ৬৬, ৭০, ৯০, ৯৫, ১০৬,
১০৭, ১৩৩, ২৬৬; ভাহার
দেহান্তর গ্রহণ ৬৮।
আদম ১০
আদর্শ—পিতৃভক্তি, মাতৃ-
প্রেমের, পিতৃভক্তি, স্বজন-
প্রীতির ও বীরত্বের ৫২,
৪৭০-৪৭২।
আদি—কাব্য ২৩৮; দর্শন ৮৭;
গ্রন্থ ১৫, ২৪, ২৯; পুস্তক
১০; কবিতা ২১৫।
আদিতা ২৮১; পুরাণ ১৮৮, ১৮৯
†আদিরাজ ৩০৬
†আদ্রিক ৩১৭
আলকদ্রুপ্তি ৩৮৮
আনন্দগিরি ১১৯
আনন্দভীর্ষ ২১০
আনন্দপূর্ণ মুনি ২২০
আনন্দমর (কোষ) ১২৯
*†আনন্দ ২৯৩, ৩১১, ৩৪১

আত্মকী ১০১

আপত্ত ৭৬, ৭৭, ১৫৪

আপত্ত-সংহিতা ১৫৪

আপোলা ৫৪

আপ্তাবা ১ ৪

আপ্তবান ৪৫১

আফগানিস্তান ২৭৫

আফ্রিকা ৩৭৭-৩৭৯, ৪৬৬

আবন্ত ৩০৮

আবর্ত ৩০৭

আবিহোতা ৩৩৪

আবুল ফজল—কাশ্মীরের রাজ-

গণ সম্বন্ধে ১০; হিন্দুগণের

সত্যনিষ্ঠা সম্বন্ধে ৪৭১

আমেরিকা—১৫, ১৬, ৪৬৪, ৪৬৫;

তথায় হিন্দুগণের গতিবিধি

১৬, ৪৬৪-৪৬৬; তথায়

হিন্দুগণের পরিচয়-চিহ্ন

৪৬৫; তথায় হিন্দুগণের

পর্কোৎসবাদি ৪৬৫-৪৬৬;

তথায় হিন্দুগণের উপ-

নিবেশ স্থাপন ৪৬৪-৪৬৬।

আয়তি, আয়াতি ৩০৭, ৩১৮

*, আয় ২১৪, ৩৫০-৩৫২, ৩৬৭,

৩৮৫, ৩৮৯, ৪২২-৪২৩

আয়ুর্বেদ—স্মৃতি, পরিপুষ্টি, উপ-

যোগিতা, প্রচার ৪৬১-৪৬২

আরণ্যক, ৪৭, ৬২, ৬৪, ২২৭

আরণ্যক ঋষি ৪১৩।

আরব ৩১৯

আরার ৩২৫

আরিয়ান (এরিয়ান) আর্যা-

বর্ত সম্বন্ধে তাঁহার মত

৪২; হিন্দুগণের সত্য-

বাদিতা সম্বন্ধে তাঁহার মত

৪৭১-৪৭২

আরিস্টটল ১০১

আরুণি (উদালক) ৬৭

*আরুণি ২৯৩, ৪২৪

*আরু ২৯৩

আর্য্যজাতি ১১-২৫; শব্দার্থ

২৪, ২৫; ধার্ম্য ২৫; হিন্দু-

গণের সভ্যতার অবিচ্ছিন্নতা

৬, ৮; তাঁহাদের ধর্ম্ম ৩৪-

৩৬; তাঁহাদের আচার-

ব্যবহার ৩৭-৪০; তাঁহাদের

আদিবাস সম্বন্ধে বিতর্ক

১৮-২৪; তাঁহাদের আদি

ভাষা ৪৭০; তাঁহাদের

ধর্ম্মই—আদি-ধর্ম্ম ৪৭০;

তাঁহাদের আদি-বাস প্রসঙ্গ

১৮, ৩৭৯; তাঁহাদের জ্ঞা-

পরম্পরা ৪৭০, ৪৭২; তাঁহা-

দের প্রতিষ্ঠা ১২; তাঁহা-

দের বাসস্থান ১২-১৪, ২২;

তাঁহাদের আধিপত্য-বিস্তার

এবং পৃথিবীর সর্বত্র গতি-

বিধি ১৬; তাঁহাদের আদি-

জাত ১৫, ২৪, ২৯; তাঁহা-

দের সম্বন্ধে পাশ্চাত্য

পণ্ডিতগণের মত ৪৬৫, ৪৬৯,

৪৭১; রাজা ৪২৭।

আর্য্যভট্ট ৪৬৩; পৃথিবীর গতি-

বিষয়ে তাঁহার মত ৪৬৩

আর্য্যসিদ্ধান্ত ৪৬৩

আর্য্যাবর্ত - ১৬; তাহার সীমা-

নিক্রপণ ২২; তাহার শ্রেষ্ঠ

১৩; তাহার সীমা সম্বন্ধে

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত

৪১; ব্রহ্মপুরাণে তাহার

সীমা-পরিমাণ ৩৩৭

আলেকজান্ডার ১০৯, ২৭২, ২৭৩,

২৭৮, ২৭৯, ২৮৮

আল্লা ৬৬

আসন্ন ৪২২

আসিরীয় ৩৭৬

আছক, আহকী ৩০৯

আহুতি ৩০৮

ইউরোপ ১৬, ৪৩০

ইংলণ্ড ৪৬৭

ইক্ষু-সমুদ্র ৩৩২

*ইক্ষুকু ২১৮, ২৯২, ৩০৪; তাঁহার

অঙ্ক জন্ম-বিবরণ ৩৪১;

অত্যাচার ৩৭৯, ৩৮২, ৩৮৬,

৩৯২, ৩৯৬, ৩৯৮, ৪০১

ইয়িক ৫০

ইণ্ডিয়া—শব্দের উৎপত্তি ১৭

ইতিহাস,—হিন্দুজাতির ৫১;

বাংলা ৫৩; গৌরব,

গেজো, বার্কলে, কোমৎ,

ইয়ারসন, এবং নেপোলিয়ন

প্রভৃতির মত ৫১-৫২।

ইথার ২৪১

*ইথারি ৩৩, ৩৩২, ৩৩৭

ইনিড ২৯০

ইন্দুমতী ৩৪২

*ইন্দু ২৯৯

ইন্দ্র ৫৪-৫৭, ৬১; তাঁহার বৃত্তা-

নুর বধ ৫৪, ৩৭১, ৩৭২;

তৎসম্বন্ধে রূপক ৫৪, ৩৭২;

বিভিন্ন মন্তব্যের বিভিন্ন

ইন্দ্র ৩৪০; অত্যাচার ২৪৮,

২৯৯, ৩৯৪, ৪০১, ৪১১, ৪১৬,

৪২৪, ৪২৭, ৪২৮, ৪৩১, ৪৩২,

৪৩৪, ৪৩৬-৪৩৭, ৪৫৪, ৪৬০।

ইন্দ্রি ৩৭৩

*ইন্দ্রিয়ার ৩৩৮, ৩৭৮, ৪০৪-৪০৬,

৪৬৮; জগন্নাথ প্রতিষ্ঠা ৪০৪।

ইন্দ্রপ্রস্থ ২৪৩, ২৪৮, ২৭১

*ইন্দ্রবাহ ৩০০; তাঁহার ঐ

নামের উৎপত্তি ৩৪১;

শ্রীমত্তাগবত-মতে ৩৮০

ইন্দ্রসেন ৩৯৫

ইন্দ্রসেনা ৩৯৫

*ইন্দ্রস্পৃক ৩৩৭

*ইন্দ্রাত ৩০৬

ইল্ফোত ৪৩০
ইব্রাহিম ৬৫
ইভ ১০, ৪৩২
ইমারসন—ইতিহাস সন্ধ্যা
তাঁহাৰ মত ৫২
ইয়াংটি ৪৭১
ইৰাবতী ১১৬
ইৰাবান ৩১৬
ইল ৩৮৪
*, টাইলা (ইড়া) ২৯৩, ৩০৪, ৩৫০,
৩৬৮, ৪৩০, ৪৩১; তাঁহাৰ
অলৌকিকত্ব ৩৮৪, ৩৮৫।
ইলাবৰ্ত্ত ৩৩৭
ইলাবৃত্ত ৩৩৩, ৩৩৮; বৰ্ষ ৩৩৩
ইলিয়ড ৫৪, ২২০
*ইলিলি ২২৫
ইলু ৪৬৮
ইলোৱা ৪৬৮
ইশ ৩৩৭
ইয়ুমান ৩২১
ইষ্টকাৰ্ঘ্য ১৪৮, ১৫০; তাহাতে
অধিকাৰী ১৫১
ইষ্টৱশি ৪২৬
ইষ্টাথ ৪২৬

ঈ

*ঈলিন ৩৮৫
ঈশোপনিষৎ ৬৮
ঈশ্বৰ (দৰ্শনে ঈশ্বৰ-তত্ত্ব) ১০০,
১০৬, ১১১, ১১৬, ১৩৬,
১৪২; তৎসম্বন্ধে জনষ্টাৰ্ট
মিলেৰ মত ১৪২; হাৰ্কাট
পেপলাৱেৰ মত ১৪২
ঈশ্বৰ ৩০৫
ঈশ্বৰকৃত্য ১৪৩

উ

উইলকোর্ড (কৰ্ণেল) কুরুক্ষেত্ৰ-
যুদ্ধ সম্বন্ধে তাঁহাৰ মত ২৭৬

উইলসন—বেদান্ত বিষয়ে তাঁহাৰ
মত ৮১; কুরুক্ষেত্ৰ-যুদ্ধ
সম্বন্ধে তাঁহাৰ মত ২৭০,
২৭৬; বৃত্ত ও চক্ৰ সম্বন্ধে
তাঁহাৰ মত ৩৭২
উইলিয়ম্‌স্ (মনিয়ৰ) — ব্যাকৰণ
সম্বন্ধে তাঁহাৰ মত ৮২;
স্থাপত্য সম্বন্ধে তাঁহাৰ মত
৪৬৯; অসীত গোঁৱবে
তাঁহাৰ মত ৪০২; হিন্দু
দিগেৰ সত্যবাদিতা-সম্বন্ধে
তাঁহাৰ মত ৪৭১; চোমা-
ৱেৰ ও ৱামাথণেৰ তুলনাৰ
তাঁহাৰ মত ২৪০

*উকৃৎ ১২৬
*উকা ২৯৩
উগচণ্ডা ২৬৩
উগ্ৰশ্ৰী ১৭৯, ২৬৮, ২৮৯
উগ্ৰসেন ৩০২, ৩৫৪-৫৬, ৩৮৬
৪১৯
উগ্ৰায়ুধ ৩১৬
উচথা ৪৩৩
উকৈঃশ্ৰবা ৩০৬
উদ্ভ ২৭৫
উতক ৩৪১
*উৎকল ৩০৪, ৩৬৭
†, *উত্তম ৩২২, ৩৩০, ৩৩৫,
৩৩৭, ৩৩৮
উত্তমোজা ৪১৫, ৪১৬
উত্তৰ-মীমাংসা ১১৭
উত্তৰা ২৫০, ৩৬১, ৪১৫
উত্তৰাধিকাৰ-বিধি ৩৬
উত্তৰায়ণ ৪৬২
*উত্তানপাদ ১৯৩, ৩৩০, ৩৩১,
৩৩৫, ৩৩৭।
†উদক্সেন ৩১৬
†উদয়ন ৩১৬
উদয়নাচাৰ্য্য ৯৬, ১০২
†উদয়াথ ৩১৬
উদাত্ত ৭৭

†উদাপি ৩১২
উদায়ী ২৭৫
*উদাবস্তু ৩০২, ৩৮৩
*উদাৰকীৰ্ত্তি ২৯৪
*উদ্যোত ৩৩৭
†উদ্ধব ৩০৯
†উদ্ভব ৩২৩
উদ্যোৎকৰ ১২২
উপদানবী ৩৬৭
†উপদেব ৩০৮
†উপনন্দ (উপানন্দ) ৩৫৬, ৩৮৮
*উপগু ২২৫
*উপগুপ্ত ৩ ২
*উপগুরু ৩০২
উপনয়ন ১৬৬
উপনিষৎ—স্বার্থ ৪৭; সংখ্যা
ও নাম-পরিচয় ৬৫; ঐতি-
পাত্ৰ ৬৬; তাহাতে ব্ৰহ্ম-
তত্ত্ব ৭০-৭১; উপনিষৎ
সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিত-
গণেৰ মত ৭১-৭২; রচনাৰ
কাল বিষয়ে ৭২, ৯৫, ১১৪;
স্বৈতান্যতৰ ১২৬
উপপূৰণ ৪৭; সংখ্যা ১৭১
উপস্ফাৰ (ভাষা) ৯৬, ১০০
†উপরিচয় বস্তু ২৬০, ৩১৫, ৩৫২,
৩৮৬ ৩৮৭; তাঁহাৰ বংশ
পরিচয় ৩১৬
উপাধি — ব্ৰাহ্মণেৰ, ক্ষত্ৰিয়েৰ,
বৈশ্যেৰ এবং শূদ্ৰেৰ ১৫৮
উপেন্দ্ৰ ৪৫৪
†উপ্ত ৩২২
†উষদ্রথ (উষদ্রথ) ৩২৪
†উরুক্ষ ৩১৫
*উৰ্জ্জবহ ২২৫
†উৰ্জ্জী ৩৫০, ৪৩০
উলু ৯৬
উলুপী ৪১৮, ৪৬০
†উলু ক ৩১১
†উশদ্রথ ৩৯৮

উপনাম ২৭৩, ৩১৪, ৩২৯
 উপনাম: ১৫৩, ৩৫৩
 উপনাম: সংহিতা ১৫৩, ১৫৪
 উপনিষ ৪২৯
 উপনিষদ ৩০৯, ৪১০, ৪১১, ৪২১
 উপবত (উপভ) ৩০৮, ৩২৭
 উপক ৩১৬

উ

উনবিংশ সংহিতা ১৩২; উন-
 বিংশ সংহিতার নাম ও
 পরিচয় ১৫০-১৫৯।

উজ্জ্বল ৩৫৬
 উজ্জ্বল ৩৩৮
 উজ্জ্বল ৩০০
 উজ্জ্বল ৩১২
 উজ্জ্বল ৩০২
 উজ্জ্বল ৪৩২

ঊ

ঊ (ঊত) ২৫
 ঊ ২৬, ২৭, ৭৮
 ঊ ৩০৫, ৩৫৮, ৩৮৩, ৩৯৯, ৪৩৩
 ঊ ২৬, ৩০-৩২, ৪৩, ৬১,
 ১৩২; তাহার ভাষ্যকারগণ
 ৪৬; সংহিতা ১৩, ২৬;
 তহুত দেশাদি ১৩; তহুত
 নদী প্রভৃতি ১৩; তহুত
 রাজ্যবর্গ ৫৫, ৫৭, ৪২২-
 ৪৩৩; তহুত যুদ্ধ-বিগ্রহ
 ৫৬, ৪২২ ৪৩৩; (বেদ
 প্রভৃতি)।

ঊ ৩১৬
 ঊ ৩১৩, ৩৪৬, ৩৪৯, ৩৫১,
 ৩৯০, ৪৫৯।

ঊ ৩১০, ৩৮৫
 ঊ ৪২২, ৪২৯।
 ঊ ৪২৫, ৪২৬, ৪৬০
 ঊ ৪৩০

*ঊ ২২৫, ৩৩৭
 ঊতধ্বজ (ঊতধ্বজ) ৪০৮-৪১০
 ঊতধ্বজ ৪১২
 *ঊতধ্বজ ২২৫
 ঊতধ্বজ ৩২১
 *ঊতধ্বজ (ঊতধ্বজ) ২২৩, ৩৪৫,
 ৩৯৫, ৩৯৬ ৪২৪

ঊতধ্বজ ৩১৪, ৩৮৫
 ঊতধ্বজ ৩১৬, ৩৩৩, ৩৩৭, ৩৯১,
 ৩৯৮, ৪২১, ৪৪৬
 ঊতধ্বজ—ভাষ্যকার ৪৫০; সপ্তবিধ
 ৪৫১; প্রাণান প্রশান ঊতধ্ব-
 গণ ৪৫১; ঊতধ্বদের বেদ-
 রচনা বিষয়ে বাদালোচনা
 ৪৩, ৪৫৫, ৪৫৭

*ঊ ২২৩
 ঊতধ্বজ ৩৫৪, ৩৬৪

এ

এ ৩১৮
 একচক্রা ২৪৩
 একচক্রা ৩০৯, ৪১৯
 একচক্রা (স্বর) ৭৮
 একমেবাদিতীয়ম্ ৩৫, ৩৬
 একাদশ রুদ্র ৪৪২, ৪৪৩
 একাদশী-তত্ত্ব (স্মৃতি রথুনন্দন
 মতে) ১৬৬-১৬৮
 একাদশ-কানন ৪৬৯
 একাদশ—লক্ষণের সহিত
 তাঁহার তুলনা ২৪০
 একাদশীউরাস—তাঁহার পর-
 মাণুবাদ ২২, ৫৪২
 একাদশীউরাস (মাউন্ট-ইউরাস)
 কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ-সম্বন্ধে তাঁহার
 মত ২৭০, ২৭২
 একাদশী ১৪১
 একাদশী—তাঁহার মতে আখ্যা-
 বর্তের সীমা ২৩; হিন্দু-
 গণের সভ্যবাদিতা সম্বন্ধে
 তাঁহার মত ৪৭০-৪৭১

ঐ

ঐতরেয় (ব্রাহ্মণ) ৩২, ৫৫
 ঐতরিন ৩১৩, ৩৮৬
 ঐতরীক ২৫৫

ও

ও ৫০
 ওষধী ৩০০, ৩৪৯
 *ওষধী ৩০০
 ওষধি ২২০
 ওষধি ৩১২, ৩৬৩, ৪০৫, ৪৩৫
 ওষধি—ভাষা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে
 তাঁহার মত ৮২
 ওষধি (কাণ্ডিন)—হরিদাস
 সাধুর সমাধি দর্শনে ১১৩
 ওষধি—হিন্দুগণের জ্ঞানো-
 রতি বিষয়ে তাঁহার মত
 ৮১; হিন্দুগণের স্থাপত্য-
 সম্বন্ধে তাঁহার মত ৪৬৯
 ওষধি ১৫

ঔ

ঔষধ (যক্ষ) ৩৩২; তাঁহার
 পুত্রগণ (বিভিন্ন পুরাণের
 মতে) ৩৩৯
 ঔষধ ৩৪৪, ৩৪৫, ৪৫১, ৪৬০
 ঔষধ (দর্শন) ৯৬
 ঔষধ: (ঔষধ) ১৫৩

ক

ক ৩১১ ৩৫৫, ৩৫৬, ৩৬০, ৪৬০
 ক ৩১১ ৩২১
 ক ৩২১, ৩৫৭, ৪৩৫
 ক ৪৫৮, ৪৬৭
 ক ৩১৩
 ক ৩২৭
 ক ২৬; তাঁহার বৈশে-
 ষিক দর্শন ২৬-১০০

† কথ ৩১৫, ৩৫৭, ৩৬৯, ৪৩৩, ৪৬১

† কতি ৩২৬

† কনক ৩০৮

কত্যা—বিবাহ-প্রণালী (স্মৃতি
দ্রষ্টব্য), বিবাহে পণগ্রহণ
২৭৪; বিক্রয় ১৫১; বাণ-
দত্তা ১৫৪, ১৫৭, ১৬০;
বৈদিককালের কত্যা সম্প্র-
দান প্রথা ৩৯

কপিল—সাংখ্য-প্রণেতা ৮৭;
তৎকৃত্য সাক্ষ্য-দর্শন ৮৭-
৯৫; অবতার ৪৪৪, ৪৪৫,
৪৪৭; তাঁহার মত ৩৪,
৯৫, ৩৪৫; তৎকর্তৃক সগর
বংশ ধ্বংস ও তদ্বিবয়ে
মতান্তর ৩৪৫

† কপিল ৩১৫

* কপিলার্শ ২৯৩

† কপোতরোমা ৩২১, ৪১০

কবশ ৪২৪

কবশ ঐলুয ৪৪, ৪৫৭

† কবি ৩১৯, ৩৩২, ৩৩৭, ৩৫৮,
৪৩৫, ৪৫৭

কবিতা—ছন্দের আদি ২৩৬

† কঙ্কলবহিষ ৩২১

কঙ্কোজ ৪১৭, ৪৬৭

* ককরুক্ষ ২৯৪, ৩০৩, ৩৮১

করভাজন ৩৩৪

† করবীর ৩২৩

† করজি ৩১৭

† কাকুশান ৩০৭

† ককরোম ৩২৬, ৩৮৯

* ককরু ২৯৩; ক্ষত্রিয়গণের
উৎপত্তি ৩৪৮

† কর্ণ ২৪৬, ৩১৪, ৪১৫, ৪১৬,
৪২২, তাঁহার দান-মাহাত্ম্য
৩৬৪

কর্ণাট ৪৩৫

কর্তব্য-ভাষ্ক-শীলক-কবিত ২৬৫

কদম ৮৮, ৩৩১, ৩৮৪ ৪৪৭

কদমায়ন ৪৫১

কর্ম ৭২, ২৬৪; পুণ্যজনক ১৫৮;

ব্রাহ্মণাদির ১৫১

কর্মকাণ্ড ১১৪, ১১৫

† কর্মজিৎ ৩২২

কর্মফল ৪৩, ১০৬, ১০৭, ১২৯,
১৪১

কর্মযোগ ২৬৬-৬৭; সন্ন্যাস-২৬৭
কলম্বস ৪৬৫

কলাপ—গ্রাম ৩৬০; দেশ
৪৩৫; ব্যাকরণ-কার ৮০

কলি ৮; পরীক্ষিত কর্তৃক তাহার
নিগ্রহ-কাহিনী ৩৬২, ৩৬৩;
তাহার শেষ ৪৪৭; দময়-
ন্তীর স্বয়ম্বর সভায় ৩৯৪

কলিযুগ ৮, ৯, ১১, ২৭৭; কলি-
যুগ প্রবর্তনা ২৭৭, ২৮২;
নিষিদ্ধ ধর্ম ১৮৮, ১৮৯

† কলিঙ্গ ২৭৪, ৩১৪, ৪১৩, ৪৩৪

ককি ১৮৯, ৪৩৫, ৪৪৪-৪৪৭

ককিপুরাণ ১৮৯

কল্ল—অর্থ ও নাম ১৯২, ৩৩০

কল্লহুত্র ৭৫, ৭৭

* কল্যাণপাদ ২৯৩, ৩৫৫

কল্লগমিত্র ৮৭

কল্ল ৪৩২, ৪৩৩, ৪৪৮

কল্লপ ২৩৪, ২৯২, ২৯৩, ৩৬৫,
৩৭৩, ৪১৩, ৪৫১; তাঁহার
বংশ ৩৬৫ এবং ২৯২
প্রভৃতি; তাঁহার হইতে
দেবদানব প্রভৃতির উৎ-
পত্তি ৩৬৫

† কল্লসেন ৩০৬

† কল্লহু ৩১০

কলীবান ৩৭৩, ৪২২, ৪২৫,
৪২৬, ৪৩১, ৪৫৮, ৪৫৯,
৪৬১

† কাকবর্ণ ৩১৬

* কাকুৎস্থ ৩০০, ৩৪১, ৩৬৩

† কাকন ৩১৩

† কাকনগ্রন্থ ৩০৭

† কাণদত্ত ১২৯

কাণ্ট—দর্শন-শাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার
মত ১৪৩

কাণ্ডার (স্থান) ২৩২

† কাণায়ন ৩১৫; বিজগৎ ৩৫৭,
৩৫৯

কাণায়ন-সংহিতা ১৫৫

কাণায়ন ৭৭, দশরথের মন্ত্রী
১৫৫, ২৩৪

† কাণায়নগণ ৩২৬

কানীন ৩৪৯

কান্দাহার ২৭৫, ৩৬৩, ৪৬৭

কাণ্ডকুজ ১৪৬

কাণ্ডেরী ৩৯২

কাম্যা ৩৩১

† কাম্পিলা ৩২১; নগরী ৩৫৯

কাণ্ডোডিয়া ৪৬৭

কাণ্ড-শরীর (ব্রাহ্মণ) ১২৯

* কাকু ২৯৩

† কার্জ ৩০৮

† কার্জবীর্ষ্যার্জুন ৩২৩, ৩৫১,
৩৫৩, ৩৮৮, ৩৯১, ৪০০; তৎ-
কর্তৃক রাবণ-বন্ধন ও মাহি-
মতী পুরী নির্মাণ ৩৫৩।

কার্ত্তিকের ৩৬৮

কার্জ ৬

কারোলি (গিরিগুহা) ৪৬৯

কালকের ২৪৯, ৩৬৭

† কালানল ৩১০

† কালানর ৩১৪

কালশোক ২৮৬

কালিদাস ২৬৬, ২৭৯, ২৮০

কালিকা-পুরাণ ২৩৩

কালী (অষ্টবিধা) ২১৪

† কাশ কাশী, কাশ ৩১৮, ৪০৬

† কাশিক ৩১০; কাশিগ ৩২৬
কাশী ৪১৯; নামের উৎপত্তি ও
প্রতিষ্ঠা ৪০৬; কাশী
নরেশগণ ৪০৬-৪০৮

† কাশীরাজ ৩১৩
 কাশীরাম ২৫৬, ২৫৭; তাঁহার
 মহাভারত ২৫৬-২৫৭
 † কাশেশ্বর ৩১৩
 † কাশ্যপ ৩২৬; (ধনুস্তরি) ৩৬২
 † কিকেনয় ৩১০
 † কিল্ল ৩২০
 * কিল্ল ২৯৬
 কিল্পুরুষ ৩৩৩; বর্ষ ৩৩৩
 কিরণাবলী ৯৬, ১০২
 কিরাত ৩৩৪, ৩৫৭, ৪১৭, ৪১৯
 † কীকট ৩৩৭, ৪৩৫, ৪৪৫
 কীচক ২৪৪
 * কুকৎস্থ ২৯২, ২৯৩, ৩৪১, ৩৭৯,
 ৩৮০, ৩৮২, ৩৯২
 * কুক্কি ২৯২, ৩৩১, ৩৭৯
 * কুকুদ্রি ৩৪৯; পুণ্যজন দম্মা
 কর্তৃক তাঁহার নগর অধি-
 কার ৩৪৯; তাঁহার রাজ-
 ধানী কুশস্থলীর দ্বারকা-
 পুরী নাম ৩৪৯
 † কুকুর ৩২১, ৩৫৬
 * কুণ্ডক ২৯৬
 কুণ্ডলনগর ৪১৩
 † কুণ্ডিক ৩০৬
 † কুণ্ডীণ ৩০৬
 † কুণ্ডোদর ৩০৬
 কুৎস ৪২২, ৪২৩
 † কুস্তি ৩০৮
 কুস্তী ২৪৩, ৩৫৫, ৩৮৮
 কুস্তীভোজ ৩৫৫, ৪১৫
 * কুবলয় ২৯৩, ৩৪১ ৪০৯,
 ৪১০; তাঁহার ধুম্মার
 সংজ্ঞা প্রাপ্তি ৩৪১; কুব-
 লয় নামক অর্থ ৪০৯
 কুন্তকর্ণ ২৩৩, ২৩৪
 কুবলয়পীড় ৩৫৭
 * কুবলায় ২৯৭; ঐ অর্থ ৪০৯
 কুমারিল ভট্ট ৬৩, ১১২
 কুবব (দম্মা) ৪৭

কুযবাচ ২২৭
 †, † কুরু—রাজ্য ৭৩; আয়িগ্র
 পুত্র ৩৩৩; রাজা ৩০৪-০৫,
 ৩৩৮, ৩৫৯, ৩৮৬
 কুরুক্ষেত্র—যুদ্ধ ৮, ১৪৯, ২৭১,
 ২৭৬, ২৭৯, ৪১৫, ৪১৭;
 যুদ্ধের সময় ২৮১-২৮৯;
 যুদ্ধ উপস্থিত রাজকুল-বর্গ
 ৪১৫; পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের
 মত ২৭৬
 কুরু-জালাল ৩৫৯
 কুরু-পাণ্ডবের বিবরণ ২৪২, ২৪৫
 † কুরুবংশ ৩২০
 † কুরুবৎস ৩১৭
 কুরুবর্ষ ৩৩৩
 কুরুযান ৩৩২
 কুলিন্দরাজ ৪১৭
 *, † কুশ ২৯২, ৩০৭, ৩৮০-৩৮৪,
 ৩৯৮, ৪৬০; দ্বীপ ৩৩২
 * কুশধ্বজ ২৯৪, ৩৮৪, ৪০৯
 † কুশনাভ ৩০৭, ৩৯০
 † কুশাগ্র ৩১২
 কুশাবতী ৩৯৮
 † কুশাবর্ত ৩৩৪, ৩৩৭
 † কুশাধ (কুশাধু) ৩২৬, ৩৯০
 * কুশাধ ২৯৪, ৩৮১, ৩৮৩, ৩৮৯
 † কুশিক ৩০৭, ৩৫০, ৩৯২
 * কুশী ৩১৫, ২২৭, ৪১৩
 কুশুম্বালি ১০২
 * কুনি ২৯৫
 কুশ-অবতার ৪১৪, ৪৪৭
 কুশপূরণ ১৭১, ১৮৬, ১৮৭
 † ককনের ৩২৮
 † কৃতক ৩১৫, ৩৮৮
 * কৃত্য ২৯৯
 * কৃতজ্ঞ ২৯৬
 † কৃততেজ ৩৩৮
 † কৃতদেব ৩১৩
 † কৃতবীৰ্য ৩০৮
 † কৃতবজ ৩২২

* কৃতবর্ষ ২৯৪
 † কৃত্যি ৩১৪
 *, † কৃত (কৃতী) ২৯৪, ৩০৭, ৩১৪
 † কৃতীমান ৩২০
 * কৃতীরথি ২৯৪
 † কৃতৈয় ৩১৫
 † কৃতৌজা ৩০৮
 † কৃতবর্ষা ৩০৮, ৩৫৫, ৪৩৫
 কৃত্তিবাস—তাঁহার রামায়ণ ২২৬,
 ২৫৬; তাঁহার রামায়ণে ও
 বায়ীকির রামায়ণে পার্থক্য
 ২৩০-২৩৪
 † কৃপ ৩২১, ৪১৬
 কৃপাচার্য ৪১৬
 † কৃপী ৩২১, ৪১৬
 † কুমি ৩১৮
 *, † কুশাধ, কুশাধ ২৯৩, ২৯৫, ৩০৭
 † কুশেয় ৩২৪
 †, † কুরু ৩২৬; ৩৩৭, ৩৮৮,
 ৩৮৯; নামক দম্মা ৫৭;
 দ্বৈপায়ন ৩৬১, ৩৮৭
 (শ্রীকৃষ্ণ জট্টা))
 কৃষ্ণচন্দ্র (মহারাজ) ২১৪
 কৃষ্ণনগর ২৭২
 কৈকয়—দেশ ২৭৫; রাজা
 ৩১৯, ৩৬৩
 কেতুক ৪৮
 কৈতুমান ৩০৭, ৪০৮
 † কৈতুমান ৩৩৩, ৩৩৮; বর্ষ ৩৩৩
 *, † কৈরল ২৯৪, ৩০৭
 কেশিনী ৩৪৪
 কৈকেয়ী ২১৮, ৩৪৬, ৩৯৭, ৪১০
 কৈবল্য ৯২, ১১০-১১২
 কোয়েটজালকোটল ৪৬৫
 † কোল ৩০৭
 কোলক্রক—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ-
 সম্বন্ধে তাঁহার মত ২৭০
 কোলানগরী ২৭৬
 কোশল ৭৩, ৩৯৮, ৪১৯
 কোটীল্য ২৭৭

কৌথুমী ৩২
কৌরব ২৪২, ৩৫৩
কৌরবা ৪১৮
কৌলীজ—প্রাচীন কালের ৪৫২
কৌশল্যা ২১৮, ২২৮, ৪৬০
কৌশাঘী ৩৬৩
† কৌশিক ৩২৩
কৌষিতকী ৩২
‡ ক্রতু ৩৩৭
† ক্রতুমান ৩১৮
† ক্রমণ ৩২৭
† ক্রথ, ক্রাথ ৩১৪, ৩০৬
† ক্রমি, ক্রমিণ ৩০২
† ক্রমিল ৩২৪
‡ ক্রিমি ৩২৭
ক্রিয়াচার্য্য ৩৬৩
ক্রুক্স (সার উইলিয়ম)—
পদার্থ-তত্ত্ব বিষয়ে তাঁহার
মত ১৪১
* ক্রুদ্ধোদন ২২৬
ক্রোষ্টু (ক্রোষ্টা) ৩০৮, ৩৫৩,
৩৫৬, ৩৮৭-৩৮৯
ক্রোধদ্বীপ ৩৩২
ক্রাইব (ক্রিব) ২৭২
* ক্রত ২২৩
† ক্রতধর্ম্মা ৩১৩
† ক্রতবুদ্ধ ৩০৭, ৩৮৫, ৩৮৯
ক্রতুগ্রী ৪৩২
ক্রিয়—উৎপত্তি-তত্ত্ব ৪১
কার্য্য ১৫১, ১৫৮; শূদ্র-
প্রাপ্তি ১৬১; তাঁহাদের
ব্রাহ্মণ্য লাভ ১৫৮, ১৫৯;
অন্ত্যস্ত ৪৬, ১৬১, ২৮১
৩৩৪, ৪৪৯, ৪৫৩; শেষে
ক্রিয় বংশের মূল ৩৪৬
ক্রোপেত ব্রাহ্মণ ৩৪৯, ৪৫৬
ক্রীসমুদ্র ৩৩২
* ক্রুদ্র (ভবিষ্য-বংশে) ২২৬
* ক্রুদ্রক ৩০১
* ক্রুপ (আদিমজা) ৩৮২, ৩৮৮,

৩৯৯; তাঁহার অদ্ভুত জন্ম-
বিবরণ ৩৮৮-৩৯৯; বংশ-
লতায় ২২৪
† ক্রমক ৩২৪, ৪০৮
* ক্রমধর্ম্মা ২৯৩
† ক্রমধর্ম্ম ৩১৬
† ক্রমধর্ম্মি ৪১৭
* ক্রমারি ২২৫
* ক্রমার ২২৫
† ক্রম্যা ৩১১
—
খ
* খট্টাস (দিলীপ) ২০৩, ৩৪৬,
৩৮০
* খনিত্র ২০৪ ৩৮২
* খনিমেন্ত্র ২০৪, ৩৮২
খর ২১৯
† খল ৩১৪
† খণ্ডপানি ৩১৬
খশ ৩৫৮, ৪৬৭
খাণ্ডবদাহ ২৪২, ৪২০
খাণ্ডব-বন ৪২০
* খাণ্ডিকা ৩০২
‡ খুতেয়ু ৩২৪
খুটান ৬০
খেল ৪২২, ৪২৫-৬, ৪৬০-১

গ

গঙ্গা ৩৪৪, ৩৫০; ভগীরথ কর্তৃক
মর্ত্ত্যে আনয়ন ৩৪৪;
জাহ্নবী নামের হেতু ৩৫০
গণ্ডকী ৩৩৪
† গণ্ডু ৩০৯
† গদ ৩০৯
গদ্যবসান-ক্রত ৩৬০
গন্ধবতী ৩৮৭
গন্ধমাদন বর্ষ ৩৩৩
*, †, ‡ গয় ৩০০, ৩০৫, ৩৩৭
(রাজর্ষি) ৩৩৪

† গস্তার ৩১৮
গয়া ১৩৪, ১৭৮, ৩৬৮, ৪৪৭;
তাঁহের উৎপত্তি ৩৬৮
গয়াসুর ৩৬১
গরুড়-পুণ্য ১১৮, ১৭১, ১৭৭,
১৭৮; এতদ্বাধ্যো আয়ুর্বেদ-
তত্ত্ব ১৭৭; হারকাদির
আকরস্থান, গুণ ও পরীক্ষা
প্রভৃতির বিষয় ১৭৮; রাজ-
ধর্ম্ম প্রসঙ্গ ১৭৮
গর্গ ৪৭০
† গর্ভ ৩১৪
† গহ ৩২৫
গাত্তাব ১৫১, ২৬১
† গাধি ৩০৭, ৩৬০, ৩৯০, ৩৯২
গান্ধিনী ৩৫৪
† গান্ধার ২৭৫, ৩০৭, ৩৬৩, ৪১৯,
দেব ৪৬৭
গান্ধারী ২৪২, ৩৫৩, ৩৬১
গান্ধিয়া ৩৭৯
গায়ত্রী ৭৬, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৮,
৪৫৫; মাহাত্ম্য-মন্ত্র ঋগ্বেদে
—৪০৬
গার্গী ৪৭০
গার্গ্য ৩৫৮
গাহ্‌ইয়া ধর্ম্ম ১৪৮
গালব—৪০৯
গীতা (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা দ্রষ্টব্য)
গুণত্রয়—২৬৮
† গুরু ৩১৩
গুরুক্ষেপ ২২৬
গুহা ১৬১
গুহ ২১৮
† গৃহ্মি ৩০৯
† গৃৎসমতি ৩১০
† গৃৎসমদ ৩০৭, ৪০৭, ৪৫৬, ৪৫৭
গৃধ্র (রাক্ষার ভদ্ভাব)—৪০১
গৃহবিবাদ ২৪৫
গোকর্ষ ৪১৩
গোকুল ৩৫৬

গোতম ৩৭২, ৪২৩
 গোতমীপুত্র ৩১৭
 গোনর্দ ২৭৮, ২৮৭, ২৮৮
 গিগোভাসু ৩০৭
 গোমতী ৪০৮, ৪৩২
 গোবিন্দ-ভাষ্ক ১২৪
 গোভিল ১৫৫
 গোলাধার ৪৬৩
 গোড়পাদাচার্য্য ১১২
 গোঁড়ীয় মহাভারত ২৬০
 গিগোভাস ৩৪, ১০১-১০৭, ১৫২,
 ২৩৭, ২৮১, ৪০১
 গোতম আশ্রম ১০২
 গোতম-সংহিতা ২৬২
 গোতম-সূত্র ৭৭
 গৌরমুখ ৪০৬
 গিগোরী ৩১০
 গ্রীকেশ্বর ৪৬২
 গ্রীস ৬; তথায় জায়দর্শন
 ১০২; তথায় শর্মাচার্য্য
 ১০২; দেশের উৎপত্তি
 ৪৬৬, প্রাচীন জাতি ৪৬৭

ঘ

ঘাটাংকচ ৩১৬
 ঘর্ম্ম ৩২৩
 ঘৃত ৩০৭
 ঞ্জতপুট (পৃষ্ঠ) ৩৩১-২, ৩৩৭
 য়তসমুদ্র ৩৩২
 ঘোষবনু ৩১৭
 ঘোষা ৪৬১

চ

চিকোর সাতকর্ণি ৩১৭
 চক্রাকাপুরী ৪১২
 চিকু ৩১৫
 *চকু ২২৩
 চকু ৩৫০, ৩৬১
 চকী ১৮৩, ১৮৪

চিত্তুরঙ্গ ৩১১
 চতুর্ভুজ মিশ্র ২৯০
 চন্দ্রন হৃদ্যন্ত ৩২৫
 চিত্র ৩০৪, ৩১৩, ৩৫৪, ৪৩৪;
 স্বর্ঘ্যারাম হইতে তাঁহার
 আলোক প্রাপ্তি ৩৬২
 চিত্রকৈতু ২২৬
 চন্দ্রগুপ্ত ১০.১১; তাঁহার রাজ্য
 প্রাপ্তি ২৭৭, ২৭৮, ২৮৮,
 ২৮৯; ভবিষ্য রাজবংশের
 বংশলতায় ৩১৭
 চন্দ্রগ্রহণ ৪৬২
 *চন্দ্রপর্কিত ২২৮
 চন্দ্রবংশ ২২১; বংশলতা ৩০৪-
 ৩২২; তৎসংশ্লিষ্ট নুপতিগণ
 ৩৫০-৩৬৪
 চন্দ্রশ্রী ৩১৭
 চিত্রাপীড় ৩২৮
 *চন্দ্রালোক ২২৮
 চিত্রাখ ২২৩
 চমস ৩৩৪
 চিম্প ৩১১, ৩৪৪
 চম্পক ৪১৩
 চম্পাপুরী ৩৪৪
 চয়মান ৪২২, ৪৩০
 চরক ৪৬১
 চরণবাগ ৩১
 চরণে দৃষ্টিশক্তি প্রকাশ ১০১
 চাঁচাক্ষ ৩১০. ৩৩৮. ৩০২
 চাক্ষুষ মনু ৩৩২; তাঁহার পুত্র-
 গণ ৩৩৯
 চাণক্য ১০২, ২৭৭, ২৭৮, ২৮৬
 চানুর ২৭৫, ৩২৭
 চার ২৩৫
 চারুদেবতা ৩২৫
 চারুদেফ ৩০৯
 চারুপদ ৩১২
 চার্কাক ১৩২
 চার্কাক দর্শন ১৩২-১৩৭;
 তাহার উৎপত্তি ১৩২; হৃদ ও

দর্শন প্রচারের উদ্দেশ্য
 ১৩৪; চার্কাক দর্শন ও
 বৌদ্ধ দর্শনে পার্থক্য ১৩৪
 চিকিৎসা শাস্ত্র ও চিকিৎসাতত্ত্ব
 —পঞ্চাদির ৪৬১
 চিত্তেয় ৩২৪
 চিত্র ২৩৫, ৪২২, ৪৩৩
 চিত্রক ৩০৮
 চিত্রকুর ৩১৮
 চিত্রকূট ২১৮
 চিত্রকৈতু ৩০১
 চিত্রকর ৩০৮, ৩৬৪, ৩৮২, ৪০৩
 ৪২৭
 *চিত্রসেন ৩০০, ৩০৬, ৪০৩,
 ৪১৩
 চিত্রা ৩০৮, ৪৩৩
 চিত্রোদয়া ৩৫৬, ৩০৬, ৩৬০,
 ৩৬১, ৪১৮, ৪২২
 চিত্তা ৩৭৭
 চিত্তার স্তর ৫১
 চান ৩৭৬, ৪৬৬, ৪৬৭
 চুরি (সংহিতা অনুসারে তাহার
 অর্থ) ১৪২
 চেকিতান ৪১৫
 চিচৈদপ ৩২২
 চৌদরাজ ৩২৪
 চিচৌ ৩২৮, ৩৪২, ৩৮৭, ৪১২
 চৈতন্যদেব ১১৩
 চৈতন্যগণ ৩১৬
 চৈতন্যরথ ৩০৫
 চিচৌল ৩০৭
 চৌগ্যাপরাধে দণ্ড (সংহিতা
 মতে) — ১৬০, ১৬১
 চিচাবন ১৭৪, ৩১২, ৪২৪, ৪৩১,
 ৪৫১, ৪৬০ ৪৬১; তাঁহার
 চির-যৌবন প্রাপ্তি ৩৪৮

ছ

ছন্দ ও আবিকার ৭২
 ছন্দঃজান—গায়ত্রী, উটিক,

অশুভ, ভ, ঙ, ত, বৃহত্তী, পংক্তি,
ত্রিহ্রস্ব, জগতী প্রভৃতি ৭৯
ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৬৭

জ

জগৎ ১০৪, ১২৮, ১৩০, ১৩৩
২২৫

জিগৎসেন ৩০৭
জগদীশ তর্কালঙ্কার ১০২, ১০৫
জটায়ু ২১২, ২২৭

*জগদ্বাক্ষত্র ৪০৪, ৪০৫
তৎপ্রতিষ্ঠা কাহিনী ৪০৫

জতুগৃহ দাহ ২৪৮

*জনক (রাক্ষস) — ৬৪, ৭৩,
১৫২, ২২১, ২২৪, ৩৪৭,
৩৩৩, ৩৯২, ৪০১, ৪৫১,
৪৩১; তাঁহার ঐ নামের
বেতু ৩৪৭; তাঁহার পৈতৃক
ও মিথি নাম প্রাপ্তির
কারণ ৩৪৭; তাঁহার
ব্রাহ্মণ্য প্রাপ্তি ৭৩

*জিনমেজয় (ভয়েজয়) ২৫৮,
২৮২, ২৯৫, ৩০৬, ৪৬৩, ৩৭৩

জনস্থান ৩৩৯

জনা ৪১৯

জিন্ত ৩১১

জন্ম ১৩৪

*জনার্দন ভট্ট ২৯০

জন্মান্তর ১০৬, ১০৮

জন্মান্তর তত্ত্ব ৪৫৩

জবন (মহুমতে) ১৬১

জিমদয়ি ৩০৭, ৩৬১, ৪৫১

জম্বুদ্বীপ ১৬, ২৩, ৩৩২; তাহার
অর্থ ৩৩৩

*জয় ২২৬, ৩০৭

জয়দ্রথ ১১১, ৪১৫, ৪১৭, ৪১৮

জয়ধ্বজ ৩১২, ৩৬৩, ৪০৮

জয়ন্ত ২৩৪, ৩৬৭

জয়শেন ৩১৩

জরা ৩৫৯

জিহ্বাসন্ধ ২৪৮, ৩১২, ৩৫২,
৩৬০; তাঁহার অলৌকিক
জন্ম বিবরণ ৩৫৯

জর্ষণ ১৫

জগদী ২২, ৪৬৬

জল ৬৮, ১৩৮

জলপ্রাবন ৬২, ১৮৬

জল সমুদ্র ৩৩২

জিলেয়ু ৩১০

জিহ্ব ৩২২

জিহ্ব ২২২, ৩৫০, ৩৫১, ৩৮৬,
৩৯২, ৪২২

জাতি—অস্তাজ ১৫৪, ১৫৭;

জাতিভেদ প্রথা (বেদে)

৩৯, ৪৪, ৪৫৪; জাতি-ভেদ

তত্ত্ব ৪৫৬-৪৫৮; জাতিধর্ম

৪২; জাতিপাত ১৬

জাতুকর্ণ ৩৪৯

জানকী ৩৯২ (সীতা; দ্রষ্টব্য)

জানালি ১০২, ২৩৪

জাদবতী ৩৫৭

জাদবান ৩৫৪

জানানন্দ ৩০৬

জাব্রফিউ ৪৬৫

জালহাসিনী ৩৫৭

জাহব ৪২২, ৪২৬

জিও ৬০

জিতব্রত ৩৩৭

জিতারি ৩০৬

জীব (তত্ত্ব) ১২৬-১৩০

জীমূত ৩০৮

জীমূতবাহন (দারভাগ প্রণেতা)
১৫৩, ১৬৯

জু, জুপিটার ৬০

জেন্দ আভেস্তা ১৩, ৫৪

জৈগীষব্য ৩৫৯

জৈন (দর্শন) ১৩৭

জৈমিনি ১১৪-১১৯, ১৩০, ২৫৬,
৪৫১; জৈমিনি-ভারত

১১৪, ১১৯; তাঁহার দর্শন

শাস্ত্র ১১৪; জৈমিনি ও
বেদ ১১৬

জোনু (সার উইলিয়ম)—

ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে
তাঁহার মত ৬; হিন্দুদিগের
রচনার প্রাচীনত্ব বিষয়ে
তাঁহার মন্তব্য ১০; মনু-
সংহিতা রচনার কাল নিরূ-
পণ সম্বন্ধে তাঁহার মত ১৫৪

জোর্দান আরণ্য ১১; ভারতের
অভিনবদ্য বিষয়ে তাঁহার
মত ৫; ধর্ম ও সভ্যতার
প্রাচীনত্ব বিষয়ে তাঁহার
মন্তব্য ৯

জান-কর্ম্মাস (যোগ) ২৬৭

জান-বিজ্ঞানোন্নতি ৪৬০-৪৭২

জান-যোগ ২৬৭

জ্যামঘ ৩০৮, ৩৫৩; জৈনদের
দৃষ্টান্ত ৩৫৩

জ্যামিতি ১০, ৭৬, ৪৬৯

জ্যোতির্বিজ্ঞা ৫, ১০, ২৭০, ২৭৯,
২৮০, ৪৬২-৬৩

জ্যোতিষ ৮০

জ্যোতিষ্মান ৩৩১, ৩৩২

টড (কর্বেল)—গ্রীক দর্শনের

আদর্শ—ভারত ৫; বিশ-
বের আদি—ভারত ৩৭৫-
৩৭৬; রাজগণের রাজত্ব-
কালের তুলনা ৩৯০; সার্ব-
সেনগণের খেলান নির্মাণ-
পদ্ধতি—ভারতের অস্থি-
করণে ৪৬৯

টমসন—সংস্কৃত ভাষার অধিতী-
য়ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার মত ৮২

টলেমি—তাঁহার মতে আর্ঘ্যা-
বস্তুর সীমানা ২৩

টিটোন ৫৪, ২৪০

টিনাইট থেবাইন ৭

ট্রয় যুদ্ধ—বৃত্তান্তের সহিত
তুলনা ৫৪, ২৪০

উ

ডাইওনিসাস ১১

ডারউইন—জীৱের বিবর্তবাদ
(Evolution Theory)
১৪১

ডুগ্লস ৪৫১

ডেমক্রেটাস—জীৱের পরমাণু-
বাদ-তত্ত্ব (Atomic Theo-
ry) ৯৯, ১৪২

ডেমিট্রিয়াস (পলেনাস)—গ্রীক
ভাষায় গীতার অনুবাদক
২৯০

ড্যান্টন—জীৱের পরমাণুবাদ-
তত্ত্ব (Atomic Theory)
৯৯, ১৪২

ত

† তাম্বু ৩০৫, ৩৭৫

তাম্বুরোম ৩২৪, ৩৮৫

* তক ২৯৬, ৩০১

তক্ক ৩৬২, ৪৬১

তক্ষির ৪৩৩

তক্ষ-জ্ঞান ১০৩, ১০৮, ১১০,
১২৫, ১৪০, ২৬২

তক্ষ-প্রদীপিকা ১১০

তক্ষ-বৈশাখরদা ১১০

† তক্ষর ৩১৮

তক্ষ ৪৭, ২০৭-২১৪; সংজ্ঞা-পরি-

চয় ২০৭; সংখ্যা ও নাম

২০৮; বৌদ্ধ-তত্ত্ব ২০৮;

পক্ষ-মকাবে-তত্ত্ব ২০৯;

তক্ষের সাত-মন্ত্র ২১০;

নব্যবিধ তাক্ষিক আচার

২১১; তাক্ষিক ভাবপ্রয়

২১১; অষ্টবিধ তাক্ষিক

অভিধেয় ২১২; তক্ষের সূত্র-

তত্ত্ব ২১২; তক্ষের অঙ্গ ও

প্রক্রিয়া ২১২; বৌদ্ধমন্ত্র
২১৩; তক্ষের কাল ২১৩;
তিরতীয় ভাষায় বৌদ্ধ-তত্ত্ব
২১৩; তত্ত্ব মতে গুরু শিষ্য
২১২; প্রণাম মন্ত্র ২১৪;
পূজা-পদ্ধতি ২১২; অষ্টবিধা
কালী ২১৪; শক্তি-পূজার
প্রাধিকার ২১৪

† তক্ষিক ৩০৯

† তক্ষিকি ৩২৭

† তক্ষিপাল ৩০৯, ৩২৭

† তক্ষিক ৩৩৭

† * তর্পিত ২৯৮, ৩০৫, ৩৫৯

তপস্বী ১৫০, ১৫১, ১৫৪

তপোবল ১৫৪

তরণী (তরণীসেন) ২৩০, ২৩৪

তরঙ্গ ৪৩২

তরাস (গিরিশ্রেণী) ২৩

* তরুণ ২৯৮

তর্ক-চলিকা ১০২

তান্দা (তান্ডা) ত্রাঙ্গণ ৬৩

তাম্র (ময়ূ) ৩৩২; জীৱের

পুত্রগণ (বিভিন্ন পুরাণের

মতে) ৩৩৯

তাম্রকুণ্ড (তাম্রকুণ্ড) ৩৭৯

তারকা ৩৭১

তারকারি ৩৬৮

তারকাসুর ৩৬৮

† তারা ৩১৩, ৩৫০

* তারাপাড় ২৯৮

তানকেতু ৪১০

† তালভব ৩০৮, ৩২৪, ৩৫৩, ৩৯১

তিউ ৬০

† তিগ্ন ৩১৬

† তিগ্নকেতু ৩৩৭

† তিগ্নিক ১১১

† তিত্তি ৩১০

† তিত্তিরি (তিত্তিরি) ৩০৯

† তিথি-তত্ত্ব ১৬৬

† তিত্তিরি ৪৩২, ৪৩৩

† তিমি ৩২২

† তিলিরি ৩২৭

তীর—প্রাচীনকালের এবং
বেদোক্ত ৫৬

তীর্থ ১২৮

তুগ্র ৪২২, ৪২৫, ৪৩২

তুজি ৪৩২

† তুণি ৩১৭

তুহুজি ৪৩২

† তুঙ্গ ৩১৪

তুঙ্গান ৪২৩

† তুঙ্গ ৩০৫, ৩১২, ৩৬৩, ৩৮৫,

৩৮৯, ৪২২-৪২৪, ৪৪৮, ৪৫৪

তুঙ্গাতি ৪২২

† তুঙ্গান ৩১৭

* তুর্ণবন্দ ২৯৫, ৩৩৩

তুর্ণবর্ত ৩৭১

তেজ (দর্শন মতে) ৯৮

তেজপুর ৪২২, ৪১৩

† তৈত্তিরীয় সংহিতা ১৩২

† তৈত্তিরীয় ৩৩১, ৩৭০, ৩৭২

* † ত্র্যাক্ষণ (ত্র্যাক্ষণি) ২৯৩,

৩১৫, ৩১৮, ৪২৮, ৪৫৬

* ত্র্যক্ষ ২৯৭

* ত্র্যক্ষ (ত্র্যক্ষ) ৩৪২,

৪২২, ৪২৫-৪২৮, ৪৩৩, ৪৪৮

ত্র্যক্ষী ২৬, ২৩৭

ত্র্যাক্ষণমিতি ৪৬৯

ত্র্যাক্ষ ৪১৮; রাজা ৪১৬

* ত্র্যাক্ষ ২৯৩

* ত্র্যাক্ষ ৩০১

ত্র্যাক্ষ (ত্র্যাক্ষ) ৩২৭

ত্র্যাক্ষিক ৩৬৮

ত্র্যাক্ষারি ৩৬৮

ত্র্যাক্ষার ৩৬৮

ত্র্যাক্ষ ৪২৮

* ত্র্যাক্ষ ২৯২; জীৱের চতু-

র্থ প্রাপ্তি এবং রাজ্য

অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ ৩৪২

† ত্র্যাক্ষ ২১৯

ত্রিখর্ষ্য ৭৮

ত্রৈতাযুগ ৯, ২৩৮

† ত্রৈশাস্ত্র ৩০৭

† ত্রৈশাষ ৩১৪

ত্রাকুণ ৪২২, ৪২৮, ৪২৯

থ

থেবাইন (টিনাইট) ৭

থিবো—হিন্দুদিগের জ্যামিতি-

বিজ্ঞা বিষয়ে তাঁহার মন্ত ৭৬

*† দক্ষ ১৫৮, ১৬৫, ৩০২, ৩১৯, ৪৫২; প্রজাপতি ২৯৪

দক্ষ-সংহিতা ১৫৮

দক্ষিণায়ন ৪৬২

দণ্ড—সুরাপানে ১৬০; চৌর্য্যাপরাধে ১৬১; বিবিধ ১৬১-১৬২; অপরাধের তার-তম্যানুসারে বর্ণ-বিশেষের দণ্ড ১৬২

* দণ্ড (রাজ্য) ২৯৪, ৩১১, ৩৯৯

দণ্ডকারণা ২১৮, ৩৯৯; তাহার উৎপত্তি বিবরণ ৩৯৯

† দণ্ডশাস্ত্র ৩০৯

† দণ্ড ৩০৯, ৪৪৬

† দণ্ডধর্ম ৩০৯

দণ্ডাক্রমে ২৯০, ৩৫৩, ৪০৯, ৪৪৪, ৪৪৬, ৪৪৭

† দণ্ডবাহন ৩১০

দণ্ডসমূহ ৩৩২

দণ্ডতি (দণ্ডক) ৩৭০, ৩৭২, ৩৭৩, ৪৬০

দণ্ড ৩৬৬; তাহার পুত্র দানব-গণ ৩৭৭

দণ্ডধর্ম ৩১৫

দণ্ডতি ৪২২, ৪২৭, ৪২৯

* দম ২২১, ২২৪, ৩৮২, ৩৮৩

† দমঘোষ ৩৯৯, ৩৫৫

† দমন ৩০৯, ৪১৩

দময়ন্তী ১০৫, ৩৪৫, ৩৭৭,

৩৯৩ ৩৯৫

দরদ ৪৬৭

দর্ভ ৪৩১, ৪৫৭

† দর্ভক ৩১৬

দর্শন ৪৭; ষড়্দর্শন ৮৩-৮৬;

সাম্প্রদায়িক ৮৭-৯৫; বৈশেষিক

৯৬-১০০; জায় ১০১-১০৯;

পাতঞ্জল দর্শন ১১০-১১৩;

মীমাংসা দর্শন ১১৪-১১৬;

বেদান্ত ১১৭-১৩১; চার্ব্বাক

ও বৌদ্ধ ১৩২-১৩৭; ষড়্-

দর্শন-সময় ১৩৮-১৪৩;

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন

১৪১-১৪৩; অক্ষপাদ ১০১

* দল ২৯৪, ৪২০

† দশন ৩০৭

*† দশরথ—২১৮, ২২০, ২৩০-২৩৫, ২৯১-২৯৩, ৩১১, ৩৪৬, ৩৫৪, ৩৬৪, ৩৭০, ৩৮২, ৩৮১, ৪১০, ৪৬০; তাহার শাসন-প্রণালী ও রাজ্যের অবস্থা ২১৯-২২০; তাহার রাজ্য পরিমাণ ৩৮৬-৩৮৭; তাহার মন্ত্রিদত্তা ২৩৪

দশানন ২২৭

দশার্ণ ২৭৫, ৪১৯

† দশার্ণেয় ৩১০

† দশার্ণ ৩০৮

দশোনি ৪৩২

দাক্ষায়ণী ২৯৩

দাতাকর্ণ ৩৬৪ (কর্ণ জটব্য)

দানব ৩৩৬, ৩৬৫-৩৭৩

দানবেশ ১১

দায়ভাগ ১৫৩, ১৬৬

দায়-এক-বাব্ ৩৭৮

দাস ২৫, ১৫৮

† দাসক ৩০৯

দাহ—সংস্কার প্রথা ৩৯, ৪৪

দিক্‌নাগাচার্য্য ১০২

দিত্তি ৩৬৫

দিনেমার ১৫

* দিবাকর ২৯৬

দিবাকীর্তি ২৬৫

দিবাগতি—ত্রাকার ২; দিবা-

গতি হইবার কারণ ৪৬৩

† দিবিকান্ত ৩০৩

† দিবিরথ ৩০৫

† দিবিলক ৩১৭

† দিবোদাস ৫৭, ৩০৭, ৩৬৯, ৩৮৯,

৪০৬-৪০৮, ৪২২, ৪২৩, ৪২৫,

৪৩২, ৪৫৫, ৪৬১

দিবোদাসেশ্বর ৪০৮

† দিবা ৩১৭

দিব্য-যুগ ২৮৩; বর্ষ ৯

*† দিলীপ ১৬৫, ২৯২, ৩১৫,

৩৪৫, ৩৪৬, ৩৮০, ৩৮১

দিল্লি ৩৮২, ৩৮৩

দীননাথ ৪১৪

দীনেশ (বা দানবেশ) ১১

† দীর্ঘতপা ৩০৭

† দীর্ঘতমা ৩১৩, ৩৬৩, ৩৭৩,

৪২৬

* দীর্ঘবাহ ২৯৫, ৩৮০

দুঃখ-নিবৃত্তি (দর্শন-মতে) ১৩৯-

১৪০

দুঃশলা (দুঃশীলা) ৩৬১, ৪১৭,

৪১৮

† দুঃশাসন ২৪২, ৩০৬, ৩৬১

† দুহুহ ৩০৬

† দুন্দুভি ৩২১

† দুর্বারতন্ত্র ৩১৯, ৩৫৮

† দুর্গম ৩১৪,

দুর্গম ৪২৭

দুর্গা ৩৬৮, ৩৭১, ৩৭২

দুর্গাদাস ৪৭২

দুর্গাসুর ৩৬৮, ৩৭১

দুর্জয় ৪০৬

† দুর্দম ৩০৯, ৪০৮

† দুর্দমন ৩২২

দুর্কাসা ২৩৯, ৩৪৯
 দুর্ভিক ৫৭, ৩৪২, ৩৬০, ৩৬৪,
 ৩৬৮
 দুর্জয় ৩১৯
 দুর্জয় ৩২১
 দুর্জয় ৪২৭
 দুর্জয় ১৩২, ২৪১, ২৪৬,
 ২৫৭, ২৬১, ২৬৪, ২৭১,
 ৩০৬, ৩৬১, ৪১৫-৪১৭
 *দুর্জয় ২২৩
 দুর্জয় ২১৯
 দুর্জয় ৩০৫, ৩৫৭, ৩৬৩, ৩৬৬,
 ৩৮৫, ৩৯৯
 দুর্জয় ৩২২
 দুর্জয় ৩১৫
 দুর্জয় ৩১৬
 দুর্জয় ৩১১
 দুর্জয় ৩১৬
 *দুর্জয় ৩২১
 দুর্জয় ৩০৫
 *দুর্জয় ২৯৩
 দুর্জয় ৩২৩
 দুর্জয় ৩১০
 দুর্জয় ২৩
 দুর্জয় ৩২০
 দেব (দেবতা)
 দেবক ৩০৯
 দেবকী ২৮৩, ৩৫৬, ৩২১
 দেবক ৩০৮
 দেবক ৩১৭, ৩২৫
 দেবক ১৩২
 দেবতা—ভাষ্য ৪৪১ ; পর-
 ত্ত্বের অভিযুক্তি ৪৪১ ;
 সংখ্যা-পরিমাণ ৪৪২ ; ভি-
 য়ের মন্তব্য ৪৪২ ;
 তেজস্বী কোটির উৎপত্তি
 ৪৪৩ ; ঐহাদের পক্ষি-
 বানি মধ্যে প্রবেশ ৪০০ ;
 ঐহাদের আরাধনা ৩৮
 দেবতাবিৎ ৩০৭

*দেবদত্ত ৩০০
 দেবদেবী ৪৪৩, ৪৪৪
 দেবদত্ত ৩০৭
 দেবদত্ত ৪১৩
 দেব-পুরোহিত ১৩২
 দেবদত্ত ৩০৮, ৪২৪
 দেবদত্ত ৩৬১
 দেবভাগ ৩০৯
 দেবভূতি ৩১৭
 দেবমৌচু ৩০৮, ৩৫৩, ৩৫৫,
 ৩৫৬, ৩৮৭, ৩৮৯
 দেবদত্ত ৩২১
 দেবদত্ত ৩৫২, ৩৬৭, ৪৫৭, ৪৫৮
 দেবদত্ত ৩০৯
 *দেবদত্ত ৩০২ ৩০৮, ৪৫৫
 দেবদত্ত ৩২৫
 দেবদত্ত ৩১২
 দেবদত্ত ৩০৯
 দেবদত্ত ৮৮, ৪৪৭, ৪৭০
 দেবদত্ত ৩১৫
 *দেবদত্ত ২৯৩
 দেবদত্ত ৩০৬, ৩৬০
 দেবদত্ত ৩০৯, ৩৫৪
 দেবদত্ত ৩১৩
 দেবদত্ত ৩২৭
 দেবীপুরাণ ২৩৩
 দেবীভাগবত ১৭২, ২৩৩
 দেবীস্থান ১১
 দেবতা—বংশ ৩৬৬ ; দেবতা
 ও দানবগণ ৩৬৫-৩৭৩ ;
 বিভিন্ন মন্তব্যের ৩৬৯
 দেব ও পুরুষকার ২৬৫
 দেবদত্ত ৭৯
 দেবদত্ত ৪৩২
 দ্বাদশ আদিত্য ৪৪২, ৪৪৩
 দ্বাপর (যুগ) ৯
 দ্বাপর ৩৭৯
 দ্বাপর ৪১৯
 দ্বিজ ৪৪৯
 দ্বিজাতি ৪৫৮ ; ভক্ত্যভিৎ ২৭৪

দ্বিমীট ৩১০
 দ্বিমীট ৩৭১
 দ্বৈতবাদ ১০৭, ১০৮, ১২৫, ১২৬ ;
 দ্বৈতবাদ মতের আলো-
 চনা ১১৯
 দ্বৈতবাদ ৩৮৭ (বেদব্যাস দ্বৈত-
 ব্যা ৬০
 দ্বৈতবাদ ৩৩৭
 দ্বৈতবাদ ৩৭৭, ৩৯৬, ৩৯৭
 দ্বৈতবাদ ৩১৮
 দ্বৈতবাদ ৩২৫
 দ্বৈতবাদ ৩৩৪
 দ্বৈতবাদ ৩৩৭
 দ্বৈতবাদ (দর্শন মতে) ৯৩ ; দ্বৈত-
 প্রকাশ ১০২ ; দ্বৈতবাদ-
 সংগ্রহ ১০২
 দ্বৈতবাদ ৪৩৫
 দ্বৈতবাদ ৪৩৭
 দ্বৈতবাদ ৩১১, ৩৫৯, ৪১৫
 দ্বৈতবাদ ৪৩১
 দ্বৈতবাদ ৫৫, ৩০৫, ৩৫২, ৩৬৩,
 ৩৮৫, ৩৮৯, ৪২৪
 দ্বৈতবাদ ২৫৯, ২৬১, ৪১৫, ৪১৬
 দ্বৈতবাদ ২৪৩, ২৬৫, ৩২১, ৩৪৩,
 ৩৫৯, ৪১৫, ৪১৬
 —
 ধ
 ধন (উপাধি) ১৫৮
 ধনক ৩২৪, ৩১৯
 ধনক ৩১২
 ধনক ২৮৬
 ধন ৩২৬
 ধন ৩৫৬, ৩৬০
 ধন ৩২০, ৩১৫
 ধন ৩০৮, ৩০৭, ৩৮৯, ৪০৬,
 ৪৪৫, ৪৪৭, ৪৬১
 ধন—বেদোক্ত ৩৮ ; মন্তব্যের
 ৪৮ ; তাহার উপাদান
 সামগ্রী—বেদ ৩৭ ; বিভিন্ন
 সম্প্রদায় ৪৮ ; তৎসমুদায়ের

উৎপত্তি ৪৮-৪১ ; তাহার
সার সামগ্রী ৫০ ; ধর্মাস্তর
পরিগ্রহে ৪৮ ; স্মৃতি মতে
১৫৬ ১৫৭ ; মহাভারতে
বর্ণিত ২৬২-২৬৪ ; সত্য-
জ্ঞেতা, দ্বাপর ও কলিযুগের
১৫৬ ; দর্শন-মতে ধর্ম ৮৭-
১৪৩ ; শ্রীকৃষ্ণ কথিত ধর্ম-
তত্ত্ব ২৬১ ; ভারতের ৪৫২
† ধর্ম ৩০৭, ৩৮৮
† ধর্মকেতু ৩০৭
† ধর্মধ্বজ ৩০২
† ধর্মনৈত্র ৩০৬, ৩৮৫, ৩৮৭
ধর্মপাল ২৩৪
* † ধর্মরথ ২৯৩, ৩১০
ধর্ম-সংহিতা—(স্মৃতি দ্রষ্টব্য)
১৪৪—১৬৯
† ধর্মসত্ত্ব ৩২২
* ধর্মী ২৯৬
ধর্মসেন ৩৪৯
ধর্মোত্তরাচারী ১০২
* ধারক ২২৭
ধিগদন্ত ৪২২
† ধীমান ৩০৫, ৩৩৮
† ধুনি ৩২৫
ধূক (অম্বর) ৩৪১
* ধূকুমার ২৯২, ৩৪১
† ধূমকেত ৩৩৭
ধূমাক ৩৬৭
* ধূম্রাখ ২৯৫, ৩৮৩
ধূম্রকর ২৮১
† ধৃত ৩১৪
ধৃতপৃষ্ঠ ৩৩১, ৩৩২
ধৃতবর্মা ৪১৮
† ধৃতব্রত ৩১১, ৩৩৮
† ধৃতরাষ্ট্র ২৪২, ২৬১, ২৬৪, ২৬৬,
২৭২, ৩০৬, ৩৬১, ৩৮৬,
৪১৫, ৪১৭ ; তাঁহার ভবিষ্য
দর্শন ২৪৫
* † ধৃতি ২৯৫, ৩০২, ৩১১

† ধৃতেশ্ব ৩১৫
† ধৃতিমান ৩১৬
* † ধৃতি ২৯৪, ৩০৮, ৩২৭, ৩২৮
* † ধৃতিকেতু ৩০২, ৩০৭, ৪১৫,
৪১৬
† ধৃষ্টদ্যুম্ন ২৪৬, ৩১১, ৩৫১,
৪১৫ ৪১৬
ধৃষ্টি ২৭৪
† ধৃষ্টোক্ত ৩০৮
† ধৃষ্ণু ৩০৯
ধ্বজ ৪৩৩
ধ্রুব (দ্রুব) ৪৩৬
† † ধ্রুব ১৯৩, ৩০৫, ৩৩১, ৩৩৫,
৩৩৭, ৩৩৮ ; তাঁহার রাজত্ব-
কাল পরিমাণ ও যক্ষদিগের
সহিত যুদ্ধ এবং মমুর নিকট
তথোপদেশ লাভ ৩৩৫ ;
অবতার ৪৪৬
ধ্রুবলোক ৩৩৫
* ধ্রুবসন্ধি ২৯২, ৩০১
—
ন
† নকুল ২৪২, ৩০৬, ৩৬১,
৪১৭, ৪৬১
† নক্ত ৩৩৭
† নম্রাজিৎ ৩০৭
† নদীন ৩০৭
† নন্দ ২৭৬-২৭৮, ২৮১, ২৮৫-
২৮৮, ৩৪৬, ৩৮৮ ; নন্দ-
নামে বহু ব্যক্তি ৮৫, ৮৬ ;
নন্দ বংশের রাজত্ব ২৭৮ ;
নন্দের অভিষেক ও রাজত্ব-
কাল সম্বন্ধে বিতর্ক ২৭৭,
২৬৬
নন্দন ৩৫৬
নন্দিগ্রাম ২১৮
নন্দী ৪৩৪
* † নন্দীবর্ধন ২৯৪, ৩০২, ৩১৬,
৩৩৩
† নব ৩১০

নবদ্বীপ ১০২, ২৩২
নবনন্দান (অর্ঘ) ২৮৭
নববাস্ত ৪২২
† নবরথ ৩০৮, ৩১৭
† নবরাষ্ট্র ৩১০
* নভ ২ ৩
* নভস ২১৯
* নভাগ ২৯৪ ৩৮২
নমুচি ৩৭১
* † নর ২৯৪, ৩১৪, ৩৩৮
নরক ২৫
নর-নারায়ণ ২৫০, ৪৪৪, ৪৪৬
নরবলি ৬৩, ৩৪৬
নরমেধ-যজ্ঞ ৩৪২, ৩৪৬
নরসিংহ (নৃসিংহ) : ৩৩৬, ৪০৪,
৪৪৭
* নরিয়ান ২২৭
* নরিসাস্ত্র ২৯৩ ৩৮২
নর্যা ৪২২, ৪২৩
*, † নল ১০৫, ২৯৩, ৩১৪, ৩১৯,
৩৪৫, ৩৭৭, ৩৯৩-৩৯৪
নলিনী ৩৫৯
*, † নল্লব ১৪৯, ১৬৪, ১৭৪,
২৯২, ৩০৪, ৩০৫, ৩৫২, ৩৬৭,
৩৮০, ৩৮২, ৩৮৫, ৩৮৯,
৪২২, ৪৩১
নাগার্জুন ২৮০
নাচিকেতা ৭০, ৭১
নাভাক ৪২৫
* নাভাগ ২৯২, ২৯৩, ৩৪৮,
৩৪৯, ৩৮০, ৩৮২
* নাভাগারিষ্ট্র ২৯৭
† নাভি ৩৩৩, ৩৩৭
নাভিবর্ষ ৩৩৩
নারদ ২১৫, ৩৪২, ৪৪৭, ৪৫১
নারদীয় পুরাণ ১৭১, ১৭৮
† নারায়ণ ৩১৩
নারীকবচ ৩৪৬
† নারায় ৩০৮
† নাসমোজা ৩০৮, ৩২৭

নাস্তিকা-দর্শন ১১৬, ১৩২, ১৩৩
 নাস্তিক্য-মত ১৩০-১৩২, ২৮১
 নিউটন (সার আইজাক) ৪৬৪
 * নিকুন্ত ২২৩
 *, † নিম্ন ২২৩, ৩০৮
 † নিচক্ষু ৩১৬, ৩২২
 † নিয়ন্ত্রি ৩১৪
 † নিবর্ত্তশক্তি ৩০৯
 *, † নিমি ১৪২, ১৬৫, ২২২, ৩৪১, ৩৪৭; তাঁহার সমস্ত বর্ষব্যাপী যজ্ঞ ও তৎপ্রতি বশিষ্ঠের অভিষাগ ৩৪৭
 নিমিত্ত কারণ ১২৯
 † নিরবিত ৩২২
 † নিরমিত্র ৩০৬
 † নিরমিত্র ৩১৬
 নিরীশ্বরবাদী ২৪, ১৩৪
 নিকুন্ত ২৫, ৫২, ৮০
 নির্ণয়সিদ্ধ ১৬৯
 নির্মাণ-যুক্তি ৯৫, ১৩৭; মোক্ষ ২২৫; ১৩৪, ১৩৫, ১৩৭
 নির্বিশেষ লিঙ্গ ৭০
 † নির্বৃত্তি ৩১৯
 † নির্বাণ ৩৩৭
 নিপুন্ত ৩৬৭, ৩৬৮
 *, † নিষধ ২২৩, ৩০৬
 নিকায়-কর্ম ২৬৫
 † নীপ ৩১৫
 † নীল ৩০৮, ৩২০, ৩৫২, ৪১৭
 নীলকণ্ঠ ২৮২, ২৯০
 নীলগিরি ৪১২
 নীলধ্বজ ৪১৯
 নীলনদ ৩৭৮
 নীলাচল ৪০৫
 † নীলাঞ্জলি ৩২৩
 * নৃপ ২২৪, ৩০০, ৪০১
 † নৃচক্ষু ৩১৬
 † নৃপঞ্জয় ৩১৬
 নেদার ৩৮২-৩৮৪
 † নেত্র ৩১৯, ৩৮৮

† নেমিচক্র ৩২২
 নেটর ২৪০
 নৈমিষারণ্য ৪০৬
 নৈরঞ্জন (নদী) ১৩৪
 নৈষধ (কাব্য) ১০৫; বর্ষ ৩৩৩
 নোখা (ঋষি) ৪২৩
 নোয়া (ও জলপ্রাচীন) ৬২, ১৮৬
 † নৃত্যোপ ৩০৯
 † নৃত্যোপ ৩২৫
 জ্ঞান-দর্শন ১০১-১০৯, ১৩৯; দর্শনের ভিন্ন ভিন্ন নাম ও দর্শনকারের পরিচয় ১০১; ভাষাসমূহ ও ভাষাকারণ ১০২; জ্ঞান-দর্শনের প্রতিপাত্ত ১০৩-১০৫; বিবিধ তত্ত্ব ১০৬-১০৯; যুক্তিবাদ ১০৮; উহার পক্ষ অবয়ব ১০৮
 জ্ঞানকৌলুভ ১০২
 জ্ঞান-বার্ত্তিক ১০২
 জ্ঞান নীলাবতী ১০২
 জ্ঞানার্থ ১০১, ১০২
 ————
 প
 পক্ষধর মিশ্র ১০৩
 পক্ষিলস্বামী ১০২, ১০৩
 † পক্ষক ৩২৩
 *, † পক্ষজন ২২৩, ৩১১
 পক্ষদশী ১৩০
 পক্ষনদ ৪১৯
 পক্ষ-মকার-তত্ত্ব ২০৯
 † পটুমান ৩১৭
 পতঞ্জলি ১১০; তাঁহার জন্ম-সম্বন্ধে কিংবদন্তী ১১০
 পদাতি ৩০৬
 পদার্থ-দর্শন মতে ২৭; পাশ্চাত্য মতে ১৪৩
 পদার্থ-দর্শনগ্রন্থ ২৬
 পদ্মপুরাণ ১৭১, ১৭৪, ২২৬-২২৮
 পদ্মা ৪৩৫

পদ্মাবতী ৩৬৪
 পদ্ম ৩৭৮
 † পয়োধ ৩০৮
 * পরজয় ২২৪
 পরজ্ঞ (উপনিষদে) ৬৭, ৬৮
 পরমহা ৩২৮
 * পরমপুরুষ (বংশলতার) ৩১৮
 পরমাণু—বৈশেষিক মতে ৯৮, ৯৯; পাশ্চাত্য মতে ১৪২; জ্ঞান মতে ১০৮
 পরমাণু—উপনিষদের মতে ৬৭, ৬৮
 † পরমেশ্বর ৩১০
 † পরমেশ্বরী ৩০৩
 পরমেশ্বর—(উপনিষদে) ১২৬
 † পরমেশ্বরী ৩৩৭
 পরলোক (চাক্ষুর মতে) ১৩৩
 পরশু ৪০৩
 † পরশুরাম ২২০, ২৩৩, ২৩৪, ২৭৭, ৩০৪, ৩০৭, ৩৫৩, ৩৮৯, ৩৯১, ৪১৬, ৪৪৪-৪৪৭, ৪৬৬; তাঁহার দর্পচূর্ণ ও রূপ-বর্ণন ৩৫১
 † পরাজিৎ ৩০৮
 † পরাবৃত্ত ৩১৪
 পরাশর ১৫৬, ৩৬১
 পরাশর সংহিতা ১৫৬
 † পরীক্ষিত ২৭৬-২৭৮, ২৮৪-২৮৭, ৩০৬, ৩৮৬, ৪২০, ৪২১, ৪৬১; তাঁহার নাম ৩৬১; তাঁহার তীক্ষ্ণ-দর্শনে মৃত্যু ও তাঁহার কারণ ৩৬১-৩৬২; তৎকর্তৃক কলি নিগ্রহের কাহিনী ৩৬২-৩৬৬; দুর্য-ক্ষেত্র-যুদ্ধের কাল নির্দেশে তাঁহার প্রসঙ্গ ২৭৬-২৮৮
 পরুক্ষেদ ৪২৩, ৪৫৫
 † পরেশ্বর ৩১৯
 পর্বত ৩৫৬
 পতঞ্জলি ৫৮

পহুব ৩৪৪, ৪১১, ৪৬৭
পাকস্থমন ৪৪৮
পাকস্থামা ৪৩২
† পাকাল (দেশ) ৭৩ (রাজ্য)
৩০৯; পাঁচ পুত্র ও পাঁচ
দেশ ৩৫৯
পাটলিপুত্র ২৮৫
পাটীগণিত ৪৭০
পাণিনি ৭৯, ৮০, ৮২, ১১০
পাণ্ডব ২৪২, ৩৫৩; তাঁহাদের
দেশ জয় ১৭; অশ্বমেধ
যজ্ঞে তাঁহাদের কৃতিত্ব
৪০১; (মহাভারত দ্রষ্টব্য)
† পাণ্ডু ২৪২, ২৭৪, ৩০৪, ৩০৬,
৩৫৫, ৩৬১, ৩৮৬
† পাণ্ড্য ৩০৭, ৪৩৫
পাতঞ্জল দর্শন ১১০-১১৩, ১৩০;
তাঁহার ব্যাস-ঐশ্য ১২০
পাতালকেতু ৪০৯
পাতাল রাজ্য ৩৬৬
† পানি ৩২৬
† পাপনয় ৩২৩
† পার ৩১৪
পারদ ৩৪৪, ৪১৭, ৪৬৬, ৪৬৭
পারস্ত ১৬১, ৪৬৬, ৪৬৭
পারায়ণ ৩১
* পারিপাত্র ২৯৩
পারিস ২৪০
† পালক ৩১৭
† পালিত ৩০৮
‡ পালী ৩০৮
পাশ্চাত্য ৪৩২
পাণ্ডপত অস্ত্র ২৪৯
পিজবন ৪২৪
পিণ্ডদান—চার্য্যক মতে ১৩৩;
স্মৃতি মতে ১৫৮
† পিণ্ডারক ৩০৯
পিতৃশ্রদ্ধে অধিকারী ১৫৩
পিপ্পলায়ন ৩৩৪
পীতাম্বর ১১

পীথাগোরাস ৫, ৭৬
পীরামিড ৬
* পুণ্ডরীক ২৯৩
† পুণ্ড্র ৩১০, ৩৬৩, ৪১৯
পুণ্ড্রজন (দস্তা) ৩৪৯
† পুণ্যযশা ৩১৯
পুতনা ২৭১
পুতলক ৩১৭
‡ পুত্র ৩০৮
পুনর্জন্ম—উপনিষদ মতে ৬৯;
চান্দ্রাক মতে ১৩৩
† পুনর্কম্ব ৩০৯
পুনর্ভূ ১৫৪
পুরজ্ঞান ৪৩৫, ৪৩৬
† পুরজ্ঞ ৩০৯, ৩৮০; তাঁহার
কুরুস্থ নাম প্রাপ্তি ৩৬১
† পুরবস্ত্র ৩২৩
† পুরস্ত ৩২৪
† পুরহত ৩২৫
পুরাণ—৪৭, ৭০, ১৭০-২০৬;
অষ্টাদশ মহাপুরাণ ১৭১-
১৮৮; ব্রহ্ম ১৭৩; পদ্ম
১৭৪; বিষ্ণু ১৭৫, শিব
১৭৬; লিঙ্গ ১৭৭; গরুড়
১৭৭; নারদ ১৭৮;
শ্রীমদ্ভাগবত ১৭৮; অগ্নি
১৮০; স্বন্দ ১৮১; ভবিষ্য
১৮২; ব্রহ্মবৈবর্ত ১৮২;
মার্কণ্ডেয় ১৮৩; বামন
১৮৫; বরাহ ১৮৫; মৎস্য
১৮৬; কুর্ম ১৮৬; লঙ্কা
১৮৭; উপপুরাণ ১৭১,
১৮৮-১৮৯; পুরাণের সার-
মর্ম্ম ও সময়স্বয় বিধান ১৯০-
১৯৩; পুরাণে ইতিহাস
১৯৩-১৯৪; পুরাণে বিবিধ
চিত্র ২০১-২০৪; পুরাণ
রচনায় বেদব্যাস ১৯৪-
২০১; পুরাণাদি সম্বন্ধে
পাশ্চাত্য মতালোচনা ২০৪-

২০৬; বৈষ্ণব, শৈব ও
ব্রাহ্ম অর্থাৎ সাধিক, রাজ-
সিক ও তামসিক পুরাণের
পরিচয় ১৭২; পুরাণের
লক্ষণ ১৭০, ১৭১, ১৮৩,
পুরাণের শ্লোক-সংখ্যা ১৭২-
১৭৩; বায়ুপুরাণ প্রসঙ্গ
১৭১; পুরাণে প্রায়-তত্ত্ব
১৯১; পুরাণে স্মৃতিতত্ত্ব
১৯০-১৯৩; পুরাণ শব্দের
অর্থ ১৭০
পুরাণতত্ত্ব ৫১
† পুরু ৩৫৭, ৩৮৯; তাঁহার
বংশের উৎপত্তি ৩৫২;
তাঁহার বংশ ৩৫৭, ৩৬৩;
অজ্ঞাত ২৯১, ৩০৪, ৩৫৩,
৩৬৭, ৩৮৫, ৪২২; তৎকর্তৃক
যযাতির জরাগ্রহণ ৩৫২;
বংশ-লতায় ৩০৫, ৩৩৭
পুরুবংশ ৩৫৭ ৩৬৩
* পুরুকুৎস ২৯৩, ৩৪২, ৩৫০,
৩৮১ ৩৯২, ৪২২, ৪২৮, ৪৪৮
† পুরুজ ৩২১
† পুরুক্ষাত ৩২৮
† পুরুজাহ্ন ৩১৫
† পুরুজিৎ ৩১৯, ৪১৫, ৪১৬
† পুরুদ্বান ৩০৮
† পুরুমিল ৪২৭
† পুরুমীচ ৩০৫, ৪২২
পুরুমীহ ৪৩২, ৪৫৫
*, † পুরুষবা ১৯৩, ২৯১, ২৯২,
৩০৫, ৩৫০, ৩৫১, ৩৮০, ৩৮৪,
৩৮৯, ৪২৩, ৪৩০, ৪৩১
পুরুষ (সাক্ষ্য মতে) ৯০, ৯৫
পুরুষকার ২৬৫
পুরুষজিৎ ৪৩৩
পুরুষোত্তম—তীর্থ ৪০৪-৪০৬;
৪১২; মন্দির ৪৬৯; পুরু-
ষোত্তম যোগ ২৬৮
† পুরুহোজ ৩১০

পুরোহিত ২৭৫
 পুলস্ত্য (আশ্রম) ৩৩৪
 পুলস্ত্য ঋষি ১৭৪
 পুলিকেশি—চালুক্যরাজ ২৮১
 পুলিকেশি (দ্বিতীয়) ২৮১
 পুলিন্দ ২৭৫, ৪৩৫
 † পুলিন্দক ৩১৭
 † পুলিমান ৩১৭
 পুলোমা ৩৬৭, ৩৭১
 † পুলোমাচি ৩১৭
 * পুন্ড ১৭৪, ২৯৬, ৩৯৪, ৩৯৫,
 ৪০১, ৪০৪; দ্বীপ ৩০২
 † পুন্ডরমাল ৩২১,
 পুন্ডরাক ৪৩৪
 † পুন্ডরাকুণি ৩১৩, ৩৫৮, ৪৫৬
 † পুন্ডরিণী ৩১৫
 পুন্ডল ৪১২
 * পুন্ড ২৯৭
 † পুন্ডবান ৩১২
 পুন্ডমান ৩০৯
 পুন্ডতলা (নদী) ৪৩৪
 † পুন্ডমিত্র ৩১৭
 † পুন্ডার্ণ ৩৩৭
 † পুন্ড ৩৩৬
 † পুন্ডোৎসব ৩১৭
 পুন্ডকার্য ৩৯, ১৪৮, ১৫০, ১৫১
 (স্থাপত্য দ্রষ্টব্য)
 পুন্ড-জন্ম (নৈময়িক মতে) ১০৬
 পুন্ড-মামাংসা ১১৪-১১৭
 পুন্ডাধার ২৭৭
 † পুন্ডা ৩২১, ৩৫৬, ৩৬৪
 পৃথিবী—তাহার জন্মদিন ৮
 তাহার সৃষ্টি কথা (পাশ্চাত্য
 ও প্রাচ্য মতে) ৯; পৃথিবী
 বা পৃথ্বী নামের উৎপত্তি
 ৩৩৬; প্রিয়ব্রজ কর্তৃক
 সপ্ত দ্বীপে তাহার বিভাগ
 ১৬; সেই সপ্ত দ্বীপের
 আধুনিক পরিচয় (পাশ্চাত্য
 মতে) ১৬; বৈশেষিক মতে

পৃথিবী ৯৮; বৌদ্ধ মতে
 পৃথিবী ১৩৭; তাহার আদি
 রাজা ১৪৬, ৩৩৮; রাজা
 সুদাসের পৃথিবী জয় ৫৫;
 পৃথিবীর আত্মমানিক লোক-
 সংখ্যা ৪৮; রাবণের পৃথিবী
 পরিত্রমণ ৪০০, ৪০১;
 উত্তার আক্রান্ত প্রকৃতি
 সম্বন্ধে বাণবিত্ততা ৪৬২;
 পৃথিবীর গতি ও গোমত-
 তত্ত্ব ৪৬২; তৎসম্বন্ধে আর্ঘ্য-
 ভট্ট প্রভৃতির মত ৪৬৩;
 পৃথিবীর আকর্ষণ-শক্তি
 ৪৬৪; তৎসম্বন্ধে ভারত-
 চার্য ও নিউটনের কথা
 ৪৬৪; পৃথিবীর প্রাচীন
 অধিবাসন ১৩৩.
 * †, †: পৃথু ১৪৯, ১৬৪, ১৭৪,
 ১৯২, ১৯৩, ৩২৯, ৩৩০, ৩৩৭;
 তাঁহার অভিধেয় ৩৩৬,
 ৪২৯, ৪৩০, ৪৪৫, ৪৪৬;
 বংশলতায় ২৯২, ৩১৬, ৩৩৭
 † পৃথুকণ্ঠা ৩১৪
 † পৃথুকীর্তি ৩১৪
 † পৃথুজয় ৩১৪
 † পৃথুদর্ভ ৩২৩
 † পৃথুদান ৩১৪
 † পৃথুদশা ৩১৪
 † পৃথুকৃষ্ণ ৩০৮
 † পৃথুলাক ৩১১
 পৃথুপ্রভা ৩০৮, ৪২২, ৪২৫, ৪২৬,
 †, †: পৃথুসেন ৩১২, ৩৩৭
 পৃথুরাজ ৪৪২
 † পৃথি ৩১৭, ৩৮৮
 † পৃথত (পৃথং) ৩১৫, ৩২৪
 * পৃথদশ ২০৪
 * পৃথদ ২০৩; তাঁহার শূন্য
 প্রাপ্তি ৩৪৮
 পৃথি ২৯১
 পের ৪৩৫

পেসিমিজম ১৪৩
 † পৈল ৩১, ৩২৩
 পোকক—ভারতের প্রেক্ষ
 বিষয়ে ৬; আফ্রিকায়
 ভারতের উপনিবেশ সম্বন্ধে
 তৎকর্তৃক যত্নবিধি কারণ
 নির্দেশ ৩৭৮
 পৌণ্ড ৩১৭, ৪৩৫
 পৌরিক ৪২১
 পৌলাণ্ড ২২
 পৌলমেয় ৩১৭
 প্যাংহেজিম ১৪৩
 প্রকরণ ১১৪
 প্রকাশ ৪১৭
 প্রকৃতি (সাম্মত) ৯০;
 গীতার ২৬৭; প্রকৃতি-
 পুরুষ বিবেক ৯১
 প্রকৃতি পূজা ৬০
 প্রকৃতি-প্রসঙ্গ ২৫৮
 প্রণব-বিজ্ঞা ৩৭৩
 † প্রচিহ্নান ৩১০
 * †, †: প্রচোতা ৩০২, ৩০৭,
 ৩৩৭, ৩৬৩
 প্রকার কর্তব্য ৪৩৭-৪৩৯
 * প্রজানি ২৯৪, ৩৮২
 * † প্রজাপতি ২৯৩, ৩০৭
 প্রজাপতি ৬৩, ৩৯০, ৩৬৫, ৪৫৫
 † প্রতর্দন ২২১, ৩০৭, ৪০৬, ৪১০,
 ৪২১, ৪৩২
 প্রতাপ ৪৩২
 † প্রতি ৩১৮
 † প্রতিজ্ঞ ৩০৭
 † প্রতিজ্ঞ ৩২৫
 * প্রতিবন্ধক ২৯৪
 † প্রতিবন্ধা ৩১৬
 * প্রতিবোধ ২৯৬
 † প্রতিবধ ৩২৪
 প্রতিশাধা ৭৯
 প্রতিষ্ঠান ৬৮৪
 † প্রতিষ্ঠোতা ৩৩৭

ঐতিহাস ৩০৭
ঐতিহাস ৩০৮
ঐতিহাস-সমুৎপাদ ১৩৫, ১৩৬
*, † প্রতীপ ৩০২, ৩০৬, ৩০৭, ৩০৮
ঐতিহ ৩০৭
প্রত্যক্ষ (দর্শন মতে) ৮৬, ৯৩
† প্রত্যগ্র ৩১৬
† প্রত্যগ্রহ ৩১২
ঐ প্রদোষ ৩৩৭
†, †: প্রদ্য ৩০৫, ৩৩৭
† প্রত্যোত ৩১৬
† প্রবন্ধ ৩০৫
† প্রবিশ্বসেন ৩১৭
প্রবন্ধ ৩০৪
প্রভা ৩৫২
* প্রভাত ২৯৮
প্রভাস ৪১৯
প্রমগন্ধ ৪২৭
ঐ প্রমহ ৩৩৭
প্রমা (দর্শন-মতে) ১০০
প্রমাণ—দর্শন-মতে ৮৬; সাংখ্য-
মতে ৯৩; বৈশেষিক মতে
৯৯; জায়-মতে ১০৪;
চাংক-মতে ১০৩; দৌদ্ধ-
মতে ১০৪; বিবিধ-মতে
১৪২, ১৪৩; প্রমাণ গ্রহ
১০৪, ১০৫; অষ্টবিধ
প্রমাণের পরিচয় ৮৬
প্রমিতি ৪০৭
প্রমিতি ৩৮২
প্রময় (বেদান্ত-মতে) ১৩০, ১২১
প্রশস্তিপাদ্যার্থ ৬৬
প্রশস্তিক ৩৮০
* প্রশস্তব ২৯২
প্রসঙ্গি ৩৯৮
প্রসঙ্গত ২৯৬
† প্রসেন ৩০৮, ৩৫৪, ৩৮৮
* প্রসেনজিৎ ২৯২, ৩৮১
† প্রসঙ্গ ৩১৯, ৩৫৭
ঐ প্রসঙ্গ ৩৩৭

প্রহেতি ৩৭১
প্রহ্লাদ ৩৬৬, ৩৭৩, ৪৪৭
* প্রাং ২৯৩, ৩৮২
প্রাগ্ জ্যোতিষ ২৭৫, ৪১৮
† প্রাচীনস্থ ৩২৩
ঐ প্রাচীনবর্হি ৩৩৭
প্রাচা ও পাশ্চাত্য দর্শন ১৪১, ১৪৩
প্রায় ৪৩৫
ঐ প্রাত ৩৩৭
প্রাপ্তি ৩৬০
* প্রাকৃ ৩০১
*, † প্রিয়রত ১৬, ৩১০; তাঁহার
বংশ ৩৩১; তাঁহার রাজত্ব-
কাল ৩৩২; তাঁহার পৃথিবী
বিভাগ ৩৩২; বংশলতায়
২৯৯, ৩৩৭; অজ্ঞাত ৩৩৩,
৩৩৫ ৩৩৭
† প্রিয়মেধ ৩২০, ৪৩৩
প্রেষ্ট—তাঁহার গ্রাহে আবে-
রিকার পরিচয় ৪৬৫
পোটাইল ১৪১
প্রক (দ্বীপ) ১৬, ৩৩২
প্রযোগ ৪২৯
প্রেটো ৫, ৪৩, ৮১
—

ফ

ফরাসী ১৫; তত্ত্বাশয় রামায়ণের
অনুবাদ ২৪০
ফাসে (মুসে জিপোলাইট)
রামায়ণের ও হোমারের
তুলনায় ২৪০
ফিনিসীয় ৬
ফিলজফি ৮৫
ফেইটু ৪৭১
† ফেন ৩১০
ফৈজি (উপনিষদের অনুবাদক)
৬৫
ফোয়েবাস ৫৪
—

ব

বংশ (লতা)—চন্দ্রবংশ ৩০০
৩২৯; সূর্য্যবংশ ২৯৯
৩০৩; স্বায়ত্ত্বয় মন্তুর বংশ
৩৩৭-৮; নিমি-বংশ ৩০০
৩৮৩; নন্দ ও বসুদেব বংশ
৩৫৬; দৈত্যবংশ (প্রহ্লাদ
প্রভৃতির) ৩৬৬; ভবিষ্য
রাজবংশ (মৌর্য্য, কুশ
অন্ধ্র প্রভৃতি) ৩১৭, ৩১৮
যদুবংশ ৩০৮; দেবমৌর্য
ও মধুর বংশ ৩০৯; পুরুষ
বংশ ৩১০; গাধি পুত্র
বিখ্যামিত্রের বংশ ৩১২
৩১০; কুরুবংশ ৩১২, ৩২৯
নহব-বংশ ৩১৪; রৌদ্রাধি
বংশ ৩১৫, ৩২৮; যদু
তুরনু, অমর, দ্রুত ও পুরুষ
বংশ ৩১৯; অন্ধক-বংশ
৩২১; ঞ্জবংশ ৩২২
ক্রোড় বংশ ৩২৭
বংশকৃতি ৩১৪
বংশ-পর্যায় আলোচনা ৩৭৪-৩৮০
† বক ৩২১
বকাস্তুর ৩৭১
† বঙ্গ ২৭৪, ৩১০, ৩৬৩, ৪১০
৪১৯, ৪৩৫
বজ্রকেতু ৪০৯
বজ্রদত্ত ৪১৮
* বজ্রনাত ২৯৩
বজ্রবারক ১১৪
† বজ্রমিত্র ৩১৭
*, † বংস ২৯৬, ৩০৭
† বংসক ৩২১
* বংসরু ৩০১
† বংসর ৩৩৭
* বংসপ্রি ২৯৪
বংসপ্রীতি ৩৮২
† বংসবান ৩০৯
* বংসবাই ২৯৬

† বৎসর ৩১৫
 বদাউনি ৬৫
 বজ্রাধ ৩১৫
 বজ্রিষতী ৪৬১
 † বসেয় ৩১০
 † বজ্রহান ২২৪
 বপু ৪৩৩
 ব্রহ্মপুত্র ৩৩১, ৩৩২, ৩৩৮
 † বক্র ৩০৭, ৩৫৪, ৪৩৩
 † বক্রবাহন ৩১৬, ৪১৮, ৪৬০
 * বক্ষন ৩০২
 বয় ২২১
 † বর ৩১২
 বরশিখ ৪২২
 বরাহ (অবতার) ৩৬৬, ৪৪৪,
 ৪৪৫ ; পুরাণ ১৬১, ১৮৫
 বরু ৪৩৩
 বরুণ ৬০, ৩৪২, ৩৯৪, ৪২৮,
 ৪৩৪, ৪৩৬, ৪৩৭, ৪৪৩
 † বরুণ ৩২৩
 † বর্ণ ৩২৩
 বর্জি ২২৭
 বর্ণ—ব্রাহ্মণাদি চতুর্ভুজের সৃষ্টি
 ৪১, ৪৬, ১৪৮, ১৬০, ৪৫৪ ;
 বর্ণ-শব্দ ১৬১ ; বর্ণ বিভাগ
 ৪৫৪
 বর্ণাশ্রম ৩৪, ৪৪
 বর্ণী ১৫৮
 বর্ষা ৪২৩
 † বর্ষকেতু ৩২৪
 * বর্ষকেতু ২২৩
 বর্ষহিষ ৩৩৭
 বর্ষিষতি ৩৩১
 বল ৪২০
 † বলদেব ৩২১, ৪১৮, ৪৬০
 বলদেব বিভ্রান্ত ১১২, ১২১,
 ১২৪, ২২০
 † বলবর্জি ৩২৭
 † বলরাম ৩১৭, ৩৫৫, ৩৫৭, ৩৬৮,
 ৩৮২, ৪০৪, ৪৪৭

* বলস্কল ৩০১
 † বলাক ৩১৮
 † বলাকাধ ৩০৭
 † বলায়ু ৩০৫
 † বলি ২৮০, ৩১৪, ৩৬৩, ৩৬৬,
 ৩৬৯, ৪১৫, ৪৪৭
 বলভাচার্য্য ১১৮, ২২০
 বলভ পণ্ডিত ১০২
 বশিষ্ঠ (বসিষ্ঠ) ১৫২, ২২৪, ২২৫,
 ২৩৪, ৩৪৩, ৩৪৫, ৩৮০
 বশিষ্ঠ-সংহিতা ১৫২
 * বখসহ (বিখসহ) ২২৫
 † বসতি ৩০৬
 বসতিরাজ ৪১৭
 †, ‡ বসু ৩০৫, ৩৩৭, ৩৮৬, ৩৯০,
 ৪০১
 † বসুদান ৩২৩
 † বসুদেব ২২৬, ৩০৪, ৩৫৫, ৩৫৬
 ৩৮৮, ৩৮৯
 বসুমনা ৪২১
 † বসুমিত্র ৩১৭
 † বসুমান ৩১৮
 † বসুরোধ ৩২৮
 † বহিষ্রবা ৩০৬
 † বহু ২৯৫, ৩৮১
 † বহগব ৩১২
 † বহুদধ ৩২১
 † বহুদেব ৩১৭
 † বহুবিধ ৩২৩
 বহু বিবাহ (পুরুষের ও স্ত্রী-
 লোকের) ২২২, ২৭৪
 † বহুরথ ২১৬
 * বহুলাধ ২০৫
 † বহি ৩০৭
 † বহুয় ৩২৬
 বাইজানটাইন ৬
 বাইবেল ১০
 বাগ ভট ৩৬১
 † বাগী ৩০৫
 বাচস্পতি মিত্র ১০২, ১১০, ১১৭,

১১৯, ১৪৪
 * বাণ ২২২, ৩৩৬, ৩৮৯
 † বাতপতি ৩০৮
 বাৎসায়ন ১০২
 বাদরায়ণ ১১৭, ১৩০, ৪৫৪
 (বেদব্যাস দ্রষ্টব্য)
 বাবিলন ৩৯, ৫৪
 বামদেব ২৩৪, ৪২০
 বামন (অবতার) ৩৬৬, ৪৪৪,
 ৪৪৫, ৪৪৭
 বামনপুরাণ ১৭১, ১৮৫
 বামী (অশ্ব) ৪২০
 বায়ু ৯৮, ৯৯, ৪৩৪
 বায়ুপুরাণ ১৭১, ১৮৫
 বারণাবত ৩৫৫
 বারাগমী ৪০৬, ৪০৮ (কাশী
 দ্রষ্টব্য)
 বার্তিক ১১৪
 * বার্ষ্য ২২৪
 বাইজান্টাইন-দর্শন ১৩৩
 * বালিক ৩০১ ; তাঁহার মূলক
 ও নারীকবচ নাম গ্রাণ্ডির
 কারণ ৩৪৬
 বালী ২১২
 বাশিষ্ঠ-সূত্র ৭৭
 বাজীকি ২১৫, ২৩০-২৩৪, ৪১৩,
 ৪৩৮, ৪৬০ ; বাজীকি ও
 কুজিবাদের রচনার তুলনা
 ২৩০-২৩৪
 বাপ্পার—পোত, বান, রথ
 প্রভৃতি ৪৬৭
 বাসুদেব ২৫০
 † বাস্কল (বাস্কলী) ৩২৬, ৩৬৯,
 ৪৪৫
 * † বাহ ২২৩, ৩০৪, ৩৫২, ৩৮১,
 ৩৯১, ৪০৩,
 বাহক ৩৮১, ৩৯১, ৩৯৫
 † বাছাধ ৩১০
 বাজিল (বাজিলক) ৩৮৪
 † বাজিলক (বাজিলক) ৩০৬, ৩৬০

†বিকর্ণ ৩০৬
 *বিকৃষ্ণি ২২২, ৩৪১, ৩৭২, ৩৮০; তাঁহার শব্দাদ নাম প্রাপ্তি ৩৪১
 †বিকৃতি ৩২০
 বিক্রমাদিত্য ১১, ৩৭২-২৮১, ৩৭৬; তাঁহার শব্দাদ ২৮০; সংবৎ ২৮১
 বিক্রান্ত ৪০৮
 বিচক্ষ ৪২২
 †বিচিত্রবীর্ষ্য ২৪২, ৩০৬, ৩৬০, ৩৮৬
 *.†বিজয় ২৩৪, ২৯৩, ৩০৭, ৩৫১, ৩৭৫, ৩৮২
 †বিজিতাশ্ব ৩৩৬-৭
 বিজ্ঞান-ভিক্ষু ১১০, ২৯০
 বিজ্ঞানেশ্বর ভট্টারক ১৫৩, ১৬৩
 †বিতপ ৩১২, ৩৫৮, ৩৮৬
 †বিতর্ক ৩০৬
 বিদগ্ধিন ৪২২
 †,†,বিদর্ভ ৩০৮, ৩৩৭, ৩৫৪, ৩৯৩
 †বিদুর ২৪২, ৩০৬, ৩৬১
 †বিদুরথ ৩০৯, ৩৮৯
 †বিদুষ ৩২৩
 বিদুষী রমণীগণ ৩৯, ৪৭০
 বিদেহ ৭৩, ২৭৬
 বিধবা—বিবাহ (বিরুদ্ধ মত) ১৫০, ১৫৬, ১৫৭, ১৬৮, ১৬৯; বিবাহ বিচারে কস্তার নিকট শূলপাণির পরাজয়-স্বীকার ১৬৯
 *বিধতি ৩০১
 *বিনতাস্ব ২৯৮
 বিনতেমু ৩২৪
 বিন্দু ৩৫৫
 *বিন্দুমতী ২৯৩
 †বিন্দুমান ৩৩৭
 †বিন্দুসার ৩১৭
 †বিপক্ষ ৩১৭

†বিপাক্ষা ৩২৩
 বিপ্র ৪৬; বিপ্রগণের কার্য ১৫৮; বিপ্রসেবা ৪২
 †,†,†বিপ্র ৩১৬, ৩৩৮
 বিপ্রচিত্ত ৩৭১
 বিবর্তবাদ ১৩০
 *বিবদ্বান ২২৩, ৪৩১, ৪৫৫
 বিবাহ ৪১; নিয়বর্ণের কস্তা উচ্চবর্ণে ১৫৩; স্মৃতিমতে ১৫৫, ১৬০, ১৬১; সম্বন্ধ-তত্ত্ব ৪৫৮; প্রাচীন পদ্ধতি ৪৫৯; বাদোদ্রম, পণদান, কৌশল, সাপল্লারা কস্তা-দান ৪৫৯
 *বিবিশ্ব ১৯৪, ৩৮২
 বিবিশতি ৩৭২
 *বিবৃথ ২৯৪
 বিভব ৭০
 বিভাগুক ৩৫৪
 বিভিন্দু ৪৩২
 বিভীষণ ২১২, ২২৩, ২২৭, ২৩০, ২৩২, ৩৭৩
 †,†,†বিভু ৩০৭, ৩৩৭
 বিভূতিযোগ ২৬৮
 †বিভ্রাজ ৩১৬
 বিমদ ৪২৫
 বিমল ৪১২, ৪১৩
 †বিয়ংনাত ৩০৮
 †বিরজ ৩৩৪, ৩৩৭
 †বিরাট (দেশ) ১৪৯; রাজা ৩৩৮, ৪১৫
 †বিরাজ ৩০৬
 বিরোধ ২১৮, ৪৬৪
 *বিরূপ ২২৪
 বিরোচন ৩৬৬
 †বিলোমা ৩১৭
 †বিশদৃশ ৩১৯
 বিশপলা ৪২৫, ৪২৬, ৪৬০
 *বিশবল ২২৫
 †বিশাখ ৩১৬

বিশারদ ২৮১
 *বিশাল ৩০০, ৩৪৮, ৩৮৩
 বিশিষ্টাষ্টভ (সম্প্রদায়) ১৫৭
 তাঁহাদের 'বিশিষ্ট' তত্ত্ব ১২৭
 বিশেষ (পদার্থ)—বৈশেষিক মতে ৯৬, ৯৮
 বিশ্বকর্ম্মা ৩৩১, ৩৭০, ৩৭১, ৪০৪, ৪০৫
 †বিশ্বক্সেন ৩২১
 †বিশ্বক্স (বিশ্বক্স) ৩০৭-২১
 *বিশ্বগুপ্ত ২৯৪
 †বিশ্বজ্যোতি ৩৩৮
 †বিশ্বজিৎ ৩১৫
 †বিশ্ববিৎ ৩০৭
 †বিশ্বরথ ৩০৭
 বিশ্বরূপ ২৬৯, ৩৭০; ঐক্যের বিশ্বরূপ ৩৬
 *বিশ্বসহ ২৯৬, ৩৮০
 *.†বিশ্বাবসু ৩০১, ৩১৩, ৪০৯
 †বিশ্বামিত্র—তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তি ৪২, ৪৩, ২১৪; ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তির উপাখ্যান ৩৫১; তাঁহার কর্ম্ম-বিবরণ ৪৩; বংশলতা ৩০৭-৩১২; অস্ত্রাস্ত্র ৩৪২, ৩৪৩, ৩৪৬, ৩৫০, ৩৫১, ৩৫৪-৩৫৭, ৩৯০, ৩৮৯, ৩৯০, ৪২১; তাঁহার জন্ম-বিবরণ ৩৯০; রামায়ণে তাঁহার বংশলতা ৩৯০; পুরাণান্তরে তাঁহার বংশলতা ৩০৪-৩২৬
 †বিশ্বারু ৩০৭
 *বিশ্বভবান ২৯৬
 †বিষদ ৩২১
 †বিষণা ৩৩৮
 বিষয়চিন্তা ২৬৬
 †বিষহর ৩০৮, ৩২৭
 বিষ্ণু ৪৪১; সংহিতা ১৫১, ১৫২; ভাগবত ১৭২

বিষ্ণুপুরাণ ১৭১ ১৭৩, ১৭৫, ১৭৬
 বিষ্ণুপুরাণে সৃষ্টি-তত্ত্ব ১২০ ;
 বিষ্ণুপুরাণে উপনিষৎ-তত্ত্ব
 প্রভৃতি ১৭৫
 বিষ্ণুযশা ১৮৯
 *বিষ্ণুরাশি ২৯৩
 *বিষ্টি ২৯৮
 †বিদ্বৎসেন ৩১৬, ৩৫৯
 বীজগণিত ৪৬৯
 †বীজমণ্ড ৩২৩
 †বীজময় ৩২৩
 *বীজহব্য ২৯৫, ৪০৭
 †বীজহোত্র ৩১৪, ৩৩১-৩৩২-
 ৩৩৭, ৩৫৩
 †বীর ৩০৮
 †বীরক ৩২৩
 বীরহ্যাস ৪২১
 বীরবাহু ২৩৩, ২৮১
 †বীরব্রত ৩৩৭
 বীরমণি ৪১৩
 বীরসিংহ ৪১৩
 *বীরসেন ২৯৯, ৩৯৩, ৩৯৬
 †বীর্ঘাবান ৩০৬
 বুকানিন—মহাভারত সঙ্ক্ষে
 তাহার মত ৩৭৬
 বুদ্ধদেব ১০২, ১৩৪, ২৮৫,
 ২৮৬ ; তাহার অবতার
 প্রসঙ্গ ৪৪৪, ৪৪৭
 †বুদ্ধ ২৯৩, ৩০৭, ৩৫০, ৩৭৬,
 ৩৮৪, ৪৩৩, ৪৬১
 †বুদ্ধ ৩৩৭
 *†বুদ্ধ ২৯৩, ৩২১, ৩৩৭, ৩৪১
 †বুদ্ধ ৩১৭
 †বুদ্ধদেব ৩০৯
 †বুদ্ধল ৩৩৮
 বুদ্ধা ৪৩১
 বুদ্ধাবান ৪২৯
 †বুদ্ধাবান ৩০৮, ৩৫৩
 বুদ্ধি—ব্রাহ্মণাদির ১৪৮, ১৫১,
 ১৫৮ ; দ্বাদশমীর ১৬২

বুদ্ধ (বুদ্ধাসুর) ৫৪ ; তাহার
 উৎপত্তি বিবরণ, নামকরণ,
 আকৃতি ৩৭০ ; রূপক-তাৎ-
 পৰ্থ্য ৩৭১-৩৭২
 বুদ্ধ (বুদ্ধহা) ৩৭১
 বুদ্ধ ৪২৪
 † বুদ্ধকৃত্র ৩২৭
 † বুদ্ধশৰ্ম্মা ৩০৫, ৩৮৫
 † বুঘ ৩০৮, ৩৫৩
 বুঘকেতু ৩৬৪
 † বুঘণ ৩০৯
 বুঘশচ ৪২২, ৪৩১
 † বুঘদৰ্শ ৩১৪, ৪১০, ৪১১
 বুঘপক্ষী ৩৫২, ৩৬৭, ৩৭১
 † বুঘত ৩১২, ৪৩২
 † বুঘসেন ৩১৪
 † বুক্ষি ৩০৪, ৩০৮, ৩৫৩, ৩৫৪,
 ৩৮৮
 বুক্ষিমান ৩১৬
 † বুহৎ ৩১৪, ৩৮৬
 † বুহৎকৰ্ম্ম ৩১৪
 † বুহৎকায় ৩২১
 বুহৎকেতু ৪৩৫
 * বুহৎক্ষণ ২৯৬
 † বুহৎক্ষত্র ৩১৫, ৩৪৮
 বুহৎ সংহিতা ২৭৮
 † বুহতী ৩০৮
 * বুহদশ ২০৩
 † বুহদিশু ৩১৪ ৩২৯
 * বুহদ্রকৃষ্ণ ২৯৪
 † বুহদ্রকৃত্র ৩২৮
 † বুহদ্রকৃত্র ৩২১
 * বুহদ্রল ২৯৬, ৩৪৭, ৩৭৫
 † বুহদ্রসু ৩১৪
 † বুহদ্রাসু ৩১৪
 * বুহদ্রণ ৩০১
 † বুহদ্রণ, ৩১৪, ৩২১, ৩৫৯,
 ৪২২, ৪৩৫
 † বুহদ্রাক্ষবান ৩২৩
 * বুহদ্রাক্ষ ২৯৬

† বুহদ্রলা ৩১৯
 † বুহদ্রানা ৩১৪, ৩২৮
 বুহদ্রাতি ১৩২, ১৩৪, ১৫৫, ৩৫০,
 ৩৬৮, ৪৩৬, ৪৩৭, ৪৫৭ ;
 সংহিতা ১৩২, ১৫৫
 * বেগবান (মান) ২৯৪, ৩০০
 *,† বেগ ১৪৯, ১৬৪, ৩০৪ ;
 তাহার নির্দিষ্টতা ৩৩৫ ;
 তাহার প্রাণ-সংহার ৩৩৬ ;
 অস্ত্রাঙ্ক ৩৩০, ৩৩১, ৪৩০,
 ৪৪৬ ; বংশলতায় ৩০২, ৩৩৭
 † বেগুহয় ৩০৮
 † বেগুহোত্র (বেগুহোত্র) ৩০৭
 বেটীলি—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের
 কাল-নির্ণয়ে ২৭৮
 বেতসু ৪৩২
 বেদ—আদিগ্রন্থ ১৫, ১৬ ; বেদ-
 চতুষ্টয়ের আলোচনা ২৬-
 ৫০ ; বৈদিক প্রসঙ্গ ৫১-৬১
 বেদ শব্দের উৎপত্তি ২৬ ;
 বেদ পরিচয় ৩৬ ; বেদ-
 রচয়িতা সম্বন্ধে আলোচনা
 ২৭, ৪৫৫ ; বেদ-সৃষ্টি-প্রসঙ্গ
 —বেদ কত কালের ২৯ ;
 অথৈদ ৩০ ; যজুঃ, সাম ও
 অথর্ক বেদ ৩২ ; বেদোক্ত
 দেবতা ও ঋষি ৩৩, ৪৪১,
 ৪৫০ ; বেদোক্ত ধর্ম্ম ৩৪ ;
 বেদোক্ত আচার-ব্যবহার
 ৩৭ ; বেদোক্ত জাতিভেদ
 ৪০, ৪৫৫ ; বেদট সর্ক-
 শাস্ত্রের স্থল ৪৬ ; বেদোক্ত
 ধর্ম্মই সর্ক ধর্ম্মের আদি ৪৮ ;
 বেদে পুরাতন ৫১ ; বৈদিক
 কালের রাজত্ববর্গ ৪৩৬,
 ৪২২-৪৩৩ ; বৈদিক-কালের
 যুদ্ধ-বিগ্রহ ৫৬ ; বেদ-বিষ-
 য়ক বিবিধ প্রসঙ্গ ৫৭ ;
 বেদ-বিভাগ ও বেদা-
 লোচনা ৫৯ ; ইউরোপে

বেদের চর্চা ৫৯; অশ্ব-
ক্ষেপে বেদান্তবাদ ৫৯;
বেদ-ব্যাখ্যায় অধিকার-
অনধিকার ৬০; বেদোক্ত
নগর, গ্রাম, অট্টালিকা
প্রভৃতি ৬৬; বেদের শাখা
উপশাখা প্রভৃতি ৬২; বেদ
লইয়া দর্শনকারগণের বিতর্ক
১০০, ১০৭, ১০৮, ১১৬,
১৩৪, ১৩৭, ১৪৩; অত্মাত্ম
৪৪৩, ৪৪৫, ৪৪৬; বেদে
রাজতত্ত্ব ৪৩৬
বেদবর্তী ৪৬০
বেদবাস ২৭, ৫২, ১০১, ১১৭,
১৩০, ১৫৭, ১৭১, ১৭৩, ২৩৭,
২৮৩, ২৮৪, ২৯০, ৩৭৫,
৩৭৭; তাঁহার উৎপত্তি-
বিবরণ ৩৮৭; অবতার
৪৪৫; ভিন্ন ভিন্ন মন্তরে
বেদবাস ও তাঁহার পুরাণ
রচনার পরিচয় ১২৪
বেদান্ত দর্শন ১১৭-১৩১; সূত্র-
সংখ্যা ১১৭; দর্শনের মুখ্য
উদ্দেশ্য ১৪০
বেদার্থ-সংগ্রহ ১২৭
বেদী—নির্ম্মাণে জ্যামিতি
বিষয়ক অভিজ্ঞতা ৭৬
বেদের্থ ৫৪
বেলাস ১৯
বেলি (মুসে) ভারতের
জ্যামিতি ও জ্যোতির্বিজ্ঞান
সম্বন্ধে তাঁহার মত ১০
† বৈকর্ণ ৩২৮
বৈকর্ণ ৪১৬
বৈজয়ন্তী ৩৮৭
বৈদর্ভি ৩০০
বৈদিক-মন্ত ৪৫৫
বৈদিক-যুগ সম্বন্ধে আলোচনা
৪৫৪-৪৫৫
বৈদেহ ৩৭৩

† বৈনহোত্র ৩২৩
* বৈবস্বত (মনু) ৮, ৩৭৬
৩৭৭, ৩৮২; মন্বন্তর ৮,
৩৭৬, ৩৭৭, ৩৮২; তাঁহার
বংশাবলী ২২২-৩২৩;
অত্মাত্ম ৪৩১, ৪৫৫
বৈরাঙ্গ (মনু) ৩৩১
* বৈরোহী ২৯৮
বৈশম্পায়ন ৩১, ২৫৮, ২৮৯, ২৯০
বৈশ্ব—কার্যবিভাগ ১৫১, ১৫৮,
১৬১, ৩৩৩, ৪৪৯, ৪৫৩
বৈশেষিক দর্শন ৯৬-১০০;
নামের কারণ ৯৬; পরি-
চয়াদি ৯৬; প্রতিপাদ্য
৯৭; বিবিধ তত্ত্ব ৯৮, ১০৩
* বৈষ্ণব ২৯৮
বৈষ্ণব-পুরাণ ১৭২
বৈষ্ণব-যজ্ঞ ৩৬৪
বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ১১৯
বোধমল্ল ২৮১
বোধাই ২৬০
বোধায়ন ৭৬, ১১৮, ১১৯
বোধ-তত্ত্ব ২১৩
বোধ-দর্শন ১৩৪, ১৩৫; তন্মতে
জগৎের হেতু ১৩৪
বৌদ্ধগণের সম্প্রদায় (মাধ্য-
মিক, যোগাচার, সৌ-
তান্ত্রিক, বৈভাষিক প্রভৃ-
তির পার্চয়) ১৩৭
ব্যাকরণ ৭৯
ব্যাস (বেদবাস ঐষ্টব্য)
ব্যাস-ভাষ্য ১১০
ব্যাস-সংহিতা ১৫৭
* ব্যাখ্যাত ২২৬
† ব্যোম ৩০৮, ৩২০
† ব্রহ্ম ৩০৫
† ব্রহ্ম ৩১২
† ব্রহ্ম ৩২৮
ব্রহ্ম ৬৬, ৬৮, ৮৪, ১২০, ১২২,
১২৪-১৩১, ১৩২, ১৪৭, ১৪৮,

২২৫, ২৬৮; ব্রহ্মদিন ৩
ব্রহ্মরাত্রি ৯, ১৪
ব্রহ্মচর্য্য ১৫৭, ২২৩, ৪৬০
† ব্রহ্মদত্ত ৩১৬, ৩২৯, ৪০১
† ব্রহ্মাবৎ ৩১৮
ব্রহ্মপুরাণ ১৭১, ১৭৩
ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ১৭১, ১৮২, ১৮৩
ব্রহ্মবিদ্য ২৩
ব্রহ্মহত্ম ১১৭
ব্রহ্মা ২৮৯, ২৯২, ৩৩৭, ৩৮১,
৩৯০, ৪৪১; তাঁহার পুত্র
১৫৪
ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ১৭১, ১৮৭, ১৮৮
† ব্রহ্মবর্ত (দেশ) ২৩; (রাজ্য)
৩৩৮
ব্রহ্মাত্ম ৮৫
ব্রাত্য ১৬১; ব্রাহ্মণ ৬৩
ব্রাহ্মণ(গ্রন্থ)—বেদের উপসংহার
৬২; ঐতরের প্রভৃতি
ব্রাহ্মণ গ্রন্থের পরিচয় ৩২;
ব্রাহ্মণ-ভাগের পরিচয় ৪৭
ব্রাহ্মণ—(বর্ণ) আশ্রয়-পরিচয়ে
অট্টট ৬-৭; তাঁহাদের
উৎপত্তি (বেদ মতে) ৪১,
১৪৮—১৪৯, অপরাধে দণ্ড
১৬০; ব্রাত্য ১৬১; তাৎ-
পর্য্যার্থ ৪৪১; ব্রাহ্মণ-সম্বন্ধে
বিবিধ প্রশ্ন ৪৪৮-৪৫০;
বেদে ব্রাহ্মণ শব্দ ৪৪৮;
ব্রাহ্মণের কার্য ও মান ৪৪৮;
তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য
৪৫২; বিষ্ণু কর্তৃক ব্রাহ্মণের
শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন ৪৫০;
ব্রাহ্মণের লক্ষণ ৪৫০;
ব্রাহ্মণ ও ঋষির সম্বন্ধ ৪৫৩;
ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব ৪৫৫;
ব্রাহ্মণের শূদ্রত্ব ৪২
ব্রাহ্মণত্ব—নিখামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব
লাভ প্রশ্ন ৪৩, ৩৫১, ৪৫৫;
কত্রোপেত ব্রাহ্মণ ৩৫৮;

কক্সিঘের ব্রাহ্মণ ৪০৭,
৪৫৬, ৪৫৭; বৈষ্ণবদিগ
ব্রাহ্মণ এসব ৪৩
ব্রাহ্মপুরাণ ১৭২
ক্লগ্‌স্‌ বে—মিশরের উৎপত্তি
বিষয়ে ৩৭৮

ড

ডাক্তি—বেদান্ত মতে ১২৭,
১৩১; ডাক্তিযোগ ২৬৮
*ডাগীর ২৩২, ২৩৩, ৩৭১, ৩৮১,
৩৮২; তৎকর্তৃক মর্ন্তোগঙ্গা
আনয়ন ২৩২
ডাক্তকার ৩০৬
ডাক্তকারী ৩২৭
ডাক্তার ৩১৫, ৩২৬
ডাক্তার ৩০৯, ৩৫৪, ৩৫৫
ডাক্তি ৩২০
ডাক্তিন ৩১৭
ডাক্তিকাব্য ২২৬, ৩৩৪
ডাক্তিক ৩২৭
ডাক্তক ৩২৩
ডাক্তর ৩২৩
ডাক্তর ৩২৩
ডাক্তর ৪১৩, ৪১৪
ডাক্তর ৩০৮
ডাক্তর ৩১২
ডাক্তর ৩২৪, ৩৩৮, ৩৮৫, ৩৯০
ডাক্তর ৩৩৩
ডাক্তর ৩৩৮
ডাক্তর ৩১৭
ডাক্তর ৩১৫
ডাক্তর ১৭১, ১৮২
ডাক্তর-রাজগণ ২৯৬, ৩১৬, ৩১৭
ডাক্তর ৩৩২, ৩৩৮
*,†,‡: ডাক্তর—বংশলতায় ২৯২,
৩০৫, ৩৩৭; অস্ত্রান্ত ২১৮,
২২১, ২৩৫, ৩৫৩, ৩৫৭,
৩৮১, ৩৮৫, ৩৮৯, ৩৯৭,
৪১২; দশরথ পুত্র ৩০৪,
৩৪৬, ৩৪৭; দ্বন্দ্বপুত্র ৩৫৭;

দ্বন্দ্ব পুত্র ৩৩৩, ৩৩৪;
তাহার মৃগহ প্রাপ্তি এবং
জড়ভরত রূপে জন্মগ্রহণ
৩৩৪; ভারত নামের
উৎপত্তি ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৫৭
ডাক্তর ১০২, ২১৮, ৩১৯, ৩৪৮,
৩৬৬, ৪০৭, ৪১৬
*ডাক্তর ৩০১
ডাক্তর ৩০৭, ৪৫৫
ডাক্তর ৩২১
*ডাক্তর ২৯৪
ডাক্তর ৩১৬
ডাক্তর ৩০৭
ডাক্তর ৩২৭
ডাক্তর—শ্রীমদ্ভাগবত ১৭২,
১৭৮-১৮০; দেবীভাগবত
১৭২; বিষ্ণুভাগবত ১৭২;
*,† ডাক্তর ২৯৪, ৩১৯
*ডাক্তর ২৯৬
ডাক্তর ৬৫, ৬৬; তাহার মুসল-
মান ধর্ম গ্রহণ ৬৫
ডাক্তর ৪৬১
ডাক্তর ৪২৬
ডাক্তর ১১৯
ভারতবর্ষ—তুলনায় শীর্ষস্থান
৪; জলবায়ু প্রভৃতিতে,
প্রাকৃতিক দৃষ্টে ও সম্ভ্রাতায়
৫; প্রাচীনতে ৭, ৯; অর্থো-
কিকতে ৭; সভ্যতার
অবিচ্ছিন্নতায় ৬; তাহার
শ্রেষ্ঠত সম্বন্ধে, ম্যাক্সমুলার
কর্ণেল টড, কাউন্ট জোন্স
জারগা, অধ্যাপক হীরে
প্রভৃতির মত ৪, ৫, ৯;
প্রাচীন ভারতবর্ষের সীমানা
২৩, ৩৩৪; অধিবাসিগণ
৩৩৪; বিস্তৃতি পরিমাণ
৩৩৪; নাম-পরিবর্তন ১৭;
ভারতবর্ষ নামের উৎপত্তি
(মতান্তরে) ৩৩৩, ৩৩৪.

৩৫৭; তাহার প্রাচীনত্ব
(মিশরাদির তুলনায়) ৩৭৫,
৩৭৬; ভারতবর্ষের অধীন
দেশ সমূহ ১৬১; ভারতের
রাজ-নৈতিক ও সামাজিক
অবস্থা (কুরু-পাণ্ডব যুদ্ধের
সমসময়ে) ২৭৩; ভারতের
ধর্ম ৪৫২; সমাজ ৪৫২
ভারত-সংহিতা ২৫৬
ভারত ২৫৬
ভারত ৩১৩
ভারত ২৯০
ভাষা-বিজ্ঞান ৮২
ভাষ্য ৪৬১; শিষ্টাঙ্গ ৪৬১
ভাষ্যচার্য ২৮০, ৪৬৩, ৪৬৪,
৪৭০
ভাষ্য ১১৬
ভাষ্য ২৪২, ২৬১, ২৭১, ৩০৫,
৩৬০, ৩৬১, ৩৮৬, ৩৯৩,
৩৯৪, ৪২৭, ৪৩৯, ৪৪০,
৪৭২
ভাষ্য (বিদর্ভরাজ) ৩৯৩
ভাষ্য ৩০৭
ভাষ্য ৩০৬
ভাষ্য ৩২৫
ভাষ্য ২৪২, ২৬১, ২৭৩, ৩১৬,
৩৬০, ৪১৫, ৪১৬, ৪৩৫,
৪৩৮, ৪৭২
ভাষ্য ৪২৫
*ভাষ্য ৩৩৮
ভাষ্য ৩১২
ভাষ্য ৩১২, ৪১৫, ৪১৭
ভাষ্য ৩০৫, ৩৮৬
*ভাষ্য ৩৩৭
ভাষ্য ৩০৮
ভাষ্য ৩১
ভাষ্য ৩২৮
ভাষ্য ১৪৬; তৎকর্তৃক ব্রাহ্মণের
শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন ৪৪৯,
৪৫০; তাহার বাদশ পুত্র

৪৫১ ; তৎকর্তৃক বেণকে
রাজ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা
৩৩৫

ভেল ৪৫১

†ভোজ ৩০৯, ৩৫৩

ভৌতিকৈয় ৩৫৩

ভৌবন ৩৩৭

ম

মকরন্দ কর ২৮০

মগধ ২৭৫, ২৭৮, ৩৩০, ৪৩৫,

৪৬৬ ; 'মগধ দেশীয় ব্রহ্ম-

বজ্র' শব্দে ৭৬

মঘা নক্ষত্র ২৭৭

মণিপুর ২৭৫, ৪১৮

মণ্ডনমিশ্র ১০২

মণ্ডল ৩০

মণ্ডুক ৪২০, ৪৪৮

মৎস্ত (অবতার) ৪৪৫, ৪৪৮

†মৎস্ত ৩১৬, ৩৫৯

মৎস্তগন্ধা ৩৩৭

মৎস্ত-পুরাণ ১৭১, ১৮৬

†মতিনার ৩০৫, ৩৮৬

মথুরা ১৪৯, ৩৬০ ; মথুরা-পুরী
প্রতিষ্ঠা ৩৪৭

মদয়জ্ঞী ৩৪৫

†মদ্রক ৩২৮

মদালনা—ভাঁহার উপদেশ ৪০৯,
৪১০, ৪৭০

মদিরা ৩৮৮

†মদ্র ২৭৫, ৩১৯, ৩৬৩

†, ‡ মধু—চতুর্দশ ৩০৪, ৩৫৩
ভাঁহার বংশোৎপত্তি ৩৫৩ ;

মধুবংশে ৩৩৭

মধুকৈটভ ৩৬৭, ৩৬৮

†মধুচ্ছন্দা ৩১৩, ৩২১

†মধুধ্বজ ৩১৪

মধুবিজা ৩৭৩

মধুসূক্ত ৩২৯

‡মধ্যদিন ৩৩৭

মধ্যদেশ ২৩

মধ্যার্চ্য ১০৮, ১১৪, ১১৮,
১৩৩, ১৩৪, ১৩৯

†মনস্বী ৩০৫

*মমু—চতুর্দশ ১৬, ৬২, ১৪২,

১৪৬, ১৪৯, ১৮৪, ১৮৬,

১৮৬, ২৭৩ ; সূর্য্যবংশে ২২২ ;

অজ্ঞাত ৩৩০, ৩৮৪, ৩৯৮,

৪৩১ ; মমু ও জলপ্লাবন

১৮৫

‡মমু ৩৩৭

মমু-সংজ্ঞিতা ১৪৫-১৫০ ; রচনার

কালসম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিত

গণের বিতর্ক ১৪৫ ;

আলোচ্য বিষয় ১৪৬-১৫০ ;

শ্লোক ও অধায় সংখ্যা

এবং মমু ১৪৭ ; মমু-মতে

স্থিতি-তত্ত্ব ১৪৭

মমুধুবৎ তবারিক ৬৫

মমু ১১৫

মমুদ্রষ্টা ৪৫৫

‡মমু ৩৩৭

মমুস্তর ৯, ১৬, ৩৩০, ৩৪০, ৩৬৯,
৩৭৬

†মমু ২৫০, ৩১৯, ৩৫৮, ৩৮৬

ময়দানব ২৭৪

মমু ২৮১

*, †মমুটি ২২২, ৩৩৭

*মমু ২২২, ৩৪৭

*, †, ‡মমুস্ত ২২৪, ৩০৭, ৩২৮
৩২২, ৩৮৩, ৩৮৯, ৪০০ ;

রাবণ কর্তৃক ভাঁহার যজ্ঞ

ধ্বংস ৪০০

*মমুদেব ২২৬

†মমুদেব ৩০৮

মমুস্তোম (যজ্ঞ) ৩৫৮

‡মলয়কৈতু ৩৩৭

মলয়ধ্বজ ৪৩৫

মলয়্যার ৪২২, ৪২৬

†মসক ৩২৭

মমুদ ১৪৫

*মমুদান ২২৬

†মমুদা ৩২৪

মমুদেব ২৪৯, ৪১৯

†মমুদাতি ৩০৫

*মমুদতি ২২৪

‡মমুদা ২৭৭, ২৮১, ২৮৫, ৩৬৬

‡মমুদ ৩৩৭

মমুদপ্ত ২৭৭, ২৮৫, ২৮৭

মমুদপ্তানন্দ ৩১৬

মমুদপ্তাণ (পুরাণ দ্রষ্টব্য) মমুদ-
পুরাণ ও উপপুরাণ সম্বন্ধে
মতভেদ ১৮৮

‡মমুদোর ৩৩২, ৩৩৭, ৪১৩

*, † মমুদীর্ঘ ২২৪, ৩১৩

মমুদারত ২৪১-২৪০ ; সার-

মমুদ ২৪৮ ; কাল-নির্ণয়

২৮১, ২৮৯ ; প্রাচীনত্ব

২৭৬-২৭৯ ; ঐতিহাসিকতা

২৫৯, ২৭৩ ; শ্লোক-সমূহ

২৫৯ ; প্রকৃষ্ট প্রসঙ্গ ২৫৮,

২৬০ ; অজ্ঞান ২৫৭ ; কুরু-

চরিত্র ২৬১, ২৬৫ ; চীকা-

কারগণ ২৯০ ; পারস্য-

ভাষায় মমুদারতের অমু-

বাদ ২৯০ ; অজ্ঞান মমুদ-

ভারত প্রসঙ্গ ১৩২, ১৫৪,

১৭২ ; মমুদারতোক্ত

রাজত্ববর্ণ ৪১৪ ; ভিন্ন ভিন্ন

গ্রন্থে মমুদারত প্রসঙ্গ

২৫৫-২৫৮ ; বেদব্যাস ও

কাশীদাসে ঐক্যটিকা

২৫৬-২৫৮

মমুদোক্ত ৩১৭, ৩৫০, ৩৫৪

† মমুদানা ৩১০, ৪১১

† মমুদানি ৩১৪

* মমুদোমা ২০৪

† মমুদাল ৩১০

মমুদুর ৩৫৫

† মমুদয় ৩১৬

† মহিমা ৩২৩
 মহিবাসুর ৩৭৮
 † মহিমান ৩০৮
 † মহীপতি ৩২২
 মহীরথ ৪১৩
 মহীরাবণ ২৩০, ২৩৩
 মহেশ্বর ৪১৩
 মাকিদন ২৭৯
 মাগধ ১৬৪; তাহারের উৎ-
 পত্তি ৩১৬
 মাঘ ২৫৬
 মাতুকোপনিষৎ ১১৯
 মাতৃগণ ১৫৫
 মাত্রী ২৭৪, ৩৬১, ৩৭৫, ৪৬০
 মাধব ৩৫৩
 মাধব বিভারণা ৫৯, ৬০
 মাধবাচার্য্য ২৯০
 মাধাকর্ষণ ৪৯, ৪৬৩, ৪৬৪;
 তৎসম্বন্ধে ভাস্করাচার্য্যের
 মত (সার আইজাক নিউ-
 টনের আবিষ্কারের পূর্বে)
 ৪৬৪
 মানসপুত্রগণ (ব্রাহ্মণ) ৩৬৫
 * মাক্তা ২২০, ২৯২; তাহার
 অপূর্ণ জন্ম-বিবরণ ৩৪১;
 তাহার রাজ্যের পরিমাণ
 ৩৪২; তৎসম্বন্ধে অজ্ঞাত
 কথা ৩৪৯, ৩৭৭, ৩৮১, ৩৯২,
 ৪২২, ৪২৫
 † মাবেল্য ৩১৬
 মাহুদঘোরী ৫৩
 মায়ী (বেদান্ত মতে) ১২৫, ১২৮
 মারিষা ৩৫৫, ৩৮৮
 মারীচ ২১৯, ৪৩৮, ৪৫১
 † মারুত ৩১২
 মারে (মিঃ) ভারতের প্রাক-
 তিক দৃষ্ট সম্বন্ধে
 মার্কণ্ডেয় (মুনি) ১৫২, ২৩৪;
 পুরাণ ১৭১, ১৮৩-১৮৫;
 চণ্ডী-প্রসঙ্গ ১৮৩, ১৮৪

মার্কোপোলা—ব্রাহ্মণদিগের
 স্তোত্রান্টি বিষয়ে ৪৭১
 † মার্ক্কার ৩২২
 মার্কণ্ড ৪৬২
 † মার্ক্কাবৎ ৩১৭
 মালাধর ৪১৮
 মাহিগুহী (পুরী) ৩৫৩, ৪১৯
 মাহেশ ২৩২
 মিতাক্ষরা ১৫৩, ১৫৯
 † মিত্রধর ৩১৮
 মিত্র ৬০
 † মিত্রমু (মিত্রয়ো) ৩১১, ৩১৫
 মিত্রসহ ৩৪৫
 মিত্রাবরুণ ৩৮৪
 মিথি (মিথিল) ৩৪৭
 মিথরা ৬১
 মিথিলা ১০২, ৪০১
 মিথ্যা (বেদান্ত মতে) ১২৪,
 (মীমাংসা-তত্ত্ব) ২৬২, ২৬৩
 মিল (জন টুয়ার্ট)—ঈশ্বরসম্বন্ধে
 তাহার অভিপ্রায় ১৪২
 মিশর—তৎসহ ভারতের সম্বন্ধ-
 তত্ত্ব ৩৭৮; দেবতা ৭; অজ্ঞাত
 ৬, ৩৯, ৩৭৫-৩৭৮, ৪৬৬
 * মীনরথ ২৯৫
 মীমাংসা—সূত্র ২৬; দর্শন
 ১১৪ ১১৭; মীমাংসা দর্শ-
 নের প্রতিপাদ্য ১১৭;
 অজ্ঞাত ১১৬, ১৩৯
 † মুকুল ৩২৪
 মুক্তি—নির্মাণ ৯৫, ১৩৭;
 জ্ঞান-মতে ১০৩, ১০৮;
 বেদান্ত-মতে ১২৩, ১৩০;
 তাহার অন্তরায় ১২২;
 উহাতে অধিকারী ২৬৬,
 ২৬৯; বড়দর্শন মতে ১৩৮-
 ১৪০; সংহিতা মতে ১৫৪;
 যোগবাশিষ্ঠে ২২৪-২২৬
 মুদ্রাবোধ ৮০
 * মুচুকুন্দ ২৯৩, ৩৮১

মুণ্ড ৩৬৮
 * মুণ্ডিক ২৯৯
 † মুগল ৩১১, ৩৫৯
 মুদ্রা ৩৯
 † মুনি ৩০৫
 মুর ৬
 † মুর্তিমান ৩০৭
 * মূলক ২৯৫, ৩৪৬
 মুগায়ী ৪৪৫
 * মৃতধ্বজ ৩০২
 মৃত-সঞ্জীবনী হিষ্টা ৪৫৬;
 মৃতের পুনর্জীবনদান ৩৬৪
 † মৃত্যু ৩২১
 মৃত্যু—তৎসম্বন্ধে উপনিষদের
 মত ৭০
 † মুহু ৩১৬
 মেকিকো ৪৬৫
 মেগাস্থিনীস—তাঁহার ভারত-
 গমন প্রসঙ্গ ১০, ২৭২,
 ২৭৩, ২৭৯
 † মেঘপালক ৩২৩
 মেঘসন্ধি ৪১৯
 মেঘহাতি ৩১৭
 মেড়ালা ২৩২
 মেঘস ১৮৩, ১৮৫, ৪৩২
 † মেধা ৩৩৭
 † † মেধাতিথি ৩৩৭, ৩১৫, ৩৩২,
 ৩৫৭, ৩৫৯, ৪৩২
 † মেধাবি ৩২২
 মেঘা ৪৩১
 মেনেলাস ২৪০
 মেনেস ৭, ৩৭৬, ৩৭৭
 মেরু প্রদেশ ১৯, ২০
 † মৈত্রয়েয় ৩২৪
 মৈত্রয়েয়ী ৪৭০
 মৈত্রয়েয়পনিষৎ ১৩২
 মৈথিল বংশ ৩৮৩, ৩৮৪
 মোক্ষ—সাধ্য মতে ৯২;
 বৈশেষিক মতে ৯৯;
 বেদান্ত মতে ১৩০; দ্ব্যুতি-

মতে ১৫০-১৫১ ; গীতা-
মতে ২৬৭, ২৬৯ ; মোক্ষ-
সন্নাস ২৬৩
† মৌল্যগণ ৩২৪
মৌল্য (ব্রাহ্মণ-বংশ) ৪৫৬ ;
গোত্র ৩৫৯
† মৌল্য রাজা ৩২১
মৌল্য (বংশ) ২৭৭, ২৭৮
মাল্লভক্তার ১১
মাল্লমূল্য—ভারতবর্ষের প্রেক্ষ
প্রসঙ্গে ৪ ; ভাষা ও বাক-
রণ বিষয়ে ৮২ ; তৎকর্তৃক
ঋষিদের অনুবাদ ৫৯ ;
কাত্যায়ন সম্বন্ধে তাঁহার
মত ৭৬ ; ব্রহ্মাস্তর সম্বন্ধে
৩৭২ ; মহাভারতের ঐতি-
হাসিকতা সম্বন্ধে ২৭২ ;
হিন্দুগণের সত্যবাদিতা
সম্বন্ধে ৪৭১ ; অতীত
গৌরব অরণ্য বিষয়ে ৪৭২
মাটির ১৪১
ম্লেক্ষ ১৪৫, ১৫৭, ১৬৪ ; ভাষা
শিক্ষা নিবেদ ১৪৫, ১৬০
ম্লেক্ষ-দেশ ১৪৫ ; তদ্দেশ গমনে
নিবেদ ১৪৫

য

* যজুর্কান ৩০২
যজুর্কেন্দ ২৬, ২৯, ৬১
যজ্ঞ—মীমাংসা দর্শনে ১১৫ ;
বৌদ্ধ দর্শনে ১৩৩ ; প্রাধাত্ত
২৭৪ ; সহস্র-বর্ষব্যাপী
৩৪৭ ; বেদী ৭৬ ; বেদী
সম্বন্ধে বিবরণ মত ৭৬
যজ্ঞ (অবতার) ৪৪৭
† যজ্ঞকৃত ৩১৩
ঋ. যজ্ঞবাহু ৩৩১, ৩৩২, ৩৩৭
যজ্ঞ-বিভাগ যোগ ২৬৭
† যজ্ঞশ্রী ৩১৭
† যতি ৩০৫, ৩৫২

যজুগুণ দাশ ২৪৩
† যজু ৩০৪, ৩০৫ ; তাঁহার ও
বংশের উৎপত্তি ৩৫২ ;
যজুগুণ ৩৫৩-৩৫৭ ; অত্যাচ্ছ
৩৫৯ ৩৮৫, ৩৮৭, ৩৮৮,
৪২২, ৪২৩, ৪৭৫, ৪৫৪
যবন—তাঁহাদের উৎপত্তি
৩৪৪ ; তাঁহাদের বাসস্থান
৩৩৪ ; অত্যাচ্ছ ৩৫৭ ৪১৭,
৪৬৬, ৪৬৭ ; গ্রীকগণের
যবনাখ্যা ৪৬৫
† যবনীর ৩২০
† যবনীর ৩১৬
* যম ৭০, ৭১, ১৪৫, ২২৩, ৩১৪
৩৩৭ ; সংহিতা ১৫৪
* যমুনা ২১৩
† যযাতি (চন্দ্রবংশে) ৩০৪,
৩০৫ ; তাঁহার বিবাহ,
তাঁহার জরা প্রাপ্তি, পুত্রের
সহিত জরা বিনিময়, তাঁহার
রাজ্যভাগ ৩৫২ ; অত্যাচ্ছ
১৭৪, ২২০, ৩৫৭, ৩৬৭, ৩৮০,
৩৮৫, ৩৯২, ৪২২, ৪৩১, ৪৫৮
যাগাত ৩৩
যাজ্ঞবল্ক্য ৭৩, ১৪২, ১৫৩, ১৬৯,
৩৪৭, ৩৪৮, ৩৬৩, ৪৭০
যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা ১৫২, ১৫৩,
১৬৪, ১৬৯
† যতি ৩০৭
যাদব ৩৫৩
যাক ৫২, ৮২
যুক্তি—চার্য্যাক মতে ১৩৩, ১৩৪
যুগ ২, ৩০
† যুগের ৩০৮
† যুগান্ত ৩২২
যুদ্ধ-বিগ্রহ ৫৬ ; যুদ্ধান্ত ২৩৬
† যুধামিথ ২২১, ৩০৮, ৩৫০, ৩৮৮
যুধামিত্র ৪১৫, ৪১৬
† যুধিষ্ঠির—তাঁহার বিজয়ানতা
২৭৩-২৮০ ; তাঁহার পিতৃ-

পরিচয় ও বাল্যজীবন ২৪২-
২৪৩ ; তাঁহার রাজত্বের বক্ষ
ও অজ্ঞাতবাস ২৪৩-২৪৪ ;
কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ ২৫৫, ২৭০,
২৭৬, তাঁহার সমসাময়িক
চিত্র ২৭৩-২৭৫ ; তাঁহার
সর্গমাত্ত বিবরণ ২৪৭ ;
তাঁহার রাজত্বের বক্ষে সমা-
গত রাজত্ববর্ণ ৪১৪ ;
তাঁহার অশ্বমেধ বক্ষে অনু-
গত নৃপতিবন্দ ৪১৭ ;
বিভিন্ন পুরাণের বংশ-
পর্য্যয়ে তাঁহার স্থান ৩৭৪ ;
অত্যাচ্ছ ২৫৯-২৬৪, ২৭০-
২৭৪, ২৭৮-২৮১, ২৮৪,
২৮৭, ২৮৮, ২৯১, ৩০৬, ৩৩১,
৩৭৬, ৫০৫, ৪১৭, ৪৩৭-৪৪০
† যুদ্ধমুষ্টি ৩২৫
যুধামিথ ৪২৪
* যুবনাথ ২২২, ২৯৩, ৩৪১,
৩৪২, ৩৫০, ৩৯২, ৪৬৮
† যুধাধন ৩০৮, ৩৮৮, ৪১৫
যোগ—পাতঞ্জল মতে ১১১ ;
সামান্যমতে ২৬৬ ; গীতার
২৬৫ ; যোগ-মাহাত্ম্য ১১২ ;
অসাধ্য-সাধন ১১২-১১৩ ;
যোগ-শাস্ত্র ১১০
যোগবাস্তিক ১১০
যোগবাস্তিক (সামান্য) ২২৩-
২২৬, ২৩৮
যোগেন্দ্র ৩৮৭
† যৌধেয় ৩০৬
* যৌবনাথ ৩০২
-গাটম্ ও গাটমিক বিজয় ১৪২
-গাটমকর্মসন ১৪৩
রক্তবীজ ৩৬৮
রক্ত-সঞ্চালন ক্রিয়া ৪৩২
* রঘু ২২২, ৩৪৬, ৩৮০, ৩৮১

ଋଷୁଦେବ ୧୦୨
 ଋଷୁନନ୍ଦନ ୧୫୧-୧୬୪, ୧୬୮
 ୨୫୩, ୨୫୪
 ଋଷୁନାଥ (ଶିବୋତ୍ତମ) ୧୦୨, ୧୦୩
 ଋଷୁବଂଶ ୨୨୭
 ଋଚନା ୩୭୦
 ଋଷଜ ୩୩୭
 ଠି ଋଜି ୩୦୫, ୩୫୦ ; ଦେବହାଜ
 ଇନ୍ଦ୍ରେର ଠାଣର ପୁତ୍ର
 ଶ୍ରୀକାର ୩୫୦
 ଋଷଜିଂସିଂହ ୧୧୨
 * ଋଷମୁଣ୍ଡ ୨୨୭
 ଋଷାତଟ ୫୧୨
 ଋଷବୀତି ୫୩୧, ୫୩୨, ୫୫୭
 ଠି ଋଷଧୁଷା ୩୨୫
 * ଋଷିତର (ଋଷୀତର) ୨୨୫, ୩୫୨
 ଠି ଋଷିଦେବ ୩୨୨, ୩୫୪
 ଋଷିନାର ୩୫୫
 ଋଷିକୌର୍ତ୍ତି ୨୫୧
 ଠି ଋଷ ୩୦୭, ୩୨୨
 ଠି ଋଷା ୩୩୭
 ଋଷ୍ୟକ ୩୩୩
 ଋଷ୍ୟକବର୍ଷ ୩୩୩
 ଠି ଋଷ ୨୨୧, ୩୩୮
 ଋଷକର ୧୫୨
 ଋଷ-ତୀର୍ଥୀନୀ ୧୦, ୨୭୮, ୨୭୭,
 ୨୫୮
 ଋଷଧନ୍ତ ୧୫୨
 ଋଷଜ୍ଞ ୩୫୨
 ଋଷପାଳ ୨୫୩
 ଋଷବିଜା (ବୋମ) ୨୫୮
 ଋଷଜଜ୍ଞି (ବୋମ) ୫୩୩
 ଋଷଜିଂସିଂହ ୫୭୨
 ଋଷଜ୍ଞାନ ୩୭୫, ୩୭୦
 ଠି ଋଷାଧିପତି ୩୭୨
 ଋଷାବଳୀ ୨୭୦
 ଋଷାବି କର୍ତ୍ତବୀ ୧୫୧, ୨୭୨,
 ୫୩୨-୫୫୦
 ଋଷେଶ ବଂଶ ୩୨୫
 * ଋଷାବର୍ଜନ ୨୨୫

* ଋଷୁଲ (ଭବିଷ୍ୟବଂଶ) ୨୨୬
 ଠି ଋଷିକ ୩୨୨
 * ଠି ଋଷ ୨୨୨, ୩୦୨
 ଋଷକୃଷ୍ଣ ୧୦୨
 * ଋଷଚକ୍ରେ (ଋଷ) ଶ୍ରୀଋଷଚକ୍ରେ
 ଶ୍ରୀଷ୍ଟବା
 ଋଷ-ବିଶାୟନ ୨୨୭
 ଋଷାହୁଜ ୧୧୪, ୧୧୨, ୧୨୮, ୨୨୦,
 ଋଷବ ୨୧୨, ୨୨୨, ୨୨୬, ୨୩୫,
 ୩୭୩, ୩୭୧, ୫୦୦, ୫୩୪
 ଠି ଋଷ, ଋଷମ ୩୩୪
 ଋଷାୟଣ ୨୧୫-୨୫୦ ; ଋଷାୟଣେର
 ନାର-ସର୍ଗ ୨୧୫-୨୧୬ ;
 ତାହାତେ ଅଧ୍ୟୋଧ୍ୟାୟ ବିବିଧ
 ଚିତ୍ର ୨୧୬-୨୨୩ ; ଯୋଗ-
 ବାସିର୍ତ୍ତ ୨୨୩-୨୨୫ ; ବିବିଧ
 ଋଷାୟଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ୨୨୬ ; ପର-
 ପୁରାଣେ ୨୨୬-୨୨୮ ; ପୁରା-
 ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଋଷାୟଣ ୨୨୮-
 ୨୩୦ ; ବାକ୍ୟାଳି ଓ କୃତ୍ତିବାସେ
 ତୁଳନା ୨୩୦-୨୩୫ ; ଋଷା-
 ଯଣେ ଶିକ୍ଷା ୨୩୫-୨୩୬ ;
 ଋଷାୟଣେ ଅଧ୍ୟୋଧ୍ୟାୟ ଓ ଲକ୍ଷ
 ୨୩୬ ; ଋଷାୟଣେର ଶ୍ରୀଚୀନର
 ୨୩୬-୨୩୭ ; ଋଷାୟଣେର ଓ
 ଋଷାୟଣେର ପ୍ରାଚୀନତ୍ତ୍ୱ
 ତୁଳନା ୨୩୭ ; ଋଷାୟଣ ଓ
 ଇଲିୟଡ୍ ଗ୍ରନ୍ଥେ ଋଷ ଲକ୍ଷ ମଧ୍ୟ
 ଋଷେର ମହିତ ଟିପ୍ପଣୀର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ
 ୨୩୭ ; କରାଣୀ ଭାଷାୟ ଋଷାୟ-
 ଣେର ଅନ୍ତର୍ବାଦ ୨୩୭ ; ଋଷାୟଣ
 ଲକ୍ଷେ ପାଞ୍ଚାତ୍ତ୍ୱା ପଞ୍ଚିତ-
 ଶ୍ରୀମତେ ୨୩୭ ; ଋଷାୟଣ
 ଓ ଋଷାୟଣେର ଋଷି-
 ଶାସ୍ତ୍ର ୨୩୮ ; ଋଷାୟଣ
 ଚଳନା ୨୩୭, ୨୩୮ ; ଋଷା-
 ଯଣ ଗାନ ୨୩୮ ; ଋଷାୟଣ
 ବର୍ଣ୍ଣିତ ଋଷାୟଣ ୨୩୮,
 ଋଷାୟଣେ ଋଷାୟଣ ୨୩୯ ;
 ଋଷାୟଣେ ନିର୍ମିତ ବଂଶଲତା

୨୫୩ ; ଋଷାୟଣେ ବିଷା-
 ମିତ୍ତେର ବଂଶ ୩୨୦
 ଋଷେଶ (ଋଷାୟଣ) ୩୭୮
 ଠି ଋଷପାଳ ୩୦୨
 ଋଷିବର୍ଜନ ୨୩୫
 ଠି ଋଷ ୩୩୨, ୩୩୭
 ଠି ଋଷପୁତ୍ର ୩୩୬, ୩୩୭, ୫୦୮
 ଋଷ ୫୧୨
 ଋଷକବଚ ୩୦୮
 ଋଷାୟଣ ୫୧୩
 ଋଷାୟଣୀ ୩୭୭
 ଋଷାୟଣ ୩୦୮
 ଋଷକ ୩୩୨
 ଋଷି ୫୫୭
 ଠି ଋଷିବଂଶ ୩୨୧
 * ଋଷ ୩୩୬
 ଋଷକ ୨୭୨, ୩୭୧, ୩୭୩, ୫୦୦
 ଋଷିନ ୩୦୫
 * ଋଷ ୨୨୬
 * ଋଷକ ୨୨୭
 ଋଷ୍ୟ ଋଷା ୫୩୦
 ଋଷ ଋଷା ୫୩୦
 ଠି ଋଷାୟଣ ୩୨୩
 ଠି ଋଷାୟଣ ୩୩୨
 ଋଷୁକା ୩୩୩
 ଋଷୁକା ୩୩୩
 * ଋଷ ୨୨୭
 * ଋଷକ ୨୨୮, ୩୫୮, ୩୭୫
 * ଋଷକ ୨୨୭, ୩୫୮, ୩୭୫
 * ଋଷକ ୨୨୮
 ଠି ଋଷି ୩୩୨, ୩୭୫
 * ଋଷ ୨୨୩
 * ଋଷକ ୨୨୩, ୩୫୮, ୩୫୯
 ଋଷକ ୩୩୨ ; ବିଭିନ୍ନ
 ପୁରାଣ ତାହାର ପୁତ୍ରଗଣ
 ୩୩୩
 ଋଷ ୨୫, ୫୫୫
 ଋଷାୟଣ ୩୩୨, ୩୫୫, ୩୭୫
 ଋଷାୟଣ ୩୫୫
 * ଋଷାୟଣ ୨୨୩, ୩୫୨

*রোহিতাষ ২২৫
 রোচা মনু ৩৪০
 রোহিতাষ ৩০৫, ৩৭৫, ৩৮২
 র
 *রক্ষণ ২১৮, ২২১, ২২২, ৩৪৬
 রক্ষী ১৫২, ২২৪
 রক্ষীনিধি ৪১২
 রক্ষা ২৩২, ২৩৬
 *রব ২১৫, ২২৭, ২২২, ৪১৩, ৪৬০
 রবণ (দৈত্য) ৩৪৭
 রবণ সমুদ্র ৩৩২
 রঘোদর ৩১৭
 রয় (বেদান্ত মতে) ১২২
 রাইলাহ ৬৬
 *রাঙ্গল ৩০১
 রাসেন—মহাভারত সম্বন্ধে
 তাঁহার মত ১৭০, ২৭২
 রামিত (ঋষি) ১৫৮
 রামিত-সংহিতা ১৫৮
 রাম-পুরাণ ১৭১, ১৭৭
 রামাবতার তত্ত্ব ৪৪৫-৪৪৬
 রামাবতী ৪৬২, ৪৭০
 রামেশ ৩১০
 রুই ১০
 রোক-সংখ্যা (পৃথিবীর) ৪৮
 রোকার্ত্ত দর্শন ১৩৩
 রোপামুজা ৪৭০
 রোমপাদ ৩০৮, ৩৫৪
 রোমশ ২২৬, ২২৭
 রোহিত ৩২৬
 রৌকিক (ছন্দ) ৭২
 রৌক্য (ঋষি) ১৩২
 রৌগাক্ষী ১১৪
 রৌহ ৩১১, ৩২৬
 রৌহি ৩০৭
 র
 *রক ২২৬, ৩৪৪, ৩৫৮, ৪১৬, ৪৬৩, ৪৬৭

রকগণ ২২৭
 *রুক্মি ২৪৪ ২৪৯, ২৬১, ২৯৩, ৩০৭, ৩৭৯
 *রুক্মি ৩৫৭
 রুক্মি ৩২৫
 রুক্ম ৩০৫
 রুক্মি (বেদান্ত মতে) ১২২-১২৩, ১২৭-১২৯
 রুক্মিশ্র ১৬, ১০০
 রুক্মিচাৰ্য্য—টপনিষৎ বিষয়ে
 ৭০; সাক্ষা-বিষয়ে ৮৮;
 বৈশেষিক সম্বন্ধে ১০০;
 কায় সম্বন্ধে ১০২; কায়
 সম্বন্ধে মণ্ডন মিশ্রের সনিক
 বিচার ১০২; মীমাংসা
 সম্বন্ধে মনুস্মৃতি ১১৬; বেদান্ত
 সম্বন্ধে ১৮—১২৫; অজ্ঞান
 ১৩২, ২২০
 রুক্ম ৩০৯
 রুক্মকর্ণ ৩০৬
 রুক্মশিরা ৩৭১
 *রুক্ম ১৫৮ ২৭৩, ২৯৭
 রুক্মান ২৯২
 *রুক্মানাত ২২৬
 রুক্ম-সংহিতা ১৫৮
 রুক্মী ৩৬৭, ৩৭৩
 রুক্মী ৩০৯, ৩২৭
 রুক্মী (যন্ত্র) ২৩৬
 রুক্মজিৎ ৩৩৪, ৩৩৫, ৩৩৭, ৩৮৭, ৪০৮
 রুক্মজিৎ ৩০৮, ২২৫
 রুক্মধনু ৩২১
 রুক্মধা ৩০৯, ৩৫৫
 রুক্মপথ ব্রাহ্মণ ৬২
 রুক্মপ্রতি ৩০৮
 রুক্মপা ৩৩১
 রুক্মজিৎ ৩০৯
 রুক্মানিক ৩০৬, ৩৬৩
 রুক্মানন্দ ৩১১
 রুক্মানু ২২১, ৩০৫

রুক্মি ৪২২, ৪৩২
 রুক্মিখাতী ৩৯৮
 *রুক্ম ২২২
 রুক্মজিৎ ৩০৯
 রুক্মজিৎ ৩১৬, ৪২২
 *রুক্মি ২৯৮
 রুক্ম—রুক্ম ২২; রুক্ম ২৩, ২৯, ১০০; রুক্ম ১১৬
 রুক্মরামী ১১৪
 রুক্ম ১২১, ৩০৯
 রুক্মী ৩০৯
 রুক্মীক ৩০৯, ৩৬১
 রুক্ম ৪৩৭
 রুক্ম ২২২
 রুক্ম ৩১৭
 রুক্ম ৩২৭
 রুক্ম ৪২৭
 রুক্ম ৩২১, ৪১৬, ৪১৭
 রুক্ম (ঋষি) ১৫২
 রুক্মচাৰ্য্য ১০৯
 রুক্ম ১৫৮
 রুক্মি ৩৫২, ৩৭৩
 রুক্মি ৪৩১
 *রুক্মি ২২৩, ৩৪৭, ৪৩১
 *রুক্ম ২২৩, ৩১২, ৪২০, ৪২১
 রুক্ম ২২৬
 রুক্মবিন্দু ৩০৮, ৩৪২, ৩৫৩
 রুক্ম ২২৩, ৩৪১, ৩৭২, ৩৮০
 রুক্ম ৪৩৬
 রুক্মী ৪৩২
 রুক্মী ৪২১
 রুক্মীপ ৩৩২
 *রুক্ম ২২৬
 রুক্মায়ন (ব্রাহ্মণ) ৪২৮, ৪৩১
 রুক্মাতপ (ব্রাহ্মণ) ১৫২; সংহিতা ১৫২
 রুক্ম ২৪২, ৩০৬, ৩২৫, ৩৬০, ৩৬৩, ৪২২, ৪৪৭, ৪৬০
 রুক্ম ৩১৮
 রুক্ম ৩৫৪, ৩৬৪

- † শাস্তি ৩২১
† শাস ৩২৫
শারণ ৩০৯
শারীরিক ভাষা ১১৮
† শাল ৩২৭
শালিবাহন ২৮০
† শালিগুপ্ত ৩১৭
† শাল্লী (রাজা) ৩০৬
শাল্লী (দীপ) ৩০২
* শাস্ত ২২৫
শাস্ত্র—ভাষার উদ্দেশ্য ৫২ ;
তাছাড়া আর্ধ্য-হিন্দুগণের
পরিচয়-চিহ্ন ২৬ ; ভাষার
অবিন্যাস ১২২, ১১৩ ;
চতুর্বিধ শাস্ত্র ও ভাষাদের
লক্ষণ ২৩৭-২৩৮
শিক্ষাগ্রন্থ ৭৭
† শিবি ৩০৮
শিনেয় ৩০৮
ঋ শিব ২০৭, ৩৩৭
শিবপুরাণ ১৭১, ১৭৬
শিবশর্মা ১৭৪
শিবস্বয়ং ৩১৭
শিবস্বাস্তি ৩১৭
শাতকর্ণি ৩১৭
শাতকর্ণি শিবলী ৩১৭
ঋ, * শিবি ৩৩৭, ৩৬৩, ৪১০,
৪১১, ৪১৭, ৪২১
শিপ্রক ৩১৭
শিল্প—প্রাচীন ভারতে শিল্প-
বিজ্ঞানাদির উৎকর্ষ লাভ
২৭৪ ; প্রাচীনকালের শিল্প-
বিজ্ঞা ৪৬৮-৪৬৯
† শিল্পশাস্ত্র ৩১৬
† শিল্পশাস্ত্র ৩১২, ৩৫৫
শিখা—উপনিষদে ৭১ ; তন্ত্রে ২১৪
ঋ শিল্পি ৩৩৮
* শিল্প ২১৬
২২২
শুকদেব ২৪১, ২৮৯
শুক (শুক্রাচার্য)—যযাতির
প্রতি তাঁহার অভিষাপ
৩৫২ ; রাজা দত্তের প্রতি
তাঁহার শাপ প্রদান এবং
তাঁহার ফলে দণ্ডকারণের
উৎপত্তি ৩১৯ ; তাঁহার
নীতি ৪৩৮ ; কচকে সঙ্গী-
বনী-বিজ্ঞা দান ৪৫৭ ;
অজ্ঞান ১৩২, ১৫৩, ৪৬০
ঋশুক ৩৩৭
শুক-যজুর্বেদ ৭৩
*, † শুচি ২২৫, ৩২১
† শুচিনামা ৩১৬
† শুচিরথ ৩২২
শুকর্ষা ৪৩৩
† শুক ৩১৮
শুককর্ণা ৪৩৩
শুকদান ৩০১
শুকদান ২৮৫
† শুনঃপুচ্ছ ৩০৭, ৩৪৩
শুনঃলাঙ্গুল ৩৪৩
† শুনঃশেফ ৬৩, ৬৪, ৩০৭
(দেবরাত) ৩৪৩, ৩৪৬,
৩৪৭, ৩৭০, ৪৫৫
† শুনক ৩০৭
† শুক ৩২৩
† শুক ৩২৭
শুক ৩৬৭
শূদ্র—শূদ্র-কর্ম ভেদে শূদ্রের
ব্রাহ্মণ্য প্রাপ্তির প্রসঙ্গ ৪২ ;
শূদ্রের কার্য (সংহিতা
মতে) ১৫১, ১৫৮, ১৬১ ;
ভাষাদের বাসস্থান নির্দেশ
(ব্রহ্মপুরাণে) ৩৩৪ ; ময়ু-
মতে ৪৫৮ ; অজ্ঞান ৪৪৮,
৪৪৯, ৪৫১ ; ক্ষত্রিয়ের
শূদ্রত্ব প্রাপ্তি ৪৬১
*, † শূদ্র ২২১, ৩০৫, ৩৫৫, ৩৫৬
*, † শূরসেন ২৩৬, ৩০৮
শূর্যনামা ২১৮, ২২৭
শূলপাণি (স্মৃতিকার) ১৬৮,
১৬৯ ; বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে
কজ্জার সহিত বিচারে
তাঁহার পরাজয় ১৬৯
শূন্যবৎ (বর্ষ) ৩৩
শূন্যবান ৩৩৩
শূন্য ৩৬১
শৈল ৩৫৮
শৈবপুরাণ ১৭২
শৈবা ৪১০, ৪১১
শৈব্যা ৩৪৪, ৩৫৩
† শোণাশ ৩০৯
শৌনক ৭৫, ৩৬৩, ২৮৯ ; ব্রাহ্মণ-
বংশ ৪৮০
† শৌনকগণ ৩০৭
শৌন্য ৪৩৫
† শৌরি ৩০৯
*, † শ্বক ২২১, ৩০৮, ৩৫৪, ৩৮৮
† শ্বক ৩০৯
শ্বিতা ৪২১
শ্বेत ৩২৯
শ্বेतকর্ণ ৩২৮
† শ্বেতকি ৪২০
শ্বেতকেতু ৬৭, ১২৪
শ্বেতবর্ষ ৩৩৩
শ্বেতবাহ কল্প ১০২
† শ্বেতবাহন ৩০৯
শ্বেতাস্বতর উপনিষৎ ১২৬
শ্বাবাশ ৪৩২, ৪৫৭
† শ্বাব ৩০৯
† শ্বাবক ৩২১
শ্রদ্ধা ১২১
* শ্রদ্ধাদেব ২২৩
* শ্রাবক ২২৯
* শ্রাবক ২২৩, ৩৪১ ; তৎকর্তৃক
শ্রাবস্তী-পূরী নির্মাণ ৩৪১
† শ্রাহক ৩২৭
† শ্রীরক—৩০৭ ; জন্ম ২৮৩ ;
তাঁহার জন্মকাল সম্বন্ধে
মীমাংসা ২৮৩ ; স্বর্গগমন
ও তৎসম্বন্ধে বাদাম্বাদ

২০২; হস্তিনায় তাঁহার
সম্মান লাভ ও তৎকর্তৃক
শিশুপাল বধ ২৪৪; তৎ-
কর্তৃক সত্য-মিথ্যা ধর্ম-
নির্ণয় ২৬৩; জ্ঞান ও
কর্মের বিচার ২৬৪; দৈব-
পুরুষকার-তত্ত্ব ২৬৫; তৎ-
কর্তৃক শ্রীমন্তগবদগীতোপ-
দেশ ২৬৬-২৬৯; শ্রমশুক
মণি প্রসঙ্গে ৩৫৪; সত্য-
ভামার সহিত তাঁহার
বিবাহ ৩৫৫; তাঁহার জন্ম
ও নন্দালায়ে অবস্থিতি ও
বংশলতা ৩৫৬; ধর্মযজ্ঞে
তৎকর্তৃক কংস-বধ ৩৬০;
ব্রাহ্মণবেশে তৎকর্তৃক কর্ণের
দাতৃ-শক্তি পরীক্ষা ৩৬৪;
তৎকর্তৃক পুতনা প্রভৃতি
বধ ৩৭১; সুধন্যাবধে
৪০১; চরিত্র-পসঙ্গে
২৬১; মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ-
চরিত্র ২৬১; অস্ত্রাঙ্ক ২৭১,
৩৬০, ৩৭৫, ৩৭৬, ৪৭২

* শ্রীজয় ২:৫

শ্রীধর ১১৩, ৪১৪

শ্রীধরস্বামী ২৮৫, ২৮৭, ২৯০

শ্রীধরচার্য্য ২৬

শ্রীবৎস ৩৭৭

শ্রীমন্তগবদগীতা—সৃষ্টি ২৪৫;
পরিসমাপ্তি ২৬০; সারমর্ম
২৬৬-২৬৯; ভাষ্যকারগণ
২৯০; গ্রীক, ল্যাটিন, ইংরাজী
প্রভৃতি ভাষায় অনুবাদ
২৯০

শ্রীমন্তগবত—বেদান্ত ভাষ্য
১১৮-১১৯; মহাপুরাণ
১৭১; মর্ম ১৭৮-১৮০;
রচনার কাল ২৪১; তাহাতে
মহাভারত-প্রসঙ্গ ২৫৫;
অবতার প্রসঙ্গ ও রচনা-

পদ্ধতি ১৭১; তাহাতে
ভক্তির প্রাধান্য ১৮০

* শ্রীরামচন্দ্র—রামায়ণ প্রসঙ্গে
২১৫-২৪০; তাঁহার জীবন-
চরিত্র ২১৮-২১৯; প্রজ্ঞা-
রঞ্জনে তাঁহার আত্মতাগ
২২১-২২২; তাঁহার সম-
সাময়িক চিত্র ২২২-২২৩;
পদ্মপুরাণ ও বিভিন্ন গ্রন্থে
রাম-চরিত্র ২২৬-২৩০;
তাঁহার অধর্মমুখ যজ্ঞসমা-
গত রাজগণ ৪১১-৪১৪;
বিভিন্ন পুরাণে তাঁহার বংশ-
পর্যায় ৩৭৪, ৩৭৫, ৩৮০, ৩৯১
৩৯২; তৎকর্তৃক পরশু-
রামের দর্পচূর্ণ ৩৯১;
তাঁহার অবতার ৪৪৪, ৪৪৭;
অস্ত্রাঙ্ক ৩৯৭, ৩৯৮, ৪৬০,
৪৬৩; মর্ত্যভূমে তাঁহার
বাস ও রাজত্ব-কাল ২২৯

শ্রীশাস্ত্রকর্ণি ৩১৭

শ্রীহর্ষ ১০৫, ২৫৬

* শ্রুত ২৯৩, ৩৮২, ৪২৪

† শ্রুতকর্ম্মা ৩১৬, ৩২৪

† শ্রুতকীর্ত্তি ৩১৬

শ্রুতদেবী ৩৫৫

† শ্রুতসেন ৩১২

শ্রুতপ্রকাশিকা ১১১

† শ্রুতশ্রব (শ্রুতশ্রব) ৩২২

* † শ্রুতায়ু ২২৫, ৩০৭

শ্রুতি ৪৭, ১৪৪

শ্রিম্যান (কর্ণেল) হিন্দুদিগের
সত্যবাদিতা সম্বন্ধে ৪৭১

শ্লোক—উৎপত্তি ২৩৬; পুরাণে

তাঁহার সংখ্যা ১৭২; মহা-

ভারতে তাঁহার সংখ্যা

২৫৮, ২৬০; শ্রীমন্তগবদগী-

তায় তাঁহার সংখ্যা ২৬৬

য

যজুর্দর্শন—৪৭; সাংখ্য-পাতঞ্জল,
জায়, দৈবেশিক, মীমাংসা,
বেদান্ত ৮৩-১৪৩

যজুর্দর্শন সম্বন্ধ ১৩৮-১৪৩

যজুর্বেদাঙ্গ—শিক্ষা, ছন্দস, ব্যাক-
রণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ,
কল্পসূত্র ৭৭

টাইলস—আদম ও ইত সম্বন্ধে
তাঁহার মত ১০

ট্রাবো—ভারতবাসীদিগের সত্যতা
সম্বন্ধে ৪৭১

† সংকৃতি ৩০৭

† সংদেব ৩২৭

সংবরণ ৩২৬

সংবর্ত্ত ১৫৫, ৪০০

† সংঘটিত ৩০৫

* সংহতাস্থ ২৯৩, ৩৮১

† সংহতি ৩১৩

† সংহন ৩২৩

সংহিতা—স্মৃতি দ্রষ্টব্য

সংহ্লাদ ৩৬৬

† সগণ ৩০১

* সগর—রামায়ণ প্রসঙ্গে ২১৯;

হৃদ্যবংশ-বর্ণন প্রসঙ্গে ২৯২;

তৎকর্তৃক তালজঙ্গমের

নিধন ৩৫৩; তাঁহার সগর

নাম ইহার কারণ ৩৪৪;

তৎকর্তৃক শক-যবনাদির

উৎপত্তি ৩৪৪; অস্ত্রাঙ্ক

৩৭৭, ৩৮১, ৩৯১, ৪৬০

সকর-মন্ত্র ৮

† সঙ্কতি ৩১৯

† সঙ্গত ৩১৭

* † সঞ্জয় ২৯৫, ৩৬৯, ৪১৫

সঞ্জয়—বৃত্তান্তের নিকট তাঁহার

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ বর্ণন ২৪৫-

২৪৭ ; তাঁহার নিকট যুক্ত-
রাষ্ট্রের ভবিষ্য ফলাফল
কখন ২৪৭-২৫৫ ; যুদ্ধি-
রের প্রতি তাঁহার উপদেশ
এবং শ্রীকৃষ্ণের উত্তর ২৬৪-
২৬৫

সত্যদাহ—সহস্রগণ দ্রষ্টব্য

† সৎকর্ম্ম ৩১৯

* সন্তম ২৯৮

† সন্তত ৩১৭

† সত্যান ৩০৯

সত্য (ধর্ম)—তদ্বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের
উপদেশ ২৬২-২৬৩ ; বেদান্ত
মতে ১২৪

‡ সত্য ৩৬৭

† সত্যাক ৩০৮

† সত্যকর্ম্ম ৩১১

† সত্যকেতু ৩০৭

† সত্যজিৎ ৩১৬

*, † সত্যযুতি ২৯৪, ৩১১,
৩৫৯, ৪১৭

* সত্যবজ ২৯৫

† সত্যবতী ৩০৭, ৩৫১, ৩৬০,
৩৮৬, ৩৮৭, ৩৯০, ৪৬৯

‡ সত্যবাক ৩৬৮

‡ সত্যবান ৪১২, ৩৭৭, ৩৯৬,
৩৯৭, ৩৩৭

* সত্যব্রত ২৯২, ৩৪২, ৩৮১ ;
তাঁহার ত্রিশঙ্ক নাম
প্রাপ্তির কারণ ৩৪২

† সত্যভামা ৩৫৭, ৩৫৫, ৩২৭

সত্যযুগ ৯

† সত্যাহিত ৩১২

সত্যায়ু ২৯১

* সত্যারথ ২৯৫, ৩৮১

† সত্যজিৎ ৩০৮, ৩৫৪, ৩৮৮

সনক ৪৪৫

সনৎকুমার ৬৪৫

* সনহাজ ৩০২

সনশ ৩৫৬

সনাতন ৪৪৫

সন্ধিকাল ২৮৩

† সন্নতি ৩০৭

† সন্নতিমান ৩১১

† সন্নতেন্দু ৩১০

সন্ন্যাস—২৬৭ ; কর্ম্ম ২৬৭

সপ্তরূপ ৩৩২, ৩৩৩, ৪৬৭

সপ্তর্ষ্য ৭৮

সপ্তর্ষি ২৭৬-২৭৮ ; ভিন্ন ভিন্ন
মহন্তরে ৩৪৪ ; অন্তান্ত
২৮৪-২৮৬, ৪২৮, ৪৫১

‡ সর্বন ৩৩৭

† সভাক্ষ ৩০৮

† সভানর ৩১০

† সম ৩১২

সমজয় ৪০৮

সমবায়—বৈশেষিক মতে ৯৮

সমাজ—বেদান্ত ৩৭ ; স্বহৃক্ত
১৪৮ ; পুরাণোক্ত ২০১ ;
রামায়ণের ১২১ ; মহা-
ভারতোক্ত ২৭৩ ; প্রাচীন
কালের ৪৫৮-৪৬০

সমাদি—পাতঞ্জল মতে ১১২ ;
রাজা ১৮৩, ৩৭৭, ৪৪৩ ;
৪৩৪ ; হা দাস সাধুর
সমাদি ১১৩

সমাধিযোগ ২৬৭

সমুদ্র যাত্রা ৫৮

সম্প্রতি ২১৯, ২২৭

† সম্বরণ ৩০৫, ৩১০, ৩৫৯

† সম্বর্ত ৩০৭, ৩৪৮

সম্বল নগর ৩৩৫

† সম্বব ৩১২

* সম্বৃত ২৯৫

† সম্বতা ৩০৭, ৩৮৯

‡ সম্রাট ৩৩১, ৩৩৭

সরযু ৪২৭

† সরলাক্ষ ৩০৬

সরযবতী ৩৬২, ৩৬৩

সর্পসত্র ২৮৯, ৩৬৩

* সর্বকাম ২৯৫, ৪২৩

* সর্বকর্ম্মা ২৯৩

† সর্বগ ৩০৬

† সর্বভেজা ৩৩৭

† সর্বত্রগ ৩১৬

সর্বদমন ৩৫৭

সর্বদর্শন সংগ্রহ ১৩৩, ১৩৪

সর্বমেধ (যজ্ঞ) ৩৫০

*, † সহদেব ১০২, ১৪২, ২৯৫,
৩০৬, ৩৬০, ৩৬১, ৩৮৩,
৪১৯, ৪৬১

সহস্রগণ প্রসঙ্গ—১৫১, ১৫৭,
১৫৮, ২২৪, ২৭৭, ৩৪৪,
৪৫৯, ৪৬০

* সহস্রান ২৯৯

† সহস্রজিৎ ৩০৯, ৩৫৩

সহস্রদ ৩০৮, ৩৮৭

সহস্রাব ২৯৮

সাগর—তাঁহার উৎপত্তি বিবরণ
৩৪৪

সাক্ষা—দর্শন ৮৭-৯৫ ; কপিল
ও সাক্ষা দর্শন ৮৭ ;
টীকাভরণ ৮৮ ; সাক্ষ্যের
প্রতিপাদ্য ৮৯ ; তন্মতে
স্থিতি ৯১-৯২ ; তন্মতে
ঈশ্বর ৯৩, নির্বাণ ৯৫ ;
পাতঞ্জল দর্শনের সহিত
তাঁহার সাদৃশ্য ১১০ ;
বৈশেষিকের সহিত তাঁহার
তুলনা ৯৭ ; বেদান্তের
সহিত তাঁহার পার্থক্য
১২২, ১২৯, ১৩০ ; শেষর
সাক্ষা ১১০

সাক্ষ্যকারিকা ১৪৩

সাক্ষ্য প্রবচন ১১০

সাক্ষ্যায়ন ৩২

† সাক্ষত ৩২৫, ৩৫৪

† সাত্যকি ৩০৮, ৩৮৮,
৪১৫, ৪১৭

* সাত্যরাধি ২৯৫

সাধন (বেদান্ত মতে) ১২১,
শমদমাদি সম্পত্তি ১২১
সাধনা (বেদান্ত মতে) শ্রবণাদি
অঙ্গ চতুষ্টয় ১২৩, ১৩০, ১৩১
সাবর্ণি (মহু) তাঁহাদের নাম
ও বংশ ৩৩৯-৩৪০
সাবর্ণি মহু ২২৮
সাবর্ণি (মহুস্তর) ৪৩৩
সাবিত্রী ৩৭৭, ৩৯৬, ৩৯৭
সাম (বেদ) ২৬, ২৯, ৩২, ৬১
সামগ্র্য ১৫২
সায়ণাচার্য্য ৪৬, ৬০, ৪৪৩
সারাসেন ৪৬৯; তাঁহাদের
খিলান নির্ঘণ প্রথা ৪৬৯
সার্কতোম ৩২০
সালসতি ৪৬৯
সাহজ ৩০৮
সাহি ৩০৮
সিদ্ধান্ত শিরোমণি ৪৬৩, ৪৭০
সিদ্ধদেশ ২৭৫
*সিদ্ধদীপ ২৯৩, ৩৮০
সিদ্ধেশ্বর ৪১৪
*সীতা ২১৮, ২১৯, ২২৬, ৩৮৩,
৩৮৪, ৩৯০, ৩৯৬, ৩৯৭;
নামের কারণ ৩৪৭; বংশ-
লতায় ২২৪
সীরধ্বজ ৩৮৩, ৩৮৪
*সুকজা ২৯৩, ৩৪৮
সুকল্প ২৯৮
সুকুমার ৩০৭, ৩৮৪
সুকৃতি ৩১৬
*সুক্রেত ২৯৩, ৩০৭
সুকৃত্র ৪৬, ৩১৬
সুখীনল ৩২২
সুগতি ৩৩৭
*সুগন্ধি ২২৫
সুগ্রীব ২১৯, ২২৭
*সুচক্র ২২৫, ৩৮৪, ৪৩৪
সুচক্র ৩০৯
সুচেতা ৩০৭

সুজঙ্ঘ ২৯১
সুজাত ৩৫৩
সুজাতি ৩২৬
সুজোষ্ঠ ৩১৭
সুতঞ্জয় ৩২০
সুতহু ৩২৫
*সুতপা ৩০১, ৩০৭
সুতসোম ৩১৬
সুতীক ২১৮
সুদংষ্ট্র ৩০৭
*সুদর্শন ১১৯, ২৯২, ৩৭৭, ৪১৭
*সুদাস ৫৫, ১৪৯, ১৬২, ৪২০,
৪২৪, ৪৩২, ৪৩৩, ৪৪৮,
৪৫৪; তাঁহার সাহিত্য-
রাগ ৫৫; বংশলতায় ২৯৩
সুদ্রয় ৩৩৮
*সুদেব ৩২৭, ৩০৯, ৩৯৯,
৪০৮
সুদেবী ৪৪৫
সুদ্রা ৩১৯
সুদ্রায় ৩৮৪, ৩৮৫
সুদ্রহু ৩০৯, ৩৫৯
*সুদ্রা ২৯৩, ৩৮৬, ৪০০, ৪০১,
৪২৭
*সুধতি ২৯৪
*সুনকত্র ২৯৬
সুনন্দ ৩২২, ৪৪৬
*সুনয় ২২৫, ৩১৬
সুনহ ২৯১
সুনহোত্র ৩০৭
সুনাং ৩১৭
সুনামা ৩০৯
সুনীত ৩১৩
সুনীতি (সুত) ৩১৬, ৩৫৫
সুনীধ ৩০৭
সুনেত্র ৩০৬
সুন্দর শতিকর্ষি ৩১৭
সুপাশ ৩১৬
*সুপ্রভীক ২৯৬, ৪০৬
সুকি ৭

*সুবর্ণ ২৯৬
*সুবর্ণরোমা ২৯৪
সুবল ৩১৬
*সুবাছ ১৭২, ২৯৬, ৩৯৪, ৩৯৬,
৪০৮, ৪০৯, ৪১২
সুবিভু ৩১৩
সুবীর ৩১৬
*সুব্রত ২৯২, ৩১৬, ৩৫৩,
৩৮০
সুভদ্রা ২৪৮, ২৭২, ৩০৯,
৪০৪, ৪০৫
সুভাষ ২৯৫
সুভূমপি ৩০৯
সুভূষণ ৩২৭
*সুমতি ২৯৫, ৩৩৭, ৩৪৬,
৩৮৩, ৩৮৬, ৪১২
সুদ ৪১১, ৪১২
সুমনস ৩৩৮
সুমনা ৩০৭
সুমন্ত ৩২৪
*সুমন্ত ২৩৪, ২৯৫, ৪৩৫
সুমালা ২৭৭
*সুমিত্র ২৯৬, ৩০৯
সুমীট ৩০৫, ৪৩২
সুযুথ ৪৪৯, ৪৬৫
সুযুটি ৩২৫
সুযু ৩০৫
সুযজ ৩০৮, ৪৩৫, ৪৪৫
সুযশা ৩১৭
সুযাতি ৩০৭
সুরেন্দ্র ৩৭৮
*সুরোধন ২৯৮, ৩৮০
*সুরোধ ১৮৩, ১৮৫, ২৯৬,
৩১২, ৩৭৭, ৩৯৯, ৪০১,
৪১৩, ৪৩৩, ৪৩৪
সুরাধা ২৭২
সুরাষ্ট্র ২৩৪, ৪১৯, ৪২৪
সুরাসমুদ্র ৩৩২
সুকচি ৩৩৫
সুরোধ ৩২৫

সুভ-সুত্র ৭০, ৪৬২	৩০২ ; দেবী-ভাগবত ও	সৌতি ১৮২
† সুশর্মা ২৪৪, ৩১৭	বৃহদ্রথ-পুরাণে ৩০৩	*সৌদাস ২২২ ; তাঁহার মিত্র-
† সুশান্তি ৩২৮	সূর্য্যবংশীয় নৃপতিগণ ৩৪১ ;	সহ স্ত কল্যাণপাদ নাম
সুশ্রবা ৪২২, ৪২৩	তাঁহাদের বংশলতা ২২২-	প্রাপ্তি ৩৪৫
† সুশ্রব ৩১৬	৩০৩ ; বংশলতায় অসাম-	সৌনক ১৭৩
সুশ্রব ৩৪২, ৪৬১	জ্ঞাত ৩৭৯	সৌবীর ৪২২
* সুশ্রুত ২২৫	সূর্য্যবংশী ৪১৮	সৌভরি ৩৪২
† সুশ্রব ৩১৬, ৩২৩	সূর্য্য-সিন্ধু ৪৬৩, ৪৬৯	স্কন্দপুরাণ ১৭১, ১৮১, ১৮২
† সুশ্র ৩১০	* সূর্য্যাব ২২৫	স্বাভেনোভিয়া ২৩
† সুশ্রুত ৩১০	† সুশ্রব ৩০৭, ৩৮৩ ৪২১	স্তোত্র ৩৪
* সুসন্ধি ২২২, ৩১১	সৃষ্টি-তত্ত্ব ১০২ ; তত্ত্ব ২১২ ;	স্তোত্রাঙ্গ ৩৩
† সুসহ ৩০৭, ৩৫০, ৩২২	সাক্ষামতে ২১-২২ ;	† স্থপিলেয় ৩১০
† সুসেন ৩০৬	বৈশেষিক মতে ৯২ ; জায়	স্থপতি-বিদ্যা ৪৬৮, ৪৬৯
† সুহবি ৩০৫	মতে ১০৬ ; বেদান্ত-মতে	† স্থলেয় ৩১০
† সুহ ৩২১	১০৮-১২২ ; বৌদ্ধ-মতে	স্পেতাঙ্গ ১১
† সুহোতা ৩০৫, ৩৮৫	১৩৬ ; দর্শনাদির তুলনায়	স্পেন্সার (হার্ভার্ট) দর্শন সম্বন্ধে
† সুহোত্র ৩০৫, ৩৮৬	১৪০-১৪১ ; মনু-মতে ১৪৭ ;	তাঁহার মত ১৪১
† সুজ ৩২৮	হারীজ-সংহিতা মতে ১৫২ ;	স্বনয় ৪২২, ৪২৬, ৪৫৮
সুজ ২২, ৩০ ; স্বপ্নেদে ৩১	বিষ্ণু-পুরাণ মতে ১৯০ ;	† স্বয়ংভোজ ৩০২
† সুচী ৩১৭	শ্রীমদ্ভাগবত, অগ্নি-পুরাণ ও	† স্বয়ম্ভু ৩১৮
সুত—তাঁহাদের উৎপত্তি ৩৩৬ ;	শিবপুরাণ মতে ১২৬ ;	স্বর ৭৭
তাঁহাদের ধর্ম্ম ২০৬	অগ্নি ৭-১০, ৬৩, ৬৯ ;	স্বরিন ৭৭
সুত্র ৭৪ ; ত্রিবিধ ৭৪, ৭৫ ;	বাইবেল মতে ১০	স্বর্গ ৯৫ ; তন্ত্রাভের উপায় ১৪৮
তৎসম্বন্ধে পাশ্চাত্য মত	সেঙ্গেল—হিন্দু-দর্শন সম্বন্ধে	*স্বর্গরোমা ৩০২
৭৬, ৭৭ ; অর্থ ৮৩	তাঁহার মত ৮৫	স্বর্ভাসু ৩৬৭
সুরসেন ৩২৩	† সেতু ৩০৭	স্বধ ৪২২
* সূর্য্য (বিশ্বাস) ২২২ ;	সেদুক ৪৩১	‡ স্বাতি ৩৩৭
তাঁহার উত্তরাংশ ও দক্ষি-	সেনজিৎ ৪২০, ৪২১	‡ স্বায়ং ৩৩৭
ণায়ণ ৪৬২ ; তাঁহার আলোক	সেনিগাল ৩৭৯	স্বায়ম্ভব (মনু)-৩৩০, ৩৩১, ৩৩৫,
হইতে চন্দের আলোক	সেলিউকাস ২৮৮	৪৩০ ; (মদন্তর) ৩৩৫,
প্রাপ্তি ৪৬২ ; তাঁহার মার্গস্ত	সোপেনহর—উপনিষৎ সম্বন্ধে	৩৭১, ৩৭৭
নামের হেতু ৪৬২, ৪৬৩	তাঁহার মত ৭২	স্বারোচিষ—মনু ৩৩০ ; বিভিন্ন
সূর্য্যকেতু ৪৩৫	সোভরি ৪৬৩	পুরাণের মতে তাঁহার
সূর্য্যপীড় ৩২৮	† সোম ৩০৭, ৪৫৫	পুস্তগণ ৩৩২ ; মদন্তর ৩৩৫
সূর্য্যবংশ—রামায়ণে ২২০ ;	† সোমক ৩১১	† স্বাহা ৩২৩, ৪১২
ব্রহ্ম পুরাণে ২২৩ ; বিষ্ণু-	* সোমমদন্ত ২২৫, ৩১৬, ৩৪৮,	† স্বাহি ৩২৭
পুরাণে ২২৪ ; হরিবংশে	৩৩৩, ৪১৫, ৪১৭	স্বতি (সংহিতা) ১৪৪-১৬৯ ;
২২৭ ; অগ্নি-পুরাণে ২২৮	সোমরস ৫৮	শকার্ণ এবং সংখ্যা-পরিচয়
শিব-পুরাণে ২২৯ ; শ্রীমদ্ভা-	† সোমলক্ষ্মী ৩১৭	১৪৪ ; তৎসমুদায়ের কাল-
গবতে ৩০০ ; মহাভারতে	† সোমজি ৩১৯	নির্ণয়ে ১৪৫ ; মনুসংহিতা

১৪৬; অত্রি-সংহিতা ১৫০;
বিষ্ণুসংহিতা ১৫১; হারীত
ও যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা ১৫২;
উশনঃ সংহিতা ১৫৩;
অঙ্গির, যম ও আগস্ত্য-
সংহিতা ১৫৪; সংবর্ধ-
কাত্যায়ন ও বৃহস্পতি-
সংহিতা ১৫৫; পরাশর
সংহিতা ১৫৬; বাস-
সংহিতা ১৫৭; শঙ্কালিখিত
ও দক্ষ সংহিতা ১৫৮;
গৌতম, শাতাতিপ ও বসিষ্ঠ
সংহিতা ১৫৯; সংহিতা-
সমূহে সামাজিক চিত্র
১৬০; সংহিতার কাল-
নির্ণয় প্রসঙ্গে ১৬৩;
পাশ্চাত্য-ভাষায় বর্ণাদি-
সংহিতার অনুবাদ ১৬৩

জ্ঞানস্বক মণি ৩৫৪

টিপ্পনজিৎ ৩২১

হ

হংসপুঞ্জ ৪০১

* হংসাখ ২৯৯

হুম্মান ১১৯, ২২৭

† হবির্জাম্ব ৩২৩

• হবির্জান ৩৩৮

† হয় ৩০৮, ৪০৫

হয়গ্রীব ৩৭১, ৪৪৫

হরি—আখ্যায় পুত্র ৩৭৭, ৩৩৩,

৩৩৭; স্বয়ং-পুত্র ৩৩৭;

অকম্পন-পুত্র ৪০১; কাকি-

পুরাণে ৪৩৭

† হরিকেশ ৩১১

হরিক্ষেত্র ৩৩০

* † হরিত ২৯৯, ৩০৮, ৩৪৪

† হরিতক ৩১৩

হরিদাস সাধু ১১২, ১১৩

হরিদেব ১৬৫

হরিবংশ ১৮৯

• হরিবর্ষ ২৩৩, ৩৩৭

হরিযুপিয়া ৪৩০

* হরিশ্চন্দ্র ৬৩, ২৩২, ২৯৩,

৩৪৬, ৩৮১; তাঁহার কন্দ-

নিবরণ ৩৪২-৩৪৪

• হর্যাক্ষ ৩৩৭

† হর্যাক্ষ ৩১১

† হর্যাবল ৩১৮

* হর্যাব (ভর্যাব) ২৯৩, ৩৪২, ৪০৮

† হর্যাবন ৩০৭

† হর্যাবত ৩২৬

হস্তিনাপুর ২৪৪, ৩৫৮, ৩৬০,

৩৬১, ৩৬৩, ৩৮৬

† হস্তী ৩০৬, ৩৫৮, ৩৮৫

হাটার (সার উইলিয়ম) হিন্দু-

শিল্পের আদর্শ বিষয়ে ৪৬১

হাখীর ৪৭২

হাখোন্ট (ব্যারন) অ্যামেরি-

কায় হিন্দুর দেব-দেবীর

অস্তিত্ব সম্বন্ধে ৪৬৫

* † হারীত ১৫২, ২৯৩, ৩১৮,

৩৪২; সংহিতা ১৫২

হার্ডি—আমেরিকার তুলনায়

ভারত-প্রসঙ্গ ৪৬৫

† হাল ৩১৭

• হালবেড—বাইবেলের স্থিতি

সম্বন্ধে ১০

হাস্টিটপ ৩৭৮

হিষ্টেস ৫৪

হিন্দু—শব্দের উৎপত্তি ১৭;

হিন্দুর লক্ষণ ৩৪; তাঁহা-

দের ইতিহাস ৫১; তাঁহা-

দের ঈশ্বর ৩৫; পাশ্চাত্য

পণ্ডিতগণের মতে তাঁহা-

দের গুণ-গৌরব ৪৭০, ৪৭১

হিন্দু-দর্শন ১৩৮-১৪১

হিন্দু-ল ১৪৯

হিমবর্ষ ৩৩৩

† হিমবর্ষ ৩২৪

• হিরণ্য ৩৩৮

হিরণ্য (হিরণ্যান) ৩৩৩

হিরণ্যকশিপু ৩৬৬, ৩৭৩, ৪৪৫

৪৪৭

হিরণ্যগর্ভ ১৪১

* হিরণ্যান্ত ৩০১, ৩৪১

• হিরণ্যরেতা ৩৩৭

হিরণ্যস্থ ৩৭২, ৪৩১

* † হিরণ্যাক্ষ ২৯২, ৩২১; এবং

দৈত্য বংশে ৩৬৬, ৩৬৯

† হীন ৩১৮

হীরেণ—(অধ্যাপক) ভারতবর্ষ

সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত ৫

হয়েন সাং—ভারতবাসীর চরিত্র

সম্বন্ধে তাঁহার মত ৪৭১

হুগ ৩৫৭, ৪১৭, ৪৬৭

† হুদিক ৩০৫, ৩৮৯

হেট্টর ২৪০

হেমকূট-বর্ষ ৩৩৩; পূর্বত ৪১৩

হেমচন্দ্র ২৯৫, ৩৯৩

হেরোডোটাস—শিশরের তুল-

নায় ৩৭৫

হেলেন ২৪০

হেলিংস (ওয়ারেন)—গীতার

অনুবাদে ২৯০; ভারত-

বাসীর গুণ-গাথায় ৪৭১

* হৈমবতী ২৯৩, ৩১১

† হৈহয় ৩০৮, ৩৪৪, ৩৫৩, ৩৮৭,

৩৮৮, ৩৯১, ৪০৮, ৪৪৫

† হোজ ৩১৮

† হোম ৩১৯

হোমার ২২০

হোয়েটলি—দর্শন সম্বন্ধে ২৭২

হোসেন (শুলতান মৈয়দ) ১৬৫

* হুবরোয়া ৩০২



